اشرف الهداية

আশরাফুল হিদায়া

বাংলা

২

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, শেখ জনুরুদ্দীন দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা-১২১৯

মাওলানা আব্দুর রায্যাক আল-হুসাইনী

মাওলানা মুহাম্মদ আবূ মূসা

মাওলানা মামুনুর রশীদ

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আশরাফুল হিদায়া বাংলা

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া : ৬৫০.০০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

নাহমাদুহূ ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম

হাম্‌দ ও সালাতের পর ফিকহশাস্ত্রে সর্বজনবিদিত, সুবিখ্যাত গ্রন্থ আল্লামা শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন হাসান আলী ইবনে আবূ বকর আল-ফারগানানী আল-মুরগীনানী (র.) [মৃত: ৫৯৩ হি.] কর্তৃক রচিত হিদায়া গ্রন্থের পরিচয় সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও পাঠক সমাজের নিকট নতুন করে তুলে ধরার কোনো অবকাশ রাখে না। এটা স্ব-স্থানে মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী সকল মাযহাবের আলোচনা -পর্যালোচনা, নকলী ও আকলী দলিলের সমন্বয়ে সংকলিত আপন মর্যাদায় উদ্ভাসিত এক অনন্য গ্রন্থ।

প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সকল মাদরাসায় এটি পাঠ্যসূচির শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। মূলত হিদায়া কিতাবখানাতে ইলমে ফিক্‌হের প্রয়োজনীয় সকল বিধানাবলির বিশদ ব্যাখ্যা সুচারুরূপে প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীগণ ও পাঠক সমাজের পক্ষে এ সুবিখ্যাত গ্রন্থের সরাসরি অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই সহজবোধ্য করার নিমিত্তে এ কিতাবটির বঙ্গানুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ জাতীয় কিতাব বাংলাদেশে এটাই প্রথম। ইতঃপূর্বে **ইসলামিয়া কুতুবখানা** এ মহাগ্রন্থটির ১ম খণ্ডের ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ বঙ্গানুবাদ করে বাজারজাত করেছে, যা সর্বমহলে ব্যাপক সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। সেই ধারায়ই আজ প্রকাশ হতে যাচ্ছে **আশরাফুল** হিদায়া-এর ২য় খণ্ড। আমরা আশা করি, প্রথম খণ্ডের ন্যায় ২য় খণ্ডটিও সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণে সক্ষম হবে 'ইনশাআল্লাহ'।

পূর্বাপরের সকল প্রশংসাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। কেননা তাঁরই অশেষ কৃপায় আমরা এ মহান উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হয়েছি। আশা করি এটা আসাতিযায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশে যথেষ্ট কালক্ষেপণ হয়ে গিয়েছে, যা সুপ্রিয় পাঠকবর্গকে বিষিয়ে তুলছিল। মূলত বাংলার ছোট্ট আকাবির শহীদ আল্লামা ইসহাক ফরিদী (র.)-এর অকাল অন্তর্ধান এজন্য বহুলাংশে দায়ী। আমাদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। তবে মৌলিক কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব 'ইনশাআল্লাহ'।

পরিশেষে এ গ্রন্থটি রচনায় যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। "জাযাহুমুল্লাহু খায়রান ফিদ্-দারাইন।" আর আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি– তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে লেখক, পাঠক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন!!

বিনীত

প্রকাশক

সূচিপত্র

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

অধ্যায় : জাকাত

ইবাদত তিন প্রকার– [১] শারীরিক ইবাদত; যেমন– নামাজ ও রোজা। [২] আর্থিক ইবাদত; যেমন– জাকাত। [৩] শারীরিক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বিত ইবাদত; যেমন– হজ।

قِيَاسْ তথা যুক্তির দাবি ছিল, নামাজ অধ্যায়ের পর রোজা অধ্যায়ের আলোচনা করা, যাতে শারীরিক ইবাদতদ্বয়ের আলোচনা পরপর একত্রে হয়ে যায়। কিন্তু এরূপ করা হয়নি; বরং নামাজের অধ্যায়ের পর জাকাতের অধ্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রথম কারণ– উক্ত তরতীবে [ক্রমধারায়] আল্লাহর বাণী কুরআন এবং রাসূল ﷺ-এর বাণী হাদীসের অনুসরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নামাজের পর জাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থ– তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত প্রদান কর।– [সূরা বাকারা; আয়াত– ৪৩]
রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ .

অর্থ– ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর। এক. সাক্ষ্য প্রদান করা এ মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, দুই. নামাজ কায়েম করা, তিন. জাকাত প্রদান করা, ...

দ্বিতীয় কারণ– সাধারণত এ কথা প্রসিদ্ধ যে, জাকাত এবং রোজা দ্বিতীয় হিজরিতে ফরজ হয়েছে, তবে নিকায়া (نِقَايَة) গ্রন্থকার মোল্লা আলী ক্বারী (র.)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, জাকাত রোজার পূর্বে ফরজ হয়েছে, এ জন্য জাকাতের আলোচনা রোজার পূর্বে করা হয়েছে। কারো কারো মতে, জাকাত ইজমালী (اِجْمَالِيْ) বা সংক্ষিপ্তভাবে হিজরতের পূর্বে ফরজ হয়েছে এবং তাফসীলী (تَفْصِيْلِيْ) বা বিস্তারিতভাবে ফরজ হয়েছে হিজরতের পর। জাকাত ফরজ হওয়ার এই তরতীব জাকাতের আলোচনা রোজার পূর্বে করার দাবিদার। তাই জাকাতের বিষয়টি রোজার পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

জাকাতের আভিধানিক অর্থ : জাকাতের আভিধানিক অর্থ– পবিত্রতা। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থ–অবশ্যই সফল হলো ঐ ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করল। – [সূরা আ'লা ; আয়াত –১৪]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً "আমি নিজের পক্ষ হতে তাকে [ইয়াহইয়া (আ.)-কে] কোমল হৃদয়ের ও পবিত্র আত্মার অধিকারী বানিয়েছিলাম।" –[সূরা মারইয়াম; আয়াত –১৩]

জাকাতের নামকরণ : জাকাতকে জাকাত বলে নামকরণ করার বহু কারণ রয়েছে–

১. প্রথম কারণ হলো, জাকাতের দ্বারা জাকাতদাতা পাপ এবং কার্পণ্যের আবিলতা হতে পবিত্র হয়। এ মর্মের প্রতি মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا "আপনি তাদের সম্পদ হতে জাকাত গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন।" [সূরা তওবা; আয়াত–১০৩]

২. দ্বিতীয় কারণ হলো, জাকাতের অর্থ– বর্ধিত হওয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। যেমন বলা হয়– زَكَى الزَّرْعُ "শস্য বড় হয়েছে।" এ অর্থের প্রেক্ষিতে জাকাতকে এ জন্য জাকাত বলা হয় যে, জাকাত দ্বারাও মাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

   জাকাত মাল বর্ধনের কারণ এভাবে যে, মহান আল্লাহ জাকাতদাতাকে দুনিয়াতে এর প্রতিদান দেন এবং আখেরাতে ছওয়াব প্রদান করেন।

   ইরশাদ হয়েছে– وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ "তোমরা যা কিছু খরচ কর তিনি [আল্লাহ] এর প্রতিদান প্রদান করেন।" –[তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ, সূরা সাবা; আয়াত নং– ৩৯]

জাকাতকে সদকা (صَدَقَةٌ)-ও বলে। কেননা জাকাত প্রদান জাকাতদাতার ঈমানের تَصْدِيْقٌ তথা সত্যতা প্রমাণ করে। অর্থাৎ জাকাত প্রদান করার দ্বারা তার নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাকাতের পারিভাষিক অর্থ : জাকাতের পারিভাষিক অর্থ– নিসাব পরিমাণ মালের এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এর একটি নির্দিষ্ট অংশ কোনো ফকির বা অনুরূপ ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেওয়াকে শরিয়তের পরিভাষায় জাকাত বলা হয়। কোনো কোনো ফকীহ জাকাতের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে–

تَمْلِيْكُ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ عَلٰى فَقِيْرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ -

অর্থ–মালিক ও হাশেমী বংশের নয় এরূপ কোনো ফকির ব্যক্তিকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়াকে পরিভাষায় জাকাত বলা হয়। কারো কারো মতে, মালের যে অংশ ফকিরের জন্য আলাদা করা হয়, ঐ অংশকে জাকাত (زَكٰوةٌ) বলে। আর তা এজন্য বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اٰتُوا الزَّكٰوةَ "জাকাত প্রদান কর।" বলা বাহুল্য, মাল ব্যতীত জাকাত প্রদান করা অসম্ভব। অতএব এর দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, জাকাত মালকেই বলা হয়।

জাকাত ফরজ হওয়ার দলিল : কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা জাকাতের ফরজিয়াত প্রমাণিত।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "তোমরা জাকাত প্রদান কর।"

পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

(١) عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا اِذَا اُمِرْتُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ . قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ اُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ وَاَنَا ابْنُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) -

অর্থ– সুলাইম ইবনে আমির (র.) বলেছেন, আমি আবূ উমামা (রা.) হতে শ্রবণ করেছি। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজের সময় রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় কর, রমজানের রোজা রাখ, নিজ মালের জাকাত প্রদান কর, যখন তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয় তখন আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। সুলাইম (র.) বলেন, আমি আবূ উমামা (রা.)-কে বললাম, আপনি এ কথা রাসূল ﷺ থেকে কত বছর বয়সে শ্রবণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, ত্রিশ বছর বয়সে শ্রবণ করেছি।-[তিরমিযী শরীফ]

অপর এক مَرْفُوْعٌ হাদীসে আছে–

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

অর্থ– ইবনে ওমর (রা.) হতে مَرْفُوْعًا বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর রাখা হয়েছে।– [১] সাক্ষ্য প্রদান করা এ মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, [২] নামাজ কায়েম করা, [৩] জাকাত প্রদান করা, [৪] বাইতুল্লাহর হজ করা এবং [৫] রমজানের রোজা রাখা। [হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন।]

জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ : জাকাত ফরজ হওয়ার سَبَبٌ [কারণ] হচ্ছে نِصَابٌ نَامٍ অর্থাৎ বর্ধনশীল নেসাবের মালিক হওয়া।

জাকাতের শর্ত : জাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত হচ্ছে নেসাবের মালিক স্বাধীন হওয়া, বিবেক ও জ্ঞানবান হওয়া, মুসলমান হওয়া, ঋণমুক্ত হওয়া এবং উক্ত নিসাবের মালের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

জাকাতের হুকুম :

যে ব্যক্তি জাকাত আদায় করে দেবে সে দুনিয়াতে মুকাল্লাফ (مُكَلَّفٌ) হওয়ার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবে, আখিরাতের আজাব হতে মুক্তি পাবে এবং ছওয়াব হাসিল হবে।

জাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত :

১. যে মালের উপর মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল, যা কষ্ট ও পরিশ্রম করে এবং ঘাম ঝরিয়ে সে অর্জন করে, সে প্রিয় মাল যখন মানুষ আল্লাহর জন্য নিজ হাতে প্রদান করে, তখন কার্পণ্য আর আবিলতা তার হৃদয় থেকে দূর হয়ে যায় এবং ঈমানের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। কেননা কষ্টার্জিত মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট পুণ্যের কাজ। এর দ্বারা আত্মার সর্বাধিক বড় নাপাকী কার্পণ্য দূর হয়ে যায়। এটি একটি উচ্চতর অবস্থা অর্থাৎ سَخَاوَتْ বা দানশীলতার অবস্থা এবং মালের মহব্বত হ্রাস করার অবস্থা। জাকাতের দ্বারা অবশ্যই এই কার্পণ্যের আবিলতা হতে মুক্তি লাভ করা যায়। জাকাত ফরজ করার এটি একটি বড় হিকমত। এমনিভাবে এর দ্বারা দয়াময় আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কেননা প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় দান করা একটি কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ। এ কষ্ট সহ্য করার কারণে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং ঈমানের মাঝেও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।

২. জাকাতের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের সহানুভূতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে ধনী ও গরিবের মাঝে নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি হয়। ধনীদের জন্য জাকাত প্রদান করা ফরজ। যদি জাকাত ফরজ নাও হয় তবুও মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রকাশার্থে গরিবদের সাহায্য করা উচিত। মানুষের মধ্যে সমবেদনা অলংকার-সম একটি উচ্চ পর্যায়ের গুণ। জাকাত প্রদানের দ্বারা ঐ গুণের প্রতিফলন ঘটে। সুরুচিসম্পন্ন মানুষের মাঝে এ কথা স্বীকৃত যে, জাকাত প্রদানের মাধ্যমে মানব সমাজের প্রতি মমত্ববোধ ও সমবেদনা প্রকাশ পায়। এমনিভাবে জাকাত প্রদান করা এমন একটি গুণ যার উপর অনেক গুণ নির্ভরশীল। জাকাত প্রদানের ফলে সমাজে শুভ আদান-প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যার মাঝে মানব জাতির প্রতি সমবেদনা প্রকাশের গুণ নেই সে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পতিত আছে। তাকে এ অবস্থা হতে উদ্ধার করা ওয়াজিব। উদ্ধারের পথ হলো, গরিবদেরকে জাকাত প্রদান করা।

৩. জাকাত পাপ মোচন করা এবং বরকত বৃদ্ধি করার বড় ধরনের মাধ্যম।

৪. নিঃসন্দেহে শহরের মধ্যে অসহায়, নিঃস্ব এবং অভাবী লোক বিদ্যমান। এ অভাবের বিপর্যয়ে আজ একজন আক্রান্ত, কাল অন্যজন। এহেন অবস্থায় যদি দরিদ্রতা ও মানুষের অভাব-অভিযোগ দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে সমাজের এ সব মানুষের ধ্বংস ও হালাকত নিশ্চিত। কাজেই জাকাত ব্যবস্থা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা; এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৫. জাকাত ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে এতে ধনীদের মালে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় এবং গরিব লাভবান ও স্বচ্ছল হয়। পক্ষান্তরে সুদি ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে এতে গরিব লোকটি আরো গরিব হয় এবং ধনী লোকটি আরো সম্পদ হাসিল করে রাতারাতি টাকার পাহাড় গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ اِذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ اَمَّا الْوُجُوْبُ فَلِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَلِقَوْلِهٖ ﷺ اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَعَلَيْهِ اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ لِاَنَّهٗ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ لِاَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ لِمَا نَذْكُرُهٗ وَالْاِسْلَامِ لِاَنَّ الزَّكٰوةَ عِبَادَةٌ وَلَا تَتَحَقَّقُ الْعِبَادَةُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا بُدَّ مِنْ مِلْكِ مِقْدَارِ النِّصَابِ لِاَنَّهٗ ﷺ قَدَّرَ السَّبَبَ بِهٖ وَلَا بُدَّ مِنَ الْحَوْلِ لِاَنَّهٗ لَابُدَّ مِنْ مُدَّةٍ يَتَحَقَّقُ فِيْهَا النَّمَاءُ وَقَدَّرَهَا الشَّرْعُ بِالْحَوْلِ لِقَوْلِهٖ ﷺ لَا زَكٰوةَ فِيْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلِاَنَّهُ الْمُمْكِنُ بِهٖ مِنَ الْاِسْتِنْمَاءِ لِاشْتِمَالِهٖ عَلَى الْفُصُوْلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْغَالِبُ تَفَاوُتُ الْاَسْعَارِ فِيْهَا فَاُدِيْرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ ثُمَّ قِيْلَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ لِاَنَّهٗ مُقْتَضٰى مُطْلَقِ الْاَمْرِ وَقِيْلَ عَلَى التَّرَاخِيْ لِاَنَّ جَمِيْعَ الْعُمُرِ وَقْتُ الْاَدَاءِ وَلِهٰذَا لَا يَضْمَنُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ التَّفْرِيْطِ ـ

অনুবাদ : আজাদ, জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ব্যক্তি যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক হয় এবং এ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকাবস্থায় তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন ঐ ব্যক্তির [সম্পদের] উপর জাকাত ওয়াজিব [ফরজ] হয়। ওয়াজিব [ফরজ] হওয়ার দলিল হলো, মহান আল্লাহর বাণী– وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "আর তোমরা জাকাত প্রদান কর।" এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ "তোমরা তোমাদের মালের জাকাত প্রদান করবে।" তদুপরি এ সিদ্ধান্তের উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে ওয়াজিব শব্দের দ্বারা ফরজ বুঝানো হয়েছে। কেননা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে দলিল উল্লিখিত হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আজাদ হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, এর দ্বারা মালিকানার পূর্ণতা অর্জিত হয়। আর জ্ঞানবান এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার শর্ত আরোপের কারণ একটু পরেই উল্লেখ করছি। মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করার কারণ হলো, জাকাত হচ্ছে একটি ইবাদত। কাফি'রর পক্ষ থেকে ইবাদত সাব্যস্ত হতে পারে না। আর নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া জরুরি। কেননা রাসূল ﷺ এ পরিমাণকে [জাকাত ওয়াজিব হওয়ার] কারণরূপে নির্ধারণ করেছেন। আর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরি। কেননা এমন একটা সময় অপরিহার্য যার মধ্যে [মালের] বৃদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে। আর শরিয়ত এর সীমা নির্ধারণ করেছে এক বছর দ্বারা। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا زَكٰوةَ فِيْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "এক বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মালে জাকাত নেই।" তা ছাড়া এই সময়ের অবকাশে মাল বর্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এতে বিভিন্ন মৌসুম শামিল রয়েছে। আর সাধারণত এ সব মৌসুমে মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং হুকুম ও সিদ্ধান্তটিকে তারই উপর আবর্তিত করা হয়েছে। অর্থাৎ একেই হুকুমের مَدَارْ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর কারো কারো মতে জাকাত عَلَى الْفَوْرِ [তাৎক্ষণিকভাবে] ওয়াজিব।

কেননা এটিই مُطْلَقُ الْاَمْرِ তথা শর্তহীন আদেশের দাবি। আর কারো মতে, এটি বিলম্বিত ওয়াজিব। কেননা সমগ্র জীবনই এটি আদায় করার সময়। এ কারণেই আদায়ে ত্রুটির পর নিসাব বিনষ্ট হয়ে গেলে তার উপর আদায়ের জিম্মাদারী আর থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথা–

[১] আজাদ হওয়া, [২] জ্ঞানবান হওয়া, [৩] প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, [৪] মুসলিম হওয়া, [৫] নিসাব পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক হওয়া, [৬] মালিকানা পূর্ণ হওয়া এবং [৭] নিসাবের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) জাকাত ফরজ হওয়ার পক্ষে তিনটি দলিল উল্লেখ করেছেন– ১. কুরআনের আয়াত– وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "আর তোমরা জাকাত প্রদান করবে।" ২. প্রসিদ্ধ হাদীস– اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ "তোমরা তোমাদের মালের জাকাত আদায় করবে"। হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর স্থাপন করা হয়েছে" ৩. ইজমায়ে উম্মত অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর যুগ হতে অদ্যাবধি কেউই জাকাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করেননি। বিজ্ঞ গ্রন্থকার (র.) বলেন, মতনে (مَتْنٌ) ওয়াজিবের দ্বারা ফরজ উদ্দেশ্য। কেননা, জাকাত অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং এর প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, যে জিনিস অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং যাতে কোনো সন্দেহ থাকে না; তা ফরজই হয়ে থাকে, ওয়াজিব হয় না।

প্রশ্ন : যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে مَتْنٌ-এ ফরজকে ওয়াজিব দ্বারা تَعْبِيْر করা হলো কেন?

উত্তর : ১. প্রথম উত্তর হলো, জাকাতের কোনো কোনো পরিমাণ ও অবস্থা আখবারে আহাদ (اَخْبَارُ اٰحَادْ) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তাই একে ফরজ না বলে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় উত্তর হলো, ফরজ এবং ওয়াজিব একটি অপরটির স্থানে مَجَازًا [রূপক অর্থে] ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানেও ফরজের স্থানে مَجَازًا [রূপক অর্থে] ব্যবহার করা হয়েছে।

আজাদ শর্তারোপ করার ফায়দা হলো, মুদাব্বার (مُدَبَّرٌ), উম্মে ওয়ালাদ (اُمُّ وَلَدٍ) এবং মুকাতাব (مُكَاتَبٌ) গোলামের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা আজাদ হওয়ার দ্বারাই মূলত পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হয়। গোলাম কোনো বস্তুর মালিকই হয় না। মুকাতাব (مُكَاتَبٌ) স্বীয় মালিকানাধীন বস্তুর তসরুফ (تَصَرُّفٌ) করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুর মালিক হয় না। মুকাতাব গোলামের মালিকানাধীন মালের মূল মালিক হচ্ছেন গোলামের মনিব। মোটকথা হলো, মুকাতাবের মালিকানা অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য মালিকানা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আর পূর্ণ মালিকানা অর্জন হয় আজাদ হওয়ার দ্বারা। এ প্রেক্ষিতে জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য আজাদ হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত– জ্ঞানবান হওয়া : এর ফায়দা হলো, মাতাল, অচেতন ও পাগলের উপর জাকাত ফরজ হবে না।

তৃতীয় শর্ত– প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : এর ফায়দা হলো, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের উপর জাকাত ফরজ হবে না। জ্ঞানবান এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সংক্রান্ত এ শর্তদ্বয়ের দলিল পরবর্তীতে উল্লেখ করবেন। لِمَا نَذْكُرُ দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

মুসলিম হওয়া এজন্য শর্ত যে, জাকাত একটি ইবাদত। আর কাফির হতে কোনো ইবাদত সংঘটিত হতে পারে না। আর ইবাদতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যাতে ইবাদতকারী ছওয়াব অর্জন করতে পারে। আর কাফিরের ছওয়াব অর্জন করার যোগ্যতা নেই। এজন্য কাফিরের উপর জাকাত ফরজ হবে না।

নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার শর্তারোপের কারণ হলো এই যে, মাল মালিককে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়। রাসূল ﷺ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে বলেছেন–

ثُمَّ اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَائِهِمْ .

অর্থ–লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন। তাদের ধনীদের থেকে জাকাত গ্রহণ কর এবং তাদের গরিবদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও।

সারকথা, উক্ত হাদীসে মালওয়ালাকে ধনী বলা হয়েছে। আর ধনী হওয়াটা মালের আধিক্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়, কিন্তু আধিক্যের নির্ধারিত কোনো সীমা নেই; বরং এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার মধ্যে তারতম্য আছে। এজন্য সাহিবে শরিয়ত মহানবী ﷺ জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ অর্থাৎ ধনী হওয়াকে নিসাবের পরিমাণ মালের সাথে مُقَيَّدْ [শর্তযুক্ত] করে দিয়েছেন। যেমন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, পাঁচ উকিয়ার (اُوْقِيَّةٌ) কম পরিমাণে জাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় জাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের (وَسْقٌ) কমে জাকাত নেই।

যেহেতু রাসূল ﷺ জাকাতের কারণকে পরিমাণের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন, এজন্য ফকীহগণ জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবের পরিমাণকে শর্ত হিসেবে স্থির করেছেন। জাকাত ওয়াজিব হওয়ার অপর একটি শর্ত হলো, পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এর দলিল হলো, জাকাত বর্ধনশীল মালের মধ্যে ফরজ হয়। অবর্ধনশীল মালের মধ্যে জাকাত ফরজ হয় না। মাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য এ পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন যাতে বৃদ্ধি সংঘটিত হতে পারে। আর শরিয়ত একে এক বছরের সাথে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এজন্য ফকীহগণ বলেছেন যে, জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ মালের উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরি।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তারোপের হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এক বছরের মধ্যে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। কেননা বছর বিভিন্ন মৌসুম যেমন– শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত কালের উপর ব্যাপৃত। বলা বাহুল্য যে, এ দীর্ঘ সময়ে জিনিসের বা সওদার মূল্যে তারতম্য এবং কম-বেশি হয়। যেমন– কোনো বস্তু এক মৌসুমে সস্তা অন্য মৌসুমে চড়া থাকে। সুতরাং মানুষ এভাবে ব্যবসা করে লাভবান হয়ে স্বীয় মাল বৃদ্ধি করতে সক্ষম। জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তি যেহেতু মালের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির (نَمُوْ) উপর রাখা হয়েছে। আর তা এক বছরের মধ্যে হয়ে যায়, তাই জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য এক বছর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এক বছরে মাল প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক বা না হোক, তাতে হুকুমের মধ্যে কোনো তারতম্য হবে না।

প্রশ্ন : যদি কেউ বলে যে, কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় মাল জমিনে প্রোথিত করে রাখে, তাহলে তাতে কি জাকাত ফরজ হবে, অথচ ঐ মাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি?

জবাব : উক্ত অবস্থায় যদিও বাহ্যতঃ বৃদ্ধি (نَمُوْ) পাওয়া যায়নি; তথাপি বাতেনী ও অভ্যন্তরীণভাবে বর্ধনশীলতা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ বৃদ্ধি হওয়ার যোগ্যতা তার মাঝে বিদ্যমান। কেননা এটা মালিকের নির্বুদ্ধিতা যে, সে স্বীয় সম্পদ জমিনের নীচে প্রোথিত করে রেখেছে; অথচ সে ঐ মাল দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সক্ষম ছিল। অতএব তার সক্ষম হওয়াকে বর্ধনশীলতা বলে গণ্য করা হবে এবং এটিই ধর্তব্য হবে। তার নির্বুদ্ধিতা ধর্তব্য হবে না।

জাকাত عَلَى الْفَوْرِ [তাৎক্ষণিক] ওয়াজিব না عَلَى التَّرَاخِىْ [বিলম্বিতভাবে] ওয়াজিব? এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম কারখী (র.)-এর মতে, তাৎক্ষণিক ওয়াজিব। সুতরাং সামর্থ্য থাকা অবস্থায় বিলম্ব করলে পাপ হবে।

দলিল : وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "আর তোমরা জাকাত প্রদান কর।" এমনিভাবে হাদীসে আছে– اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ "তোমরা স্বীয় মালের জাকাত প্রদান কর।" প্রকাশ থাকে যে, কুরআন ও সুন্নাহর উক্ত (اٰتُوْا ও اَدُّوْا) নির্দেশদ্বয় مُطْلَقٌ বা নিঃশর্ত। আর নিঃশর্ত নির্দেশের চাহিদা হলো, নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে (عَلَى الْفَوْرِ) পালন করা। অতএব বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জাকাত আদায়ে বিলম্ব করে তাহলে গুনাহগার হতে হবে। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত এই দলিলে কোনো প্রাণ বা সাবলিলতা নেই। কেননা مُطْلَقُ اَمْرٍ অর্থাৎ নিঃশর্ত নির্দেশ عَلَى الْفَوْرِ

[তাৎক্ষণিকভাবে]-ও বুঝায় না এবং عَلَى التَّرَاخِىْ [বিলম্ব]-ও বুঝায় না; বরং শুধু এতটুকু বুঝায় যে, নির্দেশটি পালন করা হোক। তৎক্ষণিক হোক বা বিলম্বিত হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং عَلَى الْفَوْرِ বা عَلَى التَّرَاخِىْ উভয়ভাবেই করা বান্দার জন্য বৈধ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-ও عَلَى الْفَوْرِ অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে জাকাত আদায় করা ফরজ হওয়ার প্রবক্তা। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ওজর ব্যতীত জাকাত আদায়ে বিলম্ব করবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। জাকাতের বিলম্ব এবং হজের বিলম্বের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, হজ ওয়াজিব হওয়ার পর বিলম্ব করার দ্বারা গুনাহগার হবে না। পক্ষান্তরে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর আদায়ে বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে। কেননা জাকাত ফকিরের হক, আর ফকিরের হক তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা আবশ্যক। তাই জাকাত আদায়ে বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে হজ এককভাবে আল্লাহর হক। আর আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন সত্তা, বিধায় তা বিলম্বে আদায় করলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হলো, মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তা আদায় করতে হবে। তাই মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। যদি হজ ফরজ হওয়ার পর আদায় না করে মারা যায় তা হলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, জাকাত আদায়ে বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে না, তবে হজ আদায়ে বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে। কেননা জাকাত সময়ের সাথে নির্ধারিত নয়। পক্ষান্তরে হজ নামাজের ন্যায় সময়ের সাথে নির্ধারিত। জাকাত যখন ইচ্ছা তখনই আদায় করতে পারে। পক্ষান্তরে হজ যদি নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে তাহলে তাকে আগামীতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর এক বছর এমন দীর্ঘ সময়, যে সময়ের মধ্যে কে বাঁচবে আর কে মারা যাবে তা কিছুই জানা নেই। এজন্য বিনা ওজরে হজ আদায়ে বিলম্ব করলে পাপী হবে।

ইমাম আবূ বকর জাসসাস রাজী (র.)-এর অভিমত হলো, বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর জাকাত আদায়ে বিলম্ব করা জায়েজ আছে। কেননা পূর্ণ জীবনই তা আদায় করার সময়। অর্থাৎ যদি তাৎক্ষণিকভাবে জাকাত আদায় না করে তাহলে জীবনের যে কোনো সময়ে তা আদায় করুক এতে তা আদায় (اداء) হিসেবে গণ্য হবে। কাজা হিসেবে গণ্য হবে না। অতএব বুঝা গেল যে, জাকাত আদায় করার সময় হলো মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। কাজেই বিলম্ব করার কারণে গুনাহ হবে না। এ কারণেই ফরজ জাকাত আদায় করতে কেউ যদি অবহেলা প্রদর্শন করে এবং এমতাবস্থার ফলে যদি পূর্ণ মাল ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাকে জাকাতের পরিমাণ মালের জামিন হতে হবে না। অর্থাৎ, তাকে এর জরিমানা দিতে হবে না। পক্ষান্তরে যদি জাকাত তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হতো তাহলে তাকে এ মালের জামিন হতে হতো। অর্থাৎ তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর জাকাত তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হয় না; বরং তা বিলম্বে আদায় করাও জায়েজ আছে। ইমাম মালিক, শাফেয়ী এবং আহমদ (র.) বলেছেন যে, উক্ত সুরতে তাকে জাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের জামিন হতে হবে। যেমন– পূর্ণ মাল ধ্বংস হওয়ার সুরতে ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে জামিন হতে হয়। অনুরূপভাবে নিসাব পরিমাণ মাল ধ্বংস হওয়ার সুরতেও তাকে জামিন হতে হবে।

তাঁদের দলিল হলো, নিসাব পরিমাণ মালের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা মালের মালিকের উপর জাকাতের অর্থ ঋণ (دين) হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। আর মাল ধ্বংস হওয়ার কারণে ঋণ মাফ হয় না এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও ঋণ হতে দায়িত্বমুক্ত হয় না। অতএব জাকাতেরও দায় থেকে সে মুক্ত হবে না।

উত্তর : আমাদের আহনাফের পক্ষ হতে এর জবাব হলো, নিসাবের মালিকের উপর নিসাবের এক অংশ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব। অতএব যখন পূর্ণ নিসাবের মাল ধ্বংস হলো তখন এর এক অংশ ধ্বংস হতে কিভাবে রক্ষা পেতে পারে? অর্থাৎ রক্ষা পেতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি নিসাবের মালিক নিসাবের পূর্ণ মাল হালাক করে দেয় তাহলে এতে তার পক্ষ হতে সীমালঙ্ঘন বা অপরাধ পাওয়া যায় বিধায় সে শাস্তিস্বরূপ জাকাতের জামিন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মাল নিজে নিজে হালাক হওয়ার সুরতে তার পক্ষ হতে যেহেতু কোনো অপরাধ পাওয়া যায়নি, তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তার উপর কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ زَكٰوةٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِنَّهٗ يَقُوْلُ هِيَ غَرَامَةٌ مَالِيَّةٌ فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْمُؤَنِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَصَارَ كَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَلَنَا اَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا تَتَاَدّٰى اِلَّا بِالْاِخْتِيَارِ تَحْقِيْقًا لِمَعْنَى الْاِبْتِلَاءِ وَلَا اِخْتِيَارَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْعَقْلِ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ لِاَنَّهٗ مَؤُنَةُ الْاَرْضِ وَكَذَالِكَ الْغَالِبُ فِى الْعُشْرِ مَعْنَى الْمَؤُنَةِ وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ وَلَوْ اَفَاقَ فِىْ بَعْضِ السَّنَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اِفَاقَتِهٖ فِىْ بَعْضِ الشَّهْرِ فِى الصَّوْمِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ يُعْتَبَرُ اَكْثَرُ الْحَوْلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْاَصْلِيِّ وَالْعَارِضِيِّ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهٗ اِذَا بَلَغَ مَجْنُوْنًا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الْاِفَاقَةِ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ اِذَا بَلَغَ ـ

অনুবাদ : অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, জাকাত হলো আর্থিক দায়দায়িত্ব। সুতরাং এটা অন্যান্য আর্থিক দায়দায়িত্বের সমতুল্য হবে। যেমন– স্ত্রীদের ভরণপোষণ। আর এটি ওশর ও খেরাজের অনুরূপ হয়ে যায়, [যা শিশু ও পাগলের মাল থেকেও নেওয়া হয়]। আমাদের উক্তি এই যে, জাকাত হলো ইবাদত। সুতরাং স্ব-ইচ্ছা ছাড়া তা আদায় হবে না। যাতে করে পরীক্ষার দিকটি সাব্যস্ত হতে পারে। আর আকল [জ্ঞান] না থাকার কারণে এ দুজনের স্ব-ইচ্ছা বলতে কিছুই নেই। খেরাজের হুকুম এর বিপরীত। কেননা খেরাজ হলো ভূমি কর বা জমির আর্থিক দায়। তদ্রূপ ওশরের ক্ষেত্রেও আর্থিক দায় -এর দিকটিই প্রধান। পক্ষান্তরে ইবাদত -এর দিকটি এতে আনুষঙ্গিক। বস্তুত পাগল যদি বছরের কোনো অংশে সুস্থতা লাভ করে তবে সেটা রোজার ক্ষেত্রে মাসের কোনো অংশে সুস্থতা লাভ করার সমতুল্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, বছরের অধিকাংশ সময় ধর্তব্য হবে। আর পাগলের বেলায় جُنُوْنٌ اَصْلِيٌّ ও جُنُوْنٌ عَرْضِيٌّ -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবালেগ যদি পাগল অবস্থায় বালেগ হয়, তবে পূর্ণ জ্ঞান লাভের সময় থেকে বছর পূর্ণ হওয়া বিবেচনা করা হবে। যেমন না বালেগার জন্য বালেগা হওয়ার সময় থেকে বছর ধর্তব্য হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হানাফী ফকীহগণের মতে, নাবালেগ ও পাগলের উপর জাকাত ফরজ নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে তাদের মালেও জাকাত ফরজ হবে। তাদের অভিভাবক তাদের মাল হতে জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলামি সরকার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত। যেমন– তাদের মাল থেকে তাদের স্ত্রীদের খোরপোষ ওয়াজিব হয় এবং যদি তাদের জমাজমি থাকে তাহলে তাতে কর এবং ওশর [উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ] ওয়াজিব হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, জাকাত হচ্ছে আর্থিক দায়দায়িত্ব। আর্থিক দায়দায়িত্বের মর্ম হলো যা মানুষের উপর আবশ্যক ছিল না তা তার নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, জাকাতের আর্থিক দায়দায়িত্বটি অবশ্য পালনীয় একটি কর্তব্য। অতএব বলা যায় যে, জাকাত সম্পদের মালিকের উপর একটি আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর আর্থিক দায়িত্ব ওয়াজিবই হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। চাই সে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা নাবালেগ হোক, জ্ঞানসম্পন্ন হোক বা পাগল হোক।

ইমাম শাফেয়ী (র.) জাকাতের বিষয়টিকে নাবালেগ এবং পাগলের স্ত্রীর খোরপোষ, তাদের জমির ওশর এবং করের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেভাবে নাবালেগ এবং পাগলের সম্পদে তাদের স্ত্রীদের খোরপোষ ওয়াজিব এবং যেভাবে তাদের জমিনে ওশর ও কর ওয়াজিব অনুরূপভাবে তাদের মালে জাকাতও ওয়াজিব হবে। এ কিয়াসের যে ইল্লত (عِلَّتْ)-টি উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায় তা হলো, গারামাত (غَرَامَتْ) বা আর্থিক দায়দায়িত্ব। সুতরাং স্ত্রীর খোরপোষ, জমির ওশর এবং কর যেরূপ মালী হক (مَالِىْ حَقْ) বা আর্থিক দায়দায়িত্ব, অনুরূপভাবে জাকাতও আর্থিক দায়দায়িত্ব।

অতএব স্ত্রীর খোরপোষ, ওশর এবং করের ন্যায় নাবালেগ এবং পাগলের মালের মধ্যেও জাকাত ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম তিরমিযী (র.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন–

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَاْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.

অর্থ–একদা রাসূল ﷺ লোকদেরকে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন, সাবধান! যে ব্যক্তি এমন কোনো এতিমের অভিভাবক হবে, যার মাল আছে তাহলে তার জন্য উচিত হবে সে যেন এর দ্বারা ব্যবসা করে। তা ফেলে রাখবে না যাতে জাকাত প্রদান করতে করতে তা শেষ না হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসে সদকা দ্বারা জাকাত উদ্দেশ্য। এ হিসেবে হাদীসের মর্ম হবে, অভিভাবক যদি এতিমের মাল ব্যবসা করে বৃদ্ধি না করে তাহলে প্রত্যেক বছর জাকাত দেওয়ার কারণে কয়েক বছরে পূর্ণ মাল শেষ হয়ে যাবে। حَتّٰى تَاْكُلَهُ الصَّدَقَةُ দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

এ হাদীসের দ্বারা জানা গেল যে, নাবালেগ এতিমের মালে জাকাত ফরজ হয়। আর যেহেতু নাবালেগ এবং পাগলের হুকুম একই ধরনের, এজন্য পাগলের মালের উপরও জাকাত ওয়াজিব হবে।

আমাদের [হানাফীদের] দলিল হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (فَتْحُ الْقَدِيْرِ وَشَرْحُ نِقَايَةٍ)

তিন ব্যক্তি হতে আল্লাহর হুকুম [সাময়িকভাবে] উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে [১] ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, [২] নাবালেগ সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং [৩] পাগল জ্ঞানসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত। উক্ত হাদীসের মর্ম হলো, এ তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহর হুকুম বর্তাবে না। তাই তাদের উপর জাকাত ফরজ হবে না। এ পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দলিল পেশ করেছেন এর জবাব হলো–[১] ইমাম তিরমিযী ঐ হাদীসের সনদকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন যে, ঐ হাদীস সহীহ নয়। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মন্তব্যের পর উক্ত হাদীস কিভাবে দলিলের উপযুক্ত হতে পারে? [২] যদি উক্ত হাদীসকে সহীহ মেনেও নেওয়া হয় তাহলেও বলা হবে যে, حَتّٰى تَاْكُلَهُ الصَّدَقَةُ-এর اَلصَّدَقَةُ দ্বারা اَلنَّفَقَةُ বা খরচাদি উদ্দেশ্য। অতএব হাদীসের মর্ম এই দাঁড়াবে যে, এতিমের অভিভাবকের জন্য উচিত এতিমের মাল ব্যবসায় খাটিয়ে বৃদ্ধি করা। অন্যথায় এতিমের দৈনন্দিন ব্যয় এবং যদি তার স্ত্রী থাকে তাহলে তার খোরপোষ তার সম্পূর্ণ সম্পদকে কয়েক বছরে খেয়ে শেষ করে দেবে। অতএব এ হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হতে পারে না। আমাদের আকলী (عَقْلِىْ) বা যুক্তিভিত্তিক দলিল হলো জাকাত একটি ইবাদত। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ الخ এ হাদীসে বর্ণিত জাকাত ব্যতীত শাহাদাতাইন (شَهَادَتَيْنِ) নামাজ, রোজা এবং হজ সর্বসম্মতিক্রমে ইবাদত। অতএব জাকাতও উক্ত হাদীসে উল্লেখ থাকার কারণে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আর যা ইবাদত হবে তা এখতিয়ার [স্ব-ইচ্ছায়] ব্যতীত আদায় হবে না। কেননা ইবাদত ইবতেলা (اِبْتِلَاءْ) বা পরীক্ষাকে বলা হয়। আর পরীক্ষার মর্ম এখতিয়ার ব্যতীত সাব্যস্ত হবে না। নাবালেগ এবং পাগলের যেহেতু বিবেচনা না থাকার কারণে এখতিয়ার নেই, তাই তাদের উপর জাকাত ফরজ হতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসের জবাব : জবাবের সারকথা হলো, জাকাতকে করের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা জাকাত কেবলমাত্রই ইবাদত (عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ) পক্ষান্তরে খেরাজ এবং ওশর হলো জমির কর। খেরাজের মধ্যে তো কেবলমাত্র জমির কর বা দায়-এর অর্থই পাওয়া যায়। ওশরের মধ্যে আর্থিক দায়-এর অর্থটি প্রবল। আর ইবাদত এর দিকটি হলো আনুষঙ্গিক। বলা বাহুল্য, যেদিকটি প্রবল সেটিরই প্রাধান্য হবে। আর যেটি আনুষঙ্গিক সেটি ধর্তব্য হবে না। কাজেই যেহেতু مَقِيْسٌ عَلَيْهِ [ওশর ও খেরাজ] এবং مَقِيْسٌ [জাকাত]-এর মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান বিদ্যমান অর্থাৎ

ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত আর مَقِيْس عَلَيْهِ [জাকাত ও খেরাজ] দায়-দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু ওশরের উপর কিভাবে কিয়াস করা জায়েজ হতে পারে? জায়েজ হবে না।

প্রশ্ন : مَؤُنَةٌ অর্থাৎ দায়দায়িত্ব বলতে কি বুঝায়? এবং খেরাজী ও ওশরী জমির مَؤُنَةٌ বা দায় কিভাবে হয়?

জবাব : কিফায়া (كِفَايَة) গ্রন্থের বক্তব্যের প্রতি লক্ষ করুন। গ্রন্থকার বলেছেন, দায় (مَؤُنَةٌ) এমন বস্তুকে বলা হয় যা কোনো জিনিস অক্ষুণ্ন থাকার কারণ হয়। অর্থাৎ بَقَاءُ شَيْءٍ-এর নাম হচ্ছে مَؤُنَةٌ। যেমন– স্ত্রীর খোরপোষ তার জীবন এবং বিবাহ অক্ষুণ্ন থাকার কারণ। অতএব খোরপোষকে স্ত্রীর জন্য (مَؤُنَةٌ) বলা হবে। উল্লেখ্য যে, খেরাজ এবং ওশর জমি মালিকের দখলে অক্ষুণ্ন থাকার কারণ। এজন্য ওশরের খাত তথা ব্যয়ের পাত্র হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠী। আর খেরাজ বা করের খাত হলো যোদ্ধা বা মুজাহিদগণ। যোদ্ধাগণ মাল দ্বারা সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করত হামলাকারী কাফিরদেরকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিহত করবে। দরিদ্র লোকেরা ওশরের মাল ভোগ করে কাফিরদের মোকাবিলায় মুসলমানদের বিজয় এবং সাহায্যের জন্য দোয়া করবে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– إِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِهِمْ "[মুসলমান!] তোমাদের সাহায্য করা হয় তোমাদের দুর্বল লোকদের কল্যাণে।" প্রকাশ থাকে যে, দুর্বল লোকের দ্বারা সাহায্য কেবলমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। যেমন আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে এ রেওয়ায়েত নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন– إِنَّمَا تَنْصُرُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ (الْحَدِيْثُ) "এই উম্মতের সাহায্য করা হয় তাদের দুর্বলদের দোয়ার বদৌলতে।" মোটকথা, মুসলিম বাহিনী কাফিরদেরকে মুসলমানদের রাজত্ব হতে বিতাড়িত করেছে এবং দরিদ্র লোকেরা দোয়ার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেছে। এতে বুঝা গেল যে– মুসলিম বাহিনী এবং গরিব মুসলমানগণ মুসলমানদের রাজত্ব এবং তাদের ভূমি অক্ষুণ্ন থাকার মূল কারণ।আর এতদুভয় সম্প্রদায়ের টিকে থাকার কারণ হচ্ছে ওশর ও খেরাজ। আর قَاعِدَةٌ আছে যে, سَبَبُ سَبَبِ الشَّيْءِ سَبَبُ هٰذَا الشَّيْءِ "কোনো বস্তুর কারণের কারণ ঐ বস্তুরও কারণ বলে গণ্য হয়ে থাকে।" তাই ওশর ও খেরাজ উভয়টিই জমির মালিকের দখলে জমি অক্ষুণ্ন থাকার কারণ বলে গণ্য হবে। আর যে বস্তু কোনো জিনিসের অক্ষুণ্ন থাকার কারণ হয় তাকেই مَؤُنَةٌ বা দায় বলা হয়। এজন্য খেরাজ এবং ওশরকে জমির আর্থিক দায় বলা হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, নিসাবের মালিক হওয়ার পর যদি পাগল ব্যক্তির বছরের কোনো অংশে জ্ঞান ফিরে আসে, চাই জ্ঞান বছরের প্রথমে ফিরে আসুক বা বছরের শেষে, অল্প সময়ের জন্য জ্ঞান ফিরে আসুক বা বেশি সময়ের জন্য, তাহলে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। এটি এরূপ যে, যদি পাগলের রমজানের কোনো অংশে রাতে বা দিনে জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে তার উপর পূর্ণ রমজানের রোজা ফরজ হবে। সারকথা হলো, জাকাতের জন্য এক বছর এবং রোজার জন্য এক মাস। পূর্ণ মাসের রোজা ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে রমজানের কোনো এক অংশে জ্ঞান ফিরে আসা পূর্ণ মাসে জ্ঞান বিদ্যমান থাকার নামান্তর। অনুরূপভাবে জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে বছরের কোনো এক সময় জ্ঞান ফিরে আসা পুরা বছর জ্ঞান বিদ্যমান থাকার নামান্তর। আর পূর্ণ বছর পাগলামি হতে জ্ঞান ফেরার ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হয়। অতএব বছরের কোনো এক অংশে জ্ঞান ফিরে আসার সুরতেও জাকাত ফরজ হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বছরের অধিকাংশ সময়ের ইতিবার (اِعْتِبَار) করেছেন। অতএব যদি বছরের অধিকাংশ সময়ে কেউ পাগল থাকে তাহলে তাকে পূর্ণ বছর পাগল বলে গণ্য করা হবে। আর যদি বছরের অধিকাংশ সময় জ্ঞানসম্পন্ন অবস্থায় থাকে তাহলে পূর্ণ বছর তাকে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গণ্য করা হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– পূর্বের হুকুমের মধ্যে জুনূনে আসলী (جُنُوْن اَصْلِيْ) এবং জুনূনে আরজী (جُنُوْن عَرْضِيْ) -এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, যদি বছরের কোনো এক সময় পাগল জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। চাই সে জুনূনে আসলীতে আক্রান্ত হোক বা জুনূনে আরজীতে আক্রান্ত হোক।

জুনূনে আসলী : যে পাগল অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে তার এ جُنُوْن-কে جُنُوْن اَصْلِيْ বলা হবে।

জুনূনে আরজী : যে প্রাপ্ত বয়স্কের পর পাগল হয়েছে, তার এ جُنُوْن-কে جُنُوْن عَرْضِيْ বলা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো– জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে বছর পূর্ণ হলে তার উপর জাকাত ফরজ হবে। যেমন– নাবালেগ ধনী শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে বছর পূর্ণ হলে তার উপর জাকাত ফরজ হয়ে থাকে।

দলিল : যেহেতু সে পাগল অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, তাই জ্ঞানসম্পন্ন না হওয়ার কারণে সে শরিয়তের আহকামের মুকাল্লাফ তথা শরিয়তের বিধান তার উপর অর্পিত হবে না। তবে যখন তার জ্ঞান ফিরে আসবে তখন হতে সে শরিয়তের আহকামের মুকাল্লাফ হবে। সুতরাং ঐ সময় হতে হিসেব করে যখন বছর পূর্ণ হবে তখন তার উপর জাকাত ফরজ হবে।

وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكٰوةٌ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِوُجُوْدِ الْمُنَافِيْ وَهُوَ الرِّقُّ وَلِهٰذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِ اَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِمَالِهِ فَلَا زَكٰوةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجِبُ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ تَامٍّ وَلَنَا اَنَّهُ مَشْغُوْلٌ بِحَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ فَاعْتُبِرَ مَعْدُوْمًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَطْشِ وَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمِهْنَةِ ـ

অনুবাদ : মুকাতাব গোলামের উপর জাকাত ফরজ নয়। কেননা সে পূর্ণভাবে মালের মালিক নয়। কারণ তার মধ্যে মালিকানা পরিপন্থি দাসত্ব বিদ্যমান আছে। এ কারণেই সে আপন গোলামকে আজাদ করার অধিকারী হয় না। যার উপর এমন ঋণ রয়েছে যা তার পূর্ণ সম্পদকে বেষ্টন করে নেয় তাহলে তার উপর জাকাত ফরজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। যেহেতু জাকাতের সবব বা কারণ বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো পূর্ণ নিসাবের মালিক হওয়া। আমাদের দলিল এই যে, তার মাল তার মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। সুতরাং তার মালকে অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে। যেমন– পিপাসা নিবৃত্তির জন্য রক্ষিত পানি এবং ব্যবহারিক ও কর্তব্য সম্পাদনের কাপড়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুকাতাব গোলামের উপর জাকাত ফরজ নয়। যদিও তার নিকট নিসাব পরিমাণ মাল বিদ্যমান থাকে।

দলিল : মুকাতাব সম্পূর্ণভাবে স্বীয় মালের মালিক নয়। তার কারণ হলো, মালিকানা পরিপন্থি দাসত্ব তার মাঝে বিদ্যমান। এ জন্যই যদি নিজের কোনো গোলাম আজাদ করতে চায় তাহলে আজাদ করতে পারবে না। কেননা, গোলাম আজাদ করার জন্য শর্ত হলো ঐ গোলামের পূর্ণ মালিক হওয়া। সুতরাং মুকাতাবের মালের উপর পূর্ণ মালিকানা না থাকার কারণে তাতে জাকাত ফরজ হবে না। কেননা জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য পূর্ণ মালিকানার সাথে নিসাবের মালিক হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন : মুকাতাব পূর্ণভাবে মালের মালিক নয় কেন?

উত্তর : মালিকানা দু'প্রকার– [১] মিলকে রাকাবা (مِلْكُ رَقَبَةٍ) বা মূল বস্তুর স্বত্বাধিকারী হওয়া, [২] মিলকে ইয়াদ (مِلْكُ يَدٍ) তসরুফ তথা ব্যবহারের মালিক হওয়া। মোটকথা, মুকাতাবের নিজ মাল ব্যবহার করার এখতিয়ার আছে বটে, কিন্তু তার মূল বস্তুর স্বত্বাধিকার তথা মালিকানা নেই; বরং স্বত্বাধিকার তার মনিবের। সুতরাং যদি ঐ মুকাতাব বদলে কিতাবত (بَدْلِ كِتَابَةٍ) বা দাসমুক্তিপণ না দিতে পারে তাহলে মুকাতাবের সমস্ত মাল মনিবের হয়ে যাবে। সারকথা, মুকাতিব মালিকানার একটি সুরত। অর্থাৎ ব্যবহারের অধিকারপ্রাপ্ত তো হয় বটে কিন্তু দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ স্বত্বাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য যে, একটি সুরতের দ্বারা অসম্পূর্ণ মালিকানা অর্জন হয়, পূর্ণ মালিকানা অর্জন হয় না। অথচ উভয়ের সমন্বয়ে পূর্ণ মালিকানা অর্জন হয়।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তির এই পরিমাণ ঋণ থাকে যা তার পূর্ণ মালকে বেষ্টন করে নেয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি দুই হাজার টাকার মালিক, কিন্তু তার সমপরিমাণ ঋণ আছে এবং ঐ ঋণ তলবকারী কোনো বান্দাও আছে, চাই সে আল্লাহর জন্য তলব করুক। যেমন– জাকাত, অথবা বান্দার জন্য তলব করুক। যেমন– কর্জ, মালের মূল্য, নষ্ট করা বস্তুর জরিমানা,

জখমের ক্ষতিপূরণ, স্ত্রীর দেনমহর ইত্যাদি। এ ঋণ মুদ্রা হোক বা পরিমাপকৃত কিংবা ওজনকৃত জিনিস হোক, নগদ কর্জ হোক না দীর্ঘ মেয়াদী কর্জ হোক। এহেন ঋণী ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপরও জাকাত ফরজ হবে। তার দলিল হলো, জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ হলো, বর্ধিষ্ণু মালের মালিক হওয়া। আর এই কারণ এখানে বিদ্যমান। কেননা কর্জের সম্পর্ক হলো দায়িত্বের সঙ্গে, মালের সঙ্গে নয়। এ কারণে ঋণী ব্যক্তির তসরুফ তার মালে কার্যকর হয়। যাতে তসরুফ করেছে তাতে কোনো বিনিময় অর্জন হোক বা না হোক। প্রথমটির উদাহরণ বেচাকেনা। আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হেবা, দান ইত্যাদি।

সারকথা, জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকার কারণে তার উপর জাকাত ফরজ হবে। আমাদের দলিল হলো, ঋণী ব্যক্তির মাল তার মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। আর তা হলো কর্জ আদায় করা। কেননা কর্জ দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতেই ক্ষতিকর। দুনিয়ায় এভাবে ক্ষতিকর যে, এতে ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তিকে পেরেশান করে এবং তাকে বন্দীও করতে পারে। আর পরকালে এভাবে ক্ষতিকর যে, কর্জটি ঋণী ব্যক্তি এবং জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে। বস্তুত ঋণ অনেক বড় ধরনের দায়। ঋণী ব্যক্তির পূর্ণ মাল তার প্রয়োজনে দায়বদ্ধ, বিধায় ঋণী ব্যক্তির এই মাল অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে। মনে করা হবে যে, তার নিকট কোনো মালই বিদ্যমান নেই। অতএব তার নিকট মাল না থাকার কারণে তার উপর জাকাত ফরজ হবে না। এর উদাহরণ এরূপ যে, কোনো ব্যক্তির নিকট অল্প পানি বিদ্যমান আছে এবং দূরবর্তী এলাকায়ও পানি নেই। এমতাবস্থায় তার অজু করার প্রয়োজন দেখা দিল। এ জাতীয় ক্ষেত্রে অবস্থা যদি এমন হয় যে, যদি সে এ পানি দিয়ে অজু করে তাহলে সে পিপাসার্ত থাকবে। আর যদি পান করার জন্য রাখে তাহলে অজু হবে না। এ ক্ষেত্রে হুকুম হলো, তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বে। কেননা এ পানি পিপাসা নিবৃত্তির জন্য রক্ষিত। এ ক্ষেত্রে মনে করা হবে, তার কাছে পানি নেই। আর পানি না থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করার হুকুম আছে। মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا (الاية). "অতঃপর তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে তোমরা তায়াম্মুম করবে"।

আর দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় কাপড় এবং কর্তব্য সম্পাদনের কাপড় এগুলো জাকাতের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থেকেও না থাকার নজরে।

وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكَّى الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا بِالْفَرَاغَةِ عَنِ الْحَاجَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتَّى لَا يَمْنَعَ دَيْنُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَدَيْنُ الزَّكٰوةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِّصَابِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِصُ بِهِ النِّصَابُ وَكَذَا بَعْدَ الْاِسْتِهْلَاكِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) فِيهِمَا وَلِأَبِيْ يُوْسُفَ فِي الثَّانِيْ عَلٰى مَا رُوِيَ عَنْهُ لِأَنَّ لَهُ مُطَالِبًا وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَّوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِيْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّ الْمُلَّاكَ نُوَّابُهُ ـ

অনুবাদ : যদি তার সম্পদ ঋণ থেকে অধিক হয় তবে উদ্বৃত্ত অংশ নিসাব পরিমাণ হলে তার জাকাত দেবে। কেননা তা প্রয়োজন থেকে মুক্ত। আর ঋণ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ঋণ, মানুষের পক্ষ হতে যার ত্বরিৎ চাহিদাকারী রয়েছে। সুতরাং মান্নত ও কাফ্ফারার ঋণ জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। আর জাকাতের ঋণ নিসাব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জাকাতকে বাধা দেয়। কেননা ঐ ঋণের কারণে নিসাব কমে যাবে। তদ্রূপ মাল নষ্ট করার পরও ঐ একই হুকুম। উভয় ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.) -এর ভিন্নমত রয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভিন্নমত আছে। আমাদের দলিল হলো, [মানুষের পক্ষ হতে] এই মালের তাগাদাকারী আছে। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে তাগাদাকারী হলেন শাসনকর্তা, পক্ষান্তরে ব্যবসা দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাগাদাকারী হলেন শাসনকর্তার নায়েব। কেননা মালিকগণ তার পক্ষে নায়েব বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ঋণী ব্যক্তির নিকট ঋণের থেকেও অধিক পরিমাণ মাল থাকে, তাহলে এ অতিরিক্ত মালের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো ঐ অতিরিক্ত মাল নিসাব পরিমাণ হতে হবে এবং তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হতে হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ঋণের দ্বারা এমন ঋণ উদ্দেশ্য যে ঋণের ব্যাপারে বান্দাদের পক্ষ হতে তাগাদাকারী আছে। যদিও আল্লাহর জন্য তাগাদা করে, তবুও এ ঋণ জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। পক্ষান্তরে যদি বান্দাদের পক্ষ হতে কোনো তাগাদাকারী না থাকে তাহলে এরূপ কর্জ থাকা জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যেমন মান্নত-এর ঋণ এবং কাফফারা-এর ঋণ। তার সুরত হলো– কোনো এক ব্যক্তির নিকট দুশত রৌপ্য মুদ্রা আছে এবং সে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহাম দান করার জন্য মান্নত করেছে, অথবা তার উপর কসমের কাফ্ফারা আছে, কিন্তু সে মান্নত বা কাফ্ফারা আদায় করেন নি। তাহলে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার উপর দু'শত দিরহামের জাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা মান্নত এবং কাফ্ফারা সে নিজে আদায় করে। রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধি তা আদায় করবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জাকাতের নিসাব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জাকাতের ঋণ অর্থাৎ বকেয়া জাকাতের ঋণ বাকি থাকলে তা জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। কেননা বকেয়া জাকাত আদায় করার দ্বারা তো জাকাতের নিসাব কমে যাবে। এর উদাহরণ এরূপ যে, এক ব্যক্তি দু'শত দিরহামের মালিক হয়েছে। তার উপর এক বছর অতিবাহিতও হয়েছে, কিন্তু সে জাকাত আদায় করেনি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বছরও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় দ্বিতীয় বছরের জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রথম বছরের জাকাত ফরজ হওয়াটা দ্বিতীয় বছর জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। এজন্য যে, প্রথম বছরের জাকাত পাঁচ দিরহাম বাদ দিলে জাকাতের নিসাব আর বিদ্যমান থাকে না। আর নিসাব পূর্ণ না থাকলে জাকাতও ফরজ হবে না।

পূর্ণ মাল নষ্ট হলেও এরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট দু'শত দিরহাম ছিল এবং এর উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর জাকাত আদায় করার পূর্বে সে পূর্ণ নিসাব জাকাতসহ ধ্বংস করে দিয়েছে। তার পর পুনরায় সে দু'শত দিরহামের মালিক হয়েছে এবং এর উপরও পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তীতে অর্জিত দু'শত দিরহামের জাকাত দিতে হবে না। কেননা প্রথম বছরের নিসাবের জাকাত তার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে বিদ্যমান আছে। আর জাকাতের ঋণ বা বকেয়া জাকাতও জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। এ ব্যাখ্যাটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর। ইমাম যুফার (র.) উক্ত সুরতে ভিন্নমত পোষণ করেন। অর্থাৎ ঐ নিসাবেও জাকাত ফরজ হবে যে নিসাবে জাকাত ফরজ হওয়ার পর সে জাকাত আদায় করেনি– এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং ঐ নিসাবেও জাকাত ফরজ হবে যে নিসাবে জাকাত ফরজ হওয়ার পর পূর্ণ মাল সে ধ্বংস করে দিয়েছে। অতঃপর পুনরায় সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়েছে এবং এর উপরও পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, উভয় অবস্থায় অতিক্রান্ত জাকাতের বকেয়া ঋণ জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, জাকাতের ঋণ এমন কর্জ যার তাগাদাকারী বান্দার পক্ষ হতে কেউ নেই। অতএব, এটিও মান্নত-এর ঋণ এবং কাফ্ফারা-এর ঋণের ন্যায় হলো, যে ঋণের তাগাদা বান্দার পক্ষ হতে নেই। অবশ্য এ জাতীয় ঋণ জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং জাকাতের ঋণ বা বকেয়া জাকাত এবং ধ্বংসকৃত ঋণ অর্থাৎ মালের জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিতীয় সুরতে আমাদের বিপরীত মত পোষণ করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে প্রথম বছরের জাকাতের ঋণ দ্বিতীয় বছরে জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। তবে যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিসাব হালাক করে দেয়। অতঃপর সে পুনরায় দু'শত দিরহামের মালিক হয় এবং এর উপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে হালাক করা মালের জাকাতের ঋণ দ্বিতীয় বছর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, বছর পূর্ণ হওয়ার পর পূর্ণ মাল হালাক করলে বান্দার পক্ষ হতে কেউ জাকাতের তাগাদাকারী নেই। পক্ষান্তরে প্রথম সুরতে অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ মাল বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বছর পূর্ণ হওয়ার পরও জাকাত দিল না। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বছরও পূর্ণ হলো। তাহলে ওশর এবং জাকাত আদায়কারী তার জাকাতের তাগাদা দিতে পারবে– সুতরাং বকেয়া ঋণ পরবর্তী বছরে জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। পক্ষান্তরে মাল হালাক করার সুরতে বান্দার পক্ষ হতে জাকাতের ঋণের কোনো তাগাদাকারী নেই। তাই এই ঋণ পরবর্তী বছরে জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক হবে না। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, জাকাতের ঋণের তাগাদাকারী বান্দা বিদ্যমান আছে। তবে সে বান্দা হচ্ছে পশুর জাকাতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধান এবং অন্যান্য ব্যবসার মালের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বিচরণকারী পশুর জাকাত আদায় করার জন্যে রাষ্ট্রপ্রধানের কোনো প্রতিনিধি আসে না এবং অন্যান্য ব্যবসার মালের জাকাত আদায় করার জন্যও কোনো প্রতিনিধি আসে না। এর জবাবে বলা হবে, রাষ্ট্রপ্রধানতো মালের মালিকদের অনুমতি দিয়েই দিয়েছেন। অতএব বলা হবে যে, মালের মালিকই রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি। তা এভাবে যে, মালিক জাকাতের মাল পৃথক করার সময় জাকাতদাতা। আর এ জাকাত গরিবদেরকে প্রদান করার সময় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি। এর দলিল এবং ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী– خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "তাদের মাল হতে জাকাত গ্রহণ করুন"। এ আয়াত দ্বারা রাষ্ট্রপতির জন্য যে কোনো মাল থেকে জাকাত গ্রহণ করার অধিকার সাব্যস্ত হয়। এ কারণে রাসূল ﷺ এবং তার পরবর্তীতে খলিফা হযরত আবূ বকর এবং ওমর (রা.) পশু, টাকা-পয়সা এবং ব্যবসার মালের জাকাত গ্রহণ করত তা যথার্থ খাতে ব্যয় করেছেন। তবে হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফতকাল আরম্ভ হলে তিনি দেখলেন যে, জাকাতের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে এবং এ আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে যে, রাজা-বাদশাহগণ মানুষের মালের প্রতি লোভের হস্ত প্রসারিত করতে পারে। এ জন্য তিনি মালের মালিককে খলিফাতুল মুসলিমীনের প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন, যেন তারা নিজের মালের জাকাত নিজেই আদায় করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মালের মালিক গরিবদেরকে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে খলিফাতুল মুসলিমীনের প্রতিনিধি

وَلَيْسَ فِيْ دُوْرِ السُّكْنٰى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَاَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوْبِ وَعَبِيْدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ زَكٰوةٌ لِاَنَّهَا مَشْغُوْلَةٌ بِالْحَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ اَيْضًا وَعَلٰى هٰذَا كُتُبُ الْعِلْمِ لِاَهْلِهَا وَاٰلَاتُ الْمُحْتَرِفِيْنَ لِمَا قُلْنَا ـ

অনুবাদ : বসবাসের ঘরে, ব্যবহারের কাপড়-চোপড়ে, ঘরের আসবাব পত্রে, সওয়ারির পশুর ক্ষেত্রে, খিদমতের গোলামদের ক্ষেত্রে এবং ব্যবহারের অস্ত্রাদির ক্ষেত্রে কোনো জাকাত নেই। কেননা এগুলো মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা ছাড়া এগুলো বর্ধিষ্ণু মালও নয়। আলিমদের ইলম চর্চায় ব্যবহৃত কিতাবাদি এবং পেশাদার লোকদের উপকরণাদি সম্পর্কেও এই একই হুকুম। এ কারণে, যা আমরা [এই মাত্র] বলেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মতনে উল্লিখিত জিনিসসমূহে জাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা এসব জিনিস তার মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত। মৌলিক প্রয়োজন (اَصْلِيْ حَاجَتْ) এমন জিনিসকে বলা হয় যার দ্বারা মানুষ ধ্বংস এবং কষ্ট হতে রক্ষা পায়। চাই তা حَقِيْقَةً [প্রকৃত ও বাহ্যিকভাবে] হোক বা বাতেনীভাবে হোক এবং এসব জিনিস বর্ধনশীলও নয়। সারকথা, মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়া এবং বর্ধিষ্ণু না হওয়া উভয়টি জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। এখানে উক্ত বস্তুগুলোতে উভয় প্রকারের প্রতিবন্ধক বিদ্যমান, তাই জাকাত ফরজ হবে না। উক্ত বস্তুগুলো যে মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা ব্যাখ্যা করে তার অপেক্ষা রাখে না। আর ঐ বস্তুগুলো বর্ধনশীলও নয়। কেননা কোনো কোনো বস্তু জন্মগতভাবে বর্ধনশীল। যেমন– স্বর্ণ এবং রৌপা, অথবা ব্যবসার মাধ্যমে বর্ধনশীল। যেমন– ব্যবসার মাল। এখানে কোনো প্রকারের বর্ধনশীলতাই বিদ্যমান নেই। এ জন্যই আমি বলেছি যে, এগুলো বর্ধনশীল মাল নয়। অনুরূপভাবে আলিমদের ইলম চর্চার কিতাবাদিতেও জাকাত ফরজ নয়। উক্ত ইবারতে আহলে ইলম (اَهْلِ عِلْم) শর্তটি اِتِّفَاقِيْ [কাকতালীয়]। কেননা যদি কোনো মূর্খ ব্যক্তির নিকট কোনো কিতাবাদি থাকে এবং তা ব্যবসার জন্য না হয় তাহলে এতেও জাকাত ফরজ হবে না। অনুরূপ হুকুম পেশাদার লোকদের উপকরণাদির ক্ষেত্রেও; যেমন– মিষ্টি ব্যবসায়ীদের হাড়ি-পাতিল, মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতেও জাকাত ফরজ হবে না। কেউ কেউ বলেছেন– পেশার উপকরণের মধ্য হতে যে জিনিসের প্রভাব তৈরিকৃত বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যেমন–সাবান এবং উশনান [এক প্রকার ঘাস বিশেষ, যার দ্বারা সাবানের মতো কাপড় ধোয়া যায়] কোনো ধুপি ক্রয় করল। অনুরূপভাবে রুটি তৈরিকারী ব্যক্তি লবণ এবং লাকড়ি ক্রয় করল, তাহলে এগুলোর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি তৈরিকৃত জিনিসের মধ্যে প্রভাব বাকি থাকে যেমন– রংকারী কোনো ব্যক্তি জাফরান এবং অন্যান্য রং ক্রয় করল। উদ্দেশ্য টাকার বিনিময়ে মানুষের কাপড় রং করবে এবং এর উপর বছরও অতিবাহিত হলো, তাহলে এসব জিনিসের উপর জাকাত ফরজ হবে। তবে শর্ত হলো, এ মাল নিসাব পরিমাণ হতে হবে।

وَمَنْ لَهُ عَلٰى اٰخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِيْنَ ثُمَّ قَامَتْ بِهٖ بَيِّنَةٌ لَمْ يُزَكِّهٖ لِمَا مَضٰى مَعْنَاهُ صَارَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِاَنْ اَقَرَّ عِنْدَ النَّاسِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَالِ الضِّمَارِ وَفِيْهِ خِلَافُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) وَمِنْ جُمْلَتِهِ الْمَالُ الْمَفْقُوْدُ وَالْاٰبِقُ وَالضَّالُّ وَالْمَغْصُوْبُ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَالْمَالُ السَّاقِطُ فِى الْبَحْرِ وَالْمَدْفُوْنُ فِى الْمَفَازَةِ اِذَا نَسِيَ مَكَانَهُ وَالَّذِيْ اَخَذَهُ السُّلْطَانُ مُصَادَرَةً وَوُجُوْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِسَبَبِ الْاٰبِقِ وَالضَّالِّ وَالْمَغْصُوْبِ عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ لَهُمَا اَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَفَوَاتُ الْيَدِ غَيْرُ مُخِلٍّ بِالْوُجُوْبِ كَمَالِ ابْنِ السَّبِيْلِ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ (رضـ) لَا زَكٰوةَ فِىْ مَالِ الضِّمَارِ وَلِاَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِيْ وَلَا نَمَاءَ اِلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ وَابْنُ السَّبِيْلِ يَقْدِرُ بِنَائِبِهٖ وَالْمَدْفُوْنُ فِى الْبَيْتِ نِصَابٌ لِتَيْسِيْرِ الْوُصُوْلِ اِلَيْهِ وَفِى الْمَدْفُوْنِ فِى الْاَرْضِ اَوِ الْكَرْمِ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلٰى مُقِرٍّ مَلِيْئٍ اَوْ مُعْسِرٍ تَجِبُ الزَّكٰوةُ لِاِمْكَانِ الْوُصُوْلِ اِلَيْهِ اِبْتِدَاءً اَوْ بِوَاسِطَةِ التَّحْصِيْلِ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلٰى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ اَوْ عَلِمَ بِهِ الْقَاضِيْ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ عَلٰى مُقِرٍّ مُفْلِسٍ فَهُوَ نِصَابٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ تَفْلِيْسَ الْقَاضِيْ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجِبُ لِتَحَقُّقِ الْاِفْلَاسِ عِنْدَهُ بِالتَّفْلِيْسِ وَاَبُوْ يُوْسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِىْ تَحَقُّقِ الْاِفْلَاسِ وَمَعَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِىْ حُكْمِ الزَّكٰوةِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْفُقَرَاءِ ـ

অনুবাদ : যার অন্য কারো উপর ঋণ রয়েছে, কিন্তু সে কয়েক বছর ধরে তা অস্বীকার করে আসছে, অতঃপর ঋণ সংক্রান্ত প্রমাণ তার হাতে এসে গেল, তাহলে তাকে উক্ত মালের বিগত বছরগুলোর জাকাত দিতে হবে না। এর অর্থ এই যে, ঋণগ্রহীতা মানুষের নিকট স্বীকারোক্তি করার কারণে তার পক্ষ হতে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এটা মালে যিমার (مَالْ ضِمَارْ)-এর মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। হারিয়ে যাওয়া মাল, পলাতক বা পথহারা গোলাম, ছিনিয়ে নেওয়া মাল যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, সমুদ্রে অর্থাৎ অথৈ পানিতে পড়ে যাওয়া মাল, খোলা মাঠে পুঁতে রাখা মাল, যার স্থান এখন মনে নেই এবং শাসক যে মাল বাজেয়াপ্ত করেছে, এ সবই মালে যিমার-এর অন্তর্ভুক্ত। পলাতক, পথহারা এবং ছিনিয়ে নেওয়া গোলামের পক্ষ হতে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে কিনা, এ ব্যাপারেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। ইমাম যুফার এবং ইমাম শাফেয়ী

(র.)-এর দলিল হলো, এসব জিনিসের মধ্যে [জাকাত ওয়াজিব হওয়ার] কারণ বিদ্যমান। আর হস্তচ্যুত হওয়া জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যেমন– মুসাফিরের [বাড়িতে রক্ষিত] মাল। আমাদের দলিল হলো, হযরত আলী (রা.)-এর বাণী– لَا زَكٰوةَ فِىْ مَالِ الضِّمَارِ "মালে যিমার-এর উপর জাকাত নেই।" তা ছাড়া জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো মাল বর্ধনশীল হওয়া। আর হস্তক্ষেপ ও পরিচালনার সক্ষমতা ছাড়া বর্ধন সম্ভব নয়। আর উপস্থিত ক্ষেত্রে তার সক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে মুসাফির তার স্থলবর্তীর দ্বারা পরিচালনা করতে সক্ষম। [সুতরাং এর উপর সেগুলোকে কিয়াস করা ঠিক নয়]। ঘরে পুঁতে রাখা মাল নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে। কেননা তা হস্তগত করা সহজ। আর জমিতে বা বাগানে পুঁতে রাখা মাল সম্পর্কে [যদি স্থান ভুলে যায়] তবে মাশায়েখদের মতভেদ রয়েছে। ঋণের কথা স্বীকার করে এমন কোনো লোকের নিকট যদি ঋণ থাকে, তবে সে সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল, এ মালের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা [সচ্ছলের ক্ষেত্রে] সরাসরি কিংবা [অসচ্ছলের ক্ষেত্রে উপার্জনের পর] উক্ত ঋণ উদ্ধার করা সম্ভব। তদ্রূপ [জাকাত ওয়াজিব হবে] যদি ঋণ এমন অস্বীকারকারী ব্যক্তির নিকট থাকে, যে ঋণের অনুকূলে প্রমাণ রয়েছে; কিংবা কাজী সে বিষয়ে অবগত আছেন। এর কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ঋণ যদি এমন ব্যক্তির নিকট থাকে, যাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু সে ঋণের কথা স্বীকার করে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত মাল নিসাবরূপে গণ্য হবে। কেননা তাঁর মতে বিচারকের পক্ষ থেকে দেউলিয়া ঘোষণা সহীহ হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ দেউলিয়া ঘোষণা করার দ্বারা তার মতে দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে একমত। পক্ষান্তরে গরিব লোকদের প্রতি সুবিবেচনার লক্ষ্যে জাকাতের হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে একমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ পর্যন্ত আলোচনা ছিল, যাদের উপর জাকাত ওয়াজিব হয় এবং যাদের উপর ওয়াজিব হয় না তাদের সম্পর্কে। এখন এমন মালের আলোচনা করা হচ্ছে, যার উপর জাকাত ফরজ হয় না। একে মালে যিমার (مَالْ ضِمَارْ) বলে।

যিমার (ضِمَارْ) মূলত ইযমার (اِضْمَارْ) ছিল। অর্থ–গোপন করা, গায়েব করা। যেমন বলা হয়– اَضْمَرَ فِىْ قَلْبِهٖ "সে অন্তরে গোপন করে রেখেছে।" আর ফকীহগণের পরিভাষায় এমন মাল যা গায়েব ও হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং যা ফিরে পাওয়ার আশা নেই। পক্ষান্তরে যদি ফিরে পাওয়ার আশা থাকে তবে সেটা মালে যিমার নয়। কারো কারো মতে, মালে যিমার বলা হয় যে মালের অস্তিত্ব এবং মালিকানা বিদ্যমান আছে, তবে মালিক তা থেকে ফায়দা অর্জন করতে সক্ষম নয়। কেননা মালে যিমার-এর মালিকের মালিকানা থাকে, তবে কবজা বা দখল থাকে না।

গ্রন্থকার (র.) মালে যিমার-এর বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।– [১] এক ব্যক্তির অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে কিছু পাওনা আছে। ঋণী ব্যক্তি কয়েক বছর ধরে তা অস্বীকার করে আসছে। আর পাওনাদার ব্যক্তির ঐ বছরগুলোতে সাক্ষী ছিল না। কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সে সাক্ষী পেয়েছে। তা এভাবে যে, ঋণী ব্যক্তি মানুষের সম্মুখে ঋণের কথা স্বীকার করল, তখন এসব লোক পাওনাদারের পক্ষে এই স্বীকারোক্তির সাক্ষী হলো। অর্থাৎ এই লোকগুলো এ ব্যাপারে সাক্ষী হলো যে, ঋণী ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে ঋণের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে। এই সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তা মালে যিমার ছিল। তবে এই সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা আর মালে যিমার হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা সাক্ষী বিদ্যমান না থাকার কারণে ঐ মাল আদায় হওয়ার আশা ছিল না। আর এখন সাক্ষী হস্তগত হওয়ার কারণে আদালতের মাধ্যমে ঐ ঋণ আদায় হওয়ার আশা সৃষ্টি

হয়েছে, [২] হারিয়ে যাওয়া মাল, [৩] পলাতক বা পথহারা গোলাম, [৪] পথহারা পশু ও গোলাম, [৫] যে মাল ছিনিয়ে নিয়েছে এবং মালিকের নিকট ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী নেই, [৬] যে মাল সমুদ্রে পড়ে গিয়েছে, [৭] যে মাল মাঠে পুঁতে রেখেছে এবং তার স্থান ভুলে গিয়েছে, [৮] যে মাল বাদশাহ মালিকের নিকট হতে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, মালে যিমার কয়েক বছর যাবত মালিকের হাতছাড়া ছিল এবং ফিরে পাওয়ার আশা ছিল না। অতঃপর কয়েক বছর পর ঐ মাল হস্তগত হয়েছে। এ জাতীয় মালের ক্ষেত্রে ঐ বিগত বছরগুলোর জাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর : এ ব্যাপারে হানাফী ইমামগণের মত হলো, বিগত বছরগুলোর জাকাত ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মত হলো, বিগত বছরগুলোর জাকাত ফরজ হবে। পলাতক, পথহারা ও ছিনিয়ে নেওয়া গোলামের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও অনুরূপ মতভেদ আছে। অর্থাৎ আমাদের মতে মনিবের উপর তাদের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাদের পক্ষ হতে মুনিবের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার এবং শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মালে যিমার -এ জাকাত ফরজ হওয়ার সবব বা কারণ বিদ্যমান আছে। আর তা হচ্ছে বর্ধন গুণসম্পন্ন নিসাবের মালিক হওয়া। যেহেতু মালে যিমার-এ জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান তাই তাতে জাকাত ফরজ হবে। তবে মালে যিমারে মালিকের দখল বিদ্যমান নেই। আর এটা জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। যেমন– মুসাফিরের মাল সফর অবস্থায় তার হস্তগত নয়। অথচ সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় এবং জাকাতও ওয়াজিব হয়।

আমাদের দলিল হযরত আলী (র.)-এর বাণী–لَا زَكٰوةَ فِيْ مَالِ الضِّمَارِ এ মর্মই হযরত হাসান বসরী (র.) হতে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে–

إِذَا حَضَرَ الْوَقْتُ الَّذِيْ يُؤَدِّيْ فِيْهِ الرَّجُلُ زَكٰوتَهٗ اَدّٰى عَنْ كُلِّ مَالٍ وَعَنْ كُلِّ دَيْنٍ اِلَّا مَاكَانَ ضِمَارًا لَا يَرْجُوْهُ.

অর্থ–যখন জাকাত আদায় করার সময় আসবে তখন প্রত্যেক মালের এবং প্রত্যেক ঋণের জাকাত আদায় করবে। তবে এমন মালে যিমার যা ফিরে পাবার আশা নেই। [এর জাকাত আদায় করতে হবে না।]

উপরিউক্ত বাণীদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মালে যিমার-এর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্য 'মালে যিমার -এর জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ পাওয়া গিয়েছে,' আমরা তা স্বীকার করি না। কেননা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ শুধু মালের মালিক হওয়া নয়; বরং বর্ধন গুণসম্পন্ন মালের মালিক হওয়া শর্ত। আর মালে যিমার-এর মধ্যে এ গুণ বিদ্যমান নেই। কেননা বর্ধন গুণসম্পন্ন হওয়া ঐ সময় প্রমাণিত হবে যখন ঐ মাল ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। আর মালে যিমার ব্যবহার করতে সক্ষম নয় বিধায় বর্ধন গুণ সম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হলো না। অতএব এতে [মালে যিমারে] জাকাত ফরজ হবে না।

وَابْنُ السَّبِيْلِ يَقْدِرُ بِنَائِبِهٖ -এর দ্বারা ইমাম যুফার এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সারকথা হলো, মালে যিমারকে মুসাফিরের মালের উপর কিয়াস করা সঠিক নয়। কেননা মালে যিমার সে নিজেও ব্যবহার করতে সক্ষম নয় এবং প্রতিনিধির মাধ্যমেও ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে মুসাফির তার বাড়ির মালে যদিও নিজে তসরুফ বা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়, কিন্তু প্রতিনিধির দ্বারা তসরুফ করতে সক্ষম। এ কারণেই মুসাফির যদি বাড়িতে রক্ষিত তার মালের কিয়দংশ বিক্রি করে তাহলে তা জায়েজ আছে। কেননা মুসাফির স্বীয় প্রতিনিধির দ্বারা বিক্রিত বস্তু সোপর্দ করতে পারে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসাফিরের মাল বর্ধন গুণসম্পন্ন। পক্ষান্তরে মালে যিমার বর্ধন গুণসম্পন্ন নয়। এমতাবস্থায় ইমাম যুফার এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর চিন্তা করা উচিত যে, উভয়ের মাঝে এত বড় পার্থক্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কিয়াস করা কিভাবে বৈধ হবে?

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কোনো গৃহে যদি কোনো মাল পুঁতে রাখে এবং তা নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে এর উপর জাকাত ফরজ হবে। কেননা গৃহের পূর্ণ অংশই তার দখলে বিধায় ঐ মাল অর্জন করা তার জন্য সহজ। তাই তা মালে যিমার-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অতএব এতে জাকাত ফরজ হবে। আর যদি মাল জমিনে বা বাগানে পুঁতে রাখা হয় এবং এর স্থান ভুলে যায় এ ব্যাপারে মাশায়েখে কেরামের মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, জাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা পূর্ণ জমি খনন করে তা বের করা সম্ভব। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ মালে তসরুফ (تَصَرُّفْ) করার ক্ষমতা তার আছে। কাজেই ঐ মাল মালে যিমার -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, ঐ মালে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা পূর্ণ জমি খনন করা যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু তা অবশ্যই কঠিন ব্যাপার। আর শরিয়তে حَرَجْ তথা কষ্টকে যথা সম্ভব অবশ্যই বিদূরিত করার চেষ্টা করা হয়েছে- وَالْحَرَجُ مَرْفُوْعٌ فِى الشَّرِيْعَةِ। কাজেই এ মালে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি এমন ব্যক্তির নিকট টাকা পাওনা থাকে যে তা স্বীকার করে এবং ঋণী ব্যক্তি ধনী হোক বা গরিব হোক তাহলে ঐ ঋণের মালে জাকাত ফরজ হবে। কেননা এ ঋণ আদায় করা সম্ভব। ঋণী ব্যক্তি যদি ধনী হয় তাহলে প্রথমেই সরাসরি ঋণ আদায় করা সম্ভব। আর যদি গরিব হয় তাহলে আদালতের নির্দেশে বা পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে তার সঞ্চয় হতে আদায় করা সম্ভব। এরূপভাবে ঋণে মালিকের যদিও حَقِيْقَةً বা বাস্তবে সামর্থ্য নেই; কিন্তু حُكْمًا বা বাতেনীভাবে সামর্থ্য আছে। আর حُكْمًا বা বাতেনী সামর্থ্য থাকার কারণে একে মালে যিমার বলা হবে না।

আর যদি এমন ব্যক্তির নিকট ঋণ থাকে যে ঋণ অস্বীকার করে, কিন্তু পাওনাদারের নিকট সাক্ষী আছে অথবা বিচারক ব্যক্তিগতভাবে এ ঋণ সম্পর্কে অবগত তাহলে জাকাত ফরজ হবে। কারণ, এ ঋণ আদায় করা সম্ভব। কেননা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা মালের মালিকের পক্ষে বিচারক ফয়সালা দেবেন। অথবা বিচারক নিজেরই ইলম মোতাবেক তার পক্ষে ফয়সালা দেবেন। আর যদি ঋণী ব্যক্তি ঋণ স্বীকার করে, কিন্তু বিচারক তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এই ঋণের মালে জাকাত ফরজ হবে। কেননা বিচারক কর্তৃক তাকে দেউলিয়া ঘোষণা দেওয়া সঠিক হয়নি; কাজেই বিচারকের দেউলিয়া ঘোষণা দেওয়া না দেওয়া সমান। বলা বাহুল্য যে, দেউলিয়া ঘোষণা না দেওয়ার সুরতে তার উপর সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, তার দ্বারা উপার্জন করিয়ে তা উসুল করা সম্ভব। অনুরূপভাবে দেউলিয়া ঘোষণা দেওয়ার সুরতেও জাকাত ফরজ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, বিচারক দেউলিয়া ঘোষণা দিলে দেউলিয়া সাব্যস্ত হবে। এ ঋণ পাওনাদারের ক্ষেত্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত মালের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ঐ ঋণের মতো হবে যাকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত মাল এবং অস্বীকারকৃত ঋণের মধ্যে জাকাত ফরজ হয় না। অতএব বিচারক দেউলিয়া ঘোষণা করার পর ঋণী ব্যক্তির ঋণের মালে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে একমত। এ কারণে ঋণী ব্যক্তির ধনী হওয়া পর্যন্ত পাওনাদারের তাগাদা করার অধিকার স্থগিত (مَوْقُوْفٌ) থাকবে। কাজেই মালদার না হওয়া পর্যন্ত পাওনাদার ব্যক্তি তার কাছে পাওনা দাবি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত আছেন। অতএব যখন পাওনাদার ব্যক্তির এই ঋণ উসুল হবে, তখন ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পাওনাদার ব্যক্তির উপর বিগত বছরগুলোর জাকাত ফরজ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জাকাত ফরজ করার মধ্যে গরিব লোকদের প্রতি সুবিবেচনা অগ্রগণ্য।

وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً لِلتِّجَارَةِ وَنَوَاهَا لِلْخِدْمَةِ بَطَلَتْ عَنْهَا الزَّكٰوةُ لِاتِّصَالِ النِّيَّةِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ تَرْكُ التِّجَارَةِ وَإِنْ نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ حَتّٰى يَبِيْعَهَا فَيَكُوْنُ فِيْ ثَمَنِهَا زَكٰوةٌ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَّصِلْ بِالْعَمَلِ إِذْ هُوَ لَمْ يَتَّجِرْ فَلَمْ تُعْتَبَرْ وَلِهٰذَا يَصِيْرُ الْمُسَافِرُ مُقِيْمًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَلَا يَصِيْرُ الْمُقِيْمُ مُسَافِرًا بِالنِّيَّةِ إِلَّا بِالسَّفَرِ -

অনুবাদ : কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে দাসী ক্রয় করল। তারপর তাকে খিদমতে নিয়োজিত করার নিয়ত করল। তাহলে ঐ দাসী হতে জাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা নিয়ত কর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে। আর তা হলো ব্যবসা বর্জন করা। যদি পুনরায় ব্যবসার নিয়ত করে তবুও তাকে বিক্রি করার পূর্ব পর্যন্ত তা ব্যবসার জন্য বিবেচিত হবে না। সুতরাং [বিক্রির পরে] তার মূল্যের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা এখানে নিয়ত কর্মের সাথে যুক্ত হয়নি। কারণ সে তো [এখনো] ব্যবসা করেনি। সুতরাং নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণেই তো মুসাফির শুধু নিয়তের দ্বারাই মুকীম হয়ে যায়। কিন্তু মুকীম সফর ছাড়া শুধু নিয়তের দ্বারা মুসাফির হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি ব্যবসার নিয়তে কোনো দাসী ক্রয় করল। অতঃপর তাকে খিদমতে নিয়োজিত করার নিয়ত করল এবং একে ব্যবসা হতে আলাদা করার নিয়ত করল। তাহলে ঐ দাসীর উপর থেকে জাকাত রহিত হয়ে যাবে।

দলিল : যে কাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের অন্তর্ভুক্ত তা শুধু নিয়ত দ্বারা সাব্যস্ত হবে না; বরং এ ক্ষেত্রে নিয়ত কর্মের সাথে যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

আর যে জিনিস বর্জন সম্পর্কীয় তাতে শুধু নিয়তই যথেষ্ট। যেহেতু সে ব্যক্তি ব্যবসার নিয়তে দাসী ক্রয় করেছে। তারপর তাকে খিদমতে নিয়োজিত করার নিয়ত করেছে। অর্থাৎ ব্যবসা বর্জন করার নিয়ত করেছে। তাই শুধু নিয়তের দ্বারাই দাসী ব্যবসা হতে আলাদা হয়ে যাবে। আর ব্যবসা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে তার থেকে জাকাত রহিত হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, নিয়ত কর্মের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। আর তা হলো ব্যবসা বর্জন করা। আর ব্যবসা বর্জন করা কোনো কর্ম নয়; বরং এটি হলো কর্ম বর্জন। পক্ষান্তরে কেউ যদি ব্যবসার নিয়তে দাসী ক্রয় করে, তারপর তাকে খিদমতে নিয়োজিত করার নিয়ত করে অতঃপর ব্যবসার নিয়ত করে, তাহলে এ দাসী ব্যবসার পণ্য হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে বিক্রি করা হবে। যদি ঐ দাসীকে বিক্রি করা হয় তাহলে এর মূল্যের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা সে যে পর্যন্ত ঐ দাসীকে বিক্রি না করেছে সে পর্যন্ত নিয়ত ব্যবসার কর্মের সাথে যুক্ত হবে না। আর যে নিয়ত আমলের সাথে যুক্ত নয় তা ধর্তব্য হয় না। এজন্য শুধু নিয়ত করার দ্বারা দাসী ব্যবসার পণ্য হিসেবে গণ্য হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুসাফির শুধু নিয়তের দ্বারাই মুকীম বলে গণ্য হয়ে যায়। কেননা ইকামত বলা হয় সফর বর্জন করাকে। আর বর্জনের ক্ষেত্রে শুধু নিয়তই যথেষ্ট। তবে মুকীম ব্যক্তি শুধুমাত্র সফরের নিয়তের দ্বারা মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে না। যদি সফর শুরু করে তাহলে মুসাফির হবে। কেননা সফর অঙ্গের কর্ম (اَعْمَالُ جَوَارِحْ)। আর যে আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত হয় তা শুধু নিয়তের দ্বারা সাব্যস্ত হবে না; বরং নিয়তের সঙ্গে কর্মও যুক্ত হওয়া আবশ্যক। এজন্য সফর আরম্ভ করা ব্যতীত শুধু নিয়তের দ্বারা ব্যক্তি মুসাফির বলে গণ্য হবে না।

وَإِنِ اشْتَرٰى شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ كَانَ لِلتِّجَارَةِ لِاتِّصَالِ النِّيَّةِ بِالْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَرِثَ وَنَوٰى لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ مِنْهُ وَلَوْ مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ أَوِ النِّكَاحِ أَوِ الْخُلْعِ أَوِ الصُّلْحِ عَنِ الْقَوَدِ وَنَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ كَانَ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) لِاقْتِرَانِهَا بِالْعَمَلِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لَا يَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تُقَارِنْ عَمَلَ التِّجَارَةِ وَقِيْلَ الْاِخْتِلَافُ عَلٰى عَكْسِهِ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো জিনিস ক্রয় করে আর ব্যবসার নিয়ত করে, তবে সেটা ব্যবসার জন্যই গণ্য হবে। কেননা নিয়ত কর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং ব্যবসার নিয়ত করে, তাহলে ব্যবসার জন্য গণ্য হবে না। কেননা তার পক্ষ হতে কোনো কর্ম পাওয়া যায়নি। আর যদি হেবা, অসিয়ত, বিবাহ ও খোলার (خُلْع) মাধ্যমে অথবা কিসাসের পরিবর্তে সন্ধির মাধ্যমে বস্তুটির মালিক হয় এবং সেটাকে ব্যবসার জন্য নিয়ত করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা ব্যবসার জন্য গণ্য হবে। কেননা নিয়তটি কর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা ব্যবসার জন্য বলে গণ্য হবে না। কেননা নিয়তটি ব্যবসা কর্মের সাথে যুক্ত হয়নি। কারো কারো মতে মতভেদটি এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি ব্যবসার নিয়তে কোনো বস্তু ক্রয় করে, তাহলে সেটা ব্যবসার জন্য বলে গণ্য হবে। কেননা নিয়ত কর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ক্রয় করা ব্যবসার জন্যই হয়ে থাকে বলে ধর্তব্য হয়ে থাকে এ হিসেবে এটি ব্যবসার নিয়তের সাথে যুক্ত হয়েছে। আর যে নিয়ত কোনো জিনিসের ব্যবসার সাথে যুক্ত হবে ঐ জিনিস ব্যবসার হিসেবেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোনো বস্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় অতঃপর তা দ্বারা ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে ঐ মাল ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা উত্তরাধিকারের মাল কোনো কর্ম ছাড়াই তার মালিকানায় দাখিল হয়ে গেছে। নিয়ত ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়নি। আর যদি কোনো ব্যক্তি হেবার মাধ্যমে কোনো জিনিসের মালিক হয় এবং এর দখলও দিয়ে দেয় অথবা অসিয়তের মাধ্যমে মালিক হয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার জন্য কোনো জিনিসের অসিয়ত করল, অথবা বিবাহের মাধ্যমে মালিক কোনো জিনিসের মালিক হয়। যেমন– সে তার দাসীকে কারো কাছে বিবাহ দিয়েছে এবং এর মহর হস্তগতও করেছে, অথবা খোলার মাধ্যমে মালিক হয়েছে। যেমন– স্বীয় স্ত্রীর সাথে কোনো কিছুর বিনিময়ে খোলা করেছে। অথবা কিসাস-এর (قِصَاص)-এর বিনিময়ে আপস করে কোনো কিছুর মালিক হয়েছে। যেমন– এক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির ওলী বা অবিভাবক। অতঃপর সে হত্যাকারীর সাথে কোনো কিছুর বিনিময়ে আপস করল, উক্ত সুরতগুলোতে সে যদি ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সেগুলো ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সেসব সুরতে নিয়ত কর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে। কর্ম হলো, সে ঐ সব মাল গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণ করা একটি কর্ম। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঐ সব মাল ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা নিয়ত ব্যবসার কর্মের সাথে যুক্ত হয়নি। কারণ এসব ওকূদ (عُقُوْد)তথা চুক্তি বা লেনদেন অর্থাৎ দান, অসিয়ত ইত্যাদি ব্যবসা হিসেবে গণ্য নয়। কেউ কেউ বলেছেন, মতভেদ এর বিপরীত। অর্থাৎ উক্ত সুরতগুলোতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ব্যবসার নিয়ত করা সত্ত্বেও এগুলো ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঐগুলো ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য হবে।

ইনায়া গ্রন্থকার (র.) এর সারকথা উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, যে বস্তু কোনো ব্যক্তির মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয় তা দু'প্রকার– [১] তার কর্ম ছাড়া অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন– উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। [২] তার কর্মের দ্বারা মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হওয়া শেষোক্তটি আবার দু প্রকার– [১] মালের বিনিময়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন– ক্রয়, ইজারা বা ভাড়া নেওয়ার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অথবা মাল নয় এমন জিনিসের বিনিময়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন– মহর, খোলা-এর মাল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত খুনের আপসের টাকা। [২] কোনো বিনিময় ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন– হেবা, সদকা, অসিয়ত ইত্যাদি। এতএব যেসব জিনিস কর্ম ব্যতীত তার মালিকানায় দাখিল হয় তাতে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবসার নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে যেসব জিনিস মালের বিনিময়ে মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হয় তাতে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবসার নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যেসব জিনিস মাল ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে বা কোনো বিনিময় ছাড়াই মালিকানায় দাখিল হয়, তাতে মতভেদ আছে। যেমন– কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

وَلَا يَجُوزُ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ اِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْاَدَاءِ اَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ لِاَنَّ الزَّكٰوةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَالْاَصْلُ فِيْهَا الْاِقْتِرَانُ اِلَّا اَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ فَاكْتَفٰى بِوُجُوْدِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيْرًا كَتَقْدِيْمِ النِّيَّةِ فِى الصَّوْمِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهٖ لَا يَنْوِى الزَّكٰوةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ اِسْتِحْسَانًا لِاَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِّنْهُ فَكَانَ مُتَعَيِّنًا فِيْهِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى التَّعْيِيْنِ وَلَوْ اَدّٰى بَعْضَ النِّصَابِ سَقَطَ زَكٰوةُ الْمُؤَدّٰى عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لِاَنَّ الْوَاجِبَ شَائِعٌ فِى الْكُلِّ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لَا يَسْقُطُ لِاَنَّ الْبَعْضَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِكَوْنِ الْبَاقِىْ مَحَلًّا لِلْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْاَوَّلِ. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : জাকাত আদায় করার সাথে যুক্ত নিয়ত, কিংবা জাকাত পরিমাণ অর্থ আলাদা করার সাথে যুক্ত নিয়ত ছাড়া জাকাত আদায় করা সহীহ্ হবে না। কেননা জাকাত একটি ইবাদত। সুতরাং এর জন্য নিয়ত শর্ত হবে। আর নিয়তের ক্ষেত্রে আসল হলো, তা কর্মের সাথে যুক্ত হওয়া। তবে যেহেতু জাকাত প্রদান সাধারণত বিভিন্ন সময়ে হয়ে থকে তাই সহজতার লক্ষ্যে জাকাতের অর্থ আলাদা করার সময় নিয়তের বিদ্যমানতাই যথেষ্ট। যেমন– সিয়ামের ক্ষেত্রে নিয়তকে অগ্রবর্তী করার বিষয়টি। আর যে ব্যক্তি পূর্ণ মাল দান করল এবং তাতে জাকাতের নিয়ত করল না, তাহলে সূক্ষ্ম যুক্তি (اِسْتِحْسَانٌ)-এর আলোকে তার থেকে জাকাতের ফরজ রহিত হয়ে যাবে। কেননা জাকাতের ফরজ পরিমাণ মাল পূর্ণ সম্পদের অংশবিশেষ এবং তা নিসাবের মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল। এজন্য ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর কেউ যদি নিসাবের কিছু অংশ সদকা করে দেয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সদকাকৃত মালের জাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা ওয়াজিবের পরিমাণ পূর্ণ মালে বিস্তৃত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ঐ অংশের জাকাত রহিত হয়ে যাবে না। কেননা জাকাতের জন্য নিসাবের এই অংশ নির্দিষ্ট নয়। এজন্য যে, যে মাল অবশিষ্ট আছে তা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার স্থান। পক্ষান্তরে প্রথম মাসআলাটি এর বিপরীত। আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জাকাত আদায়ের জন্য নিয়ত শর্ত। কেননা জাকাত কর্মটি একটি ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত। কারণ, কোনো ইবাদতই ইখলাস (اِخْلَاص) ব্যতীত আদায় হয় না। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে"।– [বায়্যিনা ; আয়াত : ৫] আর ইখলাস নিয়ত ছাড়া পাওয়া যায় না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবাদতের জন্য নিয়ত করা আবশ্যক। যেহেতু জাকাত আদায় করা একটি ইবাদত, তাই জাকাত আদায় করতেও নিয়তের প্রয়োজন হবে।

প্রশ্ন : জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কখন নিয়ত করতে হবে?

উত্তর : ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, জাকাত আদায় করার সময় নিয়ত করবে, অথবা জাকাত পরিমাণ মাল আলাদা করার সময় নিয়ত করবে।

দলিল : নিয়তের ক্ষেত্রে আসল হলো, নিয়তের ইবাদতের সাথে যুক্ত থাকা। যেমন নামাজের মধ্যে নামাজের নিয়তটি নামাজের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। এই দলিলের দাবি হলো, জাকাত আদায় করার সময়ের নিয়ত তো গ্রহণযোগ্য। কেননা জাকাত আদায় করা একটি ইবাদত। আর নিয়তের ইবাদতের সাথে যুক্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জাকাতের পরিমাণ আলাদা

করার সময়ের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা জাকাতের পরিমাণকে মাল হতে পৃথক করে নিজ গৃহে রেখে দেওয়া কোনো ইবাদত নয়। এর উত্তর হলো, ফরজ পরিমাণ জাকাতকে মাল হতে পৃথক করার সময় এর নিয়ত জরুরতের প্রেক্ষিতে ধর্তব্য হবে– সংকীর্ণতাকে দূর করার জন্য। কেননা মানুষ বিভিন্নজনকে বিভিন্ন সময়ে জাকাত প্রদান করে থাকে। অতএব যদি প্রতিবার জাকাত প্রদানের সময় নিয়ত করাকে আবশ্যক করা হয়, তাহলে এ ব্যক্তি সংকীর্ণতা এবং জটিলতার মধ্যে পতিত হবে। জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সহজ উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে মাল পৃথক করার সময়ের নিয়তই যথেষ্ট হবে। যেমন– রোজার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী নিয়তকে যথেষ্ট মনে করা হয়। তবে আসল হলো, রোজার নিয়ত সুবেহ সাদেকের প্রথম অংশের সাথে যুক্ত হওয়া। যেহেতু তা মানুষের জন্য কঠিন; বরং এভাবে নিয়ত করতে মানুষ অক্ষমও বটে। এ কারণে বলা হয়েছে যে, নিয়ত অগ্রবর্তী হলেও এতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং তা গ্রহণযোগ্য হবে।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি জাকাতের নিয়ত ছাড়াই নিজের পূর্ণ মাল দান করে দেয়, তাহলে সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে তার থেকে জাকাতের ফরজ রহিত হয়ে যাবে। তবে সাধারণ যুক্তি (قِيَاسٌ) হলো, তার থেকে জাকাতের ফরজিয়ত রহিত হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মত এরূপই। কেননা সাধারণ যুক্তি হলো, নফল এবং ফরজ উভয়ই শরিয়তসম্মত আমল। অতএব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য একটা কিছু নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। যেমন– নামাজের ক্ষেত্রে মুতলক (مُطْلَقٌ) বা সাধারণ নিয়তের দ্বারা ফরজ নামাজ আদায় হয় না; বরং তা নির্দিষ্ট করা জরুরি। অনুরূপভাবে ফরজ জাকাতও নিয়ত ছাড়া আদায় হবে না। যদিও এতে মুতলক (مُطْلَقٌ) বা সাধারণ নিয়ত পাওয়া গিয়েছে। ইসতিহসান (اِسْتِحْسَانٌ) বা সূক্ষ্ম যুক্তির কারণ হলো, ওয়াজিব তো পূর্ণ মালের একটি অংশবিশেষ। অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং পূর্ণ মালের মধ্যে এই ওয়াজিবও নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট বস্তু পুনরায় নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই। এ জন্য ঐ এক অংশকে অর্থাৎ জাকাতের পরিমাণ অংশকে নির্দিষ্ট করার কোনো আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো– জাকাত আদায় করার জন্য তো নিয়ত শর্ত। অথচ এখানে নিয়ত পাওয়া যায়নি।

উত্তর : মূলনীতি হলো, ইবাদতে নিয়ত শর্ত। যাতে ইবাদত (عِبَادَةٌ) এবং অভ্যাসের (عَادَةٌ)-এর মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। এখানে আসল ইবাদতের নিয়ত পাওয়া গিয়েছে। কেননা আমাদের বক্তব্য ঐ সুরতে প্রযোজ্য যখন পূর্ণ মাল কোনো গরিব মানুষকে দান করে দেওয়া হয় এবং তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়ত করা হয়েছে। এ কথা সকলের জানা যে, গরিবকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য দান করা ইবাদত। কাজেই আসল ইবাদতের নিয়ত পাওয়া গিয়েছে, তবে বাকি রয়ে গেল ফরজ জাকাত আদায়ের নিয়ত করা। এ ক্ষেত্রে নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা ফরজ জাকাতের নিয়তটি তাআয়ুন (تَعَيُّنٌ) বা নির্দিষ্টকরণের জন্য শর্ত। আর নির্দিষ্ট না থাকার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অথচ জাকাতের নিসাবে জাকাতের ওয়াজিব নির্দিষ্ট। তাই একে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যেমন– কোনো ব্যক্তি পবিত্র রমজানে মুতলক (مُطْلَقٌ) বা সাধারণ রোজার নিয়ত করেছে। তাহলে এতে রমজানের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। অথচ সে সুনির্দিষ্টভাবে রমজানের রোজার নিয়ত করেনি। কেননা এ মাসে ফরজ রোজা নির্দিষ্ট। তাই একে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

আর যদি নিসাবের কিছু অংশ সদকা করে দেয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নিসাবের যে পরিমাণ গরিবদেরকে সদকা করে দেওয়া হয়েছে এর জাকাত রহিত হয়ে যাবে। আর যে পরিমাণ মাল অবশিষ্ট আছে এর জাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সদকাকৃত মালের জাকাতও রহিত হবে না; বরং অবশিষ্ট মাল থেকে পূর্ণ মালের জাকাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ গরিবদেরকে যে অংশ দিয়েছে এর উপর এবং যে অংশ অবশিষ্ট আছে এর উপর তথা উভয় অংশের উপরই জাকাত ফরজ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, জাকাতের ওয়াজিবের পরিমাণটি পূর্ণ মালে বিস্তৃত ছিল। যদি পূর্ণ মাল সদকা করে দিত, তাহলে পূর্ণ জাকাত রহিত হয়ে যেত। অতএব যখন সে মালের কিয়দংশ সদকা করেছে তাই ঐ কিয়দংশের জাকাত রহিত হয়ে যাবে। সারকথা ইমাম মুহাম্মদ (র.) মালের কিয়দংশকে পূর্ণ মালের উপর কিয়াস করেছেন। যেমন–দু'শত দিরহামে [রৌপ্য মুদ্রা] পাঁচ দিরহাম জাকাত ওয়াজিব ছিল। এমতাবস্থায় যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পর চল্লিশ দিরহাম সদকা করে দেয় তাহলে ঐ চল্লিশ দিরহামের সাথে এক দিরহাম জাকাতের চলে যাবে। এখন অবশিষ্ট একশত ষাট দিরহামে চার দিরহাম জাকাত ফরজ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, জাকাতের জন্য নিসাবের ঐ কিয়দংশ নির্দিষ্ট নয় যা সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। কেননা যে পরিমাণ মাল অবশিষ্ট আছে তাও ফরজ জাকাতের স্থান। অর্থাৎ পূর্ণ জাকাত এই অবশিষ্ট মাল হতেও আদায় হতে পারে। তবে এ মাসআলাটি প্রথম মাসআলার বিপরীত। অর্থাৎ যদি পূর্ণ মাল সদকা করে দেয় তাহলে পূর্ণ জাকাত রহিত হবে। কেননা জাকাত ফরজ হওয়ার পরিমাণ তো এর মধ্যে অবশ্যই শামিল আছে।

بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ

পরিচ্ছেদ : গবাদি পশুর জাকাত

গ্রন্থকার (র.) মালের জাকাতের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ গবাদি পশুর দ্বারা আরম্ভ করেছেন এবং গবাদি পশুর মধ্যে উটের জাকাতের দ্বারা তা শুরু করেছেন। কেননা রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে জাকাত সম্পর্কে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে উটের জাকাতের বর্ণনা সর্বাগ্রে ছিল। এই তরতীব অনুসরণের দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ -এর পত্রের অনুসরণ করা।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আরবদের নিকট সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ হলো উট। এজন্য উটের জাকাতের আলোচনা প্রথমে আনা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার শিরোনামে সদকা শব্দ উল্লেখ করেছেন এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য জাকাত। এতে মহান আল্লাহর বাণী إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ-এর অনুসরণ হয়েছে। সাওয়ায়েম (سَوَائِمُ) শব্দটি সায়েমা (سَائِمَةٌ) -এর বহুবচন। এটি سَامَتِ السَّائِمَةُ হতে গৃহীত। অর্থ– চতুষ্পদ জন্তু চরেছে। سَائِمَةٌ এমন জন্তুকে বলা হয়, যা অনুমোদিত মাঠে বিচরণ করে আহার গ্রহণ করে। এরূপ জন্তুর নর-মাদী এবং একত্রিতভাবে যা মিলেমিশে থাকে সবগুলোর উপর জাকাত ফরজ হবে। তবে শর্ত হলো, এর দ্বারা দুধ পাওয়া এবং বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকতে হবে। পক্ষান্তরে এর দ্বারা যদি আরোহণ এবং গোশত অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি এর দ্বারা ব্যবসা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর উপর সায়েমা (سَائِمَةٌ) অর্থাৎ পালিত পশু হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং ব্যবসার মাল হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ নিসাব এবং হিসেব অনুযায়ী জাকাত ওয়াজিব হবে। অনুমোদিত এবং বৈধ মাঠ-ময়দানের শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, যদি ময়দানটি কোনো কিছুর বিনিময়ে নেওয়া হয়, যেমন আমাদের যুগে হয়ে থাকে তাহলে ঐ সব জন্তুর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি পশুগুলো বছরের অধিকাংশ সময় বৈধ ময়দানে বিচরণ করে খায় আর অবশিষ্ট দিন নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে প্রতিপালন করে এবং ঘাস খাওয়ায়, তাহলে একেও سَائِمَةٌ বলা হবে। আর যদি অর্ধেক বছর নিজে পালে তাহলে (سَائِمَةٌ) হবে না। এখানে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তা হলো–

بِنْتُ مَخَاضٍ ---- بِنْتُ لَبُوْنٍ ---- حِقَّةٌ ---- جَزَعَةٌ ------- ।

বিনতে মাখাজ (بِنْتُ مَخَاضٍ) : উটের ঐ বাচ্চা যা এক বছর পূর্ণ করে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। একে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো মাখাজ (مَخَاضٌ) অর্থ–গর্ভবতী। আর সাধারণত উষ্ট্রী একটি বাচ্চা প্রসব করার পর দ্বিতীয় বছরে গর্ভবতী হয়ে যায়। এ কারণে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাচ্চাকে বিনতে মাখায (بِنْتُ مَخَاضٍ) বলে। অর্থাৎ গর্ভবতীর বাচ্চা। উক্ত নামে নামকরণ করার কারণ مَخَاضٌ-এর অর্থ হচ্ছে প্রসব বেদনা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ "প্রসব বেদনা তাকে [মারইয়ামকে] এক খেজুর বৃক্ষতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল"।- [মারইয়াম : আয়াত ২৩]। যেহেতু এ উষ্ট্রীও এ বাচ্চাটির কারণে প্রসব বেদনায় আক্রান্ত হয়ে থাকে, এজন্য এ বাচ্চাকে বিনতে মাখাজ (بِنْتُ مَخَاضٍ) বলা হয়। অর্থাৎ প্রসব বেদনার ফলে যে বাচ্চা প্রসবিত হয়েছে।

বিনতে লাবূন (بِنْتُ لَبُوْنٍ): উটের ঐ মাদী বাচ্চা, যেটা দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। একে এ নামে নাম করণ করা হলো এ কারণে যে, এ বাচ্চার মা দুধওয়ালী এবং এর থেকে এর ছোট বাচ্চা দুধ পান করে। কেননা এ বাচ্চা প্রথম দিকে দুধ পান করে বড় হয়েছে। এজন্য একে বিনতে লাবূন (بِنْتُ لَبُوْنٍ) বলা হয়।

হিক্কা (حِقَّةٌ): উটের ঐ মাদী বাচ্চাকে বলে যার বয়স চতুর্থ বছরে পড়েছে। একে হিক্কা এজন্য বলা হয় যে, এটি আরোহণের এবং বোঝা বহনের উপযুক্ত হয়েছে। [ফতহুল ক্বাদীর এবং শরহে নিক্বায়া]

জিয়া'(جَزَعَةٌ): উটের ঐ মাদী বাচ্চা যা পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে। একে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, جَذَعٌ এর অর্থ– মূল হতে উচ্ছেদ করা। এ বয়সে উটের বাচ্চার দুধদাঁত মূল হতে পড়ে যায় এবং অন্য দাঁত বের হয়। এজন্য একে জিয়া' বলে, (حَاشِيَةُ هِدَايَةٍ بِحَوَالَةِ دُرِّمُخْتَارٍ)

জিয়া' উটের সব থেকে বড় বাচ্চা যেটাকে জাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, জিয়া' হতে বড় ছানী (ثَنِيٌّ)। আর এর থেকে বড় সাদীস (سَدِيْسٌ) এবং এর থেকে বড় বাযিল (بَازِلٌ)। শেষোক্ত তিনটির কোনোটিই জাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

فَصْـلٌ فِـى الْاِبِـلِ : قَالَ (رضـ) لَيْسَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى تِسْعٍ فَاِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى اَرْبَعَ عَشَرَةَ فَاِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشَرَةَ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلٰى تِسْعَ عَشَرَةَ فَاِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ اِلٰى اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِىَ الَّتِىْ طَعَنَتْ فِى الثَّانِيَةِ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ فَاِذَا كَانَتْ سِتًّا وَّثَلٰثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ وَهِىَ الَّتِىْ طَعَنَتْ فِى الثَّالِثَةِ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا كَانَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ وَهِىَ الَّتِىْ طَعَنَتْ فِى الرَّابِعَةِ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا كَانَتْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ وَهِىَ الَّتِىْ طَعَنَتْ فِى الْخَامِسَةِ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا كَانَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا كَانَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ بِهٰذَا اُشْتُهِرَتْ كُتُبُ الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

অনুচ্ছেদ : উটের জাকাত

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেছেন, পাঁচটির কম উট হলে জাকাত ওয়াজিব হবে না। যখন পাঁচটি হবে তখন জাকাত ওয়াজিব হবে। তবে তা سائمة হতে হবে এবং পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। পাঁচটি উটে একটি বকরি ফরজ হবে। একই হুকুম নয় পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। আর যখন দশটি হবে তখন দু'টি বকরি ফরজ হবে। এ হুকুম চৌদ্দ পর্যন্ত। যখন উটের সংখ্যা পনেরটি হবে তখন তিনটি ওয়াজিব হবে। এ হুকুম উনিশ পর্যন্ত। বিশটি হলে চারটি বকরি ফরজ হবে। এ হুকুম চব্বিশ পর্যন্ত। পঁচিশটি হলে একটি বিনতে মাখাজ (بِنْتُ مَخَاضٍ) ওয়াজিব হবে। বিনতে মাখাজ বলা হয়, উটের ঐ বাচ্চাকে যা প্রথম বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। এ হুকুম পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। যখন ছত্রিশটি হবে তখন একটি বিনতে লাবূন (بِنْتُ لَبُوْنٍ) ফরজ হবে। বিনতে লাবূন বলা হয়, যা দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এ হুকুম। ছিচল্লিশটি হলে একটি হিক্কা ফরজ হবে। হিক্কা উটের এমন বাচ্চা যা চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে। এ হুকুম ষাট পর্যন্ত। একষট্টিটি হলে তাতে একটি জিযা' (جَذَعَةٌ) ফরজ হবে। জিযা' (جَذَعَةٌ) বলা হয় ঐ মাদী বাচ্চাকে যা পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে। পঁছাত্তর পর্যন্ত এ হুকুম। ছিয়াত্তরটি হলে দুটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। নব্বই পর্যন্ত এ হুকুম। একানব্বই হলে দুইটি হিক্কা ফরজ হবে। একশত বিশ পর্যন্ত এ হুকুম। রাসূল ﷺ থেকে জাকাতের বিধান বিষয়ক পত্রাবলি এরূপই প্রসিদ্ধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার (র.) উটের নিসাব এবং এর জাকাতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, উটের নিসাব পাঁচ থেকে শুরু হয়। এর কমে জাকাত ফরজ হয় না। জাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত হলো সায়েমা (سَائِمَة) হওয়া এবং পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এ শর্তদ্বয়ের সাথে পাঁচ উট হলে একটি বকরি জাকাতস্বরূপ ওয়াজিব হবে। পাঁচ হতে নয় পর্যন্ত মাফ। যে বকরি জাকাতস্বরূপ গ্রহণ করা হবে তা মাদী হতে হবে এবং পূর্ণ এক বছরের হতে হবে। উক্ত শর্তের সাথে কারো দশটি উট থাকলে দুই বকরি ওয়াজিব হবে এবং দশের পর থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত মাফ। পনেরটিতে তিনটি বকরি ফরজ হবে। পনের-এর পর থেকে উনিশ পর্যন্ত মাফ। বিশটিতে চারটি বকরি ফরজ হবে। বিশের পর থেকে চব্বিশ পর্যন্ত মাফ। পঁচিশটিতে একটি বিনতে মাখায ফরজ হবে। পঁচিশের পর থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত মাফ। আর ছত্রিশটিতে একটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত মাফ। ছেচল্লিশটিতে একটি হিক্কা ফরজ হবে। ছেচল্লিশের পর হতে ষাট পর্যন্ত মাফ। একষট্টিটি হলে একটি জিযা' ফরজ হবে। একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত মাফ। ছিয়াত্তরটিতে দুই বিনতে লাবূন ফরজ হবে। ছিয়াত্তরের পর হতে নব্বই পর্যন্ত মাফ। একানব্বইটি হলে দুটি হিক্কা ফরজ হবে। একানব্বই এর পর থেকে একশত কুড়ি পর্যন্ত মাফ।

হিদায়া গ্রন্থকার দলিল দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ হতে জাকাতের বিধান সংক্রান্ত ফরমানটি এরূপ বর্ণনার সাথেই প্রসিদ্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ফরমান যা হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত আনাস (রা.)-এর নামে পাঠিয়েছেন–ইমাম বুখারী (র.) তা স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করেছেন। বরকতস্বরূপ এর শব্দগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো–

إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ (رض) كَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِيْ أَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهٗ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيُعْطِهَا عَلٰى وَجْهِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهٗ فَلَا يُعْطِهٖ فِيْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ فِيْ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَ عِشْرِيْنَ إِلٰى خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثٰى. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّ ثَلٰثِيْنَ إِلٰى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ أُنْثٰى. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَ أَرْبَعِيْنَ إِلٰى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدٰى وَ سِتِّيْنَ إِلٰى خَمْسٍ وَ سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ إِلٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدٰى وَ تِسْعِيْنَ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ ثُمَّ سَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ فِي الْغَنَمِ
(فَتْحُ الْقَدِيْرِ شَرْحُ نِقَايَة)

ফায়দা : গবাদি পশুর জাকাতের নিসাব এবং জাকাতের পরিমাণের বিষয়টি শরিয়ত প্রণেতা (شَارِعْ) কর্তৃক নির্ধারিত, বা শরিয়তের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। এতে যুক্তি-বুদ্ধির কোনো দখল বা প্রভাব নেই।

প্রশ্ন : প্রত্যেক গবাদি পশুর মধ্যে ঐ প্রজাতি হতে জাকাত ফরজ হয়, তবে উটের জাকাতে বকরি কেন ফরজ হয়?

জবাব : প্রথম উত্তর হলো, এ বিষয়ে কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। কেননা এটি শরিয়তের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় জবাব হলো, উটের নিসাব শুরু হয় পাঁচটি উটের দ্বারা। এমতাবস্থায় যদি পাঁচটি উটের মধ্যে একটি উট জাকাতস্বরূপ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে নিসাবের এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়ে যাচ্ছে। অথচ জাকাত নিসাবের চল্লিশ ভাগের এক ভাগের সমপরিমাণ ওয়াজিব হয়। আর যদি এক উটের আট ভাগের এক ভাগ দেওয়া হয়, তাহলে এক উটের আট ভাগের এক ভাগ পাঁচ উটের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হবে। এই সুরতে উটের মধ্যে শিরকত (شِرْكَتْ) বা অংশিদারিত্বে لَازِمْ আসে। এটি সমীচীন ও শোভনীয় নয়। মোদ্দাকথা হচ্ছে, পাঁচ উটে একটি বকরি ফরজ করা হয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ-এর যুগে সাধারণত একটি বকরির দাম পাঁচ দিরহাম [রৌপ্য মুদ্রা] হতো, আর সব থেকে কম বয়সের উটের বাচ্চা অর্থাৎ বিনতে মাখাজ (بِنْتُ مَخَاضٍ)-এর দাম

সাধারণত চল্লিশ দিরহাম হতো। এভাবে পাঁচ উটের দাম দু'শত দিরহাম হয়। অতএব পাঁচ উটে একটি বকরি আদায় করা ওয়াজিব হওয়াই যথার্থ। যেমন দু'শত দিরহামে পাঁচ দিরহাম ফরজ হয়। আর পাঁচ দিরহাম দু'শত দিরহামের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এজন্য এক বকরিকে পাঁচ উটের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ গণ্য করা হয়েছে।– [ইনায়া]

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) 'আল মাসালিহুল আকলিয়্যা লিল্ আহকামিশ-শারইয়্যা' (اَلْمَصَالِحُ الْعَقْلِيَّةُ لِلْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ) নামক গ্রন্থে পাঁচ উটে এক বকরি ওয়াজিব হওয়ার এ হিকমত বর্ণনা করেছেন যে, প্রাচীনকালে কোনো উটের মূল্য আট বকরি, কোনোটির মূল্য দশ বকরি, কোনোটির মূল্য বার বকরির সমপরিমাণ মনে করা হতো, যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। সাবধানতাস্বরূপ উটের ন্যূনতম মূল্য স্থির করে এক উটের মূল্য আট বকরির সমান গণ্য করা হয়েছে। এ সূরতে পাঁচ উট চল্লিশ বকরির সমপরিমাণ হবে এবং এতে [চল্লিশ বকরিতে] একটি বকরি ওয়াজিব হয়।

অতএব পাঁচ উটে এক বকরি ফরজ করা চল্লিশ বকরিতে এক বকরি ফরজ করার সমতুল্য। আর চল্লিশ বকরিতে এক বকরি চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং পাঁচ উটের মধ্যে এক বকরি পাঁচ উটের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

উল্লেখ্য যে, উটের জাকাতে মাদী উট ওয়াজিব হয়; নর উট ওয়াজিব হয় না। তবে যদি নর উট দিতে হয় তাহলে এর দাম ধরে দিতে হবে। পশু হিসেবে দেবে না।

প্রশ্ন : উটের জাকাতে মাদী উট নির্দিষ্ট করা হলো কেন?

জবাব : জাকাতে মধ্যম পর্যায়ের জন্তু দিতে হয়। যাতে জাকাতদাতার ক্ষতি না হয় এবং জাকাত গ্রহীতারও কোনো ক্ষতি না হয়। অতএব শরিয়ত উটের জাকাতে ছোট উটকে ফরজ করেছে; বড় উট ফরজ করেনি। যেমন দেখা যায় যে, বিনতে মাখায, বিনতে লাবুন, হিক্কা এবং জিযআ ফরজ করেছে। আর এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে ছোট। তাই এগুলোর কুরবানি জায়েজ নেই। ছানী (ثَنِيْ), সাদীস (سَدِيْس) এবং বাযিল (بَازِلْ) বড়-এর মধ্যে গণ্য। এজন্য এগুলোর কুরবানি করা জায়েজ আছে। এগুলো জাকাতে ফরজ করা হয়নি। কারণ, বড়কে ফরজ না করে ছোটকে ফরজ করায় জাকাতদাতার ফায়দা। পক্ষান্তরে মাদীকে ফরজ করার মাঝে গ্রহীতার ফায়দা। প্রকাশ থাকে যে, উটের মধ্যে মাদী উত্তম। আর গরু-ছাগলে মাদীকে উত্তম বলে গণ্য করা হয় না। এজন্য জাকাতে এগুলোকে ফরজ করা হয়নি।

ثُمَّ إِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ فَيَكُوْنُ فِى الْخَمْسِ شَاةٌ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ وَفِى الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِى الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى مِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ فَيَكُوْنُ فِيْهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ فَيَكُوْنُ فِى الْخَمْسِ شَاةٌ وَفِى الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِىْ عِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِىْ سِتٍّ وَّثَلَاثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَّسِتًّا وَّتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ أَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِى الْخَمْسِيْنَ الَّتِىْ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ وَهٰذَا عِنْدَنَا ـ

অনুবাদ : অতঃপর যখন উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হবে তখন [নিসাবের] বিধান নতুন করে শুরু হবে। অর্থাৎ পাঁচটি উটে দুটি হিককা সহ একটি বকরি ওয়াজিব হবে। দশটিতে দুটি, পনেরটিতে তিনটি এবং বিশটিতে চারটি বকরি ফরজ হবে। পঁচিশ থেকে একশ' পঞ্চাশ পর্যন্ত একটি বিনতে মাখাজ ফরজ হবে [দু হিককা সহ] একশ' পঞ্চাশে গিয়ে তিনটি হিককা ফরজ হবে। অতঃপর নিসাবের বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে। অর্থাৎ পাঁচটিতে একটি বকরি, দশটিতে দুটি বকরি, পনেরটিতে তিনটি বকরি এবং বিশটিতে চারটি বকরি, আর পঁচিশটিতে একটি বিনতে মাখাজ এবং ছত্রিশটিতে একটি বিনতে লাবূন এবং যখন উট একশ' ছিয়ানব্বটিতে উপনীত হবে তখন দু'শ পর্যন্ত তাতে চারটি হিক্কা ফরজ হবে। অতঃপর একশত পঞ্চাশের পরবর্তী পঞ্চাশে যেভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছে, অনুরূপ বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে। এটি আমাদের মত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে একশ' বিশ উটের জাকাতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছিল। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যদি উটের সংখ্যা একশ' বিশ অতিক্রম করে তবে পাঁচটি উটে পূর্বের দুই হিক্কার সাথে একটি বকরি দিতে হবে। উপরের ইবারতের দ্বারা বুঝা যায় যে, একশ' বিশের থেকে যদি উটের সংখ্যা এক, দুই, তিন, কিংবা চারটি বৃদ্ধি পায় তাহলে ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যাগুলোরও উপর জাকাত ফরজ হবে। তবে যদি বৃদ্ধির সংখ্যা পাঁচে পৌঁছে, তাহলে পূর্বের দুই হিক্কার সাথে একটি বকরি জাকাতস্বরূপ দিতে হবে। আর যদি দশটি উট হয় অর্থাৎ একশ' ত্রিশটি উট হয়, তাহলে দুই হিক্কা সহ দুই বকরি ওয়াজিব হবে। আর যদি একশ পঁয়ত্রিশ হয় তাহলে দুই হিক্কাসহ তিন বকরি ফরজ হবে। একশ' চল্লিশটি উট হলে দুই হিক্কা চার বকরি ফরজ হবে। যদি একশ' পঁয়তাল্লিশটি উট হয় তাহলে দুই হিককা এবং একটি বিনতে মাখাজ ফরজ হবে। একশ' পঞ্চাশটি উট হলে তিনটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। আর যদি একশ' পঞ্চাশ থেকে বেশি হয়, তাহলে নতুন করে হিসেব করতে হবে।

অতএব একশ পঞ্চাশের উপর পাঁচটি বৃদ্ধি হয়ে একশ পঞ্চান্নটি হলে তিন হিক্কা একটি বকরি ফরজ হবে। আর যদি দশটি বৃদ্ধি হয়ে একশ ষাটটি হয়, তাহলে তিন হিককাসহ দু' বকরি ওয়াজিব হবে। আর যদি একশ পঁয়ষট্টিটি উট হয়, তাহলে তিন হিক্কা তিন বকরি ওয়াজিব হবে। একশ সত্তরটি উট হলে তিন হিক্কাসহ চার বকরি ওয়াজিব হবে। একশ পঁচাত্তরটি উট হলে তিন হিক্কাসহ একটি বিনতে মাখাজ ওয়াজিব হবে। একশ ছিয়াশিটি উট হলে তিন হিক্কাসহ একটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। একশ ছিয়ানব্বইটি হলে চার হিক্কা ওয়াজিব হবে। দু'শত পর্যন্ত এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

উটের সংখ্যা দু'শতের অধিক হলে জাকাতের বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে। তা এভাবে যে, দু'শ এরপর প্রতি পাঁচ উটে চার হিক্কার সাথে একটি বকরি দিতে হবে চব্বিশ পর্যন্ত। দুশত পঁচিশ হলে চার হিক্কার সাথে একটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। দু'শত ছেচল্লিশটি হতে পঞ্চাশ পর্যন্ত পাঁচ হিক্কা ওয়াজিব হবে। দু'শ পঞ্চাশের পরবর্তী পঞ্চাশে অনুরূপভাবে জাকাত ফরজ হবে। অর্থাৎ, প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরি ফরজ হবে। এভাবে পঁচিশটি হলে একটি বিনতে মাখাজ ফরজ হবে। ছত্রিশটি হলে একটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। ছেচল্লিশ হতে পঞ্চাশ পর্যন্ত একটি হিক্কা ফরজ হবে। অতএব তিনশ উটে দু হিক্কা ফরজ হবে : প্রত্যেক পঞ্চাশের হিসেব এভাবেই করতে হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, একশ বিশের পর নতুন করে হিসেব করা হবে।

একশ পঞ্চাশ এবং দুই শত-এর পরে যে নতুন করে হিসেব করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা আমাদের মত। হযরত আলী এবং ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর অভিমতও অনুরূপ।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) إِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ
فَإِذَا صَارَتْ مِائَةً وَّثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُوْنٍ ثُمَّ يُدَارُ الْحِسَابُ عَلَى
الْاَرْبَعِيْنَاتِ وَالْخَمْسِيْنَاتِ فَيَجِبُ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ
لِمَا رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ اِذَا زَادَتِ الْاِبِلُ عَلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ
حِقَّةٌ وَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ عَوْدِ مَا دُوْنَهَا وَلَنَا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
كَتَبَ فِيْ اٰخِرِ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَمَا كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِ
ذَوْدٍ شَاةٌ فَنَعْمَلُ بِالزِّيَادَةِ وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ لِاَنَّ مُطْلَقَ الْاِسْمِ يَتَنَاوَلُهُمَا وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, একশ' বিশের উপর যখন একটি অতিরিক্ত হবে তখন তাতে তিনটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। আর যখন উট একশ' ত্রিশটি হবে তখন তাতে একটি হিক্কা এবং দুটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। তারপর চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝে হিসেব আবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাৎ প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা ফরজ হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এ মর্মে ফরমান জারি করেছেন যে, উটের সংখ্যা যখন একশ' বিশের অধিক হবে তখন প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। উক্ত ফরমানে বিনতে লাবূনের নিম্নবর্তী বিধান পুনরায় আরোপ করার শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের দলিল হলো, আমর ইবনে হযমের পত্রে রাসূল ﷺ উপরিউক্ত বক্তব্যের শেষে এ কথাও বলেছেন যে, فَمَا كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ "এর থেকে যা কম হবে তাতে প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরি ফরজ হবে।" সুতরাং এ অতিরিক্ত অংশটুকুর উপরও আমল করতে হবে। জাকাতের ক্ষেত্রে অনারব এবং আরব উট একই রকম। কেননা সাধারণভাবে উট শব্দটি উভয় প্রকারকে শামিল করে। বিশুদ্ধ বিষয়ে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, একশ বিশের থেকে একটি উট বৃদ্ধি পেলে তাতে তিনটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। আর একশ ত্রিশ উট হলে একটি হিক্কা এবং দুটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। অতঃপর প্রত্যেক চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মাঝে হুকুম আবর্তিত হতে থাকবে। প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হিক্কা ফরজ হবে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, একশ বিশের উপর একটি বৃদ্ধি পেলে তাতে তিনটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। কেননা তা চল্লিশের তিন গুণ। আর যদি উট একশ ত্রিশটি হয় তাহলে তাতে একটি হিক্কা এবং দু'টি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। কেননা একশ ত্রিশে দুটি চল্লিশ এবং একটি পঞ্চাশ একশ চল্লিশে দুই হিক্কা এবং একটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। কেননা একশ চল্লিশে দুটি পঞ্চাশ এবং একটি চল্লিশ আছে। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ-এর ফরমানে লেখা আছে যে, যখন একশ বিশের থেকে বৃদ্ধি পাবে তখন প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হিক্কা এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন ফরজ হবে। হাদীসে চল্লিশের কমে প্রথম বিধানের পুনরাবৃত্তির শর্ত করা হয়নি; অর্থাৎ এভাবে যে, প্রত্যেক পাঁচটিতে এক বকরি, পঁচিশে বিনতে মাখাজ। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, চল্লিশের কম হলে তা মাফ হয়ে যাবে। আমাদের দলিল হলো, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আমর ইবনে হযম (রা.)-কে যে ফরমান দিয়েছিলেন তার শেষে আছে– فَمَا كَانَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا الْغَنَمُ فِيْ كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ "এর চেয়ে যা কম হবে, তাতে প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরি ফরজ হবে"। আমরা এ অতিরিক্ত অংশটুকুর উপরও আমল করছি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হিক্কা আর প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হওয়ার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এটি আমাদেরও মত। এর সাথে হাদীসের শেষে অতিরিক্ত অংশটুকুর উপরেও আমল করি যে, পঁচিশের মধ্যে একটি বিনতে মাখাজ এবং এর কম হলে প্রতি পাঁচ উটে একটি বকরি ফরজ হবে।

بُخْتٌ শব্দটি بُخْتِيٌّ-এর বহুবচন। بُخْتِيٌّ বলা হয় যা আরব এবং অনারব উভয়ের মিশ্রিত বীর্য দ্বারা জন্ম লাভ করেছে। একে বুখতে নাসার (بُخْتَ نَصَّرْ) বাদশাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

عِرَابٌ শব্দটি فَرَسٌ عَرَبِيٌّ-এর বহুবচন। যেমন عَرَبٌ শব্দটি رَجُلٌ عَرَبِيٌّ-এর বহুবচন। সারকথা হলো, উট যে প্রকারেরই হোক যখন নিসাবের সংখ্যায় পৌঁছবে তখন তাতে জাকাত ফরজ হবে। কেননা হাদীসে উট শব্দ এসেছে। আর তা উভয় প্রকারের উটকেই শামিল করে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فَصْلٌ فِى الْبَقَرِ : لَيْسَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ ثَلَاثِيْنَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَهِىَ الَّتِىْ طَعَنَتْ فِى الثَّانِيَةِ وَفِىْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ وَهِىَ الَّتِىْ طَعَنَتْ فِى الثَّالِثَةِ بِهٰذَا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعَاذًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

অনুচ্ছেদ : গরুর জাকাত

অনুবাদ : গরুর ক্ষেত্রে ত্রিশের নীচে কোনো জাকাত নেই। সুতরাং মুক্ত মাঠে বিচরণকারী গরুর সংখ্যা ত্রিশ হলে এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হলে তখন তাতে একটি তাবী' (تَبِيْع) বা তাবীআ' (تَبِيْعَةٌ) অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর ওয়াজিব হবে এবং চল্লিশটিতে একটি মুসিন (مُسِنٌ) বা মুসিন্না (مُسِنَّةٌ) অর্থাৎ তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর ওয়াজিব হবে। রাসূল ﷺ হযরত মুআজ (রা.)-কে এরূপই আদেশ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার (র.) গরুর জাকাতের আলোচনাকে বকরির জাকাতের পূর্বে বর্ণনা করেছেন। কেননা গরু মোটা এবং মূল্যের দিক থেকে উটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাক্বারুন (بَقَرٌ)-এর অর্থ বিদীর্ণ করা, বাক্বর (بَقَرٌ)-কে এজন্য বকর বলে নামকরণ করা হয়েছে যে, তা জমিনকে বিদীর্ণ করে। بَقَرَةٌ-এর মধ্যে ت অক্ষরটি ওয়াহদত (وَحْدَتْ) বা একক বিষয়কে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। স্ত্রী লিঙ্গ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। অতএব বাক্বারাতুন (بَقَرَةٌ) শব্দটি নর ও মাদী উভয়কে শামিল করবে।

তাবী' (تَبِيْع) গরুর এক বছরের নর বাছুর আর তাবীআ' (تَبِيْعَةٌ) গরুর এক বছরের মাদী বাছুর।

নামকরণ : তাবী' এবং তাবীআ' স্বীয় মায়ের অনুকরণ ও অনুসরণ করে। যার পিছনে পিছনে চলে এজন্য একে তাবী' ও তাবীআ' বলা হয়। মুসিন্ন (مُسِنْ) গরুর দুই বছরের নর বাছুর। মুসিন্না (مُسِنَّةٌ) গরুর দুই বছরের মাদী বাছুর।

গরুর জাকাতে নর ও মাদীর মাঝে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। কেননা, গরুর মধ্যে মাদীকে উত্তম জ্ঞান করা হয় না। প্রকাশ থাকে যে, বকুর শব্দটি যেভাবে গাভী এবং বলদের জন্য ব্যবহার করা হয়, অনুরূপভাবে নর মহিষ ও মাদী মহিষের জন্যও তা ব্যবহার করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, বক্বর বা গরু প্রজাতির মধ্যে জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তা যেন দুধ লাভ এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য হয়। পক্ষান্তরে যদি হালচাষ এবং বোঝা বহনের জন্য হয়, তাহলে এতে জাকাত ফরজ হবে না। আর যদি তা ব্যবসার জন্য হয়, তাহলে ব্যবসা হিসেবে জাকাত ফরজ হবে। গবাদি পশু হিসেবে জাকাত ফরজ হবে না।

মোটকথা, ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী' বা তাবীআ' ফরজ হবে। আর চল্লিশটির মধ্যে একটি মুসিন বা মুসিন্না ফরজ হবে। দলিল হলো হযরত মাসরূক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَاْخُذَهُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ بَقَرًا تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنًّا اَوْ مُسِنَّةً ـ

অর্থ–হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল ﷺ যখন তাকে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক ত্রিশটি গরু হতে একটি এক বছরের নর বা মাদী বাছুর গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরু হতে একটি দু'বছরের নর বা মাদী বাছুর গ্রহণ করবে। –[শরহে নেকায়া]

فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى اَرْبَعِيْنَ وَجَبَ فِى الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذٰلِكَ اِلٰى سِتِّيْنَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فَفِى الْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ رُبْعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الْاِثْنَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الثَّلَاثَةِ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَهٰذَا رِوَايَةُ الْاَصْلِ لِاَنَّ الْعَفْوَ ثَبَتَ نَصًّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ وَلَا نَصَّ هٰنَا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ اَنَّهُ لَا يَجِبُ فِى الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسِيْنَ ثُمَّ فِيْهَا مُسِنَّةٌ وَرُبْعُ مُسِنَّةٍ اَوْ ثَلَاثُ تَبِيْعٍ لِاَنَّ مَبْنٰى هٰذَا النِّصَابِ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ كُلِّ عَقْدَيْنِ وَقَصٌ وَفِىْ كُلِّ عَقْدٍ وَاجِبٌ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) لَا شَيْءَ فِى الزِّيَادَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ سِتِّيْنَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذٍ (رضـ) لَا تَاْخُذْ مِنْ اَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا وَفَسَّرُوْهُ بِمَا بَيْنَ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى سِتِّيْنَ قُلْنَا قَدْ قِيْلَ اِنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا هٰهُنَا الصِّغَارُ ثُمَّ فِىْ سِتِّيْنَ تَبِيْعَانِ اَوْ تَبِيْعَتَانِ وَفِىْ سَبْعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيْعٌ وَفِىْ ثَمَانِيْنَ مُسِنَّتَانِ وَفِىْ تِسْعِيْنَ ثَلَاثَةُ اَتْبِعَةٍ وَفِى الْمِائَةِ تَبِيْعَانِ وَمُسِنَّةٌ وَعَلٰى هٰذَا فَيَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِىْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ تَبِيْعٍ اِلٰى مُسِنَّةٍ وَمِنْ مُسِنَّةٍ اِلٰى تَبِيْعٍ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ وَالْجَوَامِيْسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ لِاَنَّ اِسْمَ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُهُمَا اِذْ هُوَ نَوْعٌ مِنْهُ اِلَّا اَنَّ اَوْهَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ اِلَيْهِ فِىْ دِيَارِنَا لِقِلَّتِهٖ فَلِذٰلِكَ لَا يَحْنَثُ بِهٖ فِىْ يَمِيْنِهٖ لَا يَاْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : যখন গরুর সংখ্যা চল্লিশের অধিক হবে তখন ষাট পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যাগুলোতে সেই পরিমাণেই ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সুতরাং অতিরিক্ত একটিতে একটি মুসিন্নার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর দুটিতে চল্লিশ ভাগের দু'ভাগ এবং তিনটিতে মুসিন্নার চল্লিশ ভাগের তিনভাগ ওয়াজিব হবে। এটা হলো আল-আসল (اَلْاَصْل) তথা মবসূত কিতাবের বর্ণনা। কেননা [মধ্যবর্তী সংখ্যার ক্ষেত্রে] জাকাত মাফ হওয়া কিয়াসের বিপরীতে নস (نَصّ) তথা শরিয়তের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে কোনো নস (نَصّ) নেই। হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পঞ্চাশে পৌঁছা পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যায় কিছুই ওয়াজিব হবে না। অতঃপর পঞ্চাশে একটি মুসিন্না এবং এক মুসিন্নার চতুর্থাংশ কিংবা এক তাবী'-এর তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। কেননা এ [গরুর জাকাতের] নিসাবের ভিত্তি হলো, প্রতি দু'দশকের মাঝে ছাড় রয়েছে এবং প্রতিটি দশকে ওয়াজিব। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ষাটে উপনীত হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যায় কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। কেননা রাসূল ﷺ হযরত মুআয (রা.)-কে বলেছেন– لَا تَاْخُذْ مِنْ اَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا "গরুর

মধ্যবর্তী সংখ্যা থেকে কিছু গ্রহণ করবে না"। আলিমগণ মধ্যবর্তী সংখ্যার ব্যাখ্যা করেছেন চল্লিশ ও ষাটের মধ্যবর্তী সংখ্যা দ্বারা। আমাদের বক্তব্য হলো, এমনও বলা হয়েছে যে, أَوْقَاصٌ [অতিরিক্ত সংখ্যা] দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো গরুর বাছুরসমূহ। অতঃপর ষাটটি গরুর ক্ষেত্রে দু'টি তাবী' কিংবা তাবীআ', সত্তরের ক্ষেত্রে একটি মুসিন্না ও একটি তাবী', আশিটির ক্ষেত্রে দুটি মুসিন্না, নব্বইটির ক্ষেত্রে তিনটি তাবী' এবং একশটির, ক্ষেত্রে দুটি তাবী' এবং একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে প্রতি দশে তাবী' থেকে মুসিন্নাতে এবং মুসিন্না হতে তাবী' -এ হুকুম আবর্তিত হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন- فِىْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ أَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِىْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ "প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী' কিংবা তাবীআ' এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি মুসিন কিংবা মুসিন্না ওয়াজিব হবে।" মহিষ ও গরু [জাকাতের হুকুমের ক্ষেত্রে] সমান। কেননা বক্বর (بَقَرٌ) শব্দটি উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, মহিষ বক্বর (بَقَرٌ)-এরই শ্রেণীভুক্ত। তবে আমাদের দেশে সংখ্যার স্বল্পতার কারণে মানুষের চিন্তাভাবনা বক্বর (بَقَرٌ) দ্বারা সেদিকে ধাবিত হয় না। এ কারণেই কেউ যদি কসম করে যে, গরুর গোশত খাবে না, তবে মহিষের গোশত খেলে কসম ভঙ্গ হবে না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত মাসআলায় বলা হয়েছে যে, একটি গরুতে একটি তাবী' ওয়াজিব হবে। আর চল্লিশটি গরুতে একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি চল্লিশটির বেশি হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিনটি বর্ণনা আছে।

প্রথম রেওয়ায়েত : মবসূতের রেওয়ায়েতে আছে, চল্লিশ হতে অতিরিক্ত সংখ্যায় হিসেব মোতাবেক জাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ চল্লিশে একটি মুসিন্না এবং চল্লিশের অতিরিক্ত যদি একটি হয় তাহলে একটি মুসিন্নার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। আর যদি অতিরিক্ত দুটি হয় তাহলে একটি মুসিন্না এবং একটি মুসিন্নার বিশ ভাগের এক ভাগ। আর যদি চল্লিশ হতে তিনটি অতিরিক্ত হয়, তাহলে একটি মুসিন্না এবং একটি মুসিন্নার চল্লিশ ভাগের তিন ভাগ ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে হিসেব চলতে থাকবে।

এ রেওয়ায়েতের দলিল হলো, ত্রিশ এবং চল্লিশের মাঝে জাকাত ফরজ না হওয়া কিয়াসের বিপরীত নস (نَصٌّ) দ্বারা সাব্যস্ত। এখানে অর্থাৎ চল্লিশের অতিরিক্ত সংখ্যায় জাকাত মাফ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নস (نَصٌّ) নেই। অতএব চল্লিশের অতিরিক্ত সংখ্যায় জাকাত মাফ হওয়া কিয়াসের দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না। কেননা মাল জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ। আর কিয়াসের দ্বারা নিসাব সাব্যস্ত করা জায়েজ নেই। অনুরূপভাবে জাকাতের কারণ প্রাপ্তির পর কিয়াসের দ্বারা মালের থেকে জাকাতের ফরজিয়তকে রহিত করাও জায়েজ নেই।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত : হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, চল্লিশের অতিরিক্ত সংখ্যায় কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। হাঁ, যদি অতিরিক্তের সংখ্যা পঞ্চাশে পৌঁছে, তাহলে একটি মুসিন্না এবং একটি মুসিন্নার এক চতুর্থাংশ ফরজ হবে। অথবা একটি মুসিন্না এবং একটি তাবীআ'-এর এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। মোটকথা চল্লিশ এবং পঞ্চাশ-এর মধ্যবর্তী সংখ্যার জাকাত মাফ। তবে পঞ্চাশে জাকাত ওয়াজিব হবে। এ রেওয়ায়েতের দলিল হলো, গরুর নিসাবের ভিত্তি হলো এর উপর যে, প্রত্যেক দুই দশকের মধ্যবর্তী সংখ্যার জাকাত মাফ। তবে দশকের উপর জাকাত ফরজ। গরুর মধ্যবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ দু'দশকের মধ্যবর্তী নয় সংখ্যাতে জাকাত মাফ। যেমন- চল্লিশের পূর্বে এবং ষাটের পরবর্তীতে অর্থাৎ ত্রিশে একটি তাবীআ' ওয়াজিব হবে। তবে ত্রিশের পরবর্তী সংখ্যা হতে উনচল্লিশ পর্যন্ত কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। আর ষাটে দুটি তাবীআ' ফরজ হবে। কিন্তু ষাটের পরবর্তী সংখ্যা হতে উনসত্তর পর্যন্ত কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মধ্যবর্তী সংখ্যায় [নয়তেও] কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে পঞ্চাশে পৌঁছলে একটি মুসিন্নার এক চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে অথবা একটি তাবীআ'র এক তৃতীয়াংশ ফরজ হবে।

তৃতীয় রেওয়ায়েত : চল্লিশের পরবর্তী অতিরিক্ত সংখ্যায় ষাট পর্যন্ত কোনো জাকাত ওয়াজিব হবে না। এটিই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। এ রেওয়ায়েতের দলিল হলো, রাসূল ﷺ হযরত মুআজ (রা.)-কে আদেশ করেছেন- لَا تَأْخُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا "গরুর মধ্যবর্তী সংখ্যা হতে কোনো কিছু গ্রহণ করবে না"।

আলিমগণ আওক্বাস (اَوْقَاصٌ)-এর ব্যাখ্যা চল্লিশ এবং ষাটের মধ্যবর্তী সংখ্যা দ্বারা করেছেন। সুতরাং উক্ত হাদীসের মর্ম হবে চল্লিশ এবং ষাটের মধ্যবর্তী সংখ্যার জাকাত গ্রহণ করবে না। কেননা তা মাফ।

اَوْقَاصٌ [আওক্বাস] وَقَصٌ-এর বহুবচন (جَمْعٌ)। দুই ফরজের মধ্যবর্তী সংখ্যাকে وَقَصٌ বলে।

জবাব : আমাদের পক্ষ হতে উক্ত হাদীসের জবাব দেওয়া হয়েছে এভাবে, অনেক আলিম বলেছেন, اَوْقَاصٌ দ্বারা ছোট বাচ্চা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে বাচ্চার বয়স পূর্ণ এক বছর হতে কম তা থেকে জাকাত নেবে না। এ ব্যাখ্যার পর উক্ত হাদীস ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তবে এ দলিলে অধমের- [জামীল আহমদ] প্রশ্ন আছে আরতাহলো দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে اَوْقَاصٌ শব্দকে দু'দশকের মধ্যবর্তী সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। ছোট বাচ্চার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَاَمَرَ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً قَالُوْا فَالْاَوْقَاصُ قَالَ مَا اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا بِشَيْءٍ وَسَاَسْاَلُهُ اِذَا قَدِمْتُ فَلَمَّا قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ ﷺ سَاَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ.

অর্থ- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত মুআজ (রা.)-কে ইয়েমেন পাঠালেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী' বা তাবীআ' গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরু হতে একটি মুসিন্না গ্রহণ করবে। ইয়েমেনের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, اَوْقَاصٌ হতে কেন জাকাত গ্রহণ করেন না? তখন হযরত মুআজ (রা.) বললেন, এর (اَوْقَاصٌ) ব্যাপারে রাসূল ﷺ আমাকে কোনো হুকুম করেননি। আমি অচিরেই রাসূল ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব, যখন রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাজির হব। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, اَوْقَاصٌ-এর মধ্যে কোনো কিছু ওয়াজিব নয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইয়েমেনের অধিবাসীরা اَوْقَاصٌ দ্বারা দু'দশকের মধ্যবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ত্রিশ এবং চল্লিশের মধ্যবর্তী সংখ্যা উদ্দেশ্য করেছেন। আর রাসূল ﷺ-ও উত্তরে তা-ই উদ্দেশ্য করেছেন।

হযরত মাসউদী (র.) বলেছেন- اَلْاَوْقَاصُ بَيْنَ الثَّلَاثِيْنَ وَالْاَرْبَعِيْنَ اِلَى سِتِّيْنَ "ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যবর্তী সংখ্যা এবং চল্লিশ ও ষাটের মধ্যবর্তী সংখ্যাকে اَوْقَاصٌ বলে"। অতএব হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত এবং মাসউদী (র.)-এর বর্ণনার পর اَوْقَاصٌ-কে ছোট বাচ্চার অর্থে গ্রহণ করা কিভাবে জায়েজ হবে? হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ষাটটি গরুতে দুটি তাবীআ' এবং সত্তরটি গরুতে একটি মুসিন্না ও একটি তাবীআ' ওয়াজিব হবে এবং আশিতে দুটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে। প্রত্যেক চল্লিশে একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে। আশিটিতে দুটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে। আর নব্বইটি গরুতে তিনটি তাবীআ' ফরজ হবে। একশ গরুতে দুইটি তাবীআ' এবং একটি মুসিন্না ফরজ হবে। এই কিয়াসের ভিত্তিতে হিসেব করা হবে এবং জাকাতের ফরজের পরিমাণে পরিবর্তন হতে থাকবে। প্রত্যেক দশকে তাবীআ' হতে মুসিন্নার দিকে এবং মুসিন্না হতে তাবীআ'র দিকে হিসেব আবর্তিত হতে থাকবে। যেমন- একশ -এর মধ্যে দুটি তাবীআ' ও একটি মুসিন্না এবং একশ দশের মধ্যে দুটি মুসিন্না ও একটি তাবীআ' এবং একশ বিশের মধ্যে তিনটি মুসিন্না এবং একশ ত্রিশের মধ্যে তিনটি তাবীআ' ও একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে গরুর জাকাতের ফরজের হিসাব চলতে থাকবে।

দলিল : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- فِىْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ، وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ
হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মহিষ এবং গরুর হুকুম একই। অতএব ত্রিশটি মহিষে এক বছরের একটি [মহিষের] বাছুর ওয়াজিব হবে। চল্লিশটি মহিষে দুই বছরের একটি [মহিষের] বাছুর ওয়াজিব হবে। দলিল এই যে, بَقَرٌ [বাক্বর] শব্দটি গাভী এবং মহিষ উভয়কে শামিল করে। আর গাভী এবং মহিষ বাক্বর (بَقَرٌ)-এর جِنْسٌ বা প্রজাতির মধ্যে শামিল।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বাক্বর (بَقَرٌ) শব্দটি উভয়কে এজন্য শামিল করে যে, মহিষও এক প্রকার بَقَرٌ। যেহেতু আমাদের মরগিনান এলাকায় মহিষ কম, এজন্য বাক্বর (بَقَرٌ) বলার দ্বারা মহিষের দিকে খেয়াল যায় না। এ কারণেই যদি কেউ কসম করে যে, আমি গাভীর গোশত খাব না, তাহলে মহিষের গোশত খেলে তার কসম ভাঙ্গবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فَصْلٌ فِى الْغَنَمِ : لَيْسَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ مِنَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَاِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعَ مِائَةٍ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ هٰكَذَا وَرَدَ الْبَيَانُ فِىْ كِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِىْ كِتَابِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) وَعَلَيْهِ اِنْعَقَدَ الْاِجْمَاعُ ـ

অনুচ্ছেদ : বকরির জাকাত

অনুবাদ : মুক্ত মাঠে বিচরণকারী বকরির সংখ্যা চল্লিশের কম হলে তার উপর জাকাত ফরজ হবে না। যখন মাঠে বিচরণকারী বকরির সংখ্যা চল্লিশ হয় এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন তাতে একশত বিশ পর্যন্ত একটি বকরি ওয়াজিব হবে। যখন সংখ্যা একটি বাড়বে তখন দু'শ পর্যন্ত দুটি বকরি ওয়াজিব হবে। অতঃপর যখন সংখ্যা একটি বাড়বে, তখন তিনশ পর্যন্ত তাতে তিনটি বকরি ওয়াজিব হবে। যখন সংখ্যা চারশ হবে, তখন চারটি বকরি ওয়াজিব হবে। অতঃপর প্রতি একশতে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে এবং পরবর্তীতে আবূ বকর (রা.)-এর ফরমানে এরূপ বিবরণই এসেছে। আর এর উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বকরির জাকাতের আলোচনা ঘোড়ার জাকাতের আলোচনার আগে করেছেন। এর কারণ হয়ত বকরি অধিক হওয়ার কারণে এর বর্ণনার প্রয়োজন বেশি ছিল, অথবা এটাও হতে পারে যে, বকরির উপর সকল আলিমের মতে জাকাত ফরজ হয়। পক্ষান্তরে ঘোড়ার জাকাতে মতানৈক্য আছে। সর্বসম্মত বিষয়কে প্রথমে উল্লেখ করাই সঙ্গত। এ হিসেবেই গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। বকরিকে غَنَمٌ (গনম) বলে নামকরণ করার কারণ হলো, غَنَمٌ শব্দটি غَنِيْمَةٌ থেকে উদগত। এর প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা শক্তি নেই। এজন্যে এগুলো প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীর জন্যে গনিমতস্বরূপ। তাই একে غَنَمٌ বলা হয়। গনম (غَنَمٌ) শব্দটি اِسْمُ جِنْس যা নর ও মাদী উভয়কে শামিল করে।

গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, বকরির নিসাব হলো চল্লিশটি বকরি। সুতরাং চল্লিশের কমে কোনো জাকাত নেই। চল্লিশটি বকরিতে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। বকরিতে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পূর্ণ বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় মুক্ত মাঠে চরে খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়া এবং এ জাতীয় বকরির উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। একশ বিশ বকরি পর্যন্ত এই একটি বকরি ফরজ হবে। একশ বিশের থেকে একটি বেশি হলে দুটি বকরি ওয়াজিব হবে– দু'শ পর্যন্ত। যখন দু'শতের উপর একটি বকরি বেশি হবে, তখন তিনটি বকরি ওয়াজিব হবে– তিনশ পর্যন্ত। চারশ হলে চারটি বকরি ওয়াজিব হবে। তারপর প্রতি শতকে একটি করে বকরি ফরজ হবে। পাঁচশতের মধ্যে পাঁচটি বকরি এবং ছয়শতের উপর ছয়টি বকরি ওয়াজিব হবে। দলিল হলো, বকরির জাকাতের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এ ব্যাখ্যাই হুবহু রাসূল ﷺ-এর জাকাতের বিধান সংক্রান্ত ফরমানে বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর নির্দেশেও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একটি ফরমান যা হযরত আনাস (রা.)-এর নামে প্রেরিত হয়েছিল, তা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে–

وَفِىْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِىْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَمَا زَادَتْ عَلٰى مِائَتَيْنِ اِلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلَّا اَنْ يَّشَاءُ رَبُّهَا .

দ্বিতীয় দলিল : দ্বিতীয় দলিল হলো, বকরির জাকাতের যে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম এবং ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত।

وَالضَّانُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ لِاَنَّ لَفْظَةَ الْغَنَمِ شَامِلَةٌ لِلْكُلِّ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِهِ وَيُؤْخَذُ الثَّنِىُّ فِىْ زَكَاتِهَا وَلَا يُؤْخَذُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ اِلَّا فِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَالثَّنِىُّ مِنْهَا مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَالْجَذَعُ مَا اَتٰى عَلَيْهِ اَكْثَرُهَا وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَهُوَ قَوْلُهُمَا اَنَّهُ يُؤْخَذُ الْجَذَعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا حَقُّنَا الْجَذَعَةُ وَالثَّنِىُّ وَلِاَنَّهُ يَتَادّٰى بِهِ الْاُضْحِيَّةُ فَكَذَا الزَّكٰوةُ وَجْهُ الظَّاهِرِ حَدِيْثُ عَلِىٍّ مَوْقُوْفًا وَمَرْفُوْعًا لَا يُؤْخَذُ فِى الزَّكٰوةِ اِلَّا الثَّنِىُّ فَصَاعِدًا وَلِاَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْوَسْطُ وَهٰذَا مِنَ الصِّغَارِ وَلِهٰذَا لَا يَجُوْزُ فِيْهَا الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ وَ جَوَازُ التَّضْحِيَةِ بِهِ عُرِفَ نَصًّا وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِىَ الْجَذَعَةُ مِنَ الْاِبِلِ وَيُؤْخَذُ فِىْ زَكٰوةِ الْغَنَمِ الذُّكُوْرُ وَالْاُنَاثُ لِاَنَّ اِسْمَ الشَّاةِ يَنْتَظِمُهُمَا وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : ভেড়া ও ছাগল উভয়টি [নিসাবের ক্ষেত্রে] সমান। কেননা غَنَمٌ শব্দটি দুটিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর نَصّ বা শরিয়তের বাণীতে غَنَمٌ শব্দটি এসেছে। বকরির জাকাতে ছানী [পূর্ণ এক বছরের বাচ্চা] গ্রহণ করা হবে। ভেড়ার ক্ষেত্রে জাযা' (جَذَع) গ্রহণ করা হবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান ইবনে জিয়াদ কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত মতে গ্রহণ করা হবে। বকরির মধ্যে ছানী বলা হয় যার এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আর জাযা' (جَذَع) বলা হয় যার বয়স ছয় মাসের উর্ধ্বে হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে এবং সাহেবাইনেরও একই মত যে, জাযা' (جَذَع) গ্রহণ করা হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– اِنَّمَا حَقُّنَا الْجَذَعَةُ وَالثَّنِىُّ 'আমাদের হক হলো জাযা' এবং ছানী'। তা ছাড়া জাযা'র দ্বারা কুরবানি আদায় হয়ে যায়। সুতরাং জাকাতও আদায় হবে। জাহিরী রেওয়ায়েতের প্রমাণ হলো, হযরত আলী (রা.) থেকে মাওকূফ ও মরফূ' উভয়ভাবে রেওয়ায়েত আছে– لَا يُؤْخَذُ فِى الزَّكٰوةِ اِلَّا الثَّنِىُّ فَصَاعِدًا 'জাকাতের ক্ষেত্রে এক বছরের এবং তদূর্ধ্বেরই কেবল গ্রহণ করা হবে।' তা ছাড়া জাকাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো মাঝারি ধরনের পশু। জাযা' তো ছোট'র মধ্যেই গণ্য। এজন্য তো জাযা' ছাগলের মধ্য হতে জায়েজ হয় না। তবে জাযা' দ্বারা কুরবানি জায়েজ হওয়ার বিষয়টি নস দ্বারা জানা গেছে। আর উপরের বর্ণিত হাদীসে جَذَعَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উটের জাযা'। আর বকরির জাকাতের ক্ষেত্রে নর ও মাদী উভয়ই গ্রহণ করা জায়েজ আছে। কেননা শাত (شَاةٌ) শব্দ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর রাসূল ﷺ বলেছেন– فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ 'চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগল'। আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ضَانٌ অর্থ–ভেড়া, দুম্বা। আর مَعْزٌ অর্থ–ছাগল। ثَنِىٌّ ঐ শাবক যা এক বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে।

ইনায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ثَنِىٌّ ঐ বাচ্চাকে বলা হয় যার সামনের দাঁত পড়ে গেছে। অতএব উটের ক্ষেত্রে ثَنِىٌّ বলা হবে তাকে যার বয়স পাঁচ পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পদার্পণ করেছে। গরু এবং ছাগলের ক্ষেত্রে ثَنِىٌّ বলা হয় তাকে যার বয়স দ্বিতীয় বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার ক্ষেত্রে ثَنِىٌّ বলা হয় তাকে যার বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছর আরম্ভ হয়েছে। এটি অভিধানবেত্তাদের ব্যাখ্যা। তবে ফকীহদের মতে, নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা সেটিই যেটি হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

جَذَعٌ এমন শাবককে বলে যার উপর বছরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। যেমন– আবূ আলী দাককাক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, جَذَع বলা হয় তাকে যার বয়স নয় মাস হয়েছে। আবূ আবদুল্লাহ (র.) বলেছেন, جَذَع বলা হয় এমন শাবককে যা আট মাসে পদার্পণ করেছে।

শরহে আকতা (شَرْحِ اَقْطَعْ) নামক ভাষ্যগ্রন্থে আছে যে, ছাগলের جِذْعٌ হলো, যার বয়স পূর্ণ ছয় মাস হয়েছে। আল্লামা আজহারী (র.) হতে বর্ণিত আছে, ছাগলের جِذْعٌ হলো যার বয়স ছয় মাস হয়েছে। আর ভেড়া এবং দুম্বার جِذْعٌ হলো যার বয়স আট মাস হয়েছে। -[ইনায়া]

সারকথা হলো- ভেড়া, দুম্বা, বকরি এবং নর-মাদী জাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে সবই সমান- অর্থাৎ যদি ভেড়া, দুম্বা ও ছাগল মিশ্রিত থাকে এবং নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে এতে জাকাত ফরজ হবে। কেননা غَنَمٌ [গনম] শব্দটি ভেড়া, দুম্বা এবং ছাগলকে শামিল করে। যেমন اِسْمُ جِنْسٍ তার নিজস্ব اَنْوَاعٌ -কে শামিল করে। আর নসের মধ্যে غَنَمٌ [গনম] শব্দ উদ্বৃত হয়েছে। এ জন্য জাকাতের নিসাবে সবগুলোই ধর্তব্য হবে। আর نَصٌّ বা শরিয়তের বর্ণনা দ্বারা নিম্নোক্ত হাদীস বুঝানো হয়েছে- فِىْ اَرْبَعِيْنَ مِنَ الْغَنَمِ شَاةٌ [চল্লিশটি ছাগলে একটি বকরি ওয়াজিব]।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ছাগলের জাকাতে ثَنِىٌّ গ্রহণ করা হবে। চাই ثَنِىٌّ ভেড়ার থেকে হোক বা ছাগলের থেকে হোক। ভেড়ার جذعة গ্রহণ করা হবে না। এটিই জাহির রেওয়ায়েত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, ভেড়া ও দুম্বার জাযা' গ্রহণ করা হবে এবং এটিই সাহেবাইনের অভিমত। সাহেবাইনের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন-আমাদের অধিকার হলো, জাযা' (جِذْعَة) এবং ছানী (ثنى)-তে। এ রেওয়ায়েত যদিও অপ্রসিদ্ধ, কিন্তু নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত এর সমর্থনে রয়েছে-

اَخْرَجَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَاَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهٖ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ جَاءَنِىْ رَجُلَانِ مُرْتَدِفَانِ فَقَالَا اِنَّا رَسُوْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنَا اِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ قُلْتُ وَمَا هِىَ قَالَا شَاةٌ قَالَ فَعَمِدْتُّ اِلٰى شَاةٍ مُمْتَلِئَةٍ مَخَاضًا وَشَحْمًا فَقَالَا هٰذِهٖ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَاْخُذَ شَافِعًا وَالشَّافِعُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا وَلَدُهَا قُلْتُ فَاَىُّ شَىْءٍ تَاْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً اَوْ ثَنِيَّةً فَاَخْرَجْتُ اِلَيْهِمَا عَنَاقًا فَتَنَاوَلَاهَا .

অর্থ- ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম আহমদ (র.) স্বীয় মুসনাদে হযরত মিসআর (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আগে-পিছে হয়ে দু'ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর দূত। আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠানো হয়েছে এজন্য যে, আপনি স্বীয় বকরির জাকাত আমাদেরকে দিয়ে দেবেন। মিসআর (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম জাকাত কী জিনিস? [অর্থাৎ কিসের দ্বারা তা আদায় করবো]। তারা উত্তর দিলেন, বকরি। মিসআর (রা.) বলেন, আমি একটি গর্ভবতী মোটা তাজা বকরি দেওয়ার ইচ্ছা করলাম। তারা বললেন, এটা তো শাফি' (شَافِعٌ)। আর রাসূল (সা.) আমাদের শাফি' (شَافِعٌ) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর শাফি' (شَافِعٌ) বলা হয়, ঐ পশুকে যার পেটে বাচ্চা আছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আপনারা কি গ্রহণ করবেন? তাঁরা বললেন, আনাক (عَنَاق) [বকরির বাচ্চা যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়নি] চাই জাযা' হোক বা ছানী হোক। অতঃপর আমি عَنَاق [আনাক] বের করে দিলাম তাঁরা তা গ্রহণ করলেন। [ফতহুল কাদীর] উক্ত রেওয়ায়েতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় হয় যে, বকরির জাকাতে জাযা (جِذْعَه) গ্রহণ করা জায়েজ আছে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, জাযা'র কুরবানি জায়েজ আছে। অতএব এর দ্বারা জাকাত দেওয়াও জায়েজ হবে। জাহিরুর রেওয়ায়েতের কারণ হলো, হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস যা মরফূ' এবং মওকূফ উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ইবারত হলো- لَا يُؤْخَذُ فِى الزَّكٰوةِ اِلَّا الثَّنِىُّ فَصَاعِدًا "যাকাতে ثَنِىٌّ [ছানী] বা তার থেকে অধিক বয়সের পশু গ্রহণ করা হবে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাযা' এর বয়স ثَنِىٌّ [ছানী] হতে কম। এজন্য তা [জাযা'] গ্রহণ করা হবে না।

তৃতীয় দলিল হলো, জাকাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে মধ্যম পর্যায়ের পশু। আর জাযা' ছোট হওয়ার কারণে ক্ষুদ্র পর্যায়ের। এ জন্য জাযা' জায়েজ হবে না। এ কারণে বকরির জাযা' সর্বসম্মতিক্রমে জাকাতে গ্রহণ করা জায়েজ নেই। তবে ভেড়ার জাযা' কুরবানির মধ্যে জায়েজ হওয়া নস (نَصٌّ) তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ইরশাদ হয়েছে- نِعْمَتِ الْاُضْحِيَّةُ الْجِذْعُ مِنَ الضَّاْنِ 'ভেড়ার জাযা' [দ্বারা কুরবানি দেওয়া] কতই না উত্তম কুরবানি'। অতএব জাযা'র কুরবানির جَوَازٌ তথা বৈধতার বিষয়টি জাকাতের দিকে সম্প্রসারিত হবে না। আর জাকাত কুরবানির সামর্থকও নয় যে, জাকাতকে কুরবানির উপর কিয়াস করা যাবে।

জবাব : সাহেবাইন কর্তৃক পেশকৃত হাদীস اِنَّمَا حَقُّنَا الْجِذْعَةُ وَالثَّنِىُّ-এর জবাব হলো, এ হাদীসে جَذَعَةٌ দ্বারা উট উদ্দেশ্য, ভেড়া নয়।

قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ الخ : ছাগল, ভেড়া এবং দুম্বার জাকাতে নর পশুকে গ্রহণ করা জায়েজ আছে। তেমনিভাবে মাদী পশুকেও গ্রহণ করা জায়েজ আছে। দলিল হলো রাসূল ﷺ বলেছেন- فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ এখানে লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসে উল্লিখিত شَاةٌ শব্দটি নর এবং মাদী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই জাকাতে বকরির নর ও মাদী উভয়ই দেওয়া জায়েজ আছে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فَصْلٌ فِى الْخَيْلِ : اِذَا كَانَتِ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُوْرًا وَاُنَاثًا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَعْطٰى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِيْنَارًا وَاِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَاَعْطٰى عَنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رحـ) وَقَالَا لَا زَكٰوةَ فِى الْخَيْلِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهٖ وَلَا فِىْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ وَلَهٗ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَتَاوِيْلُ مَا رَوَيَاهُ فَرَسُ الْغَازِىْ وَهُوَ الْمَنْقُوْلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) وَالتَّخْيِيْرُ بَيْنَ الدِّيْنَارِ وَالتَّقْوِيْمِ مَاثُوْرٌ عَنْ عُمَرَ (رضـ) وَلَيْسَ فِىْ ذُكُوْرِهَا مُنْفَرِدَةً زَكٰوةٌ لِاَنَّهَا لَاتَتَنَاسَلُ وَكَذَا فِى الْاُنَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِىْ رِوَايَةٍ وَعَنْهُ الْوُجُوْبُ فِيْهَا لِاَنَّهَا تَتَنَاسَلُ بِالْفَحْلِ الْمُسْتَعَارِ بِخِلَافِ الذُّكُوْرِ وَعَنْهُ اَنَّهَا تَجِبُ فِى الذُّكُوْرِ الْمُنْفَرِدَةِ اَيْضًا وَلَا شَىْءَ فِى الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهِمَا شَىْءٌ وَالْمَقَادِيْرُ تَثْبُتُ سِمَاعًا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلتِّجَارَةِ لِاَنَّ الزَّكٰوةَ حِيْنَئِذٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِيَّةِ كَسَائِرِ اَمْوَالِ التِّجَارَةِ ـ

অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার জাকাত

অনুবাদ : ঘোড়া যদি মুক্ত মাঠে বিচরণকারী হয় এবং নর ও মাদী উভয় প্রকার ঘোড়াই তাতে মিশ্রিত থাকে, তাহলে ঘোড়ার মালিকের এখতিয়ার থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে ঘোড়া প্রতি এক দীনার প্রদান করবেন ইচ্ছা করলে ঘোড়াগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দুইশত দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম প্রদান করবেন। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। ইমাম জুফার (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। সাহেবাইন (র.) বলেন, ঘোড়ার কোনো জাকাতই নেই। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهٖ وَلَا فِىْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ رَوَاهُ السُّنَّةُ "নিজ গোলাম এবং নিজ অশ্বের ক্ষেত্রে মুসলমানের উপর কোনো জাকাত নেই।" ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো নবীজীর এই হাদীস– فِىْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ـ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ "মুক্তভাবে বিচরণকারী প্রতিটি ঘোড়ায় এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে।" আর সাহেবাইন (র.) যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো, মুজাহিদের ব্যবহার করার ঘোড়া। জায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) থেকে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। দীনার প্রদান কিংবা মূল্য নির্ধারণের মাঝে এখতিয়ার দেওয়ার বিষয়টি হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। শুধু পুরুষ অশ্বের ক্ষেত্রে জাকাত নেই। কেননা তার বংশ বৃদ্ধি হয় না। অনুরূপভাবে শুধু স্ত্রী অশ্বের ক্ষেত্রেও জাকাত নেই। এটা এক বর্ণনা মোতাবেক। আর আবূ হানীফা (র.)-এর অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক তাতে [স্ত্রী অশ্বে] জাকাত ওয়াজিব। কেননা ধার করা পুরুষ অশ্ব দ্বারা তার বংশ বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু পুরুষ অশ্বের বিষয়টি এর বিপরীত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য বর্ণনা অনুযায়ী আলাদা পুরুষ অশ্বের ক্ষেত্রেও জাকাত ওয়াজিব হবে। খচ্চর ও গর্দভের ক্ষেত্রে কোনো জাকাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهِمَا شَىْءٌ "এ দু'টি সম্পর্কে আমার উপর কোনো বিধান নাজিল হয়নি।" আর জাকাতের পরিমাণসমূহ নির্ধারণ হয় شَارِعْ তথা শরিয়তবেত্তার নিকট থেকে শ্রবণের দ্বারা। তবে শর্ত হলো, সেগুলো ব্যবসার মাল হতে হবে। [তখন জাকাত ফরজ হবে।] কারণ, তখন জাকাত সম্পর্কিত হবে মূল্যের দিক থেকে। যেমন অন্যান্য ব্যবসায়িক সম্পদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খুল আদব মাওলানা ইজাজ আলী (র.) শরহে নিকায়ায় ১৫ নং পৃষ্ঠার ৫নং টিকায় লিখেছেন যে, ঘোড়া প্রথমত দু'প্রকার [১] আলূফা (عَلُوفَة) অর্থাৎ যে ঘোড়া নিজ গৃহে রেখে আহার্য দান করে লালন করা হয় [২] সায়েমা (سَائِمَة) অর্থাৎ যে ঘোড়া পূর্ণ বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় নিজে নিজে মাঠে-ময়দানে চরে খেয়ে জীবন ধারণ করে।

আলূফা (عَلُوفَة) আবার দু'প্রকার- [১] হয়তো তা নিজস্ব কাজ যেমন আরোহণ, বোঝা বহন অথবা জিহাদে ব্যবহারের জন্য হবে। [২] অথবা তা ব্যবসার জন্য হবে।

প্রথম সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ফরজ হবে না। কেননা জাকাতের জন্য মাল বর্ধনশীল হওয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া শর্ত। আর প্রথম প্রকারের ঘোড়ায় উক্ত শর্তদ্বয় বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয় সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ফরজ হবে। কেননা এ [ব্যবসার] মাল বর্ধনশীল এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কেননা একে ব্যবসার জন্য নির্ধারণ করাটাই বর্ধনশীল এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার দলিল।

পক্ষান্তরে যদি তা সায়েমা (سَائِمَة) হয় তাহলে আবার দু'প্রকার- [১] হয়তো একে আরোহণ, বোঝা বহন এবং জিহাদের জন্য মুক্ত ময়দানে চরানো হবে, [২] অথবা তা ব্যবসার জন্য হবে। প্রথম সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর দ্বিতীয় সুরতে সকলের মতে জাকাত ফরজ হবে। আর যদি ঘোড়া দুগ্ধ গ্রহণ এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য লালন করা হয় তাহলে তা আবার দু'প্রকার- [১] নর ও মাদী [ঘোড়া] উভয়ই একত্রে মিশ্রিত থাকবে। [২] অথবা নর ও মাদী উভয়ে একত্রে মিশ্রিত থাকবে না।

প্রথম প্রকারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জাকাত ওয়াজিব হবে এবং ঘোড়ার মালিকের এখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে ঘোড়া প্রতি এক দীনার দিতে পারবে; কিংবা ঘোড়াগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দু'শত দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম প্রদান করতে পারবে। দ্বিতীয় প্রকারের ঘোড়াগুলো আবার দু'প্রকার- [১] হয়তো শুধু মাদী ঘোড়া হবে, [২] অথবা শুধু নর ঘোড়া হবে। শেষোক্ত দু'প্রকারের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে দুটি রেওয়ায়েত আছে। এক রেওয়ায়েত মোতাবেক জাকাত ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত মোতাবেক জাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে শুধু মাদী ঘোড়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত বর্ণনা মোতাবেক জাকাত ওয়াজিব হবে । কেননা এ সুরতে অন্যের থেকে নর ঘোড়া নিয়ে বংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব। পক্ষান্তরে শুধু নর ঘোড়ার ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব না হওয়াই رَاجِح এবং প্রবল। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ করা হয় না এবং এর থেকে বংশ বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়। এজন্য জাকাত ওয়াজিব না হওয়াই যুক্তিসম্মত কথা। সাহেবাইন (রা.) বলেছেন, ঘোড়ায় জাকাত ওয়াজিব নয়; যে ধরনের ঘোড়াই হোক না কেন। চাই আলূফা (عَلُوفَة) হোক বা সায়েমা (سَائِمَة) হোক। নর ও মাদী উভয় সংমিশ্রিত হোক অথবা উভয় মিশ্রিত না হোক, জিহাদ ও ব্যবসার জন্য হোক বা ঘোড়ার বংশ বৃদ্ধি, আরোহণ এবং বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও এটাই।

হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মোতাবেক সারকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম জুফার (র.)-এর মতে ঘোড়ায় নিম্নোক্ত শর্তের ভিত্তিতে জাকাত ফরজ। [১] মুক্ত মাঠে নিজে নিজে বিচরণকারী হওয়া; [২] নর ও মাদী উভয় মিশ্রিত হওয়া, [৩] শুধু নর বা শুধু মাদী না হওয়া। এহেন অবস্থায় ঘোড়ার মালিকের এখতিয়ার আছে, ঘোড়া প্রতি এক দীনার প্রদান করবে অথবা ঘোড়াগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দু'শত দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম দিয়ে দেবে।

প্রশ্ন : বাকি রইলো এ কথা যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঘোড়ার নিসাবের পারিমাণ কি?

উত্তর : বিশুদ্ধ অভিমত হলো, ঘোড়ার নিসাব নির্ধারিত নেই। একটি ঘোড়া হলেও জাকাত ফরজ হবে। কারো কারো মতে, তিনটি ঘোড়া জাকাতের নিসাব। কারো কারো মতে, পাঁচটি ঘোড়া জাকাতের নিসাব। কারো কারো মতে, দুটি নর হওয়া এবং দুটি মাদী হওয়া জাকাতের নিসাব। সাহেবাইন, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে ঘোড়ায় জাকাত ফরজ নয়।

সাহেবাইনের দলিল : সাহেবাইনের দলিল হলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهٖ وَلَا فِيْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ.

উক্ত হাদীসটি শায়খুল আদব আল্লামা ইজাজ আলী (র.) তাঁর প্রণীত গ্রন্থ শরহে নিকায়ায় (شَرْحُ نِقَايَةٍ) সিহাহ সিত্তা হতে উদ্ধৃত করেছেন। অনুরূপভাবে তিরমিযী শরীফ এবং আবূ দাউদ শরীফে হযরত আলী (রা.) হতে এ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ 'রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের থেকে ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের জাকাত মাফ করে দিয়েছি'। ইমাম বায়হাক্বী (র.) নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكَسْعَةِ وَالنَّخَّةِ وَالْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالنَّخَّةُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ الرَّقِيْقُ وَالْكَسْعَةُ الْحَمِيْرُ.

অর্থ–হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের থেকে ঘোড়া, ক্রীতদাস এবং গাধার জাকাত মাফ করে দিয়েছি। جَبْهَةٌ [জাবাহাতুন]-এর অর্থ ঘোড়া نَخَّةٌ এবং نُخَّةٌ এর অর্থ– গোলাম এবং كَسْعَةٌ-এর অর্থ– গাধা। উক্ত তিনটি হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, ঘোড়ার মধ্যে জাকাত ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে, দারা কুতনীর এই রেওয়ায়েত– فِيْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) কর্তৃক নিম্নে সংকলিত হাদীসটিও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِيْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هِيَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ اَجْرٌ وَ رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَ رَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَنِوَاءً فَهِيَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَمِيْرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهَا اِلَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

অর্থ– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। এক শ্রেণীর লোকের জন্য তা ছওয়াবের বিষয়। আরেক শ্রেণীর লোকের জন্য ছওয়াবেরও নয় পাপেরও নয়। অন্য এক শ্রেণীর লোকের জন্য তা বিপদের কারণ। ছওয়াব হলো ঐ শ্রেণীর লোকের জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য তা সদা প্রস্তুত করে রেখেছেন। এটি তার জন্য ছওয়াবের। আর যে ব্যক্তি তা সম্পদ প্রকাশ করা এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য রেখেছে এবং ঘোড়ার গর্দান এবং পিঠে আল্লাহর হককে ভুলেনি; তা তার জন্য আবরণ ও ঢালস্বরূপ। আর যে ব্যক্তি একে গর্ব-অহংকারের জন্য বেঁধে রেখেছে তা তার জন্য পাপস্বরূপ। রাসূল ﷺ-কে গাধার জাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি উত্তর দিয়েছেন, এ সম্পর্কে আমার নিকট– فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الخ ব্যতীত অন্য কোনো বিধান নাজিল হয়নি।

উক্ত হাদীসে وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ رِقَابِهَا কথাটি এসেছে। আর এতো স্পষ্ট যে, ঘোড়ার উপর আল্লাহর হক জাকাত ব্যতীত আর কি হতে পারে? অতএব এ রেওয়ায়েত দ্বারা ঘোড়ার উপর জাকাত ফরজ হওয়া সাব্যস্ত হলো। হিদায়া গ্রন্থকারের পক্ষ হতে সাহেবাইনের পেশকৃত হাদীস– لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهٖ وَلَا فِيْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ-এর জবাব হলো, এ হাদীসে ঘোড়ার দ্বারা মুজাহিদের ঘোড়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, হাদীসের মর্ম হচ্ছে, মুজাহিদ মুসলমানদের ঘোড়ার উপর জাকাত ফরজ হবে না। এ ব্যাখ্যা জায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, মারওয়ান-এর যুগে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, ঘোড়ায় জাকাত ফরজ কি না? এতদ বিষয়ে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হলো। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন– لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِيْ عَبْدِهٖ وَلَا فِيْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ তখন মারওয়ান হযরত জায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন, "হে আবূ সাঈদ, আপনি কি বলেন?" হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, মারওয়ানের উপর আফসোস, আমি তো তার নিকট রাসূল ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি। আর সে বলছে– مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ "হে আবূ সাঈদ! আপনি কি বলেন"? এ কথা শ্রবণ করে জায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বললেন– রাসূল ﷺ সত্য বলেছেন। তবে এখানে অর্থাৎ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে ঘোড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য মুজাহিদের ঘোড়া। আর যে ঘোড়া বংশ বৃদ্ধির জন্য লালন করা হয় তাতে জাকাত ফরজ হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, কি পরিমাণ জাকাত ফরজ হবে? বললেন– فِيْ كُلِّ فَرَسٍ

دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "প্রতি ঘোড়াতে একটি দীনার প্রদান করবে অথবা ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দু'শত দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম প্রদান করবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উক্ত এখতিয়ার হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন বর্ণিত আছে –

فَاِنَّهُ كَتَبَ اِلٰى اَبِىْ عُبَيْدَةَ فِىْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ خَيِّرْ اَرْبَابَهَا اَنْ اَدُّوْا مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِيْنَارًا وَاِلَّا فَقَوِّمْهَا وَخُذْ مِنْ كُلِّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ .

অর্থ–হযরত ওমর (রা.) ঘোড়ার জাকাত সম্পর্কে আবূ উবায়দা ইবনে জাররা (রা.)-এর প্রতি লিখলেন যে, তিনি ঘোড়ার জাকাতের ব্যাপারে মালিকদের এখতিয়ার দিয়েছেন, প্রতি ঘোড়ায় এক দীনার প্রদান করবে। অন্যথায় ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দু'শত দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম আদায় করবে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের ইমাম হযরত আবূ হানীফা (র.) -এর মতই অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِىْ ذُكُوْرِهَا الخ : ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শুধু পুরুষ অশ্বের মধ্যে জাকাত ফরজ হবে না। দলিল হলো, গবাদি পশুর ক্ষেত্রে জাকাত ফরজ হয় বংশ বৃদ্ধির কারণে। আর শুধুমাত্র পুরুষ অশ্বের দ্বারাই বংশ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই শুধুমাত্র পুরুষ অশ্বে জাকাত ফরজ হবে না। হাঁ যদি এর সাথে স্ত্রী অশ্বও থাকে তাহলে জাকাত ফরজ হবে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো– শুধুমাত্র পুরুষ উট, পুরুষ গরু ও পুরুষ ছাগলের দ্বারাও বংশ বৃদ্ধি সম্ভব নয়, এতৎসত্ত্বেও এগুলোতে জাকাত ফরজ হয় কেন?

উত্তর : জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য মাল বৃদ্ধিযোগ্য হওয়া শর্ত। অশ্বের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হওয়াটা শুধুমাত্র বংশ বৃদ্ধির দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর শুধু পুরুষ অশ্বের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে স্ত্রী অশ্ব না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ অশ্বের মধ্যে বৃদ্ধি হবে না। অতএব বৃদ্ধি হওয়ার শর্ত না পাওয়ার কারণে জাকাতও ওয়াজিব হবে না।

আর উষ্ট্রী, গরু এবং ছাগলের ক্ষেত্রে যেমন বংশ বৃদ্ধি দ্বারা বৃদ্ধি হওয়া সাব্যস্ত হয়, অনুরূপভাবে এর গোশত এবং পশমের দ্বারাও বৃদ্ধি হওয়া সাব্যস্ত হয়। অতএব পুরুষ উষ্ট্রী, গরু এবং ছাগলের ক্ষেত্রে যদিও বংশ বৃদ্ধি দ্বারা বৃদ্ধি সম্ভব হয় না, কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রে গোশত এবং পশমের দ্বারা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এ কারণে এগুলোর শুধু পুরুষের ক্ষেত্রেও জাকাত ফরজ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, শুধু পুরুষ অশ্বের ক্ষেত্রেও জাকাত ফরজ হবে। এর দলিল হলো, গবাদি অশ্ব অন্যান্য গবাদি পশুর নজীর স্বরূপ। অতএব যেভাবে অন্যান্য পুরুষ গবাদি পশুর ক্ষেত্রে মুক্ত মাঠে বিচরণকারী হওয়ার কারণে জাকাত ওয়াজিব হয়, অনুরূপভাবে পুরুষ অশ্বের মধ্যেও মুক্ত মাঠে খাদ্য গ্রহণকারী হওয়ার কারণে জাকাত ওয়াজিব হবে।

সারকথা হলো, পুরুষ অশ্বের জাকাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মোতাবেক জাকাত ওয়াজিব হবে। অন্য বর্ণনা মোতাবেক জাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে শেষোক্ত বর্ণনাটিই অগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে মাদী অশ্বের ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা আছে। এক বর্ণনা মোতাবেক জাকাত ওয়াজিব হবে না। অন্য বর্ণনা মোতাবেক জাকাত ওয়াজিব হবে।

প্রথম বর্ণনার দলিল হলো, শুধু স্ত্রী অশ্বের ক্ষেত্রে তাওয়ালুদ (تَوَالُدٌ) ও তানাসুল (تَنَاسُلٌ) বা বংশ বৃদ্ধির দ্বারা نَمَاءٌ তথা বর্ধনশীল হওয়া প্রমাণিত হয় না। অতএব এতেও জাকাত ফরজ হবে না।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হলো, যদি কোনো ব্যক্তির মালিকানায় শুধু স্ত্রী অশ্ব থাকে তাহলে এতে তাওয়ালুদ (تَوَالُدٌ) এবং তানাসুল (تَنَاسُلٌ) সম্ভব। তা এভাবে যে, প্রজননের জন্য অন্যের পুরুষ অশ্ব ধার নেওয়া হবে। অতএব যখন تَنَاسُلٌ সম্ভব তখন এর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় বর্ধনশীলতা পাওয়ার কারণে স্ত্রী অশ্বের ক্ষেত্রে জাকাত ফরজ হবে। শুধু স্ত্রী অশ্বের ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার রেওয়ায়েতটি অগ্রগণ্য।

গাধা এবং খচ্চরে জাকাত ফরজ নয়। দলিল রাসূল ﷺ -এর ফরমান– لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهِمَا شَيْءٌ "এতদুভয় সম্পর্কে আমার উপর কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি।" আর জাকাতের পরিমাণ নকলী (نَقْلِىٌّ) দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধির এতে কোনো বক্তব্য আসেনি। অতএব এতে জাকাত ফরজ হবে না। হ্যাঁ যদি গাধা এবং খচ্চর ব্যবসার জন্য হয়, তাহলে তাতে বাণিজ্যের কারণে জাকাত ফরজ হবে। কেননা তখন এর মালিয়তের সাথে জাকাতের সম্পর্ক হবে। যেমন অন্যান্য ব্যবসায়িক সম্পদের ক্ষেত্রে মালিয়তের সাথে জাকাতের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

فَصْلٌ : وَلَيْسَ فِى الْفُصْلَانِ وَالْعَجَاجِيْلِ وَالْحُمْلَانِ صَدَقَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَعَهَا كِبَارٌ وَهٰذَا اٰخِرُ اَقْوَالِهٖ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَكَانَ يَقُوْلُ اَوَّلًا يَجِبُ فِيْهَا مَا يَجِبُ فِى الْمَسَانِّ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَمَالِكٍ (رحـ) ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ فِيْهَا وَاحِدٌ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ يُوْسُفَ وَالشَّافِعِىِّ (رحـ) وَجْهُ قَوْلِهِ الْاَوَّلِ اَنَّ الْاِسْمَ الْمَذْكُوْرَ فِى الْخِطَابِ يَنْتَظِمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ وَوَجْهُ الثَّانِىْ تَحْقِيْقُ النَّظْرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَمَا يَجِبُ فِى الْمَهَازِيْلِ وَاحِدٌ مِنْهَا وَوَجْهُ الْاَخِيْرِ اَنَّ الْمَقَادِيْرَ لَا يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ فَاِذَا امْتَنَعَ اِيْجَابُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ اِمْتَنَعَ اَصْلًا وَاِذَا كَانَ فِيْهَا وَاحِدَةٌ مِنَ الْمَسَانِّ جُعِلَ الْكُلُّ تَبْعًا لَهٗ فِىْ اِنْعِقَادِهَا نِصَابًا دُوْنَ تَاْدِيَةِ الزَّكٰوةِ ثُمَّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يَجِبُ فِىْ مَا دُوْنَ الْاَرْبَعِيْنَ مِنَ الْحُمْلَانِ وَفِيْمَا دُوْنَ الثَّلَاثِيْنَ مِنَ الْعَجَاجِيْلِ وَيَجِبُ فِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْفُصْلَانِ وَاحِدٌ ثُمَّ لَا يَجِبُ شَىْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ مَبْلَغًا لَوْ كَانَتْ مَسَانَّ يُثَنّٰى الْوَاجِبُ ثُمَّ لَا يَجِبُ شَىْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ مَبْلَغًا لَوْ كَانَتْ مَسَانَّ يُثَلَّثُ الْوَاجِبُ وَلَا يَجِبُ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ فِىْ رِوَايَةٍ وَعَنْهُ اَنَّهٗ يَجِبُ فِى الْخَمْسِ خُمُسُ فَصِيْلٍ وَفِى الْعَشْرِ خُمُسَا فَصِيْلٍ عَلٰى هٰذَا الْاِعْتِبَارِ وَعَنْهُ اَنَّهٗ يُنْظَرُ اِلٰى قِيْمَةِ خُمُسِ فَصِيْلٍ فِى الْخَمْسِ وَاِلٰى قِيْمَةِ شَاةٍ وَسَطٍ فَيَجِبُ اَقَلُّهُمَا وَفِى الْعَشْرِ اِلٰى قِيْمَةِ شَاتَيْنِ وَاِلٰى قِيْمَةِ خُمُسَىْ فَصِيْلٍ عَلٰى هٰذَا الْاِعْتِبَارِ -

অনুচ্ছেদ : যে সব পশুর ক্ষেত্রে জাকাত নেই

অনুবাদ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উট-শাবক, গো-শাবক এবং মেষ-শাবকের ক্ষেত্রে জাকাত নেই। তবে যদি সেগুলোর সাথে বয়স্ক থাকে তখন সেগুলোর تَابِعْ হিসেবে শাবকগুলোর উপরও জাকাত ফরজ হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ অভিমত এবং এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এরও অভিমত। প্রথমে তিনি বলতেন যে, বয়স্কদের উপর যা ওয়াজিব হয় ছোটগুলোর উপরও তা-ই ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম যুফার (র.) এবং মালিক (র.)-এর মাজহাব। এরপর এ অভিমত প্রত্যাহার করে তিনি বলেছেন যে, শাবকগুলোর মধ্যে তাদেরই হতে একটি ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। তার প্রথম মতের দলিল এই যে, [শরিয়তের] নির্দেশে উল্লিখিত নাম ছোট-বড় উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয় মতের দলিল হলো, উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা নিশ্চিত করা। যেমন— শুধু শীর্ণ পশুর ক্ষেত্রে তা থেকে একটি ওয়াজিব হয়।

শেষ মতের দলিল হলো, পরিমাণসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো দখল নেই। সুতরাং শরিয়ত প্রবর্তিত পরিমাণ ওয়াজিব করা যখন সম্ভব নয়, তখন সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ছোটগুলোর সাথে একটিও যদি বয়স্ক থাকে তবে নিসাব পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সবগুলোকে বয়স্কটির অনুবর্তী (تَابِعٌ) ধরা হবে। কিন্তু জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অনুবর্তী ধরা হবে না [বরং বয়স্কই আদায় করতে হবে]। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, মেষ-শাবকের ক্ষেত্রে চল্লিশটির নীচে এবং গো-শাবকের ক্ষেত্রে ত্রিশটির নীচে জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর উট শাবকের ক্ষেত্রে পঁচিশটির জন্য একটি ওয়াজিব হবে। অতঃপর আর কিছু ওয়াজিব হবে না। যতক্ষণ না ঐ সংখ্যায় উপনীত হয়, যেখানে বয়স্ক উটের ক্ষেত্রে দুটি ওয়াজিব হয়। তারপর আর কিছু ওয়াজিব হবে না। যতক্ষণ না ঐ সংখ্যায় উপনীত হয়, যেটাতে বয়স্ক উটের ক্ষেত্রে তিনটি ওয়াজিব হয়। এক বর্ণনা মোতাবেক পঁচিশের নিম্নে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তাঁর পক্ষ হতে অন্য একটি বর্ণনা মতে পঁচিশটিতে একটি শাবকের পঞ্চমাংশ এবং দশটিতে দু'পঞ্চমাংশ এবং পরবর্তী প্রতি পাঁচে এ হিসেবে ওয়াজিব হবে। তাঁর পক্ষ হতে আরেকটি বর্ণনা হলো, পাঁচটি শাবকের ক্ষেত্রে এক শাবকের মূল্যের পঞ্চমাংশ এবং একটি মধ্যম বকরির মূল্য বিচার করা হবে। আর উভয়ের মধ্যে নিম্নতর মূল্যটি ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ দশটির ক্ষেত্রে দুটি বকরির মূল্য এবং একটি উট শাবকের দু'পঞ্চমাংশের মূল্য বিচার করা হবে। পরবর্তীতে এ হিসেবই চলতে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের অনুচ্ছেদসমূহে বড় গবাদি পশুর জাকাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ছোট গবাদি পশুর জাকাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। فُصْلَانٌ শব্দটি فَصِيْلٌ-এর বহুবচন। فَصِيْلٌ উটের এক বছরের শাবককে বলা হয়।

عَجَاجِيْلُ শব্দটি আল্লামা ইবনে হুমাম (র.)-এর মতে عَجُوْلٌ-এর বহুবচন। শরহে নিকায়া গ্রন্থে আছে মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেছেন, এটি عِجْلٌ-এর বহুবচন। عِجْلٌ বা عَجُوْلٌ-এর অর্থ এক বছরের মহিষের শাবক। حُمْلَانٌ [হা-এর উপরে পেশ, অথবা নীচে যের] حَمَلٌ-এর বহুবচন। حَمَلٌ-এর অর্থ মেষের শাবক, যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়নি।

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উট, গাভী এবং বকরির এক বছরের কম বয়সী শাবকের জাকাত ফরজ নয়। এর মর্ম হলো, শুধু শাবকে জাকাত ফরজ নয়। হ্যাঁ, যদি এ শাবকের সাথে এক বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পশু থাকে তাহলে জাকাত ফরজ হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথমে বলতেন যে, উটের শাবকে উটের জাকাত ওয়াজিব হবে, গরু এবং মহিষের শাবকে গরু ও মহিষের জাকাত ওয়াজিব হবে এবং মেষের শাবকে মেষের জাকাত ফরজ হবে। এটি ইমাম জুফার (র.) এবং ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও বটে। পরবর্তীতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) পূর্বের অভিমত প্রত্যাহার করেছেন এবং বলেছেন, ঐ শাবকগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলো থেকেই একটি ওয়াজিব হবে। যেমন– চল্লিশটি বকরি শাবকে একটি বাচ্চা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও এই অভিমত পোষণ করেন।

ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, ইমাম ত্বহাভী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর তিনটি অভিমত একই কাহিনীতে উল্লেখ রয়েছে। কাহিনীটি হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোনো ব্যক্তির নিকট বকরির এক বছরের কম চল্লিশটি শাবক আছে। এমতাবস্থায় তার উপর কি ওয়াজিব হবে? ইমাম আবূ হানীফা (র.) জবাব দিলেন, একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বললেন, مُسِنَّةٌ বকরির মূল্য অনেক সময় চল্লিশ বকরি শাবকের থেকে বেশি হয়। যদি তখন বেশি না হয় তবে পরবর্তীতে বেশি হয়। অতএব এর পরিণাম হলো, জাকাত হিসেবে পুরো মালই নিয়ে নেওয়া হবে। অথচ জাকাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা হয়। পূর্ণ মাল গ্রহণ করা হয় না। এ কথা শ্রবণে তিনি ঈষৎকাল চিন্তা করলেন এবং পূর্বের অভিমত প্রত্যাহার করে বললেন, না, ঐ শাবকগুলো থেকে একটি ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, জাকাতের ক্ষেত্রে এক বছরের কম বয়সী শাবক কি গ্রহণ করা হয়? অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য ছিল, গ্রহণ করা হয় না। আপনি কিভাবে এ কথা

বলছেন? এ কথা শুনে ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্বল্পসময় চিন্তাভাবনার পর দ্বিতীয় মত প্রত্যাহার করে বলেন, শাবকের ক্ষেত্রে জাকাতস্বরূপ কিছুই ওয়াজিব হবে না।

উক্ত অভিমত তিনটির মধ্যে ইমাম জুফার (র.) প্রথমোক্ত মতটি এখতিয়ার করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন।- [ইনায়া]

এটি ইমাম আজম (র.)-এর বিশেষ মর্যাদা যে, তিনি একই মজলিসে তিনটি মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং এর কোনোটিই পরিত্যক্ত হয়নি।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন আছে। তাহলো, এটি অবিসংবাদিত বিষয় যে, নিসাব পরিমাণ মালের উপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর জাকাত ফরজ হয়। সুতরাং فُصْلَانٌ [এক বছরের উট শাবক], عَجَاجِيْل [এক বছরের গো-শাবক] ও حُمْلَانٌ [এক বছরের বকরির শাবক] এগুলোর উপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হলে এ শাবকগুলো শাবক রইল কোথায়? এগুলো তো বড় হয়ে গেল। কেননা উক্ত (حُمْلَان . عَجَاجِيْل . فُصْلَان) শব্দগুলোর প্রয়োগ যদিও এক বছরের কম শাবকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কিন্তু বছর পূর্ণ হওয়ার পর সেগুলো তো আর এক বছরের কম বয়সের শাবক থাকলো না; বরং পূর্ণ এক বছরেরও বেশি বয়সের হয়ে গেছে, বিধায় এতে জাকাত ফরজ হওয়া উচিত।

জবাব : এর সুরত হলো এই, কোনো ব্যক্তি পঁচিশটি উট শাবক বা ত্রিশটি গো-শাবক অথবা চল্লিশটি বকরি-শাবক ক্রয় করল। এগুলো ক্রয় করার সময় বয়স আট মাস ছিল।

যাদের মতে উট-শাবক এবং অন্যান্য জন্তুর শাবকে জাকাত ফরজ হয়, তাদের নিকট মালের মালিক হওয়ার সাথে সাথে বছর পূর্ণ হওয়া ধরা হবে। অতএব ক্রয় করার পর যখনই পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হবে তখন উট-শাবক এবং অপর শাবকসমূহ বিশ মাসের হয়ে যাবে। সুতরাং এগুলোতে জাকাত ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে যাঁদের মতে উট শাবকে জাকাত ফরজ হয় না, তাদের মতে মালের মালিক হওয়ার দ্বারা বছর পূর্ণ হওয়া ধরা হবে না; বরং যখন এ শাবকগুলো বড় হয়ে বছর পূর্ণ করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করবে তখন বছর পূর্ণ হওয়া ধরা হবে। অর্থাৎ যখন আট মাসের পর আরো চার মাস অতিবাহিত হবে, তখন তা শাবকের সীমা থেকে অতিক্রম করে বড় পশু হিসেবে গণ্য হবে। এরপর যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন জাকাত দিতে হবে।

মোটকথা তাঁদের মতে ক্রয়ের পর ষোল মাস অতিবাহিত হলে জাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে এদের মতে ক্রয়ের পর বারো মাস অতিবাহিত হলে জাকাত দিতে হবে।

দ্বিতীয় সুরত এই যে, কোনো ব্যক্তির নিকট মুক্ত মাঠে বিচরণকারী নিসাব পরিমাণ গবাদি পশু আছে এবং সেগুলোর উপর দশ মাস অতিবাহিত হয়েছে এবং এগুলো বাচ্চা প্রসব করেছে এবং শুধু শাবকগুলোও নিসাব পরিমাণ। এমতাবস্থায় সবগুলো শাবকের মা মারা গেছে এবং শাবকগুলো বিদ্যমান আছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে শাবকের জননীর ক্ষেত্রে বছর বিদ্যমান থাকল না। অর্থাৎ দু'মাস পর শাবকের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে অন্যান্য ইমামদের মতে শাবক জননীগুলোর ক্ষেত্রে বছর বিদ্যমান ধরা হবে। অর্থাৎ দু মাস পর ঐ শাবকের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর প্রথমোক্ত মতের দলিল যা ইমাম জুফার এবং ইমাম মালিক (র.) গ্রহণ করেছেন, তা হলো, হাদীসে যেখানে জাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে إِبِلٌ [উট] بَقَرٌ [গরু] এবং غَنَمٌ [বকরি] শব্দ বলা হয়েছে। উক্ত শব্দগুলো ছোট-বড় সব ধরনের পশুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে- وَاللّٰهِ لَا اٰكُلُ الْإِبِلَ "আমি উটের গোশত খাব না" তাহলে বড় উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা যেরূপ শপথ ভেঙ্গে যাবে, অনুরূপভাবে এক বছরের উট শাবকের গোশত খাওয়ার দ্বারাও শপথ ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু إِبِلٌ ، بَقَرٌ ও غَنَمٌ ছোট-বড় সবগুলোকে শামিল করে সেহেতু শাবকের ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ জাকাত ফরজ হবে, যে পরিমাণ বড় পশুর ক্ষেত্রে ফরজ হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় মতের দলিল যা ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) গ্রহণ করেছেন, তা হলো, ঐ শাবকগুলোর মধ্য হতে একটি শাবক প্রদানের ক্ষেত্রে মালিক এবং গরিব উভয়ের প্রতি সুবিবেচনা করা হয়। তা এভাবে যে, যদি আমরা শাবকের ক্ষেত্রে পশুকে ওয়াজিব করি যেটাকে বড় পশুর ক্ষেত্রে ওয়াজিব করে থাকি, তাহলে এ শাবকের মধ্যে তো বড় কোনো পশু বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় বড় পশু ওয়াজিব করলে মালিক বা জাকাতদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কেননা

তাকে জাকাত আদায় করার জন্য বড় জন্তু তালাশ করতে হবে। অনেক সময় বড় জন্তুর মূল্য সকল শাবকের মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়। তাহলে জাকাতস্বরূপ পূর্ণ মাল গ্রহণ করা হলো বলে জ্ঞান করা হবে। এ পরিস্থিতিতে জাকাতদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যদি শাবকে কোনো জাকাত ওয়াজিব না হয় তাহলে গরিবরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং উভয় দিক বিবেচনা করে ঐ শাবকগুলোর মধ্য হতে একটি শাবক ওয়াজিব করা হয়েছে। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট যত পশু আছে সবগুলোই খুব দুর্বল। এতে জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে ঐ পশু হতেই একটি জাকাতস্বরূপ প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে জাকাতদাতার প্রতি বিবেচনা করা হলো এভাবে যে, তার জন্যে বড় বয়সের পশু অনুসন্ধান করতে হলো না এবং গরিবদের প্রতি বিবেচনা করা হলো এভাবে যে, তাদেরকে বঞ্চিত করা হলো না; বরং কিছু না কিছু অবশ্যই পেল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর তৃতীয় মতের দলিল যেটা ইমাম মুহাম্মদ (র.) গ্রহণ করেছেন, তা হলো নিসাবের পরিমাণ এবং জাকাতের পরিমাণ যুক্তির দ্বারা নির্ধারণ করা হয় না। অতএব শরিয়ত যদি কোনো বস্তুকে ওয়াজিব করে দেয়। এমতাবস্থায় যদি তা নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে ঐ ওয়াজিবটি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে এবং তা আর ওয়াজিব থাকবে না।

আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, শরিয়ত পঁচিশটি উটের ক্ষেত্রে একটি بِنْتُ مَخَاضٍ [এক বছরের উট শাবক] ওয়াজিব করেছে এবং ত্রিশটি গরুতে একটি تَبِيْعٌ বা تَبِيْعَةٌ [এক বছরের গো শাবক] ওয়াজিব করেছে এবং চল্লিশটি বকরির ক্ষেত্রে একটি ثَنِيٌّ [এক বছরের মেষ শাবক] ওয়াজিব করেছে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির নিকট এক বছরের কম উট, গরু এবং বকরির শাবক থাকে এবং এর চেয়ে অধিক বয়সের কোনো শাবক না থাকে। এমতাবস্থায় হয় সে এগুলো হতে একটি শাবক জাকাত স্বরূপ আদায় করবে, অথবা হাদীসে যে পশুর উল্লেখ আছে, তা ক্রয় করে জাকাত হিসেবে প্রদান করবে। প্রথম সূরতে হাদীসের বর্ণনার বিপরীত জাকাত আদায় করা হলো। কেননা হাদীসে ন্যূনতম এক বছরের শাবকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সে এক বছরের কম বয়সী শাবক দিয়েছে।

আর দ্বিতীয় সূরতে পূর্ণ মাল অথবা উত্তম মাল পরিশোধ করা হয়। অথচ জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে না পূর্ণ মাল আদায় করার বিধান আছে না উত্তম মাল দেওয়ার বিধি রয়েছে; বরং শরিয়তে মধ্যম ধরনের মাল দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অতএব مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ বা শরিয়ত কর্তৃক বর্ণিত পশু ওয়াজিব করা অসম্ভব হলো, বিধায় অন্য কোনো জিনিস ওয়াজিব হবে না। বেশি বয়সের কোনো প্রাণীও ওয়াজিব হবে না এবং এ শাবকগুলোর মধ্য হতেও কোনো শাবক ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, যদি ঐ শাবকগুলোর মধ্যে কোনো এটি مُسِنَّةٌ বা এক বছরের বেশি বয়সের হয়, তা হলে এ সমস্ত শাবক ঐ مُسِنَّةٌ -এর অনুবর্তী ধরা হবে।

উল্লেখ্য যে, শুধু নিসাব সংঘটিত (اِنْعِقَادُ نِصَابٍ) করার ক্ষেত্রে অনুবর্তী ধরা হবে; জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে নয়। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট এক বছরের কম বয়সের উনচল্লিশটি বকরি শাবক আছে এবং এক বছরের বেশি বয়সের একটি বকরি আছে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে নিসাব সংঘটিত হবে এবং নিসাব সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে ছোট [এক বছরের কম বয়স] শাবকগুলোকে বড় [এক বছরের বেশি বয়স] পশুর অনুবর্তী করা হবে। তবে জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে ছোট শাবককে বড় পশুর অনুবর্তী ধরা হবে না। অর্থাৎ জাকাত শুধু مُسِنَّةٌ বা এক বছরের বেশি বয়সের বকরি হতে গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে এক বছরের কম বয়সের বকরির বাচ্চা হতে জাকাত আদায় করা হবে না।

লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে كِبَارٌ বা এক বছরের বেশি বয়সের পশু হতে জাকাত আদায় করার হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে, যখন مِقْدَارُ وَاجِبٍ বা ওয়াজিবের পরিমাণ নিসাবের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট একশ উনিশটি حَمَلٌ বা এক বছরের বেশি বয়সের বকরি আছে, তাহলে তাতে দুটি مُسِنَّةٌ ওয়াজিব হবে। কেননা একশ একুশ বকরির মধ্যে দুটি বকরি ওয়াজিব হয়। আর যদি ছোট [এক বছরের কম বয়সের] বকরি একশ বিশটি থাকে এবং একটি مُسِنَّةٌ [মুসিন্না] থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শুধু একটি مُسِنَّةٌ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একটি مُسِنَّةٌ এবং একটি حَمَلٌ [এক বছরের কম বয়সের বকরি] ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো– তাঁদের মতে حَمَلٌ বা এক বছরের কম বয়সের বকরি জাকাত হিসাবে গ্রহণ করা হয় না; বরং مُسِنَّةٌ

গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব পরিমাণ অর্থাৎ দুটি مُسِنَّةٌ উপস্থিত নেই; বরং একটি مُسِنَّةٌ উপস্থিত আছে। সুতরাং এটিই জাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্টগুলো ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, যেহেতু حَمَل থেকেও জাকাত গ্রহণ করা হয়, তাই একটি مُسِنَّةٌ এবং একটি حَمَل গ্রহণ করা হবে। বকরির উপর উট এবং গো-শাবককে কিয়াস করা হবে।– [ফতহুল কাদীর]

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট একশ বিশটি حَمَل এবং একটি مُسِنَّةٌ থাকে, অতঃপর এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর مُسِنَّةٌ-টি মারা যায়, তাহলে তরফাইনের মতে অবশিষ্ট শাবকগুলোর জাকাত রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি حَمَل মারা যায় এবং مُسِنَّةٌ টি জীবিত থাকে, তাহলে مُسِنَّةٌ-এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে নেওয়া হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে مُسِنَّةٌ মরে যাওয়ার সুরতে حَمَل-এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ [জাকাতস্বরূপ] দেওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। কেননা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে صِغَار [এক বছরের কম বয়স]-ই হলো মূল। আর জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে كَبِيْر [এক বছরের বেশি বয়সী]-কে [صَغِيْر-এর উপর] প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এ مُسِنَّةٌ বিদ্যমান থাকার কারণে। কিন্তু مُسِنَّةٌ মারা যাওয়ার কারণে জাকাতের হুকুম মূলের (صِغَار) দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, একশ একুশের মধ্যে দুটি حَمَل ওয়াজিব হবে। তবে একটি مُسِنَّةٌ মারা যাওয়ার কারণে সে পরিমাণ [একটি حَمَل-এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ] জাকাত রহিত হয়ে যাবে।

ثُمَّ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ দ্বারা আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে حُمْلَان ، عَجَاجِيْل এবং فُصْلَان-এর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হয় এবং এগুলোর মধ্য হতে [জাকাত] আদায় করা ফরজ। এ কারণে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, শাবকের ক্ষেত্রে জাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন নিসাবের পরিমাণে পৌঁছে যাবে। সুতরাং চল্লিশের কম বকরির শাবকে এবং ত্রিশের কম গো-শাবকে জাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি এগুলো বড় হয় তাহলেও উক্ত নিসাবের কমে জাকাত ফরজ হবে না। পঁচিশটি উট শাবকে একটি উটের শাবক ওয়াজিব হবে এবং ছত্রিশটি বড় উটে একটি بِنْتُ لَبُوْنٍ [দ্বিতীয় বছরের শাবক] ওয়াজিব হবে। ছেচল্লিশটি উটে একটি حِقَّةٌ ওয়াজিব হবে। এতো ঠিক আছে। কিন্তু যদি উট শাবকের সংখ্যা ছত্রিশটি এবং ছেচল্লিশটি হয় তবে তাতে কি ওয়াজিব হবে?

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, পঁচিশের অধিক উটের শাবকে কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত শাবকের সংখ্যা এ পরিমাণে না পৌঁছে, যে পরিমাণে এ বয়স্ক উটগুলো পৌঁছার পর তাতে দুটি ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন ছত্রিশ উটে দুটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হয়, তাই ছত্রিশ বাচ্চাতেও দুটি বাচ্চা ওয়াজিব হবে। আবার ছত্রিশের অতিরিক্ত সংখ্যায় কিছুই ওয়াজিব হবে না। যাবৎ না এ বাচ্চা উটের সংখ্যা এমন পরিমাণে পৌঁছে, যে পরিমাণে পৌঁছার পর ঐ বড় উটে তিনটি ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– একশ পঁয়তাল্লিশ উটে তিনটি হিক্কা ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে একশ পঁয়তাল্লিশ শাবকের মধ্যে তিনটি শাবক ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে একশ ছিয়ানব্বইটি উটে চারটি حِقَّةٌ ওয়াজিব হয়। অতএব একশ ছিয়ানব্বইটি উট শাবকে চারটি উট শাবক ওয়াজিব হবে। এ নিয়মে চলতে থাকবে। উটের পঁচিশটি শাবকের কমে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী কিছুই ওয়াজিব হবে না। তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচটি উট শাবকে একটি শাবকের এক পঞ্চমাংশ [পাঁচ ভাগের এক ভাগ] ওয়াজিব হবে এবং দশটিতে দু'পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। পনেরটিতে তিন পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। বিশটিতে চার পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে এবং পঁচিশটিতে একটি [পূর্ণ] শাবক ওয়াজিব হবে। তাঁর তৃতীয় বর্ণনা হলো, উটের পাঁচ শাবকে এক শাবকের মূল্যের পঞ্চমাংশ এবং একটি মধ্যম পর্যায়ের বকরির মূল্যের মধ্যে যেটির মূল্য তুলনামূলক কম, সেটি ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি উট শাবকের মূল্যের পঞ্চম অংশ কম হয় এবং মধ্যম পর্যায়ের বকরির মূল্য বেশি হয়, তাহলে উট শাবকের মূল্যের পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে বকরির মূল্য ওয়াজিব হবে। উটের দশটি শাবকের জাকাতের ক্ষেত্রে মধ্যম পর্যায়ের দুটি বকরির মূল্য এবং একটি উট শাবকের মূল্যের পাঁচ ভাগের দু'ভাগের মধ্যে তুলনামূলক যেটির মূল্য কম সেটিই ওয়াজিব হবে। পূর্বোক্ত নিয়মের উপর কিয়াস করে পনের এবং বিশটি উট শাবকের জাকাত নির্ধারণ করা হবে। যেমন– পনেরটি উট শাবকে মধ্যম পর্যায়ের তিনটি বকরির মূল্য এবং একটি উট শাবকের মূল্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগের মধ্যে তুলনামূলক যেটির মূল্য কম হবে সেটি ওয়াজিব হবে।

قَالَ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مُسِنٌّ فَلَمْ يُوْجَدْ اَخَذَ الْمُصَدِّقُ اَعْلٰى مِنْهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ اَوْ اَخَذَ دُوْنَهَا وَاَخَذَ الْفَضْلَ وَهٰذَا يَبْتَنِيْ عَلٰى اَنَّ اَخْذَ الْقِيْمَةِ فِيْ بَابِ الزَّكٰوةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا عَلٰى مَا نَذْكُرُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِلَّا اَنَّ فِى الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لَهُ اَنْ لَّا يَاْخُذَ وَيُطَالِبَهُ بِعَيْنِ الْوَاجِبِ اَوْ بِقِيْمَتِهٖ لِاَنَّهُ شِرَاءٌ وَفِى الْوَجْهِ الثَّانِىْ يُجْبَرُ لِاَنَّهُ لَا بَيْعَ فِيْهِ بَلْ هُوَ اِعْطَاءٌ بِالْقِيْمَةِ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তির উপর مُسِنٌّ [তিন বছর বয়সের উট শাবক] ওয়াজিব হয়, তাহলে জাকাত গ্রহণকারী এর থেকে অধিক বয়সের উট গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেবে, কিংবা তার থেকে কম বয়সের উট গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য উসুল করবে। এই মাসআলার ভিত্তি এই যে, আমাদের [হানাফীদের] মতে জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মূল্য আদায় করা জায়েজ আছে। আমরা এ বিষয়টি [পরবর্তীতে] ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব, তবে প্রথম সুরতে তার [জাকাত গ্রহণকারীর] অধিকার আছে যে, উচ্চতর পশু গ্রহণ না করে যে পশু ওয়াজিব হয়েছে, হুবহু সেটা কিংবা তার মূল্য দাবি করবে। কেননা এটা মূলত ক্রয়। আর দ্বিতীয় সুরতে জাকাত গ্রহণকারীকে নিম্নতর পশু গ্রহণে বাধ্য করা হবে। কেননা এখানে ক্রয়-বিক্রয় নেই; বরং এটা হলো মূল্য দ্বারা জাকাত প্রদান করার শামিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এই ধরনের জাকাতের ক্ষেত্রে মধ্যম আকৃতির পশু ওয়াজিব হয়। অধিক নিম্নমানেরও নয় এবং অধিক উচ্চমানেরও নয়। যেমন– কোনো ব্যক্তির উপর যদি বিনতে লাবূন (بِنْتُ لَبُوْنٍ) ওয়াজিব হয়, তাহলে জাকাত বিষয়ক কর্মকর্তা কিংবা জাকাত আদায়কারী উচ্চমানের বিনতে লাবূন গ্রহণ করবে না এবং নিম্নমানের বিনতে লাবূনও গ্রহণ করবে না; বরং মধ্যম পর্যায়ের بِنْتُ لَبُوْنٍ উসুল করবে। এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ যখন হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠালেন, তখন এ নির্দেশ দিলেন যে– اِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ "জাকাত গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক।"– শরহে নিকায়া (شَرْحُ نِقَايَةٍ)। কেননা মধ্যম ধরনের পশু গ্রহণ করার মধ্যে জাকাতদাতা এবং গরিব উভয়ের প্রতি সুবিবেচনা করা হয়। উত্তম পশু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে নিম্নমানের পশু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গরিব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন : সম্পদের মালিকের উপর যে পশু ওয়াজিব হয় তা যদি বিদ্যমান না থাকে, তাহলে কি করবে? যেমন– بِنْتُ لَبُوْنٍ ওয়াজিব হলো। অথচ তার নিকট বিনতে লাবূন নেই; বরং হিক্কা আছে। অথবা حِقَّةٌ ওয়াজিব হলো। অথচ তার নিকট حِقَّةٌ নেই; বরং بِنْتُ لَبُوْنٍ আছে। অথবা গুণের দিক থেকে মধ্যম পর্যায়ের পশু বিদ্যমান নেই; বরং উচ্চমানের পশু বিদ্যমান আছে অথবা নিম্নমানের পশু বিদ্যমান আছে। উক্ত সুরতগুলোতে কোন ধরনের পশু ওয়াজিব হবে?

কুদূরী গ্রন্থকার বলেছেন, জাকাত আদায়কারী উচ্চমানের পশু গ্রহণ করতঃ অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেবে। যেমন মধ্যম পর্যায়ের بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর মূল্য এক হাজার টাকা এবং উচ্চমানের بِنْتُ لَبُوْنٍ যা মালিকের নিকট বিদ্যমান আছে, তার মূল্য পনের শত টাকা। এমতাবস্থায় জাকাত উসুলকারী উচ্চমানের بِنْتُ لَبُوْنٍ গ্রহণ করতঃ পাঁচশত টাকা মালিকের নিকট ফেরত দেবে। অথবা কোনো ব্যক্তির উপর بِنْتُ لَبُوْنٍ ওয়াজিব হয়েছে, কিন্তু তার নিকট بِنْتُ لَبُوْنٍ নেই। তার নিকট حِقَّةٌ আছে। তাহলে জাকাত উসুলকারী حِقَّةٌ গ্রহণ করত بِنْتُ لَبُوْنٍ হতে অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেবে। যেমন– بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর মূল্য এক হাজার টাকা এবং حِقَّةٌ-এর মূল্য পনের শত টাকা। তাহলে জাকাত উসুলকারী حِقَّةٌ গ্রহণ করত পাঁচশত টাকা মালিককে

ফেরত দেবে। অথবা জাকাত উসুলকারী নিম্নমানের পশু গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য উসুল করবে। মনে করুন, মালিকের নিকট মধ্যম পর্যায়ের যে بِنْتُ لَبُوْنٍ আছে, তার মূল্য এক হাজার টাকা এবং নিম্নমানের بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর মূল্য আটশত টাকা। তাহলে জাকাত উসুলকারী নিম্নমানের بِنْتُ لَبُوْنٍ গ্রহণ করত আরো অতিরিক্ত দু'শত টাকা মালিক থেকে নিয়ে নেবে। অথবা মনে করুন যে, কোনো ব্যক্তির উপর حِقَّةٌ ওয়াজিব হলো; কিন্তু তার নিকট حِقَّةٌ নেই, তবে بِنْتُ لَبُوْنٍ আছে। আর بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর মূল্য এক হাজার টাকা আর حِقَّةٌ-এর মূল্য পনের শত টাকা। তাহলে এমতাবস্থায় জাকাত উসুলকারী بِنْتُ لَبُوْنٍ গ্রহণ করত অতিরিক্ত আরো পাঁচ শত টাকা গ্রহণ করবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, مَتْنٌ-এর মাসআলার ভিত্তি হলো, আমাদের [হানাফীদের] মতে জাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণ করা জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। এ বিষয়টি সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো।

ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্ত عِبَارَتْ-এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, এ বিষয়ে জাকাত উসুলকারীর اِخْتِيَارْ আছে যে, উচ্চ মানের পশু গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেবে। অথবা নিম্নমানের পশু গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য উসুল করবে। তবে صَحِيْحٌ হলো, যার উপর জাকাত ওয়াজিব হয়েছে, তাকে اِخْتِيَارْ দেওয়া হয়েছে। কেননা তার সহজের জন্য اِخْتِيَارْ অনুমোদিত হয়েছে।

অতএব যার উপর জাকাত ফরজ হয়, তাকে اِخْتِيَارْ দেওয়ার দ্বারা سُهُوْلَتْ সাবিত হবে। সুতরাং উচ্চ অথবা নিম্নমানের [উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে] اِخْتِيَارْ ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হবে, যার উপর জাকাত ওয়াজিব হয়। হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য ঐ দুই মত হতে ভিন্ন। কেননা তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত সুরতে [উচ্চমানের পশু গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেওয়া] জাকাত উসুলকারীর اِخْتِيَارْ আছে যে, উচ্চমানের পশু গ্রহণ না করা; বরং মালিকের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, তা-ই গ্রহণ করা। অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের পশুর مُطَالَبَةٌ করা। অথবা মালিক মধ্যম পর্যায়ের পশুর মূল্য দিয়ে দেবে।

এর দলিল হলো, যদি مُصَدِّقٌ [জাকাত উসুলকারী] উচ্চমানের পশু গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেয়, তাহলে মনে করা হবে যে, مُصَدِّقٌ ঐ পশুর কিয়দংশ ক্রয় করল। আর ক্রয়ের ক্ষেত্রে কারো উপর বল প্রয়োগ করা যাবে না বা কাউকে বাধ্য করা যাবে না। এজন্য এ সুরতে مُصَدِّقٌ-এর اِخْتِيَارْ হবে, উচ্চমানের পশু গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেবে। অথবা মালিকের নিকট মধ্যম পর্যায়ের পশু দাবি করবে। সুতরাং মালিক মধ্যম পর্যায়ের পশু দেবে, অথবা তার মূল্য দিবে।

দ্বিতীয় সুরতে [নিম্নমানের পশু গ্রহণ করার সুরতে] মালিকের اِخْتِيَارْ আছে যে, নিম্নমানের পশু দেবে, অতিরিক্ত মূল্য দেবে এবং مُصَدِّقٌ-কে নিম্নমানের পশু গ্রহণ করার জন্য ও অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। এর দলিল হলো, مُصَدِّقٌ-এর জন্য নিম্নমানের পশু উসুল করে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করাকে مُصَدِّقٌ-এর পক্ষ থেকে بَيْعٌ বা ক্রয় মনে করা হবে না; বরং মালিক মূল্যের দ্বারা জাকাত আদায় করেছে জ্ঞান করা হবে। আর মূল্য আদায় করার সুরতে مُصَدِّقٌ-কে এর জন্য বাধ্য করা যাবে। –[ইনায়া]

ফায়দা : আমাদের মত অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির উপর بِنْتُ لَبُوْنٍ ওয়াজিব হলো, কিন্তু তার নিকট بِنْتُ لَبُوْنٍ নেই, তবে তার নিকট حِقَّةٌ অথবা بِنْتُ مَخَاضٍ আছে। তাহলে مُصَدِّقٌ হিক্কা গ্রহণ করত অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেবে। যেমন– بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর মূল্য এক হাজার টাকা। আর حِقَّةٌ-এর মূল্য পনের শত টাকা। এমতাবস্থায় مُصَدِّقٌ হিক্কা গ্রহণ করত পাঁচ শত টাকা মালিকের নিকট ফেরত দেবে। অথবা مُصَدِّقٌ - بِنْتُ مَخَاضٍ গ্রহণ করত আরো অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করবে। যেমন– بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর মূল্য এক হাজার টাকা। আর بِنْتُ مَخَاضٍ-এর মূল্য আটশত টাকা। এমতাবস্থায় জাকাত উসুলকারী بِنْتُ مَخَاضٍ গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত দু'শত টাকা গ্রহণ করবে। প্রকাশ থাকে যে,

আমাদের মতে حِقَّةٌ এবং بِنْتُ مَخَاضٍ এবং بِنْتُ لَبُوْنٍ অথবা بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর মূল্যের যে কমবেশি তা সুনির্দিষ্ট নয়; বরং তা নির্ভর করে বাজার মূল্যের উপর। আর বাজার মূল্য উঠানামা করে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দুই পশুর মূল্যের তফাত [কমবেশি] নির্দিষ্ট আছে। তা হলো দুটি বকরি বা বিশ দিরহাম অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যদি কারো উপর بِنْتُ لَبُوْنٍ ওয়াজিব হয় এবং তার নিকট بِنْتُ لَبُوْنٍ নেই; বরং حِقَّةٌ এবং بِنْتُ مَخَاضٍ আছে তাহলে জাকাত উসূলকারী একটি حِقَّةٌ গ্রহণ করত দুটি বকরি অথবা বিশ দিরহাম মালিককে দিয়ে দেবে। কিংবা একটি بِنْتُ مَخَاضٍ গ্রহণ করবে এবং দুটি বকরি অথবা বিশ দিরহাম গ্রহণ করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَنْ وَجَبَ عَلٰى إِبِلِهِ إِبْنَةُ لَبُوْنٍ فَلَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ إِلَّا حِقَّةً أَخَذَهَا وَرَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا مِمَّا يَتَيَسَّرُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوْجَدْ إِلَّا إِبْنَةُ مَخَاضٍ أَخَذَهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا مِمَّا يَتَيَسَّرُ عَلَيْهِ -

অর্থ– রাসূল ﷺ বলেছেন, যার উটে بِنْتُ لَبُوْنٍ ওয়াজিব হয়েছে, কিন্তু জাকাত উসূলকারী بِنْتُ لَبُوْنٍ পেল না, তবে মালিকের নিকট حِقَّةٌ বিদ্যমান আছে। এমতাবস্থায় জাকাত উসূলকারী حِقَّةٌ গ্রহণ করবে এবং মালিককে দুই বকরি বা বিশ দিরহামের মধ্যে যেটি সহজ সেটি ফেরত দেবে। পক্ষান্তরে যদি মালিকের নিকট শুধু بِنْتُ مَخَاضٍ থাকে তাহলে জাকাত উসূলকারী بِنْتُ مَخَاضٍ গ্রহণ করবে এবং দুই বকরি এবং বিশ দিরহামের মধ্যে যেটি তুলনামূলক সহজ সেটি গ্রহণ করবে। –[কিফায়া, ইনায়া]

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, দুই বয়সের পশুর মাঝে تَفَاوُتٌ -এর পরিমাণ নির্দিষ্ট। আর তা হলো দুই বকরি বা বিশ দিরহাম।

উত্তর : রাসূল ﷺ এটা এজন্য বলেছেন যে, তাঁর যুগে উক্ত দুই বয়সের পশুর মাঝে ঐ পরিমাণই تَفَاوُتٌ ছিল। এটা কোনো শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ নয়। দলিল হলো যে, হযরত আলী (র.) দুই বয়সের পশুর মাঝে একটি বকরি অথবা দশ দিরহামের দ্বারা تَفَاوُتٌ -কে নির্ধারণ করেছেন। এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.) অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কেননা তিনি রাসূল ﷺ -এর مُصَدِّقٌ বা জাকাত উসূলকারী ছিলেন। সুতরাং এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, এতদ সম্পর্কে হাদীস হযরত আলী (রা.)-এর নিকট مَخْفِيٌّ ছিল বা হযরত আলী (রা.)-এর অজানা ছিল। আর এ ধারণা করারও কোনো সুযোগ নেই যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। উক্ত দু'টোর কোনোটি যখন নয়, অতএব হযরত আলী (রা.)-এর رِوَايَتٌ -কে এই মর্মে গ্রহণ করা হবে যে, তার যুগে تَفَاوُتٌ ঐ পরিমাণেই ছিল।

উক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, দুই বয়সের পশুর মাঝে تَفَاوُتٌ -এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই; বরং কাল এবং স্থানের প্রেক্ষিতে তা কমে এবং বাড়ে। (كِفَايَةٌ)

وَيَجُوْزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِى الزَّكٰوةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِى الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) لَا يَجُوْزُ اِتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوْصِ كَمَا فِى الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَلَنَا اَنَّ الْاَمْرَ بِالْاَدَاءِ اِلَى الْفَقِيْرِ اِيْصَالٌ لِلرِّزْقِ الْمَوْعُوْدِ اِلَيْهِ فَيَكُوْنُ اِبْطَالاً لِقَيْدِ الشَّاةِ فَصَارَ كَالْجِزْيَةِ بِخِلَافِ الْهَدَايَا لِاَنَّ الْقُرْبَةَ فِيْهَا اِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا تُعْقَلُ وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِى الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَهُوَ مَعْقُوْلٌ.

অনুবাদ : আমাদের [হানাফীদের] মতে জাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান করা জায়েজ আছে। কাফ্ফারাসমূহ, সদ্কাতুল ফিতর, ওশর ও নজরের ক্ষেত্রে একই হুকুম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নস (نَصّ)-এর অনুসরণকল্পে মূল্য প্রদান করা জায়েজ নেই। যেমন– হজের হাদী ও কুরবানির পশুর ক্ষেত্রে। আমাদের দলিল এই যে, জাকাত দরিদ্রকে প্রদানের উদ্দেশ্য হলো তার নিকট প্রতিশ্রুত রিজিক পৌছানো। সুতরাং এ বিষয়টি [নস-এ বর্ণিত] বক্রির শর্তকে বাতিল করে দেয়। তাই এটা জিযয়া-এর মতো। হাদী (هَدْىٌ) বা কুরবানির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সেখানে রক্ত প্রবাহিত করাই হলো ইবাদত। আর তা যুক্তিনির্ভর নয় [সুতরাং এ ক্ষেত্রে نَصّ-এর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা অপরিহার্য]। পক্ষান্তরে বিরোধ ক্ষেত্রে ইবাদতের দিক হলো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন মিটানো। আর এটা যুক্তিসঙ্গত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে গবাদি পশুর জাকাত প্রদানের বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন সুরতে বকরি ওয়াজিব হয়, আর কোন কোন সুরতে بِنْتُ مَخَاضٍ এবং تَبِيْعَةٌ ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন : জাকাতের ক্ষেত্রে যে সকল পশু ওয়াজিব হয়, মালিক সে পশু না দিয়ে যদি সেগুলোর মূল্য প্রদান করে, তাহলে জায়েজ হবে কি?

উত্তর : ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, আমাদের মতে জাকাত প্রদানে মূল্য প্রদান করা জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে মালের কাফ্ফারা -এর ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান করা জায়েজ আছে। যেমন– কসমের কাফ্ফারা-এর মধ্যে দশজন মিসকিনকে খাবার প্রদান করা অথবা কাপড় প্রদান করার স্থানে নগদ টাকা প্রদান করা জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে সদ্কাতুল ফিতরে গম অথবা জবের স্থানে ও গুলোর মূল্য প্রদান করা জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে ওশর এবং নজর-এর মধ্যে [পশুর স্থানে] মূল্য প্রদান করা জায়েজ আছে। অর্থাৎ জমিনের উৎপন্ন ফসলের দশম অংশ ওয়াজিব হলো। সে সমস্ত ফসল বিক্রি করে এর মূল্যের দশম অংশ প্রদান করল, তাহলে এটা জায়েজ। অনুরূপভাবে স্বর্ণমুদ্রা সদ্কা করার মান্নত করল। অতঃপর ঐ পরিমাণ দিরহাম সদকা করল। তাহলে এটা জায়েজ, তবে এটা লক্ষণীয় যে, মূল্য আদায় করার দিনের ধর্তব্য হবে এবং ঐ শহর ধর্তব্য হবে যেখানে মাল আছে। পক্ষান্তরে যদি মাঠে থাকে, তাহলে সেখানকার নিকটতম জনপদের অনুরূপ পশুর মূল্য দেবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, জাকাতের ক্ষেত্রে যে পশু ওয়াজিব হয়েছে, তার মূল্য প্রদান করা জায়েজ নেই; বরং হাদীসে বর্ণিত পশুই জাকাত হিসেবে দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, তার মাযহাবে نَصّ -এর অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ نَصّ এ- بِنْتُ مَخَاضٍ , بَكْرِىْ এবং تَبِيْعَةٌ -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এটার উপর আমল

করতে হবে : মূল্য প্রদান করা জায়েজ হবে না। যেমন– هَدْىٌ এবং قُرْبَانِىْ -এর ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে মূল্য প্রদান করা জায়েজ নেই : অতএব জাকাতের ক্ষেত্রেও মূল্য প্রদান করা জায়েজ হবে না।

আমাদের দলিল হলো– মহান আল্লাহ اٰتُوا الزَّكٰوةَ -এর দ্বারা গরিবদেরকে জাকাত প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

–[বাকারা– আয়াত– ৪৩]

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا "সমূহ প্রাণীর জীবিকা প্রদানের দায়িত্ব মহান আল্লাহর"–[হূদ আয়াত– ৬] এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ সমূহ প্রাণীর রিজিক প্রদানের দায়িত্ব নিজ জিম্মায় নিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতি জাকাতের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। আয়াতের সারমর্ম হলো, জমিনে বিচরণকারী প্রত্যেক প্রাণী যার রিজিক-এর প্রয়োজন আছে, তার রিজিক পৌঁছানো মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে নিজের উপর وَاجِبٌ করেছেন। যে পরিমাণ জীবিকা যার জন্য নির্দিষ্ট আছে তার নিকট তা অবশ্যই পৌঁছবে। কাউকে اَسْبَابٌ-এর মাধ্যমে رِزْق পৌঁছান। যেমন– ব্যবসা, চাষাবাদ, পেশা বা শিল্প এবং চাকরি। পক্ষান্তরে কারো জন্য রিজিকের اَسْبَابٌ সৃষ্টি করেননি। যেমন– ফকির এবং মিসকিন। তাদের নিকট রিজিক এভাবে পৌঁছান যে, ধনীদের নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ প্রদত্ত মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ঐ ফকির ও মিসকিন লোকদের প্রদান কর। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– خُذُوْا مِنْ اَغْنِيَاۤءِ هِمْ وَتُرَدُّوْا اِلٰى فُقَرَائِهِمْ "তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ কর এবং তাদের গরিবদের নিকট প্রদান কর।" মহান আল্লাহর ফরমান– اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسَاكِيْنَ "অবশ্যই জাকাত এর হকদার গরিব এবং মিসকিনগণ"।–[তওবা–আয়াত নং ৬০] মহান আল্লাহ আরো ফরমান– اٰتُوا الزَّكٰوةَ "তোমরা জাকাত প্রদান কর।"

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, জাকাতের বিধান প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিশ্রুত রিজিক গরিব-মিস্‌কিনদের নিকট পৌঁছানো। বলা বাহুল্য যে, رِزْق বকরি, গাভী এবং উট ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের অনেক জিনিস প্রয়োজন, যা উক্ত পশু দ্বারা পূর্ণ হয় না। এজন্য বকরির শর্ত আরোপ করা বাতিল; বরং এটার মূল্য দিলেই জায়েজ হবে। যেমন– জিয়য়া -এর ক্ষেত্রে মূল্য আদায় করা জায়েজ আছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর قِيَاسٌ-এর জবাব : জাকাতকে هَدْىٌ এবং قُرْبَانِىْ-এর উপর কিয়াস করা জায়েজ নেই। কেননা هَدْىٌ এবং قُرْبَانِىْ -এর পশু জবাই করা ইবাদত। এজন্য পশু জবাই করার পর এবং সদ্‌কা করার পূর্বে যদি জবাইকৃত পশু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোনো জরিমানা আসবে না। কেননা জবাই করা দ্বারা ইবাদত আদায় হয়ে গেছে।

কুরবানির পশু জবাই করা غَيْرُ مَعْقُوْلٍ এবং যুক্তিবহির্ভূত। জনৈক উর্দু কবি এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

یہ عجیب ما جراہے کہ بروز عید قرباں * وہی قتل بھی کرے وہی لے ثواب الٹا ۔

কুরবানির ঈদের দিনে মজার ব্যাপার হলো, সে প্রাণী জবাই করবে বা পশুর জীবন নাশ করবে আবার উল্টা পুণ্যের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য জাকাত-এর মধ্যে ইবাদতের দিক হলো, এর দ্বারা মুখাপেক্ষী মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ হয়। বলা বাহুল্য যে, মুখাপেক্ষী মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করা যুক্তির আলোকে এক মহৎ কর্ম। অতএব هَدْىٌ ও قُرْبَانِىْ [যা غَيْر مَعْقُوْل]-কে زَكٰوة [যা مَعْقُوْل]-এর উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

وَلَيْسَ فِى الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ صَدَقَةٌ خِلَافًا لِمَالِكٍ (رح) لَهُ ظَوَاهِرُ النُّصُوْصِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِى الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ وَلَا فِى الْبَقَرَةِ الْمُثِيْرَةِ صَدَقَةٌ وَلِاَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِىْ وَدَلِيْلُهُ الْاِسَامَةُ اَوِ الْاِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ وَلَمْ يُوْجَدْ وَلِاَنَّ فِى الْعَلُوْفَةِ تَتَرَاكَمُ الْمُؤْنَةُ فَيَنْعَدِمُ النَّمَاءُ مَعْنًى ثُمَّ السَّائِمَةُ هِىَ الَّتِىْ تَكْتَفِىْ بِالرَّعْىِ فِىْ اَكْثَرِ الْحَوْلِ حَتّٰى لَوْ اَعْلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ اَوْ اَكْثَرَ كَانَتْ عَلُوْفَةً لِاَنَّ الْقَلِيْلَ تَابِعٌ لِلْاَكْثَرِ ـ

অনুবাদ : কাজে নিয়োজিত, ভার বহনে নিযুক্ত এবং সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালিত পশুর উপর জাকাত নেই [এ বিষয়ে] ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর দলিল হলো প্রকাশ্য নসসমূহ। আমাদের দলিল হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَيْسَ فِى الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ وَلَا فِى الْبَقَرَةِ الْمُثِيْرَةِ صَدَقَةٌ "ভার বহন এবং কাজে নিযুক্ত পশুর ক্ষেত্রে এবং চাষাবাদে নিযুক্ত গরুর ক্ষেত্রে জাকাত নেই।" তা ছাড়া জাকাত ওয়াজিব হওয়ার سَبَبٌ বা কারণ হলো বর্ধনশীল সম্পদ। আর বর্ধনশীলতার প্রমাণ হলো মুক্ত মাঠে চরিয়ে পালিত কিংবা ব্যবসায় খাটানো। এখানে এর কোনোটি পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ব্যয় বর্ধিত হয়। ফলে প্রকৃতপক্ষে সম্পদের বর্ধনশীলতা লোপ পায়। سَائِمَةٌ [বিচরণশীল] হলো ঐ সকল পশু, যারা বছরের অধিকাংশ সময় চরে খায়। সুতরাং যদি মালিক অর্ধেক বছর কিংবা তার বেশি সময় পশুর পালকে সংগৃহীত খাদ্য খাওয়ায়, তাহলে সেটা عَلُوْفَةٌ [সংগৃহীত খাদ্য দ্বারা পালিত] বলে গণ্য হবে। কেননা অল্প অধিকের অনুবর্তী হিসেবে গণ্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَوَامِلُ শব্দটি عَامِلَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– যে পশু দ্বারা কাজ করানো হয়। حَوَامِلُ শব্দটি حَامِلٌ-এর বহুবচন। অর্থ– যে পশু ভার বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয়। عَلُوْفَةٌ অর্থ–যে পশু পূর্ণ বছর বা বছরের অধিকাংশ সময়, হিদায়া গ্রন্থকারের মতে অর্ধেক বছর সংগৃহীত খাদ্য দ্বারা লালিত-পালিত হয়।

উক্ত পশুগুলোতে আমাদের এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জাকাত ফরজ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র.) -এর মতে জাকাত ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, প্রকাশ্য নস (نَصّ)। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "তুমি তাদের মাল হতে জাকাত গ্রহণ কর"।

উক্ত আয়াতে اَمْوَالٌ শব্দটি ব্যাপক, যা সব ধরনের মালকে শামিল করে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

فِىْ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِىْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ ـ

অথ– পাঁচটি উটে একটি বকরি এবং ত্রিশটি গরুতে একটি تَبِيْعٌ বা تَبِيْعَةٌ এবং চল্লিশটি বকরিতে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। অন্য এক হাদীসে আছে– خُذْ مِنَ الْاِبِلِ اِبِلًا "উট হতে জাকাতস্বরূপ উটই গ্রহণ কর।" উক্ত نَصّ গুলো হচ্ছে مُطْلَقٌ, আর اِطْلَاقٌ-এর দাবি হলো সব ধরনের উট, গরু এবং বকরিতে জাকাত ফরজ হবে। চাই তা عَوَامِلُ ও غَيْرِ عَوَامِلُ তথা কাজে নিয়োজিত হোক বা না হোক। حَوَامِلُ ও غَيْرُ حَوَامِلُ বা ভার বহনে নিযুক্ত হোক বা না হোক। عَلُوْفَةٌ বা সংগৃহীত খাদ্যে পালিত হোক, سَائِمَةٌ বা মাঠে নিজে চরে খায় এমন প্রাণী হোক।

আমাদের দলিল : হযরত আলী (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَيْسَ فِى الْاِبِلِ الْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ "ভার বহনে নিযুক্ত উটে জাকাত ফরজ নয়।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন– لَيْسَ فِى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "কাজে নিয়োজিত উটের উপর জাকাত ফরজ নয়।

হযরত জাবের (রা.) রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন- لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْمُثِيْرَةِ صَدَقَةٌ "চাষাবাদে নিযুক্ত গরুর ক্ষেত্রে জাকাত ফরজ নয়।" হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত তিনটিকে একই হাদীসে একত্রিত করেছেন। মোট কথা, উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, عَوَامِلْ এবং حَوَامِلْ -এর মধ্যে জাকাত ফরজ নয়। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কারণ হলো বর্ধনশীল সম্পদ হওয়া। বলা বাহুল্য এগুলো বর্ধনশীল সম্পদ নয়। কেননা বর্ধনশীল হওয়ার দলিল হলো পশু মুক্ত মাঠে বিচরণ করা অথবা এগুলো تِجَارَتْ -এর জন্যে নির্দিষ্ট সম্পদ হওয়া। عَوَامِلْ ,حَوَامِلْ এবং عَلُوْفَةْ -এর মধ্যে উক্ত দুটির কোনোটি পাওয়া যায়নি বিধায় জাকাত ফরজ হবে না।

তৃতীয় দলিল : عَلُوْفَةْ তথা সংগৃহীত ঘাস দ্বারা পালিত হয় বিধায় ধরে নেওয়া হবে যে, সেখানে বর্ধনশীলতার শর্ত অনুপস্থিত। সুতরাং عَلُوْفَةْ -এর মাঝে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ পাওয়া যায়নি। অতএব জাকাত ফরজ হবে না।

প্রশ্ন : ইমাম মালিক (র.) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এ আয়াতের اِطْلَاقْ -এর দ্বারা দলিল দিয়েছেন। কিন্তু আপনি لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ এ- خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা উক্ত আয়াতের اِطْلَاقْ-কে বাতিল করে দিয়েছেন। অথচ আপনার মতে خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা كِتَابْ -এর উপর مُقَيَّدْ -কে বাতিল করা বা مَنْسُوْخ করা কোনোভাবেই জায়েজ নেই। তদুপরি আপনি مُطْلَقْ -কে- مُقَيَّدْ -এর উপর مَحْمُوْل করেছেন। তা এভাবে যে, ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক পেশকৃত فِيْ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ এ হাদীসটি مُطْلَقْ, এখানে عَوَامِلْ এবং غَيْرِ عَوَامِلْ -এর কোনো قَيْد নেই যার দ্বারা সাধারণ উট, গাভী এবং অন্যান্য জিনিসে জাকাত ওয়াজিব হয়। কিন্তু আপনি এটাকে لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ -এর উপর مَحْمُوْل করেছেন। অথচ আপনার মূলনীতি অনুযায়ী مُطْلَقْ -কে- مُقَيَّدْ -এর উপর مَحْمُوْل করা জায়েজ নেই।

উত্তর : خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ এ আয়াতটি বাহ্যিক অর্থে সর্বসম্মতিক্রমে مُطْلَقْ নয়। এখানে লক্ষণীয় যে, উক্ত আয়াতটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তমুক্ত। অথচ জাকাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফরজ হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এ আয়াতটি জাকাত গ্রহণ করা যে ওয়াজিব তা বর্ণনা করার জন্য এসেছে। অর্থাৎ জাকাত উসূল করা ওয়াজিব, আয়াতটি শুধু তা-ই বর্ণনা করেছে। তা ছাড়া অন্যান্য শর্তের ক্ষেত্রে আয়াতটি مُجْمَلْ, আর مُجْمَلْ -এর ব্যাখ্যা হাদীসের দ্বারা করা হয়। অতএব لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ এ হাদীসটি خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً -এর জন্য مُبْطِلْ এবং نَاسِخْ হবে না; বরং উক্ত হাদীস আয়াতের জন্য تَفْسِيْر -স্বরূপ ধরা হবে।

আমরা مُطْلَقْ হাদীসকে مُقَيَّدْ -এর উপর مَحْمُوْل করিনি; বরং مُقَيَّدْ -কে- مُؤَخَّرْ মেনেছি এবং مُطْلَقْ -কে- مُقَدَّمْ মেনেছি। আর مُؤَخَّرْ টি مُقَدَّمْ -এর জন্য نَاسِخْ হয়। অতএব اَحَادِيْثْ مُطْلَقَةْ - لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ مُقَيَّدْ -এর দ্বারা مَنْسُوْخْ হয়ে গেছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, سَائِمَةْ ঐ পশুকে বলে যা বছরের অধিকাংশ সময় নিজে মাঠে চরে খায়। অতএব যদি অধিকাংশ বছর বা অর্ধেক বছর সংগৃহীত ঘাস খাওয়ায় তাহলে তাকে عَلُوْفَةْ বলে। বছরের অধিকাংশ সময় সংগৃহীত ঘাস খাওয়ানোর সুরতে এজন্য عَلُوْفَةْ বলে যে, স্বল্প অধিকের অনুবর্তী হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া হবে পূর্ণ বছর তাকে সংগৃহীত ঘাস খাইয়েছে। আর অর্ধেক বছর-এর সুরতে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ -এর ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছে। তা এভাবে যে, অর্ধেক বছর মাঠে নিজে চরে ঘাস খেয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য করলে জাকাত ওয়াজিব হওয়া উচিত। আর যে অর্ধেক বছর সংগৃহীত ঘাস দ্বারা লালন-পালন করা হয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করলে জাকাত ওয়াজিব না হওয়া উচিত। এ সন্দেহের কারণে ওয়াজিব না হওয়ার দিককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সে عَلُوْفَةْ হবে, এতে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

وَلَايَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رَذَالَتَهُ وَيَأْخُذُ الْوَسْطَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَأْخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ أَيْ كَرَائِمِهَا وَخُذُوا مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ أَيْ أَوْسَاطِهَا وَلِأَنَّ فِيهِ نَظْرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ .

অনুবাদ : জাকাত সংগ্রহকারী উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে না আর নিকৃষ্ট সম্পদও গ্রহণ করবে না; বরং মধ্যম মানের গ্রহণ করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا تَأْخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَخُذُوا مِنْ حَوَاشِيْ أَمْوَالِهِمْ লোকদের উৎকৃষ্ট মাল থেকে গ্রহণ করো না; বরং তাদের মধ্যম মাল থেকে গ্রহণ কর। আর এজন্য যে, তাতে উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা এই যে, জাকাত উসুলকারী উৎকৃষ্ট সম্পদও গ্রহণ করবে না এবং নিকৃষ্ট সম্পদও গ্রহণ করবে না; বরং মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হতে কিছু নিম্নমানের এবং নিকৃষ্ট হতে কিছু উচ্চমানের সম্পদ হতে হবে। দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন–

لَا تَأْخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَخُذُوا مِنْ حَوَاشِيْ أَمْوَالِهِمْ - "তোমরা লোকদের উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ কর না; বরং মধ্যম মানের মাল গ্রহণ কর।"

حَزَرَاتٌ এটা حَزَرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– উৎকৃষ্ট, حَوَاشِيْ এটা حَاشِيَةٌ-এর বহুবচন। গ্রন্থকার এটার ব্যাখ্যা মধ্যম মানের সম্পদ দ্বারা করেছেন। এর সারমর্ম হলো, রাসূল ﷺ উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং মধ্যম মানের মাল গ্রহণ করার জন্য বলেছেন। ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক সংকলিত মুয়াত্তা (مُؤَطَّا)-এর মধ্যে আছে–

مَرَّ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِغَنَمِ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيْهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيْمٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا هٰذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوْا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عُمَرُ مَا اَعْطٰى هٰذِهِ اَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُوْنَ لَاتَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থ–হযরত ওমর (রা.) জাকাতের বকরির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বড় স্তনওয়ালা একটি মোটা বকরি দেখলেন তখন বললেন, এটা কিসের বকরি? লোকেরা জবাব দিলেন, এটা জাকাতের বকরি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এ বকরির মালিক এটাকে সন্তুষ্টিচিত্তে প্রদান করেননি। তোমরা লোকদেরকে বিপদে ফেল না। তোমরা লোকদের উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ কর না।

এ হাদীস দ্বারা উৎকৃষ্ট মাল জাকাতস্বরূপ গ্রহণ করা নিষেধ বুঝায় এবং রাসূল ﷺ হযরত মুআয (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন– إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ "সাবধান লোকদের উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখ।"

আকলী দলিল : মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করার দ্বারা জাকাতদাতা এবং গরিব উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা করা হয়। আর উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করলে শুধু গরিবের প্রতি সুবিবেচনা করা হয়। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট মাল গ্রহণ করলে শুধু জাকাতদাতার প্রতি সুবিবেচনা করা হয়। সুতরাং উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা করার প্রেক্ষিতে মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَالَ : وَمَنْ كَانَ لَهٗ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِىْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهٖ ضَمَّهٗ اِلَيْهِ وَزَكَّاهُ بِهٖ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) لَا يُضَمُّ لِاَنَّهٗ اَصْلٌ فِىْ حَقِّ الْمِلْكِ فَكَذَا فِىْ وَظِيْفَتِهٖ بِخِلَافِ الْاَوْلَادِ وَالْاَرْبَاحِ لِاَنَّهَا تَابِعَةٌ فِى الْمِلْكِ حَتّٰى مَلَكَتْ بِمِلْكِ الْاَصْلِ وَلَنَا اَنَّ الْمُجَانَسَةَ هِىَ الْعِلَّةُ فِى الْاَوْلَادِ وَالْاَرْبَاحِ لِاَنَّ عِنْدَهَا يَتَعَسَّرُ التَّمْيِيْزُ فَيَتَعَسَّرُ اِعْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ وَمَا شُرِطَ الْحَوْلُ اِلَّا لِلتَّيْسِيْرِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি নিসাবের অধিকারী হয় এবং বছরের মাঝে একই জাতীয় মাল লাভ করে, সে উক্ত মাল পূর্ববর্তী নিসাবের সাথে মিলাবে এবং এটার সাথে তারও জাকাত দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মিলানো হবে না। কেননা মালিকানা স্বত্বের দিক থেকে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং তৎসম্পৃক্ত বিধানের ক্ষেত্রেও তা স্বতন্ত্র হবে। অর্জিত মুনাফা এবং ভূমিষ্ঠ বাচ্চার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা মালিকানার ক্ষেত্রে [পূর্ববর্তী সম্পদের] অনুবর্তী। তাই মূল সম্পদের মালিকানায়ই এর মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আমাদের দলিল এই যে, বাচ্চা এবং মুনাফাযুক্ত করার কারণ কম সমজাতীয় হওয়া। কেননা, এ অবস্থায় পৃথকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। সুতরাং প্রতিটি অর্জিত সম্পদের জন্য আলাদা বর্ষ গণনা করা কষ্টকর হবে। অথচ সহজ করার জন্য বর্ষপূর্তি হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তির নিকট কোনো মালের নিসাব আছে। যেমন– কারো নিকট উটের নিসাব আছে। অতঃপর বছরের মাঝে আরো কিছু মাল অর্জন হলো। তাহলে এ অর্জিত মুনাফা দুই প্রকার– [১] উটের প্রজাতির হবে [২] উটের প্রজাতির হবে না। যেমন– তার নিকট উটের নিসাব ছিল। বছরের মাঝখানে গরু বা বকরি অর্জন হলো। দ্বিতীয় সুরতে অর্জিত মুনাফাকে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বের সম্পদের সাথে যুক্ত করা হবে না; বরং অর্জিত মুনাফার ক্ষেত্রে নতুন করে বর্ষপূর্তির হিসাব ধরা হবে।

প্রথম সুরত [অর্জিত মাল পূর্ববর্তী মালের প্রজাতির হওয়া] দুই প্রকার– [১] অর্জিত মুনাফা মূল সম্পদ হতে লাভ করা হবে। যেমন– উটের বাচ্চা বা মুনাফা। [২] অথবা পূর্বের উট হতে অর্জন হয়েছে। এমতাবস্থায় [প্রথম সুরতে] সর্বসম্মতিক্রমে অর্জিত মুনাফাকে পূর্বের সাথে যুক্ত করে মূল নিসাবের বর্ষকে অর্জিত মুনাফার বর্ষ গণ্য করা হবে। অতএব নতুন করে অর্জিত মুনাফার জন্য বর্ষপূর্তির কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি দ্বিতীয় সুরত হয়। যেমন– কারো নিকট উটের নিসাব আছে এবং বছরের মাঝখানে আরো কিছু উট অর্জন হলো, কিন্তু সেগুলো অর্জন হওয়ার سَبَبٌ বা কারণ হচ্ছে ক্রয়, হিবা বা মিরাস সূত্র। অর্থাৎ সে বছরের মাঝে আরো উট খরিদ করল অথবা কোনো ব্যক্তি তাকে কোনো সম্পদ হিবা করল অথবা মিরাসসূত্রে প্রাপ্ত হলো। তাহলে এ অবস্থায় আমাদের মতে অর্জিত মুনাফাকে মূল সম্পদের সাথে যুক্ত করে মূল সম্পদের উপর বর্ষপূর্তির পর পূর্ণ মালের জাকাত দেবে। অর্জিত মালে নতুন করে বর্ষপূর্তির কোনো প্রয়োজন নেই; বরং মূল নিসাবের বর্ষপূর্তিই যথেষ্ট।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, অর্জিত মুনাফায় জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নতুনভাবে বর্ষপূর্তি হওয়া শর্ত। আর সূচনা মালিক হওয়ার পর থেকে শুরু হবে। সুতরাং যখন এক বর্ষ পূর্ণ হবে তখন [অর্জিত মুনাফায়] জাকাত ফরজ হবে। চাই অর্জিত মুনাফা নিসাব পরিমাণ হোক বা না হোক।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : কেননা অর্জিত মুনাফা মালিকানাভুক্ত মাল হওয়ার ক্ষেত্রে মূল : কেননা সে এর মালিক ভিন্ন سَبَبٌ বা কারণে হয়েছে। অর্থাৎ মূল নিসাবের মালিক হওয়ার কারণ ভিন্ন। আর অর্জিত মুনাফা-এর মালিক হওয়ার কারণ ভিন্ন। সুতরাং অর্জিত মুনাফা মূল হওয়ার কারণে জাকাতের ক্ষেত্রে মূল হবে; কারো অনুবর্তী হবে না। অতএব বর্ষপূর্তির ক্ষেত্রে তা কারো অনুবর্তী হবে না; বরং তার উপর স্বতন্ত্র বর্ষপূর্তি হওয়া শর্ত। পক্ষান্তরে মুক্ত মাঠে বিচরণকারী পশুর বাচ্চা এবং এর থেকে অর্জিত مَنَافِعٌ-এর হুকুম ভিন্ন। কেননা এগুলো مُتَوَلِّدٌ হওয়ার ক্ষেত্রে মূলের অনুবর্তী। মূলের মালিক হওয়ার দ্বারা এটারও মালিক হবে। অর্থাৎ যে কারণে মূলের মালিক হয়েছে সেই কারণে বাচ্চা এবং مَنَافِعٌ -এর মালিক হয়েছে। এ কারণে বর্ষপূর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো মূলের অনুবর্তী হবে। সুতরাং মূলের উপর বর্ষপূর্তি হলে অনুবর্তীর ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তি ধরা হবে। নতুন করে বর্ষপূর্তির কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের দলিল হচ্ছে বাচ্চা এবং مَنَافِعٌ -কে মূলের সাথে যুক্ত করার কারণ হলো جِنْسِيَّةٌ বা একই প্রজাতীয় হওয়া। অর্থাৎ বাচ্চা যেহেতু একই প্রজাতির, এ কারণে বাচ্চা অনুবর্তী ধরে মূলের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আর একই প্রজাতির হওয়ার সময় মূল নিসাব এবং অর্জিত মুনাফার পার্থক্য করা কঠিন। কেননা অর্জিত মুনাফা অনেক سَبَبٌ -এর কারণে অনেক বেশি। এজন্য প্রত্যেক অর্জিত মুনাফার ক্ষেত্রে ভিন্ন করে বর্ষপূর্তির হিসাব করা কষ্টকর। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট বকরির নিসাব আছে। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কিছু বকরি বাচ্চা প্রসব করল। অতঃপর আরো কিছু বকরি ক্রয় করল। কিছুদিন পর কিছু বকরি দানস্বরূপ প্রাপ্ত হলো। আবার কিছুদিন পর মিরাসসূত্রে কিছু বকরির মালিক হলো। এর কিছুদিন পর কিছু বকরি বাচ্চা প্রসব করল। এরপর বকরির মূল নিসাবের উপর বর্ষপূর্তি হলো। কিন্তু মাঝখানে বিভিন্ন সময়ে যেসব বকরি অর্জন করেছে তার উপর বর্ষপূর্তি একই সময়ে হবে না; বরং পরপর বিভিন্ন সময়ে বর্ষপূর্তি হবে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন করে বর্ষপূর্তির হিসাব করা [কখন কার বর্ষ পূর্ণ হয়েছে] অনেক কষ্টকর। বিশেষ করে যখন কারো নিকট রৌপ্যমুদ্রা থাকে এবং সে যদি দোকানদার হয় আর প্রতিদিন এক রৌপ্যমুদ্রা তার অর্জন হয়। এমতাবস্থায় প্রতিদিন অর্জিত রৌপ্যমুদ্রার ভিন্ন ভিন্ন করে বর্ষ পূর্ণ হওয়ার হিসাব করা চরম কঠিন। এদিকে বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয়েছে সহজ করার জন্য। অতএব যদি প্রত্যেক অর্জিত মালের ক্ষেত্রে নতুন করে বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে সহজ-এর স্থানে কঠিন হয়ে যাবে। এজন্য আমরা বলেছি, অর্জিত মাল যদি মূল নিসাবের প্রজাতির হয় তাহলে অর্জিত মাল মূল নিসাবের অনুবর্তী হবে এবং মূল নিসাবে বর্ষ পূর্ণ হওয়াকে অর্জিত মালে বর্ষ পূর্ণ হওয়া গণ্য করা হবে। অতএব মূল নিসাবে বর্ষপূর্তির পর পূর্ণ মালের জাকাত দিতে হবে। চাই তা মূল নিসাব হোক বা অর্জিত মাল হোক।

قَالَ وَالزَّكٰوةُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) فِى النِّصَابِ دُوْنَ الْعَفْوِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ (رح) فِيْهِمَا حَتّٰى لَوْ هَلَكَ الْعَفْوُ وَبَقِىَ النِّصَابُ بَقِىَ كُلُّ الْوَاجِبِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ زُفَرَ (رح) يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ لِمُحَمَّدٍ وَ زُفَرَ(رح) اَنَّ الزَّكٰوةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ وَالْكُلُّ نِعْمَةٌ وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ وَلَيْسَ فِى الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ عَشْرًا وَهٰكَذَا قَالَ فِىْ كُلِّ نِصَابٍ نَفَى الْوُجُوْبَ عَنِ الْعَفْوِ وَلِاَنَّ الْعَفْوَ تَبَعٌ لِلنِّصَابِ فَيُصْرَفُ الْهَلَاكُ اَوَّلًا اِلَى التَّبَعِ كَالرِّبْحِ فِىْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلِهٰذَا قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رح) يُصْرَفُ الْهَلَاكُ بَعْدَ الْعَفْوِ اِلَى النِّصَابِ الْاَخِيْرِ ثُمَّ اِلَى الَّذِىْ يَلِيْهِ اِلٰى اَنْ يَنْتَهِىَ لِاَنَّ الْاَصْلَ هُوَ النِّصَابُ الْاَوَّلُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ تَابِعٌ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ يُصْرَفُ اِلَى الْعَفْوِ اَوَّلًا ثُمَّ اِلَى النِّصَابِ شَائِعًا ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, জাকাত আরোপিত হয় নিসাবের উপর। [স্তরের উপর] বাড়তি অংশের উপর নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ ও জুফার (র.) বলেন, নিসাব ও বাড়তি উভয় অংশের উপর জাকাত আরোপিত হয়। সুতরাং যদি [স্তরের উপর] বাড়তি অংশ নষ্ট হয়ে যায় আর নিসাব রক্ষিত থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, ওয়াজিব পুরোপুরি থেকে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ এবং জুফার (র.)-এর মতে, যে পরিমাণ মাল হালাক হয়েছে, ওয়াজিবও সেই অনুপাতে রহিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম জুফার (র.) এর দলিল হলো, জাকাত ওয়াজিব হয়েছে সম্পদের শোকর হিসেবে। আর সমগ্র সম্পদই নিয়ামত। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ -এর হাদীস– فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ وَلَيْسَ فِى الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ عَشْرًا অর্থ–পাঁচটি سَائِمَةٌ [নিজে চরে খায় এমন] উটের ক্ষেত্রে একটি বকরি ওয়াজিব হয়। বাড়তির উপর কিছুই ওয়াজিব হয় না, সংখ্যা দশে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত। প্রতিটি নিসাবের ক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ বলেছেন। যে বাড়তির উপর ওয়াজিব হবে না। তাছাড়া বাড়তি অংশ হলো নিসাবের অনুবর্তী। সুতরাং নষ্ট হওয়ার বিষয়টি প্রথমে বাড়তির উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন– মুযারাবার মালের মুনাফার উপর প্রযোজ্য হয়। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সম্পদের বাড়তি অংশের পর হালাক হওয়ার বিষয়টি শেষ নিসাবের দিকে ফিরানো হবে। এরপর তৎসংলগ্ন নিসাবের প্রতি ফিরানো হবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত ফিরানো হবে। কেননা প্রথম নিসাবই হলো মূল। তারপর যা কিছু বাড়বে তা উক্ত নিসাবের অনুবর্তী হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, প্রথমে বাড়তি অংশের দিকে ফিরানো হবে। অতঃপর সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ নিসাবের দিকে ফিরানো হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সম্পদের একটি হচ্ছে নিসাব আর একটি হচ্ছে বাড়তি অংশ। যেমন– পাঁচটি উটে একটি বকরি ওয়াজিব হয় এবং নয় পর্যন্ত এই একটি বকরিই ওয়াজিব হয়। যখন দশটি হয় তখন দুটি বকরি ওয়াজিব হবে। পাঁচ উট এবং দশ উট হচ্ছে নিসাব, কিন্তু ছয় হতে নয় পর্যন্ত হলো বাড়তি সংখ্যা। অনুরূপভাবে পঁচিশটি উটে একটি بِنْتُ مَخَاضٍ আর ছত্রিশটি উটে একটি بِنْتُ لَبُوْنٍ, কিন্তু এতদুভয়ের মাঝেরগুলো হচ্ছে বাড়তি সংখ্যা। উক্ত মাসআলায় ইমামদের মাঝে মতানৈক্য আছে। বাড়তি সংখ্যা বা অংশের জাকাত দিতে হবে কিনা? ইমাম আবূ হানীফা এবং আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, নিসাবের পরিমাণের শুধু জাকাত দিতে হবে। বাড়তি অংশের জাকাত দিতে হবে না। ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতও অনুরূপ। এটা তাঁর নতুন মত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম জুফার (র.) বলেছেন, নিসাব এবং বাড়তি অংশ উভয়ের উপর জাকাত ফরজ হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট যদি নয়টি উট থাকে তাহলে এতে একটি বকরি জাকাত হিসেবে ওয়াজিব হবে। তবে শায়খাইন-এর মতে, এ একটি বকরি পাঁচটি উটের বাবদে ওয়াজিব হবে। আর চারটি উটকে বাড়তি ধরা হবে। এতে কোনো জাকাত ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, এ একটি বকরি নয়টি উটের জাকাত হিসেবে ধরা হবে। মতানৈক্যের ফলাফল নিম্নের উদাহরণে প্রকাশ পাবে যে, কোনো ব্যক্তির মালিকানায় নয়টি উট ছিল এবং এগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর এগুলো হতে চারটি উট মারা গেল তাহলে শায়খাইনের মতে, অবশিষ্ট পাঁচটি উটে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম জুফার (র.)-এর মতে একটি বকরির মূল্যের নয় ভাগের পাঁচ ভাগ ওয়াজিব হবে। আর চার ভাগ মাফ হয়ে যাবে। অথবা উদাহরণ স্বরূপ, কারো মালিকানায় আশিটি বকরি আছে। তাহলে বর্ষপূর্তির পর তার উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে। তবে যদি বর্ষপূর্তির পর চল্লিশটি বকরি মারা যায়, তাহলে শায়খাইনের মতে, অবশিষ্ট চল্লিশ বকরি পূর্ণ নিসাব। এতে একটি বকরি ওয়াজিব ছিল। তা-ই ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম জুফার (র.)-এর মতে যেহেতু জাকাতের সম্পর্ক নিসাব এবং বাড়তি উভয়ের সঙ্গে সেহেতু তাদের মতে, আশি বকরির মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব হয়েছে। বর্ষপূর্তির পর অর্ধেক মারা গেল। সুতরাং অর্ধেক বকরির জাকাত রহিত হয়ে যাবে। অতএব তার উপর একটি বকরির অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম জুফার (র.)-এর দলিল হলো, সম্পদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য জাকাত ওয়াজিব হয়েছে। সম্পূর্ণ মালই নিয়ামত, চাই তা বাড়তি হোক বা নিসাব হোক। সুতরাং জাকাতের সম্পর্ক সমগ্র সম্পদের সঙ্গে হবে। জাকাতের যে পরিমাণ ওয়াজিব হয়েছিল তা সমগ্র সম্পদের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। এর সমর্থন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক জারিকৃত জাকাতের ফরমান থেকে পাওয়া যায়। তাঁর ফরমানে আছে– فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ "পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশ উটে একটি بِنْتُ مَخَاضٍ দিতে হবে।"

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি بِنْتُ مَخَاضٍ পঁয়ত্রিশ উটের পক্ষ থেকে জাকাত। অথচ পঁচিশটি উটে জাকাতের নিসাব হয়। অবশিষ্ট দশটি উট বাড়তি। অনুরূপভাবে চল্লিশ হতে একশ বিশটি পর্যন্ত বকরিতে একটি বকরি ওয়াজিব হয়। একশ বিশ-এর পর থেকে দুইশত পর্যন্ত দুটি বকরি ওয়াজিব হবে। দু'শতকের পর থেকে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বকরি ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, জাকাত নিসাব এবং বাড়তি অংশ উভয়ের উপর ওয়াজিব হয়। শুধু নিসাবের উপর ওয়াজিব হয় না।

শায়খাইনের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ وَلَيْسَ فِى الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ عَشْرًا "মুক্ত মাঠে বিচরণকারী পাঁচটি উটে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। বাড়তি অংশে কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। যতক্ষণ দশ পর্যন্ত না পৌঁছে।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, পাঁচটি উট এবং দশটি উটের যে নিসাব রয়েছে, তাতে জাকাত ওয়াজিব হয়। পাঁচ এবং দশ উটের মাঝে যে চারটি উট বাড়তি, এতে জাকাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক নিসাবের বাড়তি অংশে জাকাতের وُجُوْبُ-কে نَفْىٌ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, জাকাতের সম্পর্ক শুধু নিসাবের সঙ্গে; বাড়তি অংশের সঙ্গে নয়।

আকলী দলিল : عَقْلِىْ دَلِيْل এই যে, বাড়তি অংশ নিসাবের পর সাবিত হয়। এজন্য বাড়তি অংশ নিসাবের অনুবর্তী হবে। যে ব্যক্তির নিকট নিসাব এবং বাড়তি মাল আছে, এমতাবস্থায় কিছু মাল নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে এটা [নষ্ট মাল] বাড়তি মাল

হতে গণ্য করা হবে। মূল নিসাব হতে গণ্য করা হবে না। যেমন- مُضَارَبَة-এর মালের লাভ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কাউকে شِرْكَةُ مُضَارَبَة হিসেবে মাল ব্যবসা করতে দিল এবং এতে লাভ হলো। মুযারিব (مُضَارِبْ) নিয়মিত ব্যবসা করে আসছে। হঠাৎ কিছু মাল নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে নষ্ট মাল প্রথমে লাভ হতে ধরা হবে। মূল নিসাব হতে ধরা হবে না। বলা হবে, লাভের অংশ নষ্ট হয়েছে। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, যে পরিমাণ নষ্ট হয়েছে তা বাড়তি অংশের পর সর্বশেষ নিসাব হতে ধরা হবে।

অর্থাৎ নষ্ট মাল যদি বাড়তি অংশের থেকে বেশি হয় তাহলে একে শেষ নিসাবের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করা হবে। যদি এর দ্বারাও পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব এর সঙ্গে যা মিলে আছে তার প্রতি প্রত্যাবর্তিত করা হবে। কেননা প্রথম নিসাবই হচ্ছে মূল আর যা কিছু এর থেকে বাড়তি হবে, তা অনুবর্তী ধরা হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, প্রথমে বাড়তি অংশের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করা হবে। এর দ্বারা যদি পূর্ণ না হয় তাহলে পূর্ণ নিসাবের প্রতি عَلٰى سَبِيْلِ الشُّيُوْعِ প্রত্যাবর্তিত করা হবে। এর উদাহরণ এই যে, কোনো ব্যক্তির নিকট চল্লিশটি উট আছে। বর্ষপূর্তির পর বিশটি উট ধ্বংস হয়ে গেল। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অবশিষ্ট বিশ উটে চারটি বকরি ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একটি بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর ছত্রিশ ভাগের বিশ ভাগ ওয়াজিব হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একটি بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের দলিল হলো, জাকাতের সম্পর্ক নিসাব এবং বাড়তি অংশ উভয়ের সাথে। অতএব চল্লিশ উট হতে বিশটি ধ্বংস হয়ে গেলে অর্ধেক জাকাত রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের দলিল হলো, ছত্রিশের পর চারটি তো বাড়তি। অর্থাৎ ধ্বংস হওয়া বিশটি উট হতে চারটি عَفْو [বাড়তি]-এর মধ্যে গণ্য হবে এবং বলা হবে যে, عَفْو বা বাড়তি উট হতে চারটি উট ধ্বংস হয়ে গেছে। যার সাথে জাকাত সম্পর্কিত ছিল না। সুতরাং ঐ চারটি ধ্বংস হওয়ার কারণে জাকাতে কোনো অংশ রহিত হবে না। আর অবশিষ্ট ষোলটিকে পূর্ণ নিসাবের সাথে মিলানো হবে। বলা হবে যে, ছত্রিশটি উটে একটি بِنْتُ لَبُوْنٍ ওয়াজিব। কিন্তু যখন ষোলটি উট ধ্বংস হলো তখন بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর ছত্রিশ ভাগ হতে ষোল ভাগ রহিত হয়ে যাবে এবং বিশ ভাগ বিদ্যমান থাকবে। যেমন- بِنْتُ لَبُوْنٍ-এর মূল্য ছত্রিশ শত টাকা। তাহলে ষোল শত টাকা রহিত হয়ে যাবে। আর দুই হাজার টাকা বিদ্যমান থাকবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ধ্বংস হওয়া বিশটি উট হতে চারটি عَفْو বা বাড়তি হতে ধরা হবে। অর্থাৎ বলা হবে যে, বাড়তি চারটি উট সাঁইত্রিশ হতে চল্লিশ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর ধ্বংস হওয়া উটকে শেষ নিসাবের সঙ্গে মিলানো হবে। অর্থাৎ বলা হবে যে, পঁচিশের পর ছত্রিশ পর্যন্ত এগারটি উট ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু ধ্বংস হওয়া উটের সংখ্যা অদ্যাবধি পূর্ণ হয়নি বিধায় শেষ নিসাবের সঙ্গে যা সংযুক্ত আছে তার সাথে মিলানো হবে। অর্থাৎ বলা হবে যে, বিশের পর থেকে পঁচিশ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন ধ্বংস হওয়া উটের সংখ্যা পূর্ণ হবে। সুতরাং বিশটি উট অবশিষ্ট থাকলে এতে চার বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা বিশ উটে চার বকরি ওয়াজিব হয়।

وَإِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ الْخَرَاجَ وَصَدَقَةَ السَّوَائِمِ لَا يُثَنَّى عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ وَالْجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ وَأَفْتَوْا بِأَنْ يُعِيدُوهَا دُونَ الْخَرَاجِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِأَنَّهُمْ مَصَارِفُ الْخَرَاجِ لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةً وَالزَّكٰوةُ مَصْرَفُهَا الْفُقَرَاءُ فَلَا يَصْرِفُونَهَا إِلَيْهِمْ وَقِيلَ إِذَا نَوٰى بِالدَّفْعِ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُ وَكَذَا مَا دُفِعَ إِلٰى كُلِّ جَائِرٍ لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِعَاتِ فُقَرَاءُ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ ـ

অনুবাদ : খারেজীরা বা বিদ্রোহীরা যদি খেরাজ এবং গবাদি পশুর জাকাত উসুল করে নিয়ে থাকে, তবে তাদের উপর দ্বিতীয়বার জাকাত ধার্য করা হবে না। কেননা শাসক তাদেরকে রক্ষা করেননি। আর রাজস্ব আদায়ের অধিকার হয় রক্ষা করার বিনিময়ে। তবে তাদের এই ফতোয়া দেওয়া হবে যেন তারা জাকাত নিজেই পুনরায় আদায় করে; খেরাজ নয়। তবে এটা শুধু তাদের ও আল্লাহর মাঝের বিষয়। কেননা বিদ্রোহীরা যোদ্ধা হিসেবে বিদ্রোহীদের উপর খেরাজ ব্যয় হতে পারে। আর জাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র হলো দরিদ্ররা। আর বিদ্রোহীগণ দরিদ্রের মধ্যে জাকাত প্রদান করবে না। তবে কারো কারো মতে যদি তাদেরকে প্রদানের সময় তাদের উপর সদকা করার নিয়ত করে নেয় তাহলে তার উপর থেকে জাকাত রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ যে কোনো জালিম হাকিমকে প্রদত্ত মালের একই হুকুম। কেননা তাদের উপর [মানুষের যত আর্থিক] হক এবং দায়দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলোর প্রেক্ষিতে তারা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র, তবে প্রথম হুকুম [অর্থাৎ পুনরায় আদায়] অধিক সতর্কতাপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خَوَارِجْ মুসলমানদের ঐ দলকে বলা হয়, যারা ইনসাফগার খলীফার আনুগত্য হতে বের হয়ে খলীফাকে হত্যা করা এবং তার মাল ছিনিয়ে নেওয়াকে হালাল মনে করে।

তাদের বিশ্বাস, যদি কোনো ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে অথবা কবীরা গুনাহ করে, সে কাফির হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা জায়েজ হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, যদি সে তওবা করে [কাফির হবে না]। তাদের দলিল–

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَإِنَّ لَهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ـ "যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ-এর অবাধ্যতা করবে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।"

এ দলটির জন্ম এভাবে হয়েছে যে, ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর পরস্পর মতানৈক্য দূর করার জন্য সাহাবাদের এক জামাতকে সালিস মান্য হলো। তাদের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে সালিস ছিলেন এবং হযরত আমর ইবনে আস (রা.) হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর পক্ষে সালিস ছিলেন। এ প্রস্তাবের পর হযরত আলী (রা.)-এর জামাত হতে একদল লোক তার আনুগত্য হতে বিদ্রোহ করে হারুরা (حَرُوْرَاءْ) নামক স্থানে জমায়েত হলো এবং ঘোষণা দিল যে, হযরত আলী (রা.) হকপন্থি ইমাম নন, বিধায় সালিস নিযুক্ত করেছেন। তিনি হক ইমাম হলে সালিস নিযুক্ত করতেন না। হযরত আলী (রা.) তাদেরকে বুঝানোর জন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে পাঠালেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাদেরকে হাদীসের দলিল দ্বারা বুঝালেন। তার বুঝানোর ফলে অনেকে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করত তাঁর আনুগত্যে ফিরে আসলেন। অবশিষ্ট লোকেরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে নাহরাওয়ান এলাকায় একত্রিত হলো। মনগড়াভাবে এমন অভিনব আকীদা–মাসআলা বলা শুরু করে দিল যার ফলে হযরত আলী (রা.)-এর

উপর তুফান সৃষ্টি হলো। হযরত আলী (রা.) হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-কে ছেড়ে নাহরাওয়ান-এর বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। কেননা তারা ইসলামি আকীদা এবং সুন্নতের ক্ষেত্রে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তাদের হত্যা এবং হামলা করে ছত্রভঙ্গ করে দিল, কিন্তু এ হতভাগারা দূর-দূরান্ত দেশে চলে গেল। এ ঘটনার পর থেকে বিদ্রোহী কর্তৃক হযরত আলী (রা.)-এর উপর আক্রমণের আশঙ্কা করা হতো। পরিশেষে ইবনে মুলজিম হযরত আলী (রা.)-কে নামাজরত অবস্থায় শহীদ করে দিয়েছে। এখন সূরতে মাসআলা এই হবে যে, বিদ্রোহীরা আহলে হকের নগরে প্রবেশ করল। তারা কাফিরদের থেকে জোরপূর্বক রাজস্ব আদায় করল এবং মুসলমানদের থেকে তাদের গবাদি পশু হতে জাকাত আদায় করল। এরপর ন্যায়পরায়ণ খলীফা অভিযান চালিয়ে তাদের উপর বিজয়ী হলেন। এমতাবস্থায় তাদের থেকে পুনঃ রাজস্ব এবং জাকাত আদায় করা হবে কি না?

জবাব : এর জবাব হলো, পুনরায় আদায় করা হবে না। দলিল হচ্ছে– ন্যায়পরায়ণ খলীফা তাদের রক্ষা করেনি। আর রাজস্ব ওয়াজিব হয় হেফাজত করার কারণে। ন্যায়পরায়ণ খলীফা বিদ্রোহীদের [আক্রমণ] থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব তাদের উপর জাকাত ফরজ হবে না। অর্থাৎ কাফিররা যখন আনুগত্য স্বীকার করে বসবাস করতে সম্মত হলো, তখন তারা আমাদের দায়দায়িত্বে এসে গেল। অতএব আমাদের নিজেদের জান-মালের হেফাজতের ন্যায় তাদের জান-মালের হেফাজত করা ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাদের থেকে রাজস্ব এজন্য গ্রহণ করা হয় যে, এর দ্বারা সৈনিকদের লালন করা হবে। আর সৈনিকরা তাদের জীবন ও সম্পদকে শত্রুর হামলা হতে হেফাজত করবে। অতএব ন্যায়পরায়ণ খলীফা তাদেরকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ এবং আগ্রাসন হতে রক্ষা করতে পারেনি। সুতরাং সে রাজস্বের অধিকারী কিভাবে হবে? হযরত ওমর (রা.)-এর ফরমানও এর সমর্থন করে। ফরমানটি হলো, একদা হযরত ওমর (রা.) কোনো এক গভর্নর বা কর্মকর্তার নিকট বার্তা পাঠালেন যে, إِنْ كُنْتَ لَا تَحْمِيهِمْ فَلَا تُجْبِهِمْ "যদি তুমি তাদের রক্ষা করতে না পার তাহলে তাদের থেকে রাজস্ব গ্রহণ করো না।" তবে সেখানের লোকদেরকে دِيَانَتْ-এর ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়া হবে যে, তারা যেন নিজেরা অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে পুনরায় জাকাত প্রদান করে, তবে রাজস্ব পুনরায় আদায় করবে না।

উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, বিদ্রোহীরা রাজস্বের খাত। তা এভাবে যে, বিদ্রোহীরা কাফির নয়; বরং মুসলমান। তবে হাঁ তারা বিদ্রোহী মুসলমান। যদি কাফিররা دَارُ الْإِسْلَامِ বা ইসলামি রাষ্ট্রে হামলা করে তাহলে বিদ্রোহীরা মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র হেফাজত করার জন্য যুদ্ধ করে। যেহেতু তারা কাফিরদের মোকাবিলায় জিহাদ করে। সুতরাং তারাও রাজস্বের খাত হবে। কেননা তারা রাষ্ট্রকে কাফিরদের হামলা হতে হেফাজত করে বিধায় তারাই রাজস্বের খাত। সুতরাং দ্বিতীয়বার রাজস্ব আদায় করার ফতোয়া দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে জাকাতের খাত হলো গরিব মুসলমান। বিদ্রোহীরা রাজস্ব গরিবদের জন্য খরচ করবে না। কেননা তাঁদের মতে أَهْلُ عَدْلٍ বা ন্যায়পরায়ণ মুসলমানকে হত্যা করা مُبَاحٌ বা অবকাশ আছে। সারকথা হলো, ন্যায়পরায়ণ মুসলমানদের জাকাত সঠিক খাতে খরচ হয়নি, বিধায় দিয়ানতের (دِيَانَتْ) ভিত্তিতে দ্বিতীয়বার জাকাত আদায় করার ফতোয়া দেওয়া হবে।

ফকীহ আবূ জাফর (র.) বলেছেন, যদি মালিক বিদ্রোহীদের প্রদান করার সময় জাকাত আদায় করার নিয়ত করে তাহলে এর দ্বারা জাকাত রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শক্তিশালী জালিমকে রাজস্ব দেওয়ার সময় যদি জাকাত আদায় করার নিয়ত করে, তাহলে তার দায়িত্ব হতে জাকাত রহিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার জাকাত আদায় করার তেমন প্রয়োজন নেই। এ মতের দলিল এই যে, অত্যাচারীদের উপর তাদের অত্যাচার সমূহের কারণে মানুষের যত আর্থিক হক বা দায়দায়িত্ব ওয়াজিব হয়েছে। যদি এ অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের জমাকৃত ধন-সম্পদ দ্বারা মানুষের হক আদায় করা শুরু করে তাহলে তাদের মালিকানায় কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। পরিণামে তারা ফকির হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং অত্যাচারীকে জাকাত প্রদান করার অর্থ হবে গরিবকে জাকাত প্রদান করা। আর গরিবদেরকে জাকাত প্রদান করার দ্বারা জাকাত আদায় হয়ে যায়। অতএব এ জালিমদেরকে জাকাত প্রদান করার দ্বারা জাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো প্রদান করার সময় জাকাতের নিয়ত করতে হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, প্রথম মতটি অধিক সতর্কতাপূর্ণ। কেননা দ্বিতীয়বার স্বয়ং গরিবদের জাকাত প্রদান করার দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে দ্বিতীয় মতটি বেশি সহজ। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ بَنِيْ تَغْلِبَ فِيْ سَائِمَتِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ لِاَنَّ الصُّلْحَ قَدْ جَرٰى عَلٰى ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ صِبْيَانِهِمْ -

অনুবাদ : বনূ তাগলিব গোত্রের শিশুদের সায়েমা (سَائِمَةٌ)-এর উপর কিছুই ওয়াজিব নয়, তবে তাদের স্ত্রী লোকদের উপর পুরুষের সমপরিমাণ ওয়াজিব হবে। কেননা [তাদের ব্যাপারে] সমঝোতা হয়েছে যে, মুসলমানদের থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তাদের নিকট থেকে তার দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে। আর মুসলমানদের স্ত্রী লোকদের থেকে তো জাকাত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তাদের শিশুদের থেকে গ্রহণ করা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বনূ তাগলিব আরবের খ্রিষ্টানদের একটি শ্রেণী। এরা রুমের নিকটের অধিবাসী ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) যখন তাদের উপর কর নির্ধারণের ইচ্ছা করলেন, তখন তারা বললেন, আমরাও আরবের লোক। কর প্রদানে আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে।
যদি আপনি আমাদের উপর কর নির্ধারণ করেন তাহলে আমরা পালিয়ে আপনাদের শত্রু রুমীদের নিকট চলে যাব। আপনি আমাদের নিকট হতে তা-ই গ্রহণ করুন যা মুসলমানদের নিকট হতে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ আমাদের থেকে জাকাত গ্রহণ করুন। এমনকি আপনি যদি আমাদের থেকে দ্বিগুণ জাকাত আদায় করেন তথাপি আমরা সম্মত আছি। হযরত ওমর (রা.) সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাদের সাথে সন্ধি করলেন এই মর্মে যে, তাদের থেকে মুসলমানদের জাকাতের দ্বিগুণ আদায় করা হবে। অর্থাৎ মুসলমানদের থেকে প্রতি শতক হতে আড়াই টাকা আদায় করা হয়। আর তাদের প্রতি শতক হতে পাঁচ টাকা আদায় করা হবে।
হযরত ওমর (রা.)-এর পরবর্তী খলীফা হযরত ওসমান (রা.) পূর্বের সন্ধির প্রতি কোনো আপত্তি উথাপন করেননি। এজন্যে এ সন্ধির উপর আমল করা পরবর্তী সমস্ত উম্মতের জন্য কর্তব্য।
এখন মাসআলা হলো, বনূ তাগলিবের শিশুদের সায়েমা (سَائِمَةٌ) পশুর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব নয়। তবে তাদের মহিলাদের উপর ঐ পরিমাণ ওয়াজিব হবে যে পরিমাণ তাদের পুরুষদের উপর ওয়াজিব হয়। কেননা বনূ তাগলিবের সঙ্গে এ মর্মে সন্ধি হয়েছে যে, মুসলমানদের থেকে যে পরিমাণ গ্রহণ করা হবে তাদের থেকে তার দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে। যেহেতু মুসলমান বাচ্চাদের থেকে কিছুই নেওয়া হয় না, এজন্য তাদের শিশুদের থেকেও কিছুই নেওয়া হবে না। আর মুসলমান মহিলাদের থেকে নেওয়া হয়, এজন্য তাদের মহিলাদের থেকেও নেওয়া হবে। তবে তাদের মহিলাদের থেকে ঐ পরিমাণ গ্রহণ করা হবে, যে পরিমাণ তাদের পুরুষদের থেকে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের উপর যা ওয়াজিব হয়, তার দ্বিগুণ নেওয়া হবে।
হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, বনূ তাগলিবের মহিলাদের থেকেও কিছু নেওয়া হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম জুফার (র.)-এরও অভিমত। কেননা এটা কর। আর মহিলাদের উপর কর ওয়াজিব হয় না।

وَاِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ سَقَطَتِ الزَّكٰوةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَضْمَنُ اِذَا هَلَكَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْاَدَاءِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ فِى الذِّمَّةِ فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلِاَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَصَارَ كَالْاِسْتِهْلَاكِ وَلَنَا اَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنَ النِّصَابِ تَحْقِيْقًا لِلتَّيْسِيْرِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ مَحَلِّهِ كَدَفْعِ الْعَبْدِ الْجَانِىْ بِالْجِنَايَةِ يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ وَالْمُسْتَحِقُّ فَقِيْرٌ يُعَيِّنُهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ الطَّلَبُ وَبَعْدَ طَلَبِ السَّاعِىْ قِيْلَ يَضْمَنُ وَقِيْلَ لَا يَضْمَنُ لِانْعِدَامِ التَّفْوِيْتِ وَفِى الْاِسْتِهْلَاكِ وُجِدَ التَّعَدِّىْ وَفِىْ هَلَاكِ الْبَعْضِ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ اِعْتِبَارًا لَهُ بِالْكُلِّ ـ

অনুবাদ : জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি মাল নষ্ট হয়ে যায় তবে জাকাত রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আদায়ের ক্ষমতার পর যদি হালাক হয়ে যায়, তাহলে তার জিম্মায় জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা জাকাত জিম্মার উপর ওয়াজিব। সুতরাং এটা সদকাতুল ফিতরের মতো হলো। তা ছাড়া সে তলব করার পরও আদায় করেনি। সুতরাং তা এমন হয়ে গেল যেন নিজেই মাল ধ্বংস করেছে। আমাদের দলিল এই যে, ওয়াজিব হলো নিসাবেরই একটি অংশ– সহজসাধ্য হওয়ার প্রতি বিবেচনা করে। সুতরাং ওয়াজিবের ক্ষেত্র হওয়ার কারণে ওয়াজিবও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন– অপরাধকারী গোলাম মারা গেলে অপরাধের কারণে তাকে সমর্পণ করার দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। আর জাকাতের হকদার হলো সেই দরিদ্র, যাকে নিসাবের মালিক নিজে নির্বাচন করবে। সুতরাং এখানে তো নির্বাচিত দরিদ্র থেকে তলব পাওয়া যায়নি। জাকাত উসুলকারীর তলব করার পরে হালাক হলে কোনো কোনো মতে জিম্মায় ওয়াজিব হবে। আবার কোনো কোনো মতে জিম্মায় ওয়াজিব থাকবে না। কেননা সে নিজে হালাক করেনি। আর স্বেচ্ছায় হালাক করার ক্ষেত্রে তার থেকে সীমালঙ্ঘন পাওয়া গেছে [সুতরাং শাস্তিস্বরূপ ওয়াজিবের ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে বলে গণ্য হবে]। আংশিক মাল হালাক হলে সেই অনুপাতে জাকাত রহিত হবে। আংশিককে পূর্ণের উপর কিয়াস করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি মাল নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এর জাকাতও রহিত হয়ে যাবে। এটাই ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, যদি জাকাত ফরজ হওয়ার পর জাকাত আদায়ে সক্ষম হওয়ার পরে মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে জাকাত রহিত হবে না; বরং জাকাতের পরিমাণ তার জিম্মায় ওয়াজিব হবে। আর জাকাত আদায় করার উপর সক্ষম হওয়ার অর্থ হলো, নিসাবের মালিক বর্ষপূর্তির পর জাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিকে জাকাত প্রদান করার সুযোগ পেল– অন্বেষণ করার পরে দেখা পায় বা অন্বেষণ করা ছাড়াই দেখা পায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, জাকাত জিম্মায় ওয়াজিব হয়। আর যার জিম্মায় কোনো জিনিস ওয়াজিব হয়, তা আদায়ে অক্ষমতার কারণে দায়িত্বমুক্ত হয় না। যেমন– হজ, সদকাতুল ফিতর এবং কর্জ। অর্থাৎ কারো উপর সদকায়ে ফিতর, হজ এবং কর্জ ওয়াজিব ছিল। অতঃপর তার পূর্ণ মাল হালাক হয়ে গেল, তাহলে তার দায়িত্ব হতে সদকাতুল ফিতর, হজ এবং কর্জ রহিত হবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো, জাকাত আল্লাহর হক। আদায়ে সক্ষম হওয়ার পর মহান আল্লাহ خِطَابٌ -এর মাধ্যমে তার

থেকে এ হক তলব করেছেন। [আল্লাহর خِطَابٌ -এর দ্বারা تَقْدِيْرِ خِطَابٌ উদ্দেশ্য], কিন্তু সে আদায় করেনি। এ মাল নষ্ট হওয়া দ্বারা এমন জ্ঞান করা হবে যে, পাওনাদার তলব করার পরও সে হক প্রদানে বিরত থাকল। আর পাওনাদার তলব করার পর বিরত থাকার দ্বারা যিমান (ضَمَانٌ) ওয়াজিব হয়। যেমন– নিজে নিজে মাল নষ্ট করলে যিমান ওয়াজিব হয়।

আমাদের দলিল : আমাদের দলিল হলো, জাকাত জিম্মায় ওয়াজিব হয় না; বরং সরাসরি মালে ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ জাকাত নিসাবের অংশবিশেষ।

কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ "প্রত্যেক চল্লিশটি বকরিতে একটি বকরি [জাকাত স্বরূপ] ওয়াজিব।" এখানে فِىْ শব্দটি جُزْئِيَّتْ বা অংশ বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ চল্লিশ বকরিতে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। এর এই মর্ম নয় যে, চল্লিশ বকরির জাকাত হলো, আলাদা একটি বকরি দিবে ঐ চল্লিশ বকরি ব্যতীত; বরং এর মর্ম হলো, ঐ চল্লিশ বকরি হতে একটি বকরি দিবে। যা ঐ চল্লিশ বকরির অংশবিশেষ। নিসাবের এক অংশকে জাকাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে সহজ করার জন্য। কেননা নিসাবের এক অংশকে জাকাতের জন্য ভিন্ন করা সহজ। সারকথা হলো, জাকাত নিসাবের মালের অংশবিশেষ। আর এ অংশ নিসাবের মালের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এ অংশ মাল নষ্ট হওয়ার কারণে রহিত হয়ে গেছে। কেননা যখন পূর্ণ মাল নষ্ট হয়ে যায় তখন জাকাতের অংশকে আলাদা করা সম্ভব নয়। অতএব জাকাতের অংশ আলাদা করা সম্ভব না হওয়ার কারণে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং জাকাত রহিত হয়ে যাবে। এটা এরূপ যে, কারো ক্রীতদাস কোনো ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করল। এর হুকুম হলো, হত্যাকারী গোলামকে নিহত ব্যক্তির وَلِىٌّ বা অভিভাবক-এর নিকট প্রদান করা হবে। অথবা এর ফিদ্য়া দেওয়া হবে এবং মালিকের সম্মতি থাকতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, যদি ঐ গোলামকে সোপর্দ করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে গোলামের মালিকের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। পূর্বে বলা হয়েছে যে, জাকাত জিম্মায় ওয়াজিব হয় না; বরং সরাসরি মালে ওয়াজিব হয়। আর সদ্কায়ে ফিত্র ও অন্যান্য জিনিস জিম্মায় ওয়াজিব হয়। সুতরাং জাকাতকে সদকাতুল ফিত্র এর উপর কিয়াস করা জায়েজ নেই।

وَالْمُسْتَحِقُّ فَقِيْرٌ يُعَيِّنُهُ الْمَالِكُ -এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিলের জবাব। জবাবের সারকথা হলো জাকাতের হকদার প্রত্যেক ফকির নয়; বরং ঐ ফকির যাকে মালিক নির্ধারণ করে। যদি মালিক কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারণ না করে, তাহলে তলব সাবিত হবে না। আর তলব না পাওয়ার কারণে, তলবের পর নিষেধ করা সাবিত হবে না। আর নিষেধ করা না পাওয়ার কারণে মাল থাকার সুরতে যিমান ওয়াজিব হবে না।

যদি জাকাত উসুলকারী জাকাত চায় আর মালিক জাকাত না দেয়, এমতাবস্থায় যদি পূর্ণ মাল হালাক হয়ে যায়, তাহলে শায়খ আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে, এ ব্যক্তি জাকাতের জামিন হবে। যখন সে মালের মালিক হবে, তখন তাকে পূর্বের সেই হালাক হওয়া মালের জাকাত দিতে হবে। মাওয়ারাউন নহরের মাশায়েখদের মতে, পূর্বের মালের জামিন হবে না।

শায়খ আবুল হাসান কারখী (র.)-এর দলিল হলো, জাকাত উসুলকারীকে জাকাত উসুল করার জন্য যেহেতু নির্ধারিত করা হয়েছে। সে তলব করার পরও নিষেধ করেছে বিধায় তার নিষেধ করাই নষ্ট করার সমতুল্য ধরা হবে। আর নষ্ট করার সুরতে যিমান ওয়াজিব হয়। অতএব, এ সুরতে তার উপর জাকাতের জরিমানা ওয়াজিব হবে।

মাওয়ারাউন নহরের মাশায়েখদের দলিল হলো, জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকাটা মাল নষ্ট করার সমতুল্য নয়। কেননা হতে পারে যে, সে অন্য স্থানে প্রদানের উদ্দেশ্যে বিরত রয়েছে। অতএব জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকাটা মাল নষ্ট করা নয় বিধায় সে জামিনও হবে না।

وَفِى الْاِسْتِهْلَاكِ -এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিয়েছেন। জবাবের সার-সংক্ষেপ হলো, মাল নষ্ট করার সুরতে যেহেতু মালিকের পক্ষ হতে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন পাওয়া গিয়েছে। এজন্য শাস্তি হিসেবে তার উপর যিমান ওয়াজিব করা হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি কিছু মাল নষ্ট হয়ে যায়, আর কিছু মাল অবশিষ্ট থাকে, তাহলে নষ্ট মালের জাকাত রহিত হয়ে যায় বিধায় কিয়দংশ মাল নষ্ট হওয়ার সুরতে সে অনুপাতে জাকাত রহিত হয়ে যাবে।

وَإِنْ قَدَّمَ الزَّكٰوةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ لِأَنَّهُ أَدّٰى بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوْبِ فَيَجُوْزُ كَمَا إِذْ كَفَّرَ بَعْدَ الْجُرْحِ وَفِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ (رحـ) وَيَجُوْزُ التَّعْجِيْلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِوُجُوْدِ السَّبَبِ وَيَجُوْزُ لِنُصُبٍ إِذَا كَانَ فِيْ مِلْكِهٖ نِصَابٌ وَاحِدٌ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) لِأَنَّ النِّصَابَ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصْلُ فِي السَّبَبِيَّةِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ تَابِعٌ لَهٗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : যদি নিসাবের মালিক হওয়া অবস্থায় বর্ষপূর্তির পূর্বে জাকাত প্রদান করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা ওয়াজিব হওয়ার কারণ তথা নিসাব বিদ্যমান হওয়ার পরে সে জাকাত আদায় করেছে। সুতরাং তা জায়েজ হবে। যেমন [ভুলবশত] জখম করার পর কাফ্‌ফারা দিয়ে দিলে [তা আদায় হয়ে যায়]। এ বিষয়ে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। একাধিক বছরের অগ্রিম জাকাত প্রদান করা জায়েজ আছে। কেননা [জাকাত ওয়াজিব হওয়ার] কারণ [নিসাব] বিদ্যমান রয়েছে। যদি তার মালিকানায় একটি নিসাব বিদ্যমান থাকে তবে কয়েকটি নিসাবের জাকাতও প্রদান করতে পারে। এ ব্যাপারে ইমাম জুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলিল এই যে, سَبَبْ বা কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম নিসাবই আসল। এর উপর অতিরিক্ত হলো তার অনুবর্তী। আল্লাহ অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা এই যে, আমাদের মতে নিসাবের মালিকের বর্ষপূর্তির পূর্বে জাকাত আদায় করা জায়েজ আছে। এটাই ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র.)-এর মতে জায়েজ নেই।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, বর্ষপূর্তি জাকাতের জন্য শর্ত। যেমন নিসাব পরিমাণ হওয়া শর্ত। বলা বাহুল্য যে, مَشْرُوْط [জাকাত আদায়]-কে شَرْط-এর অগ্রে করা জায়েজ নেই। অতএব বর্ষপূর্তির পূর্বে জাকাত আদায় করা জায়েজ হবে না।

আমাদের দলিল : আমাদের দলিল এই যে, সে ব্যক্তি سَبَبْ وُجُوْب বা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ [নিসাব]-এর পর জাকাত আদায় করেছে। আর سَبَبْ وُجُوْب -এর পর জাকাত আদায় করা জায়েজ আছে। যেমন– কোনো ব্যক্তি কাউকে ভুলবশত গুলি মারল এবং তাকে এমন ক্ষত করল যে, তার জীবনের আশা নেই। ভুলবশত হত্যার কারণে একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করা উচিত। যদি ক্ষত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই ঐ ক্রীতদাসকে স্বাধীন করে দেয়, তাহলে জায়েজ আছে। কেননা سَبَبْ قَتْل বা হত্যার কারণ পাওয়া গেছে। তদ্রূপ যদি কেউ أَوَّلْ وَقْت বা ওয়াক্তের শুরুতে নামাজ আদায় করে, তাহলে তা জায়েজ আছে। কেননা নামাজ سَبَبْ বা সময় আসার পর আদায় করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব এই যে, বর্ষপূর্তি হওয়া জাকাতের وُجُوْب أَدَاءْ বা আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। এটা جَوَازْ أَدَاءْ বা আদায় জায়েজ হওয়ার শর্ত নয়। অর্থাৎ বর্ষপূর্তির পর জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়। এর পূর্বে ওয়াজিব হয় না। এর এই মর্ম নয় যে, বর্ষপূর্তির পর জাকাত আদায় করা জায়েজ আছে এবং এর পূর্বে জায়েজ নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এক বছরের পূর্বেও আগাম জাকাত প্রদান করা জায়েজ আছে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কয়েক বছরের জাকাত আগাম প্রদান করে তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা জাকাতের سَبَبْ বা নিসাব বিদ্যমান আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে দু'বছরের জাকাত অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কয়েক বছরের জাকাত অগ্রিম প্রদান করায় কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি

কারো মালিকানায় একটি নিসাব আছে; কিন্তু সে কয়েক নিসাবের জাকাত অগ্রিম আদায় করে দিল, তাহলে এটা জায়েজ হবে ; তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম জুফার (র.)-এর ভিন্নমত আছে। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট পাঁচটি উট আছে। সে ব্যক্তি বর্ষপূর্তির পূর্বে চারটি বকরি জাকাত হিসেবে আদায় করে দিল, তাহলে বিশটি উট হতে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম জুফার (র.)-এর মতে শুধু চারটি উটের জাকাত আদায় হয়েছে বলে ধরা হবে।

অবশিষ্ট পনরটি উটের পুনরায় জাকাত প্রদান করা আবশ্যক হবে।

ইমাম জুফার (র.)-এর দলিল : ইমাম জুফার (র.)-এর দলিল হলো, প্রত্যেক নিসাব জাকাতের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। অতএব দ্বিতীয় নিসাবের উপর জাকাত অগ্রিম প্রদান করা এমন যেমন প্রথম নিসাবের অগ্রে করা। আর জাকাত আদায় করার সময় যেহেতু দ্বিতীয় নিসাব বিদ্যমান ছিল না, এজন্য এর উপর জাকাত অগ্রে দেওয়া প্রকৃতপক্ষে হুকুমকে سَبَبْ বা কারণের উপর مُقَدَّمْ বা অগ্রে করা। আর এটা জায়েজ নেই। এজন্য আমরা বলেছি যে, যে নিসাব বিদ্যমান আছে, এর জাকাত অগ্রে দেওয়া জায়েজ আছে। তবে যে নিসাব উপস্থিত নেই, এর জাকাত অগ্রে প্রদান করা জায়েজ নেই।

আমাদের দলিল : আমাদের দলিল এই যে, سَبَبْ বা কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম নিসাবই প্রধান। এর থেকে যা অতিরিক্ত তা প্রথমটির অনুবর্তী। প্রধানটি বিদ্যমান থাকার দ্বারা অনুবর্তীটি বিদ্যমান থাকা ধরা হবে। বলা হবে যে, জাকাত আদায় করার সময় প্রথম নিসাব বিদ্যমান আছে, তাই দ্বিতীয় নিসাব যা প্রথমটির অনুবর্তী; সেটিও বিদ্যমান আছে বলে জ্ঞান করা হবে। আর দ্বিতীয় নিসাব জাকাত আদায় করার সময় বিদ্যমান আছে, তাই হুকুমকে سَبَبْ-এর উপর অগ্রে করা لَازِمْ আসবে না। এটা এমন, যেমন কোনো ব্যক্তির নিকট প্রথমে একটি নিসাব ছিল। অতঃপর বছরের শেষে অতিরিক্ত নিসাবের মালিক হলো। তারপর প্রথম নিসাবের বর্ষ পূর্ণ হলো। অবশিষ্ট নিসাবের বর্ষ পূর্ণ হলো না, তাহলে বলা হবে যে, সমূহ নিসাবের উপর বর্ষপূর্তি হয়েছে। সবগুলোর জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় নিসাবকে জাকাত অগ্রে প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম বর্ষে বিদ্যমান থাকা গণ্য করা হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

بَابُ زَكٰوةِ الْمَالِ

فَصْلٌ فِي الْفِضَّةِ : لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالْاُوْقِيَةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ اِلٰى مُعَاذٍ (رض) اَنْ خُذْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَمِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً مِنْ ذَهَبٍ نِصْفَ مِثْقَالٍ ـ

পরিচ্ছেদ : সম্পদের জাকাত

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত : দু'শ দিরহামের নীচে কোনো জাকাত নেই। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالْاُوْقِيَةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا "পাঁচ আওকিয়ার নীচে কোনো জাকাত নেই। আর এক আওকিয়ার পরিমাণ হলো চল্লিশ দিরহাম"–[বুখারী]। দিরহাম যখন দু'শ হবে এবং তার উপর বর্ষপূর্তি হবে তখন তাতে পাঁচ দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা] ওয়াজিব হবে। কেননা রাসূল ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-এর নামে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেছেন যে, প্রতি দু'শ দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম গ্রহণ কর এবং প্রতি বিশ মিছকাল স্বর্ণ হতে অর্ধ মিছকাল গ্রহণ কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আরবদের নিকট সায়েমা (سَائِمَةٌ) পশুকে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। এজন্য এর বর্ণনা অগ্রে আনা হয়েছে। এর বর্ণনা থেকে ফারিগ হওয়ার পর জাকাতের অন্যান্য সম্পদের আলোচনা আনা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, সম্পদ ঐ জিনিসকে বলে মানুষ যার মালিক হয়। যেমন– রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, গম, জব, পশু, কাপড় ও অন্যান্য বস্তু। তবে এখানে সম্পদ দ্বারা সায়েমা (سَائِمَةٌ) ব্যতীত অন্য সম্পদ উদ্দেশ্য। রৌপ্যের জাকাত প্রথমে বর্ণনা করেছেন। এরপর স্বর্ণের জাকাত বর্ণনা করেছেন। কেননা রাসূল ﷺ-এর ফরমানে রৌপ্যের জাকাতের বর্ণনা অগ্রে এসেছে। আর স্বর্ণের জাকাতের বর্ণনা পরবর্তীতে এসেছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, রৌপ্যের লেনদেন ব্যাপক। এজন্য একে অগ্রে এনেছেন।

اُوْقِيَةٌ শব্দটির মূল হচ্ছে وِقَايَةٌ, এর অর্থ রক্ষা করা। اُوْقِيَةٌ স্বীয় মালিককে অভাব ও অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করে। এজন্য একে اُوْقِيَةٌ বলা হয়। এর বহুবচন اَوَاقٌ এক اُوْقِيَةٌ চল্লিশ দিরহামের সমপরিমাণ। গ্রন্থকার বলেছেন, রৌপ্যের নিসাব দু'শ দিরহাম। সুতরাং-এর কমে জাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি দু'শ রৌপ্যমুদ্রা থাকে এবং এর উপর বর্ষপূর্তি হয় তাহলে এতে পাঁচ দিরহামের সমপরিমাণ রৌপ্য ওয়াজিব হবে। এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ হযরত মুআয (রা.)-এর নিকট প্রেরিত পত্রে বলেছেন, প্রতি দু'শ রৌপ্যমুদ্রা হতে পাঁচ দিরহাম গ্রহণ কর। আর প্রতি বিশ মিছকাল স্বর্ণ হতে অর্ধ মিছকাল গ্রহণ কর।

قَالَ وَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ اَرْبَعِيْنَ فَيَكُوْنُ فِيْهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَزَكٰوتُهُ بِحِسَابِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ (رضـ) وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِهِ وَلِاَنَّ الزَّكٰوةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ وَاشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الْاِبْتِدَاءِ لِتَحَقُّقِ الْغِنَاءِ وَبَعْدَ النِّصَابِ فِي السَّوَائِمِ تَحَرُّزًا عَنِ التَّشْقِيْصِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ (رضـ) لَا تَاْخُذْ مِنَ الْكُسُوْرِ شَيْئًا قَوْلُهُ فِيْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْاَرْبَعِيْنَ صَدَقَةٌ وَلِاَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوْعٌ وَفِيْ اِيْجَابِ الْكُسُوْرِ ذٰلِكَ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوْفِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدَّرَاهِمِ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَهُوَ اَنْ تَكُوْنَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقِيْلَ بِذٰلِكَ جَرَى التَّقْدِيْرُ فِيْ دِيْوَانِ عُمَرَ (رضـ) وَاسْتَقَرَّ الْاَمْرُ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, নিসাবের অতিরিক্তের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। চল্লিশে গিয়ে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এরপর প্রতি চল্লিশে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন বলেন, দু'শর বেশি যা হবে, তার জাকাতেও সেই হিসাব হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও অভিমত। কেননা হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে– وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِهِ দু'শর উপরে যা অতিরিক্ত হবে, তার জাকাত সেই হিসেবেই হবে।" তাছাড়া জাকাত তো ওয়াজিব হয়েছে সম্পদের শোকর হিসেবে। তবে প্রারম্ভে নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে অভাবমুক্ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। আর গবাদি পশুর ক্ষেত্রে [প্রারম্ভিক] নিসাবের পরেও বিশেষ স্তরে পৌছার শর্তারোপ করা হয়েছে খণ্ড খণ্ড করার অসুবিধা পরিহার করার জন্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হযরত মুআয (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত ব্যক্যটি– لَا تَاْخُذْ مِنَ الْكُسُوْرِ شَيْئًا "নিসাবের ভগ্নাংশ থেকে কিছু গ্রহণ কর না।" তদ্রূপ হযরত আমর ইবনে হাজম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْاَرْبَعِيْنَ صَدَقَةٌ "চল্লিশ দিরহামের নীচে কোনো জাকাত নেই।" তা ছাড়া অসুবিধার অবস্থা শরিয়তে পরিহার্য। আর ভগ্নাংশের জাকাত ওয়াজিব করার মধ্যে অসুবিধা রয়েছে। কেননা ভগ্নাংশের হিসাব কঠিন। দিরহামের ক্ষেত্রে وَزْنُ سَبْعَةٍ [ওজনে সাবআ'] গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ প্রতি দশ দিরহামের ওজন হবে সাত মিছকাল। হযরত ওমর (রা.)-এর অর্থ দফতরের হিসাবে এই পরিমাণই প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীতে এটিই স্থায়ীরূপ লাভ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, যদি রৌপ্যমুদ্রা দু'শর বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে হ্যাঁ যদি অতিরিক্ত অংশ চল্লিশ দিরহাম পরিমাণ হয়। যেমন– কারো নিকট দু'শ চল্লিশ দিরহাম থাকে, তাহলে এতে ছয় দিরহাম ওয়াজিব হবে। তারপর প্রতি চল্লিশে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

সাহেবাইন বলেছেন, দু'শর বেশি হলে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। সে অতিরিক্ত অংশ কম হোক বা বেশি হোক। সুতরাং যদি দু'শর থেকে এক দিরহাম অতিরিক্ত হয়, তাহলে পাঁচ দিরহাম এবং এক দিরহামের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও অভিমত।

সাহেবাইন-এর দলিল : সাহেবাইনের দলিল হলো, হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে আছে– وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِهِ "দু'শর উপর যা অতিরিক্ত হবে তার জাকাত সেই হিসেবে গ্রহণ করা হবে।" দ্বিতীয় দলিল হলো, জাকাত সম্পদের শোকর হিসেবে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং দু'শর উপর যা অতিরিক্ত হয়েছে তাও সম্পদ। চাই সে অতিরিক্ত অংশ চল্লিশ দিরহাম হোক বা তার থেকে কম হোক। অতিরিক্ত হলে হিসাব মোতাবেক শোকর আদায় করা ওয়াজিব হবে। وَاشْتِرَاطُ النِّصَابِ-এর দ্বারা সাহেবাইনের عَقْلِيْ دَلِيْل বর্ণনা করেছেন এবং وَلِأَنَّ الزَّكٰوةَ-এর উপর যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তার জবাব প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন : যদি জাকাত সম্পদের শোকর হিসেবে ওয়াজিব হয়, তাহলে প্রারম্ভে নিসাবের কেন শর্ত আরোপ করা হয়েছে? কেননা যেভাবে নিসাবের পরিমাণ মাল সম্পদ তদ্রূপ নিসাবের কমও সম্পদ। অতএব যে কোনো পরিমাণের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হওয়া উচিত, চাই তা নিসাব পরিমাণ হোক বা তার থেকে কম হোক।

উত্তর : জাকাত ধনীদের উপর ওয়াজিব হয়; গরিবদের উপর ওয়াজিব হয় না। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তাদের ধনীদের থেকে [জাকাত] গ্রহণ কর, আর তাদের গরিবদের নিকট প্রদান করো। ধনী এবং গরিবের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হিসেবে নিসাবের পরিমাণকে নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ নিসাবের পরিমাণের মালিককে ধনী বলা হবে আর এর থেকে কম মালের মালিককে ধনী বলা হবে না; বরং গরিব বলা হবে। মোট কথা, ধনী হওয়া সাবিত করার জন্য প্রারম্ভে নিসাবের শর্তারোপ করা হয়েছে। আর مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ-এর মধ্যে অতিরিক্ত দ্বারা غِنٰى-এর অতিরিক্ত উদ্দেশ্য। غِنٰى-এর মধ্যে কম ও বেশি উভয়ের মধ্যে অতিরিক্ত সাবিত হয়। এজন্য আমরা বলেছি, নিসাবের পরিমাণ থেকে যা অতিরিক্ত হবে, সে হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন : সায়েমা (سَائِمَةٌ)-এর ক্ষেত্রে নিসাবের পর যে কোনো সংখ্যা অতিরিক্ত হলে কেন জাকাত ওয়াজিব হয় না? যেমন– পাঁচ উটে একটি বকরি ওয়াজিব হয়। আর যদি চারটি উট অতিরিক্ত হয় তাহলে এ অতিরিক্ত সংখ্যায় কোনো ধরনের জাকাত ওয়াজিব হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ অতিরিক্ত সংখ্যা নিসাব পরিমাণ না হয়। যখন উটের সংখ্যা দশে পৌছবে তখন দুটি বকরি ওয়াজিব হবে।

উত্তর : সায়েমা (سَائِمَةٌ)- এর ক্ষেত্রে নিসাবের পর যে কোনো অতিরিক্ত সংখ্যায় জাকাত ওয়াজিব হয় না– খণ্ড খণ্ড করার অসুবিধা পরিহার করার জন্য। অর্থাৎ পাঁচ উটের উপর যদিও আরো চার উট বৃদ্ধি হয়, তাহলে এ চার উটের জাকাত এক বকরির পাঁচ ভাগের চার ভাগ হবে। আর এ সুরতে বকরিকে খণ্ড করা لَازِم হচ্ছে। যদিও তা মূল্যের দিক থেকে হোক না কেন।

অতএব খণ্ড খণ্ড করার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সায়েমা (سَائِمَةٌ) -এর মধ্যে নিসাবের পর যে কোনো অতিরিক্ত সংখ্যার মধ্যে জাকাত ওয়াজিব করা হয়নি; বরং অতিরিক্ত সংখ্যা যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে জাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন– পাঁচ উটের উপর আরো পাঁচ উট অতিরিক্ত হলো, তাহলে দুই বকরি ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়েমেন দেশে গভর্নর বানিয়ে পাঠানোর সময় বলেছেন– لَا تَأْخُذْ مِنَ الْكُسُوْرِ شَيْئًا "নিসাবের ভগ্নাংশ থেকে কিছু গ্রহণ কর না;" বরং নিসাবের অতিরিক্ত অংশ চল্লিশ হলে জাকাত গ্রহণ কর। আর চল্লিশের কম যেহেতু ভগ্নাংশ, বিধায় এর থেকে কিছু গ্রহণ কর না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, হযরত আমর ইবনে হাজম (রা.)-এর হাদীস– لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْأَرْبَعِيْنَ صَدَقَةٌ "চল্লিশের কমে কোনো জাকাত ওয়াজিব নয়;" বরং চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, এ হুকুম দু'শ দিরহামের পরবর্তী চল্লিশের ক্ষেত্রে।

অর্থাৎ দু'শর পর চল্লিশ দিরহামের কমে জাকাত ওয়াজিব নয়, তবে চল্লিশ দিরহামে জাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা দু'শ দিরহামের পূর্বে চল্লিশ দিরহামে জাকাত ওয়াজিব হবে না এবং [দু'শর পর] চল্লিশের কমেও জাকাত ওয়াজিব হবে না।

প্রশ্ন : হযরত আমর ইবনে হাজম (রা.)-এর হাদীসটি হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে নিম্নে বর্ণিত- مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ হাদীসটির বিপরীত। বিপরীত এভাবে যে, হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে আছে, দু'শর বেশি হলেই জাকাত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে হযরত আমর ইবনে হাজম (রা.)-এর হাদীসে আছে যে, দু'শর উপর যদি চল্লিশ দিরহাম অতিরিক্ত হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশে জাকাত ওয়াজিব হবে। এর কম হলে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

উত্তর : উক্ত হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসের যেখানে এ সম্ভাবনা আছে যে, যে-কোনো অতিরিক্ত সংখ্যা হতে পারে সেখানে এ সম্ভাবনাও আছে যে, দু'শর অতিরিক্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- চল্লিশ দিরহামের অতিরিক্ত হওয়া। দ্বিতীয় সুরত উদ্দেশ্য করা অবস্থায় উভয় রেওয়ায়েতে কোনো বৈপরীত্য থাকবে না।

আকলী দলিল হলো, অসুবিধা শরিয়তে পরিহার্য। অথচ ভগ্নাংশে জাকাত ওয়াজিব করার দ্বারা অসুবিধা হয়। কেননা ভগ্নাংশ হিসাব করা অসম্ভব। যেমন- কোনো ব্যক্তির মালিকানায় দু'শ সাত দিরহাম আছে। সাহেবাইনের মতে তার উপর দু'শ দিরহামের জাকাত পাঁচ দিরহাম এবং সাত দিরহামের জাকাত এক দিরহামের চল্লিশ ভাগের সাত ভাগ ওয়াজিব হবে। জাকাত প্রদানের পর তার নিকট এক দিরহামের চল্লিশ ভাগের তেত্রিশ ভাগ এবং দু'শ এক দিরহাম বিদ্যমান থাকবে। এখন যদি এর উপর দ্বিতীয় বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলে দু'শ দিরহামে পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে এবং এক দিরহামে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে এবং তেত্রিশ ভগ্নাংশে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। এখানে চিন্তা-ভাবনার বিষয় যে, তেত্রিশ ভগ্নাংশে হিসাব করে এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বের করা কত কঠিন ব্যাপার। আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব। ঐ সব লেখাপড়া না জানা মানুষের কি অবস্থা হবে যারা একশ এর উপর গুনতেও পারে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এই অসুবিধা এবং জটিলতা পরিহার করার জন্য বলেছেন যে, ভগ্নাংশে জাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং যদি দু'শর পরে চল্লিশ দিরহাম অতিরিক্ত হয়, তাহলে জাকাত ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, জাকাতের নিসাব, মহর, সদকাতুল ফিত্‌র ও চুরির নিসাবের ব্যাপারে ওজনে সাব্‌আ' (وَزْنُ سَبْعَةٍ) গ্রহণযোগ্য। ওজনে সাবআ' হলো প্রতি দশ দিরহামের ওজন হবে সাত মিছকাল। এর تَحْقِيْق হলো, প্রাথমিক যুগে তিন ধরনের দিরহামের প্রচলন ছিল। যথা-

১. ওজনে আশারা (وَزْنُ عَشَرَةٍ), ২. ওজনে সিত্তা (وَزْنُ سِتَّةٍ) এবং ৩. ওজনে খামসা (وَزْنُ خَمْسَةٍ)।

ওজনে আশারা এমন দশ দিরহাম যা দশ মিছকালের সমান।

ওজনে সিত্তা এমন দশ দিরহাম যা ছয় মিছকালের সমান।

ওজনে খামসা এমন দশ দিরহাম যা পাঁচ মিছকালের সমান।

উক্ত তিনটি ওজনের মধ্যে ওজনে আশারা উত্তম। আর ওজনে খামসা সর্বনিম্ন। সাধারণ মানুষ তিনটির উপর আমল করত এবং তিনটির দ্বারা লেনদেন করত। যখন হযরত ওমর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি মনস্থ করলেন যে, জাকাত এবং রাজস্ব উত্তম ওজনে অর্থাৎ ওজনে আশারা দ্বারা উসুল করবেন। তখন লোকেরা খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট কমানোর জন্য আবেদন জানালেন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) হিসাব বিশেষজ্ঞদের সমবেত করলেন- তিন ওজনের মধ্যে মধ্যম ওজন নির্ধারণ করার জন্য। যাতে উভয়ের প্রতি সুবিবেচনা হয়। তারা তিনটি ওজনের মিছকালকে একত্রিত করলে এর সংখ্যা দাঁড়াল একুশ। আর ওজন যেহেতু তিনটি ছিল, এজন্য একুশ মিছকালকে তিনভাগে বিভক্ত করলেন। তখন প্রতি ভাগে সাত মিছকাল হলো। অর্থাৎ মধ্যম ওজন এই হলো যে, প্রতি দশ দিরহাম সাত মিছকালের সমপরিমাণ। একে ওজনে সাবআ' বলে। এর উপর সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.)-এর দফতরে লেনদেন হতো। পরবর্তীতে এ ওজনই চলে আসছে।

وَاِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْفِضَّةِ وَاِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغَشُّ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْعُرُوْضِ يُعْتَبَرُ اَنْ تَبْلُغَ قِيْمَتُهُ نِصَابًا لِاَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُوْ عَنْ قَلِيْلِ غَشٍّ لِاَنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ اِلَّا بِهٖ وَتَخْلُوْ عَنِ الْكَثِيْرِ فَجَعَلْنَا الْغَلَبَةَ فَاصِلَةً وَهُوَ اَنْ يَّزِيْدَ عَلَى النِّصْفِ اِعْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ وَسَنَذْكُرُ فِى الصَّرْفِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِلَّا اَنَّ فِىْ غَالِبِ الْغَشِّ لَابُدَّ مِنْ نِيَّةِ التِّجَارَةِ كَمَا فِىْ سَائِرِ الْعُرُوْضِ اِلَّا اِذَا كَانَ تَخْلُصُ مِنْهَا فِضَّةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا لِاَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِىْ عَيْنِ الْفِضَّةِ الْقِيْمَةُ وَلَا نِيَّةُ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : কোনো রৌপ্য বস্তুতে রুপার পরিমাণ যদি বেশি হয়, তবে সবটুকুই রুপা হিসেবেই গণ্য হবে। আর খাদ যদি বেশি হয় তবে তা পণ্যদ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে। তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হওয়ার বিষয়টি বিবেচিত। কারণ দিরহামে সামান্য খাদ থাকেই। কেননা তা খাদ ছাড়া জমাট বাঁধে না, তবে অধিক পরিমাণ খাদ থেকে [সাধারণত] মুক্ত থাকে। তাই পরিমাণের আধিক্যকে পার্থক্যকারী হিসেবে গণ্য করেছি। আর আধিক্যের অর্থ হলো অর্ধেক থেকে বেশি হওয়া– বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রেখে। সরফ (صَرْف) অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করব। তবে খাদ অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে [জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে] ব্যবসার নিয়ত থাকা অপরিহার্য। যেমন অন্যান্য বাণিজ্য পণ্যের ক্ষেত্রে। তবে যদি তা থেকে রুপা পৃথক করে নেওয়া হয়। আর তা নিসাব পরিমাণ হয় [তবে ব্যবসার নিয়ত করা জরুরি নয়]। কেননা শুধু রুপার ক্ষেত্রে মূল্য কিংবা ব্যবসার নিয়ত ধর্তব্য নয়। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَرِقْ - وَاو-এর উপর যবর এবং رَا-এর নীচে যের। অর্থ রৌপ্যের বস্তু। যেমন– দিরহাম ইত্যাদি।

غَشّ - غَيْن-এর নীচে যের এবং شِيْن-এর উপর তাশদীদ। অর্থ ঘোলাটে, ময়লা, খাদ। এখানে غَشّ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রৌপ্য এবং স্বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ধাতু যা রৌপ্যের মধ্যে ঢেলে রুপার বস্তু তৈরি করা হয়। আর এটা সর্বজনমান্য যে, রৌপ্য এবং স্বর্ণের বস্তু খাদ ছাড়া জমাট বাঁধে না। এখন সূরতে মাসআলা হলো এই যে, কোনো রৌপ্যের বস্তুতে যদি রৌপ্যের পরিমাণ বেশি থাকে আর খাদ কম থাকে তাহলে পূর্ণটাই রৌপ্য হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মধ্যে রৌপ্যের জাকাত ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে যদি খাদ বেশি থাকে তাহলে তা পণ্যদ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মূল্য অনুমান করে দেখা হবে। তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে জাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলাটি দলিলসহ বর্ণনা করেছেন। দিরহাম এবং অন্যান্য রৌপ্যের বস্তুতে কিছু খাদ যুক্ত করা আবশ্যক। কেননা খাদ ব্যতীত রুপার বস্তু জমাট হয় না, তবে খাদের পরিমাণ অধিক হওয়া আবশ্যক নয়। এজন্য আমরা কম এবং বেশির মধ্যে আধিক্যকে পার্থক্যরূপে গণ্য করেছি। আধিক্য হলো অর্ধেকের বেশি হওয়া। অতএব যদি রুপা অর্ধেকের বেশি হয় এবং খাদ অর্ধেকের কম হয় তাহলে সবটুকুই রুপা হিসেবে গণ্য হবে এবং এতে রুপার জাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে পণ্যদ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে। তার হুকুম অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতো হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, খাদ অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যবসার নিয়ত করা অপরিহার্য। কেননা এ অবস্থায় এটা পণ্যদ্রব্যের হুকুমে। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, রুপা এবং স্বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যবসার নিয়ত করা আবশ্যক। যদি রুপার বস্তুতে রুপা কম থাকে তবে যদি একে পৃথক করলে এর পরিমাণ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে অর্থাৎ দু'শ দিরহাম পরিমাণ হয় তাহলে এর রুপায় রৌপ্যের জাকাত ওয়াজিব হবে। মূল্য ধর্তব্য হবে না এবং ব্যবসার নিয়তও ধর্তব্য হবে না। কেননা সরাসরি রুপার মধ্যে ঐ দুটোর [মূল্য ও ব্যবসার নিয়ত] ধর্তব্য হয় না। আল্লাহই অধিক অবগত।

فَصْلٌ فِى الذَّهَبِ : لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً مِنْ ذَهَبٍ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً فَفِيْهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ لِمَا رَوَيْنَا وَالْمِثْقَالُ مَا يَكُوْنُ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنْهَا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ الْمَعْرُوْفُ ثُمَّ فِىْ كُلِّ اَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ قِيْرَاطَانِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ رُبْعُ الْعُشْرِ وَذٰلِكَ فِيْمَا قُلْنَا اِذْ كُلُّ مِثْقَالٍ عِشْرُوْنَ قِيْرَاطًا وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ اَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ صَدَقَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ بِحِسَابِ ذٰلِكَ وَهِىَ مَسْاَلَةُ الْكُسُوْرِ وَكُلُّ دِيْنَارٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِى الشَّرْعِ فَيَكُوْنُ اَرْبَعَةُ مَثَاقِيْلَ فِىْ هٰذَا كَاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا ـ

অনুচ্ছেদ : স্বর্ণের জাকাত

অনুবাদ : বিশ মিছকাল স্বর্ণের নীচে জাকাত ওয়াজিব নয়। যখন বিশ মিছকাল হবে তখন তাতে অর্ধ মিছকাল ওয়াজিব হবে। দলিল পূর্বোক্ত হাদীসটি। মিছকালের [দীনারের] পরিমাণ হলো এর সাতটির ওজন দশ দিরহামের সমান হবে। এটাই প্রচলিত। এরপর প্রতি চার মিছকালে দুই কীরাত ওয়াজিব হবে। কেননা, দশমাংশের এক চতুর্থাংশ [বা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ] হলো জাকাতের ওয়াজিবের পরিমাণ। আর তা হলো আমরা যা বলেছি। অর্থাৎ দুই কীরাত। কারণ, প্রতি মিছকালের ওজন বিশ কীরাত। বর্ধিত অংশ চার মিছকালের কম হলে জাকাত নেই। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইনের মতে সেই অনুপাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। এটা মূলত ভগ্নাংশের মাসআলা। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রতি দীনার দশ দিরহামের সমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চার মিছকাল চল্লিশ দিরহামের সমান হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ পরিচ্ছেদে স্বর্ণের জাকাতের বিবরণ রয়েছে। স্বর্ণের নিসাব বিশ মিছকাল। এর কমে জাকাত ওয়াজিব হয় না। বিশ মিছকালে অর্ধ মিছকাল ওয়াজিব হয়। দলিল এই রেওয়ায়েত যা রৌপ্যের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে–

مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ نِصْفُ مِثْقَالٍ "প্রত্যেক বিশ মিছকাল হতে অর্ধ মিছকাল ওয়াজিব হবে।" ইবনে মাজাহ্ শরীফে এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا نِصْفَ دِيْنَارٍ وَمِنَ الْاَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا - (شَرْحُ نِقَايَةٌ)

অর্থ– রাসূল ﷺ প্রত্যেক বিশ দীনার হতে অর্ধ দীনার এবং প্রতি চল্লিশ দীনার হতে এক দীনার গ্রহণ করতেন।

[শরহে নেকায়া] মিছকাল দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মিছকাল যার সাত মিছকালের ওজন দশ দিরহামের সমান হয়। জনসাধারণের মাঝে এ ওজনই প্রচলিত।

قَوْلُهُ ثُمَّ فِىْ كُلِّ اَرْبَعَةٍ : কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, বিশ মিছকালের উপর চার মিছকাল অতিরিক্ত হলে অর্ধ মিছকালের সাথে দুই কীরাত ওয়াজিব হবে। কেননা চার মিছকালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দুই কীরাত হয়। কেননা এক মিছকাল বিশ কীরাত হয়। অতএব চার মিছকাল আশি কীরাত হবে। আর আশির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দুই হয়। এজন্য চার মিছকালের জাকাত দুই কীরাত হয়।

ফায়দা : এক কীরাত পাঁচটি জবের দানার সমান হয়। এক মিছকাল একশ জবের দানার সমান হয়। قِرَاطٌ মূলত قِيْرَاطٌ ছিল। কারণ, এর বহুবচন قَرَارِيْطُ একটি ر -কে يْ দ্বারা পরিবর্তন করেছে।

মাসআলা হলো, বিশ মিছকালের উপর চার মিছকালের কম অতিরিক্ত হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই অতিরিক্ত অংশে কোনো জাকাত ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে ভগ্নাংশের হিসাব অনুপাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন- বিশ মিছকালের উপর এক মিছকাল অতিরিক্ত হলে অর্ধ মিছকাল এবং অর্ধ কীরাত ওয়াজিব হবে। কেননা বিশ মিছকালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হলো অর্ধ মিছকাল। আর এক মিছকালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হলো অর্ধ কীরাত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ভগ্নাংশে সাহেবাইনের মতে জাকাত ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জাকাত ওয়াজিব হয় না। উভয় পক্ষের দলিলসমূহ সবিস্তারে "রুপা-এর পরিচ্ছেদে" আলোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, এক দীনার দশ দিরহামের সমান। মিছকাল এবং দীনার একই জিনিস। অতএব চার মিছকাল চল্লিশ দিরহামের সমান। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যেভাবে দিরহামের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিরহামের কম অতিরিক্ত হলে জাকাত ওয়াজিব হয় না, অনুরূপভাবে নিসাবের পর চার মিছকালের কম অতিরিক্ত হলে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

প্রশ্ন : বিগত পরিচ্ছেদে ওজনে সাবআ'-এর তাহকীকে বলা হয়েছে যে, সাত মিছকাল দশ দিরহামের ওজনের সমান। মিছকাল এবং দীনার একই জিনিস। আর এখানে বলা হলো যে, এক দীনার দশ দিরহামের সমান।

উত্তর : বিগত পরিচ্ছেদে ওজনের বর্ণনা ছিল। অর্থাৎ দশ দিরহামের ওজন সাত মিছকাল বা সাত দীনারের সমান। আর এখানে মূল্যের বর্ণনা। অর্থাৎ এক দীনার যা এক মিছকাল স্বর্ণ। শরিয়ত এর মূল্য দশ দিরহাম রৌপ্য নির্ধারণ করেছে। যেমন- ভুলবশত হত্যার دِيَت বা রক্ত ঋণ যদি দীনারের দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে এক হাজার দীনার আদায় করবে। আর যদি দিরহাম দ্বারা আদায় করতে চায় তাহলে দশ হাজার দিরহাম আদায় করতে হবে।

তবে এখানে লক্ষণীয় যে, এ অনুমান সেই যুগের মূল্যের প্রেক্ষিতে ছিল। মূল্য যেহেতু কমবেশি হতে থাকে, এজন্য প্রতি যুগে সে সময়ের বাজার দরের প্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

قَالَ وَفِيْ تِبْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَحُلِيِّهِمَا وَ اَوَانِيْهِمَا الزَّكٰوةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا تَجِبُ فِيْ حُلِيِّ النِّسَاءِ وَخَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ لِاَنَّهُ مُبْتَذَلٌ فِيْ مُبَاحٍ فَشَابَهَ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ وَلَنَا اَنَّ السَّبَبَ مَالٌ نَامٍ وَدَلِيْلُ النَّمَاءِ مَوْجُوْدٌ وَهُوَ الْاِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ خِلْقَةً وَالدَّلِيْلُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الثِّيَابِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের খণ্ড, এ দুটির অলঙ্কার ও পাত্র এ সবে জাকাত ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার এবং পুরুষের রুপার আংটিতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা তা মুবাহ হিসেবে ব্যবহৃত। সুতরাং তা ব্যবহার্য কাপড়ের সদৃশ। আমাদের দলিল এই যে, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, বর্ধনসম্পন্ন সম্পদ। এখানে বর্ধনের প্রমাণ বিদ্যমান। আর তা হলো, সৃষ্টিগতভাবেই এগুলো ব্যবসার জন্য প্রস্তুতকৃত। আর এ ক্ষেত্রে প্রমাণ বিদ্যমান। সুতরাং তা-ই বিবেচ্য। ব্যবহার্য বস্ত্রের বিষয়টি এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تِبْرٌ রৌপ্যের পাত যা দ্বারা কোনো অলঙ্কার নির্মাণ করা হয়নি। حُلِيٌّ রুপা এবং স্বর্ণের অলঙ্কার যা মহিলারা শ্রী বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করে।

আমাদের মতে স্বর্ণ এবং রুপার অলঙ্কার-এর পাত্রে জাকাত ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মহিলাদের অলঙ্কার এবং পুরুষদের রুপার আংটিতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। ইমাম মালিক এবং আহমদ (র.) ও -এর প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রুপা এবং স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার করা মহিলাদের জন্য বৈধ। আর রুপার আংটি ব্যবহার করা পুরুষের জন্য জায়েজ আছে। যে বস্তুর ব্যবহার জায়েজ এবং ব্যবহারের সাধারণ রেওয়াজও আছে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন– দৈনন্দিন ব্যবহারের কাপড় এবং পরিশ্রম করাকালীন কাপড়। এতে কোনো জাকাত ওয়াজিব নয়। আমাদের দলিল হলো, জাকাত ফরজ হওয়ার سَبَبٌ বা কারণ হচ্ছে বর্ধমান সম্পদ হওয়া। বর্ধমান দুভাবে হয়। যথা–

১. خَلْقِيٌّ বা জন্মগতভাবে। যেমন– স্বর্ণ-রৌপা।

২. فِعْلِيٌّ বা কর্মের দ্বারা। যেমন– ব্যবসার দ্বারা। এখানে বর্ধনের দলিল আছে। অর্থাৎ জন্মগতভাবে এটা ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে বর্ধনসম্পন্ন হওয়ার দলিল বিদ্যমান আছে। সুতরাং কারো বাতিল করার দ্বারা এই জন্মগত বর্ধন রহিত হবে না। ব্যবহার্য বস্ত্রের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এতে জন্মগতভাবে কোনো বর্ধন পাওয়া যায় না এবং কর্মের দ্বারাও কোনো বর্ধন পাওয়া যায় না। জন্মগতভাবে এজন্যে বর্ধন নেই যে, কাপড় জন্মগতভাবে ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করা হয়নি। আর কর্মের দিক থেকে এজন্য বর্ধন নেই যে, ব্যবহার্য বস্ত্রে বান্দার পক্ষ হতে ব্যবসার নিয়ত করা হয় না। কোনোভাবেই যেহেতু বর্ধন নেই সেহেতু ব্যবহার্য বস্ত্রে জাকাত ওয়াজিব হবে না। আমাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত আয়াত–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

অর্থ–আর যারা স্বর্ণ-রুপা পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং এটা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। অর্থাৎ জাকাত প্রদান করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির শুভ সংবাদ প্রদান কর।– [সূরা তওবা– আয়াত নং ৩৪]

এ আয়াতের عُمُوْمٌ বা ব্যাপকতার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, স্বর্ণ-রুপা বিগলিত হোক বা না হোক এবং বিগলিত হলে তা কোনো سِكَّةٌ বা বস্তুর সুরতে হোক বা কোনো অলঙ্কারের রূপে হোক সর্বাবস্থায় এতে জাকাত ফরজ হবে। কেননা আল্লাহর রাস্তায়

খরচ না করার কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ধমক এসেছে। আর ধমক ওয়াজিব বর্জন করার দ্বারাই আসে। উক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, স্বর্ণ-রুপা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা বা জাকাত দেওয়া ওয়াজিব। তা ছাড়া ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র.) নিম্নোক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا وَفِىْ يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكٰوةَ هٰذَا قَالَتْ لَا قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِمَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ (فَتْحُ الْقَدِيْرِ - شَرْحُ نِقَايَةٍ) ۔

অর্থ– আমর ইবনে শুআইব স্বীয় পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক মহিলা নিজের কন্যা নিয়ে রাসূল ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং তখন তার কন্যার হাতে স্বর্ণের দুটো মোটা টুকরা ছিল। রাসূল ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন যে, তুমি এর জাকাত প্রদান কর কি? সে বলল, না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, এর পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে আগুনের চুড়ি পরিধান করাবেন। বর্ণনাকারী বলেন, সে চুড়ি দুটো খুলে রাসূল ﷺ-এর খিদমতে পেশ করলেন এবং বললেন যে, এ দুটো আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ -এর জন্য নিবেদিত।

–[আবূ দাউদ : খণ্ড–১, পৃ. ২১৮]

এ রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, অলঙ্কারে জাকাত ওয়াজিব।

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর নীচের হাদীস দ্বারাও-এর সমর্থন পাওয়া যায়–

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَ كَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدِّىَ زَكٰوتَهٗ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ۔

অর্থ–হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি স্বর্ণের চুড়ি পরিধান করতাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে, আল্লাহর রাসূল! এটা কি (كَنْزٌ) কানয? নবীজী ﷺ উত্তর দিলেন যা নিসাব পরিমাণ হয় এবং তুমি যদি তার জাকাত প্রদান কর তাহলে তা কানয [পুঞ্জিভূত সম্পদ] নয়। – [আবূ দাউদ : খণ্ড–১, পৃ. ২১৮]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) কানয দ্বারা ঐ কানযকে বুঝিয়েছেন যে কানযের সম্পর্কে عَذَابٌ اَلِيْمٌ বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা এসেছে। এ হাদীসও অলঙ্কারে জাকাত ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে নিম্নে বর্ণিত হাদীস এ বক্তব্য সমর্থন করে–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَاٰى فِىْ يَدِىْ فَتْخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَتْ مَا هٰذَا قُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنُ لَكَ بِهِنَّ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكٰوتَهُنَّ قُلْتُ لَا فَقَالَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ۔

অর্থ– হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূল ﷺ -এর খিদমতে হাজির হলাম। রাসূল ﷺ দেখলেন যে, আমার হাতে রুপার চুড়ি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? আমি বললাম যে, এটা এজন্য তৈরি করেছি, এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্যে সজ্জিত হব। রাসূল ﷺ বললেন, এর জাকাত প্রদান কর? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন যথেষ্ট। –[আবূ দাউদ : খণ্ড–১, পৃ. ২১৮]

এ রেওয়ায়েত দ্বারা অলঙ্কারে জাকাত ফরজ হওয়া সাবিত হয়।

فَصْلٌ فِى الْعُرُوْضِ : اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ فِىْ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ اِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهَا نِصَابًا مِنَ الْوَرِقِ اَوِ الذَّهَبِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهَا يُقَوِّمُهَا فَيُؤَدِّىْ مِنْ كُلِّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلِاَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلْاِسْتِنْمَاءِ بِاِعْدَادِ الْعَبْدِ فَاَشْبَهَ الْمُعَدَّ بِاِعْدَادِ الشَّرْعِ وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ لِيَثْبُتَ الْاِعْدَادُ ثُمَّ قَالَ يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ اَنْفَعُ لِلْمَسَاكِيْنِ اِحْتِيَاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ قَالَ (رض) وَهٰذَا رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَفِى الْاَصْلِ خَيَّرَهٗ لِاَنَّ الثَّمَنَيْنِ فِىْ تَقْدِيْرِ قِيَمِ الْاَشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ وَتَفْسِيْرُ الْاَنْفَعِ اَنْ تُقَوِّمَهَا بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهٗ يُقَوِّمُهَا بِمَا اشْتَرٰى اِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنَ النُّقُوْدِ لِاَنَّهٗ اَبْلَغُ فِىْ مَعْرِفَةِ الْمَالِيَّةِ وَاِنِ اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ النُّقُوْدِ قَوَّمَهَا بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهٗ يُقَوِّمُهَا بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ كَمَا فِى الْمَغْصُوْبِ وَالْمُسْتَهْلَكِ ـ

অনুচ্ছেদ : পণ্যদ্রব্যের জাকাত

অনুবাদ : যে কোনো ধরনের ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য হোক তাতে জাকাত ওয়াজিব– যদি তার মূল্য রুপার কিংবা স্বর্ণের নিসাব পরিমাণ পৌছে। কেননা পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন– يُقَوِّمُهَا فَيُؤَدِّىْ مِنْ كُلِّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ "পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং প্রতি দু'শ দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম আদায় করা হবে।" আর এজন্যেও যে, এগুলো বান্দার পক্ষ হতে বর্ধনের জন্য প্রস্তুতকৃত। সুতরাং তা শরিয়তের পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত সদৃশ। ব্যবসার নিয়তের শর্ত আরোপ করা হয়েছে যাতে বান্দার পক্ষ হতে প্রস্তুতকরণ সাব্যস্ত হয়।অতঃপর ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দরিদ্রের জন্য অধিকতর লাভজনক যা, তা দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো, দরিদ্রের হক-এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত, কিন্তু মবসূত-এর বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মালিকের এখতিয়ারের উপর ন্যস্ত করেছেন। কেননা বস্তুসমূহের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে উভয় [স্বর্ণ ও রৌপ্য] মুদ্রাই সমান। অধিকতর লাভজনক হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, ঐ মুদ্রার দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, যা দ্বারা নিসাব অর্জিত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পণ্যদ্রব্য যদি মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা হয়ে থাকে, তাহলে যে ধরনের মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে, তা দ্বারাই মূল্য নিরূপণ করা হবে। কেননা মূল্য অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে এটাই কার্যকর। পক্ষান্তরে যদি মুদ্রা ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্য দ্বারা ক্রয় করে থাকে তবে দেশে প্রচলিত প্রধান মুদ্রা দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বাবস্থায় প্রচলিত প্রধান মুদ্রা দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। যেমন ছিনতাইকৃত ও ধ্বংসকৃত মালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عُرُوْض এটা عَرْضٌ-এর বহুবচন। অর্থ হলো, স্বর্ণ-রুপা ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী। মাসআলা এই যে, ব্যবসার মাল তা যে ধরনেরই হোক না কেন, এতে জাকাত ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো তার মূল্য স্বর্ণ বা রুপার নিসাব পরিমাণ হতে হবে।

দলিল : রাসূল ﷺ বলেছেন, ব্যবসার পণ্যসামগ্রীর মূল্য দু'শ দিরহাম হলে পাঁচ দিরহাম পরিমাণ জাকাত প্রদান কর। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِيْ يُعَدُّ لِلْبَيْعِ .

অর্থ–রাসূল ﷺ আমাদের নির্দেশ দিতেন ঐ সম্পদের জাকাত প্রদান করতে যা ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, যে কোনো সম্পদে বান্দা ব্যবসার নিয়ত করার দ্বারা এটা বর্ধনসম্পন্ন মালে পরিণত হয়। আর যেহেতু বর্ধনসম্পন্ন মালে জাকাত ওয়াজিব হয়, সুতরাং ব্যবসার মালেও জাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন– রুপা এবং স্বর্ণে জাকাত ওয়াজিব হয়; কারণ, এটা শরিয়তের পক্ষ হতে বর্ধনসম্পন্ন মাল হিসেবে নির্ধারিত।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বর্ধন সাবিত করার জন্য মাল ক্রয় করার সময় ব্যবসার নিয়ত করা শর্ত। সুতরাং যদি মাল ক্রয় করার সময় ব্যবসার নিয়ত না করে; বরং মালিক হওয়ার পর নিয়ত করে, তাহলে নিয়তের সাথে ব্যবসার কার্যক্রম সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এজন্য যে, শুধু নিয়ত যথেষ্ট নয়; বরং নিয়তের সঙ্গে কর্ম সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ يُقَوِّمُهَا : ব্যবসার সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে রুপা বা স্বর্ণের নিসাব পরিমাণ হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন : মূল্য কি রুপা [দিরহাম] দ্বারা নিরূপণ করা হবে নাকি স্বর্ণ [দীনার] দ্বারা? এতদ্ সম্পর্কে চারটি মত বিদ্যমান আছে। যথা–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে 'আমালী' নামক গ্রন্থে একটি বর্ণনা আছে। তা হলো, পণ্য-সামগ্রীর মূল্য উভয় মুদ্রা হতে যেটির দ্বারা নিরূপণ করলে গরিব-মিসকিনের জন্য অধিক উপকার হবে, সেটির দ্বারা নিরূপণ করা হবে। যেমন– ব্যবসার একটি পণ্য আছে যার মূল্য দু'শ দিরহাম। তবে ঐ পণ্যের মূল্য বিশ মিছকালের সমান হয় না। তাহলে দিরহামের দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি রুপার মূল্য বেশি হয় এবং স্বর্ণের মূল্য কম হয় পণ্যের মূল্য বিশ মিছকাল স্বর্ণের মূল্যের সমান হয় তবে দু'শ দিরহাম রুপার মূল্যের সমান হয় না, তাহলে এর মূল্য মিছকালের দ্বারা নিরূপণ করা হবে। রূপার দ্বারা নিরূপণ করা হবে না। এ মতের ভিত্তি হলো, দরিদ্র ও মিসকিনের হক-এর ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার উপর।

২. 'মবসূত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, মালিকের এখতিয়ার রয়েছে যে, রুপা এবং স্বর্ণ উভয়ের যে কোনো একটির দ্বারা নিরূপণ করতে পারে। এ মতের দলিল হলো, মূল্য এজন্য নির্ধারণ করা হয়, যাতে মূল্যের পরিমাণ অবগত হওয়া যায়। উদ্দেশ্য হলো, দিরহাম এবং দীনার উভয় সমান ।

৩. ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত এটাই যে, এ পণ্যকে মুদ্রাদ্বয়ের মধ্য হতে যেটির বিনিময়ে ক্রয় করেছে, সেটির দ্বারা এর মূল্য নিরূপণ করা হবে। যদি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে দিরহামের দ্বারা মূল্য নিরূপণ করবে। আর যদি দীনার দ্বারা ক্রয় করে তাহলে দীনারের দ্বারা মূল্য নিরূপণ করবে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত মুদ্রাদ্বয় ব্যতীত অন্য বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে মুদ্রাদ্বয়ের মধ্যে যেটির প্রচলন বেশি, সেটির দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করবে। এ মতের দলিল হলো, মুদ্রাদ্বয়ের মধ্যে যেটির দ্বারা পণ্য ক্রয় করেছে, সেটির দ্বারা মূল্যের অবগতি বেশি হবে। কেননা একবার এ মুদ্রা দ্বারা এর মূল্য নিরূপণ হয়েছে বিধায় দ্বিতীয়বার মূল্য নিরূপণ করতে কোনো কষ্ট হবেনা।

৪. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো, শহরের মুদ্রার মধ্যে যে মুদ্রার প্রচলন অধিক, সর্বাবস্থায় সে মুদ্রার দ্বারা মূল্য নিরূপণ হবে। দলিল হলো, আল্লাহর হক– এ মূল্য নিরূপণ করাকে বান্দার হক– এ মূল্য নিরূপণ করার উপর কিয়াস করা হবে। আর বান্দার হক-এ শহরের প্রধান মুদ্রা দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা হয়। যেমন– কোন ব্যক্তি কোনো বস্তু ছিনতাই করল এবং সে বস্তু গসবকারীর নিকটে নষ্ট হয়ে গেল এবং সে বস্তু ذَوَاتُ الْقِيَمِ [যা মূল্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়] -এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে গসবকারীর উপর এর মূল্য ওয়াজিব হবে এবং মূল্য নিরূপণ করা হবে মুদ্রাদ্বয়ের মধ্যে যেটির প্রচলন বেশি, সেটির দ্বারা। তদ্রূপ যদি কেউ কারো কোনো পণ্য নষ্ট করে দেয় এবং সে পণ্য যদি ذَوَاتُ الْقِيَمِ [যাওয়াতুল কিয়াম] হয় তাহলে নষ্টকারীর উপর মূল্য ওয়াজিব হবে এবং অধিক প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা হবে। যেমন বান্দার হকে অধিক প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা হয়, তদ্রূপ আল্লাহর হকেও অর্থাৎ জাকাত আদায় করার জন্যও অধিক প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা হবে।

وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِيْ طَرْفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيْمَا بَيْنَ ذَالِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكٰوةَ لِاَنَّهُ يَشُقُّ اِعْتِبَارُ الْكَمَالِ فِيْ اَثْنَائِهِ اَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ فِيْ اِبْتِدَائِهِ لِلْاِنْعِقَادِ وَتَحَقُّقِ الْغِنَاءِ وَفِيْ اِنْتِهَائِهِ لِلْوُجُوْبِ وَلَا كَذٰلِكَ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ حَالَةُ الْبَقَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُّ حَيْثُ يَبْطُلُ حُكْمُ الْحَوْلِ وَلَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ لِانْعِدَامِ النِّصَابِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا كَذَالِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْاُوْلٰى لِاَنَّ بَعْضَ النِّصَابِ بَاقٍ فَيَبْقَى الْاِنْعِقَادُ

অনুবাদ : বছরের উভয় প্রান্তে যদি নিসাব পূর্ণ থাকে তবে মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবে হ্রাস জাকাতকে রহিত করবে না। কেননা মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ণতার সমীক্ষণ কঠিন। তবে শুরুতে নিসাবের পূর্ণতা আবশ্যকীয়, যাতে জাকাত সংঘটিত হয় এবং অভাবমুক্ত সাবিত হয়। তদ্রূপ বছরের শেষ প্রান্তেও [নিসাবের পূর্ণতা জরুরি] জাকাত ওয়াজিব হওয়ার হুকুমের জন্য। মধ্যবর্তী সময়টি অনুরূপ নয়। কেননা সেটা হচ্ছে নিছক বিদ্যমান থাকার অবস্থা। পক্ষান্তরে সমস্ত মাল ধ্বংস হয়ে গেলে জাকাতের বর্ষপূর্তির হুকুমটি বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে নিসাব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু প্রথম মাসআলাটি এরূপ নয়। কেননা নিসাবের অংশ এখনো কিছু বিদ্যমান আছে। সুতরাং জাকাতের উপাদানের সংঘটন অব্যাহত থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেছেন, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বছরের প্রারম্ভে এবং শেষে নিসাব পূর্ণ থাকা শর্ত। সুতরাং বছরের প্রারম্ভে যদি নিসাব পূর্ণ থাকে এবং বছরের শেষেও পূর্ণ থাকে তবে বছরের মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবের কিছু কম হলেও জাকাত ওয়াজিব হবে; জাকাত রহিত হবে না। ইমাম জুফার (র.) বলেছেন, বছরের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত নিসাব পূর্ণ থাকা শর্ত। সুতরাং বছরের কোনো এক সময় যদি নিসাব কম হয় তাহলে জাকাত ওয়াজিব হবে না। সায়েমা পশু এবং স্বর্ণ-রূপায় জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতও অনুরূপ। [পূর্ণ বছর পূর্ণ নিসাব বিদ্যমান থাকতে হবে], তবে অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে তার মতে শুধু বছরের শেষে নিসাব পূর্ণ থাকা শর্ত। ইমাম জুফার (র.)-এর দলিল হলো, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার سَبَبٌ বা কারণ হচ্ছে বর্ষপূর্তি হওয়া। আর এটা فَرْعٌ বা শাখা পূর্ণ বছর নিসাব বিদ্যমান থাকার। এর দ্বারা সাবিত হলো যে, পূর্ণ বছর নিসাব বিদ্যমান থাকা শর্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তি এই। তবে তিনি ব্যবসার পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে এ শর্ত রহিত করে দিয়েছেন। কেননা ব্যবসার পণ্যদ্রব্য সদাসর্বদা কমবেশি হতে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিদিন মালের মূল্য নিরূপণ করা এবং নিসাব পূর্ণ আছে কিনা? তা নিরীক্ষণ করা খুবই দুরূহ কাজ; বরং প্রায় অসম্ভব কাজ। এজন্য ব্যবসার সম্পদে শুধু বছরের শেষে নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে।

আমাদের দলিল : বছরের মধ্যবর্তী সময়ে নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা অনেক কঠিন। কেননা মাল কমবেশি হতে থাকে। এজন্য বছরের মধ্যবর্তী সময়ে নিসাব পূর্ণ থাকার শর্তারোপ করা হয়নি। তবে শুরু এবং শেষে উভয় প্রান্তে নিসাব পূর্ণ হওয়া শর্ত। শুরুতে নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে, যাতে জাকাতে سَبَبٌ বা কারণ সংঘটিত হয় এবং মুখাপেক্ষিহীনতা বা ধনী হওয়া প্রমাণিত হয়। আর শেষে এজন্য শর্তারোপ করা হয়েছে, যাতে জাকাত ওয়াজিব হওয়া সাবিত হয়। আর বছরের মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত দুটি বিষয়ের কোনোটি বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। এজন্য বছরের মাঝে নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি।

بِخِلَافِ مَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُّ দ্বারা نُقْصَانُهُ শর্তের ফায়দা উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা হচ্ছে, বছরের মাঝে নিসাব কম হলে জাকাত রহিত হবে না। তবে হাঁ, যদি পূর্ণ নিসাব হালাক হয়, তাহলে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা বছরের এক অংশে নিসাব সম্পূর্ণভাবে শূন্য হয়েছে বিধায় حَوَلَانُ الْحَوْلِ বা বর্ষপূর্তির শর্ত পাওয়া গেল না। অথচ জাকাতের সবব (سَبَبٌ) বা কারণ সংঘটিত হওয়ার পরবর্তী শর্ত হলো বর্ষপূর্তি হওয়া। প্রথম মাসআলা এমন নয়, অর্থাৎ যখন নিসাব কম হয়েছে এবং কিছু বিদ্যমান আছে। এজন্য যে, কারণ সংঘটিত হওয়া অব্যাহত আছে, সুতরাং জাকাত ওয়াজিব হবে।

قَالَ وَتُضَمُّ قِيْمَةُ الْعُرُوْضِ اِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَتّٰى يَتِمَّ النِّصَابُ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ فِى الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ التِّجَارَةِ وَاِنِ افْتَرَقَتْ جِهَةُ الْاِعْدَادِ وَيُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ لِلْمُجَانَسَةِ مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةِ وَمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ صَارَ سَبَبًا ثُمَّ تُضَمُّ بِالْقِيْمَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا بِالْاَجْزَاءِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ حَتّٰى اَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةُ مَثَاقِيْلَ ذَهَبٍ وَتَبْلُغُ قِيْمَتُهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكٰوةُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا هُمَا يَقُوْلَانِ الْمُعْتَبَرُ فِيْهِمَا الْقَدْرُ دُوْنَ الْقِيْمَةِ حَتّٰى لَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ فِىْ مَصْنُوْعٍ وَزْنُهُ اَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْنِ وَقِيْمَتُهُ فَوْقَهَا هُوَ يَقُوْلُ اِنَّ الضَّمَّ لِلْمُجَانَسَةِ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِاعْتِبَارِ الْقِيْمَةِ دُوْنَ الصُّوْرَةِ فَيُضَمُّ بِهَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নিসাব পূর্ণ হওয়ার জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। কেননা এ সবের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভার হিসেবেই জাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে, যদিও ব্যবসার জন্য প্রস্তুতকরণের দিকটি ভিন্ন। স্বর্ণকে রৌপ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। কেননা মুদ্রা হওয়ার দিক থেকে উভয়টি সমজাতীয়। এজন্যই তা জাকাতের সবব (سَبَبٌ) হিসেবে গণ্য। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মূল্যের মাধ্যমে সংযুক্তি হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে সংযুক্তি হবে অংশ হিসেবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতেও এরূপ এক মত বর্ণিত আছে। সুতরাং যদি কারো নিকট একশ দিরহাম এবং পাঁচ মিছকাল স্বর্ণ থাকে যার মূল্য একশ দিরহাম পরিমাণ হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তাদের দলিল হলো, স্বর্ণ ও রুপার ক্ষেত্রে পরিমাণই বিবেচ্য; মূল্য বিবেচ্য নয়। তাইতো যে স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রের ওজন দু'শ দিরহামের কম, অথচ তার মূল্য দু'শ দিরহামের বেশি, তাতে [সর্বসম্মতিক্রমে] জাকাত ওয়াজিব হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুক্তি হলো, সাদৃশ্যের কারণে একটাকে অন্যটার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আর তা মূল্যের বিবেচনায় বাস্তবায়িত হয়; আকৃতির দিক থেকে নয়। সুতরাং মূল্যের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত করা হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তির নিকট ব্যবসার পণ্য নিসাব পরিমাণ নেই, তবে তার নিকট কিছু স্বর্ণ-রৌপ্য আছে। এমতাবস্থায় নিসাব পূর্ণ করার জন্য ব্যবসাপণ্যের মূল্যকে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট পঞ্চাশ দিরহাম আছে এবং একশ পঞ্চাশ দিরহাম মূল্যের বাণিজ্যিক পণ্য আছে। তাহলে তার উপর দু'শ রৌপ্য মুদ্রার জাকাত ওয়াজিব হবে। অথবা কারো নিকট আট মিছকাল স্বর্ণ আছে এবং বারো মিছকাল মূল্যের ব্যবসার পণ্যদ্রব্য আছে। তাহলে তার উপর বিশ মিছকাল স্বর্ণের জাকাত ওয়াজিব হবে। এটা সর্ববাদীসম্মত মত। দলিল হলো, প্রতি জিনিসে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবব (سَبَبٌ) বা কারণ হচ্ছে বর্ধনসম্পন্ন সম্পদ হওয়া। আর এ গুণ [বর্ধনসম্পন্ন হওয়া] ব্যবসার পণ্যে বিদ্যমান আছে; স্বর্ণ এবং রুপার মধ্যে বর্ধনসম্পন্ন হওয়ার দিক ভিন্ন। অর্থাৎ বাণিজ্যিক পণ্যে বান্দার পক্ষ হতে বর্ধনসম্পন্ন হওয়ার গুণ সাবিত হয়; কেননা বান্দা একে ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করেছে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে বর্ধনসম্পন্ন হওয়ার গুণ আল্লাহর পক্ষ হতে আছে। কেননা মহান আল্লাহ এ দু'টোকে ব্যবসার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মূল জিনিস হচ্ছে বর্ধনসম্পন্ন হওয়া, যা উভয় স্থানে বিদ্যমান আছে। অতএব ব্যবসার পণ্যের মূল্যকে স্বর্ণ-রুপার সঙ্গে সংযুক্ত করে জাকাত প্রদান করা হবে।

قَوْلُهُ وَيُضَمُّ الذَّهَبُ : সূরতে মাসআলা হলো এই–কোনো ব্যক্তির নিকট স্বর্ণের নিসাব পরিপূর্ণ নেই এবং রুপার নিসাবও পূর্ণ নেই, তবে উভয় মিলে একটি পূর্ণ নিসাব হয়। তা হলে হানাফী এবং ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, একটিকে অপরটির সঙ্গে মিলিয়ে জাকাত দিতে হবে। তবে শর্ত হলো, উভয় মিলে নিসাব পরিমাণ হতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, স্বর্ণ এবং রুপার মধ্য হতে একটিকে অন্যটির সাথে সংযুক্ত করা হবে না। আর মিলানো হয় না, বিধায় নিসাবও পূর্ণ হয় না। অতএব জাকাতও ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো– স্বর্ণ এবং রৌপ্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি– উপাদান এবং হুকুম উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন– উট এবং বকরি দুই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি। حَقِيْقَةً বা মূল উপাদানের দিক থেকে ভিন্ন হওয়া সুস্পষ্ট। আর হুকুমের দিক থেকে ভিন্ন প্রজাতি হওয়া এজন্য যে, স্বর্ণ এবং রুপার মধ্য হতে একটিকে অপরটির বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। যেমন ধরুন, একশ গ্রাম স্বর্ণ দু'শ গ্রাম রুপার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ আছে। যদি উভয়টি একই প্রজাতীয় হতো, তাহলে কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হতো না। যেহেতু স্বর্ণ এবং রৌপ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি। সুতরাং একটিকে অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে না। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি সায়েমা (سَائِمَةٌ) পশুর ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা হয় না। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট উট আছে এবং বকরিও আছে। তবে কোনোটির নিসাবই পূর্ণ নয়। উট এবং বকরি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির হওয়ার কারণে জাকাত ওয়াজিব করার জন্য একটিকে অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় না। অতএব স্বর্ণ এবং রৌপ্যকেও সংযুক্ত করা হবে না।

আমাদের দলিল হলো, স্বর্ণ এবং রুপা সত্তাগত দিক থেকে যদিও এক নয়, তবে সামানিয়্যাত (ثَمَنِيَّتٌ) বা মুদ্রা হওয়ার দিক থেকে উভয়টি এক। আর সামানিয়্যাত (ثَمَنِيَّتٌ) হওয়াই জাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবব (سَبَبٌ) বা কারণ। অতএব সামানিয়্যাত (ثَمَنِيَّتٌ) -এর দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়টিকে একই প্রজাতির ধরা হবে। সুতরাং জাকাত ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

বুকাইর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আশাজ (র.)-এর সূত্রে নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারাও আমাদের সমর্থন হয়। রেওয়ায়েতটি হলো– مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ضَمِّ الذَّهَبِ اِلَى الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ اِلَى الذَّهَبِ فِيْ اِخْرَاجِ الزَّكٰوةِ

অর্থ–জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ -এর সাহাবীগণের এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যে, তারা স্বর্ণকে রুপার সাথে এবং রুপাকে স্বর্ণের সাথে সংযুক্ত করতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মূল্যের প্রেক্ষিতে সংযুক্তি হবে। এরূপ একটি বর্ণনা আছে ইমাম আহমদ (র.) থেকেও। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে অংশের প্রেক্ষিতে সংযুক্তি হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতেও এরূপ একটি বর্ণনা আছে। ইমাম মালিক (র.)-ও এর প্রবক্তা। ইমাম আহমদ (র.) হতেও এরূপ একটি রেওয়ায়াত আছে।

মতানৈক্যের ফলাফল নিম্নোক্ত উদাহরণে প্রকাশ হবে। কোনো ব্যক্তির নিকট এক দিরহাম রুপা এবং পাঁচ মিছকাল স্বর্ণ আছে এবং পাঁচ মিছকাল স্বর্ণের মূল্য একশ দিরহামের সমপরিমাণ। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা মূল্যের দৃষ্টিকোণে নিসাব পূর্ণ হয়েছে। সাহেবাইনের মতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা অংশের প্রেক্ষিতে নিসাব পূর্ণ হয়নি।

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট দশ মিছকাল স্বর্ণ এবং একশ দিরহাম রুপা থাকে, অথবা উভয় মুদ্রা হতে কোনো একটি তিন ভাগের এক ভাগ আর অপরটি তিনভাগের দুই ভাগ অথবা উভয় মুদ্রার কোনো একটি চার ভাগের একভাগ আর অপরটি চার ভাগের তিন ভাগ। উক্ত সুরতগুলোতে সর্বসম্মতিক্রমে একটি মুদ্রাকে অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত করে জাকাত ওয়াজিব করবে।

সাহেবাইনের দলিল : স্বর্ণ-রুপায় ওজন ধর্তব্য; মূল্য ধর্তব্য নয়। এজন্য কোনো ব্যক্তির নিকট যদি পাত্র এবং অলংকার থাকে এবং এর ওজন দু'শ দিরহামের কম তবে এর মূল্য দু'শ দিরহামের বেশি তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব হবে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ওজন ধর্তব্য; মূল্য ধর্তব্য নয়; অতএব ওজনের দিক থেকে নিসাব পূর্ণ হলে জাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, একই প্রজাতির প্রেক্ষিতে সংযুক্তি হবে। আর একই প্রজাতি হওয়া মূল্যের ভিত্তিতে ধরা হয়। বস্তুর আকৃতির দিক থেকে নয়। এজন্য সংযুক্তি মূল্যের ভিত্তিতে হবে। বস্তুর আকৃতির ভিত্তিতে হবে না। অংশের ধর্তব্য মূলত বস্তু আকৃতির ধর্তব্য। এজন্য বস্তু আকৃতির ভিত্তিতে সংযুক্তি না করা মূলত অংশের আকৃতির ভিত্তিতে সংযুক্তি না করা। অতএব বুঝা গেল, সংযুক্তির জন্য অংশ ধর্তব্য নয়; বরং মূল্য ধর্তব্য; আল্লাহই অধিক অবগত।

بَابٌ فِيْ مَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ

إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ فَقَالَ اَصَبْتُهُ مُنْذُ اَشْهُرٍ اَوْ عَلَيَّ دَيْنٌ وَحَلَفَ صُدِّقَ وَالْعَاشِرُ مَنْ نَصَبَهُ الْاِمَامُ عَلَى الطَّرِيْقِ لِيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنَ التُّجَّارِ فَمَنْ اَنْكَرَ مِنْهُمْ تَمَامَ الْحَوْلِ اَوْ الْفَرَاغَ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ مُنْكِرًا لِلْوُجُوْبِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِيْنِ ـ

পরিচ্ছেদ : ওশর উসুলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী

অনুবাদ : কোনো ব্যবসায়ী যখন পণ্যদ্রব্যসহ ওশর উসুলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে আর বলে যে, মাত্র কয়েক মাস আগে আমি এ সম্পদ লাভ করেছি কিংবা আমার উপর ঋণের দায় রয়েছে। আর এ কথা সে শপথ করে বলে, তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। ওশর উসুলকারী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাকে শাসক ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে জাকাত উসুল করার জন্য রাস্তার উপর নিযুক্ত করে। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা বর্ষপূর্তির কথা কিংবা ঋণ হতে মুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করে, সে মূলত জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করল। আর কসমসহ অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ পরিচ্ছেদকে কিতাবুজ জাকাতে 'মবসূত' এবং 'জামেউস সগীর' -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের অনুসরণে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদের কিতাবুজ জাকাতের সঙ্গে এক ধরনের সামঞ্জস্য আছে। তাহলো, ওশর উসুলকারীর নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী মুসলমানদের থেকে যে ওশর গ্রহণ করা হয় তা প্রত্যক্ষভাবে জাকাত। তবে ওশর উসুলকারী এটা যে মন্দ মুসলমান থেকে গ্রহণ করে তদ্রূপ যিম্মী (ذِمِّيٌّ) এবং মুস্তামিন (مُسْتَأْمِنٌ) থেকেও গ্রহণ করে। আর তাদের (ذِمِّيٌّ এবং مُسْتَأْمِنٌ) থেকে যে মাল গ্রহণ করা হয় তা জাকাত নয়। জাকাতকে এ পরিচ্ছেদ এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, জাকাত সম্পূর্ণভাবে ইবাদত। তাতে অন্যের কোনো সংমিশ্রণ নেই।

আশির (عَاشِرٌ) ঐ ব্যক্তি যাকে খলীফা জাকাত উসুল করার জন্য রাস্তায় নিযুক্ত করেছে। এই সংজ্ঞা (تَعْرِيْف) -এর উপর একটি প্রশ্ন হয়। তাহলো, আশির (عَاشِرٌ) কাফির এবং জিম্মী হতে কর আদায় করে, যা জাকাত নয়। এজন্য আশির (عَاشِرٌ)-এর সংজ্ঞা جَامِعٌ হলো না।

উত্তর : আশির (عَاشِرٌ) নিযুক্ত করার মূল উদ্দেশ হলো জাকাত আদায় করা। কেননা এতে ইবাদত আদায়ে মুসলমানদের সাহায্য করা হয়। এছাড়া অন্যগুলো তার অনুবর্তী হিসেবে শামিল হয়। এজন্য অন্যান্যগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা এই যে, কোনো ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্য নিয়ে ওশর উসুলকারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল এবং বলল যে, আমি কয়েক মাস পূর্বে এই সম্পদের মালিক হয়েছি, এখনো বর্ষপূর্তি হয়নি। অথবা বলল যে, আমার উপর ঋণের দায় রয়েছে, তাহলে এ কথা বিশ্বাস করা হবে। আশির (عَاشِرٌ) তার থেকে জাকাত উসুল করবে না। কেননা ব্যবসায়ী ব্যক্তি বর্ষপূর্তি অস্বীকার করেছে অথবা মাল ঋণ হতে মুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছে। মূলত সে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। আর কসমসহ অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণীয়। অতএব ব্যবসায়ীর কথা ধর্তব্য হবে।

وَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا إِلَى عَاشِرٍ أٰخَرَ وَ مُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِىْ تِلْكَ السَّنَةِ عَاشِرٌ أٰخَرُ لِأَنَّهُ ادَّعٰى وَضْعَ الْأَمَانَةِ مَوْضَعَهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَاشِرٌ أٰخَرُ فِىْ تِلْكَ السَّنَةِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ كِذْبُهُ بِيَقِيْنٍ. وَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا أَنَا يَعْنِىْ إِلَى الْفُقَرَاءِ فِى الْمِصْرِ لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ فِيْهِ وَ وِلَايَةُ الْأَخْذِ بِالْمُرُوْرِ لِدُخُوْلِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ وَكَذَا الْجَوَابُ فِىْ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ فِىْ ثَلَاثَةِ فُصُوْلٍ وَفِى الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُ بِنَفْسِىْ إِلَى الْفُقَرَاءِ فِى الْمِصْرِ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ حَلَفَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ أَوْصَلَ الْحَقَّ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلسُّلْطَانِ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ثُمَّ قِيْلَ الزَّكٰوةُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِىْ سِيَاسَةٌ وَقِيْلَ هُوَ الثَّانِىْ وَالْأَوَّلُ يَنْقَلِبُ نَفْلًا وَهُوَ الصَّحِيْحُ ثُمَّ فِيْمَا يُصَدَّقُ فِى السَّوَائِمِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ لَمْ يُشْتَرَطْ إِخْرَاجُ الْبَرَاءَةِ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَشَرَطَهُ فِى الْأَصْلِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِأَنَّهُ ادَّعٰى وَلِصِدْقِ دَعْوَاهُ عَلَامَةٌ فَيَجِبُ إِبْرَازُهَا وَجْهُ الْأَوَّلِ الْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَلَا يُعْتَبَرُ عَلَامَةً.

অনুবাদ : তদ্রূপ যদি সে বলে যে, আমি অন্য ওশর উসূলকারীর নিকট ওশর আদায় করেছি। এটি তখনই, যদি এ বছর অন্য কোনো ওশর উসুলকারী থেকে থাকে। কেননা সে আমানত যথাস্থানে আদায় করার দাবি করেছে। পক্ষান্তরে যদি এ বছর অন্য কোনো ওশর উসুলকারী নিযুক্ত হয়ে না থাকে [তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না]। কেননা সুনিশ্চিতভাবেই তার মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়ে গেছে। তদ্রূপ যদি সে বলে, আমি নিজেই আদায় করেছি। অর্থাৎ আমি শহরের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি। কেননা শহরে থাকা অবস্থায় জাকাত আদায় করার বিষয়টি তার উপরই ন্যস্ত ছিল। আর [অশির-এর নিকট দিয়ে] পথ অতিক্রমের করণে আশির -এর জাকাত আদায়ের কর্তৃত্ব এজন্যে যে, ব্যবসায়ী তখন তার হেফাজতে প্রবেশ করেছে। গবাদি পশুর জাকাত সম্পর্কে প্রথমোক্ত তিন ক্ষেত্রে একই হুকুম। কিন্তু চতুর্থ ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি সে বলে যে, আমি নিজেই শহরের দরিদ্রগণের মাঝে বণ্টন করেছি। তবে কসম করে বললেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, বিশ্বাস করা হবে। কেননা সে হকদারের নিকট হক পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের দলিল এই যে, গবাদি পশুর জাকাত আদায় করার অধিকার হলো রাষ্ট্র পরিচালকের। সুতরাং তা বাতিল করার অধিকার তার নেই। অপ্রকাশ্য সম্পদের হুকুম ভিন্ন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রথমটিই জাকাতে গণ্য। পক্ষান্তরে আশির (عَاشِرٌ) কর্তৃক দ্বিতীয়বার উসুল করা হচ্ছে শাসনভিত্তিক। আর কারো কারো মতে দ্বিতীয়টিই হলো জাকাত এবং প্রথমটি নফলে রূপান্তরিত হবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। গবাদি পশু এবং বাণিজ্য পণ্যে যে সকল ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হবে, সে ক্ষেত্রে জামেউস্ সগীর

(جَامِعُ الصَّغِيْرِ) -এর বর্ণনায় লিখিত সনদ বের করে দেখানোর শর্ত আরোপ করা হয়নি। কিন্তু মবসূত (مَبْسُوْط)-এর বর্ণনায় এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর তা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পক্ষ হতে হাসান ইব্‌নে জিয়াদ (র.) বর্ণনা করেছেন। কেননা সে একটি দাবি করেছে। তার দাবির সত্যতার স্বপক্ষে একটি প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং তা প্রদর্শন করা আবশ্যক হবে। প্রথম মতের পক্ষে দলিল এই যে, হস্তাক্ষরের সঙ্গে অন্য হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং তা প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি ব্যবসায়ী জাকাত উসুলকারীকে বলে যে, আমি অন্য জাকাত উসুলকারীকে ওশর প্রদান করেছি এবং ঐ বছরে অন্য জাকাত উসুলকারী সেখানে বিদ্যমান ছিল, তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। কেননা সে আমানত যথাস্থানে প্রদান করার দাবি করেছে। যেহেতু আমানতদার যথাস্থানে মাল দেওয়ার দাবিদার, সেহেতু কসমের সাথে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে হ্যাঁ যদি এ বছর অন্য কোনো জাকাত উসুলকারী না থাকে, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ অবস্থায় তার সুনিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী হওয়া প্রকাশ পেল।

وَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا : শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেছেন, যদি নিসাবের মালিক বলে যে, আমি স্বয়ং শহরের গরিবদের মাঝে জাকাত বণ্টন করে দিয়েছি, তাহলে কসমের সাথে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

শহরের শর্ত এজন্য আরোপ করেছেন যে, যদি শহরের বাইরে সফর অবস্থায় জাকাত আদায় করে, তাহলে আশির (عَاشِرْ)-এর জাকাত গ্রহণ করার অধিকার বাতিল হবে না। কেননা প্রকাশ্য সম্পদে [যেমন– দিরহাম, দীনার ইত্যাদি] জাকাত আদায় করার অধিকার শহরে আছে। তবে শহর থেকে বের হওয়ার পর এ অধিকার রাষ্ট্র পরিচালকের প্রতি ন্যস্ত হয়।

পার্থক্য এই যে, এ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ নিয়ে শহরে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমানতদার ছিল। রাষ্ট্র পরিচালক কর্তৃক তার প্রতি কোনো নিরাপত্তা ছিল না বিধায় সে নিজেই জাকাত প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করবে। তবে যখন সে মাল নিয়ে শহরের বাইরে বের হবে, তখন সে রাষ্ট্র পরিচালকের নিরাপত্তার অধীনে আসল। অতএব রাষ্ট্র প্রধানের জাকাত গ্রহণ করার অধিকার সৃষ্টি হবে। অতএব সম্পদের মালিকের স্বয়ং জাকাত আদায় করার অধিকার থাকবে না।

وَكَذَا الْجَوَابُ-এর দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, প্রথমোক্ত তিন সুরতে অপ্রকাশ্য সম্পদের যে হুকুম, সেই হুকুম প্রকাশ্য সম্পদেরও। যেমন– সায়েমা পশু। তিন সুরত হলো–

১. নিসাবের মালিক ব্যবসায়ী আশিরকে বলল যে, আমার এ সম্পদের উপর এখন বছর অতিক্রান্ত হয়নি; বরং আমি কয়েক মাস পূর্বে এ মালের মালিক হয়েছি।
২. সে বলল যে, আমার ঋণ আছে।
৩. সে বলল যে, আমি অন্য আশির-এর নিকট জাকাত আদায় করেছি এবং অন্য আশির ঐ বছরে উপস্থিতও ছিল বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত ছিল। উপরিউক্ত তিন সুরতে যেভাবে অপ্রকাশ্য সম্পদের ক্ষেত্রে কসমের সাথে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য, তদ্রূপ প্রকাশ্য মাল যেমন– সায়েমা পশু ইত্যাদিতে কসমের সাথে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে হ্যাঁ, চতুর্থ সুরতে প্রকাশ্য মালের ক্ষেত্রে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে কসম দিয়ে বলে।

চতুর্থ সুরত হলো– মালিক বলল যে, সায়েমা (سَائِمَةٌ) পশুর জাকাত শহরের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি। আমাদের মতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে কসমের সাথে বলে; বরং তার থেকে দ্বিতীয়বার জাকাত গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, তার কথা গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয়বার তার থেকে জাকাত গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : জাকাত গরিবদের হক। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ এ আয়াতে لِلْفُقَرَاءِ -এর لَامْ টি مِلْكِيَّتْ -এর জন্য এসেছে। সুতরাং إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ-এর মর্ম হলো জাকাত দরিদ্রদের মালিকানায় বা জাকাত গরিবদের হক। আর মালিক তাদের হক তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছে বিধায় দায়িত্বমুক্ত হয়েছে। যেমন- কোনো ব্যক্তি বিক্রেতার উকিল হতে কোনো বস্তু খরিদ করেছে। আর ক্রেতা মুআক্কিল (مُوَكِّلْ)-এর নিকট মূল্য দিয়ে দিল, তাহলে ক্রেতা দায়িত্বমুক্ত হবে। তদ্রূপ মালিক গরিবদের জাকাত বণ্টন করে দিলে দায়িত্বমুক্ত হবে। সুতরাং তার থেকে পুনরায় জাকাত গ্রহণ করা হবে না।

আমাদের দলিল : জাকাত গ্রহণ করার একমাত্র অধিকার হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানের। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "তুমি তাদের সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ কর।" রাসূল ﷺ-এর বাণী- خُذْ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً "তুমি উট হতে জাকাত গ্রহণ কর।" উক্ত نُصُوص দ্বারা বুঝা গেল যে, সায়েমা পশুর জাকাত গ্রহণের অধিকার রাষ্ট্র প্রধানের। নিসাবের মালিককে এ অধিকার নষ্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যেমন- কোনো ব্যক্তির উপর যদি কর ওয়াজিব হয় এবং সে যদি এটা যোদ্ধাদের জন্য ব্যয় করে, তাহলে কর আদায় হবে না; বরং তার থেকে দ্বিতীয়বার কর গ্রহণ করা হবে। কেননা কর গ্রহণ করার অধিকার শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের। অতএব এটা নষ্ট করার অধিকার নিসাবের মালিকের হবে না। পক্ষান্তরে أَمْوَالْ بَاطِنَةْ বা অপ্রকাশ্য মালে নিসাবের মালিক জাকাত বণ্টন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের نَائِبْ বা প্রতিনিধি। অতএব জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে মালিক আমানতদার। আর আমানতদার ব্যক্তির কথা কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য। এ জন্য أَمْوَالْ بَاطِنَةْ -এর ক্ষেত্রে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রশ্ন : নিসাবের মালিক নিজে যদি সায়েমা পশুর জাকাত গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান তাদের থেকে পুনরায় জাকাত আদায় করে নেয়। এমতাবস্থায় কোনটি জাকাত গণ্য হবে, মালিকেরটি, না রাষ্ট্রপ্রধানেরটি?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে দুটি মত আছে। প্রথম মত হলো- নিসাবের মালিক প্রথম যা দিয়েছে, তা জাকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান দ্বিতীয়বার যা গ্রহণ করেছে, তা শাসন এবং শাস্তি হিসেবে গণ্য হবে। যাতে কোনো ব্যক্তি এরূপ করার সাহস না পায়। দ্বিতীয় মত হলো- দ্বিতীয়বার যা দেওয়া হয়েছে, তা জাকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর প্রথমে যা দেওয়া হয়েছে, তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। এটিই সহীহ অভিমত।

উভয় মতের সার হলো, নিসাবের মালিক গরিবদের মাঝে জাকাত বণ্টন করার দাবি করেছে। তার এ দাবি যদি সত্য হয়, তাহলে এর দু' সুরত- ১. হয়ত সে আল্লাহর কাছে দায়মুক্ত হবে; ২. অথবা দায়মুক্ত হবে না। যারা প্রথম সুরত [দায়মুক্ত হওয়া] গ্রহণ করেছেন তাদের মতে প্রথমটি জাকাত। এর উদাহরণ এরূপ যে, জাকাত আদায়কারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির মাল গোপন ছিল। পরবর্তীতে মালের মালিক এর জাকাত আদায় করে দিয়েছে। তাহলে এটা জাকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান দ্বিতীয়বার যা গ্রহণ করেছে, তা প্রশাসনিক ধমকি এবং শাস্তি হিসেবে গণ্য হবে। যাতে মানুষ এরূপ অপরাধমূলক কাজ না করে।

পক্ষান্তরে যারা দ্বিতীয় সুরত গ্রহণ করেছেন [দায়মুক্ত হবে না] তাদের মতে দ্বিতীয়টি জাকাত হিসেবে গণ্য হবে। এর উদাহরণ এরূপ-কোনো ব্যক্তি জুমার দিন ঘরে জোহরের নামাজ আদায় করল। তারপর জুমার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত জুমার নামাজ আদায় করল। এমতাবস্থায় প্রথমে যে জোহরের চার রাকাত আদায় করেছে তা নফল হবে। আর পরবর্তীতে যা পড়েছে, তা জুমার ফরজ হিসেবে গণ্য হবে।

ثُمَّ فِيْمَا يُصَدَّقُ فِي السَّوَائِمِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ -এই ইবারত-এর সারমর্ম হলো, যদি মালের মালিক আশিরকে বলে যে, আমি অন্য আশির-এর নিকট এ বছরের জাকাত আদায় করেছি, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কসমই যথেষ্ট। অথবা দ্বিতীয় আশির-এর লিখিত সনদ বের করে দেখানো আবশ্যক।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'জামেউস্ সগীর' গ্রন্থে বলেছেন, নিসাবের মালিকের সত্যতার জন্য কোনো লিখিত সনদ পেশ করা জরুরি নয়। পক্ষান্তরে মবসূত (مَبْسُوْط) নামক গ্রন্থে এরূপ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এরূপ একটি রেওয়ায়েত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান ইব্‌নে জিয়াদ (র.) বর্ণনা করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এই تَصْدِيْقِيْ تَحْرِيْر বা সত্যায়ন লিপিকে إِخْرَاجُ الْبَرَاءَةِ বা দায়মুক্তির পত্র দ্বারা প্রকাশ করেছেন। একে خَطُّ إِبْرَاءٍ -ও বলে।

'মাবসূত' -এর রেওয়ায়েতের দলিল হলো মালের মালিক অন্য আশির-এর নিকট জাকাত আদায় করে দেওয়ার দাবি করেছে এবং এই দাবির সত্যতার স্বপক্ষে দলিলও বিদ্যমান আছে। তা হচ্ছে দ্বিতীয় আশিরের লিখিত সনদকে প্রদর্শন করা তার উপর আবশ্যক। জামেউস্ সগীর -এর বর্ণনার দলিল হলো– এক হস্তাক্ষর অন্য হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য হয়। এজন্য লিখিত দলিল গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ নিসাবের মালিক দ্বিতীয় আশির -এর প্রতি যে লিখিত সনদ আরোপ করেছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা নেই যে, এটি তার [দ্বিতীয় আশির-এর] না অন্য কারোর। অতএব লিখিত সনদ দলিল হিসেবে কার্যকর হবে না।

প্রশ্ন : ثُمَّ فِيْمَا يُصَدَّقُ فِي السَّوَائِمِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ হিদায়া গ্রন্থকারের এ ইবারতে প্রশ্ন আছে। প্রশ্নের সারমর্ম হলো– পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সায়েমা পশু এবং ব্যবসার সম্পদে মালিকের বক্তব্যের চারটি সুরত রয়েছে। যথা–

১. সে আশিরকে বলল যে, আমার নিকট যে মাল আছে, তার উপর বর্ষপূর্তি হয়নি।

২. আমার উপর ঋণের দায় আছে।

৩. অন্য আশির-এর নিকট জাকাত আদায় করে দিয়েছি, যে এ বছর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ছিল।

৪. নিজ হতে গরিবদের মাঝে জাকাত বণ্টন করে দিয়েছি।

পূর্বে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিসাবের মালিকের কথা ব্যবসার মালে উপরিউক্ত চারটি সুরতেই গ্রহণযোগ্য হবে। আর সায়েমা পশুর ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত তিন সুরতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এ ব্যাখ্যার পর হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ব্যবসার মাল এবং সায়েমা পশুর যে সব সুরতে মালের মালিকের কথা বিশ্বাস করা হয়, ঐ সব সুরতে 'জামেউস সগীর' -এর বর্ণনা মোতাবেক إِخْرَاجُ الْبَرَاءَةِ বা দায়মুক্তি পত্র বের করা শর্ত নয়। পক্ষান্তরে 'মবসূত'-এর বর্ণনা মোতাবেক শর্ত। এই عِبَارَتْ -এর মর্ম হলো, মবসূত-এর বর্ণনা মোতাবেক সকল সুরতে إِخْرَاجُ الْبَرَاءَةِ বা লিখিত দায়মুক্তি পত্র পেশ করা অবশ্যক নয়। অথচ একটি সুরত ব্যতীত সমূহ সুরতে إِخْرَاجُ الْبَرَاءَةِ পেশ করা সম্ভবই নয়। কেননা যখন মালিক বলল, এখনো বর্ষপূর্তি হয়নি, অথবা আমার উপর ঋণের দায় আছে, অথবা আমি নিজেই গরিবকে দিয়েছি। উক্ত তিন সুরতে লিখিত সনদ পেশ করা সম্ভব নয়। তবে হাঁ যদি সে বলে যে, অন্য আশিরকে জাকাত দিয়েছি, তাহলে দ্বিতীয় আশির-এর লিখিত সনদ পেশ করা সম্ভব।

উত্তর : উক্ত ইবারতে مَجَازْ [মাজায] বা রূপক হিসেবে আম (عَامْ) -এর দ্বারা খাছ (خَاصْ) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বলেছেন তো এমন শব্দ যা সব সুরতকে অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু উদ্দেশ্য উক্ত একটিই তা হচ্ছে চতুর্থ সুরত।

قَالَ وَمَا صُدِّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيهِ الذِّمِّيُّ لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَيُرَاعٰى تِلْكَ الشَّرَائِطُ تَحْقِيقًا لِلتَّضْعِيفِ وَلَا يُصَدَّقُ الْحَرْبِيُّ إِلَّا فِي الْجَوَارِيْ يَقُوْلُ هُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِيْ أَوْ غِلْمَانٌ مَعَهُ يَقُوْلُ هُمْ أَوْلَادِيْ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ بِطَرِيْقِ الْحِمَايَةِ وَمَا فِيْ يَدِهٖ مِنَ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهٗ بِنَسَبِ مَنْ فِيْ يَدِهٖ مِنْهُ صَحِيْحٌ فَكَذَا بِأُمُوْمَتِهِ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا تَبْتَنِيْ عَلَيْهِ فَانْعَدَمَتْ صِفَةُ الْمَالِيَّةِ فِيْهِنَّ وَالْأَخْذُ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنَ الْمَالِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ক্ষেত্রে মুসলমানদের কথা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে সে ক্ষেত্রে জিম্মির কথাও সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। কেননা মুসলমানদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয় তার কাছ থেকে তার দ্বিগুণ নেওয়া হয়। সুতরাং দ্বিগুণত্বকে বাস্তবায়িত করার প্রেক্ষিতে [এ ক্ষেত্রেও] উপরিউক্ত শর্তাবলি বিবেচনা করা হবে। হারবী [ব্যবসায়ী]-এর দাবি সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যদি দাসীদের ব্যাপারে বলে যে, এরা আমার উম্মে ওয়ালাদ কিংবা সঙ্গের বালকদের সম্পর্কে বলে, এরা আমার সন্তান। কেননা, হেফাজতের লক্ষ্যেই তার থেকে শুল্ক গ্রহণ করা হয়। আর তার মালিকানাধীন সম্পদই শুধু হেফাজতের মুখাপেক্ষী। তবে তার অধীনস্ত বালকদের নসবের স্বীকৃতিদান তার জন্য বৈধ। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদের [মাতৃত্বের] স্বীকৃতি দানও বৈধ হবে। কেননা মাতৃত্ব নসবের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাদের মালিয়তের গুণ লুপ্ত হয়ে গেল। আর শুল্ক গ্রহণ একমাত্র মালের উপরই ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা এই যে, যদি মুসলমান আশির-এর পরিবর্তে জিম্মি আশির-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে এবং সে বর্ষপূর্তি হওয়াকে অস্বীকার করল অথবা ঋণের দায়মুক্ত হওয়াকে অস্বীকার করল, অথবা অন্য আশির-এর নিকট জাকাত আদায় করার দাবি করল। তাহলে যে সব সুরতে মুসলমানদের কথা বিশ্বাস করা হয়, সে সব সুরতে জিম্মির কথাও সত্য বলে বিশ্বাস করা হবে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক সুরতে মুসলমানদের কথা বিশ্বাস করা হয় না। আর তা হলো– যখন মালিক বলল যে, আমি শহরে গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি। এ ছাড়া অন্যান্য সব সুরতে তার কথা বিশ্বাস করা হয়। তদ্রূপ এই এক সুরত ব্যতীত অন্যান্য সুরতে জিম্মির কথা গ্রহণ করা হবে। আর শুধু ঐ এক সুরতে তার কথা গ্রহণ করা হবে না।

দলিল হলো– মুসলমান থেকে যা গ্রহণ করা হয় জিম্মি হতে তার দ্বিগুণ নেওয়া হয়। মুযাআফ (مُضْعَفٌ) তথা যার থেকে দ্বিগুণ নেওয়া হয় এর মধ্যে ঐ সব শর্ত ধর্তব্য হবে, যা মুযাআফ আলাইহি (مُضْعَفٌ عَلَيْهِ) তথা যার উপর দ্বিগুণ নেওয়া হয় এর মধ্যে ধর্তব্য হয়। যেভাবে মুযাআফ আলাইহি বা মুসলমানদের ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তি, ঋণের দায়মুক্ত হওয়া এবং ব্যবসার নিয়ত করা শর্ত, তদ্রূপ জিম্মির ক্ষেত্রেও ঐ সব শর্তের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক।

قَوْلُهٗ وَلَا يُصَدَّقُ الْحَرْبِيُّ : সুরতে মাসআলা এই যে, যদি কোনো হারবী বা বিদ্রোহী ব্যবসায়ী নিরাপত্তা নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দারুল ইসলাম বা ইসলামি রাষ্ট্রে প্রবেশ করে এবং মাল নিয়ে আশির-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে আর উক্ত চারটি উক্তি [সুরত] হতে যে কোনো একটি বলল। যেমন বলল যে, আমার এ মালের এখনো বর্ষপূর্তি হয়নি। অথবা বলল যে, আমি অন্য

আশির -এর নিকট আদায় করে দিয়েছি। অথবা বলল যে, আমি নিজে ওশরের (عُشْر) পরিমাণ গরিবদের দিয়েছি। এমতাবস্থায় কোনো সুরতে তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না; বরং আশির তার থেকে ওশর আদায় করবে। তবে হ্যাঁ যদি তার সাথে দাসী থাকে এবং সে বলে যে, এ ব্যক্তি আমার সন্তানের মা অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদ (أُمِّ وَلَدْ) অথবা তার সাথে ছেলে আছে এবং সে বলে যে, এ ব্যক্তি আমার সন্তান, তাহলে এই দুই সুরতে তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দাসী এবং ছেলে থেকে ওশর গ্রহণ করা হবে না।

হারবী ব্যবসায়ীর মাল হতে ওশর গ্রহণ করার দলিল : হারবী হতে এজন্য ওশর গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ঐ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর যে পরিমাণ মাল তার দখলে আছে, তার সংরক্ষণের প্রয়োজনও আছে। ইসলামি রাষ্ট্র তার মাল সংরক্ষণ করেছে। অতএব সংরক্ষণের পাওনা হিসেবে ওশরও আদায় করবে। উপরিউক্ত চারটি সুরতে তার কথা সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। কেননা সত্য বলে গ্রহণ করায় কোনো ফায়দা নেই। এর কারণ হলো– যদি সে বলে, আমার মালে এখনো বর্ষপূর্তি হয়নি, তাহলে বলা হবে হারবীর মালে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য বর্ষপূর্তি শর্ত না। কেননা হারবীর উপর ওশর (عُشْر) ওয়াজিব হয় তাকে এবং তার মালকে হেফাজত করার কারণে। হারবীকে নিরাপত্তা দেওয়ার দ্বারা তার হেফাজত হলো। এজন্য আমান দেওয়ার দ্বারা তার উপর ওশর ওয়াজিব হবে। বর্ষপূর্তি হোক বা না হোক। আর যদি সে বলে যে, আমার উপর ঋণের দায় আছে, তাহলেও তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কেননা যে কর্জর তার উপর দারুল হরব (دَارُ الْحَرْبِ) বা শত্রু কবলিত রাষ্ট্রে ওয়াজিব হয়েছে, তা তার থেকে ইসলামি রাষ্ট্রে চাওয়া হবে না। আর যদি হারবী বলে যে, আমি অন্য আশির-এর নিকট আদায় করে দিয়েছি, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা যা কিছু তার থেকে উসুল করা হচ্ছে, তা হচ্ছে তার হেফাজতের পারিশ্রমিক। আর নিরাপত্তা প্রদানের দ্বারা হেফাজত অর্জিত হয়েছে। যদি সে বলে যে, আমি স্বয়ং গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি, তাহলেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তার বিশ্বাস তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য করে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে ব্যক্তি হারবীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তার পক্ষ থেকে বংশের স্বীকৃতি সহীহ হবে। যেমন– সে বলল যে, এ ব্যক্তি আমার ছেলে বা মেয়ে অথবা এ ব্যক্তি আমার সন্তানের মা, তাহলে আমরা তার স্বীকৃতি গ্রহণ করব। কেননা তার হারবী হওয়াটা সন্তান কামনা করা এবং বংশের বিপরীত নয়। কেননা সন্তান কামনা এবং বংশ যেভাবে ইসলামি রাষ্ট্রে সাবিত হয় তদ্রূপ শত্রু কবলিত রাষ্ট্রেও সাবিত হয়। অতএব দাসীর ক্ষেত্রে উম্মে ওয়ালাদের (أُمِّ وَلَدْ) স্বীকৃতি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে সন্তানের স্বীকৃতি সহীহ। সুতরাং এতে ওশর ইত্যাদিও ওয়াজিব হবে না। কেননা উম্মে ওয়ালাদ এবং সন্তানের মাঝে মাল হওয়ার গুণ অনুপস্থিত। আর ওশর মাল হতে গ্রহণ করা হয়। আর যা মাল নয়, তা হতে গ্রহণ করা হয় না।

قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ هٰكَذَا اَمَرَ عُمَرُ (رض) سُعَاتَهُ وَاِنْ مَرَّ حَرْبِيٌّ بِخَمْسِيْنَ دِرْهَمًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّا اَنْ يَكُوْنُوْا يَاْخُذُوْنَ مِنَّا مِنْ مِثْلِهَا لِاَنَّ الْاَخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيْقِ الْمُجَازَاةِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ لِاَنَّ الْمَاْخُوْذَ زَكٰوةٌ اَوْ ضِعْفُهَا فَلَا بُدَّ مِنَ النِّصَابِ وَهٰذَا فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَفِىْ كِتَابِ الزَّكٰوةِ لَا تُاْخَذُ مِنَ الْقَلِيْلِ وَاِنْ كَانُوْا يَاْخُذُوْنَ مِنَّا مِنْهُ لِاَنَّ الْقَلِيْلَ لَمْ يَزَلْ عَفْوًا وَلِاَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ اِلَى الْحِمَايَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুসলমানদের কাছ থেকে দশমাংশের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করা হবে। আর জিম্মির কাছ থেকে দশমাংশের অর্ধেক এবং হারবীর কাছ থেকে পূর্ণ দশমাংশ গ্রহণ করা হবে। হযরত ওমর (রা.) তার শুল্ক আদায়কারীদের প্রতি এরূপ নির্দেশই জারি করেছিলেন। কোনো হারবী যদি পঞ্চাশ দিরহাম সঙ্গে নিয়ে পথ অতিক্রম করে, তাহলে তার নিকট হতে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যদি তারা এই পরিমাণের ক্ষেত্রে আমাদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে [তখন আমরাও গ্রহণ করব]। কেননা তাদের নিকট থেকে নেওয়া হয় মূলত পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে। মুসলিম ও জিম্মির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা [মুসলমানদের ক্ষেত্রে] উসুলকৃত অর্থ হলো– জাকাত কিংবা [জিম্মির ক্ষেত্রে] জাকাতের দ্বিগুণ। সুতরাং নিসাব পূর্ণ হওয়া জরুরি। এটা জামেউস সগীরের মাসআলা। পক্ষান্তরে মবসূত-এর 'কিতাবুজ জাকাতে'র অধ্যায়ে রয়েছে যে, অল্প পরিমাণের ক্ষেত্রে তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না। যদিও তারা অনুরূপ পরিমাণ মালে আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। কেননা অল্প পরিমাণ সর্বদাই ছাড়যোগ্য। তা ছাড়া তা নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেছেন, মুসলমান ব্যবসায়ী হতে তার মালে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা হবে। আর জিম্মি ব্যবসায়ী হতে বিশ ভাগের এক ভাগ এবং হারবী ব্যবসায়ী হতে দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা হবে। দলিল হলো– হযরত ওমর (রা.) জাকাত উসুলকারী কর্মকর্তা এবং আশিরকে অনুরূপ হুকুম দিয়েছেন। যেমন হযরত ওমর (রা.) বলেছেন– خُذُوْا مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرَ হযরত ওমর (রা.) এই সিদ্ধান্ত সাহাবাদের উপস্থিতিতে দিয়েছেন। সাহাবাদের মধ্য হতে কেউ এ ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেননি। সুতরাং এটা ইজমা (اِجْمَاعٌ) বা সর্বসম্মত মত হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আকলী দলিল হলো, মুসলমানদের থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এ জন্য গ্রহণ করা হয় যে, هَاتُوْا رُبُعَ عُشُوْرِ اَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ "তোমরা নিজেদের মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ প্রদান কর। প্রতি চল্লিশ দিরহাম হতে এক দিরহাম আদায় কর।" আশির-এর জাকাত গ্রহণ করার অধিকার এ জন্য আছে যে, মুসলমান নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী। আর জিম্মি মুসলমানের তুলনায় অধিক নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী। কেননা তার মাল লুণ্ঠন করার বেশি লোভ করে থাকে। সুতরাং তার থেকে মুসলমানের তুলনায় দ্বিগুণ ওশর আদায় করা হবে। যেমন– বনূ তাগলিব হতে মুসলমানদের জাকাতের পরিমাণের দ্বিগুণ আদায় করা হয়। আর হারবী জিম্মির তুলনায় এমন, যেমন জিম্মী মুসলমানের

তুলনায়। যেমন আপনি লক্ষ্য করুন, হারবীদের সাক্ষ্য জিম্মিদের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন জিম্মিদের সাক্ষ্য মুসলমানদের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। পক্ষান্তরে জিম্মিদের সাক্ষ্য হারবীদের পক্ষে বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। অতএব জিম্মি হতে যেরূপ মুসলমানদের জাকাতের দ্বিগুণ গ্রহণ করা হয় তদ্রূপ হারবী হতে জিম্মিদের জাকাতের দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে।

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন যে, যদি কোনো হারবী পঞ্চাশ দিরহাম সাথে নিয়ে আশির-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তাহলে তার থেকে কিছু গ্রহণ করা হবে না, তবে হ্যাঁ যদি তারা এই পরিমাণ মালের ক্ষেত্রে আমাদের লোকদের থেকে গ্রহণ করে, তাহলে আমরাও গ্রহণ করব। কেননা হারবীদের থেকে প্রতিদান বা প্রতিশোধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারা আমাদের সাথে যেরূপ লেনদেন করবে তদ্রূপ আমরাও তাদের সাথে করব। হযরত ওমর (রা.)-এর ফরমানও সেদিকে ইঙ্গিত করে। কেননা হযরত ওমর (রা.) যখন আশির নিযুক্ত করলেন, তখন তারা হযরত ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে- كَمْ نَاخُذُ مِمَّا مَرَّ بِهِ الْحَرْبِيُّ "আমরা হারবী হতে কি পরিমাণ উসূল করব?" হযরত ওমর (রা.) বললেন যে, كَمْ يَاْخُذُوْنَ مِنَّا "তারা আমাদের নিকট হতে কি পরিমাণ গ্রহণ করে?" লোকেরা জবাব দিল যে, তারা আমাদের থেকে ওশর (عُشْر) বা দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। তখন তিনি বললেন- خُذُوْا مِنْهُمُ الْعُشْرَ "তোমরাও তাদের থেকে ওশর গ্রহণ কর।"

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, গ্রন্থকারের ইবারতে বৈপরীত্য আছে। তা হলো, এখানে বলা হয়েছে, হারবীদের থেকে ওশর গ্রহণ করা হয় মুজাযাত (مُجَازَاتْ) বা প্রতিশোধস্বরূপ। আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, জিম্মি এবং হারবীদের থেকে ওশর গ্রহণ করা হয় নিরাপত্তা দানের কারণে।

উত্তর : হারবীদের থেকে নেওয়া হয় নিরাপত্তা দানের ভিত্তিতে। আর পরিমাণ নির্ধারণ করা অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা হয় مُجَازَاتْ বা প্রতিশোধের ভিত্তিতে। সুতরাং এখন আর কোনো বৈপরীত্য ও اِعْتِرَاضْ থাকবে না। পক্ষান্তরে মুসলমান ও জিম্মিদের থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তা যথাক্রমে মুসলমানদের ক্ষেত্রে এক গুণ জাকাত আর জিম্মিদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ জাকাত। অতএব এর জন্য নিসাব জরুরি, যাতে এই নিসাব হতে এক গুণ জাকাত অথবা দ্বিগুণ জাকাত গ্রহণ করা যায়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, হারবীদের স্বল্প মাল হতে প্রতিদান হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ আছে। এ মাসআলা 'জামেউস সগীরে' আছে। পক্ষান্তরে 'মবসূত'-এর 'কিতাবুজ জাকাতে'র অধ্যায়ে আছে যে, হারবীদের কম মাল হতে আশির (عَاشِرْ) কিছুই গ্রহণ করবে না। যদিও হারবীরা আমাদের এ পরিমাণ স্বল্প মাল হতে গ্রহণ করে থাকে। কেননা অল্প পরিমাণ মাল ছাড়যোগ্য। সুতরাং এ থেকে যদি ওশর গ্রহণ করা হয় তাহলে জুলুম হবে। তা ছাড়া অল্প মালের কোনো হেফাজত লাগে না। আর হেফাজতের কারণেই ওশর নেওয়া হয়।

قَالَ وَإِنْ مَرَّ حَرْبِيٌّ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَا يُعْلَمُ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ لِقَوْلِ عُمَرَ (رضـ) فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا رُبْعَ عُشْرٍ أَوْ نِصْفَ عُشْرٍ يَأْخُذُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا يَأْخُذُ الْكُلَّ لِأَنَّهُ غَدْرٌ وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ أَصْلًا لَا يَأْخُذُ لِيَتْرُكُوا الْأَخْذَ مِنْ تُجَّارِنَا وَلِأَنَّا أَحَقُّ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো হারবী যদি দু'শ দিরহাম সঙ্গে নিয়ে পথ অতিক্রম করে। আর তারা আমাদের থেকে কি পরিমাণ গ্রহণ করে তা জানা না থাকে, তাহলে তার থেকে দশমাংশ গ্রহণ করা হবে। কেননা হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, যদি তোমরা জানতে অক্ষম হও, তবে দশমাংশ গ্রহণ কর। আর যদি জানা যায় যে, তারা আমাদের থেকে ওশরের এক চতুর্থাংশ কিংবা ওশরের অর্ধেক গ্রহণ করে তাহলে তার নিকট থেকে সেই পরিমাণই গ্রহণ করা হবে। আর তারা যদি সবটুকু নিয়ে নেয় তাহলে সবটুকু নেওয়া হবে না। কেননা তা গাদ্দারী [আর গাদ্দারী মুসলমানদের জন্য শোভনীয় নয়]। আর যদি তারা কিছুই না নেয়, তবে [আমাদের ওশর উসুলকারীও] কিছু নেবে না। যাতে তারা আমাদের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক নেওয়া হতে বিরত থাকে। তা ছাড়া উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে আমরাই অধিক হকদার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো হারবী ব্যবসায়ী দু'শ বা ততোধিক দিরহাম নিয়ে আশির -এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং মুসলমান আশির-এর জানা নেই যে, তারা আমাদের ব্যবসায়ীদের থেকে কি পরিমাণ গ্রহণ করে, তাহলে ওশর [দশ ভাগের এক ভাগ] গ্রহণ করা হবে।

দলিল : হযরত ওমর (রা.) বলেছেন– فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ "যদি তোমরা জানতে অক্ষম হও যে, তারা তোমাদের থেকে কি পরিমাণ গ্রহণ করে, তাহলে ওশর গ্রহণ কর।" আর যদি জানা যায় যে, হারবীরা আমাদের চল্লিশ ভাগের একভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে, তাহলে আমাদের আশিরও সেই পরিমাণ গ্রহণ করবে। আর যদি জানা যায় যে, হারবী আমাদের ব্যবসায়ীদের থেকে পূর্ণ মাল নিয়ে নেয়, তাহলে আমাদের আশির হারবী ব্যবসায়ী থেকে পূর্ণ মাল নিয়ে নেবে না। কেননা এটা অশোভনীয় আচরণ যে, নিরাপত্তার পর পূর্ণ মাল ছিনিয়ে নিল। এটা গাদ্দারী যা শরিয়তে হারাম। যদিও হারবীরা আমাদের সাথে এরূপ আচরণ করে। আর যদি হারবী লোকেরা নিরাপত্তা দানের পর আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। কোনো কোনো শায়খ বলেছেন যে, আমাদের আশির তাদের পূর্ণ মাল নিয়ে নেবে, তবে তাদেরকে এ পরিমাণ মাল দিয়ে দেবে, যা দ্বারা নিজ বাড়ি পৌছতে পারে। কেননা আমরা তাদেরকে বাড়ি পৌছাতে আদিষ্ট। মহান আল্লাহ বলেছেন– ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ "তাকে তার বাড়িতে পৌছিয়ে দাও।"–[তওবা, আয়াত নং ৬]

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, হারবী ব্যবসায়ী হতে পূর্ণ মাল নিয়ে নেওয়া হবে এবং বাড়ি যাওয়ার পরিমাণ পথ খরচও দেওয়া হবে না। কেননা হারবীদের থেকে مُجَازَاتْ বা প্রতিশোধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যেহেতু তারা আমাদের ব্যবসায়ী হতে পূর্ণ মাল নিয়ে নিয়েছে। তদ্রূপ আমরাও করব যাতে তারা সতর্ক হয়। আর যদি হারবী আমাদের ব্যবসায়ীদের থেকে কিছু না নেয়, তাহলে আমাদের আশিরও কিছুই গ্রহণ করবে না। তাতে তারা আমাদের ব্যবসায়ীদের থেকে নেওয়া ছেড়ে দেবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো– তারা আমাদের থেকে কোনো কিছু না নিয়ে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করল। অতএব আমরা উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অধিক হকদার।

قَالَ وَإِنْ مَرَّ الْحَرْبِيُّ عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَرَهُ ثُمَّ مَرَّ مَرَّةً أُخْرَى لَمْ يُعَشِّرْهُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ لِأَنَّ الْأَخْذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِسْتِيصَالُ الْمَالِ وَحَقُّ الْأَخْذِ لِحِفْظِهِ وَلِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ بَاقٍ وَبَعْدَ الْحَوْلِ يَتَجَدَّدُ الْأَمَانُ لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا وَالْأَخْذُ بَعْدَهُ لَا يَسْتَاصِلُ الْمَالَ وَإِنْ عَشَرَهُ فَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ ذَالِكَ عَشَرَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَدِيدٍ وَكَذَا الْأَخْذُ بَعْدَهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْإِسْتِيصَالِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হারবী যদি ওশর উসুলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে এবং সে তার কাছ থেকে ওশর আদায় করে থাকে, অতঃপর যদি সে দ্বিতীয়বার পথ অতিক্রম করে, তবে বর্ষপূর্তির পূর্বে তার নিকট থেকে পুনরায় ওশর গ্রহণ করা হবে না। কেননা প্রতিবার শুল্ক গ্রহণের পরিণাম হলো– তার সম্পদ বিনাশ করা। অথচ শুল্ক গ্রহণের অধিকার হলো তার সম্পদের হেফাজতের জন্য। তা ছাড়া প্রথম নিরাপত্তা দানের কার্যকারিতা এখনো অব্যাহত আছে। বর্ষপূর্তির পর নিরাপত্তার নবায়ন হবে। কেননা তাকে এক বছরের অধিক অবস্থানের অবকাশ দেওয়া হয় না। আর বর্ষপূর্তির পর পুনরায় শুল্ক গ্রহণ করার দ্বারা তার সম্পদ নিঃশেষিত হবে না। ওশর আদায় করার পর যদি সে দারুল হরবে ফিরে গিয়ে একই দিনে ফিরে আসে, তাহলে তার থেকে পুনরায় জাকাত গ্রহণ করা হবে। কেননা সে নতুন নিরাপত্তা নিয়ে ফিরে এসেছে। আর দারুল হরবে গিয়ে ফিরে আসার পর শুল্ক গ্রহণে মাল নিঃশেষে পরিণত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি হারবী ব্যবসায়ী কোনো আশির-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং আশির তার থেকে ওশর আদায় করে দারুল হরব (دَارُ الْحَرْبِ) -এ যাওয়ার পূর্বে দ্বিতীয়বার ঐ আশির-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। যদি এক বর্ষপূর্তি হয়, তা হলে আশির তার থেকে দ্বিতীয়বার ওশর আদায় করবে। আর যদি এক বর্ষপূর্তি না হয় তাহলে আশির তার থেকে দ্বিতীয়বার জাকাত আদায় করবে না।

দলিল হলো– একই বছরে বারবার আশির-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সুরতে যদি বারবার ওশর উসুল করা হয়, তাহলে এই গরিব ব্যক্তির পূর্ণ মাল ওশর প্রদানে শেষ হয়ে যাবে। তার নিকট কিছুই বিদ্যমান থাকবে না। অথচ হারবী থেকে ওশর নেওয়ার অধিকার হলো– তার মালের হেফাজতের প্রেক্ষিতে। দ্বিতীয় দলিল হলো– প্রথম নিরাপত্তা দানের হুকুম বা কার্যকারিতা এখনও অব্যাহত আছে। আর এই নিরাপত্তা দানের কারণেই ওশর আদায় করেছে। এজন্য আশির একই বছর দ্বিতীয়বার ওশর আদায় করবে না। হযরত ওমর (রা.)-এর ফরমানের দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মোতাবেক ঘটনা নিম্নরূপ– এক খ্রিস্টান নিজের ঘোড়া নিয়ে হজরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আশির-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করল। আশির হারবী খ্রিস্টান হতে ওশর আদায় করে নিল। এ হারবী খ্রিস্টান দারুল হরবে ফিরে যাওয়ার পূর্বে ঐ বছর ঐ আশির-এর নিকট দিয়ে পুনরায় পথ অতিক্রম করল। ঐ আশির দ্বিতীয়বার ওশর আদায় করার ইচ্ছা করল। তখন খ্রিস্টান বলল, যদি তুমি প্রতিবার ওশর আদায় কর তাহলে আমার ঘোড়া শেষ হয়ে যাবে এবং আমার নিকট কিছুই থাকবে না। ঐ খ্রিস্টান ঘোড়াগুলো ঐ আশিরের নিকট রেখে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খিদমতে হাজির হলো। সে মদীনা পৌঁছে সরাসরি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল এবং দরজার চৌকাঠে দু'হাত রেখে বলল, আমি একজন খ্রিস্টান বৃদ্ধ ব্যক্তি। আমীরুল মু'মিনীন বললেন যে, أَنَا شَيْخٌ حَنِيفِيٌّ "আমি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি।" খ্রিস্টান ব্যক্তি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার সাহায্য-সহযোগিতা করা

হবে। সে মাথা নত করল এবং ফিরে চলে আসল। খ্রিস্টান ব্যক্তি মনে করল যে, ওমর (রা.) আশির-এর অপরাধকে হালকা মনে করেছেন এবং তার অভিযোগের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেননি। মনে হয় যেন সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসল; কিন্তু যখন নিজের ঘোড়ার নিকট পৌছল, তখন জানতে পারল যে, ঐ আশির-এর নিকট হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি তার পূর্বেই পৌছে গেছে।

চিঠির মর্ম হলো– إِنَّكَ إِنْ أَخَذْتَ الْعُشْرَ مَرَّةً فَلَا تَأْخُذْ مَرَّةً أُخْرَى "যদি তুমি একবার ওশর আদায় করে থাক তাহলে দ্বিতীয় বার ঐ খ্রিস্টান হতে ওশর আদায় কর না।" এই বৃদ্ধ খ্রিস্টান হযরত ওমর (রা.)-এর এই অদ্ভুত কর্ম দেখে মন্তব্য করল, দীন ইসলাম এতই ইনসাফপূর্ণ? এ দীন অবশ্যই সত্য। এ কথা বলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, হারবী যদি দারুল হরবে গিয়ে ফিরে না আসে তাহলে তার থেকে এই বছরে দুই বার ওশর নেওয়া হবে না। তবে হ্যাঁ যদি হারবী এক বছরের পরেও দারুল ইসলামে অবস্থান করে তাহলে দ্বিতীয় বছর শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয়বার ওশর গ্রহণ করা হবে। কেননা এক বর্ষপূর্তির পর নিরাপত্তা নবায়ন করা হয়। অর্থাৎ এক বছর পর তাকে দ্বিতীয়বার নিরাপত্তা দেওয়া হলো। অতএব দ্বিতীয় বার ওশর ওয়াজিব হবে। আর এক বর্ষপূর্তির পর ওশর প্রদানের দ্বারা সম্পদ নিঃশেষ হবে না। এজন্য বর্ষপূর্তির পর পুনরায় ওশর গ্রহণ করা হয়। আর এক বর্ষপূর্তির পর নিরাপত্তা এজন্য নবায়ন করা হয় যে, হারবীর জন্য দারুল ইসলামে এক বছরের অধিক অবস্থান করা বৈধ নয় এবং তাকে এক বছরের অধিক অবস্থান করার সুযোগ দেওয়া হবে না। 'ফতহুল কাদীর' -এর গ্রন্থকার বলেছেন– لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا এই ইবারতে إِلَّا শব্দটি অতিরিক্ত। এটা লেখকের ভুল। সারকথা হলো, হারবীর জন্য দারুল ইসলামে এক বছর অবস্থান করা সম্ভব নয়। এটিই সহীহ। কেননা হারবীর জন্য পূর্ণ বছর অবস্থান করা জায়েজ নেই; বরং এক বছরের কম অবস্থান করা জায়েজ আছে। অতএব হারবী যখন দারুল ইসলামে দাখিল হবে, তখন ইসলামি রাষ্ট্র প্রধান তাকে বলবে, যদি তুমি এক বছর অবস্থান কর, তাহলে তোমাকে কর দিতে হবে। যদি সে এক বছর অবস্থান করে এবং খলীফা তার উপর কর নির্ধারণ করে থাকে, তখন তার জন্য দারুল হরবে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না; বরং সে বশ্যতা স্বীকার করে দারুল ইসলামে সময় পূর্ণ করবে।

'ফতহুল কাদীর'-এর এই ইবারত সহীহ করার পর হিদায়ার ইবারত (عِبَارَتْ) -এর মাঝে تَنَاقُضْ বা বিরোধ لَازِمْ আসছে। তা এভাবে যে, শুরুতে বলা হয়েছে– হারবী যদি আশির-এর নিকট দিয়ে দ্বিতীয়বার অতিক্রম করে, তাহলে তার থেকে পুনরায় ওশর আদায় করা হবে না। তবে হাঁ যদি এক বর্ষপূর্তির পর দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়, তাহলে দ্বিতীয়বার ওশর নেওয়া হবে। এই ইবারত দ্বারা বুঝা গেল যে, হারবী এক বছরের বেশি দারুল ইসলামে অবস্থান করতে পারে। আর সামনে বলছে যে, لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا –إِلَّا শব্দটি ভুল। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সারকথা হলো, হারবীকে এক বছর অবস্থান করার সুযোগ দেওয়া হবে না। এর জবাব হলো, হারবী এক বছর পর্যন্ত দারুল ইসলামে অবস্থান করল, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান তা অবগত হতে পারেনি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বার জাকাত গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ عَشَرَهُ فَرَجَعَ الخ : মাসআলা এই যে, যদি আশির হারবী ব্যবসায়ী হতে ওশর গ্রহণ করে। তারপর ঐ হারবী দারুল হরবে গিয়ে ঐ দিনেই ফিরে আসে তাহলে তার থেকে পুনরায় ওশর গ্রহণ করা হবে। কেননা সে যখন দারুল হরবে গিয়ে ফিরে এসেছে, তখন সে নতুন নিরাপত্তার সাথে এসেছে। আর এই নতুন নিরাপত্তার কারণে তার থেকে পুনরায় ওশর আদায় করা হবে। আর দারুল হরবে গিয়ে ফিরে আসার পর ওশর নিলে মাল হালাক হওয়ার কারণ হবে না। সুতরাং ওশর নেওয়ায় অসুবিধা নেই।

وَإِنْ مَرَّ ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عُشِرَ الْخَمْرُ دُونَ الْخِنْزِيرِ وَقَوْلُهُ عُشِرَ الْخَمْرُ أَيْ مِنْ قِيْمَتِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يُعْشَرُهُمَا لِأَنَّهُ لَا قِيْمَةَ لَهُمَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) يُعْشَرُهُمَا لِإِسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يُعْشَرُهُمَا إِذَا مَرَّ بِهِمَا جُمْلَةً كَأَنَّهُ جَعَلَ الْخِنْزِيرَ تَبَعًا لِلْخَمْرِ فَإِنْ مَرَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ عُشِرَ الْخَمْرُ دُونَ الْخِنْزِيرِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْقِيْمَةَ فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ لَهَا حُكْمُ الْعَيْنِ وَالْخِنْزِيرُ مِنْهَا وَذَوَاتُ الْأَمْثَالِ لَيْسَ لَهَا هٰذَا الْحُكْمُ وَالْخَمْرُ مِنْهَا وَلِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ يَحْمِيْ خَمْرَ نَفْسِهِ لِلتَّخْلِيْلِ فَكَذَا يَحْمِيْهَا عَلٰى غَيْرِهِ وَلَا يَحْمِيْ خِنْزِيْرَ نَفْسِهِ بَلْ يَجِبُ تَسْيِيْبُهُ بِالْإِسْلَامِ فَكَذَا لَا يَحْمِيْهِ عَلٰى غَيْرِهِ -

অনুবাদ : যদি কোনো জিম্মি মদ কিংবা শূকর নিয়ে পথ অতিক্রম করে, তবে মদের ওশর গ্রহণ করা হবে, কিন্তু শূকরের ওশর গ্রহণ করা হবে না। মদের ওশর গ্রহণের অর্থ হলো– তার মূল্যের ওশর গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয়টির মধ্যে কোনোটির ওশর গ্রহণ করা হবে না। কেননা [মুসলমানদের কাছে] এ দুটির কোনো মূল্য নেই। ইমাম জুফার (র.) বলেন, উভয়টির ওশর গ্রহণ করা হবে। কেননা সম্পদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিকট উভয়টি সমান। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি উভয়টি নিয়ে একসঙ্গে পথ অতিক্রম করে, তাহলে উভয়টির ওশর গ্রহণ করা হবে। সম্ভবত তিনি শূকরকে মদের অনুগামী ধরেছেন। কিন্তু যদি উভয়টি আলাদাভাবে নিয়ে চলে, তবে মদের ওশর নেওয়া হবে, কিন্তু শূকরের ওশর নেওয়া হবে না। যাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই পার্থক্যের কারণ এই যে, মূল্যনির্ভর বস্তু মূল বস্তুর হুকুম রাখে। আর শূকর এই শ্রেণীভুক্ত। পক্ষান্তরে সমতুল্য বস্তুর ক্ষেত্রে মূল্য মূল বস্তুর হুকুম রাখে না। আর মদ এই শ্রেণীভুক্ত। তা ছাড়া শুল্ক গ্রহণের অধিকার বর্তে হেফাজতের কারণে। তবে সিরকায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমান নিজস্ব মদ সংরক্ষণ করতে পারে। সুতরাং অন্যের মদও সে সংরক্ষণ করতে পারবে। পক্ষান্তরে নিজস্ব মালিকানায় সে শূকর সংরক্ষণ করতে পারে না; বরং ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। সুতরাং সে অন্যের শূকরও সংরক্ষণ করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা এই যে, যদি কোনো জিম্মি ব্যবসার নিয়তে মদ বা শূকর কিংবা উভয়টি সঙ্গে নিয়ে কোনো আশির-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং এর মূল্য দু'শ দিরহাম পরিমাণ হয়, তাহলে এতে চারটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. তরফাইনের মতে মদের মূল্য হতে দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা হবে। তবে শূকর -এর ওশর গ্রহণ করা হবে না।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উভয়ের মধ্যে কোনোটির ওশর গ্রহণ করা হবে না।

৩. ইমাম জুফার (র.)-এর মতে মদ এবং শূকর উভয়টির ওশর গ্রহণ করবে।

৪. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো, যদি জিম্মি মদ ও শূকর উভয়টি নিয়ে আশির-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে তাহলে উভয়টির ওশর গ্রহণ করবে। আর আলাদাভাবে নিয়ে চললে মদের ওশর নেবে। শূকর-এর ওশর নেবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মদ এবং শূকর ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানের ক্ষেত্রে কোনো সম্পদও নয় এবং কোনো মূল্যও নয়। এ কারণে যদি কোনো মুসলমান কোনো জিম্মির মদ অথবা শূকর ধ্বংস করে দেয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কোনো জরিমানা ওয়াজিব হবে না। অতএব এ দুটো ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মাল নয়, বিধায় এতে ওশর ওয়াজিব হবে না। কেননা ওশর তো মালের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে।

ইমাম জুফার (র.)-এর দলিল হলো, মদ এবং শূকর কাফিরদের নিকট মাল। যদিও আমাদের নিকট মাল নয়। এজন্যই কোনো মুসলমান যদি জিম্মিদের শূকর ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হয়। যেমন– তাদের [জিম্মিদের] মদ নষ্ট করলে জরিমানা ওয়াজিব হয়। ইমাম জুফার (র.)-এর মতে মাল হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টি সমান। এ দুটো মুসলমানদের নিকট মাল নয়, তবে কাফিরদের নিকট মাল বিধায় ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা প্রত্যেক ব্যবসার মালে ওশর ওয়াজিব হয় নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্তে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) تَبْعِيَتْ বা অনুবর্তী হওয়াকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন এবং তিনি বলেছেন, শূকর মদের অনুগামী হবে এবং উভয়টি নিয়ে পথ অতিক্রম করলে উভয়টি থেকে ওশর গ্রহণ করা হবে। আর যদি আলাদাভাবে নিয়ে পথ চলে, তাহলে মদের ওশর নেবে; শূকরের ওশর নেবে না।

প্রশ্ন : শূকরকে মদের অনুগামী করেছে, এর উল্টা করল না কেন?

উত্তর : মদ সম্পদের নিকটবর্তী। কেননা যে বস্তু দ্বারা মদ তৈরি করা হয়েছে তা মদে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে মাল ছিল এবং মদ হওয়ার পরও মাল। তা এভাবে যে, একে সিরকায় রূপান্তরিত করবে। আর শূকরে এমনটা সম্ভব নয়। এ কারণে যদি কোনো মুকাতিব (مُكَاتَبْ)-এর নিকট মদ এবং শূকর থাকে এবং সে বদলে কিতাবত (بَدْلِ كِتَابَتْ) বা দাসত্ব মুক্তিপণ আদায় করতে অক্ষম হয়, তাহলে তার মদ মনিবের মালিকানায় চলে যাবে, কিন্তু শূকর মনিবের মালিকানায় চলে যাবে না। অনেক সময় কোনো বস্তু تَبَعًا বা অনুগামী হিসেবে সাবিত হয়, কিন্তু قَصْدًا বা ইচ্ছাকৃতভাবে সাবিত হয় না। এজন্য শূকরকে মদের অনুগামী বানিয়ে ওশর নেওয়া হবে। শূকরকে মূল বা স্বতন্ত্র গণ্য করে ওশর নেওয়া হবে না। তরফাইনের দলিল হলো, উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, যাওয়াতুল কিয়াম (ذَوَاتُ الْقِيَمِ) অর্থাৎ মূল্যনির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে মূল্য মূল বস্তুর হুকুম রাখে। আর শূকর যাওয়াতুল কিয়াম(ذَوَاتُ الْقِيَمِ) বা মূল্যনির্ভর বস্তু। সুতরাং শূকরের মূল্য নেওয়া প্রকারান্তরে শূকর নেওয়ার মতোই। আর মুসলমানদের জন্য শূকর নেওয়া এবং এর মালিক হওয়া জায়েজ নেই। এজন্য বলা হয়েছে যে, শূকরের ওশর নেওয়া হবে না। আর যাওয়াতুল আমছাল (ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ) বা সমতুল্য বস্তুর ক্ষেত্রে মূল্য মূল বস্তুর হুকুম রাখে না। আর মদ সমতুল্য বস্তুর শ্রেণীভুক্ত। অতএব মদের মূল্য হতে ওশর গ্রহণ করা মদ গ্রহণ করা হিসেবে গণ্য হবে না। সুতরাং মদের মূল্য হতে ওশর গ্রহণ করা জায়েজ হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, ওশর নেওয়ার অধিকার নিরাপত্তা দানের কারণে। মুসলমান পান করার জন্য নিজের মদের হেফাজত করে না; বরং সিরকা তৈরি করার জন্য করে। যেভাবে নিজের মদ হেফাজত করে, তদ্রূপ অন্যের মদও হেফাজত করে। আর এই হেফাজত বা নিরাপত্তা দানের প্রেক্ষিতে ওশর গ্রহণ করবে। মুসলমান নিজের শূকর হেফাজত করে না; বরং মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। অতএব অন্যদের শূকরও হেফাজত বা সংরক্ষণ করবে না। অতএব সংরক্ষণ করার কারণে ওশর নেবে না।

وَلَوْ مَرَّ صَبِيٌّ أَوْ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ تَغْلِبَ بِمَالٍ فَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ لِمَا ذَكَرْنَا فِى السَّوَائِمِ وَمَنْ مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ فِىْ مَنْزِلِهِ مِائَةً أُخْرٰى قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَمْ يُزَكِّ الَّتِىْ مَرَّ بِهَا لِقِلَّتِهٖ وَمَا فِىْ بَيْتِهٖ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حِمَايَتِهٖ فَلَوْ مَرَّ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ بِضَاعَةٍ لَمْ يُعْشَرْهَا لِاَنَّهٗ غَيْرُ مَاذُوْنٍ بِاَدَاءِ زَكٰوتِهٖ ـ

অনুবাদ : তাগলাবী কোনো শিশু বা স্ত্রী লোক যদি সম্পদ নিয়ে অতিক্রম করে, তবে শিশুর [সম্পদের] উপর কোনো শুল্ক আরোপ করা হবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকের [সম্পদের] উপর ঐ পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হবে যা তাদের পুরুষ লোকের উপর আরোপ করা হয়। এর কারণ আমরা গবাদি পশুর ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি। আর যে ব্যক্তি ওশর আদায়কারী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে একশ দিরহাম নিয়ে অতিক্রম করল এবং এ কথা জানালো যে, তার ঘরে আরো একশ দিরহাম আছে এবং সেটার বর্ষপূর্তি হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যে একশ দিরহাম সে নিয়ে যাচ্ছে, তার জাকাত উসুল করা হবে না। কেননা তা নিসাবের পরিমাণের চেয়ে কম। আর যা তার ঘরে আছে, সেটা ওশর আদায়কারীর নিরাপত্তাধীনে আসেনি। যদি সে অন্যের প্রদত্ত পুঁজিরূপে দু'শ দিরহাম নিয়ে যায়, তবে তার থেকে ওশর উসুল করা হবে না। কেননা সে জাকাত আদায় করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : বনূ তাগলিবের কোনো ছেলে বা কোনো স্ত্রীলোক যদি মাল নিয়ে আশির-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে ছেলের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে স্ত্রীলোকের উপর ঐ পরিমাণ ওয়াজিব হবে, যা বনূ তাগলিবের পুরুষের উপর ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বিগুণ নেওয়া হবে।

قَوْلُهٗ وَمَنْ مَرَّ الخ : কোনো ব্যক্তি একশ দিরহাম নিয়ে কোনো আশির-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, সে আশিরকে অবগত করল যে, তার বাড়িতে একশ দিরহাম আছে এবং উভয়টির উপর বর্ষপূর্তি হয়েছে, তাহলে আশির কোনোটি থেকে ওশর গ্রহণ করবে না। কারণ, যা তার সাথে আছে তা নিসাবের পরিমাণ হতে কম। অতএব ওশর ওয়াজিব হবে না। আর যা তার ঘরে আছে তা আশির-এর নিরাপত্তাধীনে আসেনি এবং নিসাবের পরিমাণ থেকে কমে জাকাত ও ওশর ওয়াজিব হয় না। এ জন্য এই একশ দিরহামে জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যা আশির-এর নিরাপত্তাধীনে আসেনি তা থেকে ওশর গ্রহণের অধিকার আশির-এর নেই। সুতরাং তার জাকাতও আশির গ্রহণ করবে না।

قَوْلُهٗ فَلَوْ مَرَّ الخ : বিযাআতুন (بِضَاعَة)-এর আভিধানিক অর্থ মালের টুকরা বা অংশবিশেষ। পারিভাষিক অর্থ হলো– ব্যবসার জন্য মালিক কোনো ব্যক্তিকে পুঁজি দেবে আর পূর্ণ মুনাফা মালিক পাবে; পরিশ্রমকারী কিছুই পাবে না।

এখন মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি ব্যবসার পুঁজি হিসেবে দু'শ দিরহাম নিয়ে আশির -এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। আশির তার থেকে ওশর গ্রহণ করবে না। কেননা সে মালিকের পক্ষ হতে শুধু ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। আশির তার থেকে কিছু নিলে তা জাকাত ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে গণ্য হবে। আশির -এর জাকাত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই।

قَالَ وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ يَعْنِىْ إِذَا مَرَّ الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقُوْلُ اَوَّلًا يَعْشِرُهَا لِقُوَّةِ حَقِّ الْمُضَارِبِ حَتّٰى لَا يَمْلِكَ رَبُّ الْمَالِ نَهْيَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيْهِ بَعْدَ مَا صَارَ عُرُوْضًا فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمِلْكِ ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى مَا ذُكِرَ فِى الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِاَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ فِىْ اَدَاءِ الزَّكٰوةِ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فِى الْمَالِ رِبْحٌ يَبْلُغُ نَصِيْبُهُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لِاَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ وَلَوْ مَرَّ عَبْدٌ مَاذُوْنٌ لَهُ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عُشِرَهُ قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا اَدْرِىْ اَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ (رحـ) رَجَعَ عَنْ هٰذَا اَمْ لَا وَقِيَاسُ قَوْلِهِ الثَّانِىْ فِى الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا اَنَّهُ لَا يَعْشِرُهُ لِاَنَّ الْمِلْكَ فِيْمَا فِىْ يَدِهِ لِلْمَوْلٰى وَلَهُ التَّصَرُّفُ فَصَارَ كَالْمُضَارِبِ وَقِيْلَ فِى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اِنَّ الْعَبْدَ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ حَتّٰى لَا يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلٰى فَكَانَ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ وَالْمُضَارِبُ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ حَتّٰى يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلٰى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْمُحْتَاجُ فَلَا يَكُوْنُ الرُّجُوْعُ فِى الْمُضَارِبِ رُجُوْعًا مِنْهُ فِى الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِاَنَّ الْمِلْكَ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِمَالِهِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ اَوْ لِلشُّغْلِ قَالَ وَمَنْ مَرَّ عَلٰى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ فِىْ اَرْضٍ قَدْ غَلَبُوْا عَلَيْهَا فَعَشَرَهُ يُثَنّٰى عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مَعْنَاهُ إِذَا مَرَّ عَلٰى عَاشِرِ اَهْلِ الْعَدْلِ لِاَنَّ التَّقْصِيْرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুদারাবা (مُضَارَبَة)-এর ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাৎ মুদারাবা-এর ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি মাল নিয়ে ওশর উসুলকারী ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। [তবে উক্ত মাল থেকে ওশর উসুল করা হবে না]। ইমাম আবূ হানীফা (রা.) প্রথমে বলতেন যে, আশির মুদারাবা-এর মাল থেকে ওশর আদায় করবে। কেননা [পুঁজির উপর] মুদারিব-এর হক অধিক দৃঢ়। এজন্যই পুঁজিদাতা ব্যবসার কোনো ক্ষেত্রে তাকে বাধা দিতে পারে না। যখন পুঁজির অর্থ ব্যবসার পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সুতরাং সে মালিকের স্থলবর্তী হয়ে যাবে। পরবর্তীতে তিনি [ইমাম আবূ হানীফা (র.)] কুদূরীতে উল্লিখিত মতের প্রতি রুজূ করেছেন। আর এটাই সাহেবাইনের অভিমত। কেননা সে প্রকৃতপক্ষে উক্ত পুঁজির মালিক নয় এবং জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে মালিকের নায়েব বা স্থলবর্তীও নয়। কিন্তু যদি পুঁজির সঙ্গে এই পরিমাণ মুনাফা বিদ্যমান থাকে, যাতে তার অংশ নিসাব পরিমাণ পৌঁছে, তবে তার নিকট হতে জাকাত গ্রহণ করা হবে। কেননা সে তো তার মালিক। ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো দাস যদি দু'শ দিরহাম নিয়ে [আশির এর কাছ দিয়ে] অতিক্রম করে এবং তার উপর ঋণের কোনো দায় না থাকে, তবে তার নিকট থেকে

ওশর গ্রহণ করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমি জানি না– ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মত হতে রুজু করেছেন কি না? তবে মুদারাবা -এর ক্ষেত্রে তার দ্বিতীয় মতের যুক্তি হলো এই যে, আশির তার নিকট হতে ওশর গ্রহণ করবে না। এটাই সাহেবাইনের অভিমত। কেননা তার অধীনে যে সম্পদ রয়েছে তার মালিক তার মনিব। তার শুধু ব্যবসা পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং সে মুদারিবের মতো হয়ে গেল। আর উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হিসেবে বলা হয় যে, দাস নিজের জন্যই যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ কারণে মনিবের দিকে কোনো দায়-দায়িত্ব রুজু হয় না। সুতরাং সে নিজেই নিরাপত্তা লাভের মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে মুদারিব নায়েব বা স্থলবর্তীরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই সকল দায়দায়িত্ব পুঁজিদাতার দিকে রুজু হয়। তাই পুঁজিদাতাই হচ্ছে নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর مُضَارِبٌ -এর মাসআলায় রুজু করাটা অনুমতি প্রাপ্ত দাসের মাসআলায় রুজু করা হবে না। তবে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের সঙ্গে যদি তার মনিবও উপস্থিত থাকে, তাহলে মনিবের নিকট হতে ওশর গ্রহণ করা হবে। কেননা [আসলে] মালিকানা তো তারই। কিন্তু যদি দাসের উপর তার সম্পদ বেষ্টনকারী ঋণের দায় থাকে তাহলে ওশর নেওয়া হবে না। কেননা তার মালিকানা কিংবা তার সম্পদ দায়বদ্ধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার কেউ যদি তাদের নিযুক্ত আশির-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। আর সে তার কাছ থেকে ওশর গ্রহণ করে থাকে, তাহলে বৈধ সরকারের আশির তার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার জাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ যখন সে বৈধ শাসকের নিয়োগকৃত আশির-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। কেননা এটি তার পক্ষ থেকেই হয়েছে। যেহেতু সে খারেজী আশির-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুদারাবা (مُضَارَبَة) কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে (দুই শত টাকা দিল ব্যবসা করার জন্য। শর্ত হলো, যা মুনাফা হবে, উভয়ের মাঝে তা সমানভাবে ভাগ হবে। যদি মুদারিব নিসাব পরিমাণ মুদারাবার মাল নিয়ে আশির -এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তাহলে আশির তার থেকে জাকাত গ্রহণ করবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম মত ছিল যে, আশির তার থেকে জাকাত গ্রহণ করবে। কেননা মুদারিব -এর অধিকার সুদৃঢ়। এমনকি মুদারিব যদি টাকা দ্বারা পণ্য খরিদ করে, তাহলে মালিকের এখতিয়ার নেই মুদারিবকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিষেধ করার। বলা যায়, মুদারিব মালিকের সমতুল্য। অতএব যেভাবে মালিক -এর নিকট হতে ওশর গ্রহণ করে, তদ্রূপ মুদারিব হতে ওশর গ্রহণ করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথম অভিমত হতে কিতাবে উল্লিখিত মতের প্রতি রুজু করেছেন। এটি সাহেবাইনেরও অভিমত। দলিল হলো, মুদারিব মালের মালিকও নয় এবং জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে মালিকের প্রতিনিধিও নয়; বরং শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি। সুতরাং মুদারিব হতে জাকাত গ্রহণ করা হবে না। তবে হ্যাঁ, যদি মুনাফা এই পরিমাণ হয় যে, মুদারিব-এর লভ্যাংশ নিসাব পরিমাণ, তাহলে তার থেকে জাকাত গ্রহণ করা হবে। কেননা মুদারিব নিজের অংশের মালিক।

قَوْلُهُ وَلَوْ مَرَّ عَبْدٌ الخ : عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ অর্থ হলো–মনিব কর্তৃক ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম। কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত দাস যদি দু'শ দিরহাম নিয়ে আশির-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং তার উপর কোনো ঋণের দায় না থাকে, তাহলে عَاشِرٌ তার থেকে ওশর নেবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমার জানা নেই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) 'ওশর ওয়াজিব' এ মত হতে 'ওশর ওয়াজিব নয়' এ মতের প্রতি রুজু করেছেন কিনা? যেমন– মুদারাবা-এর মাসআলায় রুজু করা সাবিত আছে। তবে হ্যাঁ, মুদারাবার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতের প্রেক্ষিতে কিয়াসের দাবি হলো, অনুমতিপ্রাপ্ত দাস হতে ওশর গ্রহণ করা হবে না। মুদারাবার মাসআলায় যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় মত হলো, মুদারিব হতে ওশর গ্রহণ করা হবে না। তদ্রূপ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম -এর উপর ওশর ওয়াজিব হওয়া উচিত নয়। এই কিয়াসের

দলিল হলো, যেমন মুদারিব মালের মালিক নয়। তদ্রূপ জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ হতে প্রতিনিধিও নয়। অনুরূপভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের দখলে যে মাল আছে ঐ সব মাল মনিবের মালিকানায়।

অনুমতিপ্রাপ্ত দাস ঐ মালের মালিকও নয় এবং জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ হতে অনুমতিপ্রাপ্তও নয়; বরং তাকে শুধু ব্যবসার কারবার করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তবে যারা অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের উপর ওশর ওয়াজিব বলে এবং মুদারিবের উপর ওশর ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলে, তারা উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করেন যে, অনুমতিপ্রাপ্ত দাস নিজের জন্য কার্যক্রম করে। এজন্যই অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মনিবের উপর কোনো দায়দায়িত্ব আসে না। যেমন- অনুমতিপ্রাপ্ত দাস যদি ব্যবসা করাকালীন ঋণী হয়, তাহলে এ ঋণ তাকে নিজস্ব উপার্জন হতে শোধ করতে হবে। মনিবের উপর এ ঋণের কোনো দায়দায়িত্ব আসবে না। অনুমতিপ্রাপ্ত দাস যেহেতু ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনা করে, সুতরাং সে নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী।

অতএব তার উপর ওশর ওয়াজিব হবে। আর মুদারিব মনিবের প্রতিনিধি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। মুদারিবের কার্যক্রমের দায়দায়িত্ব মালিকের উপর আসে। এ কারণেই মুদারিব যদি কোনো পণ্য খরিদ করল, কিন্তু মূল্য আদায় করল না। এমতাবস্থায় ঐ পণ্য ধ্বংস হয়ে গেল, তাহলে এর মূল্যের দায়দায়িত্ব মনিবের উপর আসবে। সুতরাং মনিবই নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী হবে। আর মুদারিব নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী নয়। অতএব তার উপর ওশরও ওয়াজিব হবে না।

উভয় মাসআলার মাঝে এই পরিমাণ পার্থক্য বিদ্যমান আছে। অতএব ইমাম আবূ হানীফা (র.) মুদারাবার মাসআলায় পূর্বের মত হতে রুজু করার দ্বারা এটা لزم আসে না যে, তিনি অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের মাসআলায়ও ওশর ওয়াজিব হবার মত হতে রুজু করেছেন। আর যদি অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের মনিব তার সাথে থাকে, তাহলে মনিব হতে ওশর গ্রহণ করা হবে। কেননা অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের দখলে যে মাল আছে তা মূলত মনিবের মালিকানাধীন। তবে হ্যাঁ, যদি গোলামের এই পরিমাণ ঋণ থাকে যা তার পূর্ণ মালকে বেষ্টন করে, তাহলে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হতে ওশর নেওয়া হবে না। মনিব তার সাথে থাক অথবা না থাক। কেননা গোলামের নিকট যে মাল আছে তার সাথে পাওনাদারদের অধিকার সম্পর্কিত হওয়ার কারণে মনিবের مِلْك বা মালিকানা শূন্য হয়েছে। যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন।

অথবা বলা হবে যে, এ মাল ঋণের সাথে সম্পর্কিত যা সাহেবাইন বলেছেন। আর মালিকানা শূন্য হওয়া এবং মাল ঋণের সাথে জড়িত হওয়া উভয়টি জাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক। অতএব দাসের উপর ঋণের দায় থাকার কারণে ওশর ওয়াজিব হবে না।

ফায়দা : উপরিউক্ত মাসআলাসমূহে যেখানে ওশর (عُشْر) শব্দ বলা হয়েছে, এর দ্বারা শুধু দশ ভাগের এক ভাগই উদ্দেশ্য নয়; বরং ওশর শব্দটি বিশ ভাগের এক ভাগ এবং জাকাত তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগের ক্ষেত্রেও বলা হয়।

প্রমাণের দ্বারা তা নির্ধারণ করা হবে। আশির-এর নিকট দিয়ে ব্যবসার মাল বহনকারী ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, তাহলে তার থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত গ্রহণ করা হবে। যদি জিম্মি হয় তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করবে। আর যদি হারবী হয় তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ নেবে। এ সবের উপর ওশর (عُشْر) শব্দটি ব্যবহার হয়।

মাসআলা : যদি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী কোনো মুসলমান বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তাদের আশির -এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং বিদ্রোহীদের আশির তার থেকে ওশর গ্রহণ করল। তারপর ঐ ব্যক্তি বৈধ সরকারের আশির -এর নিকট দিয়ে পথ চলল, তাহলে তার থেকে দ্বিতীয়বার জাকাত গ্রহণ করা হবে। কেননা ত্রুটি তার [মুসলমান ব্যক্তি] পক্ষ থেকে হয়েছে। যেহেতু সে বিদ্রোহী আশির -এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে।

আর যদি বিদ্রোহীরা বৈধ শাসকের শহরের উপর বিজয়ী হয়- মুসলমানদের পশু হতে জাকাত আদায় করে তাহলে বৈধ সরকার প্রধানের জন্য দ্বিতীয়বার জাকাত আদায় করা জায়েজ হবে না। কেননা এই সুরতে ত্রুটি বৈধ সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি হয়নি। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

بَابٌ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ

قَالَ مَعْدِنُ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ حَدِيْدٍ اَوْ رَصَاصٍ اَوْ صُفْرٍ وُجِدَ فِيْ اَرْضِ خَرَاجٍ اَوْ عُشْرٍ فَفِيْهِ الْخُمُسُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيْهِ لِاَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ اِلَيْهِ كَالصَّيْدِ اِلَّا اِذَا كَانَ الْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبًا اَوْ فِضَّةً فَيَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِيْ قَوْلٍ لِاَنَّهُ نَمَاءٌ كُلُّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيَةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ فَاُطْلِقَ عَلَى الْمَعْدِنِ وَلِاَنَّهَا كَانَتْ فِيْ اَيْدِي الْكَفَرَةِ وَحَوَتْهَا اَيْدِيْنَا غَلَبَةً فَكَانَتْ غَنِيْمَةً وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ بِخِلَافِ الصَّيْدِ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيْ يَدِ اَحَدٍ اِلَّا اَنَّ لِلْغَانِمِيْنَ يَدًا حُكْمِيَّةً لِثُبُوْتِهَا عَلَى الظَّاهِرِ وَاَمَّا الْحَقِيْقِيَّةُ فَلِلْوَاجِدِ فَاعْتَبَرْنَا الْحُكْمِيَّةَ فِيْ حَقِّ الْخُمُسِ وَالْحَقِيْقِيَّةُ فِيْ حَقِّ الْاَرْبَعَةِ الْاَخْمَاسِ حَتّٰى كَانَتْ لِلْوَاجِدِ -

পরিচ্ছেদ : খনিজ সম্পদ ও প্রোথিত সম্পদ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমাদের মতে খেরাজী কিংবা ওশরী ভূমিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, সীসা কিংবা তামা জাতীয় খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেলে তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে প্রাপকের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা তা বৈধ [মালিকানামুক্ত সম্পদ বলে], শিকারের ন্যায় সে সর্বাগ্রে তার অধিকার লাভ করেছে। তবে খনিজ দ্রব্য যদি স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য হয়, তাহলে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। একমত অনুযায়ী তিনি এ ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করেননি। কেননা তা সম্পূর্ণ বর্ধিত সম্পদ। আর বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয় সম্পদ বর্ধিত হওয়ার জন্য। আমাদের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "ভূ- গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।" আর তা [رِكَازٌ শব্দটি] رَكْزٌ ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ– স্থাপিত সম্পদ। সুতরাং তা খনিজ দ্রব্যের উপর প্রযুক্ত হবে। তাছাড়া এ কারণে যে, খনি কাফিরদের আয়ত্তে ছিল, তা বিজিতরূপে আমাদের হাতে এসেছে। সুতরাং সেটা গনিমতরূপে গণ্য হবে। আর গনিমতের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে শিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা কখনো কারো দখলে ছিল না। তবে তাতে মুজাহিদদের দখল হলো নীতিগত– ভূ-পৃষ্ঠের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে। আর প্রকৃতপক্ষে কবজ হাসিল হয়েছে প্রাপকের। তাই এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমরা নীতিগত অবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করেছি আর অবশিষ্ট চারভাগের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করেছি। অতএব তা প্রাপকের হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَعَادِنٌ শব্দটি مَعْدِنٌ -এর বহুবচন। اَلْمَعْدِنُ শব্দটি عَدْنٌ থেকে গৃহীত হয়েছে। অর্থ– অবস্থান, আবাস। এ থেকে "جَنَّتُ عَدْنٍ" আয়াতটি এসেছে। প্রতিটি জিনিসের কেন্দ্র তার আবাস বা অবস্থান স্থল। জমি থেকে তিন ধরনের সম্পদ পাওয়া যায়। [এক] كَنْزٌ [দুই] مَعْدِنٌ [তিন] رِكَازٌ। মানুষ যে সম্পদ জমিতে প্রোথিত করে রাখে তাকে كَنْزٌ বলে। আর আল্লাহ তা'আলা জমিন

সৃষ্টির সময় তাতে যে সম্পদ গচ্ছিত রেখেছেন তা হলো مَعْدِنٌ। আর رِكَازٌ শব্দটি مَعْدِنٌ ও كَنْز উভয়কে একীভূত করে। কেননা رِكَازٌ অর্থ জমিতে যা প্রোথিত করা হয়েছে, চাই তা স্রষ্টা কর্তৃক হোক কিংবা সৃষ্টি কর্তৃক হোক।

أَرْضٌ خَرَاجِيٌّ : আরদ্বে খেরাজী অর্থ–যে জমির উপর খাজনা ওয়াজিব হয়। আর যে জমির উপর 'ওশর' ওয়াজিব হয়, তা হলো أَرْضٌ عُشْرِيٌّ বা ওশরী জমি।

খনিজ দ্রব্য তিন প্রকার– [১] কঠিন পদার্থ যা তাপ দিলে গলে যায় ও ছাঁচে ফেলা যায়। যেমন– স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, সীসা ও তামা। [২] কঠিন পদার্থ তবে তাপ দিলে গলে না। যেমন– চুনা, সুরমা, ইয়াকুত [চুনি, পদ্মরাগমণি], লবণ। [৩] তরল পদার্থ। যেমন– পানি, আলকাতরা যার রং কালো, নৌকায় পানি প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়। পেট্রোল বা খনিজ তৈল, যা জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। আবার ঔষধের কাজেও ব্যবহৃত হয়।

যৌক্তিকভাবে এ অধ্যায়ের মাসআলাগুলো ১৫ ভাগে বিভক্ত। কেননা প্রাপ্ত স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য مَعْدِنٌ [খনিজ-সম্পদ] হবে অথবা كَنْز [প্রোথিত সম্পদ] হবে। এর প্রত্যেকটিই আবার দু'প্রকার। কেননা তা হয়তো মুসলিম অধ্যুষিত কোনো ভূমিতে প্রাপ্ত হবে কিংবা অমুসলিম অধ্যুষিত ভূমিতে প্রাপ্ত হবে। এর প্রত্যেকটিই তিন ধরনের হতে পারে। হয়তো তা মালিকানাহীন কোনো ভূমিতে পাওয়া যাবে। কিংবা মালিকানাধীন ভূমিতে পাওয়া যাবে, অথবা কারো বাড়িতে পাওয়া যাবে। এ হলো ১২ প্রকার। আর كَنْز [প্রোথিত সম্পদ] -কে আলাদাভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে বাড়িতে তা প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে মুসলমানদের কোনো মুদ্রার ছাপ থাকবে কিংবা জাহেলিদের মুদ্রার ছাপ থাকবে অথবা বিষয়টি অস্পষ্ট হবে।

এই পনের প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের অর্থাৎ প্রাপ্ত পদার্থের যেগুলো তাপ দিলে গলে যায় ও ছাঁচে ফেলানো যায়, যেমন– রৌপ্য, স্বর্ণ, লোহা, সীসা কিংবা তামার হুকুম হলো– আমাদের মতে খেরাজী কিংবা ওশরী ভূমিতে প্রাপ্ত এসব দ্রব্যে এক -পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, স্বর্ণ, রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রাপকের উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে খনিজ দ্রব্য যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য হয়, তাহলে তাতে জাকাত তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।

তাঁদের দলিল হলো, এসব খনিজ দ্রব্য মালিকানামুক্ত সম্পদ। সুতরাং যে সর্বাগ্রে তা পাবে, তারই অধিকার তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মালিকানামুক্ত সম্পদের উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হয় না। যেমন– সর্বাগ্রে যে শিকার কারো হস্তগত হয়, তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হয় না। তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যের উপর এক পঞ্চমাংশ কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না।

আর প্রাপ্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক'-এর একটি রেওয়ায়েত দলিলরূপে পেশ করেন–

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ نَاحِيَةُ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكٰوةُ.

أَقْطَعَ অর্থ– জায়গির দেওয়া। قَبَلِيَّة শব্দটি قَبَل ['ক্বাফ' ও 'বা' যবরযুক্ত] -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত, একটি স্থানের নাম। فُرْع ['ফা'-পেশযুক্ত ও 'রা' সাকিনযুক্ত]-দুই হরমের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম।

এখন হাদীসের অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বিলাল ইবনে হারিছ মাযা'নী (রা.)-কে ক্বাবাল নামক স্থানের খনিজ দ্রব্যকে জায়গির হিসেবে দিয়েছেন। তা থেকে জাকাত ছাড়া অন্য কিছু অদ্যাবধি গৃহীত হয় না।

এ থেকে বুঝা যায় যে, খনিজ দ্রব্যে জাকাত ওয়াজিব হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে খনিজ দ্রব্য স্বর্ণ বা রৌপ্য হলে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করেননি। কেননা বর্ষপূর্তির শর্তারোপ করা হয় সম্পদ বর্ধিত হওয়ার জন্য। আর খনিজ দ্রব্য যেহেতু বিনামূল্যে প্রাপ্ত হয়েছে, তাই তা সম্পূর্ণ বর্ধিত সম্পদ। সুতরাং বর্ষপূর্তির কোনো প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ "জেনে রেখ, গনিমতরূপে তোমরা যা কিছু পাও, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'আলার জন্য।" আর ভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদও গনিমতের মালস্বরূপ। কেননা আল্লাহ তা'আলা ভূমি ও ভূমিতে যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, তা কাফিরদের দখলে ছিল। কিন্তু তা বিজিতরূপে মুসলমানদের হাতে আসলে তাদের জন্য এ সবকিছুই গনিমতের সম্পদ হয়ে যায়। গনিমতের সম্পদে চার পঞ্চমাংশ প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। যেমন বর্ণিত আয়াতে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে। এজন্যই আমরা বলি, খনিজ সম্পদে এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াজিব হবে।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর বর্ণিত হাদীস–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ قِيْلَ وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّذِىْ خَلَقَ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ ـ

অর্থ– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– স্বর্ণ ও রৌপ্য যা জমিন সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা জমিতে গচ্ছিত রেখেছেন।

হাদীসের এ সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় যে, ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ হলো খনিজ দ্রব্য। কেননা খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য। সুতরাং এ থেকে খনিজ দ্রব্যে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার আক্বলী দলিল উপস্থাপন করেন যে, খনিজ সম্পদের সম্পূর্ণ অঞ্চলটি কাফিরদের দখলে ছিল। বিজিতরূপে তা মুসলমানদের হাতে আসলে, তারা তা গনিমতে রূপান্তরিত করে। আর গনিমতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। এজন্য খনিজ দ্রব্যেও আল্লাহ তা'আলার অংশ হিসেবে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

শিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শিকার করার পূর্বে তা কখনো কারো দখলে ছিল না। সুতরাং কোনো মুসলমান তা হস্তগত করার ফলে গনিমতরূপে গণ্য হবে না। আর গনিমত না হওয়ার কারণে শিকারের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না।

اِلَّآ اَنَّ لِلْغَانِمِيْنَ الخ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো আল্লাহ তা'আলা ভূমিতে যে খনিজ সম্পদ সৃষ্টি করেছেন তা যদি গনিমতরূপে গণ্য হয় যেমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে– তাহলে চার পঞ্চমাংশ মুজাহিদদের হওয়া উচিত, প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য নয়। কেননা গনিমতের সম্পদের বিধান এরূপই যে, এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য আর অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ মুজাহিদদের জন্য নির্ধারিত। এর উত্তর হলো– গনিমতের সম্পদের উপর যখন প্রকৃত ও নীতিগতভাবে মুজাহিদদের কবজ হাসিল হয় কেবল তখনই তাদের জন্য চার পঞ্চমাংশ নির্ধারিত। এর উত্তর হলো– গনিমতের সম্পদের উপর যখন প্রকৃত ও নীতিগততাবে মুজাহিদদের কবজ হাসিল হয় কেবল তখনই তাদের জন্য চার পঞ্চমাংশ নির্ধারিত। কিন্তু যখন নীতিগতভাবে মুজাহিদদের কবজ সাব্যস্ত হয় আর প্রকৃত কবজ অন্য কারো হাসিল হয়, তখন চার পঞ্চমাংশ মুজাহিদদের জন্য হবে না; বরং প্রকৃত কবজ যে ব্যক্তির হাসিল হয়েছে সে-ই তার হকদার।

মোদ্দাকথা, জমিতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের উপর মুজাহিদদের কবজ হলো নীতিগত প্রকৃতপক্ষে কবজ হাসিল হয়েছে প্রাপ্ত ব্যক্তির। তাই এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমরা নীতিগত অবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করেছি। আর অবশিষ্ট চার ভাগের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করেছি যে, তা প্রাপ্ত ব্যক্তির হবে চাই সে মুসলমান হোক আর জিম্মি হোক কিংবা স্বাধীন হোক, আর গোলাম হোক কিংবা নাবালেগ হোক আর বালেগ হোক, পুরুষ হোক আর মহিলা হোক।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর থেকে হযরত বিলাল ইবনে হারিছ (রা.) -এর যে হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তার জবাবে বলা হয় যে, এ হাদীসটি মুনক্বাতি' (مُنْقَطِعٌ)। আর দলিল হিসেবে এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

وَلَوْ وُجِدَ فِيْ دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيْهِ شَيْئٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا فِيْهِ الْخُمُسُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَلَهُ اَنَّهُ مِنْ اَجْزَاءِ الْاَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيْهَا وَلَا مُؤْنَةَ فِيْ سَائِرِ الْاَجْزَاءِ فَكَذَا فِيْ هٰذَا الْجُزْءِ لِاَنَّ الْجُزْءَ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ بِخِلَافِ الْكَنْزِ لِاَنَّهُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ فِيْهَا قَالَ وَاِنْ وُجِدَ فِيْ اَرْضِهٖ فَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِيْهِ رِوَايَتَانِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلٰى اَحَدِهِمَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اَنَّ الدَّارَ مَلَكَتْ خَالِيَةً عَنِ الْمُؤَنِ دُوْنَ الْاَرْضِ وَلِهٰذَا وَجَبَ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي الْاَرْضِ دُوْنَ الدَّارِ فَكَذَا هٰذِهِ الْمُؤْنَةُ.

অনুবাদ : যদি নিজ বাড়িতে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, এতে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কারণ, আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা ব্যাপক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এটা জমির সাথে যুক্ত জমির অংশবিশেষ। আর জমির অন্যান্য অংশের উপর কোনো কিছু ধার্য নেই, তদ্রূপ এ অংশের ক্ষেত্রেও কিছু ধার্য হবে না। কেননা, অংশ সমষ্টির বিপরীত হয় না। মাটিতে প্রোথিত সম্পদের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা জমির সাথে যুক্ত নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, [খনিজ সম্পদ] যদি নিজের জমিতে পেয়ে থাকে তবে সে সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনামতে অর্থাৎ 'জামেউস সগীরের' বর্ণনা হিসেবে পার্থক্যের কারণ হলো, বাড়ির মালিকানা দায়মুক্ত, জমির মালিকানা নয়। এ কারণে জমির উপর ওশর বা খেরাজ ওয়াজিব হয়, কিন্তু বাড়ির উপর হয় না। আর এটি হলো দায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি নিজ বাড়ির সীমানায় কোনো খনিজ সম্পদ পায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, তাতে এক পঞ্চমাংশ বা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর সাহেবাইনের মতে, তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।" এ হাদীসটি ব্যাপক। এখানে জমি ও বাড়ির মাঝে পার্থক্য করা হয়নি। এজন্য সাধারণভাবে খনিজ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। চাই তা ভূমিতে প্রাপ্ত হোক কিংবা বাড়িতে প্রাপ্ত হোক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, এই প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ সৃষ্টিগতভাবে বাড়ির জমির একটি অংশ। আর বাড়ির কোনো অংশের উপর খেরাজ, ওশর কিংবা অন্য কিছু ওয়াজিব হয় না। এজন্য এই খনিজ অংশের উপরও কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা অংশ সমষ্টির বিপরীত হয় না। মাটিতে প্রোথিত সম্পদের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ তা জমির সাথে যুক্ত নয়। অর্থাৎ তা জমির অংশ নয়; বরং তা জমিতে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এ কারণে বাড়িতে প্রাপ্ত প্রোথিত সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন হলো : খনিজ সম্পদ যদি জমির অংশই হয়, তাহলে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ হওয়া চাই। অথচ সর্বসম্মতভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা অন্য কোনো খনিজ দ্রব্য দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই।

এর উত্তরে বলা হয়, জমি জাতীয় যে কোনো কিছু দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েজ। জমিতে সৃষ্ট কোনো অংশের সাথে তায়াম্মুম জায়েজ হওয়া সম্পৃক্ত নয়। আর খনিজ পদার্থ জমি জাতীয় কিছু নয়; বরং তা জমির একটি অংশ, ফলে স্বর্ণ, রৌপ্যের খনিও জমি বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয়।

قَالَ وَاِنْ وُجِدَ فِيْ اَرْضِهٖ : কেউ যদি স্বীয় মালিকানাধীন জমিতে খনিজ সম্পদ পায়, তাহলে সে সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। মবসূতের বর্ণনা মতে, এতে পঞ্চমাংশ কিংবা কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না, যেমন স্বীয় বাড়িতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে কোনো কিছুই ওয়াজিব হয় না। আর 'জামেউস সগীরের' বর্ণনা মতে, এতে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

আর সাহেবাইন (র.) থেকে একটিই বর্ণনা রয়েছে। তা হলো– স্বীয় মালিকানাধীন জমিতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো– وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ 'ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।' এ হাদীসটি ব্যাপক এবং প্রসিদ্ধ।

মবসূতের বর্ণনা হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মালিকানাধীন জমির কোনো অংশে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এতে প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যেও পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না।

জামেউস সগীরের বর্ণনামতে মালিকানাধীন জমি ও বাড়ির মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, জমি আর্থিক দায়মুক্ত নয়; কিন্তু বাড়ির মালিকানা আর্থিক দায়মুক্ত। আর এ কারণেই জমির উপর ওশর বা খেরাজ ওয়াজিব হয়, কিন্তু বাড়ির উপর হয় না। তদ্রূপ জমিতে প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যেও পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে, কিন্তু বাড়িতে প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না।

وَاِنْ وَجَدَ رِكَازًا اَىْ كَنْزًا وَجَبَ فِيْهِ الْخُمُسُ عِنْدَ هُمْ لِمَا رَوَيْنَا وَاِسْمُ الرِّكَازِ يُطْلَقُ عَلَى الْكَنْزِ لِمَعْنَى الرَّكْزِ وَهُوَ الْاِثْبَاتُ ثُمَّ اِنْ كَانَ عَلٰى ضَرْبِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ كَالْمَكْتُوْبِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقْطَةِ وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهَا فِىْ مَوْضِعِهَا وَاِنْ كَانَ عَلٰى ضَرْبِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَالْمَنْقُوْشِ عَلَيْهِ الصَّنَمُ فَفِيْهِ الْخُمُسُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ لِمَا بَيَّنَّا ثُمَّ اِنْ وَجَدَهُ فِىْ اَرْضٍ مُبَاحَةٍ فَاَرْبَعَةُ اَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ لِاَنَّهُ تَمَّ الْاِحْرَازُ مِنْهُ اِذْ لَا عِلْمَ بِهِ لِلْغَانِمِيْنَ فَيَخْتَصُّ هُوَ بِهِ وَاِنْ وَجَدَهُ فِىْ اَرْضٍ مَمْلُوْكَةٍ فَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاَنَّ الْاِسْتِحْقَاقَ بِتَمَامِ الْحِيَازَةِ وَهُوَ مِنْهُ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) هُوَ لِلْمُخْتَطِّ لَهُ وَهُوَ الَّذِىْ مَلَّكَهُ الْاِمَامُ هٰذِهِ الْبُقْعَةَ اَوَّلَ الْفَتْحِ لِاَنَّهُ سَبَقَتْ يَدُهُ اِلَيْهِ وَهِىَ يَدُ الْخُصُوْصِ فَيَمْلِكُ بِهِ مَا فِى الْبَاطِنِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَنِ اصْطَادَ سَمَكَةً فِىْ بَطْنِهَا دُرَّةٌ ثُمَّ بِالْبَيْعِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لِاَنَّهُ مُوْدَعٌ فِيْهَا بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ لِاَنَّهُ مِنْ اَجْزَائِهَا فَيَنْتَقِلُ اِلَى الْمُشْتَرِىْ وَاِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْمُخْتَطُّ لَهُ يُصْرَفُ اِلٰى اَقْصٰى مَالِكٍ يُعْرَفُ فِى الْاِسْلَامِ عَلٰى مَا قَالُوْا وَلَوِ اشْتَبَهَ الضَّرْبُ يُجْعَلُ جَاهِلِيًّا فِىْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِاَنَّهُ الْاَصْلُ وَقِيْلَ يُجْعَلُ اِسْلَامِيًّا فِىْ زَمَانِنَا لِتَقَادُمِ الْعَهْدِ .

অনুবাদ : আর যদি জমিতে অবস্থিত অর্থাৎ প্রোথিত সম্পদ পায়, তাহলে তাদের সকলের মতে তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কারণ ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। তা ছাড়া رِكَازْ শব্দটি প্রোথিত সম্পদের উপর প্রযোজ্য হয়। কেননা তাতে رَكْزٌ তথা স্থায়িত্বের অর্থ রয়েছে। তবে যদি তাতে ইসলামি আমলের ছাপ থাকে, যেমন– তাতে কালিমায়ে শাহাদাত লেখা রয়েছে, তাহলে তা হারানো জিনিসের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর এর বিধান যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। যদি তাতে জাহেলি যুগের ছাপ থাকে, যেমন তাতে মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে, তাহলে পূর্ব বর্ণিত কারণে সর্বাবস্থায় তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি তা [জাহেলিয়া যুগের পতিত সম্পদ] পতিত ভূমিতে পেয়ে থাকে, তাহলে এক পঞ্চমাংশের অবশিষ্ট চারভাগ প্রাপকের হবে। কারণ, তার পক্ষ থেকে সংরক্ষণ পূর্ণ হয়েছে। কেননা যোদ্ধাদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানা ছিল না। সুতরাং সে-ই এটার নিরঙ্কুশ মালিকানা লাভ করবে। আর যদি তা মালিকানাধীন জমিতে পায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা পূর্ণ সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিকার লাভ হয়। আর তা তার থেকে পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, দেশ জয়ের প্রাক্কালে শাসকের পক্ষ হতে জমিটি যার নামে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে, সে-ই এর মালিক হবে। কেননা প্রথমে তা তারই হস্তগত হয়েছে। আর তা হলো নির্দিষ্ট কবজ। সুতরাং এ কারণে সে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের মালিক

হবে। যদিও তার কবজ ভূ-পৃষ্ঠের উপরে সম্পন্ন হয়েছে। যেমন– কেউ মাছ শিকার করল আর তার পেটে মুক্তা পাওয়া গেল। অতঃপর এ জমি অন্যের নিকট বিক্রি করার কারণে প্রোথিত সম্পদ তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে না। কেননা তা মাটির নীচে রক্ষিত আমানত। খনিজ দ্রব্যের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা জমিনের অংশবিশেষ। সুতরাং তা ক্রেতার মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। প্রথমে যার নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার পরিচয় না পাওয়া গেলে ইসলামি আমলের যে দূরতম মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় তার নিকটেই এর মালিকানা সোপর্দ করা হবে। ফিকহ বিশারদগণ এরূপই বলেছেন। আর যদি ছাপ অস্পষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে জাহেরী মাজহাব অনুসারে সেটাকে জাহিলিয়া যুগের বলে ধরা হবে। কেননা, সেটাই মূল অবস্থা। আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের এ যুগে সেটি ইসলামি আমলেরই ধরা হবে– এ যুগ প্রবীণ হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ وَجَدَ رِكَازًا اَىْ كَنْزًا : কুদূরী গ্রন্থকার رِكَازْ-এর ব্যাখ্যা করেছেন كَنْز তথা প্রোথিত সম্পদ। কেননা رِكَازْ শব্দটি مَعْدِنْ ও كَنْز উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আর مَعْدِنْ-এর বর্ণনা ইতঃপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই رِكَازْ-এর উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে كَنْز তথা প্রোথিত সম্পদ।

رِكَازْ শব্দটি مَعْدَنْ ও كَنْز উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেন? এর উত্তরে বলা হয় যে, رِكَازْ শব্দটি رَكْزٌ মূলধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ– স্থায়িত্ব। আর এই স্থায়িত্বের অর্থ مَعْدَنْ ও كَنْز উভয়ের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান রয়েছে। তবে পার্থক্য হলো– مَعْدِنْ-স্রষ্টা কর্তৃক স্থায়িত্ব লাভ করেছে আর كَنْز সৃষ্টি জীব [তথা মানুষ] কর্তৃক স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

মাসআলা : কেউ জমিতে কোনো প্রোথিত সম্পদ লাভ করলে হানাফীদের সর্বসম্মতিক্রমে তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এই প্রোথিত সম্পদ তিন ধরনের হতে পারে। হয়তো তাতে ইসলামি আমলের কোনো ছাপ থাকবে যেমন, কালিমায়ে শাহাদাত–'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' উৎকীর্ণ রয়েছে, কিংবা জাহিলিয়া যুগের কোনো ছাপ থাকবে, যেমন– মূর্তি-প্রতিমার ছবি উৎকীর্ণ রয়েছে অথবা ছাপ এমন অস্পষ্ট থাকবে যে, সেটাকে ইসলামি আমল কিংবা জাহিলিয়া যুগের বলে নির্দিষ্ট করা যায় না।

যদি প্রথম সুরত তথা ইসলামি যুগের কোনো ছাপ থাকে, তাহলে তা হারানো জিনিসের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা ইসলামি কোনো ছাপ থাকার কারণে তা মুসলমানের সম্পদ বলে প্রতীয়মান হয়। আর মুসলমানদের সম্পদ গনিমতরূপে গণ্য হয় না। সুতরাং তাতে এক পঞ্চমাংশ কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না; বরং তা হারানো জিনিসরূপে গণ্য হবে। আর হারানো জিনিসের বিধান হলো– একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা প্রচার করতে হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে মালিক পাওয়া যায় তাহলে তার নিকট তা সোপর্দ করতে হবে। অন্যথায় প্রাপ্ত ব্যক্তি দরিদ্র হলে সে সদকা হিসেবে গ্রহণ করবে। আর যদি সে ধনী হয়, তাহলে অন্য কোনো দরিদ্র লোককে তা সদকা করে দেবে। তবে সে ইচ্ছা করলে এ সম্পদ নিজে খরচ না করে কিংবা দরিদ্র লোককে সদকা না করে সর্বদা নিজের কাছে রাখতে পারে। কতদিন পর্যন্ত এই প্রাপ্ত হারানো সম্পদ প্রচার করতে হবে– এ ব্যাপারে বিধান সম্পদের কম-বেশির ভিত্তিতে ভিন্ন হয়ে থাকে। 'কিফায়া' গ্রন্থকার বলেন, দশ দিরহাম কিংবা তদূর্ধ্ব সম্পদের ক্ষেত্রে এক বছর প্রচার করতে হবে। দশ দিরহামের কমে তিন মাস, আর তিন দিরহাম থেকে এক দিরহামের মধ্যে হলে একদিন প্রচার করতে হবে। আর পয়সার ক্ষেত্রে ডানে-বামে লক্ষ্য করে কোনো ফকিরকে তা দিয়ে দেবে।

আর [দ্বিতীয় সুরত] যদি প্রাপ্ত প্রোথিত সম্পদে জাহিলি যুগের কোনো ছাপ বিদ্যমান থাকে, তাহলে সর্বাবস্থায় সে ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। অর্জনকারী প্রাপ্ত বয়স্ক হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক, স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম হোক, মুসলমান হোক অথবা জিম্মি হোক। আর প্রাপ্ত সম্পদ স্বর্ণ, রৌপা, পিতল, সীসা কিংবা অন্য যেকোনো দ্রব্যই হোক না কেন এবং এ প্রোথিত সম্পদ নিজের মালিকানাধীন জমিতে প্রাপ্ত হোক কিংবা অন্যের মালিকানাধীন জমিতে প্রাপ্ত হোক অথবা মালিকামুক্ত কোনো পতিত জমিতে প্রাপ্ত হোক, সর্বক্ষেত্রে তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

আকলী ও নকলী দলিল এ অধ্যায়ের শুরুতে অতিক্রান্ত হয়েছে। নকলী দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– ভূ-গর্ভস্থ সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। আকলী দলিল হলো– জমিন ও জমিনে প্রোথিত সবকিছু কাফিরদের দখলে ছিল, কিন্তু মুসলমানরা বিজিতরূপে তা হস্তগত করলে– এসব প্রোথিত সম্পদ গনিমতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর গনিমতের সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জাহিলিয়া যুগের ছাপযুক্ত প্রোথিত সম্পদ যদি মালিকানাবিহীন পতিত জমিতে পাওয়া যায়, তাহলে এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ প্রাপকের হবে। কেননা এ প্রোথিত সম্পদের পরিপূর্ণ সংরক্ষণ ও কবজ উভয়টিই তার থেকে পাওয়া গেছে। আর মুজাহিদগণের তো এর উপস্থিতি সম্পর্কে জানা ছিল না। এজন্য সে-ই এর নিরঙ্কুশ মালিকানা লাভ করবে। সুতরাং চার পঞ্চমাংশ তারই প্রাপ্য। এ দলিলের সারকথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এই প্রোথিত সম্পদের উপর মুজাহিদগণের নীতিগত কবজ রয়েছে। আর প্রাপকের প্রকৃত কবজ রয়েছে। সুতরাং নীতিগত কবজের বিবেচনায় এক পঞ্চমাংশ এতিম ও মিসকিনদের জন্য গৃহীত হয়েছে। আর প্রকৃত কবজের বিবেচনায় চার পঞ্চমাংশ প্রাপককে দেওয়া হবে।

আর যদি জাহিলি যুগের এই প্রোথিত সম্পদ মালিকানাধীন ভূমিতে প্যাওয়া যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে অর্থাৎ, এক পঞ্চমাংশ ফকির-মিসকিনকে দেবে আর অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ প্রাপকের হবে। চাই সে মালিক হোক বা না হোক। কেননা অধিকার লাভ হয় পূর্ণ সংরক্ষণের মাধ্যমে। আর পূর্ণ সংরক্ষণ প্রাপকের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং চার পঞ্চমাংশের হকদার সে-ই হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এক পঞ্চমাংশ ভিন্ন করে অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ ঐ ব্যক্তির জন্য হবে যাকে দেশ জয়ের প্রাক্কালে শাসক জমিটির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন এবং তার সীমানা চিহ্নিত করে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং চার পঞ্চমাংশের হকদার এ ব্যক্তিই হবে। আর তার অনুপস্থিতিতে তার উত্তরাধিকারীগণ এর মালিক হবে। এভাবে চলতে থাকবে। কেননা দেশ জয়ের পর প্রথমে তারই কবজ এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ দলিলের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, শাসনকর্তা কর্তৃক প্রযুক্ত মালিকের কবজ যদিও এই প্রোথিত সম্পদের উপর সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তথাপি তাতো ছিল নীতিগত কবজ। কেননা প্রকৃত কবজ তো প্রাপকের হাতে। আর নীতিগত কবজের দ্বারা প্রোথিত সম্পদের মালিক হওয়া যায় না। যেমন মুজাহিদদের ব্যাপারে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, নীতিগত কবজের কারণে তারাও এ সম্পদের মালিক হয়নি।

এর উত্তরে বলা হবে, নীতিগত কবজের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে মালিকানা সাব্যস্ত হবে না তখনই, যখন তা ব্যাপক ভিত্তিতে হয়। যেমন মুজাহিদদের নীতিগত কবজটি ছিল ব্যাপক ভিত্তিতে। ব্যাপকভাবে সকলেই তার মালিক। আর যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির নীতিগত কবজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের মালিকও হবে। যদিও তার প্রকৃত কবজ ভূ-পৃষ্ঠের উপর সম্পন্ন হয়েছে। যেমন– কোনো ব্যক্তি মাছ শিকার করল, আর মাছের পেট থেকে মুক্তা বের হলো, তাহলে সে এই মুক্তারও মালিক হবে।

ثُمَّ بِالْبَيْعِ – থেকে গ্রন্থকার বলেছেন, যার নামে জমিটি শাসনকর্তা কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছিল, সে যদি তা বিক্রি করে দেয় আর সে জমিতে কোনো প্রোথিত সম্পদ পাওয়া যায়, তাহলেও চার পঞ্চমাংশ তারই হবে। কেননা প্রোথিত সম্পদ মাটির নীচে রক্ষিত আমানত। তাই জমি বিক্রি করার কারণে প্রোথিত সম্পদ তার মালিকানা থেকে বের হবে না। যেমন– কেউ মাছ শিকারের পর তা বিক্রি করল আর মাছের পেট থেকে মুক্তা বের হলো তাহলে বিক্রির কারণে এই মুক্তা তার মালিকানা থেকে বের হবে না।

খনিজ দ্রব্যের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা জমি বিক্রি করার দ্বারা তাও ক্রেতার নিকটে স্থানান্তরিত হয়। কারণ, খনিজ দ্রব্য জমির অংশবিশেষ। সুতরাং ক্রেতার নিকটে জমি স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে তার অন্যান্য অংশও স্থানান্তরিত হবে।

আর যদি প্রথমে জমিটি যার নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার পরিচয় না পাওয়া যায়, তাহলে ইসলামি আমলের যে দৃঢ়তম মালিকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাকেই এ প্রোথিত সম্পদ অর্পণ করা হবে। যদি সে বেঁচে না থাকে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের হাতে তা সোপর্দ করা হবে। তারাও বেঁচে না থাকলে, তাদের উত্তরাধিকারীদের মাঝে তা বণ্টন করে দেওয়া হবে। আর যদি তাদের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে সরকারি কোষাগারে তা জমা করা হবে।

আর যদি [তৃতীয় সুরত] প্রোথিত সম্পদের ছাপ অস্পষ্ট হয়ে থাকে যে, ইসলামি কোনো ছাপ কিংবা জাহিলিয়া যুগের কোনো ছাপ তাতে নেই, তাহলে জাহিলিয়া যুগের মাজহাব অনুসারে সেটাকে জাহিলিয়া যুগের বলে ধরা হবে। কেননা তা-ই হলো মূল অবস্থা। আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের এ যুগে সেটি ইসলামি আমলেরই ধরা হবে। কেননা ইসলামি যুগও প্রবীণ হয়ে গেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা কাফির কর্তৃক প্রোথিত নয়; বরং তা মুসলমান কর্তৃক প্রোথিত।

وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِيْ دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ لِأَنَّ مَا فِي الدَّارِ فِيْ يَدِ صَاحِبِهَا خُصُوْصًا وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْ يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوْصِ فَلَا يُعَدُّ غَدْرًا وَلَا شَيْءَ فِيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَصِّصِ غَيْرُ مُجَاهِرٍ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি দারুল হরবে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করল এবং তাদের কারো বাড়িতে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ লাভ করল, বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। কেননা বাড়িতে যা কিছু আছে, তা বাড়ির মালিকের জন্যই নির্ধারিত। আর যদি সে তা [মালিকানামুক্ত] মাঠে পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা তারই হবে। কেননা তা বিশেষভাবে কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়। সুতরাং তা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে না। আর এতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা সে গোপনে হস্তগতকারীর পর্যায়ভুক্ত, মুজাহিরের মতো [প্রকাশ্যে হস্তগতকারীর ন্যায়] নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কেউ দারুল হরবে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে আর তাদের কারো বাড়িতে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ পায়– চাই তা খনিজ দ্রব্য হোক কিংবা প্রোথিত সম্পদ হোক, তাহলে সে তা বাড়ির মালিককে ফিরিয়ে দেবে। এটা করবে 'বিশ্বাসঘাতকতা' থেকে বেঁচে থাকার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, فِى الْعُهُوْدِ وَفَاءٌ لَا غَدْرَ "অঙ্গীকার-চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।"

দলিল হলো, বাড়িতে যা কিছু আছে, তা বিশেষতঃ মালিকেরই কবজে থাকে। যদিও তা নীতিগত কবজ। সুতরাং এই ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ হস্তগত করা বিশ্বাস ভঙ্গের নামান্তর।

আর যদি সে দারুল হরবে মালিকানামুক্ত কোনো প্রান্তরে ভূ-গর্ভস্থ কোনো সম্পদ পায়, তাহলে তা তারই হবে। কেননা তা বিশেষ কারো কবজে নেই। সুতরাং তা হস্তগত করা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাস ভঙ্গ বলে গণ্য হবে না। আর এই ভূ-গর্ভস্থ সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না। কেননা গনিমতভুক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। আর গনিমত হলো যা বিধর্মীদের দখলে ছিল; মুসলমানরা আক্রমণ করে তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু সে ব্যক্তি এরূপ পন্থায় তা অর্জন করেনি; বরং গোপনে হস্তগতকারীর ন্যায় সে তা পেয়েছে। সুতরাং তা গনিমতের মাল না হওয়ার কারণে তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না।

وَلَيْسَ فِى الْفَيْرُوزَجِ الَّذِىْ يُوْجَدُ فِى الْجِبَالِ خُمُسٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا خُمُسَ فِى الْحَجَرِ وَفِى الزِّئْبَقِ الْخُمُسُ فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اٰخِرًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَلَا خُمُسَ فِى اللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ (رحـ) فِيْهِمَا وَفِىْ كُلِّ حِلْيَةٍ تُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ خُمُسٌ لِاَنَّ عُمَرَ (رضـ) اَخَذَ الْخُمُسَ مِنَ الْعَنْبَرِ وَلَهُمَا اَنَّ قَعْرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَهْرُ فَلَا يَكُوْنُ الْمَاخُوْذُ مِنْهُ غَنِيْمَةً وَاِنْ كَانَ ذَهَبًا اَوْ فِضَّةً وَالْمَرْوِىُّ عَنْ عُمَرَ (رضـ) فِيْمَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَبِهٖ نَقُوْلُ مَتَاعٌ وُجِدَ رِكَازٌ فَهُوَ لِلَّذِىْ وَجَدَ وَفِيْهِ الْخُمُسُ مَعْنَاهُ وُجِدَ فِى الْاَرْضِ لَا مَالِكَ لَهَا لِاَنَّهٗ غَنِيْمَةٌ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : ফিরোজা পাথর যা পাহাড়ে পাওয়া যায়, তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا خُمُسَ فِى الْحَجَرِ "পাথরের উপর এক পঞ্চমাংশ নেই।" পারদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না– ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পরবর্তী মতানুসারে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এরও অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। মুক্তা ও আম্বরের উপর এক পঞ্চমাংশ নেই। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ দুটিতে এবং সমুদ্র থেকে আহরিত প্রতিটি ভূষণের [অলঙ্কারের] উপর পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কেননা হযরত ওমর (রা.) আম্বর হতে পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দলিল হলো– সমুদ্রের তলদেশে বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং তা থেকে প্রাপ্ত বস্তু স্বর্ণ, রৌপ্য হলেও গনিমতরূপে গণ্য হবে না। আর হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতের ক্ষেত্র হলো সমুদ্র নিক্ষিপ্ত বস্তু। আর সে ক্ষেত্রে আমাদেরও একই অভিমত। মাটিতে পুঁতে রাখা সামান পত্র পাওয়া গেলে তা প্রাপকেরই হবে। আর তাতে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ মালিকানামুক্ত পতিত জমিতে পাওয়া গেলে। কেননা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতো এটাও গনিমতের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَيْرُوز অর্থ–এক ধরনের মূল্যবান পাথর। زِئْبَق অর্থ– পারদ। اَلْكُحْلُ অর্থ– শক্ত সুরমা।

মাসআলা : ফিরোজা পাথর, শক্ত সুরমা, ইয়াকুত প্রভৃতি যা পাহাড়ে পাওয়া যায়, তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব নয়। এর দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا خُمُسَ فِى الْحَجَرِ "পাথরের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ নেই।" আর পারদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর শেষোক্ত মতানুসারে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পারদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয় না।

'ইনায়া' গ্রন্থকার একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথম দিকে বলতেন– পারদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ কিংবা অন্য কিছু ওয়াজিব হয় না। আমি এ ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে ছিলাম। আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। জানতে পারলাম যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) পারদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ আমি দেখলাম, তাতে কিছুই ওয়াজিব নয়।

মোদ্দা কথা, পারদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর শেষোক্ত মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমত। এটিই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। অর্থাৎ পারদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পরবর্তী মতটিই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমত–পারদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا خُمُسَ فِي اللُّؤْلُؤِ الخ : لُؤْلُؤٌ –মুক্তা। বসন্তকালে বৃষ্টির এক ফোঁটা যে ঝিনুকে পড়ে, তা-ই মুক্তা হয়। কেউ কেউ বলেন, ঝিনুক এক প্রকার প্রাণী, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুক্তা সৃষ্টি করেন।

عَنْبَر [আম্বর]। সামুদ্রিক ফেনা। কেননা সাগরের ঢেউয়ের সৃষ্ট ফেনা থেকে আম্বরের জন্ম হয়। অতঃপর তা সমুদ্র তীরে ঢেউয়ের আঘাতে নিক্ষিপ্ত হয়। 'কাফী' ও 'মবসূত'-এ বর্ণিত আছে যে, আম্বর এক জাতীয় ঘাস, যা সমুদ্রে জন্মায়। আর কেউ কেউ বলেন, আম্বর কোনো সামুদ্রিক প্রাণীর বর্জ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, আম্বর সামুদ্রিক ঘাস। কখনো কখনো মাছ তা খেয়ে ফেলে। কিন্তু তা বিস্বাদের কারণে মাছ-বমি করে বাইরে ফেলে দেয়। আর মাছ যদি তা গলাধ:করণ না করেই বাইরে ফেলে দেয়, তাহলে তা উন্নতমানের আম্বরে রূপান্তরিত হয়।– [কিফায়া]

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, আম্বরের ক্ষেত্রে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয় না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ দুটোতে এবং সমুদ্র থেকে আহরিত সকল ভূষণের উপর পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। তাঁর দলিল হলো– হযরত ওমর (রা.) আম্বর হতে পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছেন। 'ইনায়া'-তে এ বর্ণনাটি এভাবে এসেছে–

اَنَّ يَعْلَى بْنَ اُمَيَّةَ كَتَبَ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) يَسْاَلُهُ عَنْ عَنْبَرَةٍ وُجِدَتْ عَلَى السَّاحِلِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ فِى جَوَابِهِ اَنَّهُ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَفِيْهِ الْخُمُسُ .

অর্থ– হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়্যা (রা.) সমুদ্র তীরে প্রাপ্ত আম্বরের বিধানের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) -এর কাছে চিঠি লিখেছেন। উত্তরে তিনি লিখেছেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্পদ। যাকে ইচ্ছা, তিনি তাকে দান করেন। আর এতে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়।

এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয় যে, আম্বরের ক্ষেত্রে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। আর মুক্তার ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা সমুদ্র হতে প্রাপ্ত আম্বরের ক্ষেত্রে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। তদ্রূপ সমুদ্র হতে প্রাপ্ত মুক্তা ও অন্য সকল ভূষণের উপর পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) তার 'ফতহুল কাদীর' -এর মধ্যে এবং মোল্লা আলী ক্বারী (র.) তার 'শরহে নিকায়াহ'-এর মধ্যে উল্লেখ করেন যে, আম্বরের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার বিধানটি হযরত ওমর (রা.) থেকে সাব্যস্ত নয়; বরং এ ঘটনাটি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-এর। তিনি আম্বরের ক্ষেত্রে পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত হাসান বসরী ও ইমাম জুহরী (র.) বলেন– আম্বর ও মুক্তার উপর পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যে সম্পদ প্রথমতঃ কাফিরদের দখলে ছিল অতঃপর মুসলমানরা তা আক্রমণ করে তার উপর বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছে– এমতাবস্থায় তার উপর পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। আর আম্বর এমন নয়। কেননা তা কারো দখলে ছিল না। এ কারণেই বলা হয় যে, সমুদ্র থেকে লব্ধ স্বর্ণ-রৌপ্যের উপরও কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেন, হযরত ওমর (রা.) কিংবা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) যে আম্বরের ক্ষেত্রে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন, তা হলো দারুল হরবে সমুদ্র নিক্ষিপ্ত আম্বর যেটা মুসলমান সৈন্যরা একত্রিত করেছে, এমন আম্বরের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। কেননা তা গনিমত। আর গনিমতের সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। আমরাও তো এরূপ অভিমত পোষণ করি।

'কিফায়া' গ্রন্থকার পঞ্চমাংশ ওয়াজিব না হওয়ার দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মুক্তার মূল অবস্থা হলো পানি। আর পানির ক্ষেত্রে কিছুই ওয়াজিব হয় না। সুতরাং মুক্তার ক্ষেত্রেও কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর আম্বরেরও মূল অবস্থা হলো পানি কিংবা ঘাস অথবা প্রাণীর বর্জ্য। আর এসব জিনিসের ক্ষেত্রে কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না। সুতরাং আম্বরের মধ্যেও কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না।

'কুদূরী' গ্রন্থকার বলেন, স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত গৃহস্থালীর সামান পত্র যেমন– কাপড়-চোপড়, অস্ত্র-শস্ত্র, গৃহের তৈজসপত্র ইত্যাদি মাটিতে প্রোথিত পাওয়া গেলে তাতেও পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ এগুলো মালিকানাহীন জমিতে পাওয়া গেলে। কেননা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতো তা গনিমতের মাল। আর গনিমতের মালে যেহেতু এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। তাই এসব সামান পত্রেও এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

بَابُ زَكٰوةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ

قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رح) فِيْ قَلِيْلِ مَا اَخْرَجَتْهُ الْاَرْضُ وَكَثِيْرِهِ الْعُشْرُ سَوَاءٌ سُقِيَ سَيْحًا اَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ اِلَّا الْقَصَبَ وَالْحَطَبَ وَالْحَشِيْشَ وَقَالَا لَايَجِبُ الْعُشْرُ اِلَّا فِيْمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ اِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَالْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ فَالْخِلَافُ فِيْ مَوْضَعَيْنِ فِيْ اِشْتِرَاطِ النِّصَابِ وَفِيْ اِشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ لَهُمَا فِي الْاَوَّلِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلِاَنَّهُ صَدَقَةٌ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ النِّصَابُ لِتَحَقُّقِ الْغِنَاءِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَتَاوِيْلُ مَا رَوَيَاهُ زَكٰوةُ التِّجَارَةِ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِالْاَوْسَاقِ وَقِيْمَةُ الْوَسْقِ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَالِكِ فِيْهِ فَكَيْفَ بِصِفَتِهٖ وَهُوَ الْغِنَاءُ وَلِهٰذَا لَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ لِاَنَّهُ لِلْاِسْتِنْمَاءِ وَهُوَ كُلُّهُ نَمَاءٌ وَلَهُمَا فِي الثَّانِيْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَالزَّكٰوةُ غَيْرُ مَنْفِيٍّ فَتَعَيَّنَ الْعُشْرُ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا وَمَرْوِيُّهُمَا مَحْمُوْلٌ عَلٰى صَدَقَةٍ يَأْخُذُهَا الْعَاشِرُ وَبِهٖ يَأْخُذُ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رح) فِيْهِ وَلِاَنَّ الْاَرْضَ قَدْ تَسْتَنْمِيْ بِمَا لَا يَبْقٰى وَالسَّبَبُ هِيَ الْاَرْضُ النَّامِيَةُ وَلِهٰذَا يَجِبُ فِيْهَا الْخَرَاجُ اَمَّا الْحَطَبُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيْشُ لَا تُسْتَنْبَتُ فِي الْجِنَانِ عَادَةً بَلْ تُنْقٰى عَنْهَا حَتّٰى لَوِ اتَّخَذَهَا مَقْصَبَةً اَوْ مَشْجَرَةً اَوْ مَنْبَتًا لِلْحَشِيْشِ يَجِبُ فِيْهَا الْعُشْرُ وَالْمُرَادُ بِالْمَذْكُوْرِ الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ اَمَّا قَصَبُ السُّكَّرِ وَقَصَبُ الذَّرِيْرَةِ فَفِيْهِمَا الْعُشْرُ لِاَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِمَا اِسْتِغْلَالُ الْاَرْضِ بِخِلَافِ السَّعْفِ وَالتِّبْنِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ الْحَبُّ وَالثَّمَرُ دُوْنَهُمَا ـ

পরিচ্ছেদ : ফসল ও ফলের জাকাত

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, অল্প হোক কিংবা বেশি, ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর ওশর ওয়াজিব হবে, চাই তা প্রবাহিত পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা। কিন্তু বাঁশ, জ্বালানি কাঠ ও ঘাসের উপর ওশর নেই। সাহেবাইন বলেন, যে সকল ফল দীর্ঘদিন থাকে, তা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে, তাতে শুধু ওশর ওয়াজিব হবে। এক ওয়াসাক হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রচলিত সা'-এর পরিমাণে ষাট সা'। সবজি জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ওশর ওয়াজিব নয়। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ওশর ওয়াজিব হবে। মোটকথা, দুটি ক্ষেত্রে মতানৈক্য

রয়েছে– নিসাবের শর্তারোপে ও দীর্ঘস্থায়িত্বের শর্তারোপে। প্রথমটির ক্ষেত্রে [নিসাবের শর্তারোপে] সাহেবাইনের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ "পাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে জাকাত ওয়াজিব নয়।" তাছাড়া যেহেতু তা জাকাত, তাই স্বচ্ছলতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রেও নিসাবের শর্তারোপ করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ। "ভূমি যা উৎপন্ন করে, তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।" এতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আর তাদের বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, তা বাণিজ্য দ্রব্যের জাকাত। কেননা তারা ওয়াসাকের মাপে বেচাকেনা করতো। আর এক ওয়াসাকের মূল্য সাধারণত চল্লিশ দিরহাম হতো। ওশরের ক্ষেত্রে ভূমির মালিক হওয়ার শর্ত নেই। সুতরাং স্বচ্ছলতার শর্ত কিভাবে হতে পারে? এ কারণেই বর্ষপূর্তির শর্তারোপ করা হয় না। কেননা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এ শর্তারোপ করা হয়। অথচ এটা সম্পূর্ণই বর্ধিত সম্পদ। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে [দীর্ঘস্থায়িত্বের শর্তারোপ] সাহেবাইনের দলিল হলো– لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ "সবজি জাতীয় দ্রব্যের উপর সদকা নেই।" [সদকা দ্বারা] জাকাত নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ওশরই উদ্দেশ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস। আর তাঁদের বর্ণিত হাদীসটি– শুল্ক আদায়কারী যে সদকা গ্রহণ করে, তার উপর প্রযোজ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও তো এর উপর আমল করে থাকেন। তা ছাড়া এজন্য যে, ভূমিতে এমন ফসলও উৎপাদিত হয় যা দীর্ঘ সময় সংরক্ষিত থাকে না। আর ওশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ ভূমির ফলনশীলতা। এ কারণে এ ধরনের ভূমিতে খারাজ ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর বাঁশ, জ্বালানি কাঠ ও ঘাস সাধারণতঃ বাগানে উৎপাদন করা হয় না এবং এগুলো থেকে বাগানকে পরিষ্কার রাখা হয়। এমনকি কেউ যদি বাঁশঝাড়, কিংবা জ্বালানি বৃক্ষ অথবা ঘাসের ক্ষেত লাগায়, তাহলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। উল্লিখিত বাঁশ দ্বারা সাধারণ বাঁশ উদ্দেশ্য; তবে ইক্ষু কিংবা জোয়ারের উপর ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলোর জন্য ভূমিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়। তবে খেজুর শাখা ও খড়ের হুকুম এর বিপরীত। কেননা এগুলোর ক্ষেত্রে শস্য ও ফলই উদ্দেশ্য। বৃক্ষ বা খড় উদ্দেশ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জমিতে উৎপাদিত ফসল ও ফলের উপর ওশর [এক দশমাংশ] ওয়াজিব হয়। এখানে জাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওশর। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেরূপ জাকাত উসুলকারীকে রূপকভাবে عَاشِرٌ বলা হয়েছে, তদ্রূপ এখানেও 'ওশর'-কে রূপকভাবে 'জাকাত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জাকাত যেহেতু শুধু ইবাদত, আর ওশর জমির ব্যয়ভার অবশ্য তাতে ইবাদতের অর্থও রয়েছে, সেহেতু জাকাতের আলোচনা শুরুতে এবং ওশরের বিধান পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওশর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সাধারণভাবে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর ওশর ওয়াজিব হয়– উৎপাদিত ফসল কম হোক আর বেশি হোক। এক বছর সংরক্ষণের কোনো শর্ত নেই। জমি নদী কিংবা অন্য কোনো প্রবাহিত পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সর্বাবস্থায় ওশর ওয়াজিব হবে। তবে বাঁশ জ্বালানি কাঠ ও ঘাসের উপর ওশর নেই। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, দু শর্তে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর ওশর ওয়াজিব হবে। প্রথম শর্ত– জমি থেকে উৎপাদিত ফসল কোনো প্রকার ঔষধ প্রয়োগ ছাড়াই এক বছর সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে। যেমন– গম, ভুট্টা, ধান প্রভৃতি। আর যদি এক বছর সংরক্ষণযোগ্য না হয়, তাহলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে না। যেমন– আঙ্গুর, তরমুজ, আপেল প্রভৃতি। দ্বিতীয় শর্ত হলো– উৎপাদিত ফসল পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হতে হবে। এর কমে ওশর ওয়াজিব হবে না। আর এক ওয়াসাক হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রচলিত সা'-এর পরিমাণে ষাট সা'। তাহলে পাঁচ ওয়াসাক তিনশ সা' -এর সমপরিমাণ। আর চার মণে এক সা' হয়। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক হলো বারশত মন।

সাহেবাইনের মতে সবজি জাতীয় দ্রব্যে ওশর ওয়াজিব হবে না। কেননা ঔষধ প্রয়োগ ছাড়া তা এক বছর সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। মোট কথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে দু'ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। প্রথমত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ হওয়া শর্ত নয়। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে তা শর্ত। দ্বিতীয়ত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উৎপাদিত ফসল এক বছর সংরক্ষণযোগ্য হওয়া শর্ত নয়; কিন্তু সাহেবাইনের মতে তা শর্ত।

ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবের শর্তারোপের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস– لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ "পাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে সাদকা ওয়াজিব হয় না।" এ হাদীসে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওশর। কেননা পাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যেও জাকাত ওয়াজিব হয়, তবে শর্ত হলো তার মূল্য দু'শ দিরহাম হতে হবে। তাহলে হাদীসের অর্থ হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে ওশর ওয়াজিব হয় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হওয়া জরুরি।

তাঁদের দ্বিতীয় দলিল হলো– ওশর জাকাতের মতোই। কেননা, ওশর জমির ফলনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদ বৃদ্ধি হওয়ার শর্ত রয়েছে। অধিকন্তু জাকাতের ন্যায় ওশরও কাফিরদের উপর ওয়াজিব হয় না। আর জাকাতের ক্ষেত্র যা, ওশরের ক্ষেত্রেও তা-ই। এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, ওশর জাকাতের মতো। আর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবের শর্ত রয়েছে যাতে ধনী হওয়া সাব্যস্ত হয়। তদ্রূপ ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্যও নিসাব শর্ত হিসেবে গণ্য হবে সচ্ছলতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ "তোমরা যা উপার্জন কর এবং জমি থেকে যা উৎপাদন কর, তার উৎকৃষ্ট কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো।" এ আয়াতটি ব্যাপক। সাধারণভাবে জমিতে উৎপাদিত ফসলের [আল্লাহর রাস্তায়] ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কম-বেশির কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ "ভূমি যা উৎপন্ন করে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।" এতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

আর সাহেবাইনের বর্ণিত হাদীস– لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ-এর ব্যাখ্যা এই যে, এতে বাণিজ্য দ্রব্যের জাকাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক দ্রব্যে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হতে হবে। কেননা সাহাবায়ে কেরামের যুগে লোকজন ওয়াসাকের মাপে বেচাকেনা করতো। আর এক ওয়াসাক খেজুরের মূল্য সাধারণত চল্লিশ দিরহাম হতো। তাহলে পাঁচ ওয়াসাকের মূল্য ছিল দু'শ দিরহাম। আর এটিই জাকাতের নিসাব।

وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَالِكِ বলে সাহেবাইনের যুক্তিগ্রাহ্য দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের মোদ্দা কথা হলো– ওশরের ক্ষেত্রে ভূমির মালিক হওয়ার শর্ত নেই। এ কারণেই ওশর মুকাতাব, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের জমিতে উৎপাদিত ফসলের মধ্যেও ওয়াজিব হয়। আবার ওয়াকফকৃত ভূমিতেও ওশর ওয়াজিব হয়। অথচ ওয়াকফকৃত ভূমির কোনো মালিক নেই। সুতরাং ওশরের ক্ষেত্রে যখন মালিক হওয়ার শর্ত নেই, তখন মালিক অবস্থা তথা সচ্ছলতার শর্ত আরোপের তো প্রশ্নই আসে না। তাই সাধারণভাবে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ওশর ওয়াজিব হবে– কম হোক বা বেশি হোক। আর এ কারণেই বর্ষপূর্তির শর্তারোপ করা হয় না। কেননা বর্ষপূর্তির শর্ত করার উদ্দেশ্য হলো বৃদ্ধির সুযোগ। অথচ এটা সম্পূর্ণই বর্ধিত সম্পদ।

ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস– لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ "সবজি জাতীয় দ্রব্যের উপর সদকা নেই"। এ হাদীসটি 'দারে কুতনী' গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে এসেছে– إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সবজি জাতীয় দ্রব্যের উপরে সদকা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" এ হাদীসে সদকা দ্বারা ওশর উদ্দেশ্য। কেননা ব্যবসার জন্য সবজি জাতীয় দ্রব্যে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসে জাকাত নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ওশরই উদ্দেশ্য হবে। তাহলে হাদীসের অর্থ হবে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবজি জাতীয় দ্রব্যে ওশর ওয়াজিব নয়। কেননা তা সংরক্ষিত থাকে না। সুতরাং যে সব দ্রব্য ঔষধ প্রয়োগ ছাড়া সংরক্ষণযোগ্য নয় তাতে ওশর ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, পূর্ব বর্ণিত হাদীস- مَا اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ "ভূমি যা উৎপন্ন করে, তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।" কেননা এ হাদীসটি ব্যাপক। এতে উৎপাদিত দ্রব্য সংরক্ষণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার কোনো শর্ত নেই। এ কারণেই সাধারণভাবে জমিতে উৎপাদিত ফসলে ওশর ওয়াজিব হবে- চাই তা এক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হোক বা না হোক।

আর لَيْسَ فِى الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ এই হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি ওশর উসুলকারীর নিকট সবজি জাতীয় দ্রব্য [ওশর হিসেবে] অর্পণ করে, এর মূল্য দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে উসুলকারী তা গ্রহণ করবে না। কেননা তাকে সাধারণত শহরের বাইরে থাকতে হয়। সেখানে দরিদ্র লোকেরা নাও থাকতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে যদি সে সবজি জাতীয় দ্রব্য উসুল করে, তাহলে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য বলা হয়েছে যে, উসুলকারী সবজি জাতীয় দ্রব্য ওশর হিসেবে গ্রহণ করবে না; বরং মালিক নিজেই তা দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিবে, সেক্ষেত্রে তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও এ হাদীসের উপর আমল করে থাকেন। হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সবজি জাতীয় দ্রব্যে একেবারেই ওশর ওয়াজিব হবে না, যেমন- সাহেবাইন (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যৌক্তিক প্রমাণ হলো, ওশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ ভূমির ফলনশীলতা। আর কখনো কখনো জমি থেকে এমন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে ফলনশীলতা পাওয়া যায় যা সংরক্ষণযোগ্য নয়। সুতরাং জমিতে উৎপাদিত সবজি জাতীয় দ্রব্যে যদি ওশর ওয়াজিব না হয়, তাহলে হুকুম ছাড়া কারণ সাব্যস্ত হয়, যা সিদ্ধ নয়। এ কারণে এ জাতীয় দ্রব্যে ওশর ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা খেরাজি জমিতে সবজী জাতীয় দ্রব্য জন্মালে তাতে খেরাজ ওয়াজিব হয়। সুতরাং অসংরক্ষণযোগ্য ফসলে যেরূপ খেরাজ ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ ওশরও ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাজহাব অনুসারে জ্বালানি কাঠ, বাঁশ ও ঘাসে ওশর ওয়াজিব হয় না। কেননা এগুলো সাধারণত বাগানে উৎপন্ন করা হয় না; বরং এগুলো থেকে বাগানকে পরিষ্কার রাখা হয়। তবে কেউ যদি স্বীয় জমিতে বাঁশঝাড় কিংবা জ্বালানি বৃক্ষ কিংবা ঘাসের ক্ষেত লাগায় এবং এগুলো উৎপাদন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মূল ইবারতে বাঁশ দ্বারা সাধারণ বাঁশ উদ্দেশ্য যা দিয়ে কলম বানানো হয়। তবে ইক্ষু কিংবা জোয়ারের উপর ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলো থেকে ফসল উৎপাদন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইক্ষু ও জোয়ারের গাছ ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়, এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার আশা থাকে। আর যে সব ফসল বা উদ্ভিদ লাগানো হয়, তাতে ওশর ওয়াজিব হয় বলে এগুলোর মধ্যেও ওশর ওয়াজিব হবে। তবে খেজুরের শাখা ও খড়ের হুকুম ভিন্ন। এগুলোতে ওশর ওয়াজিব হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রে বৃক্ষ ও খড় উদ্দেশ্য নয়; বরং খেজুরের ফল ও শস্যই উদ্দেশ্য।

قَالَ وَمَا سُقِىَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ اَوْ سَانِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِاَنَّ الْمُؤْنَةَ تَكْثُرُ فِيْهِ وَتَقِلُّ فِيْمَا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ اَوْ سَيْحًا وَاِنْ سُقِىَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُعْتَبَرُ اَكْثَرُ السَّنَةِ كَمَا هُوَ فِى السَّائِمَةِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) فِيْمَا لَا يُوْسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ مِنْ اَدْنٰى مَا يُوْسَقُ كَالذُّرَةِ فِىْ زَمَانِنَا لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيْرُ الشَّرْعِىُّ فِيْهِ فَاعْتُبِرَتْ قِيْمَتُهُ كَمَا فِىْ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يَجِبُ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خَمْسَةَ اَعْدَادٍ مِنْ اَعْلٰى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ فَاعْتُبِرَ فِى الْقُطْنِ خَمْسَةُ اَحْمَالٍ كُلُّ حِمْلٍ ثَلَاثُ مِائَةِ مَنٍّ وَفِى الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ اَمْنَاءٍ لِاَنَّ التَّقْدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ لِاِعْتِبَارِ اَنَّهُ اَعْلٰى مَا يُقَدَّرُ بِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বালতি দ্বারা কিংবা পানি তোলার চর্কি দ্বারা কিংবা উষ্ট্রীর পিঠে বয়ে আনা পানি দ্বারা যে ক্ষেত্রে সেচ দেওয়া হয়েছে, তাতে উভয় মত অনুসারে অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যয়ভার অধিক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বৃষ্টির পানি দ্বারা কিংবা খালের পানি দ্বারা সেচ দেওয়া জমিতে ব্যয় কম হয়ে থাকে। যদি খাল ও চর্কি উভয় পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে বছরের অধিকাংশ সময়ের বিবেচনা করা হবে। যেমন– 'সায়িমা' পশুর ক্ষেত্রে। যে সকল জিনিস ওয়াসাক দ্বারা মাপা হয় না, যেমন– জাফরান ও তুলা, এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যখন এগুলোর মূল্য ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপকৃত সর্বনিম্ন মূল্যের জিনিসের পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়ে যাবে, তখন তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। যেমন– আমাদের যুগে জোয়ার রয়েছে। কেননা শরিয়ত নির্ধারিত পরিমাপ এখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তার মূল্য বিবেচনা করা হবে। যেমন– ব্যবসা সামগ্রীর ক্ষেত্রে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উৎপন্ন দ্রব্য যখন ঐ জাতীয় বস্তু পরিমাপ করার সর্বোচ্চ পরিমাণের পাঁচ গুণ হয়ে যাবে, তখন তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। সুতরাং তুলার ক্ষেত্রে পরিমাণ ধরা হবে পাঁচটি গাঁট। প্রতি গাঁট হবে তিনশত মণ [দুই রতল বা পনের ছটাক] আর জাফরানের ক্ষেত্রে হবে পাঁচ মণ। কেননা ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপের কারণ ছিল– তা ছিল ঐ জাতীয় দ্রব্যের মাপের সর্বোচ্চ পরিমাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

غَرْبٌ -বড় বালতি। دَالِيَةٌ –চর্কি, যাতে একাধিক বালতি বেঁধে গরু কিংবা অন্য কিছু দিয়ে ঘুরানো হয়। কিংবা ঢেঁকির মতো এক খণ্ড কাঠের মাথায় চামড়ার বালতি বেঁধে পানিতে নোয়ানোর মাধ্যমে ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়। سَانِيَةٌ [উটনী] যার দ্বারা সেচ কার্য সম্পাদন করা হয়।

মাসআলা : ক্ষেতে যদি বড় বালতি কিংবা পানি তোলার চাক্কি দ্বারা কিংবা উটনীর পিঠে বয়ে আনা পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন উভয়ের মতে অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে। তবে পূর্ব বর্ণিত মতপার্থক্য এ ক্ষেত্রেও রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট নিসাব ও স্থায়িত্ব হওয়ার শর্ত নেই কিন্তু সাহেবাইনের নিকট এ দুটি শর্ত ধর্তব্য হবে।

[মাসআলায় বর্ণিত হুকুমের] দলিল হলো : এসব ক্ষেত্রে কষ্ট অধিক হয়ে থাকে বৃষ্টি কিংবা খালের পানি দ্বারা সেচ দেওয়ার তুলনায়। এতে কষ্ট তুলনামূলকভাবে কম। এজন্য এ ক্ষেত্রে ওশর ওয়াজিব হবে। আর চাক্কি, বালতি কিংবা উটনীর পিঠে বয়ে

আনা পানি দ্বারা সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু কষ্ট অধিক হয়, তাই অর্ধেক ওশর তথা বিশভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। আর যদি ক্ষেতে চর্কি ও খাল উভয়ের পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তাহলে বছরের অধিকাংশ সময়ের বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ যদি বছরের অধিকাংশ সময় খালের পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয়। আর কিছু দিন বালতি বা চার্কি দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তাহলে ওশর ওয়াজিব হবে। এর উল্টো ক্ষেত্রে অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে। যেমন– 'সায়িমা' পশুর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ের বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ বছরের অধিকাংশ দিন যদি মাঠে চরানো হয় আর কিছু দিন বাড়িতে রেখে খাওয়ানো হয় তাহলে তা 'সায়িমা' পশু বলে গণ্য হবে এবং তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। এর উল্টো হলে তাকে عَلُوْف বলে এবং সেক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হয় না।

সাহেবাইনের মতের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তা হলো– উৎপাদিত ফসলে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে তাঁদের মতে– পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হওয়া আবশ্যক। এর কম পরিমাণে ওশর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যে সকল জিনিস 'ওয়াসাক' দ্বারা মাপা হয় না ও বেচাকেনা হয় না যেমন– জাফরান, তুলা এগুলোর মধ্যে ওশর ওয়াজিব হবে না। 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেন, এগুলো সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, জাফরান ও যে সকল জিনিস ওয়াসাক দ্বারা মাপা হয় না এগুলোর মূল্য ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপকৃত সর্বনিম্ন মূল্যের জিনিসের পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে তাতে ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন– দু'শ গ্রাম জাফরানের মূল্য পাঁচ ওয়াসাক জোয়ারের মূল্যের সমান। তাহলে দু'শ গ্রাম জাফরানে ওশর ওয়াজিব হবে। যদিও জাফরানের বেচাকেনা ওয়াসাক দ্বারা হয় না। দলিল হলো– যে সকল জিনিস ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। সেগুলোতে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপ [পাঁচ ওয়াসাক] প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তার মূল্য বিবেচনা করা হবে। যেমন ব্যবসার সামগ্রীর ক্ষেত্রে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব [দু'শ দিরহাম হওয়া] প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না বলে সে ক্ষেত্রে তার মূল্য বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসার সামগ্রীর মূল্য দু'শ দিরহাম হলে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ رحمه الله বলেন, যে সকল জিনিস ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপ করা যায় না, সে গুলোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাপ বিবেচ্য। অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্য যখন ঐ জাতীয় বস্তু পরিমাপ করার সর্বোচ্চ পরিমাণের পাঁচগুণ হয়ে যাবে তখন তাতে ওশর ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়। যেমন– তুলার সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় حِمْل [হা-যেরযুক্ত দ্বারা حِمْل [গাঁট] অর্থ এক উটের বোঝা। সুতরাং পাঁচ গাঁট তুলার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওশর ওয়াজিব হবে। এক حِمْل [গাঁট] প্রায় তিনশ মণ [একটি পুরোনো হিসাব, যার পরিমাণ দুই রতল বা পনের ছটাক]। আর জাফরানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাগ হলো মণ। সুতরাং জাফরান পাঁচ মণ [প্রায় পাঁচ সের] পরিমাণ হলে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। এর দলিল হলো পরিমাপযোগ্য দ্রব্যের মাপের সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো ওয়াসাক। সুতরাং সর্বোচ্চ পরিমাপ হওয়ার কারণে 'ওয়াসাক'-কে বিবেচনা করা হয়েছে। মোদ্দা কথা হলো, যে কোনো জিনিসে পরিমাপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ জিনিসের সর্বোচ্চ পরিমাপকে মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সুতরাং সে জিনিস যদি ঐ সর্বোচ্চ পরিমাপে পাঁচ হয় তাহলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।

وَفِى الْعَسَلِ الْعُشْرُ إِذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الْحَيَوَانِ فَأَشْبَهَ الْإِبْرِيْسَمَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْعَسَلِ الْعُشْرُ وَلِأَنَّ النَّحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْأَنْوَارِ وَالثِّمَارِ وَفِيْهِمَا الْعُشْرُ فَكَذَا فِيْمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا بِخِلَافِ دُوْدِ الْقَزِّ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَوْرَاقَ وَلَا عُشْرَ فِيْهَا ثُمَّ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ النِّصَابَ وَعَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِيْهِ قِيْمَةَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيْهِ حَتّٰى يَبْلُغَ عَشْرَ قِرَبٍ لِحَدِيْثِ بَنِىْ شَبَابَةَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُؤَدُّوْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ وَعَنْهُ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ كُلُّ فَرَقٍ سِتَّةٌ وَّثَلَاثُوْنَ رِطْلًا لِأَنَّهُ أَقْصٰى مَا يُقَدَّرُ بِهٖ وَكَذَا فِىْ قَصَبِ السُّكَّرِ وَمَا يُوْجَدُ فِى الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالثِّمَارِ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَعَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِانْعِدَامِ السَّبَبِ وَهِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ حَاصِلٌ وَهُوَ الْخَارِجُ ـ

অনুবাদ : মধু যখন ওশরী জমিন থেকে আহরণ করা হয়, তখন তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ওশর ওয়াজিব হবে না। কেননা তা প্রাণী থেকে উৎপন্ন। সুতরাং তা রেশমের সমতুল্য হলো। আমাদের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস فِى الْعَسَلِ الْعُشْرُ "মধুতে ওশর ওয়াজিব।" তাছাড়া এ কারণে যে, মৌমাছি বিভিন্ন ফুল ও ফল থেকে মধু আহরণ করে। আর সেগুলোতে যেহেতু ওশর আছে, সেহেতু তা থেকে উৎপন্ন পদার্থের ওশর হবে। পক্ষান্তরে রেশম কীটের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে পাতা ভক্ষণ করে, আর তাতে ওশর নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মধু অল্প হোক কিংবা বেশি, তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা তিনি এতে কোনো নিসাব ধার্য করেন না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নীতি অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে তিনি পাঁচ ওয়াসাকের মূল্য গণ্য করেন। তাঁর থেকে এমন মতও বর্ণিত রয়েছে, দশ মশক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা 'বনূ শাবাবা' সম্পর্কিত হাদীসে আছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ অনুপাতেই ওশর আদায় করতো। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে পাঁচ মণ -এর কথাও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে পাঁচ 'ফারাক'-এর বর্ণনা রয়েছে। প্রতি ফারাক হলো ছত্রিশ রিতিল। কারণ মধু মাপার সর্বোচ্চ মাপ এটি। তদ্রূপ ইক্ষু সম্পর্কেও। পাহাড়ে যে মধু বা ফল-ফলাদি পাওয়া যায়, তাতেও ওশর ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে না। কেননা তাতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান নেই। আর তা হলো ফলনশীল ভূমি। জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল হলো ফলনশীল ভূমির যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফল লাভ করা তাতো অর্জিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মধু যদি ওশরী ভূমি থেকে আহরণ করা হয়, তাহলে তাতেও ওশর ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মধুর ক্ষেত্রে ওশর ওয়াজিব হবে না। এটিই ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো– মধু প্রাণী তথা মৌমাছি থেকে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তা রেশমের সমতুল্য হয়ে গেল কেননা রেশমও প্রাণী তথা রেশমকীট থেকে উৎপন্ন হয়। আর সর্বসম্মতভাবে রেশমের ক্ষেত্রে ওশর ওয়াজিব হয় না। সুতরাং মধুতেও ওশর ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ اَنَّ فِى الْعَسَلِ الْعُشْرَ .

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়েমেনবাসীদেরকে লিখেছেন যে, মধুতে ওশর ওয়াজিব।

দ্বিতীয় দলিল হলো– মৌমাছি বিভিন্ন ফুল ও ফল ভক্ষণ করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ। আর উৎপাদিত ফল ও ফুলে যেহেতু ওশর ওয়াজিব হয়, সেহেতু তা থেকে উৎপন্ন পদার্থেও ওশর ওয়াজিব হবে। রেশম কীটের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে শাহতুত [একপ্রকার ফল বিশেষ] এর পাতা ভক্ষণ করে। আর পাতার ক্ষেত্রে ওশর ওয়াজিব হয় না। সুতরাং তা থেকে উৎপন্ন রেশমেও ওশর ওয়াজিব হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মধু অল্প হোক বা বেশি হোক, তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ওশর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নিসাব ধার্য করেন না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এ ব্যাপারে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনা হলো– পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ মূল্যের মধুতে ওশর ওয়াজিব হবে। এটিই তাঁর মূলনীতি। দ্বিতীয় বর্ণনা হলো– মধু দশ মশক পরিমাণ হলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। এর দলিল হলো বনূ শাবাবা গোত্র সম্পর্কিত হাদীস। 'ইনায়া' গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে এসেছে যে, জোরহাম গোত্রের একটি শাখা-গোত্র বনূ শাবাবার নিকট মধু ছিল। তারা প্রতি দশ মশকের মধ্যে এক মশক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উপত্যকা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। হযরত ওমর (রা.)-এর সময়কালে তিনি সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ছাক্বাফী (র.)-কে উসুলকারী নিয়োগ করলে তারা ওশর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ হযরত ওমর (রা.)-কে চিঠি দ্বারা অবহিত করলে তিনি উত্তরে লিখলেন যে, মৌমাছি হলো বৃষ্টির মতো।

আল্লাহ তা'আলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে তা নিয়ে যান। যদি তারা তোমাকে ওশর দেয়– যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তারা দিত, তাহলে তুমি তাদের উপত্যকার দেখাশুনা করবে। অন্যথায় মৌমাছি ও তাদেরকে ভিন্ন করে দাও। এ উত্তর শোনার পরে তারা আবার ওশর দেওয়া শুরু করে। হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠির উত্তরের মোদ্দা কথা ছিল– যদি তারা ওশর দেয় তাহলে তাদের উপত্যকার রক্ষণাবেক্ষণ করবে অন্যথায় ইচ্ছামতো মধু নিয়ে নেবে। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বনু শাবাবার লোকেরা দশ মশকের মধ্যে এক মশক ওশর হিসেবে দিত। এক মশক হলো পঞ্চাশ রিতিল।

তৃতীয় বর্ণনা হলো– মধু পাঁচ মণপরিমাণ হলে ওশর ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, পাঁচ 'ফারাক' মধু হলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। এক 'ফারাক' হলো ছত্রিশ রিতিল। কেননা মধুর পরিমাপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাপ হলো 'ফারাক'।

ইক্ষু সম্পর্কেও ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে একই মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে ইক্ষুর মূল্য পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে ওশর ওয়াজিব হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– পাঁচ মণ হলে ওশর ওয়াজিব হবে।

আর পাহাড়ে যে মধু এবং ফলফলাদি পাওয়া যায়, তাতেও ওশর ওয়াজিব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে রয়েছে যে, তাতে ওশর ওয়াজিব হয় না। কেননা তাতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান নেই। আর তা হলো ফলনশীল জমি।

জাহিরী রেওয়ায়েত তথা ওশর ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো, ফলনশীল ভূমির যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফল লাভ করা, তা অর্জিত হয়েছে। সুতরাং ফল লাভ বিদ্যমান থাকার কারণে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।

قَالَ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيهِ الْعُشْرُ لَا يُحْتَسَبُ فِيهِ أَجْرُ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ الْوَاجِبِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلَا مَعْنَى لِرَفْعِهَا قَالَ تَغْلِبِيٌّ لَهُ أَرْضُ عُشْرٍ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا عُرِفَ ذٰلِكَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّ فِيمَا اشْتَرَاهُ التَّغْلِبِيُّ مِنَ الْمُسْلِمِ عُشْرًا وَاحِدًا لِأَنَّ الْوَظِيفَةَ عِنْدَهُ لَا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْمَالِكِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) [জামে' গ্রন্থে] বলেন, ভূমিতে উৎপাদিত যে সকল ফসলে ওশর ওয়াজিব হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এবং হাল-বলদের খরচ হিসাব করা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যয়ভারের তারতম্যের কারণে ওয়াজিব পরিমাণে তারতম্যের হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং ব্যয়ভার বাদ দেওয়ার কোনো অর্থ নেই। তাগলাবী জিম্মির ওশরী জমির উপর দ্বিগুণ ওশর ধার্য করা হবে। সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মাধ্যমে তা গৃহীত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাগলাবী জিম্মি মুসলমানের নিকট থেকে কোনো জমি ক্রয় করলে তাতে এক ওশরই ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতে মালিকের পরিবর্তনের কারণে জমির আর্থিক দায় পরিমাণে পরিবর্তিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে ভূমির উৎপাদিত ফসলে ওশর কিংবা অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হয়, সেই উৎপাদনে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এবং হাল-বলদের খরচের হিসাব করা হবে না। যেমন– উৎপাদিত একশ মন গমের মধ্যে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এবং হাল-বলদের খরচে দশ মণ চলে গেল, তাহলে এই দশ মণ হিসাব করে অবশিষ্ট নব্বই মনে ওশর ওয়াজিব করা হবে না; বরং মোট উৎপাদিত একশ মণ গমের মধ্যে ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যয়ভারের তারতম্যের কারণে ওয়াজিব পরিমাণে তারতম্যের হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং পারিশ্রমিক ও খরচকে হিসাব করার কোনো অর্থ নেই।

মাসআলা : তাগলাবী জমির ওশরী জমিতে দ্বিগুণ পরিমাণ ওশর ওয়াজিব হবে। চাই সে প্রাথমিকভাবেই ঐ জমির মালিক হোক কিংবা কোনো মুসলমান থেকে তা ক্রয় করুক। এর দলিল হলো– সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কেননা হযরত ওমর (রা.)-এর সময়কালে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে যে, মুসলমান থেকে যা গৃহীত হবে, বনূ তাগলাব থেকে তার দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে। আর মুসলমানের ওশরী জমি থেকে যেহেতু এক দশমাংশ গৃহীত হয়, সেহেতু তাগলাবী থেকে তার দ্বিগুণ গৃহীত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাগলাবী জিম্মি যদি কোনো মুসলমান থেকে ওশরী জমি ক্রয় করে, তাহলে এক দশমাংশই ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতে মালিকের পরিবর্তনের ফলে হুকুমের পরিবর্তন হবে না। সুতরাং মুসলমানের মালিকানায় থাকাকালে সে জমিতে যেহেতু এক দশমাংশ ওয়াজিব হতো, তদ্রূপ তাগলাবী জিম্মির মালিকানায় এসেও তাতে এক দশমাংশই ওয়াজিব হবে।

فَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِمِّيٌّ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ لِجَوَازِ التَّضْعِيْفِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ سَوَاءٌ كَانَ التَّضْعِيْفُ أَصْلِيًّا أَوْ حَادِثًا لِأَنَّ التَّضْعِيْفَ صَارَ وَظِيْفَةً لَهَا فَتَنْتَقِلُ إِلَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيْهَا كَالْخَرَاجِ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَعُوْدُ إِلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ لِزَوَالِ الدَّاعِيْ إِلَى التَّضْعِيْفِ قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ قَالَ (رض) إِخْتَلَفَ النُّسَخُ فِيْ بَيَانِ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَعَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ بَقَاءِ التَّضْعِيْفِ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي الْأَصْلِيِّ لِأَنَّ التَّضْعِيْفَ الْحَادِثَ لَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ تَغَيُّرِ الْوَظِيْفَةِ.

অনুবাদ : কোনো জিম্মি যদি তাগলাবীর নিকট থেকে উক্ত জমি ক্রয় করে, তাহলে সকলের মতেই জমির আর্থিক দায় একই অবস্থায় থাকবে। কেননা যে কোনো অবস্থায় জিম্মির উপর দ্বিগুণ ধার্য করা যায়। যেমন– ওশর উসুল কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার সময়। তদ্রূপ একই হুকুম হবে– যদি কোনো মুসলমান তার থেকে ঐ জমি ক্রয় করে কিংবা তাগলাবী নিজেই যদি ইসলাম গ্রহণ করে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত, চাই হুকুমের এই দ্বিগুণতা পূর্ব থেকে চলে আসুক বা নতুনভাবে আরোপিত হোক। কেননা দ্বিগুণতা ঐ জমির আর্থিক দায়রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং খেরাজের ন্যায় উক্ত জমি তার আর্থিক দায়সহ মুসলমানের মালিকানায় স্থানান্তরিত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দ্বিগুণকরণের কারণ দূরীভূত হওয়ায় পুনরায় এক ওশরের দিকে ফিরে আসবে। আর মবসূত গ্রন্থে রয়েছে, বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মত বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুলিপির বিভিন্নতা রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, দ্বিগুণতা বহাল রাখার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে একমত। তবে পূর্ব থেকে চলে আসা দ্বিগুণতার ক্ষেত্রেই শুধু তাঁর মত প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা তাঁর মাযহাব অনুযায়ী নতুনভাবে আরোপিত দ্বিগুণতা সাব্যস্ত হতে পারে না। কারণ, এতে আর্থিক দায় পরিবর্তিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাগলাবী ভিন্ন অন্য কোনো জিম্মি যদি তাগলাবীর নিকট থেকে ওশরী জমি ক্রয় করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এ জিম্মির উপরও দ্বিগুণ ওশর ওয়াজিব হবে। যেমন তাগলাবী জিম্মির উপর ওয়াজিব ছিল। কেননা জিম্মির উপরও দ্বিগুণ হয়। যেমন– কোনো জিম্মি ওশর উসুলকারীর সম্মুখ দিয়ে ব্যবসার সামগ্রী নিয়ে অতিক্রম করার সময় মুসলমানের নিকট থেকে যা নেওয়া হয় তার নিকট থেকে তার দ্বিগুণ নেওয়া হবে।

মাসআলা : কোনো তাগলাবী থেকে যদি মুসলমান ওশরী জমি ক্রয় করে কিংবা তাগলাবী মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে দ্বিগুণ ওশর বহাল থাকবে। চাই এই দ্বিগুণতা পূর্ব থেকেই চলে আসুক, যেমন– তাগলাবী পৈত্রিক সূত্রে এ জমির মালিক হয়েছে, আর তাতে দ্বিগুণ ওশর ধার্য ছিল, কিংবা এই দ্বিগুণতা নতুনভাবে আরোপিত হোক।

যেমন– তাগলাবী এ জমি কোনো মুসলমান থেকে ক্রয় করেছে। আর তার উপর আর্থিক দায় দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ মুসলমানের উপর একটি ওশর ওয়াজিব ছিল। তাই এ দ্বিগুণতা নতুনভাবে আরোপিত হয়েছে।

এর দলিল হলো, ওশরের দ্বিগুণতা উক্ত জমির আর্থিক দায়রূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং উক্ত জমি তার নিজস্ব আর্থিক দায়সহই মুসলমানদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হবে। যেমন– খেরাজের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ মুসলমান যদি কোনো জিম্মি থেকে খেরাজী জমি ক্রয় করে, তাহলে উক্ত জমি খেরাজসহ মুসলমানের মালিকানায় স্থানান্তরিত হবে। এমনকি জিম্মি থেকে যেরূপ খেরাজ আদায় করা হতো তদ্রূপ মুসলমান থেকেও খেরাজ আদায় করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তাগলাবীর উক্ত জমিতে যে দ্বিগুণ ওশর ধার্য ছিল তা রহিত হয়ে পুনরায় এক ওশরের দিকে ফিরে আসবে। কেননা তাগলাবীর কুফরির কারণেই তাতে দ্বিগুণ ওশর ধার্য করা হয়েছিলো। কিন্তু তাগলাবী থেকে যখন উক্ত জমি কোনো মুসলমান ক্রয় করে; কিংবা তাগলাবী নিজেই ইসলাম গ্রহণ করে তখন দ্বিগুণকরণের কারণ দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং দ্বিগুণকরণের কারণ না থাকায় দ্বিগুণ ওয়াজিব হবে না; বরং এক ওশরই ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মবসূতের জাকাত অধ্যায়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ তাগলাবীর ওশরী জমি যদি কোনো মুসলমান ক্রয় করে কিংবা তাগলাবী নিজেই যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে এক ওশরই ওয়াজিব হবে, দ্বিগুণ ধার্য করা হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত বর্ণনার ক্ষেত্রে মবসূত গ্রন্থের অনুলিপির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত কিংবা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে একমত। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, মুসলমানের উপর ওশরের দ্বিগুণতা বহাল রাখার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে একমত। তবে এই দ্বিগুণতা পূর্ব থেকে চলে আসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, নতুনভাবে আরোপিত দ্বিগুণতা সাব্যস্ত হবে না। কেননা তাঁর মাযহাব অনুযায়ী নতুনভাবে আরোপিত দ্বিগুণতা সাব্যস্ত হয় না। কারণ, তাঁর মতে আর্থিক দায় পরিবর্তিত হয় না। পূর্ব থেকে চলে আসা দ্বিগুণতা ও নতুনভাবে আরোপিত দ্বিগুণতার ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَوْ كَانَتِ الْاَرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعَهَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ يُرِيْدُ بِهٖ ذِمِّيًّا غَيْرَ تَغْلِبِيٍّ وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّهُ اَلْيَقُ بِحَالِ الْكَافِرِ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا وَيُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ اِعْتِبَارًا بِالتَّغْلِبِيِّ وَهٰذَا اَهْوَنُ مِنَ التَّبْدِيْلِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) هِيَ عُشْرِيَّةٌ عَلٰى حَالِهَا لِاَنَّهُ صَارَ مُؤْنَةً لَهَا فَلَا تَتَبَدَّلُ كَالْخَرَاجِ ثُمَّ فِيْ رِوَايَةٍ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الصَّدَقَاتِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ .

অনুবাদ : যদি কোনো মুসলমান [তার ওশরী] জমি কোনো খ্রিস্টানের নিকট বিক্রি করে, অর্থাৎ তাগলাবী ছাড়া অন্য কোনো জিম্মির নিকট, আর সে উক্ত জমির দখল গ্রহণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে। কেননা খেরাজই কাফিরের অবস্থার উপযুক্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর দ্বিগুণ ওশর ওয়াজিব হবে। তবে তাগলাবীর বিবেচনায় খেরাজের ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা হবে। কেননা এটা আমূল পরিবর্তনের চেয়ে একটি সহজ ব্যবস্থা। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এটি পূর্ব অবস্থায় ওশরী থাকবে। কেননা এটি জমির দায়রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা পরিবর্তিত হবে না। যেমন– খেরাজ পরিবর্তিত হয় না। অবশ্য এক বর্ণনা মতে, গৃহীত অর্থ জাকাত –সদকা খাতে ব্যয় হবে। আর অন্য বর্ণনা মতে খেরাজের খাতে ব্যয় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো মুসলমান যদি স্বীয় ওশরী ভূমি তাগলাবী ছাড়া অন্য কোনো জিম্মির নিকট বিক্রি করে আর সে ঐ জমির দখল গ্রহণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঐ ক্রেতা জিম্মির উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দ্বিগুণ ওশর ধার্য করা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এক ওশর ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো– কাফিরের অবস্থার উপযুক্ত হলো খেরাজ। কেননা এ ক্ষেত্রে শাস্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। আর কাফির তো শাস্তির উপযুক্ত। তাই জিম্মি ক্রেতার উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তাগলাবী জিম্মির উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ বনূ তাগলাবের লোকদের উপর যেরূপ দ্বিগুণ ওশর ধার্য করা হয় তদ্রূপ তাগলাবী ছাড়া অন্য জিম্মির ক্ষেত্রেও দ্বিগুণ ওশর ওয়াজিব হবে। তবে খেরাজের ক্ষেত্রেই তো ব্যয় হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমূল পরিবর্তনের চেয়ে ওশরকে দ্বিগুণ করাই হলো সহজ ব্যবস্থা অর্থাৎ ওশরকে দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। পক্ষান্তরে ওশরকে খেরাজে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। আর আমূল পরিবর্তনের চেয়ে গুণগত পরিবর্তন সহজসাধ্য। এজন্যই দ্বিগুণ ওশর ধার্য করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, এ জমির উপর পূর্বেই ওশর ধার্য ছিল। এখনও তা পূর্ব অবস্থায় ওশরী থাকবে। কেননা তাঁর মতে জমির মালিক পরিবর্তনের দ্বারা জমির উপর অর্জিত দায় পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং মুসলমানের নিকট থাকাকালে এ জমির উপর যেরূপ ওশর ওয়াজিব ছিল, তদ্রূপ কাফিরের মালিকানায় আসার পরও তার উপর ওশরই ওয়াজিব হবে। এর কোনো পরিবর্তন হবে না। যেমন– কাফিরের জমিতে খেরাজ ওয়াজিব হয়। এ জমি যদি কোনো মুসলমানের মালিকানায় এসে যায়। তবুও তাতে খেরাজই ওয়াজিব হবে। তবে ব্যয়ের খাত সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, গৃহীত অর্থ জাকাত-সদকার খাতে ব্যয় হবে। আর অন্য বর্ণনা মতে, খেরাজের খাতে ব্যয় হবে।

فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالشُّفْعَةِ أَوْرُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ كَمَا كَانَتْ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِتَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إِلَى الشَّفِيْعِ كَأَنَّهُ اِشْتَرَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ بِالرَّدِّ وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ جُعِلَ الْبَيْعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهٰذَا الشِّرَاءِ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِقٌّ بِالرَّدِّ قَالَ وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارٌ خِطَّةٌ فَجَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَعْنَاهُ إِذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْرِ أَمَّا إِذَا كَانَتْ تُسْقٰى بِمَاءِ الْخَرَاجِ فَفِيْهَا الْخَرَاجُ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ فِيْ مِثْلِ هٰذَا تَدُوْرُ مَعَ الْمَاءِ.

অনুবাদ : উক্ত খ্রিস্টান হতে কোনো মুসলমান যদি শোফ'আর মাধ্যমে সে জমি লাভ করে কিংবা বিক্রি ফাসেদ হওয়ার কারণে তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়, তবে তা পূর্বের মতো ওশরী হয়ে যাবে। প্রথম সুরতের কারণ হলো বিক্রয়ের বিষয়টি শোফ'আর দাবিদারের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং সে যেন মুসলমানের নিকট থেকেই ক্রয় করেছে। দ্বিতীয় সুরতের কারণ হলো– ত্রুটির কারণে বিক্রয় প্রত্যাহার করা এবং বিক্রিত বস্তু ফেরত দানের মাধ্যমে ধরে নেওয়া হবে যেন বিক্রয় সংঘটিত হয়নি। তাছাড়া এ কারণে যে, যেহেতু বিক্রিত বস্তুটি ফেরত দেওয়া কর্তব্য, সেহেতু ক্রয়ের কারণে মুসলিম বিক্রেতার হক তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো মুসলমানের যদি শাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাড়ি থাকে, আর সে এটিকে বাগানে পরিণত করে ফেলে, তাহলে তার উপর ওশর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি ১. ওশরী পানি দিয়ে বাগান সেচ দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি খেরাজী ২. পানি দিয়ে বাগান সেচ দিয়ে থাকে, তাহলে তার উপর খেরাজ ধার্য হবে। কেননা এ ধরনের ক্ষেত্রে পানি সেচের সাথে আর্থিক দায় সম্পৃক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুসলমান যদি স্বীয় ওশরী জমি কোনো জিম্মির নিকট বিক্রি করে দেয়, অতঃপর অন্য কোনো মুসলমান শোফ'আ বলে তার থেকে সে জমি লাভ করে, কিংবা বিক্রি ফাসেদ হওয়ার কারণে জিম্মি তা মুসলমান বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দেয়, তাহলে উভয় সুরতে এ জমি পূর্বের মতো ওশরীই থাকবে।

প্রথম সুরতে ওশরী হিসেবে বহাল থাকার কারণ হলো বিক্রয়ের বিষয়টি জিম্মি হতে শোফ'আর দাবিদার মুসলমানের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। যেন সে মুসলমান বিক্রেতা থেকেই ক্রয় করেছে, জিম্মির কোনো মধ্যস্থতা নেই। আর প্রকাশ্য যে, যদি কোনো মুসলমান থেকে অন্য কোনো মুসলমান ওশরী জমি ক্রয় করে, তাহলে উক্ত জমি ওশরী হিসেবেই বহাল থাকে।

দ্বিতীয় সুরতে উক্ত জমি ওশরী হিসেবে বহাল থাকার কারণ হলো, এ বিক্রি ফাসেদ হওয়ার কারণে তা প্রত্যাহার করা আবশ্যক। সুতরাং ধরে নেওয়া হবে যে, মুসলমান ও জিম্মির মাঝে যেন কোনো বিক্রয়-ই সংঘটিত হয়নি। আর বিক্রয় সংঘটিত না হওয়ার কারণে উক্ত জমি যেরূপ ওশরী ছিল, সেরূপ ওশরী হিসেবে বহাল থাকবে। আরেকটি কারণ হলো, বিক্রয় ফাসেদ হওয়ার কারণে মুসলিম বিক্রেতার হক তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। কেননা তা প্রত্যাহার করা আবশ্যক। সুতরাং মুসলিম বিক্রেতার হক তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার কারণে উক্ত জমি ওশরীই থাকবে।

قَالَ وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ الخ মাসআলা : দারুল হরবকে বিজিত করার প্রাক্কালে শাসক কোনো মুসলমানকে একটি বাড়ির মালিক বানিয়ে দিয়েছে, আর সে উক্ত বাড়িকে বাগানে রূপান্তরিত করেছে। তাহলে তার উপর ওশর ওয়াজিব হবে। অথচ সে যদি তা বাগানে রূপান্তরিত না করতো, তাহলে উক্ত বাড়িতে কোনো কিছুই ওয়াজিব হতো না। কিন্তু যখন সে তা বাগান বানিয়েছে, তখন তার উপর ওশর ওয়াজিব হবে। এর অর্থ হলো– যদি ওশরী পানি দিয়ে সে এই বাগান সেচ দিয়ে থাকে, তাহলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। আর যদি খেরাজী পানি দিয়ে সে উক্ত বাগান সেচ দেয়, তাহলে তার উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পানি সেচের সাথে আর্থিক দায় সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যে ধরনের পানি হবে, সে অনুপাতে আর্থিক দায় আবশ্যক হবে।

১. ওশরী পানি অর্থ– ওশরী জমিতে অবস্থিত কূপ কিংবা প্রাকৃতিক ঝর্ণা, বৃষ্টি কিংবা বড় নদীর পানি।

২. অনারবী বাদশাহ কর্তৃক খননকৃত খাল এবং খেরাজী জমিতে অবস্থিত কূপ ও ঝর্নার পানি হলো খেরাজী পানি।

وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوْسِيِّ فِى دَارِهِ شَىْءٌ لِاَنَّ عُمَرَ (رضـ) جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوًا وَاِنْ جَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَاِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَذُّرِ اِيْجَابِ الْعُشْرِ اِذْ فِيْهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فَتَعَيَّنَ الْخَرَاجُ وَهُوَ عُقُوْبَةٌ تَلِيْقُ بِحَالِهِ وَعَلٰى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِى الْمَاءِ الْعُشْرِيِّ اِلَّا اَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) عُشْرًا وَاحِدًا وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ عُشْرَانِ وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ ثُمَّ الْمَاءُ الْعُشْرِيُّ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْاٰبَارِ وَالْعُيُوْنِ وَالْبِحَارِ الَّتِىْ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ اَحَدٍ وَالْمَاءُ الْخَرَاجِىُّ الْاَنْهَارُ الَّتِىْ شَقَّهَا الْاَعَاجِمُ وَمَاءُ جَيْحُوْنٍ وَسَيْحُوْنٍ وَدَجْلَةَ وَالْفُرَاتِ عُشْرِىٌّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِاَنَّهُ لَايَحْمِيْهَا اَحَدٌ كَالْبِحَارِ وَخَرَاجِىٌّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاَنَّهَا يُتَّخَذُ عَلَيْهَا الْقَنَاطِيْرُ مِنَ السُّفُنِ وَهٰذَا يَدٌ عَلَيْهَا ـ

অনুবাদ : নিজ বাসভবনের জন্য অগ্নিপূজকের উপর কোনো কর নেই। কেননা হযরত ওমর (রা.) বাসস্থানসমূহকে করমুক্ত রেখেছেন। আর সে যদি তা বাগানে পরিণত করে, তবে তাতে খেরাজ ধার্য হবে। এমনকি ওশরী পানি দ্বারা সেচ করলেও। কেননা ওশরের মাঝে ইবাদতের অর্থ বিদ্যমান থাকার কারণে তার উপর ওশর ওয়াজিব করা সম্ভব নয়। তাই খেরাজই নির্ধারিত হবে। আর খেরাজ এক প্রকার শাস্তি, যা তার অবস্থার উপযোগী। আর সাহেবাইনের নীতির উপর কিয়াস অনুযায়ী ওশরী পানির সেচের ক্ষেত্রে ওশরই ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একটি ওশর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুটি ওশর ওয়াজিব হবে। পূর্বে এর কারণ অতিক্রান্ত হয়েছে। ওশরী পানি অর্থ বৃষ্টির পানি, কূয়া, ঝর্না ও ঐ সকল নদ-নদীর পানি, যা কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আর খেরাজী পানি অর্থ যে সকল খাল আজমীরা [অনারব] খনন করেছে। জায়হুন, সায়হুন, দাজলা ও ফুরাতের পানি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওশরী। কেননা সমুদ্রের ন্যায় কেউ এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এগুলো খেরাজী পানি। কেননা নৌকা ইত্যাদি দ্বারা এর উপর পুল তৈরি করা হয়, যা তার উপর নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : অগ্নি পূজকের বাসভবনে কোনো কর নেই। যেমন- হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানের বাসস্থানে কোনো কর নেই। দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.) অগ্নিপূজকদের বাসভবনসমূহকে করমুক্ত করেছেন। যেমন- 'ইনায়া' গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- سُنُّوْا بِالْمَجُوْسِ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ الخ "আহলে কিতাবের ন্যায় অগ্নিপূজকদেরকে বিবেচনা করো। তবে তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ ও তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকবে।" হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনার পর তা কার্যে পারিণত করলেন। কর্মচারীদেরকে তাদের ভূমি নিরীক্ষণ করত তাতে তাদের সাধ্যমতো কর আরোপের নির্দেশ দিলেন এবং তাদের বাড়ি ও বাড়িতে উৎপাদিত বৃক্ষকে করমুক্ত করলেন। মজূসী [অগ্নিপূজক], যারা ইসলাম থেকে দূরে, তাদের ক্ষেত্রে যখন এই বিধান তখন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বাসভবন করমুক্ত হওয়া অধিক সঙ্গত।

আর অগ্নিপূজক যদি তার বাড়িকে বাগানে পরিণত করে তাহলে তাতে খেরাজ ধার্য হবে। যদিও সে ওশরী পানি দ্বারা তা সেচ দেয়। কেননা তার উপর ওশর ওয়াজিব করা সম্ভব নয়। কারণ, ওশরের ক্ষেত্রে ইবাদত ও আনুগত্যের অর্থ রয়েছে। আর কাফিরদের থেকে কোনো ইবাদত গৃহীত হয় না। এজন্য খেরাজই ধার্য হবে। আর খেরাজ এক প্রকার শাস্তি, যা কাফিরের অবস্থার অধিক উপযোগী। এজন্যই বলা হয়েছে, যদিও ওশরী পানি দ্বারা সেচ দেয়, তথাপি তাতে খেরাজ ওয়াজিব হবে, ওশর ওয়াজিব হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো– পানির বিবেচনায় ওশর ওয়াজিব হয় নাকি যে ব্যক্তির উপর কর ওয়াজিব হয়, তার বিবেচনায় ওশর ওয়াজিব হয়। যদি প্রথমটির বিবেচনা করা হয়, তাহলে এ অগ্নিপূজকের উপরও ওশর ওয়াজিব হওয়া উচিত। কেননা সে তার ভূমি ওশরী পানি দ্বারা সেচ দিয়েছে। আর দ্বিতীয়টির বিবেচনা করা হলে হিদায়া গ্রন্থকারের উক্তি– لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ فِيْ مِثْلِ هٰذَا تَدُوْرُ مَعَ الْمَاءِ-এর সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। কেননা তিনি ব্যক্তির অবস্থার বিবেচনায় কর ধার্য করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আর্থিক দায় তথা ওশর কিংবা খেরাজ পানি সেচের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যে ধরনের পানি হবে, সে ধরনের আর্থিক দায়ও ধার্য করা হবে। যেমন– ওশরী পানির ক্ষেত্রে ওশর ও খেরাজী পানির ক্ষেত্রে খেরাজ ওয়াজিব হবে।

এর জবাব হলো– পানির বিবেচনায় ওশর ওয়াজিব হবে, যেরূপ গ্রন্থকার বলেছেন। তবে হুকুম ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাত্র গ্রহণীয় হওয়া আবশ্যক। আর কাফির ওশর ওয়াজিব হওয়ার পাত্র / ক্ষেত্র নয়। কেননা ওশর একটি ইবাদত। আর কাফির ইবাদতের পাত্র নয়। মোদ্দা কথা হলো, ওশরী পানির কারণে ওশর ওয়াজিব হওয়াই সমীচীন। কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার শর্ত না পাওয়ার কারণে ওশর ওয়াজিব হয়নি; বরং খেরাজ ধার্য করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানের উপর খেরাজ ওয়াজিব হয় কিভাবে? কেননা খেরাজের মধ্যে এক ধরনের লাঞ্ছনার বিষয় নিহিত রয়েছে। আর মুসলমান তো লাঞ্ছনার পাত্র হতে পারে না। এর উত্তরে বলা হয় যে, ভূমির খেরাজে লাঞ্ছনা নেই; বরং এককভাবে ব্যক্তিত্বের উপর খেরাজ ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা রয়েছে।

এ মাসআলায় সাহেবাইনের নীতির উপর কিয়াসের চাহিদা হলো, ওশরী পানি সেচের ক্ষেত্রে তাদের মতে ওশরই ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একটি ওশর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুটি ওশর ওয়াজিব হবে। উভয়ের দলিল পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

ওশর ও খেরাজী পানির পরিচয় কি? : এ ব্যাপারে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বৃষ্টি, কুয়া, ঝর্না ও শাসক কিংবা সর্বসাধারণের নিয়ন্ত্রণমুক্ত নদ-নদীর পানিই হলো ওশরী পানি। আর যেসব খাল প্রাক-ইসলামি যুগের শাসকরা খনন করেছে, যেমন ইয়াযদাজারদ নদী ও মরুরুজ নদী।

جَيْحُوْن [জায়হূন] : তিরমিযের একটি নদীর নাম।

سَيْحُوْن [সায়হূন] : তুর্কিস্থানের একটি নদীর নাম।

دَجْلَة [দাজলা] : বাগদাদের একটি নদী।

فُرَاتٌ [ফুরাত] : কুফার একটি নদী।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এ চারটি নদীর পানিই ওশরী। কেননা সমুদ্রের পানির ন্যায় এগুলোও কারো রক্ষণাবেক্ষণে নেই। আর যে সকল নদ-নদীর পানি কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তা-ই ওশরী পানি। সুতরাং এ চারটি নদীর পানি ওশরী হিসেবে গণ্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এসব নদ-নদীর পানি খেরাজী। কেননা এগুলোর উপর নৌকা দ্বারা পুল তৈরি করা হয়। এটা এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ। আর যে সকল নদ-নদীর উপর কারো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তার পানি খেরাজী বলে বিবেচ্য। সুতরাং এসব নদ-নদীর পানিও খেরাজী হিসেবে গণ্য হবে।

وَفِى اَرْضِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ التَّغْلِبِيَّيْنِ مَا فِى اَرْضِ الرَّجُلِ يَعْنِى الْعُشْرَ الْمُضَاعَفَ فِى الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجَ الْوَاحِدَ فِى الْخَرَاجِيَّةِ لِاَنَّ الصُّلْحَ قَدْ جَرٰى عَلٰى تَضْعِيْفِ الصَّدَقَةِ دُوْنَ الْمُؤْنَةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ اِذَا كَانَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْعُشْرُ فَيُضَعَّفُ ذٰلِكَ اِذَا كَانَا مِنْهُمْ وَلَيْسَ فِى عَيْنِ الْقِيْرِ وَالنَّفْطِ فِى اَرْضِ الْعُشْرِ شَيْءٌ لِاَنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اِنْزَالِ الْاَرْضِ وَاِنَّمَا هُوَ عَيْنٌ فَوَّارَةٌ كَعَيْنِ الْمَاءِ وَعَلَيْهِ فِى اَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ وَهٰذَا اِذَا كَانَ حَرِيْمُهُمَا صَالِحًا لِلزِّرَاعَةِ لِاَنَّ الْخَرَاجَ يَتَعَلَّقُ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الزِّرَاعَةِ .

অনুবাদ : তাগলিবী পুরুষের জমিতে যা ধার্য হয়, তাগলিবী শিশু ও স্ত্রীলোকের জমিতেও তা ধার্য হবে। অর্থাৎ ওশরী জমিতে দ্বিগুণ ওশর এবং খেরাজী জমিতে একটি খেরাজ। কেননা তাদের সাথে সমঝোতা হয়েছিল যে, সদকা দ্বিগুণ করা হবে। নিছক আর্থিক দায় দ্বিগুণ করা হবে না। আর যেহেতু মুসলিম শিশু ও নারীর উপর ওশর ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাই তাগলিবী শিশু ও নারীর উপরও তা দ্বিগুণরূপে ধার্য হবে। ওশরী জমিতে প্রাপ্ত আলকাতরা বা তেলের কূপে কিছু ধার্য করা হবে না। কেননা তা ভূমি থেকে উৎপন্ন জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং পানির ঝরনার মতো উৎসারিত ঝরনাবিশেষ। যদি তা খেরাজী জমি থেকে উৎপন্ন হয়, তবে তার উপর খেরাজ ধার্য হবে। এটা তখনই হবে, যখন আলকাতরা ও তৈলকূপের চারপার্শ্ব চাষোপযোগী হয়। কেননা খেরাজের সম্পর্ক জমির চাষোপযোগিতার সঙ্গে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : বনূ তাগলিবের পুরুষদের জমিতে যা ওয়াজিব হয়, তাদের শিশু ও স্ত্রীলোকের জমিতেও তা-ই ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ ওশরী জমিতে দ্বিগুণ ওশর এবং খেরাজী জমিতে একটি খেরাজ ওয়াজিব হবে। এর দলিল হলো– আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ও বনূ তাগলিবের মাঝে এ মর্মে সমঝোতা হয়েছিল যে, যেগুলোতে ইবাদতের অর্থ রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে দ্বিগুণ ওয়াজিব হবে। যেমন– জাকাত, ওশর প্রভৃতি। আর নিছক আর্থিক দায়, যাতে ইবাদতের অর্থ নেই, তাতে দ্বিগুণ করা হবে না। যেমন– খেরাজ। সুতরাং এই শিশু ও নারী যদি মুসলমান হতো, তাহলে তাদের উপর ওশর ওয়াজিব হতো। কিন্তু তাগলিবী হওয়ার কারণে তাদের উপর ওশরের দ্বিগুণ ধার্য করা হবে– যেমন সন্ধি চুক্তি থেকে প্রতিভাত হয়।

قَوْلُهٗ وَلَيْسَ فِى الخ : قِيْر অর্থ–দুর্গন্ধযুক্ত তৈলাক্ত পদার্থ। কালো রংয়ের এ পদার্থ পানিরোধকল্পে নৌকাতে ব্যবহার করা হয়। যেমন– আলকাতরা। نَفْط এক জাতীয় তৈল যা পানিতে ছেয়ে যায়। যেমন– খনিজ তৈল। এ প্রকার খনিজ তৈলে দ্রুত আগুন ধরে। জ্বালানি ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে نَفْط বলতে পেট্রোল বুঝানো হয়।

মাসআলা : ওশরী জমিতে প্রাপ্ত আলকাতরা ও তেলের কূপে ওশর কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা এ দুটো ভূমি থেকে উৎপন্ন জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা পানির ঝরনার মতো উৎসারিত ঝরনাবিশেষ। আর পানিতে কোনো ওশর নেই। সুতরাং এগুলোতেও ওশর ওয়াজিব হবে না। আর যদি তা খেরাজী জমিতে পাওয়া যায়, তাহলে তাতে খেরাজ ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো, যখন তার চারপার্শ্ব চাষোপযোগী হয়। কেননা খেরাজের সম্পর্ক জমির উৎপাদনের সাথে নয়; বরং জমির চাষোপযোগী হওয়ার সাথে। অর্থাৎ যদি কেউ খেরাজী জমির মালিক হয় এবং ঐ জমি চাষোপযোগী হয়, তাহলে তার উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে, যদিও সে চাষাবাদ না করে। কেননা সে চাষাবাদ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি চাষাবাদ না করে তাহলে এটা তারই ত্রুটি। রাষ্ট্র এর দায়ভার বহন করবে না।

'ইনায়া' গ্রন্থকার وَعَلَيْهِ فِىْ اَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ -এর দু'ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। একটি ব্যাখ্যা হলো, আলকাতরা ও তেলের কূপ এবং তার চারপার্শ্বের সম্পূর্ণ জমি মেপে খেরাজ গ্রহণ করা হবে। তবে শর্ত হলো তার চারপার্শ্ব চাষোপযোগী হতে হবে। আর এ সুরতে কূপের স্থানটি জমির অনুবর্তী হবে। আর জমিতে যেহেতু খেরাজ ওয়াজিব সেহেতু কূপের স্থানেও খেরাজ ওয়াজিব হবে। কেউ কেউ এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, কূপের জায়গাটি পরিমাপ করে বাদ দেওয়া হবে আর তার চারপার্শ্বের জমিতে খেরাজ ওয়াজিব হবে। আবূ বকর রাজী (র.) এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন। আর যদি আলকাতরা এবং তেলের প্রতিক্রিয়ার ফলে চারপার্শ্বের জমি চাষোপযোগী না হয়, তাহলে খেরাজও ওয়াজিব হবে না। যেমন– ক্ষারযুক্ত ভূমিতে খেরাজ ওয়াজিব হয় না।

بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَاتِ اِلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ

قَالَ (رضـ) اَلْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (الاية) فَهٰذِهٖ ثَمَانِيَةُ اَصْنَافٍ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعَزَّ الْاِسْلَامَ وَاَغْنٰى عَنْهُمْ وَعَلٰى ذٰلِكَ اِنْعَقَدَ الْاِجْمَاعُ وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَهٗ اَدْنٰى شَيْءٍ وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهٗ وَهٰذَا مَرْوِيٌّ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَدْ قِيْلَ عَلَى الْعَكْسِ وَلِكُلٍّ وَجْهٌ ثُمَّ هُمَا صِنْفَانِ اَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ سَنَذْكُرُهٗ فِيْ كِتَابِ الْوَصَايَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

পরিচ্ছেদ : জাকাত-সদকা কাকে দেওয়া জায়েজ আর কাকে দেওয়া না জায়েজ

অনুবাদ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সম্পর্কে মূল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– "সদকা হলো দরিদ্র, নিঃস্ব, সদকা উসুলের কাজে নিয়োজিত এবং ঐ লোকদের জন্য যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিতদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে ফরজকৃত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান।"–এ হলো মোট আট প্রকার। তন্মধ্যে 'যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়' সে শ্রেণীটি বাদ পড়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। এর উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ফকির ঐ ব্যক্তি, যার সামান্য পরিমাণ জিনিস আছে। আর মিসকিন ঐ ব্যক্তি, যার কিছুই নেই। এ ব্যাখ্যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। কেউ কেউ এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। উভয়টিরই যুক্তি রয়েছে। আবার এরা স্বতন্ত্র দুই শ্রেণী কিংবা একই শ্রেণী। অসিয়ত অধ্যায়ে ইনশাল্লাহ এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য পরিচ্ছেদে জাকাত ও তৎসংশ্লিষ্ট সদকার আলোচনা শেষে এগুলোর ক্ষেত্রসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জাকাতের ক্ষেত্র সম্পর্কে মূল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী–

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ– জাকাত হলো দরিদ্রদের জন্য, নিঃস্বদের জন্য, সদকা উসুলের কাজে নিয়োজিতদের জন্য, ঐ লোকদের জন্য যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়। দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিতদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা নবী কিংবা অন্য কারো সন্তুষ্টির উপর সদকার বণ্টনকে অর্পণ করেননি; বরং নিজেই এর ক্ষেত্রসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তা হলো আটটি– [১] দরিদ্র-যাদের কিছুই নেই। [২] মিসকিন-নিঃস্ব, যাদের প্রয়োজন মেটানোর মতো কিছু নেই। [৩] সদকা উসুলকারী-যাদেরকে এ কাজের জন্য ইসলামি রাষ্ট্র নিয়োগ করেছে। [৪] مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ -যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায় কিংবা ইসলামে যারা দুর্বল। [৫] رِقَابٌ -দাস মুক্তির জন্য লিখিত অর্থাংশের পরিশোধ করণার্থে কিংবা দাস ক্রয় করতে মুক্তি দেওয়া কিংবা বন্দীদেরকে ফিদিয়া প্রদানের মাধ্যমে আজাদ করার লক্ষ্যে। [৬] غَارِمِيْن -ঋণগ্রস্ত। যে কোনো ঘটনার শিকার হয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে কিংবা কারো জামানত কিংবা

অন্য কিছুর ফলে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। [৭] আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত মুজাহিদ কিংবা অন্যদেরকে [৮] মুসাফির, যে সফরকালীন সময়ে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক নয়। যদিও নিজ বাসভবনের সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। –[থানবী (র.)]

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এই আট প্রকারের মধ্য থেকে مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ "যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়" শ্রেণীটি বাদ পড়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর এ শ্রেণীটি আর নেই।

'ইনায়া' গ্রন্থকার বলেন, مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ তিন ধরনের ছিল। এক. ঐসব কাফির যাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ জাকাত প্রদান করতেন। দুই. ঐসব কাফির যাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করার জন্য জাকাত প্রদান করতেন। তিন. যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে বটে, তবে আক্বীদা-বিশ্বাস ছিল দুর্বল, তাদেরকে ইসলামে অটল থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ জাকাত প্রদান করতেন এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'উয়াইনা ইবনে হাসান, আক্বরা ইবনে হাবিস ও আব্বাস ইবনে মুরদাস এ তিনজই ছিলেন কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের। এ ছাড়াও ছিল আবূ সুফিয়ান সাখার ইবনে হরব উমূবী, হারিছ ইবনে হিশাম মাখজূমী, আবদুর রহমান ইবনে ইয়ারবূ মাখজূমী, সুহাইল ইবনে আমর আল 'আমিরী, হুয়াইত্বাব ইবনে আবদুল উজ্জা আমরী, আবদুল উজ্জা আসাদী, হাকীম ইবনে হাজ্জাম আসাদী প্রমুখ।

مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ শ্রেণীটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে তা রহিত হয়ে যায়। যেমন, বর্ণিত আছে যে, 'ওয়াইনা ইবনে হাসান ফাজারী ও আক্বরা' ইবনে হাবিস তামীমী একবার হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট স্বীয় জমির কর মাফের জন্য গেলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে নির্দেশনামা লিখে দিলেন। অতঃপর তারা নির্দেশনামা নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রা.)-এ নির্দেশনামা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন– তোমাদের চিত্তকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে তা দিতেন। এখন আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে বিজয় দান করেছেন এবং তোমাদের থেকে ইসলামকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যদি ইসলামের উপর অবিচল থাক তাহলে ভালো। অন্যথায় তলোয়ারই তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবে। এ কথা শুনে তারা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট ফিরে গিয়ে অভিযোগ করলেন, আপনি কি খলিফা? নাকি হযরত ওমর (রা.)? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ চাহে তো সে খলীফা। এ সময় থেকেই مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ শ্রেণীটি বাদ পড়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামের কেউই এ ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেননি; বরং সকলেই নীরবতা অবলম্বন করেছেন, যেন এ বিষয়ে তাঁদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। –[ফতহুল ক্বাদীর]

قَوْلُهُ وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَهُ الخ : ফকির ও মিসকিনের সংজ্ঞায় ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন– ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ফকির ঐ ব্যক্তি, যার সামান্য পরিমাণ জিনিস রয়েছে, তবে তা নিসাবের কম। কিংবা নিসাব পরিমাণ রয়েছে বটে, তবে তা বৃদ্ধিযোগ্য নয় এবং বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে সে আবদ্ধ। আর মিসকিন ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই। আহার্য দ্রব্য, পরিধানের বস্ত্র কিছুই নেই। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ফকিরের তুলনায় মিসকিনের অবস্থা গুরুতর।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত এর উল্টো। অর্থাৎ মিসকিনের তুলনায় ফকিরের অবস্থা গুরুতর। তাঁর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ "হযরত খিজির (আ.) যে নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করেছিলেন– তা ছিল মিসকিনদের।" এ আয়াতে নৌকার মালিকদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিসকিনের নিকট কিছু না কিছু থাকে। আর ফকিরের নিকট কিছুই থাকে না। সুতরাং মিসকিনের তুলনায় ফকিরের অবস্থা সংকটাপন্ন ও গুরুতর।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ "কিংবা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত মিসকিনকে।" মর্মার্থ হলো মিসকিন ক্ষুধার জ্বালায় স্বীয় পেট মাটিতে লাগায়। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মিসকিনের নিকট ক্ষুধা নিবারণের মতো খাবার থাকে না এবং শরীর ঢাকার মতো কাপড় থাকে না। সুতরাং মিসকিনের অবস্থা ফকিরের তুলনায় সংকটাপন্ন হওয়া সাব্যস্ত হলো।

দ্বিতীয় দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا .

এটার প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকেদের; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না; যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে।

আয়াতে তাকে এমন ফকির বলা হয়েছে যে, যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাকে ধনী মনে করে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন তার বাহ্যিক অবস্থা ভালো হবে। আর বাহ্যিক অবস্থা ভালো হওয়ার জন্য ফকিরের নিকট সামান্য কিছু হলেও থাকা দরকার। এ থেকেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতটি সাব্যস্ত হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপস্থাপিত আয়াত– أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ -এর জবাব হলো, নৌকার মালিকদেরকে অনুগ্রহ ও দয়ার দৃষ্টিতে মিসকিন বলা হয়েছে। যেমন, দোয়ার মধ্যে একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ .

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকিন হিসেবে বাঁচিয়ে রাখ; মিসকিন রূপে আমার মৃত্যু ঘটাও এবং মিসকিনদের দলে আমাকে হাশর কর।" এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসকিন হওয়ার দোয়া করেছেন। অথচ তিনি দরিদ্রতা ও সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে হেফাজতের দোয়া করতেন। এ দুটি বিষয়ের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তা ছিল অন্তরের দরিদ্রতা। আর মিসকিন হওয়ার দোয়া ছিল আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমত কামনার জন্য। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন মিসকিন কর, যে দয়া ও রহমতের যোগ্য।

দ্বিতীয় জবাব হলো, ঐ নৌকা মিসকিনদের ছিল না; বরং তারা ভাড়া খাটতো। আয়াতের মর্মার্থ হবে– হযরত খিজির (আ.) নৌকাকে ক্রটিযুক্ত করেছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, এ মিসকিনদের উপার্জনের পথ যেন বন্ধ না হয়ে যায়। কেননা যদি তিনি নৌকাটিকে ক্রটিমুক্ত রেখে যেতেন, তাহলে শাসক তার অভ্যাস অনুযায়ী তা আত্মসাৎ করে ফেলতো। ফলে মিসকিনরা উপার্জনক্ষম হয়ে পড়তো।

তৃতীয় জবাব হলো, এটা ধার করা নৌকা ছিল। তারা এটির মালিক ছিল না। যা হোক, আয়াতটি এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, মিসকিনের নিকট কিছু হলেও থাকে।

ফকির ও মিসকিন স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণী নাকি একই শ্রেণী– এর বিস্তারিত বর্ণনা 'অসিয়ত' অধ্যায়ে আলোচিত হবে। তবে উল্লেখ্য, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ফকির ও মিসকিন স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উভয়টা মিলে তা একই শ্রেণী। এ মতপার্থক্যের ফলাফল নিম্নোক্ত উদাহরণে প্রকাশ পাবে, কোনো ব্যক্তি যায়েদ, ফকির এবং মিসকিনদের জন্য তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করল। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদকে দুভাগ করত এক ভাগ যায়েদকে এবং অন্যভাগ ফকির ও মিসকিনের মাঝে বণ্টন করে দেবে। কেননা তাঁর মতে ফকির ও মিসকিন একই শ্রেণীর। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করে এক অংশ যায়েদকে, এক অংশ ফকিরদেরকে এবং অন্য অংশ মিসকিনদেরকে দেবে। কেননা তাঁর মতে, ফকির ও মিসকিন স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণী।

وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ الْإِمَامُ إِلَيْهِ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيهِ مَا يَسَعُهُ وَأَعْوَانَهُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالثُّمُنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لِأَنَّ اِسْتِحْقَاقَهُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ وَلِهٰذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا إِلَّا أَنَّ فِيْهِ شُبْهَةَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ الْهَاشِمِيُّ تَنْزِيْهًا لِقَرَابَةِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شُبْهَةِ الْوَسَخِ وَالْغَنِيُّ لَا يُوَازِيْهِ فِيْ اِسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ فَلَمْ تُعْتَبَرِ الشُّبْهَةُ فِيْ حَقِّهِ ـ

অনুবাদ : জাকাত উসুলের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে শাসক তার কাজের পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক দেবেন এবং এ পরিমাণ দান করবেন, যা তার ও তার অধীনস্তদের জন্য যথেষ্ট হয়। তা অষ্টমাংশে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কারণ, দায়িত্ব পালনের সূত্রে সে জাকাতের হকদার হয়েছে। এজন্য সে ধনী হলেও গ্রহণ করতে পারে। তবে যেহেতু তাতে জাকাতের কিঞ্চিত ছাপ [আশঙ্কা] রয়েছে, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বংশকে ময়লার সন্দেহ থেকে পবিত্র থাকার জন্য হাশেমী পরিবারের কোনো নিয়োজিত ব্যক্তি জাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে মর্যাদার যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তি হাশেমীর সমতুল্য নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ বিবেচ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরআন মাজীদে বর্ণিত জাকাতের ক্ষেত্রসমূহের তৃতীয় প্রকার হলো– عَامِلِيْنَ। এ শব্দটি عَامِلٌ -এর বহুবচন। ইমামুল মুসলিমীন যাকে সদকা, জাকাত প্রভৃতি উসুল করার জন্য নিয়োগ করেন, তাকে عَامِلٌ বলা হয়। এর অপর নাম سَاعِىْ [সা'ঈ]।

ইমামুল মুসলিমীন জাকাত উসুলকারীকে ও তার সাথে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে কাজের পরিমাণ অনুসারে জাকাতের মাল থেকে পারিশ্রমিক প্রদান করবেন। লক্ষ রাখতে হবে যে, এ পরিমাণ তাদেরকে দান করবে যাতে তার ও তার অধীনস্তদের জীবিকার জন্য যথেষ্ট হয়। তবে যদি তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে উসুলকৃত পুরো জাকাতের মাল ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে অর্ধেকের বেশি দেবে না। আর যদি লোকজন নিজেরাই জাকাতের মাল শাসকের নিকট গিয়ে দিয়ে আসে তাহলে উসুলকারী তার হকদার হবে না। কেননা তার কাজের কারণে তাকে তা প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে তার কর্ম না পাওয়া যাওয়ার কারণে সে তার হকদার হবে না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– জাকাত উসুলকারীকে যা প্রদান করা হয়, তা পারিশ্রমিক হিসেবে নয়। কেননা পরিশ্রমের জন্য কাজ, সময় ও পারিশ্রমিক নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে কোনো কিছুই নির্ধারিত নয়। এজন্য জাকাত উসুলকারীকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হবে না; বরং যেটুকু সময় সে যাতায়াত ও সদকা উসুলের জন্য ব্যয় করেছে– সেটুকু সময়ের জন্য পূর্ণ খরচ প্রদান করা হবে। কেননা সে এ কাজের জন্য নিজেকে ধরে রেখেছে। আর যে ব্যক্তি সর্বসাধারণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, তার ভরণ-পোষণ তাদের উপরই ওয়াজিব। যেমন– কাজি [বিচারক] ও কিসাসের ক্ষেত্রে হত্যা করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির ভরণ-পোষণ সাধারণ মুসলমানের উপরে ওয়াজিব এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব। সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, পারিশ্রমিক হিসেবে জাকাত উসুলকারীকে দেওয়া হয় না, তখন প্রয়োজনমাফিক তাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয় তা

অষ্টমাংশ কিংবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না। অর্থাৎ জাকাত উসুলকারীর উসুলকৃতের এক অষ্টমাংশ তাকে দেওয়া হবে না, যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা জাকাতের আটটি ক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন। কাজেই প্রত্যেকের জন্য যেন এক অষ্টমাংশ নির্ধারিত। আর তাই জাকাত উসুলকারীকেও তার উসুলকৃত থেকে এক অষ্টমাংশ দেওয়া হবে। আর এখন যেহেতু مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ 'যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়' শ্রেণীটি ইজমার ভিত্তিতে বাদ পড়েছে, তাই প্রত্যেকের জন্য এক সপ্তমাংশ নির্ধারিত। মোট কথা আমাদের মতে জাকাত উসুলকারীর জন্য কোনো অংশ নির্ধারিত নেই, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নির্ধারিত।

আমাদের দলিল হলো, জাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির প্রাপ্যতা যথেষ্ট হওয়ার পন্থায় নির্ধারণ করা হয়, জাকাতের পন্থায় নয়। তাই তো সে যদি সচ্ছল হয় এবং জাকাত উসুলের কাজ করে, তাহলে জাকাতের সম্পদ থেকে যথেষ্ট হওয়া পরিমাণ সে গ্রহণ করবে। যদি জাকাত হিসেবে তাকে প্রদান করা হতো; তাহলে সে তার হকদার হতো না। সুতরাং জাকাত উসুলকারী সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা এ কথার প্রমাণ করে যে, তার প্রাপ্যতা যথেষ্টতার ভিত্তিতে হয়, জাকাত হিসেবে নয়। إِلَّا أَنَّ فِيْهِ شُبْهَةَ الصَّدَقَةِ الخ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, জাকাত উসুলকারী যদি তার কাজের ভিত্তিতে হকদার হয়, জাকাতের ভিত্তিতে নয়, তাহলে হাশেমী পরিবারের কোনো নিয়োজিত ব্যক্তিও তার কাজের বিনিময়ে জাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। অথচ তার জন্য তা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েজ।

এর জবাবে বলা হয় যে, জাকাত আদায়ের ফলে জাকাতদাতা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। তার থেকে জাকাত আদায় হয়ে যায়। ফলে তাতে জাকাতের কিঞ্চিত ছাপ রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বংশধরকে ময়লার সন্দেহ থেকে পবিত্র রাখার জন্য হাশেমী পরিবারের নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য যেমন জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ নেই, তদ্রূপ সচ্ছল ব্যক্তির জন্যও জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ নেই। সুতরাং জাকাত উসুলের কাজে নিয়োজিত কোনো হাশেমী ব্যক্তি যেমন পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না, তদ্রূপ এ কাজে নিয়োজিত সচ্ছল ব্যক্তির জন্যও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

এর উত্তর হলো, মর্যাদার যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সচ্ছল ব্যক্তি হাশেমীর সমতুল্য নয়। এজন্য হাশেমীর ক্ষেত্রে জাকাতের কিঞ্চিত সন্দেহ বিবেচ্য; কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য নয়।

وَفِى الرِّقَابِ اَنْ يُعَانَ الْمُكَاتَبُوْنَ مِنْهَا فِىْ فَكِّ رِقَابِهِمْ هُوَ الْمَنْقُوْلُ وَالْغَارِمُ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَلَايَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهٖ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ مَنْ تَحَمَّلَ غَرَامَةً فِىْ اِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَاِطْفَاءِ النَّائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيْلَتَيْنِ ـ

অনুবাদ : দাসমুক্তির অর্থ হলো, মুকাতাবকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাহায্য করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। ঋণগ্রস্ত হলো ঐ ব্যক্তি, যার উপর ঋণ রয়েছে এবং সে ঋণের পরিমাণ থেকে বেশি নিসাবের মালিক নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, غَارِمٌ হলো ঐ ব্যক্তি, যে দুজনের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিংবা দুই গোত্রের মাঝে শত্রুতা বিদূরিত করতে গিয়ে আর্থিক দায় বহন করছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জাকাতের ক্ষেত্রসমূহের চতুর্থ প্রকার হলো, দাসমুক্তি। দাসমুক্তির ক্ষেত্রে দু'ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এক. জাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেওয়া। দুই. লিখিত চুক্তিবদ্ধ দাসের চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করণার্থে সাহায্য করা। কুদূরী গ্রন্থকার দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করেছেন। 'তাবারানী'-তেও দাসমুক্তির ব্যাখ্যায় হাসান বসরী, ইমাম জুহরী, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আসলাম (র.) প্রমুখ থেকে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তাঁরা বলেছেন- وَفِى الرِّقَابِ هُمُ الْمُكَاتَبُوْنَ অর্থাৎ, দাসমুক্তির অর্থ হলো, জাকাতের মাল মুকাতাবকে দেওয়া হবে, যাতে সে তা মনিবকে প্রদান করত দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় যে, জাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করত মুক্ত করে দিলে জাকাত আদায় হবে না। কেননা জাকাত আদায়ের জন্য মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। আর এ ক্ষেত্রে মালিক বানিয়ে দেওয়ার অর্থ পাওয়া যায় না। কারণ, নিছক দাস কোনো কিছুর মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

قَوْلُهٗ وَالْغَارِمُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকারের বর্ণনানুসারে জাকাতের ক্ষেত্রসমূহের পঞ্চম প্রকার হলো- غَارِمٌ তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। ঋণগস্ত হলো ঐ ব্যক্তি যার উপর ঋণ রয়েছে এবং সে ঋণের পরিমাণ থেকে বেশি নিসাবের মালিক নয়। যেমন- কারো নিকট এক হাজার দিরহাম রয়েছে। আর সে নয়শ দিরহাম ঋণগ্রস্ত। তাহলে তাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ। কেননা নয়শ দিরহামের সাথে পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত থাকার কারণে তা অনস্তিত্বের পর্যায়ে। কাজেই সে যেন এর মালিক নয়। আর অবশিষ্ট একশ দিরহাম নিসাব পরিমাণ নয়। সুতরাং জাকাতের অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য জায়েজ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ঋণগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি, যে দু'দল [যুদ্ধংদেহী] মুসলমানের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর্থিক দায় বহন করে, যদিও সে ধনী। তাহলে এই আর্থিক দায় পরিশোধ করণার্থে সে জাকাতের সম্পদ গ্রহণ করতে পারবে। আমাদের মতে, সে ব্যক্তি জাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। তবে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক না থাকে তাহলে জাকাত গ্রহণ করতে পারবে, তবে ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে নয়; বরং ফকির তথা নিসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার কারণে, সে এই অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لِاَنَّهُ الْمُتَفَاهَمُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مُنْقَطِعُ الْحَاجِّ لِمَا رُوِىَ اَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بَعِيْرًا لَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاجَّ وَلَا يُصْرَفُ اِلٰى اَغْنِيَاءِ الْغُزَاةِ عِنْدَنَا لِاَنَّ الْمَصْرَفَ هُوَ الْفُقَرَاءُ وَابْنُ السَّبِيْلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِىْ وَطَنِهِ وَهُوَ فِىْ مَكَانٍ اٰخَرَ لَا شَىْءَ لَهُ فِيْهِ .

অনুবাদ : আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে ঐ মুজাহিদ যে সম্পদহীন হয়ে পড়ে। কেননা নিঃশর্তভাবে তা আল্লাহর রাস্তায় বলতে সাধারণত মুজাহিদকেই বুঝায়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, এর অর্থ হজের সফরে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। কেননা বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার নিয়ত করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো হজযাত্রীকে তাতে আরোহণ করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমাদের মতে ধনী মুজাহিদকে দান করা যাবে না। কেননা দরিদ্ররাই হলো জাকাতের ক্ষেত্র। মুসাফির ঐ ব্যক্তি, যার স্বীয় আবাস স্থলে অর্থ রয়েছে; কিন্তু সে যে স্থানে রয়েছে, সেখানে তার নিকট কিছুই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জাকাতের ষষ্ঠ ক্ষেত্র হলো আল্লাহর রাস্তা। এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আল্লাহর রাস্তা বলতে এমন মুজাহিদকে বুঝানো হয়, যে জিহাদের সফরে সম্পদহীন হয়ে পড়ে, তবে তার বাড়িতে সম্পদ রয়েছে। কেননা নিঃশর্তভাবে فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ব্যবহার করা হলে সাধারণত মুজাহিদকেই বুঝায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, 'আল্লাহর রাস্তায়' বলতে ঐ হাজী উদ্দেশ্য যার বাড়িতে সম্পদ রয়েছে বটে, কিন্তু হজের সফরে সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এর দলিল হলো, বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি স্বীয় উট আল্লাহর রাস্তায় দান করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এর উপর কোনো হজযাত্রীকে আরোহণ করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তা বলতে হজের সফরে গমনকারী উদ্দেশ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আহনাফের নিকট ধনী মুজাহিদকে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুজাহিদ ধনী হলেও তার জন্য জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ اِلَّا لِخَمْسَةٍ اَلْغَازِىْ وَالْعَامِلُ عَلَيْهَا وَالْغَارِمُ وَ رَجُلٌ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ اِلَيْهِ . (عِنَايَة)

অর্থ-কোনো ধনী ব্যক্তির জন্য সদকা হালাল নয়, পাঁচ ব্যক্তি ব্যতীত। এক. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। দুই. সদকা উসুলকারী। তিন. ঋণগ্রস্ত। চার. যে সদকার বস্তু স্বীয় সম্পদ দিয়ে খরিদ করেছে। পাঁচ. যে ব্যক্তি কোনো মিসকিনকে সদকা করার পর মিসকিন তা তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছে-

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ধনী মুজাহিদ জাকাত গ্রহণ করতে পারবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয় যে, হাদীসে ধনী দ্বারা নিসাব পরিমাণ মালের মালিক উদ্দেশ্য নয়; বরং উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এখন হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি উপার্জনে সক্ষম, সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলেও তার জন্য জাকাত ও সদকা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে মুজাহিদ, যদিও উপার্জনে সক্ষম কিন্তু জিহাদে লিপ্ত থাকার কারণে তার জন্য সদকা ও জাকাত বৈধ।

আমাদের দলিল এই যে, জাকাতের ক্ষেত্র হলো দরিদ্র ব্যক্তি। যেমন হাদীসে এসেছে- خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِىْ فُقَرَائِهِمْ . "তাদের ধনী লোকদের থেকে জাকাত গ্রহণ কর আর তাদের দরিদ্রদের মাঝে তা বিলিয়ে দাও।" এর আলোকেই আমরা বলি যে, ধনী মুজাহিদকে জাকাতের অর্থ দান করা যাবে না।

জাকাতের ক্ষেত্রসমূহের সপ্তম প্রকার হলো- اِبْنُ السَّبِيْلِ তথা মুসাফির। মুসাফির দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য, নিজের আবাসস্থলে যার ধন-সম্পদ রয়েছে কিন্তু সফরকালীন তার হাতে কিছুই নেই। কাজেই সে যেন ঐ সময়ে ফকির, দরিদ্র। আর দরিদ্রের জন্য জাকাত গ্রহণ করা বৈধ। তবে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়েজ নেই। আলিমগণ বলেন, উত্তম হলো, সে ঋণ নেবে এবং বাড়িতে ফিরে এসে তা পরিশোধ করবে।

قَالَ فَهٰذِهٖ جِهَاتُ الزَّكٰوةِ فَلِمَالِكٍ اَنْ يَدْفَعَ اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَهٗ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يُصْرَفَ اِلٰى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لِاَنَّ الْاِضَافَةَ بِحَرْفِ اللَّامِ لِلْاِسْتِحْقَاقِ وَلَنَا اَنَّ الْاِضَافَةَ لِبَيَانِ اَنَّهُمْ مَصَارِفُ لَا لِاِثْبَاتِ الْاِسْتِحْقَاقِ وَلِهٰذَا لَمَّا عُرِفَ اَنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبِعِلَّةِ الْفَقْرِ صَارُوْا مَصَارِفَ فَلَا يُبَالِيْ بِاخْتِلَافِ جِهَاتِهٖ وَالَّذِيْ ذَهَبْنَا اِلَيْهِ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ)

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এই শ্রেণীগুলো জাকাতের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র। সুতরাং মালিকের এখতিয়ার আছে, জাকাতের অর্থ প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করার কিংবা যে-কোনো একটি শ্রেণীর মধ্যে দান করার। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রত্যেক শ্রেণীর [অন্তত] তিনজনকে প্রদান না করলে জাকাত আদায় হবে না। কেননা لام অব্যয়ের দ্বারা সম্বন্ধের মাধ্যমে অধিকার সাব্যস্ত হয়। আমাদের দলিল এই যে, এই সম্বন্ধ নিছক এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, এরা হলো জাকাত প্রদানের ক্ষেত্র; অধিকার সাব্যস্তকরণের জন্য নয়। কেননা এতো জানা বিষয় যে, জাকাত হলো আল্লাহ তা'আলার হক। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে উপরিউক্ত শ্রেণীগুলো জাকাতের ক্ষেত্র হয়েছে। সুতরাং ক্ষেত্রের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ করা হবে না। আর আমরা যে মত গ্রহণ করেছি, তা হযরত ওমর ও হযরত ইবনে আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোল্লিখিত সাতটি শ্রেণী হলো আমাদের নিকট জাকাতের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র, জাকাতের হকদার নয়। সুতরাং মালিক যদি বর্ণিত শ্রেণীগুলোর প্রতিটিকে প্রদান করে কিংবা যে-কোনো একটি শ্রেণীকে দান করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই জায়েজ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এই সাত শ্রেণীর লোকই জাকাতের হকদার। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তত তিনজনকে জাকাত প্রদান করা আবশ্যক। কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রত্যেক শ্রেণীর কমপক্ষে তিনজন করে মোট একুশ জনকে জাকাত দিতে হবে অন্যথায় জাকাত আদায় হবে না।

তাঁর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা জাকাতের ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করেছেন এভাবে– اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (الاية) الخ ; এ আয়াতে সদকাকে لَامْ অব্যয় দ্বারা ফকিরদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আর অন্যান্য শ্রেণীগুলোকে وَاوْ অব্যয় দ্বারা এর উপর عَطْف করা হয়েছে। لَامْ অধিকার সাব্যস্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং وَاوْ একত্র বা সমন্বয় করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের মর্মার্থ হয়, এই সাত শ্রেণীর ব্যক্তি জাকাতের হকদার। সুতরাং তাদের প্রত্যেককেই জাকাত দেওয়া আবশ্যক। এই সাত শ্রেণীকে বহুবচনের শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বহুবচনের ন্যূনতম একক হলো তিন। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর কমপক্ষে তিনজনকে জাকাত দেওয়া জরুরি। কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে মালিক যদি প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তত তিনজনকে জাকাত প্রদান করে, তাহলে জাকাত আদায় হবে, অন্যথায় হবে না।

আমাদের দলিল হলো– لِلْفُقَرَاءِ-এর لام অব্যয়টি বিশেষত্বের জন্য এসেছে; অধিকার সাব্যস্ত করার অর্থে নয়। অর্থাৎ জাকাতের ক্ষেত্র কেবল এই সাতটি। এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্র নেই। সুতরাং এ সাতটি শ্রেণীর যেটিকেই জকাত দেওয়া হোক না কেন, তা নির্দিষ্ট খাতেই ব্যয় হবে। এ আয়াতের মর্মার্থ এ নয় যে, বর্ণিত সাতটি শ্রেণী জাকাতের হকদার, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রত্যেককে জাকাতের অর্থ না দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাকাত আদায় হবে না। এর কারণ হলো, প্রকৃত পক্ষে জাকাত হলো আল্লাহ তা'আলার হক। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে উপরিউক্ত শ্রেণীগুলো জাকাতের ক্ষেত্র হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং যখন দারিদ্র্যের কারণে উপরিউক্ত শ্রেণীগুলো জাকাতের ক্ষেত্র হয়েছে, তখন ক্ষেত্রের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। অর্থাৎ মুখাপেক্ষীতার ব্যাপারে দরিদ্রতা, নিঃস্বতা, ঋণগ্রস্ত হওয়া, সফর করা প্রভৃতি ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ করা হবে না; বরং যেখানেই মুখাপেক্ষিতা পাওয়া যাবে, সেটাই জাকাতের ক্ষেত্ররূপে গণ্য হবে। এটিই হযরত ওমর (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত। যেমন 'তাবারানী' -তে আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ (الاية) قَالَ فِيْ اَيِّ صِنْفٍ وَضَعْتَهٗ اَجْزَاكَ .

অর্থ– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে শ্রেণীকেই জাকাত দেবে আদায় হয়ে যাবে।

আর হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে– قَالَ اَيُّمَا صِنْفٍ اَعْطَيْتَهٗ مِنْ هٰذَا اَجْزَاكَ عَنْكَ অর্থ–তুমি যে শ্রেণীকেই জাকাত দেবে তোমার জন্য তা যথেষ্ট হবে।

وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَدْفَعَ الزَّكٰوةَ اِلٰى ذِمِّيٍّ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذٍ (رضـ) خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِىْ فُقَرَائِهِمْ وَيَدْفَعُ اِلَيْهِ مَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يُدْفَعُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اِعْتِبَارًا بِالزَّكٰوةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَصَدَّقُوْا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا وَلَوْلَا حَدِيْثُ مُعَاذٍ (رضـ) لَقُلْنَا بِالْجَوَازِ فِى الزَّكٰوةِ وَلَا يُبْنٰى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ لِاِنْعِدَامِ التَّمْلِيْكِ وَهُوَ الرُّكْنُ وَلَا يُقْضٰى بِهَا دَيْنُ مَيِّتٍ لِاَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يَقْتَضِى التَّمْلِيْكَ مِنْهُ لَا سِيَّمَا فِى الْمَيِّتِ .

অনুবাদ : কোনো জিম্মিকে জাকাত প্রদান করা জায়েজ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে বলেছেন– خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا اِلٰى فُقَرَائِهِمْ "জাকাত মুসলমানদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ কর এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দাও।" এ ছাড়া অন্যান্য সদকা তাকে দেওয়া যাবে। জাকাতের উপর কিয়াস করে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দেওয়া যাবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একটি বর্ণনা। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস– تَصَدَّقُوْا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا "সকল ধর্মের লোককে সদকা প্রদান করো।" হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস না হলে জাকাত প্রদানও আমরা জায়েজ বলতাম। জাকাতের অর্থ দিয়ে মসজিদ তৈরি করা যাবে না এবং তা দ্বারা মৃতের কাফন দেওয়া যাবে না। কেননা এখানে মালিক বানানো অনুপস্থিত। অথচ এটাই জাকাত আদায়ের রুকন। জাকাতের অর্থ দিয়ে কোনো মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় করা যাবে না। কেননা অন্যের ঋণ আদায় করা ঋণী ব্যক্তিকে মালিক বানানো প্রমাণ করে না, বিশেষত: ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জিম্মিকে জাকাত প্রদান করা জায়েজ নেই। এর দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَيُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ . فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ . (شَرْح نِقَايَة بِحَوَالَةِ كُتُبِ سِتَّة)

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে শাসনকর্তা বানিয়ে পাঠালেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এক আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। [প্রথমত] তাদেরকে এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি আহ্বান করবে; لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। আমি আল্লাহর রাসূল"। যদি তারা তোমার আনুগত্য স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে অবগত করবে যে, আল্লাহ তা'আলা দিবা-রাত্রিতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যদি তারা তোমাকে এ ব্যাপারে মান্য করে, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধনসম্পদে জাকাত ফরজ করেছেন। তা [জাকাত] তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে আর তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি তারা তোমার এ নির্দেশও মেনে নেয়, তাহলে তাদের উত্তম সম্পদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আর মজলুমের আর্তনাদকে ভয় করো। কেননা তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোনো পর্দা নেই।–[শরহে নিকায়া]

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– تَصَدَّقُوْا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا "সকল ধর্মের লোককে সদকা প্রদান করো।" এ হাদীস দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে– [১.] হারবী [অমুসলিম রাষ্ট্রদ্রোহী] ও মুসতা'মান [অর্থের বিনিময়ে যাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে]-কেও সদকা দেওয়া জায়েজ। কেননা তারাও সকল ধর্মের লোকের অন্তর্ভুক্ত। [২.] তাদেরকে জাকাত দেওয়াও জায়েজ। কেননা [تَصَدَّقُوْا] শব্দটি জাকাতের অর্থও প্রদান করে। এই দ্বিতীয় বিষয়টির জবাবে বলা হয় যে, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর হাদীসের কারণে তাদেরকে জাকাত প্রদান আমরা জায়েজ বলি না।

মোদ্দা কথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস– تَصَدَّقُوْا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا -এর চাহিদা হলো, জিম্মি ও অন্যান্যদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ। আর মু'আয (রা.)-এর হাদীসের চাহিদা হলো, জিম্মিকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং আমরা জাকাতের ক্ষেত্রে হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসের উপর আমল করি এবং বলি যে, জাকাত শুধু মুসলমানদেরকে দেওয়া যাবে, জিম্মি কিংবা অন্যদেরকে দেওয়া যাবে না। আর অন্যান্য সদকার ক্ষেত্রে تَصَدَّقُوْا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا এ হাদীসের উপর আমল করি এবং বলি যে, জিম্মিকে জাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদকা যেমন– ঈদুল ফিতরের সদকা, কাফফারার সদকা প্রদান করা যাবে।

আর প্রথম বিষয়টির জবাবে বলা হয়, যদিও হাদীসটি থেকে হারবী ও মুসতা'মান সহ সকল ধর্মের লোককে জাকাত দেওয়া জায়েজ হওয়া বুঝা যায়, কিন্তু 'হারবী' ও 'মুসতা'মান' হাদীসের বিধান বহির্ভূত। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ–আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কারকরণে সাহায্য করেছে। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাইতো জালিম।

মোট কথা, যে সব লোক তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাদের সাথে লেনদেন করো না। প্রকাশ থাকে যে, এসব লোকই হলো হারবী। সুতরাং সদকা কিংবা অন্য কিছু দিয়ে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা যাবে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, হারবী ও মুসতা'মান [সেও প্রকৃতার্থে হারবী]-কে কোনো ধরনের সদকা দেওয়া যাবে না।

মাসআলা : জাকাতের অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েজ নেই এবং কোনো মৃত ব্যক্তির কাফন দেওয়াও জায়েজ নেই। কেননা জাকাত আদায়ের রুকন হলো মালিক বানানো। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা জাকাতকে সদকা শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সদকা অর্থ দরিদ্রকে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, জাকাত আদায় করার জন্য মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে মালিক বানানোর অর্থ অনুপস্থিত। এ কারণে জাকাতের অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েজ নেই। আর মৃত ব্যক্তি যেহেতু মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, সেহেতু জাকাতের অর্থ দিয়ে তার কাফন দেওয়াও জায়েজ হবে না।

জাকাতের অর্থ দিয়ে কোনো মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় করাও জায়েজ নেই। কেননা মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় করার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, প্রথমে তাকে এ সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তা থেকে পাওনাদারদের ঋণ শোধ করা হয়েছে। কেননা সে তো মালিক হওয়ার যোগ্যই নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মালিক বানানোর অর্থ অনুপস্থিত বলে জাকাত আদায় হবে না। তবে যদি কোনো জীবিত ব্যক্তি নিজের ঋণ আদায়ের জন্য অন্য কাউকে নির্দেশ দেয় আর নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাকাতের অর্থ দিয়ে ঋণ আদায় করে, তাহলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে জাকাত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে; আর পাওনাদার তার পক্ষ থেকে উকিল হয়ে কবজ করেছে। সুতরাং ঋণগ্রস্তকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার অর্থ এক্ষেত্রে বিদ্যমান। তাই জাকাত আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

وَلَا تُشْتَرٰى بِهَا رَقَبَةٌ تُعْتَقُ خِلَافًا لِمَالِكٍ حَيْثُ ذَهَبَ اِلَيْهِ فِىْ تَاوِيْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَفِى الرِّقَابِ وَلَنَا اَنَّ الْاِعْتَاقَ اِسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيْكٍ وَلَا تُدْفَعُ اِلٰى غَنِيٍّ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَهُوَ بِاِطْلَاقِهٖ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِىْ غَنِيِّ الْغُزَاةِ وَكَذَا حَدِيْثُ مُعَاذٍ (رض) عَلٰى مَا رَوَيْنَا ـ

অনুবাদ : জাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্ত করার জন্য কোনো দাস ক্রয় করা যাবে না। ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি আল্লাহর বাণী– وَفِى الرِّقَابِ [দাস মুক্ত করানো]-এর এ ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের দলিল হলো, এরূপ আজাদ করার দ্বারা মালিকানা রহিত হয়, মালিক বানানো হয় না। ধনীকে জাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ "কোনো ধনীর জন্য সদকা হালাল নয়।" এ নির্দেশ ব্যাপক হওয়ার কারণে এ হাদীস ধনী মুজাহিদের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলিল, তদ্রূপ আমাদের বর্ণিত হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জাকাতের অর্থ দিয়ে দাস কিংবা দাসী ক্রয় করত মুক্ত করে দিলে জাকাত আদায় হবে না। তবে ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, জাকাত আদায় হয়ে যাবে। তিনি বলেন, وَفِى الرِّقَابِ দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে আজাদ করা। আমাদের মতে وَفِى الرِّقَابِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মোকাতাব-কে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আমাদের দলিল এই যে, মুক্ত করার অর্থ– মালিকানা রহিত করা, মালিক বানানো নয়। অথচ মালিক বানানো জাকাতের রুকন। দাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে মালিক বানানোর অর্থ পাওয়া যায় না; বরং মালিকানা রহিত করার অর্থ রয়েছে। তাই জাকাত আদায় হবে না।

ঐ ধনী ব্যক্তি যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, তাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস– لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ "কোনো ধনীর জন্য সদকা হালাল নয়।" ইমাম শাফেয়ী (র.) ধনী মুজাহিদের জন্য জাকাত গ্রহণ করাকে বৈধ বলেছেন। যেমন– বিস্তারিতভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটি ও হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস– فَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَائِهِمْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল।

قَالَ وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّى زَكْوةَ مَالِهِ إِلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفِلَ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَالِ وَلَا إِلَى اِمْرَأَتِهِ لِلْاِشْتِرَاكِ فِى الْمَنَافِعِ عَادَةً وَلَا تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ (رحـ) لِمَا ذَكَرْنَا وَقَالَا تَدْفَعُ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ قَالَهُ لِاِمْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضـ) وَقَدْ سَأَلَتْهُ عَنِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জাকাত আদায়কারী তার পিতা ও দাদাকে যত উর্ধ্বতনই হোক, তদ্রূপ আপন পুত্র এবং নাতিকে যত অধঃস্তনই হোক, জাকাত দিতে পারবে না। কেননা মালিকানার লাভালাভ তাদের মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং পরিপূর্ণভাবে মালিক বানানো সাব্যস্ত হবে না। আপন স্ত্রীকেও দিতে পারবে না। কেননা সাধারণত উপকার গ্রহণে অংশীদারিত্ব রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্ত্রী তার স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে না– উল্লিখিত কারণে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, দিতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَكِ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ "তোমার জন্য দুটি প্রতিদান। সদকার প্রতিদান এবং স্বজনের প্রতি সহানুভূতির প্রতিদান।" ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে সদকা প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ কথা বলেন। আমরা বলি, আলোচ্য হাদীস নফল সদকার উপর প্রযোজ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জাকাত আদায়কারী জাকাতের অর্থ স্বীয় পিতা, দাদা ও উর্ধ্বতন কাউকে অনুরূপভাবে মা, নানী ও উর্ধ্বতন কাউকে এবং পুত্র, নাতি ও অধঃস্তন কাউকে জাকাত দিতে পারবে না। মোট কথা, তার মূল– যার থেকে সে জন্মগ্রহণ করেছে ও তার শাখা– তার থেকে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের কাউকে জাকাত দিতে পারবে না। বস্তুত যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, তাদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।

দলিল হলো, মালিকানার লাভালাভ তাদের মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও অংশীদারিত্ব রয়েছে। সুতরাং তাদেরকে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে মালিক বানানো সাব্যস্ত হয় না। অথচ মালিক বানানো জাকাতের রুকন।

স্বামী স্ত্রীকে জাকাত দিতে পারবে না। কেননা সাধারণত উপকার গ্রহণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অংশীদারিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর সম্পদ স্বামীর সম্পদরূপে গণ্য আবার স্বামীর সম্পদ স্ত্রীর সম্পদরূপে গণ্য। তারা একে অপরের সম্পদ থেকে উপকার লাভ করে। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى "তিনি তোমাকে নিঃস্ব পেয়েছিলেন অতঃপর তিনি তোমাকে ধনী করেছেন।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.)-এর ধনসম্পদ দ্বারা ধনী হয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর সম্পদ স্বামীর সম্পদরূপে গণ্য; অনুরূপভাবে স্বামীর সম্পদও স্ত্রীর সম্পদরূপে গণ্য। সুতরাং স্বামী স্ত্রীকে জাকাত দেওয়ার অর্থ– এক পকেট থেকে অন্য পকেটে রাখা। আর তাই এতে জাকাত আদায় হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্ত্রীও স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে না। সাহেবাইন বলেন, তা জায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল তা-ই, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপকার গ্রহণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অংশীদারিত্ব রয়েছে।

সাহেবাইনের দলিল হলো– বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীস, যা 'ফতহুল কাদীরে' এভাবে বিবৃত হয়েছে–

عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنِّيْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكَ وَاِلَّا صَرَفْتُهَا اِلٰى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بَلْ اِئْتِيْهِ اَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتِيْ حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْتُ اِئْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ هَلْ تُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِيْ حُجُوْرِهِمَا وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا قَالَ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ اِمْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ ـ

অর্থ– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর সহধর্মিণী যয়নব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– হে নারী সকল! তোমরা সদকা কর– তোমাদের অলঙ্কার থেকে হলেও। হযরত যয়নব (রা.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, আপনি তো স্বল্প সম্পদের মালিক। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমাদেরকে সদকা প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলুন, এ অলঙ্কার যদি আমার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে তা আপনাকে দেব, অন্যথায় অন্য কাউকে দেব। হযরত যয়নব (রা.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তুমিই জিজ্ঞাসা কর। হযরত যয়নব (রা.) বলেন, আমি বের হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় এক আনসারী মহিলাকে পেলাম। আমার মতো সেও একই প্রয়োজনে এসেছিল। হযরত যয়নব (রা.) বলেন, [সে সময়] রাসূলুল্লাহ ﷺ গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন। এ সময় বেলাল (রা.) বের হলে আমি তাঁকে বললাম– "তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গিয়ে বল, দরজায় দুজন মহিলা এসেছে; তারা আপনাকে ﷺ জিজ্ঞাসা করছে যে, "তারা কি তাদের স্বামী ও তাদের কোলে এতিম শিশুদেরকে সদকা দিতে পারবে? আমাদের পরিচয় বলিও না।" তিনি বলেন, হযরত বেলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তা জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা কে? হযরত বেলাল (রা.) বললেন, এক আনসারী মহিলা ও জয়নব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন যয়নব? উত্তরে হযরত বেলাল (রা.) বললেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান। স্বজনদের প্রতি সহানুভূতির প্রতিদান ও সদকার প্রতিদান।

হাদীসের এ বিশদ বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, আপন স্বামীকে স্ত্রীর জন্য সদকা দেওয়া জায়েজ। এর জবাবে আমরা বলি, আলোচ্য হাদীস নফল সদকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ স্ত্রী যদি স্বামীকে নফল সদকা প্রদান করে তাহলে সে দুটি প্রতিদান পাবে। একটি হলো, স্বজনদের প্রতি সহানুভূতির প্রতিদান। অপরটি হলো সদকার প্রতিদান। সাহেবাইনের পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা এটিই বুঝানো হয়েছে। কেননা হযরত যয়নব (রা.) তাঁর স্বামী ও পূর্বের স্বামীর এতিম সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কেই দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ সর্বসম্মতভাবে সন্তানকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসে নফল সদকা উদ্দেশ্য, জাকাত উদ্দেশ্য নয়।

قَالَ وَلَا يُدْفَعُ اِلٰى مُدَبَّرِهٖ وَمُكَاتَبِهٖ وَاُمِّ وَلَدِهٖ لِفُقْدَانِ التَّمْلِيْكِ اِذْ كَسْبُ الْمَمْلُوْكِ لِسَيِّدِهٖ وَلَهٗ حَقٌّ فِىْ كَسْبِ مُكَاتَبِهٖ فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيْكُ وَلَا اِلٰى عَبْدٍ قَدْ اُعْتِقَ بَعْضُهٗ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهٗ وَقَالَا يُدْفَعُ اِلَيْهِ لِاَنَّهٗ حُرٌّ مَدْيُوْنٌ عِنْدَهُمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আপন মুদাব্বার, মুকাতাব এবং উম্মে ওয়ালাদকে জাকাত দিতে পারবে না। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে মালিক বানানো অনুপস্থিত। যেহেতু দাস-দাসীর যাবতীয় উপার্জন তার মনিবের। মুকাতাবের উপার্জনেও মনিবের অধিকার রয়েছে। সুতরাং পূর্ণরূপে তাতে মালিক বানানো হয় না। আর এমন গোলামকেও জাকাত দিতে পারবে না, যার একাংশ আজাদ করা হয়েছে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কেননা তার মতে উক্ত দাস মুকাতাবের পর্যায়ভুক্ত। আর সাহেবাইন বলেন, তাকে দেওয়া যাবে। কেননা তাঁদের মতে সে স্বাধীন ঋণগ্রস্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আপন মুদাব্বারকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই, চাই সে সাধারণ মুদাব্বার হোক কিংবা শর্তযুক্ত মুদাব্বার হোক। সাধারণ মুদাব্বার হলো ঐ দাস, যার স্বাধীনতাকে মনিব তার মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করেছে। যেমন মনিব দাসকে বলেছে– আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীন। আর শর্তযুক্ত মুদাব্বার হলো ঐ দাস, যার স্বাধীনতাকে মনিব তার বিশেষ ধরনের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। যেমন দাসকে বলা হয়েছে যে, যদি আমি অমুক অসুখে মরে যাই, তাহলে তুমি আজাদ।

আপন মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদকে জাকাত দেওয়াও জায়েজ নেই। দলিল হলো, বর্ণিত তিনটি ক্ষেত্রে মালিক বানানো পাওয়া যায় না। কেননা মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ সব দিক থেকেই মনিবের মালিকানাধীন। তাদের উপার্জন মালিকের বলে গণ্য হয়। আর মুকাতাবের উপার্জনে মনিবের অধিকার সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তাদেরকে জাকাত দেওয়ার অর্থ নিজেকেই জাকাত দেওয়া। আর স্বীয় সম্পদের জাকাত নিজেকে দিলে তা আদায় বলে গণ্য হবে না। কেননা জাকাত আদায় হওয়ার জন্য অন্যকে মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। আর এ অর্থ এখানে অনুপস্থিত বলে জাকাত দেওয়া সিদ্ধ হবে না।

قَوْلُهٗ وَلَا اِلٰى عَبْدٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো– দুজন ব্যক্তির যৌথ মালিকানায় একটি দাস রয়েছে। তন্মধ্যে একজন নিজের অংশ আজাদ করে দিয়েছে। আর আজাদকারী অসচ্ছল। এ ক্ষেত্রে অন্য শরিক নিজের অংশ আজাদ করে দেবে কিংবা দাসের মাধ্যমে উপার্জন করত নিজের অংশের মূল্য উসুল করে নেবে। যদি অন্য শরিক স্বীয় অংশের মূল্য নিতে চায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এই দাস সেই শরিকের ক্ষেত্রে মুকাতাবের পর্যায়ে পড়বে। আর সাহেবাইনের মতে সে স্বাধীন, কিন্তু ঋণগ্রস্ত। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যেহেতু এই দাস অন্য অংশীদারের ক্ষেত্রে মুকাতাবের পর্যায়ভুক্ত, আর স্বীয় মুকাতাবকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।

আর সাহেবাইনের মতে যেহেতু সে সম্পূর্ণরূপে আজাদ, তবে অন্য অংশীদারের নিকট সে ঋণগ্রস্ত, সেহেতু অন্য অংশীদার তাকে জাকাত দিতে চাইলে তা শরিয়তসম্মত হবে। কেননা তা এরূপ হলো– যেমন কেউ স্বীয় দেনাদারকে জাকাতের অর্থ প্রদান করল, আর এ অর্থ দিয়ে সে নিজের পাওনা আদায় করে নেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। তদ্রূপ অপর অংশীদারের জন্য স্বীয় মালের জাকাত এই আংশিক আজাদকৃত গোলামকে দেওয়া জায়েজ।

وَلَا يُدْفَعُ إِلَى مَمْلُوكِ غَنِيٍّ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقِعٌ لِمَوْلَاهُ وَلَا إِلَى وَلَدِ غَنِيٍّ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيًّا بِمَالِ أَبِيهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ كَبِيرًا فَقِيرًا لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيًّا بِيَسَارِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَبِخِلَافِ امْرَأَةِ الْغَنِيِّ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لَا تُعَدُّ غَنِيَّةً بِيَسَارِ زَوْجِهَا وَبِقَدْرِ النَّفَقَةِ لَا تَصِيرُ مُوسِرَةً .

অনুবাদ : কোনো ধনীর দাসকে জাকাত দেবে না। কেননা, মালিকানা তার মনিবের জন্যই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর কোনো ধনীর নাবালক সন্তানকে দেবে না। কেননা, তাকে তার পিতার সম্পদের কারণে ধনী গণ্য করা হয়। তবে সাবালক দরিদ্র সন্তানকে দেওয়া যাবে। কেননা পিতার সচ্ছলতার কারণে তাকে ধনী গণ্য করা হয় না। যদিও তার ভরণ-পোষণ তার পিতার জিম্মায় থাকে। পক্ষান্তরে ধনী লোকের স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে নিজে দরিদ্র হলে স্বামীর সচ্ছলতার কারণে তাকে ধনী বিবেচনা করা হয় না। আর ভরণ-পোষণের পরিমাণ দ্বারা সে মালদার গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো ধনীর দাসকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। চাই সে নিছক দাস হোক, কিংবা মুদাব্বার হোক অথবা উম্মে ওয়ালাদ হোক। দলিল হলো, দাসের যাবতীয় সম্পদ তার মনিবের মালিকানায় সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং ধনীর দাসকে জাকাত দেওয়া হলে সে অর্থ ধনীর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর ধনীকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই বলে তার দাসকেও জাকাত দেওয়া জায়েজ হবে না। অবশ্য ধনীর মুকাতাবকে জাকাত দেওয়া জায়েজ। কেননা এ ব্যাপারে কুরআনের অকাট্য প্রমাণ (وَفِي الرِّقَابِ) বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, ধনী ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকেও জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা নাবালক সন্তানকে তার পিতার সম্পদের কারণে ধনী গণ্য করা হয়। তবে ধনী ব্যক্তির সন্তান বালেগ ও দরিদ্র হলে তাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হবে। কেননা সে পিতার সচ্ছলতার কারণে মালদার বলে গণ্য নয়। যদিও তার ভরণ-পোষণ পিতার উপর ওয়াজিব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যেহেতু দরিদ্র, তাই তাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হবে। অনুরূপভাবে ধনীর স্ত্রী যদি দরিদ্র হয় তাহলে তাকেও জাকাত দেওয়া জায়েজ। কেননা স্বামীর সচ্ছলতার কারণে তাকে ধনী বিবেচনা করা হয় না। আর ভরণ-পোষণের পরিমাণ দ্বারা সে মালদার বলে গণ্য হবে না। এ কারণে তাকেও জাকাত দেওয়া বৈধ।

وَلَا تُدْفَعُ إِلَى بَنِيْ هَاشِمٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا بَنِيْ هَاشِمٍ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَ اَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ لِاَنَّ الْمَالَ هٰهُنَا كَالْمَاءِ يَتَدَنَّسُ بِاِسْقَاطِ الْفَرْضِ اَمَّا التَّطَوُّعُ بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّدِ بِالْمَاءِ قَالَ وَهُمْ اٰلُ عَلِيٍّ وَاٰلُ عَبَّاسٍ وَاٰلُ جَعْفَرٍ وَاٰلُ عَقِيْلٍ وَاٰلُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيْهِمْ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَلِاَنَّهُمْ يَنْتَسِبُوْنَ اِلٰى هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَنِسْبَةُ الْقَبِيْلَةِ اِلَيْهِ وَاَمَّا مَوَالِيْهِمْ فَلِمَا رُوِىَ اَنَّ مَوْلًى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَاَلَهُ اَتَحِلُّ لِيَ الصَّدَقَةُ فَقَالَ لَا اَنْتَ مَوْلَانَا بِخِلَافِ مَا اِذَا اَعْتَقَ الْقُرَشِيُّ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا حَيْثُ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُعْتِقِ لِاَنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْاِلْحَاقُ بِالْمَوْلٰى بِالنَّصِّ وَقَدْ خُصَّ الصَّدَقَةُ ـ

অনুবাদ : আর বনূ হাশেমকে জাকাত দেবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–"হে বনূ হাশেম! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের এঁটো পানি এবং তাদের ময়লা হারাম করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পঞ্চম ভাগের পঞ্চমাংশ দান করেছেন"। পক্ষান্তরে নফল দান ভিন্ন। কেননা এ ক্ষেত্রে সম্পদ হলো পানির মতো। ফরজ আদায় করার কারণে তা ময়লা হয়ে যায়। আর নফল দান পানি দ্বারা শীতলতা লাভ করার পর্যায়ভুক্ত। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাশেমীগণ হলেন– হযরত আলী, আব্বাস, জাফর, 'আকীল ও হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর পরিবার এবং তাদের আজাদকৃত গোলাম। কেননা এরা সকলে হাশেম ইবনে আবদে মানাফের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর হাশেমী গোত্রের পরিচয়ও তার সাথেই সম্পৃক্ত। আর তাদের আজাদকৃত গোলামদের ক্ষেত্রের কারণ হলো, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার জন্য কি সদকা হালাল হবে?' তিনি ﷺ বললেন, না। তুমি তো আমাদের আজাদকৃত। পক্ষান্তরে কোনো কুরায়শী যদি কোনো নাসরানী গোলামকে আজাদ করে, তবে তার নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে। আর এক্ষেত্রে আজাদকৃত ব্যক্তির অবস্থাই বিবেচনা করা হবে। কেননা এটাই কিয়াস। পক্ষান্তরে মনিবের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে হাদীস দ্বারা। আর হাদীসে বিশেষভাবে সদকাকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাশেমী বংশের কাউকে জাকাত দেওয়াও জায়েজ নেই। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) হাদীসটি এভাবে বিবৃত করেছেন–

يَا بَنِيْ هَاشِمٍ إِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ اَيْدِى النَّاسِ وَ اَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ ـ

অর্থ–হে হাশেমীগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের এঁটো পানি এবং তাদের ময়লা অপছন্দনীয় করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পঞ্চম ভাগের পঞ্চমাংশ দান করেছেন।

অর্থাৎ গনিমতের সম্পদের পাঁচ ভাগের চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা হবে। আর অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার পাঁচ ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে এক অংশ হাশেমীদের জন্য আর অবশিষ্ট চার ভাগ অন্যখাতে ব্যয় করা হবে। পক্ষান্তরে নফল সদকা বনূ হাশেমকে দেওয়া যাবে।

এর দলিল হলো– এ ক্ষেত্রে সম্পদ পানির মতো। সুতরাং পানি যদি ফরজ আদায়ের জন্য তথা নাপাকী দূরীভূত করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা ময়লা পানি হিসেবে গণ্য হয়। তদ্রূপ যে সম্পদ জাকাতের ফরজ বিধান আদায় করার জন্য ব্যয় করা হয়, তাও ময়লা মিশ্রিত হয়ে যায়। আর কোনো পবিত্র ব্যক্তি যদি শীতলতার জন্য পানি ব্যবহার করে, তাহলে সে পানি পবিত্র বলে গণ্য এবং তা দ্বারা অজু করাও জায়েজ। তদ্রূপ নফল সদকা সম্পদ ও পবিত্র। বনূ হাশেমের জন্য তা নেওয়া জায়েজ।

قَوْلُهُ قَالَ اٰلُ عَلِيٍّ الخ : বনূ হাশেমের পরিচয় দেওয়া হয়েছে– এ স্থানে। বনূ হাশেম হলেন– হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর, চাই হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্যান্য স্ত্রীদের গর্ভজাত সন্তান হোক। স্বয়ং হযরত আলী (রা.)-ও বনূ হাশেমের অন্তর্ভুক্ত, হযরত আব্বাস (রা.)-ও তাঁর বংশধর, হযরত জাফর (রা.)-ও তাঁর বংশধর, হযরত আকীল (রা.)-ও তাঁর বংশধর, হযরত হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-ও তাঁর বংশধর এবং তাদের আজাদকৃত দাস। কেননা তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঊর্ধ্বতন পুরুষ হাশেম ইবনে আবদে মানাফের সাথে সম্পৃক্ত। আর হাশেমী গোত্রের পরিচয়ও হাশেম ইবনে আবদে মানাফের সাথেই সম্পৃক্ত। আর তাঁদের আজাদকৃত গোলামকেও হাশেমী বলার কারণ হলো– আবূ দাউদ শরীফের বিশদ এক হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِاَبِيْ رَافِعٍ اِصْحَبْنِيْ فَاِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا قَالَ حَتّٰى اٰتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَسْاَلُهُ فَاَتَاهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ .

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম হযরত আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি মাখজুমের এক ব্যক্তিকে সদকা উসুল করার জন্য প্রেরণ করলেন। সে আবূ রাফি' (রা.)-কে বলল– আমার সাথে চলো, তাহলে তুমিও পাবে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত নয়। অতঃপর হযরত আবূ রাফি' (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো গোত্রের গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত [বিধানের ক্ষেত্রে]। আর আমাদের জন্য সদকা হালাল নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচা আবূ লাহাব হাশেম ইবনে আবদে মানাফের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো সন্তান মুসলমান হলে তার জন্য সদকা হালাল হবে। কেননা বনূ হাশেমের সম্মানার্থেই তাঁদের উপর সদকা হারাম করা হয়েছে। এ মর্যাদা প্রথমত ঊর্ধ্বতন বংশধরদের জন্য সাব্যস্ত হয়। অতঃপর তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের সন্তানদের জন্য এ মর্যাদা প্রযোজ্য। বনূ হাশেমকে সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো, তারা জাহিলি যুগে ও ইসলামি যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য-সহায়তা করেছিলেন। পক্ষান্তরে হতভাগা আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কষ্ট দিয়েছিল। এ কারণে সে সম্মানের পাত্র নয় এমনকি তার সন্তানরাও সম্মানের যোগ্য নয়– যদিও তারা মুসলমান হয়। তাই আবূ লাহাবের মুসলমান বংশধরের জন্য সদকা হালাল।

بِخِلَافِ مَا اِذَا اَعْتَقَ الْقُرَشِيُّ الخ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো– হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো গোত্রের আজাদকৃত গোলাম সেই গোত্রেরই বলে বিবেচ্য। এ নীতি অনুসারে কোনো কুরায়শী যদি কোনো অমুসলিম গোলামকে আজাদ করে দেয়, তাহলে সেই গোলাম হতে জিজিয়া গ্রহণ না করা উচিত। কেননা কুরায়শী থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হয় না। অথচ কুরায়শীর আজাদকৃত অমুসলিম গোলামের উপর জিজিয়া ওয়াজিব।

এর জবাবে বলা হয় যে, এ ক্ষেত্রে مُعْتَقْ [যবরযুক্ত] তথা আজাদকৃত গোলামের অবস্থা বিবেচনা করা হয়। কেননা এটিই কিয়াস। অর্থাৎ আজাদকৃত গোলামকে আজাদকারীর সঙ্গে কোনো ক্ষেত্রেই যুক্ত করা যায় না। কেননা তারা প্রত্যেকে সত্তাগতভাবে মূল। কারণ, উভয়েই বালেগ, 'আকেল, স্বাধীন ও শরিয়তের হুকুম পালনে দায়বদ্ধ। তবে আজাদকৃত গোলামের সদকা গ্রহণ করা হারাম হওয়ার বিষয়টি তার মনিবের সাথে যুক্ত করা হয়েছে কিয়াস পরিপন্থিভাবে مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ হাদীস দ্বারা। সুতরাং তা শুধু এ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ (رح) اِذَا دَفَعَ الزَّكٰوةَ اِلٰى رَجُلٍ يَظُنُّهُ فَقِيْرًا ثُمَّ بَانَ اَنَّهُ غَنِيٌّ اَوْ هَاشِمِيٌّ اَوْ كَافِرٌ اَوْ دَفَعَ فِيْ ظُلْمَةٍ فَبَانَ اَنَّهُ اَبُوْهُ اَوْ اِبْنُهُ فَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ عَلَيْهِ الْاِعَادَةُ لِظُهُوْرِ خَطَائِهِ بِيَقِيْنٍ وَاِمْكَانِ الْوُقُوْفِ عَلٰى هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ وَصَارَ كَالْاَوَانِيْ وَالثِّيَابِ وَلَهُمَا حَدِيْثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيْهِ يَا يَزِيْدُ لَكَ مَا نَوَيْتَ وَيَا مَعْنُ لَكَ مَا اَخَذْتَ وَقَدْ دَفَعَ اِلَيْهِ وَكِيْلُ اَبِيْهِ صَدَقَتَهُ وَلِاَنَّ الْوُقُوْفَ عَلٰى هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ بِالْاِجْتِهَادِ دُوْنَ الْقَطْعِ فَيُبْنَى الْاَمْرُ فِيْهَا عَلٰى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ كَمَا اِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ غَيْرِ الْغَنِيِّ اَنَّهُ لَا يُجْزِيْهِ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْاَوَّلُ وَهٰذَا اِذَا تَحَرّٰى وَ دَفَعَ وَفِيْ اَكْبَرِ رَأْيِهِ اَنَّهُ مَصْرَفٌ اَمَّا اِذَا شَكَّ وَلَمْ يَتَحَرَّ اَوْ تَحَرّٰى فَدَفَعَ وَفِيْ اَكْبَرِ رَأْيِهِ اَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْرَفٍ لَا يُجْزِيْهِ اِلَّا اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ فَقِيْرٌ هُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তিকে দরিদ্র মনে করে জাকাত দেয় এবং পরে প্রকাশ পায় যে, সে ধনী বা হাশেমী বা কাফির কিংবা অন্ধকারে জাকাত প্রদান করেছে; কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে, লোকটি তার পিতা কিংবা ছেলে, তাহলে তার জন্য পুনরায় জাকাত প্রদান জরুরি নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার জন্য পুনরায় জাকাত প্রদান জরুরি, সুনিশ্চিতভাবে তার ভুল প্রকাশ পাওয়ার কারণে। অথচ এ বিষয়গুলো জেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল। বিষয়টি পাত্র ও পোশাকের হুকুমের অনুরূপ হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো মা'আন ইবনে ইয়াজীদ (রা.)-এর হাদীস। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- يَا يَزِيْدُ لَكَ مَا نَوَيْتَ وَيَا مَعْنُ لَكَ مَا اَخَذْتَ "হে ইয়াজীদ! তুমি যা নিয়ত করেছ, তা তুমি পাবে। আর হে মা'আন! তুমি যা নিয়েছ, তা তোমার।" ব্যাপারটি ছিল- হযরত মা'আন (রা.)-এর পিতা ইয়াজীদ এর উকিল তার পিতার সদকার অর্থ তার পুত্র মা'আনকে প্রদান করেছিল। অধিকন্তু এসব বিষয় অবগত হওয়া ইজতিহাদ ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনার পর যা তার নিকট স্থিরীকৃত হয়, তার উপরই বিষয়টি নির্ভরশীল হবে। যেমন- যখন কিবলার দিক তার জন্য সন্দেহযুক্ত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ধনী ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে প্রদত্ত জাকাত যথেষ্ট হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতই হলো জাহিরী রেওয়ায়েত। এ সিদ্ধান্ত তখনই হবে, যখন সে চিন্তা-ভাবনা করে জাকাত প্রদান করে এবং তার প্রবল ধারণা হয়ে থাকে যে, লোকটি জাকাতের উপযুক্ত পাত্র। আর যখন তার সন্দেহ হয়ে থাকে অথচ চিন্তা না করে, অথবা চিন্তা করেছে বটে, তবে তার প্রবল ধারণা ছিল সে জাকাতের উপযুক্ত পাত্র নয়, তাহলে প্রদত্ত জাকাত আদায় হবে না। তবে পরে যদি জানতে পারে যে, সে দরিদ্র। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি কাউকে জাকাতের ক্ষেত্র মনে করে জাকাত প্রদান করেছে। তাহলে সে ক্ষেত্রে তিনটি সুরত হতে পারে- [১] জাকাত দেওয়ার পর সে অবগত হয়েছে যে, তা জাকাতের ক্ষেত্র। [২] জাকাত আদায়কারী যাকে জাকাত দিয়েছে- সে জাকাতের ক্ষেত্র কিনা? এ ব্যাপারে কিছুই সে জানে না। [৩] কিংবা যাকে জাকাত দেওয়া হয়েছে, সে জাকাতের ক্ষেত্র নয় বলে জাকাত আদায়কারী অবগত হয়েছে। যেমন- যাকে জাকাতের ক্ষেত্র মনে করে জাকাত দিয়েছে- সে ধনী কিংবা হাশেমী পরিবারের লোক অথবা কাফির কিংবা লোকটি তার পিতা বা সন্তান। বর্ণিত তিনটি সুরতের মধ্যে প্রথম দুটি সুরতের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে জাকাত আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। তৃতীয় সুরতে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জাকাত

আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে তার জন্য পুনঃ জাকাত প্রদান জরুরি নয়; বরং সে যা আদায় করেছে তা-ই যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে জাকাত আদায় হবে না; বরং দ্বিতীয়বার জাকাত আদায় করা জরুরি। জাকাত হিসেবে যে অর্থ সে প্রদান করেছে, তা ফিরিয়ে নেবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো– জাকাত আদায়কারী নিশ্চিত জেনেছে যে, সে জাকাত প্রদানে ভুল করেছে এবং যথার্থ খাতে সে জাকাত দেয়নি। অথচ সে যাকে জাকাত দিয়েছে সে ধনী না দরিদ্র; হাশেমী কি না; কাফির না মুসলমান, বাবা না ছেলে– এ বিষয়গুলো জেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল। সুতরাং যখন এ বিষয়গুলো জেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল এবং সুনিশ্চিতভাবে জাকাত আদায়কারীর ভুল প্রকাশ পেয়েছে। তখন জাকাতের অর্থ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না করার কারণে জাকাত আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে না। তাই পুনরায় জাকাত প্রদান করা জরুরি হবে। বিষয়টি এরূপ হয়ে গেল, যেমন– পানির কতিপয় পাক ও নাপাক পাত্র এলোমেলো হয়ে গেছে। কেউ চিন্তা-ভাবনা করে এক পাত্র পানি দিয়ে অজু করেছে। পরক্ষণেই সে অবগত হয়েছে যে, ঐ পাত্রের পানি নাপাক ছিল। তাহলে এ ক্ষেত্রে পুনরায় অজু করা ওয়াজিব। তদ্রূপ পাক ও নাপাক কাপড় এলোমেলো হয়ে গেছে এবং পাক-নাপাক বুঝার কোনো চিহ্নও নেই। অতঃপর কেউ চিন্তা-ভাবনার পর যে কোনো একটি কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়ল। এরপর সে জানতে পারল যে, সেটা নাপাক ছিল, তাহলে পুনরায় নামাজ পড়া ওয়াজিব।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ দুটি ক্ষেত্রে যেমন পুনরায় অজু করা ও নামাজ পড়া ওয়াজিব, তদ্রূপ বর্ণিত মাসআলার ক্ষেত্রেও পুনরায় জাকাত প্রদান জরুরি। আর বিভিন্ন খাতে সে যে অর্থ ব্যয় করেছে তা ফিরিয়ে নেবে না। কেননা জাকাতের ক্ষেত্র ফাসেদ হওয়ায় আদায় হওয়াকে বিনষ্ট করবে না। সুতরাং তা স্বীয় অবস্থায় অটুট থাকবে। তবে আদায়ের পদ্ধতি ফাসেদ হওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার জাকাত প্রদান করা জরুরি।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো– বুখারী শরীফে বর্ণিত মা'আন ইবনে ইয়াজীদের হাদীস। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) 'ফতহুল কাদীরের মধ্যে এবং মোল্লা আলী ক্বারী (র.) 'শরহে নিক্বায়া' -এর মধ্যে নিম্নোক্তভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَ اَبِىْ وَجَدِّىْ وَخَطَبَ عَلَىَّ فَاَنْكَحَنِىْ وَخَاصَمْتُ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبِىْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكَ اَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ وَلَكَ مَا اَخَذْتَ يَا مَعْنُ . (بُخَارِىٌّ)

অর্থ– হযরত মা'আন ইবনে ইয়াজীদ (রা.) বলেন, আমি, আমার পিতা ও আমার দাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলাম। তিনিই আমার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং আমাকে বিবাহ করালেন। একটি বিষয়ে আমি তার সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হলাম। আমার পিতা ইয়াজীদ [একদা] কিছু দিনার বের করলেন– সদকা করার জন্য। মসজিদে তিনি এক ব্যক্তির নিকট তা রেখে দিলেন। আমি তা নিয়ে চলে আসলাম। তিনি [আমার পিতা ইয়াজীদ] বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিনি। সুতরাং বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইয়াজীদ! তুমি যা নিয়ত করেছ তার প্রতিদান তুমি পাবে। আর হে মা'আন, তুমি যা নিয়েছ তা তোমার।–[বুখারী]

এ হাদীসে হযরত ইয়াজীদ (রা.)-কে পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আবার হযরত মা'আন (রা.)-কে তা ফিরিয়ে দেওয়ারও আদেশ করা হয়নি। অথচ হযরত মা'আন (রা.)-এর পিতা ইয়াজীদ (রা.)-এর উকিল, তাঁর সদকার অর্থ পুত্র মা'আনকে প্রদান করেছিলেন। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জাকাত প্রদানের পর যদি জাকাত দাতা জানতে পারে যে, সে ভিন্ন খাতে জাকাত প্রদান করেছে– তাহলে তার জন্য পুনরায় জাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়; বরং তার জাকাত আদায় হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, ইয়াজীদ (রা.) নফল সদকা হিসেবে তা প্রদান করেছিলেন। আর নফল সদকা ছেলে সন্তানকে দেওয়া জায়েজ আছে। সুতরাং বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হতে পারে না।

এর জবাবে বলা হয় যে, এ ধরনের সম্ভাবনা অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– لَكَ مَا نَوَيْتَ -এর مَا অব্যয়টি مَوْصُوْلَه হওয়ার কারণে সব ধরনের সদকার নিয়তের ক্ষেত্রেই তা জায়েজ। অর্থাৎ নফল সদকার নিয়ত করলে সে তার প্রতিদান পাবে। আর জাকাতের অর্থাৎ (ফরজ সদকা) নিয়ত করলে তারও প্রতিদান সে পাবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো অবগত হওয়া সম্ভব। তবে তা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা কারো প্রয়োজন

সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া দুষ্কর। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার পর যা স্থিরীকৃত হয় তার উপরই বিষয়টি নির্ভরশীল হবে। এমনকি যদি সে ইজতিহাদের মাধ্যমে স্থির করে যে, জাকাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি দরিদ্র, তাহলে তাকে জাকাত প্রদানের দ্বারা আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করা হবে এবং জাকাত আদায় হয়ে যাবে। বিষয়টি এরূপ হলো, যেমন- নামাজ আদায়কারীর জন্য যখন কিবলার দিক সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়, তখন সে চিন্তা-ভাবনা করে যেদিকে ফিরে নামাজ পড়বে, নামাজ আদায় হয়ে যাবে। যদিও নামাজ শেষে সে জানতে পারে যে, সঠিক দিকে ফিরে নামাজ পড়া হয়নি। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ইজতিহাদের উপর আমল করেছে। সুতরাং চিন্তা-ভাবনার পর যে দিকটাকে তার কিবলা বলে মনে হবে সেদিকে ফিরেই নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তদ্রূপ জাকাতের বিষয়টিও। যদিও পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় যে, যাকে জাকাত দেওয়া হয়েছে, সে জাকাতের ক্ষেত্র ছিল না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, জাকাত দেওয়ার পর যদি জানা যায়, যাকে জাকাত দেওয়া হয়েছে সে ধনী, তাহলেও জাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় জাকাত প্রদান করা আবশ্যক নয়। আর যদি সে হাশেমী পরিবারভুক্ত হয়, কিংবা কাফির বা পিতা-পুত্রের কেউ হয়, তাহলে জাকাত আদায় বলে গণ্য হবে না; বরং পুনরায় জাকাত প্রদান করতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উক্ত বর্ণনার দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, ধনী কখনো কখনো জাকাতের ক্ষেত্র হয়। যেমন- জাকাত উসুলের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও জাকাতের অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য জায়েজ। কিন্তু হাশেমী পরিবার, কাফির পিতা কিংবা সন্তান কখনই জাকাতের ক্ষেত্র নয়। এজন্য কোনো ধনীকে দরিদ্র মনে করে জাকাত দিলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা সে কখনো কখনো জাকাতের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে প্রদত্ত জাকাত যথেষ্ট হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, প্রথমোক্ত মতই হলো জাহিরী রেওয়ায়েত। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই জাকাত আদায় হয়ে যাবে- যখন সে ক্ষেত্র মনে করে জাকাত দিয়ে থাকে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ভিন্ন খাতে জাকাত প্রদান করলে তা আদায় বলে গণ্য হবে তখনই, যখন সে চিন্তা-ভাবনা করে জাকাত প্রদান করে এবং তার প্রবল ধারণা হয়ে থাকে যে, লোকটি জাকাতের উপযুক্ত পাত্র। পক্ষান্তরে যদি তার সন্দেহ হয়ে থাকে যে, সে জাকাতের উপযুক্ত পাত্র কি না, অথচ চিন্তা না করে থাকে, কিংবা চিন্তা করে জাকাত প্রদান করেছে, অথচ তার প্রবল ধারণা হয়েছিল যে, সে জাকাতের উপযুক্ত পাত্র নয়, তাহলে বর্ণিত দুটি ক্ষেত্রে প্রদত্ত জাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে পরে যদি প্রকাশ পায় যে, যাকে জাকাত দেওয়া হয়েছে সে দরিদ্র, তাহলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

বি: দ্র : 'ইনায়া' গ্রন্থকার বলেন, এ মাসআলার চারটি সুরত রয়েছে। কেননা জাকাত প্রদানকারী কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়া এবং চিন্তা-ভাবনা না করে জাকাত দেয় অথবা জাকাত গ্রহণকারীর অবস্থা সম্পর্কে তার সন্দেহ থাকে। প্রথম সুরতে প্রদত্ত জাকাত গ্রহণযোগ্য হবে। তবে জাকাত গ্রহণকারীর সচ্ছলতা প্রকাশ পেলে জাকাত আদায় হবে না। কেননা মূলত জাকাতের অর্থের উপর দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় সুরতটি আবার দু'প্রকার। সন্দেহের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করে জাকাত দিয়েছে; কিংবা চিন্তা-ভাবনা না করেই জাকাত দিয়েছে। যদি চিন্তা-ভাবনা না করে জাকাত দেয়, তাহলে প্রদত্ত জাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি পরে জানতে পারে যে, সে দরিদ্র, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে যখন সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তখন জাকাত আদায়কারীর উপর চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক হয়ে যায়। সুতরাং চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও সে যখন চিন্তা-ভাবনা করেনি তখন প্রদত্ত জাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- কোনো মুসল্লির নিকট যদি কেবলা সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজিব। সুতরাং সে যদি চিন্তা-ভাবনা না করেই জাকাত আদায় করে, তাহলে আদায়কৃত জাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে পরে যদি সে জানতে পারে যে, সে দরিদ্র, তাহলে প্রদত্ত জাকাত গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে দরিদ্রই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অর্জিত হয়েছে। যেমন- জুমার জন্য সা'ঈ করা ফরজ। তবে সা'ঈ ছাড়াই যদি জুমার নামাজ কেউ আদায় করে, তাহলে তা আদায় বলে গণ্য হয়। যেমন- জামে মসজিদে ই'তেকাফকারী সা'ঈ ছাড়াই জুমার নামাজ সম্পন্ন করে। কেননা মূল উদ্দেশ্য হলো জুমার নামাজ, সা'ঈ নয়।

আর যদি চিন্তা-ভাবনা করে জাকাত প্রদান করে, তাহলে সে ক্ষেত্রেও দু'টি সুরত রয়েছে। যাকে জাকাত দেওয়া হয়েছে সে জাকাতের ক্ষেত্র এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় কিংবা ক্ষেত্র না হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয়। জাকাতের ক্ষেত্র না হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হলে প্রদত্ত জাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি পরে প্রকাশ পায় যে, সে দরিদ্র, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর প্রথম সুরতে অর্থাৎ, জাকাতের ক্ষেত্র মনে করে জাকাত দেয় আর পরে জানা যায় যে, সে বাস্তবিকভাবেই জাকাতের পাত্র কিংবা কিছুই জানা যায়নি; তাহলে সর্বসম্মতভাবে জাকাত আদায় বলে গণ্য হবে। এটিই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রথম অভিমত। আর তার দ্বিতীয় মত হলো, প্রদত্ত জাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না; পুনরায় জাকাত প্রদান করা আবশ্যক।

وَلَوْ دُفِعَ إِلٰى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهُ عَبْدُهُ اَوْ مُكَاتَبُهُ لَا يُجْزِئُهُ لِانْعِدَامِ التَّمْلِيْكِ لِعَدَمِ اَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ وَهُوَ الرُّكْنُ عَلٰى مَا مَرَّ وَلَا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكٰوةِ إِلٰى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ اَيِّ مَالٍ كَانَ لِاَنَّ الْغِنَى الشَّرْعِيَّ مُقَدَّرٌ بِهٖ وَالشَّرْطُ اَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنِ الْحَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَاِنَّمَا النَّمَاءُ شَرْطُ الْوُجُوْبِ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তিকে জাকাত প্রদানের পর জানতে পারে যে, সে তার নিজের গোলাম কিংবা মুকাতাব ছিল, তাহলে প্রদত্ত জাকাত যথেষ্ট হবে না। কেননা এক্ষেত্রে মালিক বানানো অনুপস্থিত। [কারণ] তাদের মধ্যে মালিকানার যোগ্যতা নেই, অথচ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মালিক বানানো হলো জাকাত আদায়ের রুকন। যে ব্যক্তি যে কোনো মালের নিসাব পরিমাণের মালিক হবে, তাকে জাকাত প্রদান করা জায়েজ নেই। কেননা শরিয়তের পরিভাষায় মালদার হওয়া নিসাব দ্বারাই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শর্ত এই যে, এ নিসাব তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে। সম্পদের বর্ধনশীলতার গুণটি হলো জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি না দেখে কাউকে জাকাত দেওয়ার পর জানতে পারলো যে, যাকে জাকাত দেওয়া হয়েছে সে তার গোলাম কিংবা মুকাতাব। তাহলে প্রদত্ত জাকাত আদায় হবে না। কেননা গোলামের ক্ষেত্রে মালিকানার যোগ্যতা না থাকার কারণে মালিক বানানো সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। অথচ মালিক বানানো জাকাত আদায়ের রুকন। অপরদিকে মুকাতাব নীতিগতভাবে গোলাম। যদিও সে কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন। সুতরাং এক হিসেবে মুকাতাব ও তার মালের মালিক তার মনিব। এ জন্য মুকাতাবকে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে মালিক বানানো পাওয়া যায় বটে, তবে তা অসম্পূর্ণ। অথচ পূর্ণ মালিক বানানো জাকাত আদায়ের রুকন।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণের মালিক হয়, চাই সেটা স্বর্ণ-রৌপ্যের নিসাব হোক, কিংবা পশুর নিসাব হোক অথবা অন্য কোনো আসবাব পত্রের নিসাব হোক; মাল বর্ধনশীল হোক কিংবা না হোক– তাহলে তাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই, তবে শর্ত হলো– এ নিসাব তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে। মৌলিক প্রয়োজন যেমন– সে ঋণগ্রস্ত কিংবা তা ব্যবহার করতে সে মুখাপেক্ষী। যথা– কোনো আলিমের নিকট নিসাব পরিমাণ মূল্যের কিতাবাদি রয়েছে, কিন্তু তিনি সেগুলো দরস ও তাদরীসের কাজে ব্যবহার করেন; তার জন্য জাকাতের অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা তিনি নিসাবের মালিক বটে, তবে তা মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত নয়।

নিসাবের মালিককে জাকাত প্রদান জায়েজ না হওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের বর্ধনশীলতার শর্ত করা হয়নি। কেননা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো সম্পদ বর্ধনশীল হতে হবে। জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ না হওয়ার জন্য এ শর্ত নয়। এ কারণেই যদি কেউ নিসাব পরিমাণ অবর্ধনশীল সম্পদের মালিক হয়, তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না বটে, তবে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সে মালদার বলে বিবেচিত হওয়ার কারণে তার জন্য জাকাত নেওয়া জায়েজ নেই।

وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا اِلَى مَنْ يَمْلِكُ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا لِاَنَّهُ فَقِيْرٌ وَالْفُقَرَاءُ هُمُ الْمَصَارِفُ وَلِاَنَّ حَقِيْقَةَ الْحَاجَةِ لَا يُوْقَفُ عَلَيْهَا فَاُدِيْرَ الْحُكْمُ عَلٰى دَلِيْلِهَا وَهُوَ فَقْدُ النِّصَابِ .

অনুবাদ : নিসাবের কম পরিমাণ মালের অধিকারীকে জাকাত প্রদান করা জায়েজ, যদিও সে সুস্থ ও উপার্জনে সক্ষম হয়ে থাকে। কেননা সে দরিদ্র। আর দরিদ্ররাই হলো জাকাতের ক্ষেত্র। তা ছাড়া যেহেতু প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু প্রয়োজনের প্রমাণের উপর হুকুম আবর্তিত হবে। আর প্রমাণ হলো, নিসাব পরিমাণ মাল না থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : আমাদের মতে, যে ব্যক্তি নিসাবের কম পরিমাণ মালের অধিকারী, তাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ– যদিও সে সুস্থ ও উপার্জনে সক্ষম হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, এমন ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ "ধনী ও সুস্থ-উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য সদকা হালাল নয়।"

আমাদের দলিল হলো– যে ব্যক্তি নিসাবের মালিক নয়, সে শরিয়তের দৃষ্টিতে দরিদ্র বলে গণ্য। সে ধনী বলে ধর্তব্য হয় না। আর দরিদ্ররাই হলো জাকাতের ক্ষেত্র। সুতরাং সে ব্যক্তি যখন শরিয়তের দৃষ্টিতে দরিদ্র বলে বিবেচিত, তখন তাকে জাকাত প্রদান করাও জায়েজ হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, প্রকৃত প্রয়োজন ও দরিদ্রতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এটি একটি গোপন বিষয়। আর মূলনীতি আছে যে, অস্পষ্ট ও গোপন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণকে তার স্থলবর্তী করে প্রমাণের উপর হুকুম আবর্তিত হয়। যেমন– বীর্য স্খলিত হওয়ার দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়। কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করল, কিন্তু বীর্য স্খলিত হলো না, তাহলে সেক্ষেত্রে গুপ্তাঙ্গের মিলনকে বীর্যস্খলনের স্থলবর্তী করে গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। যেমন কেউ স্বীয় স্ত্রীকে বললো– اِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِيْ فَاَنْتِ طَالِقٌ "যদি তুমি আমাকে ভালোবাস তাহলে তুমি তালাক।" -এর উত্তরে যদি স্ত্রী বলে– اُحِبُّكَ [আমি তোমাকে ভালোবাসি] তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কেননা ভালোবাসা একটি গোপন বিষয়। সুতরাং তার উক্তি– اُحِبُّكَ -কে স্থলবর্তী করে তার উপর হুকুম আবর্তিত হবে। তদ্রূপ প্রয়োজন ও দরিদ্রতা একটি গোপন বিষয়। তবে তার প্রমাণ তথা নিসাবের মালিক না হওয়া একটি প্রকাশ্য বিষয়। এজন্য নিসাবের মালিক না হওয়াকে প্রয়োজনের স্থলবর্তী করে বলা হবে যে, যে ব্যক্তি নিসাবের মালিক নয়, সে দরিদ্র। আর দরিদ্রকে জাকাত দেওয়া জায়েজ। সুতরাং তাকেও জাকাত দেওয়া জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পক্ষ থেকে দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হাদীসের উত্তরে বলা হয় যে, বর্ণিত হাদীসে যাচনা করা নিষিদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুস্থ ও উপার্জনে সক্ষম, তার জন্য জাকাত ও সদকা কামনা করা হালাল নয়। তার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসখানা দলিল–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَاتِ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلَانِ يَسْاَلَانِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا وَرَاٰهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُ لَا حَقَّ لَكُمَا فِيْهِ وَاِنْ شِئْتُمَا اَعْطَيْتُكُمَا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা সদকা বণ্টন করছিলেন। দু'জন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সদকা চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে তাকালেন এবং তাদেরকে সামর্থ্যবান দেখলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এতে তোমাদের কোনো অধিকার নেই। তবে তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে দেব।

এর মর্মার্থ হলো সদকা চাওয়ার অধিকার তাদের নেই। অবশ্য তাদেরকে জাকাত দিলে তা জায়েজ বলে গণ্য হবে। কেননা যদি তাদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ না হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কেন বলেছিলেন–

اِنْ شِئْتُمَا اَعْطَيْتُكُمَا .

وَيُكْرَهُ اَنْ يُدْفَعَ اِلَى وَاحِدٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا وَاِنْ دُفِعَ جَازَ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يَجُوْزُ لِاَنَّ الْغِنَاءَ قَارَنَ الْاَدَاءَ فَحَصَلَ الْاَدَاءُ اِلَى الْغَنِيِّ وَلَنَا اَنَّ الْغِنَاءَ حُكْمُ الْاَدَاءِ فَيَتَعَقَّبُهُ لٰكِنَّهُ يُكْرَهُ لِقُرْبِ الْغِنٰى مِنْهُ كَمَنْ صَلّٰى وَبِقُرْبِهٖ نَجَاسَةٌ قَالَ وَاَنْ يُغْنِيَ بِهَا اِنْسَانًا اَحَبُّ اِلَيَّ مَعْنَاهُ الْاِغْنَاءُ عَنِ السُّوَالِ لِاَنَّ الْاِغْنَاءَ مُطْلَقًا مَكْرُوْهٌ ـ

অনুবাদ : এক ব্যক্তিকে দু'শ দিরহাম বা তার বেশি প্রদান করা মাকরূহ। তবে যদি প্রদান করে তবে জায়েজ হবে। ইমাম জুফার (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কেননা তার সচ্ছলতা জাকাত প্রদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং ধনী ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া হয়ে গেল। আমাদের দলিল হলো, ধনী হওয়া জাকাত প্রদানের ফল। সুতরাং তা জাকাত প্রদানের পরেই সাব্যস্ত হবে। তবে সচ্ছলতাটা জাকাত আদায়ের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তা মাকরূহ হবে। যেমন– কেউ নাজাসাতের পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লো। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জাকাত প্রদান করে এক ব্যক্তিকে সচ্ছল করে দেওয়া আমার নিকট পছন্দনীয়। অর্থাৎ যাচনা ও সওয়াল করার প্রয়োজন থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়া। কেননা একেবারে ধনী করে দেওয়া মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো ব্যক্তিকে দু'শ দিরহাম কিংবা তার বেশি জাকাত প্রদান করা মাকরূহ। তবে শর্ত হলো তার কোনো পরিবার-পরিজন থাকবে না; কিংবা সে ঋণগ্রস্ত না। সুতরাং সে ব্যক্তির যদি পরিবার-পরিজন থাকে। আর তাকে এ পরিমাণ সম্পদ জাকাত হিসেবে দেওয়া হয় যে, সে তা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করলে দু'শ দিরহামের কম হয়, তাহলে তা কারাহাত [মাকরূহ] ব্যতীতই জায়েজ। তদ্রূপ সে ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত হয়। আর তাকে যদি এ পরিমাণ অর্থ জাকাত হিসেবে দেওয়া হয় যে, ঋণ পরিশোধের পর তা দু'শ দিরহামের কম হয়, তাহলে তা কারাহাত [মাকরূহ] ছাড়াই জায়েজ। মোট কথা জাকাত হিসেবে কাউকে দু'শ দিরহাম প্রদান করা মাকরূহ। তবে যদি প্রদান করে, তাহলে কারাহাতের [মাকরূহের] সাথে জায়েজ হবে।

ইমাম জুফার (র.) বলেন, দু'শ দিরহাম পরিমাণ মাল কাউকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। তাঁর দলিল হলো, যখন কোনো দরিদ্রকে দু'শ দিরহাম পরিমাণ অর্থ জাকাত দেওয়া হয়, তখন সে ধনী হয়ে যায়। কাজেই সচ্ছলতা জাকাত প্রদানের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কেননা সচ্ছলতার কারণ (عِلَّتْ) হলো, জাকাত প্রদান। আর কারণ (عِلَّتْ) مَعْلُوْل [পরিণাম বা পরিণতি]-এর সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং যেহেতু সচ্ছলতা জাকাত প্রদানের সাথে যুক্ত সেহেতু বিষয়টি এরূপ হয়ে গেল যে, জাকাত ধনী ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়েছে। আর ধনী ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। অতএব কাউকে দু'শ দিরহাম পরিমাণ জাকাত দেওয়া জায়েজ হবে না।

আমাদের দলিল হলো, ধনী হওয়া জাকাত প্রদানের ফল। আর কোনো কিছুর ফল বিষয়টির পরই সাব্যস্ত হয়। সুতরাং ধনী হওয়ার বিষয়টিও জাকাত প্রদানের পরে সাব্যস্ত হবে। আর জাকাত প্রদানের পরে যেহেতু ধনী হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু জাকাত দরিদ্রকেই অর্পণ করা হয়েছে; ধনীকে নয়। আর দরিদ্রকে জাকাত দেওয়ার কারণে প্রদত্ত জাকাত আদায় হবে। তবে সচ্ছলতা জাকাত আদায়ের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তা মাকরূহ হবে। যেমন– কেউ নাজাসাতের পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলে নামাজ হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে নাজাসাতের পাশে দাঁড়ানোর কারণে।

মাসআলা : পছন্দনীয় হলো, কাউকে এ পরিমাণ জাকাত দেওয়া যার দ্বারা সে ঐ দিন অন্যের নিকট সওয়াল করা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, একদিন অন্যের নিকট সওয়াল করার প্রয়োজন থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়াই হলো ইবাদতের উদ্দেশ্য। কেননা একেবারে ধনী করে দেওয়া তথা নিসাবের মালিক বানানো মাকরূহ। যেমন–ইত:পূর্বের মাসআলায় বিবৃত হয়েছে।

وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكٰوةِ مِنْ بَلَدٍ إِلٰى بَلَدٍ وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيْقٍ فِيْهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ (رض) وَفِيْهِ رِعَايَةُ حَقِّ الْجِوَارِ إِلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا الْإِنْسَانُ إِلٰى قَرَابَتِهِ أَوْ إِلٰى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الصِّلَةِ أَوْ زِيَادَةِ دَفْعِ الْحَاجَةِ وَلَوْ نُقِلَ إِلٰى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوْهًا لِأَنَّ الْمَصْرَفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِّ ـ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : এক শহর থেকে অন্য শহরে জাকাত স্থানান্তরিত করা মাকরূহ; বরং প্রত্যেক সমাজের সদকা তাদের [দরিদ্রদের] মাঝেই বণ্টন করা হবে। দলিল হলো, আমাদের পূর্ব বর্ণিত হযরত মু'আয (রা.) -এর হাদীস। তা ছাড়া এতে প্রতিবেশীর হক রক্ষা হয়। তবে মানুষ তার নিকটাত্মীয়দের কাছে জাকাত পাঠাতে পারে কিংবা এমন জনগোষ্ঠীর কাছে জাকাত পাঠাতে পারে, যাদের প্রয়োজন তার শহরের লোকদের চেয়ে বেশি। কেননা এতে আত্মীয়তার অধিকার সংরক্ষণ করা কিংবা অধিক পরিমাণ প্রয়োজন দূর করার বিষয় রয়েছে। তবে এদের ব্যতীত অন্যদের নিকট স্থানান্তরিত করলেও জাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদিও তা মাকরূহ। কেননা শরিয়তের বিধানে জাকাতের ক্ষেত্র নিঃশর্তভাবে যে কোনো দরিদ্র। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জাকাতের অর্থ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করা মাকরূহ; বরং যে সমাজ থেকে জাকাতের অর্থ উসুল করা হয়, সে সমাজেই তা বণ্টন করা সমীচীন। এর প্রথম দলিল হলো– হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস–

خُذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ إِلٰى فُقَرَائِهِمْ ـ

"যে স্থানের ধনীদের থেকে জাকাত উসুল করা হবে, ঐ স্থানের দরিদ্রদের মাঝে তা বণ্টন করে দেওয়া হবে।"

দ্বিতীয় দলিল হলো : জাকাত স্থানান্তরিত না করার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের হক রক্ষা হয়। আর স্থানান্তরিত করার ফলে তাদের হক বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে অন্য শহরে যদি তার নিকটাত্মীয় থাকে; কিংবা অন্য শহরের লোকদের প্রয়োজন নিজ শহরের লোকদের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে জাকাতের অর্থ স্থানান্তরিত করা কারাহাত ছাড়াই জায়েজ আছে। কেননা অন্য শহরে অবস্থিত নিকটাত্মীয়দেরকে জাকাতের অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে জাকাতের সওয়াব ছাড়াও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা হয়। আর অন্য শহরের লোকদের অধিক প্রয়োজনে জাকাত স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ প্রয়োজন দূর করার বিষয় রয়েছে। আর যার প্রয়োজন বেশি সে জাকাতের অধিক হকদার। অবশ্য এ দুটি কারণ ছাড়া কেউ যদি জাকাতের অর্থ অন্য শহরে স্থানান্তরিত করে তাহলেও তা জায়েজ। যদিও তা মাকরূহ। কেননা কুরআন শরীফে إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ আয়াতে জাকাত বণ্টনের ক্ষেত্র দরিদ্রদেরকে নি:শর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা দরিদ্র কিংবা অন্য কোনো স্থানের দরিদ্র– এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

পরিচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর

সদকাতুল ফিতর ও জাকাতের মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। উভয়টি আর্থিক ইবাদত, তবে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। আর জাকাত হলো ফরজ– এজন্য জাকাতের তুলনায় সদকাতুল ফিতর এক স্তর নিম্নে অবস্থিত। আর এ কারণেই জাকাতের বিধান আলোচনার পর সদকাতুল ফিতরের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা বাস্তবিক ক্রমবিন্যাসের চাহিদাও এটাই। কারণ, সদকাতুল ফিতরের মধ্যে ফিতর হলো সদকার জন্য শর্ত। আর অস্তিত্বের দিক থেকে ফিতর রমজানের রোজার শেষে অবস্থিত। এজন্য সদকাও রমজানের রোজার শেষে হবে। সুতরাং অস্তিত্বের ক্রমবিন্যাসের দিকে লক্ষ রেখে 'মবসূত' গ্রন্থে রোজার অধ্যায়ের পর সদকাতুল ফিতরের আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের গ্রন্থগুলোতে সদকাতুল ফিতরকে বিভিন্ন শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে– [১] সদকাতুল ফিতর [২] জাকাতুল ফিতর [৩] জাকাতু রামাজান [৪] জাকাতুস সাওম [৫] সদকাতুস সাওম [৬] সদকাতু রামাজান [৭] সদকাতুর রুউস ও [৮] জাকাতুল আবদান।

صَدَقَةٌ অর্থ– এমন দান যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশা করা হয়।

صَدَقَةٌ নামকরণের কারণ হলো– যেহেতু এর দ্বারা সওয়াব অর্জনের প্রতি আকর্ষণের সত্যতা প্রকাশ পায়। যেমন– صِدَاقٌ [মহর] দ্বারা স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের আকর্ষণের সত্যতা প্রকাশ পায়। (عِنَايَة)। আর فِطْرٌ শব্দটি فِطْرَتٌ মূলধাতু থেকে গৃহীত। অর্থ সত্তা, প্রকৃতি। কেননা সদকা প্রতিটি সত্তার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। এমনকি ঈদের চাঁদ উদিত হওয়ার রাত্রে সুবেহ সাদেকের পূর্বে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার পক্ষ থেকেও সদকা দেওয়া হয়। আর শরিয়তের পরিভাষায় সদকাতুল ফিতর এমন সদকাকে বলা হয় যা ইবাদত হিসেবে এবং দয়াপরবশতার বন্ধন হিসেবে দেওয়া হয়। জ্ঞাতব্য, জাকাতের পূর্বে সদকাতুল ফিতরের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন– হযরত ইবনে হাজর আসকালানী (র.) নাসায়ী ও ইবনে মাজার সূত্রে হযরত কায়স ইবনে সা'দি ইবনে উবাদাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন–

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةُ . (اَلْحَدِيْثُ)

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জাকাতের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সদকাতুল ফিতরের নির্দেশ দিয়েছেন।

সদকাতুল ফিতর প্রবর্তিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে সুনানে আবূ দাউদ ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِىَ زَكٰوةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .

অর্থ–হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন, যা রোজাদারদেরকে অনর্থক ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্রকারী এবং মিসকিনদের জন্য খাদ্যসামগ্রী। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে তা আদায় করল, সেক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় সদকারূপে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের পরে আদায় করল সেক্ষেত্রে তা সাধারণ সদকাগুলোর একটি বলে গণ্য হবে।

قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِيْدِهِ أَمَّا وُجُوْبُهَا فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ خُطْبَتِهِ أَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ رَوَاهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ صُعَيْرٍ الْعَدَوِيُّ وَبِمِثْلِهِ يَثْبُتُ الْوُجُوْبُ لِعَدَمِ الْقَطْعِ وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ لِتَحَقُّقِ التَّمْلِيْكِ وَالْإِسْلَامِ لِيَقَعَ قُرْبَةً وَالْيَسَارِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) فِيْ قَوْلِهِ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى قُوْتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَقُدِّرَ الْيَسَارُ بِنِصَابٍ لِتَقَدُّرِ الْغِنَاءِ فِي الشَّرْعِ بِهِ فَاضِلًا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْمُسْتَحَقُّ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ كَالْمَعْدُوْمِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النُّمُوُّ وَيَتَعَلَّقُ بِهٰذَا النِّصَابِ حِرْمَانُ الصَّدَقَةِ وَوُجُوْبُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْفِطْرِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব স্বাধীন মুসলমানের উপর, যখন সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় এবং তা তার বাসস্থান, বস্ত্র, ব্যবহারিক সামগ্রী, ঘোড়া, অস্ত্র ও দাস-দাসীদের থেকে অতিরিক্ত হয়। ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুতবায় বলেছেন– أَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ "প্রত্যেক ছোট-বড় স্বাধীন ও দাস ব্যক্তির পক্ষ হতে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' যব আদায় করো।" ছা'লাবা ইবনে সু'আইর আল-আ'দাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এ ধরনের হাদীস দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়– অকাট্য প্রমাণ না থাকার কারণে। আর স্বাধীনতার শর্তারোপ করা হয়েছে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। আর ইসলামের শর্ত আরোপ করা হয়েছে যেন কাজটি ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। সচ্ছলতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى "ধনী ছাড়া সদকা আরোপিত হয় না।" এ হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। তাঁর বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের একদিনের আহার সামগ্রীর অতিরিক্ত মালের অধিকারী হবে, তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। আর সচ্ছলতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে নিসাব দ্বারা। কেননা শরিয়তে নিসাব দ্বারাই সচ্ছলতা সাব্যস্ত হয়– যা উপরিউক্ত জিনিসগুলো থেকে অতিরিক্ত থাকে। কেননা সেগুলো মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। আর মৌলিক প্রয়োজনে আবদ্ধ জিনিসকে অস্তিত্বহীন ধরে নেওয়া হয়। নিসাবে বর্ধনশীলতার শর্ত নেই। আর এই নিসাবের সঙ্গে সদকা গ্রহণে অযোগ্যতা এবং কুরবানি ও সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। অর্থাৎ তা এমন দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যা অকাট্য নয়। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে সদকাতুল ফিতর ফরজ। ইমাম মালিক (র.) থেকে সুন্নত হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে। সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে– [১] স্বাধীন হওয়া। [২] মুসলমান হওয়া [৩] নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া–

চাই তা বর্ধনশীল হোক বা না হোক। অবশ্য মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে। যেমন– থাকার বাসস্থান, পরিধানের বস্ত্র, ব্যবহারিক সামগ্রী, আরোহণের ঘোড়া, ব্যবহারিক অস্ত্র এবং খিদমতের দাস-দাসী থেকে অতিরিক্ত হতে হবে। যেমন– কারো দুটি বাড়ি রয়েছে। একটিতে সে বসবাস করে। আরেকটিতে সে বসবাস করে না। এই দ্বিতীয় বাড়িটি সে ভাড়া দিয়ে থাকুক বা না থাকুক– তার সচ্ছলতার ক্ষেত্রে এর মূল্য ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ বাড়িটির মূল্য দশ দিরহাম পরিমাণ হলে তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।

সদকাতুল ফিতর ফরজ হওয়ার ব্যাপারে তিন ইমাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। হাদীসটি হলো–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْكَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ ـ (كِفَايَة)

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রত্যেক স্বাধীন ও দাস; স্ত্রী ও পুরুষ; ছোট ও বড় সকলের উপর ফরজ করেছেন।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুতবায় বলেছেন–

اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ ـ

অর্থ– প্রত্যেক স্বাধীন ও ছোট বা বড় দাস ব্যক্তির পক্ষ হতে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' যব আদায় করো।

এ হাদীসে 'ছোট বা বড়' দাসের গুণ; স্বাধীন ও দাস উভয়ের গুণ-নয়। কেননা দাস ছোট বা বড় উভয়ের পক্ষ থেকে মনিবের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়। কিন্তু বড় আজাদ সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় না; শুধু নাবালক সন্তানের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়।

আর ছা'লাবা ইবনে সু'আয়র আল-আদাবীর বর্ণিত হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। যা ধারণামূলক দলিল; অকাট্য দলিল নয়। এ ধরনের হাদীস দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়, ফরজ সাব্যস্ত হয় না। এজন্যই আমরা বলি, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে 'ফরজ' দ্বারা পারিভাষিক ফরজ উদ্দেশ্য নয় যে, তা অস্বীকারকারী কাফির হবে; বরং 'ফরজ' দ্বারা উদ্দেশ্য 'নির্দেশ' যা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়; ফরজ নয়।

সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বাধীনতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে এজন্য যে, জাকাতের ন্যায় সদকাতুল ফিতর আদায় করার জন্যও রুকন হলো অন্যকে মালিক বানানো। আর দাস যেহেতু আপন সত্তারই মালিক নয়, সেহেতু সম্পদের মালিক হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর নিজেই যখন কোনো সম্পদের মালিক নয়, তখন অন্যকে মালিক বানাবে কিভাবে? এ জন্যই দাসের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়; বরং তার পক্ষ থেকে মনিবের উপর ওয়াজিব হয়।

আর মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে এ কারণে যে, সদকাতুল ফিতর একটি ইবাদত। আর কাফির থেকে কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং সদকাতুল ফিতর আদায়ের জন্য মুসলমান হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় শর্ত– নিসাবের মালিক হওয়া। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.) সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নিসাব নির্ধারণ করেননি; বরং যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের একদিনের আহার সামগ্রীর অতিরিক্ত মালের অধিকারী হবে, তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।

এ ক্ষেত্রে তাঁদের দলিল হলো, হাদীসের ভাণ্ডারের কোথাও সদকাতুল ফিতরের জন্য নিসাব বর্ণনা করা হয়নি। এজন্য একদিনের আহার সামগ্রীর অতিরিক্ত মালের অধিকারীও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কারো নিকট যদি একদিনের আহার সামগ্রী থাকে, তাহলে তার উপর উক্ত তিন ইমামের মতেও সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে বৈপরীত্ব পূর্ণ বিষয় লাজিম আসে। আজ সদকাতুল ফিতর হিসেবে সে তা দান করল, আবার আগামীকাল অন্যের নিকট সওয়াল করতে সে বাধ্য হবে।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا صَدَقَةَ اِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى 'ধনী ছাড়া [কারো উপর] সদকা আরোপিত হয় না।' হাদীসে ظَهْر শব্দটি زَائِد [অতিরিক্ত]। আর শরিয়তে ধনী বলা হয়, যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী তাকে এ থেকে বুঝা যায় যে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ধনী হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় দলিল হলো, অনেক হাদীসে সদকাতুল ফিতরকে 'জাকাতুল ফিতর' শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন তিরমিযী শরীফে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে–

كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ـ اَلْحَدِيْثُ ـ

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ হাদীসে সদকাতুল ফিতরকে জাকাতুল ফিতর শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এক হাদীসে এসেছে–

قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ـ اَلْحَدِيْثُ

এ হাদীসেও সদকাতুল ফিতরকে জাকাতুল ফিতর শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু কুরআন শরীফেও এমনটি করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ـ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক তাফসীর বিশারদ صَلٰوة দ্বারা ঈদের নামাজ বুঝিয়েছেন। আর تَزَكّٰى দ্বারা সদকাতুল ফিতর ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং সদকাতুল ফিতরকে যখন 'জাকাত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে তখন জাকাতের যে নিসাব, তা-ই সদকাতুল ফিতরের নিসাব বলে গণ্য হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সচ্ছলতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে নিসাব দ্বারা। অর্থাৎ সচ্ছল সেই, যে নিসাবের মালিক। কেননা শরিয়তে নিসাব দ্বারাই সচ্ছলতা সাব্যস্ত হয়। তবে উপরিউক্ত জিনিসগুলো তথা মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা নিসাব যদি মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ হয়, তাহলে তা অস্তিত্বহীন বলে গণ্য করা হয়। যেমন– সফরের অবস্থায় কারো নিকট খাবারের পানি ছাড়া অন্য কোনো পানি না থাকলে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে ঐ পানি নেই বলে ধরে নেওয়া হবে এবং তার জন্য তায়াম্মুম জায়েজ হবে। তদ্রূপ মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে সচ্ছল হওয়ার ক্ষেত্রে তা অস্তিত্বহীন বলে গণ্য হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নিসাবে বর্ধনশীলতার শর্ত নেই। সুতরাং কেউ যদি নিসাব পরিমাণ অবর্ধনশীল মালের মালিক হয়, তাহলে তারও উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। কেননা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য قُدْرَة مُمَكِّنَة শর্ত; قُدْرَة مُيَسِّرَة শর্ত নয়। আর বর্ধনশীল হওয়ার দ্বারা সহজসাধ্যতার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। সুতরাং 'জাকাত' যা قُدْرَة مُيَسِّرَة দ্বারা ওয়াজিব হয়, তার জন্য বর্ধনশীলতার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর সদকাতুল ফিতর যা قُدْرَة مُمَكِّنَة দ্বারা ওয়াজিব হয়, তার জন্য বর্ধনশীলতার শর্তারোপ করা হয়নি। এর বিশদ বিবরণ উসূলে ফিকহ-এর গ্রন্থগুলোতে দ্রষ্টব্য।

'নিসাব' তিন প্রকার– [১.] যার মধ্যে বর্ধনশীলতার শর্ত রয়েছে। এ নিসাবের সঙ্গে জাকাত এবং অর্থ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান সম্পৃক্ত। [২.] এমন নিসাব যার সঙ্গে চার ধরনের হুকুম সংশ্লিষ্ট– [ক] সদকা গ্রহণের অযোগ্যতা, [খ] কুরবানি ওয়াজিব হওয়া [গ] সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া [ঘ] পরিবার–পরিজনের ব্যয়ভার। এ ধরনের নিসাবের ক্ষেত্রে বর্ধনশীলতা, ব্যবসা ও বর্ষপূর্তির শর্ত নেই। [৩.] এমন নিসাব যার কারণে সওয়াল করা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়। আর তা হলো, কারো নিকট একদিনের আহার সামগ্রী থাকলে। কেউ কেউ বলেন, পঞ্চাশ দিরহামের মালিক হলে তার জন্য অন্যের কাছে সওয়াল করা হারাম।

قَالَ يُخْرِجُ ذٰلِكَ عَنْ نَفْسِهٖ لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى اَلْحَدِيْثُ وَيُخْرِجُ عَنْ اَوْلَادِهِ الصِّغَارِ لِاَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يَمُوْنُهٗ وَيَلِيْ عَلَيْهِ لِاَنَّهَا تُضَافُ اِلَيْهِ يُقَالُ زَكٰوةُ الرَّأْسِ وَهِيَ اَمَارَةُ السَّبَبِيَّةِ وَالْاِضَافَةُ اِلَى الْفِطْرِ بِاعْتِبَارِ اَنَّهٗ وَقْتُهَا وَلِهٰذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الرَّأْسِ مَعَ اِتِّحَادِ الْيَوْمِ وَالْاَصْلُ فِي الْوُجُوْبِ رَأْسُهٗ وَهُوَ يَمُوْنُهٗ وَيَلِيْ عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهٖ مَا هُوَ فِيْ مَعْنَاهُ كَاَوْلَادِهِ الصِّغَارِ لِاَنَّهٗ يَمُوْنُهُمْ وَيَلِيْ عَلَيْهِمْ وَمَمَالِيْكِهٖ لِقِيَامِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَايَةِ وَهٰذَا اِذَا كَانُوْا لِلْخِدْمَةِ وَلَا مَالَ لِلصِّغَارِ فَاِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يُؤَدّٰى مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) لِاَنَّ الشَّرْعَ اَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ فَاَشْبَهَ النَّفَقَةَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সদকাতুল ফিতর নিজের পক্ষ থেকে আদায় করবে। কেননা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে- قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى "রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রী ও পুরুষের উপর সদকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন।" আর নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে আদায় করবে। কেননা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো- সে সব ব্যক্তি যার, সে ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করে। কেননা সদকা ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় এবং বলা হয়- زَكٰوةُ الرَّأْسِ "ব্যক্তির জাকাত।" আর সম্বন্ধই হলো সবব বা কারণ হওয়ার আলামত। তবে ফিতরের দিকে সম্বন্ধ করা হয় এ হিসেবে যে, তা হলো সদকাতুল ফিতরের সময়। এ কারণেই দিন একটি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি বিভিন্ন হওয়ার কারণে সদকাতুল ফিতর বিভিন্ন হয়ে থাকে। তবে সদকা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো তার নিজ সত্তা। কেননা সে নিজের সত্তার ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করে। সুতরাং তার সঙ্গে যুক্ত তারা, যারা তার পর্যায়ভুক্ত। যেমন- তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা। কেননা সে-ই তাদের প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ করে থাকে। আর নিজ গোলামদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করবে। কেননা এদের ক্ষেত্রেও ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন বিদ্যমান রয়েছে। এ বিধান তখনই হবে, যখন তারা খিদমতের জন্য হয় এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের যখন নিজস্ব সম্পদ না থাকে। আর যদি তাদের মাল থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে তাদের মাল থেকেই ফিতরা আদায় করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা শরিয়ত এটাকে আর্থিক দায়দায়িত্বের পর্যায়ভুক্ত করেছে। সুতরাং তা ভরণ-পোষণের সদৃশ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারীর উপর ওয়াজিব হলো নিজের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা। এর দলিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস। সম্পূর্ণ হাদীসটি হলো-

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ .

অর্থ- রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রী ও পুরুষ, স্বাধীন ও দাসের উপর এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' যব ফরজ করেছেন।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করবে। দলিল হচ্ছে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো- এমন ব্যক্তি যার ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন সে করে। আর এ কারণেই

সদকাতুল ফিতরকে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলা হয়– زَكٰوةُ الرَّأْسِ "ব্যক্তির জাকাত।" এর কোনো কিছুর দিকে সম্বন্ধই হলো কারণ হওয়ার আলামত। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সবব ব্যক্তিসত্তা।

কিন্তু প্রশ্ন হয়, ঈদুল ফিতরের দিকে সম্বন্ধ করে সদকাতুল ফিতর বলা হয়। তাহলে এর মর্মার্থ হবে– ফিতরও সদকা ওয়াজিব হওয়ার কারণ; অথচ বিষয়টি এমন নয়। এর উত্তরে বলা হয় যে, ঈদুল ফিতরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে এ হিসেবে যে, ঈদুল ফিতর সদকাতুল ফিতরের সময়। আর এ কারণেই ব্যক্তি বিভিন্ন হওয়ার ভিত্তিতে সদকাতুল ফিতর বিভিন্ন হয়ে থাকে। অথচ ঈদুল ফিতরের দিন একটিই। সুতরাং ব্যক্তিই হলো সদকা ওয়াজিব হওয়ার কারণ বা সবব। আর কারণ বা سَبَبٌ বিভিন্ন হওয়ার কারণে مُسَبَّبٌ-ও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তবে প্রশ্ন হয়– ব্যক্তিই যদি সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়, তাহলে এক ব্যক্তির উপর সারা জীবনে একবারই সদকা ওয়াজিব হওয়া উচিত। কেননা সমগ্র জীবনে ব্যক্তি তো একজনই থাকে। সুতরাং প্রতি বছর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া উচিত নয়। অথচ প্রতি বছরই তা ওয়াজিব হয়। এর উত্তরে বলা হয় যে, নিছক ব্যক্তিসত্তা সদকা ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়; বরং ভরণ-পোষণের বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত। আর ভরণ-পোষণ সময়ের সাথে আবর্তিত হয়। সুতরাং ভরণ-পোষণের গুণটি বারবার আবর্তিত হওয়ার কারণে ব্যক্তিসত্তাও বিধানগতভাবে বার বার আবর্তিত হয়। আর এ কারণেই সদকাতুল ফিতর প্রতি বছরই ওয়াজিব হয়।

যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সবব যদি ব্যক্তিসত্তা হয়, তাহলে শুধু নিসাবের মালিকের উপর সদকা ওয়াজিব হওয়া চাই; তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও অধীনস্ত দাস-দাসীদের পক্ষ থেকে সদকা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। এর জবাব হলো– সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো নিসাবের মালিকের নিজ সত্তা। কেননা নিজের সত্তার সে প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ করে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, সদকা ওয়াজিব হওয়ার সবব নিজ সত্তার ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন। আর যে স্থলে ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন পাওয়া যাবে তা সচ্ছল ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হবে। যেমন– অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ পিতাই করে থাকে; এ কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সদকাতুল ফিতর পিতার উপর ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো পিতাকে নিসাবের মালিক হতে হবে।

মাসআলা : গোলাম, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের সদকা মনিবের উপর ওয়াজিব। এর দলিল হলো– মনিব এদের ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করে থাকে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, গোলামদের পক্ষ থেকে ফিতরা তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তারা খিদমতের জন্য হয়। কেননা ব্যবসার জন্য হলে জাকাত ওয়াজিব হয়; সদকাতুল ফিতর নয়। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ফিতরা পিতার উপর তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তাদের নিজস্ব সম্পদ না থাকে। আর যদি তাদের মাল থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, তাদের মাল থেকেই ফিতরা আদায় করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের মাল থেকে সদকা আদায় করবে না; বরং পিতা তার মাল থেকেই আদায় করবে। এমনকি, পিতা যদি তাদের মাল থেকে সদকা আদায় করে, তাহলে পিতা সে মালের জামিন হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো– শরিয়তে সদকাতুল ফিতর জাকাতের পর্যায়ভুক্ত। যেমন– মালের জাকাত। আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হয় না। সুতরাং তাদের সম্পদে সদকাতুল ফিতরও ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো সদকাতুল ফিতর একটি ইবাদত। অথচ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইবাদতের যোগ্য নয়। এ কারণে তাদের সম্পদেও সদকা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো– শরিয়তে সদকাতুল ফিতর আর্থিক দায়দায়িত্বের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, ব্যক্তির উপর অন্যের পক্ষ থেকে সদকা ওয়াজিব করা হয়েছে। সুতরাং তা ভরণ-পোষণের সদৃশ হলো। আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মাল থাকলে– তার ভরণ-পোষণ সে মাল থেকেই ওয়াজিব হয়। তদ্রূপ সদকাতুল ফিতরও তার মাল থেকেই ওয়াজিব হবে তবে শর্ত হলো, তার মাল থাকতে হবে।

وَلَا يُؤَدِّى عَنْ زَوْجَتِهٖ لِقُصُوْرِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فَإِنَّهٗ لَا يَلِيْهَا فِىْ غَيْرِ حُقُوْقِ النِّكَاحِ وَلَا يَمُوْنُهَا فِىْ غَيْرِ الرَّوَاتِبِ كَالْمُدَاوَاةِ وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَإِنْ كَانُوْا فِىْ عِيَالِهٖ لِاِنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ وَلَوْ أَدّٰى عَنْهُمْ أَوْ عَنْ زَوْجَتِهٖ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ أَجْزَأَهُمْ اِسْتِحْسَانًا لِثُبُوْتِ الْإِذْنِ عَادَةً ـ

অনুবাদ : আর তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে না। অভিভাবকত্ব ও আর্থিক দায়িত্ব অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে। কেননা বিবাহ সম্পর্কিত হকসমূহ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সে তার অভিভাবকত্বের অধিকারী নয় এবং নির্ধারিত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সে তার আর্থিক দায় বহন করে না। যেমন– ঔষধপত্রের ব্যয়। এবং তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে না, যদিও তারা তার পরিবারভুক্ত। কেননা তাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব নেই। তবে তাদের পক্ষ থেকে কিংবা তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের সম্মতি ছাড়া যদি সে আদায় করে দেয়, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। কেননা তাদের সম্মতি থাকাটাই স্বাভাবিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : সচ্ছল স্বামীর উপর স্বীয় স্ত্রীর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়। কেননা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অভিভাবকত্ব ও আর্থিক দায় অসম্পূর্ণ। অভিভাবকত্ব অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, বিবাহ সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর অভিভাবকত্বের অধিকারী নয়; বরং শুধুমাত্র বিবাহ সম্পর্কিত হকসমূহে সে তার অভিভাবকত্বের অধিকারী। সুতরাং স্ত্রীর উপর স্বামীর অভিভাবকত্ব অসম্পূর্ণ। আর আর্থিক দায় অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর দায়ভার বহন করে। যেমন– খাদ্য, ভরণ-পোষণ ও আবাসস্থল। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বামীর উপর স্ত্রীর দায়ভার ওয়াজিব নয়। যেমন স্ত্রী অসুস্থ হলে তার ঔষধপত্রের ব্যয় স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং অভিতাবকত্ব ও আর্থিক দায়িত্ব অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে স্বামীর উপর স্ত্রীর পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে না। কেননা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় পূর্ণ অভিভাবকত্ব ও আর্থিক দায়ভারের কারণে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে স্ত্রীর সদকাতুল ফিতর স্বামীর উপর ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, أَدُّوْا عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ "তোমরা যার আর্থিক ব্যয়ভার বহন কর, তার পক্ষ থেকে সদকা আদায় করো।" আর স্বামী যেহেতু স্ত্রীর আর্থিক দায়তার বহন করে, সেহেতু স্বামীর উপর তার সদকা ওয়াজিব হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয় যে, হাদীসে নিঃশর্তভাবে আর্থিক দায়ভারের কথা বলা হয়েছে। আর নিঃশর্ততা পূর্ণতাকে বুঝায়। অথচ স্বামীর উপর স্ত্রীর আর্থিক দায়ভার পূর্ণ নয়; বরং অসম্পূর্ণ; তাই স্ত্রীর সদকা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা : পিতার উপর প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সদকা ওয়াজিব নয়। যদিও সে তার পরিবারভুক্ত হয়। কেননা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের উপর পিতার কোনো অভিভাবকত্ব নেই। তবে পিতা যদি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পক্ষ থেকে কিংবা স্বামী স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের সম্মতি ছাড়াই আদায় করে, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস মোতাবেক সদকা আদায় হয়ে যাবে। কেননা অনুমতি থাকাটাই স্বাভাবিক। আর স্বাভাবিকভাবে যা সাব্যস্ত হয়, তা নস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার মতোই।

وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهٖ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلَا الْمُكَاتَبُ عَنْ نَفْسِهٖ لِفَقْرِهٖ وَفِي الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ وِلَايَةُ الْمَوْلٰى ثَابِتَةٌ فَيُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَمَالِيْكِهٖ لِلتِّجَارَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِنَّ عِنْدَهٗ وُجُوْبُهَا عَلَى الْعَبْدِ وَ وُجُوْبُ الزَّكٰوةِ عَلَى الْمَوْلٰى فَلَا تُنَافِيْهِ وَعِنْدَنَا وُجُوْبُهَا عَلَى الْمَوْلٰى بِسَبَبِهٖ كَالزَّكٰوةِ فَيُؤَدِّيْ اِلَى الثِّنٰى .

অনুবাদ : আর আপন মুকাতাবের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে না। অভিভাবকত্ব বিদ্যমান না থাকার কারণে। আর মুকাতাব নিজেও তার পক্ষ থেকে আদায় করবে না। কেননা সে দরিদ্র। মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের উপর মনিবের অভিভাবকত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তাই সে তাদের পক্ষ থেকে সদকা আদায় করবে। আর ব্যবসায়ের গোলামদের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় গোলামের উপর। আর জাকাত ওয়াজিব হয় মনিবের উপর। সুতরাং একটি অপরটির প্রতিবন্ধক হবে না। আমাদের মতে জাকাতের মতো গোলামের সদকাতুল ফিতরও মনিবের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। যাতে তার উপর দুটি ওয়াজিব আরোপিভ হয়ে যায় [যা শরিয়ত বিধি বহির্ভূভ]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুকাতাবের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মনিবের উপর ওয়াজিব নয়। কেননা মুকাতাব কার্যক্ষেত্রে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ার কারণে তার উপর মনিবের পরিপূর্ণ অভিভাবকত্ব নেই। অথচ সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো পূর্ণ অভিভাবকত্ব। আর মুকাতাব-এর নিজের পক্ষ থেকেও সদকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা বদলে কেতাবত [দায়বদ্ধ অর্থ] আদায় করতে সে দায়বদ্ধ। এজন্য তার অর্জিত মাল মনিবেরই। সুতরাং সে দরিদ্র। আর দরিদ্রের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় না বলে মুকাতাবের জন্যও তার নিজের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে না। তবে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ উভয়ের উপর মনিবের পূর্ণ অভিভাবকত্ব বিদ্যমান রয়েছে এবং তাদের দায়ভারও মনিব বহন করে বলে তাদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মনিবের উপর ওয়াজিব হবে।

ব্যবসার জন্য দাস-দাসীদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মনিবের উপর ওয়াজিব হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সদকাতুল ফিতর দাস-দাসীদের উপর ওয়াজিব হয়। যদিও তাদের পক্ষ থেকে মনিব আদায় করে। আর তাদের জাকাত ওয়াজিব হয় মনিবের উপর। সুতরাং সদকাতুল ফিতর এবং জাকাত পৃথক দুটি পাত্রে সাব্যস্ত তথা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় গোলামের উপর আর জাকাত ওয়াজিব হয় মনিবের উপর। সুতরাং এ দুটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্ব নেই বলে উভয়টি একত্র হতে পারে।

আমাদের মতে জাকাতের মতো গোলামের সদকাতুল ফিতর মনিবের উপর ওয়াজিব। সুতরাং ব্যবসার গোলামের সদকাও যদি মনিবের উপর ওয়াজিব করা হয়, তাহলে একই বছরে তার উপর দুটি আর্থিক ফরজ আরোপিত হয়ে যায়– একটি সদকাতুল ফিতর হিসেবে, অপরটি জাকাত হিসেবে। আর তা জায়েজ নেই। যেমন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا ثِنٰى فِي الصَّدَقَةِ এখানে ছা বর্ণটি যেরযুক্ত ও আলিফ মাকসূরা যোগে। অর্থাৎ বছরে দু'বার সদকা আরোপিত হয় না।

وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلٰى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِقُصُوْرِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِىْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَذَا الْعَبِيْدُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا عَلٰى كُلِّ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ مِنَ الرُّؤُسِ دُوْنَ الْاَشْقَاصِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهُ لَا يَرٰى قِسْمَةَ الرَّقِيْقِ وَهُمَا يَرَيَانِهَا وَقِيْلَ هُوَ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِيْبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ تَتِمُّ الرَّقَبَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ـ

অনুবাদ : একটি গোলাম দু'জন মনিবের মাঝে শরিক হলে কারো উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। কেননা তাদের প্রত্যেকের অভিভাবকত্ব ও ভরণ-পোষণ অসম্পূর্ণ। তদ্রূপ দু'জনের মাঝে বহু গোলাম শরিকানায় থাকলেও। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, প্রত্যেকের অংশে যে ক'জন আসবে, প্রত্যেকের উপর সেগুলোর ফিতরা ওয়াজিব হবে; ভগ্নাংশটির উপর নয়। মতানৈক্যের ভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) গোলামদের ভাগের প্রতি লক্ষ করেন না। আর সাহেবাইন (র.) ভাগের প্রতি লক্ষ করেন। কেউ কেউ বলেন, এটা সর্বসম্মত মাজহাব। কেননা ভাগ করার পূর্বে অংশ একত্র হয় না। সুতরাং দু'জনের কারোরই কোনো গোলামের উপর মালিকানা পূর্ণ হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি একটি গোলাম দু'জন মনিবের মাঝে শরিক হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তাদের কারো উপর তার সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। কেননা তাদের প্রত্যেকের অভিভাবকত্ব ও ভরণ-পোষণ অসম্পূর্ণ। সুতরাং সবব না পাওয়ার কারণে সদকাতুল ফিতরও ওয়াজিব হবে না।

আর যদি দু'জনের শরিকানায় একাধিক গোলাম থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাদের কারো উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। আর সাহেবাইনের মতে, প্রত্যেক শরিকের অংশে যে ক'জন আসবে, প্রত্যেকের উপর সেগুলার সদকা ওয়াজিব হবে। আর কোনো ভগ্নাংশ থাকলে তার উপর সদকা আসবে না। যেমন– দু'জনের শরিকানায় পাঁচজন গোলাম রয়েছে। তাহলে প্রত্যেকের অংশ পূর্ণ দু'জন ও অর্ধেক করে ভাগে পড়ে। সুতরাং প্রত্যেক শরিকের উপর দু'জন করে গোলামের সদকা ওয়াজিব হবে। আর অবশিষ্ট অর্ধাংশের উপর কারো সদকা ওয়াজিব হবে না।

এ মতানৈক্যের ভিত্তি হলো, ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে গোলামদের মাঝে ভাগ-বণ্টন জায়েজ নেই। আর সাহেবাইনের মতে তা জায়েজ। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রত্যেক শরিকই প্রতিটি গোলামের অংশীদার। ফলে তাদের কেউই পূর্ণ গোলামের মালিক হবে না। আর তাই, কোনো শরিকেরই পূর্ণ অভিভাকত্ব ও পূর্ণ ভরণ-পোষণ সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং কারো উপরই সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে, যেহেতু গোলামদের মাঝে ভাগ-বণ্টন জায়েজ, সেহেতু প্রত্যেক শরিকই একটি করে পূর্ণ গোলামের মালিক হবে। সুতরাং প্রত্যেকের ভাগে যতটি পূর্ণ গোলাম হবে, তাদের সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। আর কোনো ভগ্নাংশ থাকলে, তার সদকা ওয়াজিব হবে না। পূর্বোক্ত উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

আবার কেউ কেউ বলেন, দু'জনের শরিকানায় একাধিক গোলাম থাকলে কারো উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব না হওয়া সর্বসম্মত। কেননা বণ্টনের পূর্বে অংশ একত্র হয় না। সুতরাং দু'জনের কারোরই কোনো গোলামের উপর মালিকানা পূর্ণ হবে না। আর তাই সদকাতুল ফিতরও ওয়াজিব হবে না।

وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوْسِيٍّ اَلْحَدِيْثُ وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلٰى مِنْ أَهْلِهِ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح) لِأَنَّ الْوُجُوْبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَلَا وُجُوْبَ بِالْإِتِّفَاقِ ـ

অনুবাদ : মুসলমান তার কাফির গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে। আমাদের পূর্ব বর্ণিত নিঃশর্ত হাদীসের কারণে। তা ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন – أَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوْسِيٍّ ـ (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيْ) "প্রত্যেক স্বাধীন ও দাসের পক্ষ থেকে [ফিতরা] আদায় করো; সে দাস ইহুদি হোক কিংবা খ্রিস্টান হোক অথবা অগ্নিপূজক হোক। তা ছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, সদকাতুল ফিতরের সবব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর মনিবও ফিতরা আরোপের যোগ্য। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তাঁর মতে ফিতরা ওয়াজিব হয় গোলামের উপর। আর সে ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য নয়। যদি বিষয়টি বিপরীত হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ফিতরা ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : নিসাবের অধিকারী কোনো মুসলমান যদি কাফির গোলামের মালিক হয়, তাহলে তার উপর কাফির গোলামের পক্ষ থেকে মুসলমান মনিব সদকা আদায় করবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত এটিই।

আমাদের দলিল এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লিখিত ছা'লাবা ইবনে সু'আইর (র.)-এর বর্ণিত হাদীস– أَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ـ اَلْحَدِيْثُ এ হাদীসটি মুতলাক তথা নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুসলমান গোলাম ও কাফির গোলাম উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয় দলিল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) দারাকুত্বনী (دَارَ قُطْنِيْ) সূত্রে নিম্নোক্তভাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَدُّوْا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوْكٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ ـ

আর তৃতীয় দলিল হলো, এক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সবব পাওয়া গেছে। কেননা কাফির গোলামের উপর মুসলমান মনিবের পূর্ণ অভিভাবকত্ব ও ভরণ-পোষণ রয়েছে। আর মনিব ফিতরা আরোপের যোগ্য। যদিও গোলাম কাফির হওয়ার কারণে ফিতরা আরোপের যোগ্য নয়। সুতরাং সবব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই কাফির গোলামের পক্ষ থেকে মুসলমান মনিবের উপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর গোলামের উপর ওয়াজিব হয়, যদিও মনিব তা আদায় করে। আর কাফির গোলাম সদকাতুল ফিতরের মতো ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য নয়। এজন্য কাফির গোলামের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। আর যদি মাসআলাটি বিপরীত হয়, অর্থাৎ গোলাম মুসলমান আর মনিব কাফির হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। আমাদের নিকট ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো, মনিব কাফির হওয়ায় সে সদকা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য নয়; আবার আদায়েরও যোগ্য নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যদিও গোলামের উপর ফিতরা ওয়াজিব, কিন্তু মনিবকে তা আদায় করতে হয়। আর মনিব কাফির হওয়ার কারণে সে ইবাদতের যোগ্য নয়। যে কারণেই এ ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না।

قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَ اَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلٰى مَنْ يَصِيْرُ لَهُ مَعْنَاهُ اَنَّهُ إِذَا مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقٍ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) عَلٰى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لِاَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) عَلٰى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ لِاَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِهِ كَالنَّفَقَةِ وَلَنَا اَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوْفٌ لِاَنَّهُ لَوْ رَدَّ يَعُوْدُ اِلٰى مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ اُجِيْزَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِىْ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ فَيَتَوَقَّفُ مَا يَبْتَنِىْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِاَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوَقُّفَ وَزَكٰوةُ التِّجَارَةِ عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ একটি গোলাম বিক্রি করে আর তা উভয়ের মাঝে একজনের ইচ্ছাধীন থাকে, তাহলে গোলাম অবশেষে যার হবে, ফিতরা তার উপরই ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি ইচ্ছাধীন থাকা অবস্থায় ঈদুল ফিতরের দিন অতিবাহিত হয়। ইমাম জুফার (র.) বলেন, যার অনুকূলে এখতিয়ার থাকবে, তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা, তারই অধিকারভুক্ত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মালিকানা যার জন্য সাব্যস্ত তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা এটা মালিকানার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। যেমন– ভরণ-পোষণের ব্যাপার। আমাদের যুক্তি এই যে, এমতাবস্থায় মালিকানা স্থগিত থাকে। কেননা যদি ক্রেতা ফিরিয়ে দেয় তবে তা বিক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে বিক্রয় যদি বহাল রাখে, তবে চুক্তির সময় হতেই মালিকানা বিক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মালিকানার উপর যে জিনিসের ভিত্তি সেটাও স্থগিত থাকবে। ভরণ-পোষণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে আরোপিত, যা স্থগিত রাখা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ের জাকাত সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ স্বীয় গোলাম বিক্রি করে এবং ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার যে কোনো একজনের এখতিয়ার থাকে, তাহলে গোলাম অবশেষে যার হবে, সদকাতুল ফিতর তার উপরই ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ বিক্রি সম্পন্ন হলে ক্রেতার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। আর বিক্রি ভেঙ্গে গেলে বিক্রেতার উপরই তা ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হলো এখতিয়ার বাকি থাকা অবস্থায় ঈদুল ফিতরের দিন অতিবাহিত হলে সদকাতুল ফিতর তার উপরেই ওয়াজিব হবে, যার গোলাম হবে। অর্থাৎ বিক্রয় সংঘটিত হলে ক্রেতা আদায় করবে, অন্যথায় বিক্রেতার উপর তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ গোলাম খিদমতের জন্য; আর ক্রেতাও খিদমতের জন্য তা ক্রয় করে। কেননা ব্যবসার গোলামে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় না।

ইমাম জুফার (র.)-এর অভিমত এই যে, যার অনুকূলে এখতিয়ার থাকবে, তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো পূর্ণ অভিভাবকত্ব। আর যার অনুকূলে এখতিয়ার থাকবে, পূর্ণ অভিভাবকত্ব তার দখলে থাকবে। কারণ, সে যদি বিক্রি বাস্তবায়ন করে, তাহলে তা সম্পন্ন হয়ে যাবে অন্যথায় বিক্রি ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং যার অনুকূলে এখতিয়ার আছে, তার অভিভাবকত্ব পূর্ণ থাকার কারণে ফিতরা তার উপরই ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাজহাব হলো– মালিকানা যার জন্য সাব্যস্ত, তার উপরই সেই গোলামের ফিতরা ওয়াজিব হবে। আর মালিকানা সাব্যস্ত হয় ক্রেতার জন্য। কেননা তাঁর মতে এখতিয়ার ক্রেতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হতে প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং তাঁর মতে গোলামের সদকাতুল ফিতর ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে, এখতিয়ার যে কারোরই হোক না কেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো– সদকাতুল ফিতর মালিকানা সম্পর্কিত বিষয়। তাই মালিকের উপরই তা ওয়াজিব হবে। আর এখতিয়ারের ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হয়। যেমনটা তার মাজহাব; এজন্য ফিতরা ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। যেমন– এখতিয়ারকালীন গোলামের ভরণ-পোষণ ক্রেতার উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে।

আমাদের দলিল এই যে, সদকাতুল ফিতর মালিকানা সম্পর্কিত বিষয়–এ কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মালিকানা স্থগিত থাকে। কেননা যার অনুকূলে এখতিয়ার থাকে, সে যদি ফিরিয়ে দেয় তবে তা বিক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসবে। আর যদি বিক্রয় বহাল রাখে, তাহলে চুক্তির সময় হতেই মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আর মূলনীতি আছে যে, স্থগিত কোনো জিনিসের উপর যদি অন্য কোনো জিনিসের ভিত্তি হয়, তাহলে সেটাও স্থগিত থাকবে। সুতরাং স্থগিত মালিকানা যার জন্য সাব্যস্ত হবে, সদকাতুল ফিতরও তার উপর ওয়াজিব হবে। ভরণ-পোষণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ভরণপোষণ যদিও মালিকানার ভিত্তিতে সাব্যস্ত, তবে তা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে আরোপিত। এজন্য এ ক্ষেত্রে স্থগিত গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তাৎক্ষণিকভাবে ভরণ-পোষণের ফয়সালা করা আবশ্যক। কিন্তু সদকাতুল ফিতরের বিষয়টি এমন নয়। তা দু' চার দিন বিলম্ব করেও আদায় করা যায়। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে সদকাতুল ফিতরকে ভরণ-পোষণের উপর কিয়াস করা সিদ্ধ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ব্যবসার গোলামের জাকাতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। যেমন– কেউ ব্যবসার গোলামকে এখতিয়ারের শর্তে বিক্রি করে দিলো আর এ সময়ে বছরও পূর্ণ হলো, তাহলে আমাদের মতে যে গোলামের মালিক হবে, তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। ইমাম জুফার (র.)-এর মতে যার অনুকূলে এখতিয়ার থাকবে, তার উপরই ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সে সময় মালিকানা যার জন্য সাব্যস্ত [অর্থাৎ ক্রেতা] তার উপরই জাকাত ওয়াজিব হবে। [আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত]।

فَصْلٌ فِىْ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ : اَلْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ دَقِيْقٍ اَوْ سَوِيْقٍ اَوْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ وَقَالَا اَلزَّبِيْبُ بِمَنْزِلَةِ الشَّعِيْرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَالْاَوَّلُ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ مِنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ صَاعٌ لِحَدِيْثِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ ذَالِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفِيْهِمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الزِّيَادَةِ تَطَوُّعًا وَلَهُمَا فِى الزَّبِيْبِ اَنَّهُ وَالتَّمْرُ يَتَقَارَبَانِ فِى الْمَقْصُوْدِ وَلَهٗ اَنَّهٗ وَالْبُرُّ يَتَقَارَبَانِ فِى الْمَعْنٰى لِاَنَّهٗ يُؤْكَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيْعِ اَجْزَائِهٖ وَيُلْقٰى مِنَ التَّمْرِ النَّوَاةُ وَمِنَ الشَّعِيْرِ النُّخَالَةُ وَبِهٰذَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبُرِّ وَالتَّمْرِ وَمُرَادُهٗ مِنَ الدَّقِيْقِ وَالسَّوِيْقِ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْبُرِّ اَمَّا دَقِيْقُ الشَّعِيْرِ كَالشَّعِيْرِ وَالْاَوْلٰى اَنْ يُرَاعٰى فِيْهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيْمَةُ اِحْتِيَاطًا وَاِنْ نُصَّ عَلَى الدَّقِيْقِ فِىْ بَعْضِ الْاَخْبَارِ وَلَمْ يُبَيَّنْ ذَالِكَ فِى الْكِتَابِ اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ وَالْخُبْزُ يُعْتَبَرُ فِيْهِ الْقِيْمَةُ هُوَ الصَّحِيْحُ ثُمَّ يُعْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَزْنًا فِيْمَا يُرْوٰى عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهٗ يُعْتَبَرُ كَيْلًا وَالدَّقِيْقُ اَوْلٰى مِنَ الْبُرِّ وَالدَّرَاهِمُ اَوْلٰى مِنَ الدَّقِيْقِ فِيْمَا يُرْوٰى عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْفَقِيْهِ اَبِىْ جَعْفَرٍ لِاَنَّهٗ اَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَاَعْجَلُ بِهٖ وَعَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الْاَعْمَشِ تَفْضِيْلُ الْحِنْطَةِ لِاَنَّهٗ اَبْعَدُ مِنَ الْخِلَافِ اِذْ فِى الدَّقِيْقِ وَالْقِيْمَةِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رح) .

অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ ও সময়

অনুবাদ : ফিতরার পরিমাণ হলো অর্ধ সা' গম, বা আটা বা ছাতু বা কিশমিশ অথবা এক সা' খেজুর বা যব। সাহেবাইন বলেন, কিশমিশ যবের পর্যায়ভুক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এ অভিমত বর্ণিত আছে। প্রথম মতটি 'জামেউস সগীর' কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উল্লিখিত সবকটি জিনিসের ক্ষেত্রেই এক সা' ওয়াজিব হবে। কেননা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন- كُنَّا نُخْرِجُ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে এ পরিমাণ আদায় করতাম।" আর আমাদের দলিল হলো- [ছা'লাবা (র.) -এর বর্ণিত হাদীস] যা ইত:পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর এটা একদল সাহাবীরও মাজহাব- যাদের মাঝে খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-ও রয়েছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা নফলরূপে অতিরিক্ত দানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর কিশমিশ সম্পর্কে সাহেবাইনের বক্তব্য এই যে, কিশমিশ ও খেজুর উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে নিকটবর্তী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, কিশমিশ ও গম গুণগত দিক থেকে নিকটবর্তী। কেননা উভয়টি সর্বাংশে ভক্ষণ করা হয়। অথচ খেজুরের বিচি আর যবের খোসা ফেলে দিতে হয়। এখান থেকে গম

ও খেজুরের মানের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আটা ও ছাতুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গমের আটা ও ছাতু। যবের ছাতু যবেরই শ্রেণীভুক্ত। তবে সতর্কতার খাতিরে উভয়ের মধ্যে পরিমাণ ও মূল্য বিবেচনা করা উত্তম। যদিও কোনো কোনো বর্ণনায় আটা কথাটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ অবস্থার উপর বিবেচনা করে 'জামেউস সগীর' গ্রন্থে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি। রুটির ক্ষেত্রে মূল্য বিবেচ্য হবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অর্ধ-সা' গম পাল্লার ওজনে বিবেচনা করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা মতে, পাত্রের মাপ ধর্তব্য হবে গমের চেয়ে আটা এবং আটার চেয়ে দিরহাম দ্বারা আদায় করা উত্তম। এ হলো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত মত। ফকীহ আবূ জা'ফর এ মতই গ্রহণ করেছেন। কেননা এটা প্রয়োজন অধিক বিদূরিতকারী ও তা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। ইমাম আবূ বকর আল-আ'মাশ থেকে গমকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা এটা মতভেদ থেকে অধিক দূরবর্তী। কারণ, আটা ও মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিভিন্ন মত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এতক্ষণ পর্যন্ত সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়া, তার শর্তাবলি, কার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব, কার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব– এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে কোন কোন জিনিস দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় হয় এবং তার পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণের ক্ষেত্রে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গম, আটা, ছাতু বা কিশমিশ দ্বারা ফিতরা আদায় করলে তার পরিমাণ হবে অর্ধ-সা'। আর খেজুর বা যব দিয়ে আদায় করলে তার পরিমাণ হবে এক সা'। সাহেবাইনের মাজহাবও অনুরূপ। তবে পার্থক্য এটুকু যে, তাদের মতে কিশমিশ যবের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ যবের মতো কিশমিশও এক সা' পরিমাণ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রা.) থেকেও এ মত বর্ণিত আছে। প্রথম মতটি অর্থাৎ কিশমিশ অর্ধ সা' ওয়াজিব হয় জামেউস সগীরের বর্ণনা অনুযায়ী। কিন্তু এর উপর ফতোয়া নয়।

সাহেবাইনের মতের স্বপক্ষে হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে–

قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعَ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ اَقِطٍ اَوْ زَبِيْبٍ . (اَلْحَدِيْثُ)

এ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় কিশমিশ এক সা' পরিমাণ আদায় করা হতো।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, সদকায়ে ফিতরে উল্লিখিত সবক'টি জিনিসের ক্ষেত্রেই এক সা' ওয়াজিব হবে। এমনকি যব ও অন্যান্যগুলোর ন্যায় গমও এক সা' ওয়াজিব হবে। তাঁদের দলিল হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস, যা ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন– এভাবে যে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রা.) একদা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.)-এর নিকট চিঠি লিখলেন, সদকায়ে ফিতরের বিধান কি? হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) উত্তরে বলেছিলেন–

كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ .

অর্থ– আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক সা' খাদ্যসামগ্রী (গম), কিংবা এক সা' যব, কিংবা এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' কিশমিশ অথবা এক সা' পনির সদকায়ে ফিতর হিসেবে আদায় করতাম। এ হাদীসে খাদ্যসামগ্রী দ্বারা তিন ইমাম গম বুঝিয়েছেন।

আমাদের দলিল এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হাদীস–

اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ .

এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্ধ সা' গম ওয়াজিব হবে। তা ছাড়া তিরমিযী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসটিও হানাফী মাজহাবের দৃঢ়তা প্রকাশ করে–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ اِلَّا اَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ اَوْ سِوَاهُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার রাজপথে এক আহ্বানকারীকে পাঠালেন যে, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, স্বাধীন-দাস, ছোট-বড় সকলের উপর দুই মুদ্দ গম কিংবা তা ছাড়া অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে এক সা' করে। এক সা' হলো চার মুদ্দ পরিমাণ। সুতরাং দুই মুদ্দ হলো, অর্ধ-সা'। সুতরাং এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, গম অর্ধ সা' ওয়াজিব। অধিকন্তু বুখারী শরীফে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)-এর একটি বর্ণনায় এসেছে– كُنَّا نُؤَدِّيْ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় সদকাতুল ফিতর হিসেবে দুই মুদ্দ গম আদায় করতাম। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা একদল সাহাবায়ে কেরামের মাজহাবও বটে যাঁদের মাঝে খোলাফায়ে রাশেদীনও রয়েছেন যে, গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' ওয়াজিব হয়; এক সা' নয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর হাদীসের জবাবে আমরা বলি, এক সা' গমের মধ্যে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) অর্ধ সা' ওয়াজিব হিসেবে আদায় করতেন। আর বাকি অর্ধ–সা' নফলরূপে আদায় করতেন। সতর্কতার ভিত্তিতে তিনি এমনটি করতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে সহজলভ্য খাদ্যসামগ্রী দ্বারা এক সা' আদায় করা হতো। আর গম সহজলভ্য হলে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সতর্কতাবশত এক সা' আদায় করতেন।

দ্বিতীয় জবাব হলো, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে যে طَعَامٌ শব্দ এসেছে, আমাদের নিকট তার অর্থ গম নয়; বরং জোয়ার, বাজরা কিংবা অন্য কোনো শস্য উদ্দেশ্য। গম বুঝাতে طَعَامٌ শব্দের ব্যবহার শুরু হয় গমের প্রচলন যখন বেড়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় পরবর্তী সময়ের মতো লোকজনের সাধারণ খাদ্য গম ছিল না এবং সে সময়ে طَعَامٌ বলতে জোয়ার, বাজরা ও অন্যান্য শস্য বুঝানো হতো। যেমন– এ হাদীসটিই আবূ ওমর হাফস ইবনে মুয়াসসারা সূত্রে নিম্নোক্তভাবে এসেছে– قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ (رض) وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْاَقِطُ وَالتَّمْرُ

অর্থ– আবূ সাঈদ খুদরী (র.) বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল জোয়ার, কিশমিশ, পনির ও খেজুর।

এ অংশ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময়ের সাধারণ খাদ্য গম ছিল না। অধিকন্তু হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন– لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيْبَ وَالشَّعِيْرَ وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় طَعَامٌ শব্দের ব্যবহার গম ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্যের উপর প্রয়োগ হতো। কেননা সে সময়ে গমের প্রচলন তেমন ছিল না। মোদ্দা কথা, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে طَعَامٌ দ্বারা গম উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সদকায়ে ফিতররূপে গম এক সা' পরিমাণ হওয়ার দলিল হিসেবে বর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করা যথার্থ নয়।

আর কিশমিশ খেজুরের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো, কিশমিশ ও খেজুর উদ্দেশ্যের [স্বাদ ও মিষ্টতা অর্জনের] দিক থেকে নিকটবর্তী। এজন্য ফিতরা আদায়ের ক্ষেত্রেও উভয়ের একই হুকুম হবে। অর্থাৎ কিশমিশ ও খেজুর এক সা' করে ওয়াজিব হবে। ইত:পূর্বে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে وَصَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কিশমিশ ও গম গুণগত দিক থেকে নিকটবর্তী। কেননা উভয়ের প্রত্যেকটি সর্বাংশ ভক্ষণ করা হয়। অথচ খেজুরের বিচি ও যবের খোসা ফেলে দিতে হয়। আর তাই কিশমিশকে গমের উপর কিয়াস করা সঙ্গত; খেজুর কিংবা যবের উপর কিয়াস করা সঙ্গত নয়। এ আলোচনা থেকে গম ও খেজুরের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ খেজুরের কিছু অংশ তথা বিচি ফেলে দিতে হয় আর গমের সর্বাংশ ভক্ষণ করা হয়। সে জন্য গম অর্ধ সা' ও খেজুর এক সা' নির্ধারণ করা হয়েছে।

وَمُرَادُهُ الخ থেকে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মতনে উল্লিখিত اَوْ دَقِيْقٍ اَوْ سَوِيْقٍ দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, সাধারণত আটা ও ছাতু অর্ধ সা' করে ওয়াজিব। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং গমের আটা ও ছাতু অর্ধ সা' ওয়াজিব হয় আর যবের আটা যবেরই হুকুমে হবে অর্থাৎ যবে যেরূপ এক সা' ওয়াজিব হয়, যবের আটায়ও তদ্রূপ এক সা' পরিমাণ ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সতর্কতাবশত আটা ও ছাতুর মধ্যে পরিমাণ ও মূল্য বিবেচনা করা উত্তম। যেমন– কেউ ফিতরা হিসেবে অর্ধ সা' গমের আটা সদকা করল। আর এই অর্ধ সা' আটার মূল্য অর্ধ সা' গমের সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়ে বেশি। তাহলে সে ব্যক্তি সতর্কতার উপর আমল করেছে বলে গণ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে অর্ধ সা' পরিমাণ ও অর্ধ-সা' গমের মূল্য উভয়টিই পাওয়া গেছে। আর যদি সে গমের আটা অর্ধ সা'র কম পরিমাণ সদকা করে, তবে তার মূল্য অর্ধ সা' গমের সমপরিমাণ অথবা

গমের আটা অর্ধেক সা' সদকা করেছে বটে, কিন্তু তার মূল্য অর্ধ সা' গমের চেয়ে কম, তাহলে সে ব্যক্তি সতর্কতার উপর আমলকারী বলে গণ্য হবে না। কেননা প্রথম সুরতে মূল্যের বিবেচনা করা হয়েছে; কিন্তু পরিমাণ [অর্ধ সা'] পাওয়া যায়নি। আর দ্বিতীয় সুরতে পরিমাণের বিবেচনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু মূল্যের বিবেচনা করা হয়নি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদিও কোনো কোনো বর্ণনায় 'আটা' কথাটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَدُّوْا قَبْلَ خُرُوْجِكُمْ زَكٰوةَ فِطْرِكُمْ فَإِنَّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ دَقِيْقٍ.

অর্থ–রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইদগাহে বের হওয়ার পূর্বে নিজেদের ফিতরা আদায় করো। কেননা প্রত্যেক মুসলমানের উপর দুই মুদ্দ [অর্ধ সা'] গম কিংবা আটা ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে যবের আটা সম্পর্কেও হাদীসে এসেছে। যেমন– হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (র.) থেকে দারাকুত্বনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ دَقِيْقٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ.

উক্ত হাদীসে دَقِيْق দ্বারা যবের আটা উদ্দেশ্য। আর سُلْت অর্থ–যব কিংবা খোসা ছাড়া যব। এসব বর্ণনায় যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, গমের আটা অর্ধ সা' এবং যবের আটা এক সা' সদকাতুল ফিতর হিসেবে ওয়াজিব হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সতর্কতার খাতিরে আটা ও ছাতুর ক্ষেত্রে পরিমাণ ও মূল্য বিবেচনা করা উত্তম। এ সতর্কতার বিষয়টি মতনে উল্লেখ করা হয়নি। কেননা মতনে অধিকাংশ সময়ের বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ সাধারণত অর্ধ সা' গমের আটা, অর্ধ সা' গমের সমপরিমাণ হয়ে থাকে। বরং তা থেকে অতিরিক্তও হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো এর মূল্য কমে যায়। যেমন– গম বপনের সময়ে গমের বীজের মূল্য বেড়ে যায়; আটার মূল্য সস্তা হয়। সুতরাং হিদায়া গ্রন্থকার সতর্কতার উপর আমল করার বিবেচনা করেছেন; আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) "জামেউস সগীর" গ্রন্থে সাধারণ অবস্থার কথা বিবেচনা করেছেন।

বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে রুটির ক্ষেত্রে মূল্য বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ অর্ধ সা' গম কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্যের রুটি সদকায়ে ফিতর হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

অর্ধ সা' কিংবা এক সা'-এর পরিমাপ পাল্লার ওজনে বিবেচনা করা হবে নাকি পাত্রের মাপ ধর্তব্য হবে? এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পাল্লার ওজনে অর্ধ সা' কিংবা এক সা' দেওয়া হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা মতে পাত্রের মাপ বিবেচ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সা' -এর পরিমাণে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন কেউ কউ বলেন– এক সা' হলো আট রিতিল। কেউ কেউ বলেন, পাঁচ রিতিল ও এক রিতিলের এক তৃতীয়াংশ। আর রিতিল কোনো পাত্র নয়; বরং ওজনের যন্ত্র তথা পাল্লা। সুতরাং সর্বসম্মতভাবে সা' এর ক্ষেত্রে পাল্লার ওজন বিবেচ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, হাদীসে সা' শব্দ এসেছে। আর সা' হলো, পাত্র; ওজনের পাল্লা নয়। এজন্য সদকায়ে ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে পাত্রের মাপ ধর্তব্য হবে; পাল্লার ওজন বিবেচ্য হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, গমের চেয়ে আটা পরিশোধ করা উত্তম। কেননা আটা তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগানো যায়। আর মুদ্রার দ্বারা আদায় করা আটার চেয়ে উত্তম। কেননা মুদ্রার দ্বারা সুবিধামতো প্রয়োজন মেটানো যায়। যেমন– খাদ্যদ্রব্য ছাড়া কাপড়-চোপড়, কিংবা ঔষধপত্র ক্রয়েও তা ব্যবহার করা সম্ভব। এ হলো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত অভিমত। ফকীহ আবূ জাফর (র.)-এর পছন্দনীয় মাজহাব এটিই। আর আবূ বকর আল–আ'মাশ থেকে বর্ণিত আছে, গম প্রদান করাই উত্তম। কেননা গম জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই। পক্ষান্তরে আটা কিংবা মূল্যের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সুতরাং বিরোধপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করার তুলনায় সর্বসম্মত বিষয়কে গ্রহণ করাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

قَالَ وَالصَّاعُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِىْ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاعُنَا اَصْغَرُ الصِّيْعَانِ وَلَنَا مَا رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ وَهٰكَذَا كَانَ صَاعُ عُمَرَ (رضـ) وَهُوَ اَصْغَرُ مِنَ الْهَاشِمِيِّ وَكَانُوْا يَسْتَعْمِلُوْنَ الْهَاشِمِيَّ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এক সা'-এর পরিমাণ হচ্ছে আট ইরাকী 'রিতিল'। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পাঁচ 'রিতিল' ও এক রিতিলের এক তৃতীয়াংশ। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও অভিমত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- صَاعُنَا اَصْغَرُ الصِّيْعَانِ "আমাদের সা' হলো সকল সা' -এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম।" আর আমাদের দলিল হলো বর্ণিত হাদীস- اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ "রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুদ্দ' পাত্র দিয়ে অজু করতেন যার পরিমাণ ছিল দুই রিতিল আর গোসল করতেন এক সা' দ্বারা যার পরিমাণ ছিল আট রিতিল। হযরত ওমর (রা.)-এর সা'ও অনুরূপ ছিল। আর তা হাশেমী সা'-এর তুলনায় ছোট। তারা সাধারণত হাশেমী সা'-ই ব্যবহার করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সা'-এর পরিমাণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, সা' তা-ই, যাতে আট ইরাকী 'রিতিল' পরিমাণ গম কিংবা অন্য কিছু ধরে তথা আট ইরাকী 'রিতিল'। আর এক সা' চার 'মুদ্দ' পরিমাণ। এক 'রিতিল' হলো বিশ আস্তার পরিমাণ। আর এক আস্তার সাড়ে ছয় দিরহাম ওজনের সমপরিমাণ। সুতরাং এক 'রিতিল' একশ ত্রিশ দিরহাম ওজনের সমপরিমাণ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এক সা' হলো পাঁচ রিতিল ও এক রিতিলের এক তৃতীয়াংশ। ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.)-এর অভিমত এটিই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো এ হাদীস- صَاعُنَا اَصْغَرُ الصِّيْعَانِ "আমাদের সা' হলো সকল সা' -এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম।" আর প্রকাশ থাকে যে, পাঁচ 'রিতিল' ও এক রিতিলের এক তৃতীয়াংশ আট রিতিলের তুলনায় ক্ষুদ্র। এজন্য আমরা বলি যে, এক সা' হচ্ছে পাঁচ রিতিল ও এক রিতিলের এক তৃতীয়াংশ। অধিকন্তু ইবনে হিব্বান হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রেওয়ায়েত করেন-

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَاعُنَا اَصْغَرُ الصِّيْعَانِ وَمُدُّنَا اَكْبَرُ الْاَمْدَادِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ قَلِيْلِنَا وَكَثِيْرِنَا وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ .

অর্থ- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একবার আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের সা' হলো সকল সা'-এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম এবং আমাদের 'মুদ্দ' সকল মুদ্দ-এর মধ্যে বৃহত্তম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের সা'-এর মধ্যে বরকত দাও, আমাদের কম ও বেশির মধ্যে বরকত দাও এবং আমাদের জন্য একটি বরকতের সাথে দুটি বরকত নির্ধারণ করে দাও।

ইবনে হিব্বান (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা' ক্ষুদ্রতর হওয়াকে অস্বীকার করেননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, মদীনা শরীফের সা' সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সা' ছিল।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) হাসান ইবনে অলীদ কারশীর একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হজ্ব থেকে আমাদের এখানে প্রত্যাগমন করলেন এবং বললেন– আমি তোমাদের সামনে একটি ইলমী বিষয় উন্মুক্ত করতে চাই, যা আমাকে চিন্তাগ্রস্ত করে ফেলেছিল। আমি সে বিষয়ে অনুসন্ধানার্থে মদীনায় গেলাম এবং সা'-এর ব্যাপারে জানতে চাইলাম। লোকজন উত্তরে বলেন, এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সা'। আমি বললাম, এর প্রমাণ কি? তারা উত্তর দিল, আগামী কাল আমরা এর প্রমাণ পেশ করব। প্রত্যুষে আমার নিকট পঞ্চাশ জনের মতো বৃদ্ধ লোক আসলেন যারা আনসার ও মুহাজিরদের সন্তান-সন্ততি ছিলেন। প্রত্যেকের চাদরের নিচে একটি করে সা' ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই পিতা-দাদার বংশ পরম্পরা বর্ণনান্তে বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সা'। আমি দেখলাম সবগুলোই সমপরিমাণ। অতঃপর আমি পরিমাপ করলাম পাঁচ রিতিল ও এক রিতিলের এক তৃতীয়াংশ থেকে কিছু কম। এ দেখে আমি আমার উস্তাদ ইমাম আযম (র.)-এর অভিমত পরিত্যাগ করলাম।

আমাদের দলিল হলো হযরত আনাস ও জাবির (রা.)-এর রেওয়ায়েত–

إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ ـ

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ এক 'মুদ্দ' তথা দুই রিতিল পানি দিয়ে অজু করতেন এবং এক সা' তথা আট রিতিল পানি দিয়ে গোসল করতেন।

আর হযরত ওমর (রা.)-এর সা'-ও অনুরূপ ছিল। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এক সা'-এর পরিমাণ হচ্ছে আট 'রিতিল'। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত রেওয়ায়েত صَاعُنَا اَصْغَرُ الصِّيْعَانِ-এ ক্ষুদ্রতম সা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আট রিতিল বিশিষ্ট সা'। এটা হাশেমী সা' থেকে ছোট। কেননা হাশেমী সা'-এর পরিমাণ ছিল বত্রিশ রিতিল। আর লোকজন ঐ সা' ব্যবহার করতো– যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরাকী সা' [আট রিতিল পরিমাণ] ব্যবহার করতেন। আর তাই হাশেমী সা'-এর বিপরীতে صَاعُنَا اَصْغَرُ الصِّيْعَانِ বলা হয়েছে।

বি: দ্র: তিনটি পদ্ধতির দ্বারা সা'-এর পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়– [১] মিছক্বাল হিসেবে সা'-এর পরিমাণ জানা যায়। এক মিছক্বাল হলো চার মাশা, চার রতি। এ হিসেবে সা'-এর ওজন হয় ৩২৪০ [তিন হাজার দু'শ চল্লিশ] মাশা। অর্থাৎ ২৭০ [দু'শ সত্তর] তোলা। সুতরাং এক সা' হলো ৩ সের ৬ ছটাক পরিমাণ। আর অর্ধ সা' হলো দেড় সের তিন ছটাক পরিমাণ। [২] দিরহাম হিসেবে সা'-এর পরিমাণ জানা যায়। এক দিরহাম হলো তিন মাশা এক রতি ও এক রতির এক পঞ্চমাংশ। এ হিসেব অনুসারে এক সা' হচ্ছে ২৭৩ [দু'শ তিয়াত্তর] তোলা পরিমাণ। আর অর্ধ সা' হলো ১৩৬ [একশ ছত্রিশ] তোলা ৬ [ছয়] মাশা। ইংরেজী সেরের হিসেব অনুযায়ী এক সা' হলো ৩ সের ৬ ছটাক ৩ তোলা সমপরিমাণ। আর আট সা' হলো ১$\frac{১}{২}$ সের ৩ ছটাক ১$\frac{১}{২}$ তোলা সমপরিমাণ। [৩] 'মুদ্দ' হিসেবেও সা' -এর পরিমাণ জানা যায়। এক 'মুদ্দ' হলো ৬৮ তোলা ৩ মাশা। এ হিসেব অনুসারে এক সা' হলো ২৮০ তোলা ৬ মাশা। আর অর্ধ সা' হলো ১৪০ তোলা ৩ মাশা। সুতরাং এক সা' সাড়ে তিনসের ছয় মাশা পরিমাণ এবং অর্ধ সা' পৌনে দু'সের তিন মাশা পরিমাণ। উল্লেখ্য, এক সা' হলো চার 'মুদ্দ' পরিমাণ। –[দরসে তিরমিযী, খণ্ড–২, পৃষ্ঠা– ৪৯৪]

সা' পরিমাপের উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতির যে কোনো একটি দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করা যায়। তবে শেষোক্ত হিসেবটিতে পরিমাণে অধিক হওয়ার কারণে সে অনুযায়ী আদায় করার মধ্যে অধিক সতর্কতা রয়েছে। অর্থাৎ পৌনে দু'সের তিন মাশা গম কিংবা সাড়ে তিনসের ছয় মাশা যব কিংবা অন্য কিছু ফিতরা হিসেবে আদায় করবে।

قَالَ وُجُوْبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ فِى الْيَوْمِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى اَنَّ مَنْ اَسْلَمَ اَوْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ فِطْرَتُهٗ عِنْدَنَا وَعِنْدَهٗ لَا تَجِبُ وَعَلٰى عَكْسِهٖ مَنْ مَاتَ فِيْهَا مِنْ مَمَالِيْكِهٖ اَوْ وَلَدِهٖ لَهٗ اَنَّهٗ يَخْتَصُّ بِالْفِطْرِ وَهٰذَا وَقْتُهٗ وَلَنَا اَنَّ الْاِضَافَةَ لِلْاِخْتِصَاصِ وَاخْتِصَاصُ الْفِطْرِ بِالْيَوْمِ دُوْنَ اللَّيْلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদিত হওয়ার সাথে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রমজানের শেষ দিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ঈদের রাতে ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জন্মগ্রহণ করে, আমাদের মতে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে, কিন্তু তার মতে ওয়াজিব হবে না। আর ঈদের রাত্রে তার যে গোলাম কিংবা সন্তান মারা যাবে তাদের ক্ষেত্রে মতামত হলো বিপরীত। তার যুক্তি এই যে, এটার সম্পর্ক হলো 'ফিতর' তথা রোজা ভঙ্গের সাথে। আর এটা হলো তার সময়। আমাদের দলিল এই যে, ফিতরের সাথে সদকার সম্পর্ক হলো বিশেষত্ব প্রকাশের জন্য। আর ফিতর [রোজা রাখা বা না রাখা] -এর সম্পর্ক হলো দিনের সাথে; রাত্রের সাথে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদিত হওয়ার দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত এটিই। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রমজানের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মোদ্দা কথা হলো শাফেয়ীদের নিকট রমজানের শেষ দিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সদকায়ে ফিতর আদায় করার সময় আরম্ভ হয়ে যায়। আর আমাদের নিকট ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদিত হওয়ার পরেই আরম্ভ হয়। এ মত পার্থক্যের ফলে ঈদের রাতে ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে কোনো কাফির মুসলমান হলে কিংবা কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমাদের মতে তার ফিতরা ওয়াজিব হবে; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে ওয়াজিব হবে না। আর যদি ঈদের রাতে ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে কারো গোলাম মারা গেল কিংবা সন্তান মারা গেল, আমাদের মতে তার ফিতরা ওয়াজিব হবে না। কেননা ফিতরা আদায়ের সময় আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মারা গেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ওয়াজিব হবে। কেননা তাঁর নিকট ফিতরা আদায়ের সময় আরম্ভ হওয়ার পর মারা গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক হলো ফিতর তথা রোজা ভঙ্গের সাথে। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন– فَرَضَ رَسُوْلُ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ [রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরের জাকাত ফরজ করেছেন] ফিতর তথা রোজা ভঙ্গের সময় সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আরম্ভ হয়ে যায়। এ জন্যই বলা হয় যে, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক হলো রমজানের শেষ দিন সূর্যাস্তের সঙ্গে।

আমাদের দলিল হলো, সদকায়ে ফিতরের মধ্যে ফিতরের সাথে সদকার সম্পর্ক হলো বিশেষত্ব প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ সদকা ফিতরের সাথে বিশিষ্ট। আর ফিতর হলো সওমের বিপরীত। আর সওমের সম্পর্ক দিনের সাথে; রাতের সাথে নয়। সুতরাং ফিতরের সম্পর্কও দিনের সাথে হবে; রাতের সাথে নয়। অর্থাৎ ফিতর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিন, যা ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়; সূর্যাস্তের পর থেকে নয়। আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, সদকা ফিতরের সাথে বিশিষ্ট; আর ফিতর-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিন। সুতরাং সদকা দিনের সাথে বিশিষ্ট হবে। আর দিন ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয়। অতএব সদকায়ে ফিতরের ওয়াজিব আদায় ঈদের রাতের ফজর উদিত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسُ الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمُصَلّٰى لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُخْرِجُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِغْنَاءِ كَيْ لَا يَتَشَاغَلَ الْفَقِيْرُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنِ الصَّلٰوةِ وَذٰلِكَ بِالتَّقْدِيْمِ فَإِنْ قَدَّمُوْهَا عَلٰى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ لِأَنَّهُ أَدّٰى بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ فَأَشْبَهَ التَّعْجِيْلَ فِي الزَّكٰوةِ وَلَا تَفْصِيْلَ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ هُوَ الصَّحِيْحُ -

অনুবাদ : ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করতেন। তা ছাড়া যুক্তিসঙ্গত দলিল এই যে, সচ্ছল করে দেওয়ার আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো নামাজ বাদ দিয়ে যেন গরিব লোকটি সওয়াল করতে ব্যস্ত না হয়ে পড়ে। এটা আগে ভাগে আদায় করার মাধ্যমেই সম্ভব। আর যদি ঈদুল ফিতরের আগেই আদায় করে দেয়, তবে জায়েজ হবে। কেননা সবব [রমজান] আগমনের পরেই সে তা আদায় করেছে। সুতরাং আগে ভাগে জাকাত আদায় করার অনুরূপ হবে। আর সময়ের পরিমাণে কোনো তারতম্য নেই। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা মোস্তাহাব। এর দলিল হলো হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস–

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَسِّمُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الْمُصَلّٰى وَيَقُوْلُ أَغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ -

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ঈদের নামাজের পূর্বে সদকা আদায় করতে নির্দেশ দিতেন। আর তিনি ﷺ নিজেও ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকা বণ্টন করে দিতেন এবং আর বলতেন, আজকের দিনে গরিবদেরকে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো থেকে সচ্ছল করে দাও। অর্থাৎ চাওয়া ব্যতীতই নামাজের পূর্বে তাদেরকে সদকা প্রদান কর।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, দরিদ্রদেরকে সচ্ছল করে দেওয়ার আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো তার সওয়াল করার কারণে ঈদের নামাজ যেন বাদ না পড়ে। আর নামাজের আগে ভাগে সদকা আদায় করার মধ্যেই এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এ কারণে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করাকে মোস্তাহাব বলে গণ্য করা হয়েছে।

মাসআলা : কেউ যদি ঈদের দিনের আগেই সদকা আদায় করে দেয়, তাহলে জায়েজ হবে। এর দলিল হলো– সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ [সবব] পাওয়ার পরই সে তা আদায় করেছে। আর সবব হলো ঐ সব ব্যক্তিসত্তা যাদের সে ভরণ-পোষণ বহন করে ও যাদের উপর অভিভাবকত্ব রয়েছে। সুতরাং সবব পাওয়ার পর যখন সে তা আদায় করেছে, তখন তা আদায় বলে গণ্য হবে। বিষয়টি এরূপ হলো, যেমন বর্ষপূর্তির আগেই জাকাত দিলে তা আদায় বলে গণ্য হয়। কেননা সবব তথা নিসাব পাওয়া গেছে। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে এসেছে– وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ - "সাহাবায়ে কেরাম ঈদুল ফিতরের দু' একদিন পূর্বেই ফিতরা দিতেন।" কতটুকু সময় পূর্বে ফিতরা দেওয়া জায়েজ কিংবা নাজায়েজ– এ ব্যাপারে কোনো তারতম্য নেই; বরং সাধারণত আগে ভাগে ফিতরা দেওয়া জায়েজ। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। যদিও হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) আগে ভাগে ফিতরা প্রদান করাকে সম্পূর্ণরূপে না জায়েজ বলেছেন। যেমন– কুরবানির দিনগুলোর পূর্বে কুরবানি করা জায়েজ নেই।

খালফ ইবনে আইয়ুব (র.) বলেন, রমজান শুরু হওয়ার পর ঈদের দিনের পূর্বে যে কোনো সময় ফিতরা আদায় করা জায়েজ। তবে রমজান শুরু হওয়ার পূর্বে আদায় করা জায়েজ নেই। অপরদিকে নূহ ইবনে আবূ মারয়াম (র.) বলেন, রমজানের অর্ধেক অতিবাহিত হলে ফিতরা দেওয়া জায়েজ; এর পূর্বে দেওয়া জায়েজ নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, রমজানের শেষ দশকে দেওয়া জায়েজ। এর পূর্বে দেওয়া জায়েজ নেই।–[ইনায়া]

وَاِنْ اَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اِخْرَاجُهَا لِاَنَّ وَجْهَ الْقُرْبَةِ فِيْهَا مَعْقُوْلٌ فَلَا يَتَقَدَّرُ وَقْتُ الْاَدَاءِ فِيْهَا بِخِلَافِ الْاُضْحِيَّةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : আর যদি ঈদুল ফিতরের দিন আদায় না করে বিলম্বিত করে, তবে ওয়াজিব রহিত হবে না; বরং তা আদায় করতেই হবে। কেননা এটার ইবাদত হওয়ার কারণ যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এ সদকার ক্ষেত্রে আদায় করার সময় সীমাবদ্ধ হবে না। কুরবানির বিষয়টি এর বিপরীত। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি ঈদুল ফিতরের দিন সদকায়ে ফিতর আদায় না করে, এমনকি ঈদের দিন চলে যায়; তাহলে তার জিম্মা থেকে সদকা রহিত হবে না; বরং তার উপর সেটা ওয়াজিবই থেকে যাবে এবং তা আদায় করা তার জন্য আবশ্যক, যত বিলম্বেই হোক।
হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) বলেন, ঈদের দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিতরা রহিত হয়ে যাবে। কেননা তা এমন একটি ইবাদত, যা ঈদুল ফিতরের দিনের সাথে বিশিষ্ট। সুতরাং তা কুরবানির মতো হয়ে গেল। যেরূপ ঈদের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার ফলে কুরবানি রহিত হয়ে যায়, তদ্রূপ ঈদুল ফিতরের দিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে সদকাও রহিত হয়ে যাবে।
আমাদের দলিল এই যে, সদকায়ে ফিতর ইবাদত হওয়ার কারণ যুক্তিসঙ্গত। কেননা তা আর্থিক দান এবং দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণার্থেই তা প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং তা আদায়ের নির্ধারিত কোনো সময় হবে না এবং ওয়াজিব হওয়ার পর জাকাতের ন্যায় আদায় করা ব্যতীত রহিত হবে না। পক্ষান্তরে কুরবানির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে রক্ত প্রবাহিত করাই হলো ইবাদত, যা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন উর্দু কবি বলেন–

ঈদের দিনের বড়ই আজব ঘটনা
হত্যা করে পশু সওয়াব হয় উল্টা।

সুতরাং এ ইবাদত যেহেতু যুক্তির উর্ধ্বে ও কিয়াস পরিপন্থি, সেহেতু তা এ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর হাদীস অনুযায়ী কুরবানি শুধু কুরবানির দিনগুলোতেই হয়ে থাকে। এ কারণে কেউ যদি এ দিনগুলোতে কুরবানি না করে, তাহলে তার জিম্মা থেকে কুরবানি রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য কুরবানির পশু সদকা করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায় : রোজা

পূর্বকথা : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামেউস সগীরের মধ্যে সাওম অধ্যায়কে সালাত অধ্যায়ের পর উল্লেখ করেছেন। কারণ হলো, উভয়টি ইবাদতে বদনিয়া বা শারীরিক ইবাদত। পক্ষান্তরে জাকাত ইবাদতে মালিয়া বা আর্থিক ইবাদত। ইমাম কুদূরী ও হিদায়া গ্রন্থকার (র.) তাঁদের কিতাবদ্বয়ে সালাত অধ্যায়ের পর জাকাত অধ্যায় উল্লেখ করেছেন, যাতে কুরআনে কারীম-এর আয়াত- اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ-এর অনুসরণ হয়ে যায়। صَوْم-এর আভিধানিক অর্থ হলো مُطْلَقًا [সাধারণত] বিরত থাকা। তা যে কোনো জিনিস থেকেই হোক না কেন। যেমন- صَامَ عَنِ الْكَلَامِ-এর অর্থ হলো, কথাবার্তা থেকে বিরত থাকল। শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পানাহার এবং সহবাস থেকে বিরত থাকাকে صَوْم বলা হয়। সাওম বা রোজা কালিমায়ে তাওহীদের পর ইসলামের তৃতীয় রুকন। রমজানের রোজা হিজরতের দ্বিতীয় বছর শাবান মাসে ফরজ হয়। অর্থাৎ হিজরতের আঠার মাস পর শাবান মাসে কেবলা পরিবর্তনের (تَحْوِيْلُ قِبْلَة) পর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে। এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম আশুরা এবং 'আইয়ামে বীয' তথা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখের রোজা রাখতেন। আশুরা ও আইয়ামে বীযের রোজা তখন ফরজ ছিল কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীগণ বলেন, এই রোজাগুলো তখন ফরজ ছিল। শাফেয়ীগণ বলেন, রমজানের রোজার পূর্বে কোনো ধরনের রোজা ফরজ ছিল না; বরং আশুরা ইত্যাদির রোজা পূর্বেও সুন্নত ছিল এবং এখনো সুন্নতই আছে। হানাফীগণের বক্তব্যের সমর্থন আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা পাওয়া যায়। যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার রোজা কাজা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কাজা সাধারণত ফরজ ও ওয়াজিবেরই হয়ে থাকে; সুন্নতের নয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, আশুরার রোজা রমজানের রোজার পূর্বে ফরজ ছিল। হাদীসটির ইবারত হলো-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ اَسْلَمَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لَا قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ يَعْنِىْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ . (اَبُوْدَاوُدَ ج ١ ص ٣٣٢ . بَابٌ فِىْ فَضْلِ صَوْمِهِ)

অর্থ- আব্দুর রহমান ইবনে মাসলামাহ তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আসলাম গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসেছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এই দিনের অর্থাৎ আশুরার দিনের রোজা রেখেছ? তারা বলল, না। তিনি বললেন, যে পরিমাণ দিন অবশিষ্ট আছে তা পুরা করো, অতঃপর তার কাজা আদায় করো। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, এর দ্বারা আশুরার দিন উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, এখানে আশুরার রোজার কাজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কাজা ফরজ আর ওয়াজিবেরই হয়ে থাকে। সুতরাং বুঝা গেল যে, আশুরার রোজা রমজানের রোজার পূর্বে ফরজ ছিল। অধিকন্তু বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড পৃ. ২৬৮ ও ২৬৯ নং পৃষ্ঠার بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ-এর মধ্যে হযরত সালামা বিন আক্ওয়া' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ اَمَرَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ اَنْ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنَّ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ .

অর্থ- রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলাম গোত্রের এক লোককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষের মাঝে ঘোষণা করে দাও, যারা কিছু আহার করেছে তারা [যেন] অবশিষ্ট দিন রোজা রাখে। আর যারা আহার করেনি তারা [যেন] রোজার নিয়ত করে। কেননা, এই দিনটি হলো আশুরার দিন।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই গুরুত্ব এবং আমরের সীগাহ্ فَلْيَصُمْ দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, আশুরার রোজা ফরজ ছিল। এমনিভাবে মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, ৩৬০ নং পৃষ্ঠার بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ-এর মধ্যে হযরত রবী' বিনতে মু'আওয়ায ইবনে আফরা সূত্রে বর্ণিত আছে–

قَالَتْ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ اِلٰى قُرَى الْاَنْصَارِ الَّتِىْ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ مَنْ كَانَ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهٖ فَكُنَّا بَعْدَ ذٰلِكَ نَصُوْمُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

অর্থ– রবী' বিনতে মু'আওয়ায ইবনে আফরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন প্রভাতে মদীনার আশপাশে আনসারদের বস্তির নিকটে একজন দূত [এ ই'লান করার জন্য] পাঠিয়েছিলেন যে, যারা রোজা অবস্থায় সকাল করেছে তারা নিজেদের রোজা পূর্ণ করবে। আর যারা রোজা না রেখে সকাল করেছে তারা অবশিষ্ট দিন পুরা করবে। রবী' বলেন, এরপর আমরা নিজেরাও আশুরার রোজা রাখতাম এবং ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রাখার জন্য বলতাম। এমনিভাবে বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড, ২৬৮ নং পৃষ্ঠার بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ-এর মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهٖ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

অর্থ– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আশুরার দিন তো এমন ছিল যার মধ্যে বর্বরতার যুগে কুরাইশ লোকেরা রোজা রাখত। ঐ দিন জাহিলিয়া যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও রোজা রাখতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করলেন তখন আশুরার দিনে রোজা রাখলেন এবং লোকদেরকেও ঐ দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো তখন আশুরার দিনকে ছেড়ে দেওয়া হলো, যার মনে চাইত সে আশুরার দিনে রোজা রাখত আর যার মনে না চাইত সে ঐ দিন রোজা রাখত না।

উপরিউক্ত হাদীসগুলো রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোজা ফরজ থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। আবূ দাউদ শরীফ ১ম খণ্ড, ৩৩২ নং পৃষ্ঠার بَابٌ فِىْ صَوْمِ الثَّلٰثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ-এ কথার মধ্যে ইবনে মালিহান কায়সী তার পিতা কাতাদাহ সূত্রে বর্ণনা করেন–

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلٰثَ عَشَرَةَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْأَةِ الدَّهْرِ.

অর্থ– ইবনে মালিহান-এর পিতা কাতাদাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আইয়ামে বীযের রোজা রাখতে– অর্থাৎ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা রাখতে। তিনি বলতেন, এটি সবসময় রোজা রাখার তুল্য।

উক্ত হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড, ২৪৬ নং পৃষ্ঠায় হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আইয়ামে বীযের রোজা ফরজ হওয়া প্রমাণ করে।

মোদ্দা কথা, উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রমজানের পূর্বে আশুরা এবং আইয়ামে বীযের রোজা ফরজ ছিল, যা হানাফীদের মাজহাব।

রমজানের রোজা ধাপে ধাপে ফরজ হয়েছে। যেমন প্রথমত يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ দ্বারা সাধারণরূপে [মুতলাকান] ফরজ করা হয়েছিল। অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। অতঃপর اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তা নির্ধারিত কিছুদিন হবে। আর এর দ্বারা রমজানের রোজা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে, তবে

তখন এই এখতিয়ার ছিল যে, মনে চাইলে রোজা রাখবে আর মনে না চাইলে রাখবে না; বরং তার পরিবর্তে ফিদিয়া দিয়ে দেবে। অর্থাৎ একজন ফকিরকে পেট ভরে দুই ওয়াক্ত খানা খাওয়াবে। তাইতো وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াত দ্বারা ঐ স্বাধীনতাকেই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের রোজা রাখার শক্তি রয়েছে তারা তার পরিবর্তে একজন ফকিরকে খাওয়াবে। তবে রাখা না রাখার মাঝে স্বাধীনতা প্রদানের সাথে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, রোজা রাখা উত্তম। তাই ইরশাদ হয়েছে, وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ কিছুদিন পর ঐ এখতিয়ার রহিত করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক সুস্থ মুকীমের উপর রমজানের রোজা রাখা অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "তোমাদের মধ্য থেকে উক্ত মাস যে পাবে সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে।" সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা রোজা রাখা জরুরি হয়ে গেল এবং ফিদিয়া দিয়ে রোজা না রাখার অবকাশ অবশিষ্ট থাকল না। মোট কথা, রমজানের রোজা অপরিহার্য হয়ে গেল। কিন্তু শুরুতে এই নির্দেশ ছিল যে, রমজানের মধ্যে রাতের শুরুতে পানাহার এবং বিবিদের সাথে সঙ্গমের অনুমতি ছিল। কিন্তু শুয়ে যাওয়ার পর এর সব কিছুই নিষেধ হয়ে যেতো। কিছু কিছু সাহাবী খেলাফ করে বসলেন এবং শোয়ার পর বিবিদের সাথে সঙ্গম করে ফেললেন। তারপর রাসূল ﷺ -এর কাছে এসে আবেদন করলেন এবং নিজেদের অপরাধের স্বীকৃতি দিলেন, লজ্জিত হলেন এবং তওবা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। এ প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়–

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ .

অর্থ– রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য দান করেছেন তা আহরণ করো। আর পানাহার করো যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত।

قَالَ الصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ وَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ حَتّٰى اَصْبَحَ اَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجْزِيْهِ اِعْلَمْ اَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وَعَلٰى فَرْضِيَّتِهٖ اِنْعَقَدَ الْاِجْمَاعُ وَلِهٰذَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَالْمَنْذُوْرُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَسَبَبُ الْاَوَّلِ الشَّهْرُ وَلِهٰذَا يُضَافُ اِلَيْهِ وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهٖ وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبُ وُجُوْبِ صَوْمِهٖ وَسَبَبُ الثَّانِيْ النَّذْرُ وَالنِّيَّةُ مِنْ شُرُوْطِهٖ وَسَنُبَيِّنُهُ وَنُفَسِّرُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهُ قَوْلِهٖ فِي الْخِلَافِيَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَلِاَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِيْ ضَرُوْرَةَ اَنَّهُ لَا يَتَجَزّٰى بِخِلَافِ النَّفْلِ لِاَنَّهُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ ـ

অনুবাদ : [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন] রোজা দু'প্রকার। ওয়াজিব ও নফল। আবার ওয়াজিব দু'প্রকার। এক প্রকার হলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– রমজানের রোজা এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজা। এ প্রকারের রোজা রাতে নিয়ত করার দ্বারা জায়েজ হয়। আর যদি নিয়ত না করে অথচ ভোর হয়ে যায়, তাহলে ভোর ও দ্বি-প্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে নিয়ত করলেও যথেষ্ট হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। জেনে রাখা উচিত যে, রমজানের রোজা হলো ফরজ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে।" তা ছাড়া রোজা ফরজ হওয়া সম্পর্কে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। এজন্যই রমজানের রোজা অস্বীকারকারীকে কাফির সাব্যস্ত করা হয়। মান্নতের রোজা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ "তারা যেন তাদের মান্নতসমূহ পুরা করে।" প্রথমটির সবব হলো [রমজান] মাসের উপস্থিতি। এ কারণেই উক্ত রোজাকে মাসের দিকে সম্বোধন করা হয় এবং মাসের পুনরাগমনে রোজারও পুনরাগমন ঘটে। আর রমজানের প্রতিটি দিন হচ্ছে সেই দিনের রোজা ফরজ হওয়ার সবব।

দ্বিতীয় প্রকারের রোজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে মান্নত করা। আর নিয়ত হচ্ছে তার জন্য শর্ত। ইন্‌শাআল্লাহ এ বিষয়ে সামনে বিশদ আলোচনা করব। বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যের প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ "যে ব্যক্তি রাত্রে রোজার নিয়ত করেনি, তার রোজা নেই।" তা ছাড়া নিয়ত না থাকার কারণে রোজার প্রথম অংশটুকু যখন ফাসেদ হয়ে গেল তখন দ্বিতীয় অংশটুকুও অনিবার্যভাবে ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা, [ফরজ] রোজা বিভক্তিযোগ্য নয়। নফলের বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ, নফল রোজা তাঁর মতে বিভক্তিযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الصَّوْمُ ضَرْبَانِ الخ : শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) রোজার প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রোজা দুই প্রকার। যথা– ১. ওয়াজিব, ২. নফল। অথচ রোজা তিন ভাগে বিভক্ত। ১. ফরজ, ২. ওয়াজিব, ৩. নফল। অর্থাৎ ওয়াজিব নয়– যা সুন্নত, মোস্তাহাব এবং নফলসহ সবগুলোকে শামিল করে। এর জবাব এই যে, ওয়াজিব শব্দটি ফরজ এবং ওয়াজিব উভয়টিকে শামিল করে। কেননা, ওয়াজিব সাবিত [প্রমাণ]-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যদি অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাকে ফরজ বলা হয় আর যদি সন্দেহসূচক দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয় তবে তাকে ওয়াজিব বলা হয়। কুদূরী গ্রন্থকার উভয়টি বুঝানোর জন্য শুধু ওয়াজিব [সাবিত] শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অতঃপর ওয়াজিব দুই প্রকার– ১. মু'আইয়্যান, ২. গায়রে মু'আইয়্যান। অর্থাৎ

প্রথমটি হলো এমন রোজা যা কোনো নির্ধারিত দিনের সাথে যুক্ত। যেমন– রমজানের রোজা ও নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজা। যেমন– কেউ বলল, আমার উপর আল্লাহর ওয়াস্তে এই মাসের প্রথম জুমার রোজা আবশ্যক। এতে এই মাসের প্রথম জুমার রোজা নির্ধারিত হয়ে গেল। দ্বিতীয়টি হলো এমন রোজা যা কোনো নির্ধারিত দিনের সাথে যুক্ত নয়। যেমন– রমজানের কাজা রোজা যার কোনো নির্ধারিত ওয়াক্ত নেই; বরং নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া যে-কোনো দিন কাজা করতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র.) প্রথমত নির্ধারিত ওয়াজিবের (وَاجِبٌ مُعَيَّنٌ) আহকাম আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন– রমজানের রোজা ও নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজা অন্যান্য রোজার ন্যায় রাত্রে নিয়ত করার দ্বারা জায়েজ হয়ে যাবে। যদি রমজানের রোজা আর নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজার নিয়ত রাত্রে না করা হয়, এমনকি ভোর হয়ে যায়। তবে ভোর ও জাওয়ালের মধ্যবর্তী সময়ে যদি করে নেওয়া হয় তবুও জায়েজ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি রমজানের রোজা কিংবা নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজার নিয়ত রাত্রে না করা হয়; বরং ভোর হওয়ার পর করা হয় তবে জায়েজ হবে না। তবে নফল রোজার নিয়ত ভোরের পর করাও জায়েজ আছে। এটাই ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, ফরজ এবং নফল সকল রোজার জন্য রাত্রে নিয়ত করা শর্ত। যদি ভোরের পর নিয়ত করা হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বিরোধপূর্ণ মাসআলায় উভয় দলের দলিল-প্রমাণ বর্ণনার পূর্বে ভূমিকা হিসেবে কিছু জরুরি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। প্রথম হলো, রমজানের রোজা ফরজ। আর ফরজ হওয়ার ব্যাপারে দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ এবং উম্মতের ইজমা। এ কারণেই রমজানের রোজার ফরজিয়তের অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে গণ্য হয়।

নজরের রোজা ওয়াজিব। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ কেননা, وَلْيُوفُوا শব্দটি আমরের সীগাহ্। আর 'আমর' দ্বারা ওয়াজিব বুঝা যায়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, রমজানের রোজার সবব হলো রমজান মাসের উপস্থিতি। এ কারণেই সাওমকে রমজানের দিকে ইজাফত [সম্বন্ধ] করে সাওমে রমজান বলা হয়। আর ইজাফত সবব হওয়ার আলামত বহন করে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, সাওমে রমজানের সবব হলো রমজান মাসের উপস্থিতি। আর যেহেতু সবব তথা মাসের তাকরার দ্বারা মুসাব্বাব তথা রোজারও তাকরার হয় এজন্য রমজান মাসের পুনরাগমন দ্বারা রমজানের রোজারও পুনরাগমন ঘটে। কোনো কোনো মাশায়েখ এটা গ্রহণ করেছেন যে, রমজানের মাস রমজানের রোজার সবব। আল্লামা ফখরুল ইসলাম বলেন, প্রত্যেক দিনের রোজা ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো ঐ দিন। কেননা রমজানের রোজা হলো বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের অনুরূপ। এজন্য যে, দুই দিনের মাঝখানে এমন একটি অতিরিক্ত সময় [রাত] আসে যার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে রোজা রাখার যোগ্যতা নেই। আদায়েরও নেই, কাজারও নেই। সুতরাং রমজানের রোজা নামাজের অনুরূপ হয়ে গেল। তাই যেমনিভাবে প্রত্যেক নামাজের সবব ঐ নামাজের ওয়াক্ত আসা, তেমনিভাবে প্রত্যেক দিন ঐ দিনের রোজার সবব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার উভয় মতকে একত্রিত করেছেন। কেননা, উজূব দুই প্রকার। একটি হলো নাফ্সে উজূব [সত্তাগতভাবে দরকারী] দ্বিতীয়টি হলো উজূবে আদা [আদায়ের দিক থেকে দরকারী]। সুতরাং রমজান মাস সবব হলো রোজা সত্তাগতভাবে ওয়াজিব হওয়ার। আর প্রত্যেক দিন সবব হলো ঐ দিনের আদায় ওয়াজিব হওয়ার। হিদায়া গ্রন্থকারের উপরিউক্ত ব্যাখ্যার পর উভয় মতামতে আর কোনো বিরোধ থাকে না।

নজরে মু'আইয়ান তথা নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজার সবব হলো মান্নত করা। আর নিয়ত তার শর্ত। ইনশাআল্লাহ রোজার সকল শর্তের আলোচনা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মতনের (مَتْن) মাসআলাটি বিরোধপূর্ণ। অর্থাৎ ঐ মাসআলার মধ্যে আমাদের মতে দ্বি-প্রহরের পূর্বে নিয়ত করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে রাত্রে নিয়ত করা জরুরি। জাওয়ালের পূর্বে যদি নিয়ত করা হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল নিম্নোক্ত হাদীস– لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ "যে ব্যক্তি রাতে রোজার নিয়ত করেনি তার রোজাই হলো না।" দ্বিতীয় দলিল এই যে, যদি রাত্রে অর্থাৎ সুবহে সাদেকের পূর্বে রোজার নিয়ত না করে তখন রোজার প্রথমাংশ অর্থাৎ ঐ অংশ যার মধ্যে নিয়ত পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ নিয়ত যা শর্ত ছিল তা না পাওয়া যাওয়ার কারণে ফাসেদ হয়ে গেল। আর রোজার প্রথমাংশ যখন ফাসেদ হয়ে গেল তখন দ্বিতীয়াংশ তথা ঐ অংশ যার মধ্যে নিয়ত পাওয়া গেছে তাও ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা, রোজা বিভক্তিযোগ্য নয় যে, তার এক অংশ ঠিক আর অপর অংশ বেঠিক। সুতরাং যখন রোজা বিভক্তিযোগ্য নয় তখন দ্বিতীয়াংশের বেনা প্রথমাংশের উপর ঠিক হবে। আর প্রথমাংশ নিয়ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে ফাসেদ। আর কায়েদা আছে যে, ফাসেদ জিনিসের উপর বেনা করাও ফাসেদ হয়। এজন্য পুরা রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যখন রাত্রে নিয়ত না করার কারণে রোজা ফাসেদ হয়ে গেল, বুঝা গেল রাত্রে নিয়ত করা শর্ত এবং জরুরি। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নফল রোজার মধ্যে রাত্রে নিয়ত করা শর্ত নয়। কেননা নফল রোজা তাঁর মতে বিভক্তিযোগ্য। সুতরাং যে অংশ নিয়ত ছাড়া হবে সেটি ফাসেদ আর যে অংশ নিয়তের সাথে হবে তা ঠিক বলে গণ্য হবে।

وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا شَهِدَ الْاَعْرَابِيُّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ اَلَا مَنْ اَكَلَ فَلَا يَاْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَاْكُلْ فَلْيَصُمْ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى نَفْيِ الْفَضِيْلَةِ وَالْكَمَالِ اَوْ مَعْنَاهُ لَمْ يَنْوِ اَنَّهُ صَوْمٌ مِنَ اللَّيْلِ وَلِاَنَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ فَيَتَوَقَّفُ الْاِمْسَاكُ فِيْ اَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَاَخِّرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِاَكْثَرِهِ كَالنَّفْلِ وَهٰذَا لِاَنَّ الصَّوْمَ رُكْنٌ وَاحِدٌ مُمْتَدٌّ وَالنِّيَّةُ لِتَعْيِيْنِهِ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَتَتَرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ جَنْبَةُ الْوُجُوْدِ بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ وَالْحَجِّ لِاَنَّهُمَا اَرْكَانٌ فَيُشْتَرَطُ قِرَانُهَا بِالْعَقْدِ عَلٰى اَدَائِهِمَا بِخِلَافِ الْقَضَاءِ لِاَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلٰى صَوْمِ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ النَّفْلُ وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ اِقْتِرَانُهَا بِالْاَكْثَرِ فَتَرَجَّحَتْ جَنْبَةُ الْفَوَاتِ ثُمَّ قَالَ فِى الْمُخْتَصَرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ الْاَصَحُّ لِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ وُجُوْدِ النِّيَّةِ فِيْ اَكْثَرِ النَّهَارِ وَنِصْفُهُ مِنْ وَقْتِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلٰى وَقْتِ الضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى لَا وَقْتُ الزَّوَالِ فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِيَتَحَقَّقَ فِى الْاَكْثَرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيْمِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) لِاَنَّهُ لَا تَفْصِيْلَ فِيْمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيْلِ.

অনুবাদ : আমাদের দলিল এই যে, জনৈক বেদুইন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اِلَا مَنْ اَكَلَ فَلَا يَاْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَاْكُلْ فَلْيَصُمْ "শোন, যে ব্যক্তি পানাহার করে ফেলেছে, সে যেন অবশিষ্ট দিন পানাহার না করে। আর যে পানাহার করেনি, সে যেন রোজা রাখে।" আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণতা ও ফজিলত অর্জিত না হওয়ার উপর প্রযোজ্য। কিংবা এর অর্থ এই যে, সে এই নিয়ত করেনি যে, তার রোজা রাত্র থেকে শুরু হবে। তা ছাড়া যৌক্তিক কারণ এই যে, এটা হলো রোজার জন্য নির্ধারিত দিন। সুতরাং প্রথমাংশের পানাহার থেকে বিরত থাকাটা বিলম্বিত নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে, যা উক্ত রোজার অধিকাংশের সঙ্গে যুক্ত। যেমন নফলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, রোজা হচ্ছে একটি দীর্ঘায়িত রুকন। আর নিয়তের প্রয়োজন হলো সেটাকে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আধিক্যের দ্বারা রোজার অস্তিত্বের দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে। নামাজ ও হজের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা নামাজ ও হজ হচ্ছে কয়েকটি রুকন সমন্বিত। সুতরাং নিয়ত ঐ চুক্তির সাথে যুক্ত হওয়া শর্ত হবে যা উভয়টির আদায়ের জন্য ফরজ হয়েছে। কাজা রোজার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তা ঐ দিনের রোজার উপর নির্ভরশীল। আর ঐ রোজাটি হলো নফল। [সুতরাং নফল রোজার সময় আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ রাত্রে নিয়ত না করলে দিনের বেলায় নিয়তের দ্বারা নফলকে কাজা হিসেবে রূপান্তরিত করা যাবে না]। জাওয়ালের পরে নিয়ত করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সেক্ষেত্রে রোজার নিয়তটি দিনের অধিকাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। ফলে রোজা ফউত হওয়ার [ছুটে যাওয়ার] দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

'মুখতাসারুল কুদূরীতে' [নিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে] ভোর ও জাওয়ালের মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে আর 'জামেউস্ সগীর' কিতাবেও অর্ধ দিবসের পূর্বের কথা বলা হয়েছে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা দিবসের অধিকাংশ সময় নিয়ত বিদ্যমান থাকা জরুরি। আর [শরিয়ত মতে] দিবসের অর্ধেক হলো ফজরের উদয় থেকে বৃহৎ পূর্বাহ্ন পর্যন্ত; জাওয়ালের সময় পর্যন্ত নয়। সুতরাং এর পূর্বেই নিয়ত বিদ্যমান হওয়া জরুরি, যাতে নিয়ত দিবসের অধিকাংশে বিদ্যমান থাকে। [দিবসের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে] মুসাফির ও মুকীমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা আমাদের বর্ণিত দলিলে কোনো পার্থক্য নির্দেশ নেই। অবশ্য ইমাম জুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের দলিল, যখন একজন বেদুইন ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কিছু পানাহার করেছে সে যেন অবশিষ্ট দিন পানাহার না করে। আর যে ব্যক্তি পানাহার করেনি সে যেন রোজা রাখে। অর্থাৎ রোজা রাখার নিয়ত করে। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ভোরের পর নিয়ত করা জায়েজ। মোল্লা আলী কারী (র.)-এর মতানুযায়ী 'শরহে নিক্বায়া' গ্রন্থকারের উপরিউক্ত হাদীস অপ্রসিদ্ধ (غَيْرُ مَعْرُوْفٍ), তবে 'সুনানে আরবা'আ তথা চার সুনানের কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ الْحَسَنُ فِيْ حَدِيْثِهِ يَعْنِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ اَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا .

অর্থ– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে একজন বেদুইন আসল। সে বলল, আমি চাঁদ দেখেছি, হাসান তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন "রমজানের চাঁদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই? সে বলল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? সে বলল, জি–হ্যাঁ। তিনি বললেন, বেলাল লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যাতে তারা রোজা রাখে।

উক্ত হাদীসটিও আমাদের সুস্পষ্ট দলিল হয় না। কেননা হাদীসটির মধ্যে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, শাহাদাতের এই ঘটনা চাঁদ দেখার পর রাত্রেই ঘটেছে নাকি পূর্বের দিন ভোরে ঘটেছে। যদি রাত্রে ঘটে থাকে তবে রেওয়ায়েতটি আমাদের দলিল হয় না। আর যদি পূর্বের দিন ভোরে ঘটে থাকে তবে নিশ্চিতভাবে আমাদের দলিল হবে। কেননা পূর্বের দিন ভোরে উক্ত ঘটনা ঘটার অর্থ এই যে, তিনি সেদিনের রোজা রাখতেই নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ঐ দিনের এই রোজা রাত্রের নিয়ত দ্বারা হবে না; বরং ভোরের পরের নিয়ত দ্বারাই হবে। যখন নিয়ত ভোরের পর করা হয়েছে তখন প্রমাণিত হলো যে, রাত্রে নিয়ত করা শর্ত নয়। আমাদের মাজহাবের সমর্থনে সুস্পষ্ট হাদীস হলো যা হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া' (রা.) সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি হলো–

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ .

অর্থ–রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন লোকদের মাঝে এই মর্মে ঘোষণা করে যে, যে কিছু পানাহার করেছে সে যেন অবশিষ্ট দিন রোজা রাখে আর যে পানাহার করেনি সেও যেন রোজা রাখে অর্থাৎ রোজা রাখার নিয়ত করে। কেননা এই দিনটি হলো আশুরার দিন।

এই ঘটনাটি তখনকার যখন আশুরার রোজা ফরজ ছিল এবং রমজানের রোজা ফরজ হওয়া দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ফরজ রোজার নিয়ত দিনে করাও জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত হাদীস– لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ -এর জবাব এই যে, উক্ত হাদীসের মধ্যে মূল রোজার নফী করা হয়নি; বরং রোজার ফজিলত ও পূর্ণাঙ্গতার নফী করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি রাত্রে রোজার নিয়ত না করে তবে রোজা ফজিলতপূর্ণ ও পরিপূর্ণ হবে না। তবে মূল রোজা আদায় হয়ে যাবে। যেমন– لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ -এর মধ্যে নামাজের পূর্ণতা ও ফজিলতের নফী করা হয়েছে। মূল নামাজ এবং নামাজ ঠিক হওয়ার নফী করা হয়নি। দ্বিতীয় জবাব এই যে, উক্ত হাদীসের মতলব হলো ঐ ব্যক্তির রোজা হবে না, যে এই নিয়ত করেনি যে, সে রাত্র থেকে রোজাদার। মোট কথা হলো, এক ব্যক্তি যে দিনে নিয়ত করেছে, কিন্তু এই নিয়ত করেনি যে, আমার এই রোজা রাত্র তথা সুবহে সাদেক থেকে শুরু হবে; বরং যে সময় নিয়ত করেছে ঐ সময় থেকে রোজার নিয়ত করেছে। উল্লেখ্য যে, এই রোজা জায়েজ হবে না। কেননা ঐ রোজা গ্রহণযোগ্য হবে, যা সুবহে সাদেক থেকে হয়।

আমাদের পক্ষ থেকে আকলী দলিল এই যে, রমজান ও নির্দিষ্ট মান্নতের (نَذْر مُعَيَّنْ) দিন তো রোজারই দিন। কেননা, ঐ দিনে রোজা রাখা ফরজ। সুতরাং যখন এই দিন রোজার জন্য নির্ধারিত তখন দিনের প্রথমাংশে যে ইমসাক তথা পানাহার এবং সহবাস থেকে বিরত থাকা পাওয়া গিয়েছে তা ঐ নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে যা বিলম্বিত এবং দিনের অধিকাংশ সময়ের সাথে যুক্ত। যেমন– নফল রোজার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি সুবহে সাদেকের পূর্বে পানাহার এবং সহবাস থেকে বিরত থাকে তবে এই বিরত থাকা আগামী নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে। সুতরাং যদি সে আগামী রোজার নিয়ত করে এবং এখনো দিনের অধিকাংশ সময় অবশিষ্ট আছে। তখন বলা হবে যে, দিনের প্রথমাংশের ইমসাকও রোজা। আর যদি আগামীতে রোজা ভাঙ্গার নিয়ত করে তখন বলা হবে যে, শুরুর ইমসাকও রোজা ছিল না। সুতরাং জানা গেল যে, শুরুর ইমসাক আগামীর নিয়তের উপর নির্ভরশীল হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দিনের শুরুর ইমসাক আগামী নিয়তের উপর নির্ভরশীল হয়। কেননা রোজা হচ্ছে একটি দীর্ঘায়িত রুকন। তবে এর মধ্যে এ সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে যে, এই রুকনটি আদত হিসেবে [স্বভাবগতভাবে] হবে। আবার রোজা হিসেবে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এটা নির্ধারণ করা যে, এ ইমসাকটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের নিয়তের মাধ্যমে হতে পারে; স্বভাবগত নয়। এ কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, দিনের শুরুর ইমসাক আগামীর নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এখন এই নিয়ত যদি দিনের অধিকাংশে পাওয়া যায় তবে যেহেতু অধিকাংশ পূর্ণের স্থলবর্তী হয় এজন্য আধিক্যের কারণে অস্তিত্বের দিকটিকে অনস্তিত্বের দিকের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বলা হবে যে, নিয়ত পুরো দিনে পাওয়া গিয়েছে। আর যখন পুরো দিনে নিয়ত পাওয়া গিয়েছে তখন রোজা জায়েজ হবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, রোজার নিয়ত রাত্রে করা জরুরি নয়। এর বিপরীত হলো নামাজ ও হজের বিষয়টি। এগুলোর মধ্যে শুরু থেকে নিয়ত করা জরুরি। এগুলোর মধ্যে لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ [অধিকাংশ পূর্ণের স্থলবর্তী]-এর কায়েদা প্রযোজ্য হয় না। কেননা, এগুলো বহু রুকন সমন্বিত। যেমন– নামাজের মধ্যে কিয়াম, রুকু, সিজদা এবং কেরাত ইত্যাদি রুকন। আর হজের মধ্যে উকূফে আরাফা [আরাফায় অবস্থান] এবং তওয়াফ রুকন। এখন যদি তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাজের প্রারম্ভে নামাজের নিয়ত না করা হয় এবং ইহ্রামের সময় হজের প্রারম্ভে হজের নিয়ত না করা হয়, তখন কিছু কিছু রুকন নিয়ত ছাড়া থেকে যাবে। আর যে সকল রুকন নিয়তবিহীন আদায় হবে সেগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনকি ঐ রুকনগুলো ব্যতিরেকে নামাজ ও হজ আদায় হবে না। এজন্য হজ ও নামাজ উভয়টির শুরুতে নিয়ত করা জরুরি। পরবর্তীতে যদি নিয়ত করা হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ الخ এই ইবারতটি দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো এই যে, রোজা যদি একটি দীর্ঘায়িত রুকন হয় এবং মধ্যাহ্নের পূর্বে নিয়ত করা জায়েজ হয় তবে তো রমজানের রোজার কাজা আদায়ের ক্ষেত্রেও মধ্যাহ্নের পূর্বে নিয়ত জায়েজ হওয়া দরকার ছিল। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়; বরং রমজানের কাজা আদায়ের ক্ষেত্রে রাত্রে নিয়ত করা শর্ত। এর জবাব হলো, রমজানের রোজা ও নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা ব্যতীত সমস্ত দিন নফল রোজার জন্য প্রবর্তিত– নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া। অর্থাৎ শরিয়ত ঐ দিনগুলোর রোজা তার উপর অপরিহার্য করেনি। তবে নফল রোজার কথা ভিন্ন। সুতরাং রমজানের রোজা ও নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজার দিনগুলো ছাড়া অন্যগুলোর মধ্যে ইমসাক তথা খানা-পিনা এবং সহবাস থেকে বিরত থাকা ঐ দিনের রোজার উপর নির্ভরশীল হবে। ঐ দিনের রোজা নফল। তাই ঐ দিনের রোজা নফল

হিসেবে গণ্য হবে। তবে যদি দিনের শুরু থেকে অর্থাৎ সুবহে সাদেক থেকেই কাজা ইত্যাদি রোজার নিয়ত করে। সুতরাং বুঝা গেল যে, কাজা রোজার নিয়ত রাত্রে করা শর্ত। যদি সুবহে সাদেকের পর মধ্যাহ্নের পূর্বে নিয়ত করা হয় তবে তা অগ্রাহ্য হবে।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ الخ এই ইবারতটুকু দ্বারাও একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, যখন রোজা একটি দীর্ঘায়িত রুকন, তখন নিয়তের সম্পর্ক দিনের কমবেশি উভয় অংশের সাথে সমান হওয়া উচিত। অর্থাৎ নিয়ত দিনের অধিকাংশে পাওয়া যাক বা অল্পাংশে পাওয়া যাক, যদি মধ্যাহ্নের পর নিয়ত করা হয়, তবে উভয় সুরতে রোজা সিদ্ধ হওয়া উচিত। অথচ মধ্যাহ্নের পর নিয়ত করার দ্বারা রোজা জায়েজ হয় না। এর উত্তর এই যে, আসল তো ছিল, নিয়ত দিনের শুরু ভাগে করা। অর্থাৎ সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথেই রোজার নিয়ত করা। কিন্তু যদি দিনের অধিকাংশের সাথে নিয়তের সম্পর্ক পাওয়া যায় তথা মধ্যাহ্নের পূর্বেই নিয়ত করা হয় তবে 'অধিকাংশ পূর্ণের হুকুমে' এই নীতির কারণে এই আমলকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি আর যেহেতু মধ্যাহ্নের পর নিয়ত করার সুরতে দিনের অধিকাংশের মধ্যে নিয়ত পাওয়া যায় না সেহেতু এই সুরতে অনস্তিত্বের দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে এবং বলা হবে, যেন পুরো দিনেই নিয়ত পাওয়া যায়নি। আর রোজা নিয়ত ছাড়াই রেখেছে। উল্লেখ্য যে, নিয়ত ছাড়া রোজা গ্রহণযোগ্য হয় না। এজন্য মধ্যাহ্নের পর নিয়ত করার সুরতেও রোজা গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ فِى الْمُخْتَصَرِ الخ-এর দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার কুদূরী ও জামে সগীরের ইবারতের পার্থক্য বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, কুদূরীর মতন হলো– إِذَا لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ "কেউ যদি রাত্রে নিয়ত না করে, আর ভোর হয়ে যায়, তবে সে মধ্যাহ্ন তথা সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে নিয়ত করে নেবে।" জামে সগীরের মতন হলো– قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ "অর্ধ দিনের পূর্বে নিয়ত করবে।" হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জামে সগীরের ইবারত অধিক বিশুদ্ধ। কেননা রোজার মধ্যে শরয়ী দিন উদ্দেশ্য; পারিভাষিক দিন নয়। শরয়ী দিন হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। আর পারিভাষিক দিন হলো সূর্য উদিত হওয়া থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

আর মধ্যাহ্ন সময় পারিভাষিক দিনের অর্ধেক হয়; শরয়ী দিনের অর্ধেক হয় না। কেননা শরয়ী দিনের অর্ধেক চাশ্তের শেষ সময় পর্যন্ত হয়। যেমন– আজ ৮ জানুয়ারী ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে ৫.৪৮ মিনিটে। সূর্য অস্ত যাবে ৫.৩৬ মিনিটে। এই হিসেবে অর্ধ দিন হয় ১১.৪২ মি.। জামে সগীরের বর্ণনা মতে ১১.৪২ মিনিট যেটা চাশ্তের শেষ সময় যাকে বৃহৎ পূর্বাহ্ন (ضَحْوَةُ الْكُبْرٰى) বলা হয়, এর পূর্বেই নিয়ত করা জরুরি। যাতে শরয়ী দিনের অধিকাংশের মধ্যে নিয়ত পাওয়া যায়। এমনিভাবে আজ ৮ জানুয়ারি ২০০৪ ইং সূর্য উদয় হবে ৭.১৭ মিনিটে। আর সূর্য অস্ত যাবে ৫.৩৬ মিনিটে। এর অর্ধেক হবে ১২.২৫ মি. ৩০. সেকেন্ডে। কুদূরীর বর্ণনা অনুযায়ী ১২.২৫ মিঃ যাকে মধ্যাহ্নের ওয়াক্ত বলা হয়, এর পূর্বে নিয়ত করা জরুরি। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) জামে সগীরের মতনকে এই কারণে বিশুদ্ধ বলেছেন যে, রোজার মধ্যে শরয়ী দিনের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আর শরয়ী দিনের অর্ধেক মধ্যাহ্নের প্রকৃত সময় হয় না; বরং মধ্যাহ্নের সময়ের পূর্বের আনুমানিক এক ঘণ্টা পূর্বেই হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, রমজান এবং নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজার অর্ধ দিনের পূর্বে নিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুসাফির ও মুকীম উভয়ের ক্ষেত্রে বরাবর। কেননা যে দলিল বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে ইমাম জুফার (র.)-এর মতে, মুসাফিরের জন্য রাত্রে নিয়ত করা শর্ত। ভোরের পর অর্ধ দিনের পূর্বে নিয়ত করা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَهٰذَا الضَّرْبُ مِنَ الصَّوْمِ يَتَأَدّٰى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِىْ نِيَّةِ النَّفْلِ عَابِثٌ وَفِىْ مُطْلَقِهَا لَهٗ قَوْلَانِ لِاَنَّهٗ بِنِيَّةِ النَّفْلِ مُعْرِضٌ عَنِ الْفَرْضِ فَلَا يَكُوْنُ لَهُ الْفَرْضُ وَلَنَا اَنَّ الْفَرْضَ مُتَعَيَّنٌ فِيْهِ فَيُصَابُ بِاَصْلِ النِّيَّةِ كَالْمُتَوَحِّدِ فِى الدَّارِ يُصَابُ بِاسْمِ جِنْسِهٖ وَاِذَا نَوَى النَّفْلَ اَوْ وَاجِبًا اٰخَرَ فَقَدْ نَوٰى اَصْلَ الصَّوْمِ وَزِيَادَةَ جِهَةٍ وَقَدْ لَغَتِ الْجِهَةُ فَبَقِىَ الْاَصْلُ وَهُوَ كَافٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيْمِ وَالصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِاَنَّ الرُّخْصَةَ كَيْلَا تَلْزَمَ الْمَعْذُوْرَ مَشَقَّةٌ فَاِذَا تَحَمَّلَهَا اِلْتَحَقَ بِغَيْرِ الْمَعْذُوْرِ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اِذَا صَامَ الْمَرِيْضُ وَالْمُسَافِرُ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ يَقَعُ عَنْهُ لِاَنَّهٗ شَغَلَ الْوَقْتَ بِالْاَهَمِّ لِتَحَتُّمِهٖ فِى الْحَالِ وَتَخَيُّرِهٖ فِىْ صَوْمِ رَمَضَانَ اِلٰى اِدْرَاكِ الْعِدَّةِ وَعَنْهُ فِىْ نِيَّةِ التَّطَوُّعِ رِوَايَتَانِ وَالْفَرْقُ عَلٰى اَحَدِهِمَا اَنَّهٗ مَا صَرَفَ الْوَقْتَ اِلَى الْاَهَمِّ ـ

অনুবাদ : এই প্রকারের রোজা সাধারণ নিয়ত, নফলের নিয়ত এবং অন্য ওয়াজিবের নিয়ত দ্বারা আদায় হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নফলের নিয়ত করলে তা নিরর্থক হবে [ফরজও হবে না নফলও হবে না]। সাধারণ নিয়ত সম্পর্কে তাঁর দুটি মত রয়েছে। কেননা নফলের নিয়ত দ্বারা সে ফরজ রোজার উপেক্ষাকারী হলো। সুতরাং তার জন্য ফরজ আদায় হবে না। আমাদের দলিল হলো, সে দিনটিতে ফরজ নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং মূল নিয়ত দ্বারাই তা হাসিল হয়ে যাবে। যেমন– ঘরে একা বিদ্যমান ব্যক্তিকে তার জাতিবাচক নামে ডাকলেও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। আর যদি নফল কিংবা অন্য ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে থাকে, তাহলেও সে মূল রোজা এবং অন্য একটি অতিরিক্ত দিকের নিয়ত করল। সুতরাং যখন অতিরিক্ত দিকটি বাতিল হয়ে গেল তখন মূল বিষয় [রোজা] অবশিষ্ট থাকল। আর তা-ই ফরজ রোজা আদায়ের জন্য যথেষ্ট। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মুসাফির ও মুকীম এবং সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তির মাঝে এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা [রোজা না রাখার] অবকাশ দানের কারণ, 'মাযূর' ব্যক্তির যেন কষ্ট না হয়। কিন্তু যখন সে স্বেচ্ছায় কষ্ট গ্রহণ করে নিল, তখন সে অ-মাযূর ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তি যখন অন্য ওয়াজিব রোজার নিয়তে রোজা রাখে তখন সে রোজাই সাব্যস্ত হবে। কারণ সময়কে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োজিত করেছে। কেননা, অন্য ওয়াজিবের কাজা এই মুহূর্তে জরুরি। পক্ষান্তরে রমজানের রোজার ব্যাপারে পরবর্তীতে সময় লাভ করা পর্যন্ত সে এখতিয়ারপ্রাপ্ত। নফলের নিয়ত করার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনা [অর্থাৎ ফরজ হিসেবে গণ্য হওয়ার] মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, এখানে সময়টিকে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিযুক্ত করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, রোজার এই প্রকার অর্থাৎ وَاجِبْ مُعَيَّنْ [নির্দিষ্ট ওয়াজিব] সাধারণ (مُطْلَقْ) নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়; নফলের নিয়ত এবং অন্য ওয়াজিবের নিয়ত দ্বারাও আদায় হয়ে যায়। কুদূরী গ্রন্থকারের ইবারতের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। তা হলো- وَاجِبْ مُعَيَّنْ-এর মধ্যে রমজানের রোজা এবং নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোজা উভয়টি শামিল আছে। এখন এর উদ্দেশ্য দাঁড়ায়, যেমনিভাবে রমজানের রোজা সাধারণ নিয়ত, নফল নিয়ত এবং অন্য ওয়াজিবের নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়, তেমনিভাবে نَذْر مُعَيَّنْ-এর রোজাও উপরিউক্ত তিনটির দ্বারা আদায় হয়ে যাবে অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। কেননা نَذْر مُعَيَّنْ-এর রোজা সাধারণ নিয়ত এবং নফলের নিয়ত দ্বারা তো আদায় হয়ে যায়, কিন্তু অন্য ওয়াজিব যেমন- কাজা কিংবা কাফফারার নিয়ত দ্বারা আদায় হয় না; বরং নির্ধারিত মান্নতের দিন যদি রাত্রেই অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করে তবে অন্য ওয়াজিবের রোজা আদায় হবে; মান্নতের রোজা আদায় হবে না। মোদ্দা কথা, হানাফীগণের মাজহাব হলো, রমজানের রোজা সাধারণ নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। যেমন এভাবে বলল, আমি আগামীকাল রোজা রাখব। নফল নিয়ত দ্বারাও আদায় হয়ে যায়। যেমন এভাবে বলল, আমি আগামীকাল নফল রোজা রাখব। অন্য ওয়াজিবের দ্বারাও আদায় হয়ে যায়। যেমন এভাবে বলল, আমি আগামীকাল কাফফারা কিংবা বিগত বছরের রমজানের কাজা রোজা রাখব।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রমজানের রোজার মধ্যে যদি নফলের নিয়ত করে তবে রমজানের রোজাও আদায় হবে না এবং নফল রোজাও আদায় হবে না; বরং ঐ দিন বিরত থাকা নিরর্থক হবে। কেননা, রমজানের রোজার তো নিয়ত করেনি। আর নফল রোজার কোনো [নির্ধারিত] সময় বা দিন নেই। তাই এটি কোনো রোজাই হবে না। আর যদি রমজানের মধ্যে সাধারণ রোজার নিয়ত করে তবে এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুটি অভিমত রয়েছে। একটি হলো, সাধারণ নিয়ত দ্বারা রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি হলো, রমজানের রোজা আদায় হবে না। এটাই ইমাম মালিক ও আহমদ (র.)-এর অভিমত।

নফলের নিয়ত দ্বারা রমজানের রোজা আদায় হবে না- এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রমজানের সাথে নফল রোজার নিয়ত করে সে যেন ফরজকেই উপেক্ষা করল। কেননা ফরজ ও নফলের মাঝে বিরোধ রয়েছে। সুতরাং ফরজকে উপেক্ষা করা এমন যেমন সে নিয়তই বর্জন করেছে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, নিয়ত বর্জন দ্বারা রোজা আদায় হবে না। এজন্য ঐ সুরতে রমজানের রোজা আদায় হবে না। আর যেহেতু নফল রোজার কোনো সময় নেই এজন্য নফল রোজাও আদায় হবে না।

সাধারণ নিয়তের সুরতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম অভিমতের দলিল হলো, যখন রমজান মাসে সাধারণ রোজার নিয়ত পাওয়া গিয়েছে তখন এই ব্যক্তি ঐ নিয়ত দ্বারা ফরজকে উপেক্ষাকারী হবে না। আর যখন ফরজ থেকে বিমুখতা পাওয়া গেল না তখন রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অভিমতের দলিল হলো- যেমনিভাবে মূল রোজা ইবাদত, তেমনিভাবে وَصْف فَرْضِيَّتْ-ও ইবাদত। মূল রোজা নিয়ত ব্যতীত আদায় হয় না। সুতরাং যেমনিভাবে মূল রোজা নিয়ত ছাড়া আদায় হয় না তেমনিভাবে وَصْف فَرْضِيَّتْ-ও নিয়ত ছাড়া আদায় হবে না। আর সাধারণ নিয়তের সুরতে যেহেতু وَصْف فَرْضِيَّتْ অস্তিত্বহীন হয়ে গেল, এজন্য মূল রোজাও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল হলো, রমজানের মাস ফরজ রোজার জন্য নির্ধারিত। তাইতো রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- إِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إِلَّا رَمَضَانُ "যখন শাবান মাস শেষ হয়ে গেল, তখন রমজান ব্যতীত কোনো রোজা নেই।" অর্থাৎ ঐ মাসের মধ্যে রমজানের ফরজ রোজা ব্যতীত আর কোনো রোজা নেই। সুতরাং যখন রমজানের মাস ফরজ রোজার জন্য নির্ধারিত তখন রোজার ফরজিয়ত মূল নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। যেমন- কোনো ঘরে একা এক ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। তাকে তার জাতিবাচক নামে ডাকলেও সে ব্যক্তিই উদ্দেশ্য হবে এবং এ ধরনের ডাকাও সঠিক হবে- যেমন বলল, ওহে প্রাণী! সুতরাং ওহে প্রাণী দ্বারা সে ব্যক্তিই উদ্দেশ্য হবে যে ব্যক্তি ঘরে বিদ্যমান আছে। যেমন, ওহে ইনসান এবং তার নাম হে যায়েদ দ্বারা সে-ই উদ্দেশ্য হবে। এমনিভাবে রমজানের মাস যখন ফরজ রোজার জন্য নির্ধারিত তখন শুধু রোজার নিয়ত দ্বারা ঐ

রোজাই আদায় হবে যার স্থান এই মাস। আর যখন সে নফল কিংবা অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করল, তখন সে যেন মূল রোজার নিয়ত করল এবং একটি অতিরিক্ত জিনিস তথা নফল কিংবা ওয়াজিবের নিয়ত করল। সুতরাং এই অতিরিক্ত বস্তুটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সময় তথা রমজান মাস তাকে গ্রহণ করে না। আর যখন অতিরিক্ত দিকটি বাতিল হয়ে গেল তখন আসল রোজার নিয়ত অবশিষ্ট থাকল। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল নিয়ত দ্বারা রমজানের সমান রোজা আদায় হয়ে যায়। এ জন্য নফল কিংবা অন্য ওয়াজিবের নিয়ত দ্বারাও রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, রমজানের রোজা সাধারণ নিয়ত, নফলের নিয়ত এবং অন্য ওয়াজিব নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। উক্ত হুকুমের মধ্যে মুসাফির, মুকীম, সুস্থ, অসুস্থ সকলেই সমান। কেননা মুসাফির ও রোগীকে রমজানের রোজা বিলম্ব করার অবকাশ এজন্য দেওয়া হয়েছিল যে, যাতে তাদের সফরের ওজর আর রোগের ওজরের কারণে রোজার কষ্ট অনুভব না হয়। কিন্তু যখন তারা স্বেচ্ছায় কষ্টকে গ্রহণ করে নিল তখন তারা সুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। আর সুস্থ ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের রমজানের রোজা সাধারণ নিয়ত, নফল নিয়ত এবং অন্য ওয়াজিবের নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। তাই মুসাফির ও রুগীর রমজানের রোজাও উপরিউক্ত সব ধরনের নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি মুসাফির ও রোগী ব্যক্তি রমজানের মধ্যে অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করত রোজা রাখে তবে অন্য ওয়াজিবের রোজাই আদায় হবে; রমজানের রোজা আদায় হবে না। দলিল এই যে, অন্য ওয়াজিব তথা কাজা কিংবা কাফফারার রোজা তো তার উপর তাৎক্ষণিকভাবে অপরিহার্য। সুতরাং এই অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে তখন ঐ অন্য ওয়াজিবের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট পাকড়াও হবে।

রমজানের রোজাকে অসুস্থ ও সফরের কারণে বিলম্ব করার এখতিয়ার [অধিকার] দেওয়া হয়েছে। অতএব এই ব্যক্তি যদি ঐ রোগ কিংবা ঐ সফরে মারা যায় তবে এই রমজানের ব্যাপারে পাকড়াও হবে না। সুতরাং বুঝা গেল, অসুস্থ ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে অন্য ওয়াজিবটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর রমজানের রোজা হলো গুরুত্বহীন। আর নিয়ম হলো, সময়কে গুরুত্বের সাথে নিয়োজিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্বহীন বিষয়ের অগ্রে আদায় করা। এজন্য ইমাম সাহেব (র.) বলেছেন, রমজানের মধ্যে যদি মুসাফির ও রুগী ব্যক্তি অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করে তবে ঐ অন্য ওয়াজিবটি আদায় হবে। রমজানের রোজা আদায় হবে না।

যদি মুসাফির রমজানের মাঝে নফল রোজার নিয়ত করে তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে–

১. ঐ সুরতে রমজানের রোজা আদায় হবে; নফল রোজা আদায় হবে না।

২. নফল রোজা আদায় হবে; রমজানের রোজা আদায় হবে না। প্রথম মতের দলিল এই যে, মুসাফির ব্যক্তি রমজানে নফল রোজার নিয়ত করে সময়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োজিত করেনি; বরং উদ্দেশ্য হলো সওয়াব হাসিল করা। আর সওয়াব নফলের তুলনায় রমজানের রোজায় অধিক। এজন্য নফল রোজার নিয়ত করা সত্ত্বেও রমজানের রোজাই আদায় হবে। দ্বিতীয় মতের দলিল হলো, মুসাফিরের ক্ষেত্রে রমজানের রোজা এমন যেমন মুকীমের ক্ষেত্রে শাবানের রোজা। শাবান মাসে নফল কিংবা অন্য ওয়াজিব যার নিয়ত করা হবে সেটিই আদায় হবে। সুতরাং এমনিভাবে মুসাফির রমজান মাসে যার নিয়ত করবে নফল কিংবা অন্য ওয়াজিবের, তা-ই আদায় হবে।

وَالضَّرْبُ الثَّانِى مَا ثَبَتَ فِى الذِّمَّةِ كَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ فَلاَ يَجُوْزُ اِلاَّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ لِاَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ وَلاَبُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ وَالنَّفْلُ كُلُّهُ يَجُوْزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ خِلاَفًا لِمَالِكٍ (رحـ) فَاِنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِاِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا كَانَ يُصْبِحُ غَيْرَ صَائِمٍ اِنِّىْ اِذًا لَصَائِمٌ وَلِاَنَّ الْمَشْرُوْعَ خَارِجَ رَمَضَانَ هُوَالنَّفْلُ فَيَتَوَقَّفُ الْاِمْسَاكُ فِىْ اَوَّلِ الْيَوْمِ عَلٰى صَيْرُوْرَتِهٖ صَوْمًا بِالنِّيَّةِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ نَوٰى بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يَجُوْزُ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) يَجُوْزُ وَ يَصِيْرُ صَائِمًا مِنْ حِيْنِ نَوٰى اِذْ هُوَ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ لِكَوْنِهٖ مَبْنِيًّا عَلَى النِّشَاطِ وَلَعَلَّهُ يَنْشَطُ بَعْدَ الزَّوَالِ اِلاَّ اَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْاِمْسَاكَ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ وَعِنْدَنَا يَصِيْرُ صَائِمًا مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ لِاَنَّهُ عِبَادَةُ قَهْرِالنَّفْسِ وَهِىَ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِاِمْسَاكٍ مُقَدَّرٍ فَيُعْتَبَرُ قِرَانُ النِّيَّةِ بِاَكْثَرِهٖ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন রোজা, যা [অনির্ধারিতভাবে] তার জিম্মায় ওয়াজিব। যেমন– রমজান মাসের কাজা রোজা এবং কাফফারার রোজা। সুতরাং রাত্রেকৃত নিয়ত ছাড়া তা জায়েজ হবে না। কেননা তা নির্ধারিত নয়। অথচ প্রথম থেকে নির্ধারণ করা জরুরি। সকল নফল রোজা মধ্যাহ্নের পূর্বে নিয়ত করা দ্বারা জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি আমাদের উল্লিখিত হাদীসের ব্যাপকতা প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন। আমাদের দলিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বে-রোজাদার অবস্থায় ভোর হওয়ার পরে বলেছেন– اِنِّىْ اِذًا لَصَائِمٌ "এখন থেকে আমি রোজা রেখে দিলাম।" তা ছাড়া যৌক্তিক কারণ এই যে, রমজানের বাইরে নফল রোজা শরিয়ত অনুমোদিত ইবাদত। সুতরাং দিনের প্রথমাংশের পানাহার সংযমটি রোজারূপে গৃহীত হওয়া নিয়তের উপর নির্ভর করবে। যেমন আমরা আগে উল্লেখ করে এসেছি। যদি মধ্যাহ্নের পরে নিয়ত করে তবে জায়েজ হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জায়েজ হবে। আর যখন নিয়ত করবে তখন থেকে সে রোজাদার বিবেচিত হবে। কেননা, তার মতে রোজা বিভাজন গ্রহণ করে। কারণ নফলের ভিত্তি হচ্ছে মনের প্রফুল্লতার উপর। এমনও হতে পারে যে, মধ্যাহ্নের পর সে প্রফুল্লতা অনুভব করল। তবে তার জন্য শর্ত হলো, দিনের শুরু থেকেই পানাহার থেকে বিরত থাকা। আমাদের মতে দিনের শুরু থেকেই সে রোজাদার বলে গণ্য হবে। কেননা, এটা হলো আত্মদমনের বিশেষ ইবাদত। আর তা নির্ধারিত সময়ে রোজা বিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং দিনের অধিকাংশ সময়ের সঙ্গে নিয়ত যুক্ত হওয়া বিবেচ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রোজার দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা তার জিম্মায় ওয়াজিব এবং এর জন্য নির্ধারিত কোনো দিন-ক্ষণ নেই। যেমন– রমজানের কাজা রোজা, কাফফারায়ে ইয়ামীনের রোজা, কাফফারায়ে জিহারের রোজা, কাফফারায়ে কতলের [হত্যার] রোজা, জাযায়ে সাইদের [শিকারের] রোজা, নজরে মুতলকের রোজা। এ সকল রোজার হুকুম হলো, রাত্রে কিংবা ভোর হওয়ার সাথে সাথেই যদি নিয়ত

করা হয় তবে জায়েজ। আর যদি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর নিয়ত করে তবে রোজা জায়েজ হবে না। কেননা এ ধরনের রোজার নির্ধারিত কোনো সময় নেই; বরং সারা বছরে রমজান এবং নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া যে-কোনো সময় রাখতে পারে। এ জন্য দিনের শুরুতেই নির্ধারণ করা জরুরি। আর দিন শুরু হয় ফজর উদিত হওয়া থেকে। এজন্য ফজরের ওয়াক্তের পূর্বে নিয়ত করবে কিংবা ফজরের ওয়াক্তের সাথে সাথেই নিয়ত করবে।

নফল রোজার জন্য অর্ধ দিনের পূর্বেই নিয়ত করা জরুরি। তাই শরয়ী দিনের অর্ধেকাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি নিয়ত করা হয় তবে রোজা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম মালিক (র.) বলেন, নফল রোজার জন্যও রাত্রে নিয়ত করা জরুরি। ফজরের ওয়াক্তের পর যদি নিয়ত করা হয়, তবে নফল রোজাও গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর দলিল এই যে-

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ .

উপরিউক্ত হাদীসটি মুতলক। এর মধ্যে ফরজ রোজা ও নফল রোজার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এজন্য সব ধরনের রোজার ক্ষেত্রেই রাত্রে নিয়ত করা একান্ত আবশ্যক।

আমাদের দলিল হলো আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস-

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى نِسَائِهِ وَيَقُوْلُ هَلْ عِنْدَكُنَّ مِنْ غِذَاءٍ فَإِنْ قُلْنَ لَا قَالَ إِنِّيْ إِذًا لَصَائِمٌ .

অর্থ- রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিবিদের গৃহে তাশরীফ নিয়ে যেতেন আর বলতেন, তোমাদের নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? যদি তাঁরা বলতেন কিছু নেই, তখন তিনি বলতেন, আমি এখন থেকে রোজাদার।

অর্থাৎ ভোর হওয়ার পর যখন তিনি খাওয়ার কোনো জিনিস না পেতেন তখন তিনি রোজার নিয়ত করে নিতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল নফল রোজার নিয়ত সূর্য উদিত হওয়ার পরও করা জায়েজ।

আর আকলী দলিল হলো, রমজানের রোজা ব্যতীত পুরো সময় নফল রোজার জন্য অনুমোদিত। সুতরাং দিনের প্রথমাংশে ইমসাক তথা পানাহার এবং সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম রোজা হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে, তবে শর্ত হলো, নিয়ত দিনের অধিকাংশে পাওয়া যেতে হবে। আর নিয়ত দিনের অধিকাংশে তখনই পাওয়া গেছে বলা হবে যখন তা দিনের অর্ধেকের পূর্বে করা হবে।

আর নফলের নিয়ত যদি মধ্যাহ্নের পর করা হয় তবে আমাদের মতে জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে রোজাদার হিসেবে তখন গণ্য হবে যখন থেকে সে রোজার নিয়ত করেছে। কেননা তাঁর মতে রোজা বিভাজন গ্রহণ করে। তাঁর দলিল এই যে, সকল কাজের ভিত্তি হচ্ছে মনের প্রফুল্লতার উপর। আর এমনও হতে পারে যে, তার মনে মধ্যাহ্নের পরেই প্রফুল্লতা অনুভব হয়। সুতরাং যখন জাওয়ালের পর প্রফুল্লতা আসল তখনই নিয়ত করে রোজা আরম্ভ করে দিল। সেক্ষেত্রে এই রোজা ঐ সময়ের নিয়ত দ্বারা গণ্য হবে। তবে তার শর্ত এই যে, দিনের শুরু থেকেই পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন- কেউ ফজরের ওয়াক্ত থেকে মধ্যাহ্নের পর পর্যন্ত কিছু পানাহার করেনি। অতঃপর মধ্যাহ্নের পর আনুমানিক দুই ঘটিকা হতে রোজার নিয়ত করল। তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দুই ঘটিকা থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তার নফল রোজা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি ফজরের পর কিছু পানাহার করে নফল রোজার নিয়ত করে তবে এই রোজা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর আমাদের মতে, রোজা যেহেতু বিভাজনযোগ্য নয় সেহেতু রোজার গ্রহণযোগ্যতা দিনের শুরু থেকেই হবে। কারণ, রোজা হলো আত্মদমনের এক বিশেষ ইবাদত। আর এই ইবাদত একটি নির্ধারিত সময় বিরত থাকা দ্বারা সংঘটিত হয়। ঐ বিরত থাকার পরিমাণ হলো পূর্ণ একদিন। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। সুতরাং দিনের অধিকাংশ সময়ের সাথে নিয়ত যুক্ত হওয়া জরুরি। অর্থাৎ যদি দিনের অধিকাংশে নিয়ত পাওয়া যায় তবে রোজা গ্রহণযোগ্য হবে, নতুবা নয়।

قَالَ وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوْا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوْا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّهْرِ فَلَا يُنْتَقَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيْلٍ وَلَمْ يُوْجَدْ وَلَا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ الشَّكِّ إِلَّا تَطَوُّعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلٰى وُجُوْهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ رَمَضَانَ وَهُوَ مَكْرُوْهٌ لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ زَادُوْا فِيْ مُدَّةِ صَوْمِهِمْ ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ يُجْزِيْهِ لِأَنَّهُ شَهِدَ الشَّهْرَ وَصَامَهُ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعًا وَإِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَقْضِهِ لِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْمَظْنُوْنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মানুষের কর্তব্য হলো শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখে চাঁদ অনুসন্ধান করা। যদি তারা চাঁদ দেখতে পায়, তাহলে রোজা রাখবে। আর যদি [মেঘের কারণে] চাঁদ তাদের অগোচরে থাকে তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। অতঃপর রোজা রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো। আর যদি চাঁদ তোমাদের অগোচরে থাকে তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।" তা ছাড়া এই কারণে যে, প্রকৃত অবস্থা হলো মাস অব্যাহত থাকা। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া উক্ত মাস থেকে বের হওয়া যাবে না। আর এখানে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। [ত্রিশ তারিখের] সন্দেহপূর্ণ দিনটিতে নফল ছাড়া অন্য কোনো রোজা রাখবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا "যে দিনটি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, তা রমজান কিনা, সে দিনে নফল ছাড়া অন্য কোনো রোজা রাখা যাবে না। এই মাসআলাটি কয়েক প্রকার– প্রথম প্রকার হলো, রমজানের নিয়ত করে রোজা রাখা মাকরূহ। দলিল হলো, আমাদের উপরে বর্ণিত হাদীস। আরো এ কারণে যে, এতে আহলে কিতাবের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়। কেননা তারা তাদের রোজার পরিমাণে বর্ধিত করেছিল। তবে রোজা রাখার পর যদি দেখা যায় যে, দিনটি রমজানেরই দিন, তাহলে তা রমজানের রোজা হিসেবে যথেষ্ট হবে। কেননা সে মাস পেয়েছে এবং তাতে রোজা রেখেছে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, দিনটি শাবান মাসের ছিল, তাহলে তা নফল হয়ে যাবে। আর যদি রোজা ভঙ্গ করে, তাহলে তার কাজা করবে না। কেননা তা ধারণা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শাবানের উনত্রিশ তারিখে রমজানের চাঁদ দেখা ওয়াজিবে কিফায়াহ। কেননা, মাস কখনো উনত্রিশ দিনে হয় আবার কখনো ত্রিশ দিনে হয়। সুতরাং শাবানের উনত্রিশ তারিখে যদি চাঁদ দেখা যায় তবে রোজা রাখবে। আর যদি চাঁদ না দেখা যায় তবে শাবানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করবে এবং পরের দিন রোজা রাখবে। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী–

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ـ

আকলী দলিল হলো, প্রকৃত অবস্থা শাবান মাস অব্যাহত থাকা। কেননা শাবান মাস অতীত থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে চলে আসছে। তাই প্রমাণ ছাড়া উক্ত মাস থেকে রমজানের মাসের দিকে বের হওয়া যাবে না। আর এখানে কোনো দলিল– প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব বুঝা গেল, ২৯ তারিখে অবশ্যই চাঁদ দেখা যায়নি; বরং মেঘ ইত্যাদির কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর সন্দেহের কারণে একিন দূরীভূত হয় না। সুতরাং ২৯ তারিখে চাঁদের সন্দেহের কারণে শাবান মাস শেষ হয়নি; বরং ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত শাবান মাস অব্যাহত থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَصُوْمُوْنَ الخ : يَوْمُ الشَّكِّ [ইয়াওমুশ শাক] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাবানের শেষ দিন, যার ব্যাপারে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তা রমজানের প্রথম দিন এবং এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শাবানের শেষ দিন অর্থাৎ শাবানের ত্রিশ তারিখ। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, শাবানের শেষ দিন অর্থাৎ শাবানের ত্রিশ তারিখ সন্দেহপূর্ণ দিন (يَوْمُ الشَّكِّ) তখন হবে যখন শাবানের উনত্রিশ তারিখে উদয়াচল (مَطْلَعْ) পরিষ্কার না থাকার কারণে চাঁদ উদয় হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছিল। যদি উদয়াচল পরিষ্কার হয় তবে পরের দিনকে সন্দেহপূর্ণ দিন বলা যাবে না। মোদ্দা কথা সন্দেহপূর্ণ দিনে নফল রোজা ব্যতীত অন্য কোনো রোজা রাখা যাবে না। দলিল হলো এই হাদীস– لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ হিদায়া গ্রন্থকার উপরিউক্ত মাসআলার পাঁচটি সুরত বর্ণনা করেছেন– প্রথম প্রকার হলো কেউ সন্দেহপূর্ণ দিনে রমজানের রোজার নিয়ত করল। এটি মাকরূহ। দলিল হলো উপরে বর্ণিত হাদীস। তবে এর উপর একটি প্রশ্ন হয়। তা-হলো, হাদীসের মধ্যে لَا يُصَامُ টি نَفِىْ-এর সীগাহ। আর نَفِىْ নাজায়েজকে বুঝায়। তাই এর দ্বারা সন্দেহপূর্ণ দিনে রমজানের রোজার নিয়তে রোজা রাখা নাজায়েজ প্রমাণিত হয়; মাকরূহ নয়।

জওয়াব : হাদীসের মধ্যে نَفِىْ টি نَهِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর نَهِىْ দ্বারা অনুমোদন বুঝা যায়। সুতরাং বুঝা গেল, সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজার নিয়তে রোজা রাখার মৌলিভাবে অনুমোদন তো রয়েছে তবে نَهِىْ-এর কারণে اَلْمَمْنُوْعُ وَلِغَيْرِهٖ আর اَلْمَمْنُوْعُ لِغَيْرِهٖ-এর অপর নাম হলো মাকরূহ। এ কারণে বলা হয়েছে যে, ঐ দিনে রমজানের নিয়তে রোজা রাখা জায়েজ তো বটে তবে মাকরূহ।

আকলী দলিল এই যে, সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজার নিয়তে রোজা রাখার মধ্যে ইহুদি ও নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা, তারা তাদের রোজার পরিমাণের মধ্যে বর্ধিত করতো। তার কারণ ছিল, যদি কখনো রোজা গরমের মৌসুমে হতো তখন তাদের আলিমগণ তা শীতের মৌসুমে করে দিতো। উক্ত পরিবর্তনের কারণে কিছু রোজা বৃদ্ধি হয়ে যেতো। সুতরাং যেহেতু সন্দেহপূর্ণ দিনে রমজানের রোজা রাখার মধ্যে উপরিউক্ত সাদৃশ্য রয়েছে, তাই ঐ দিনে রমজানের রোজার নিয়তে রোজা রাখাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। মোট কথা, সন্দেহপূর্ণ দিনে রমজানের নিয়তে রোজা রাখা মাকরূহ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কেউ যদি রোজা রাখে এবং পরে জানা যায় যে, এটি প্রকৃতপক্ষে রমজানেরও দিন ছিল, তবে তার এই রোজা রমজানের রোজা হিসেবেই গণ্য হবে। তার উপর ঐ দিনের রোজার কাজা করতে হবে না। কেননা এ ব্যক্তি রমজানের মাস পেয়েছে এবং তাতে রোজা রেখেছে। তাই সে আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-এর উপর আমলকারী হয়ে গেল।

আর যদি পরে জানা যায় যে, এটি শাবানের দিন ছিল, তাহলে তা নফল রোজা হয়ে যাবে এবং মাকরূহের সাথে জায়েজ হবে। আর যদি সে রোজা ভঙ্গ করে এবং প্রমাণিত হয় যে, এটি শাবানের দিন তবে তার উপর তা কাজা করা অপরিহার্য হবে না। কেননা এই ব্যক্তি ধারণা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সে এই ধারণার সাথে রোজা আরম্ভ করেছে যে, তা আমার উপর ওয়াজিব। অথচ তা ওয়াজিব ছিল না। আর ধারণায় নিপতিত লোকের উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। যেমন– এক ব্যক্তি জোহরের নামাজ পড়ল পরে তা তার স্মরণ নেই বিধায় সে দ্বিতীয়বার জোহরের ফরজ নামাজ আরম্ভ করে দিল। তারপর স্মরণ হলো যে, জোহরতো পড়েছে। এখন সে যদি জোহরের নামাজ পূর্ণ করে তবে তা নফল হয়ে যাবে। আর যদি মাঝখানে ভঙ্গ করে দেয় তবে উক্ত নফলের কাজা ওয়াজিব হবে না। সুতরাং এমনিভাবে যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ দিনে রমজানের নিয়তে রোজা রাখল এবং পরে জানা গেল যে, আজকে রমজান শুরু হয়নি। এখন সে যদি এই রোজা পূর্ণ করে তবে নফল হয়ে যাবে আর যদি মাঝখানে রোজা ভঙ্গ করে তবে তার কাজা ওয়াজিব হবে না।

وَالثَّانِي أَنْ يَنْوِيَ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا إِلَّا أَنَّ هٰذَا دُوْنَ الْأَوَّلِ فِي الْكَرَاهَةِ ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يُجْزِيْهِ لِوُجُوْدِ أَصْلِ النِّيَّةِ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ قِيْلَ يَكُوْنُ تَطَوُّعًا لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَتَأَدّٰى بِهِ الْوَاجِبُ وَقِيْلَ يُجْزِيْهِ عَنِ الَّذِيْ نَوَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُوَ التَّقَدُّمُ عَلٰى رَمَضَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ لَا يَقُوْمُ بِكُلِّ صَوْمٍ بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيْدِ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُوَ تَرْكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ وَالْكَرَاهَةُ هُنَا بِصُوْرَةِ النَّهْيِ.

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার এই যে, [রমজান ছাড়া] অন্য কোনো ওয়াজিব রোজার নিয়ত করল। সেটাও মাকরূহ। দলিল, ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তবে মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রথমটির তুলনায় গৌণ। এরপর যদি দেখা যায় যে, দিনটি রমজানের দিন ছিল, তাহলে রমজানের রোজা হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, রোজার মূল নিয়ত বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ পায় যে, তা শাবানের দিন ছিল, তাহলে কারো কারো মতে তা নফল হবে। কেননা, এ রোজা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং তা ছাড়া ওয়াজিব রোজা আদায় হবে না। কোনো কোনো মতে, যে রোজার নিয়ত করেছে তা আদায় হয়ে যাবে। এটি বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা যে রোজাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো রমজানের উপর রমজানের রোজাকে অগ্রবর্তী করা। সব ধরনের রোজা দ্বারা তা বাস্তবায়িত হবে না। ঈদের দিনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এখানে নিষিদ্ধ বিষয়টি অর্থাৎ আল্লাহর দাওয়াত গ্রহণ করাকে বর্জন করা যে কোনো রোজা দ্বারা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর সেখানে মাকরূহ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে নিষেধ হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দ্বিতীয় প্রকার হলো. সন্দেহপূর্ণ দিনে রমজান ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াজিবের নিয়ত করল। যেমন– বিগত রমজানের কাজা রোজার নিয়ত করল, কিংবা কাফফারার রোজার নিয়ত করল। তবে এটিও মাকরূহের সাথে জায়েজ হবে। দলিল হলো– ঐ হাদীস যা ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ الْحَدِيْثَ তবে মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে এ সুরতটি প্রথম সুরতের তুলনায় গৌণ। কেননা এই সুরতের মধ্যে আহলে কিতাবের সাথে সাদৃশ্য লাযিম আসে না। এখন অন্য ওয়াজিবের নিয়তের সাথে রোজা রাখার পর যদি জানা যায় যে, এটি রমজানের দিন ছিল তবে রমজানের রোজা হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা অন্য ওয়াজিবের ভিতরে মূল নিয়ত পাওয়া গেছে। আর মূল নিয়ত দ্বারা রমজানের রোজা আদায় হয়ে যায়। এজন্য এই রোজাটি রমজানের রোজা হিসেবেই গণ্য হবে।

আর যদি পরে জানা যায় যে, এই দিনটি শাবানের দিন ছিল। তাহলে কারো কারো মতে, এই রোজাটি অন্য ওয়াজিবের নিয়ত থাকা সত্ত্বেও নফল হবে। কেননা সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজা রাখা নিষিদ্ধ ছিল। এজন্য এই দিনের রোজা অসম্পূর্ণ হবে। আর যে রোজা তার জিম্মায় ওয়াজিব তা হলো পরিপূর্ণ। তাই পরিপূর্ণের আদায় অপরিপূর্ণের দ্বারা হবে না। যেমন– ঈদের দিন যদি অন্য কোনো ওয়াজিবের রোজা রাখা হয় তবে সেই ওয়াজিব রোজা আদায় হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যে ওয়াজিবের

নিয়ত করেছে তা আদায় হয়ে যাবে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা, আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

لَا تَتَقَدَّمُوا عَلَى رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ ـ

"রমজানের উপর এক এবং দুই দিনের রোজা অগ্রবর্তী করো না"– এর মধ্যে রমজানের রোজা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রমজানের উপর এক কিংবা দুই রমজানের রোজা মনে করে অগ্রবর্তী করো না। মোট কথা, রমজানের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়নি; বরং রমজানের পূর্বে রমজান মনে করে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। আর যে অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করেছে স্পষ্টত সে তা রমজানের রোজা মনে করে আদায় করেনি। এজন্য অন্য ওয়াজিবের রোজা ঐ দিন নিষিদ্ধ হবে না। আর যেহেতু নিষিদ্ধ নয় তাই ঐ দিন অন্য ওয়াজিবের রোজা রাখা দ্বারা অন্য ওয়াজিবের রোজাই আদায় হবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে ঈদের দিনে রোজা রাখা এই কারণে নিষিদ্ধ যে, ঈদের দিন আল্লাহর সকল বান্দা তাঁর মেহমান হয়। তাই ঐ দিন রোজা রাখা মানে আল্লাহর দাওয়াতকে অস্বীকার করা। আর আল্লাহর দাওয়াত বর্জন করা নিষিদ্ধ। এ কারণেই ঈদের দিন রোজা রাখতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা দাওয়াত বর্জন করার অর্থ সব ধরনের রোজার মধ্যেই পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَالْكَرَاهَةُ هُنَا بِصُوْرَةِ النَّهْيِ : এই ইবারতটি দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, যখন রমজানের উপর রমজানের রোজা মনে করে অগ্রবর্তী করা নিষিদ্ধ তখন রমজানের পূর্বে অন্য ওয়াজিবের রোজা মাকরূহ ছাড়াই জায়েজ হওয়া উচিত ছিল। অথচ আপনি বলেছেন, মাকরূহের সাথে জায়েজ হবে।

উত্তর : বাহ্যত (صُوْرَةً) نَهْيٌ পাওয়া গেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الْحَدِيْثَ এজন্য অন্য ওয়াজিবের রোজাকে মাকরূহে তানজীহী বলা হয়েছে।

وَالثَّالِثُ اَىْ يَنْوِىَ التَّطَوُّعَ وَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ لِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِىْ قَوْلِهِ يُكْرَهُ عَلَى سَبِيْلِ الْاِبْتِدَاءِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ اَلْحَدِيْثُ نَهَى التَّقَدُّمِ بِصَوْمِ رَمَضَانَ لِاَنَّهُ يُؤَدِّيْهِ قَبْلَ اَوَانِهِ ثُمَّ اِنْ وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ فَالصَّوْمُ اَفْضَلُ بِالْاِجْمَاعِ وَكَذَا اِذَا صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَصَاعِدًا وَاِنْ اَفْرَدَهُ فَقَدْ قِيْلَ اَلْفِطْرُ اَفْضَلُ اِحْتِرَازًا عَنْ ظَاهِرِ النَّهْيِ وَقِيْلَ الصَّوْمُ اَفْضَلُ اِقْتِدَاءً بِعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ (رضـ) فَاِنَّهُمَا كَانَا يَصُوْمَانِهِ وَالْمُخْتَارُ اَنْ يَصُوْمَ الْمُفْتِىْ بِنَفْسِهِ اَخْذًا بِالْاِحْتِيَاطِ وَيُفْتِى الْعَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ اِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ثُمَّ بِالْاِفْطَارِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ.

অনুবাদ : তৃতীয় প্রকার, নফলের নিয়ত করা। এটি মাকরূহ নয়। দলিল, ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। আর উক্ত হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য, 'নতুনভাবে রোজা রাখা ঐ দিন মাকরূহ' -এর বিপক্ষে প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীস– لَا تَتَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ "তোমরা একটি বা দুটি রোজা দ্বারা রমজানের অগ্রগামী হয়ো না"-এর উদ্দেশ্য হলো, রমজানের রোজা রেখে অগ্রবর্তী হওয়া থেকে নিষেধ করা। কেননা এতে সময়ের পূর্বেই রমজানের রোজা রাখা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি ঐ দিনটি এমন কোনো দিন হয় যাতে সে পূর্ব হতেই রোজা রেখে আসছে, তাহলে সকলের ঐকমত্যেই রোজা রাখা উত্তম। তদ্রূপ যদি এমন হয় যে, [শাবান] মাসের [কিংবা প্রত্যেক মাসের] শেষ তিন দিন কিংবা ততোধিক দিন সে রোজা রেখে এসেছে, তাহলে তার জন্য রোজা রাখাই উত্তম। পক্ষান্তরে যদি শুধু ঐ একদিন রোজা রাখার অভ্যাস হয়ে থাকে, তাহলে কোনো কোনো মতে বাহ্যত নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য রোজা না রাখাই উত্তম। আর কোনো কোনো মতে হযরত আলী ও আয়েশা (রা.)-এর অনুসরণে রোজা রাখাই উত্তম। কেননা তাঁরা ঐ দিন রোজা রাখতেন। আর স্বীকৃত মত হলো, মুফতি [ও অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিগণ] সতর্কতার খাতিরে নিজে রোজা রাখবেন, কিন্তু সাধারণ লোকদের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর পানাহার করার ফতোয়া প্রদান করবেন। [নিজে গোপনে রোজা রাখবেন] অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তৃতীয় প্রকার হলো, সন্দেহপূর্ণ দিনে নফল রোজার নিয়ত করা। ঐ দিন নফল রোজা মাকরূহ নয়। কেননা لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ اِلَّا تَطَوُّعًا -এর মধ্যে নফল রোজাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সন্দেহপূর্ণ দিনে নতুনভাবে রোজা রাখা মাকরূহ। নতুনভাবে রোজা রাখার অর্থ হলো, সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজা রাখা তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী ছিল না এবং তার প্রতি মাসের শেষ দিনগুলোতে রোজা রাখারও অভ্যাস ছিল না। যেমন– সন্দেহপূর্ণ দিনটি হলো শনিবার। তার সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখার অভ্যাস ছিল এবং ঐ ব্যক্তির মাসের শেষ দিনগুলোর রোজা রাখারও অভ্যাস ছিল না। তবে এই শনিবার সকলের মতে সন্দেহপূর্ণ দিন। যদি সে ঐ দিন রোজা রাখে তবে তার এই রোজা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল لَا تَتَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمِ

يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ صَوْمًا يَصُوْمُهُ رَجُلٌ "রমজানের উপর এক কিংবা দুই রোজা অগ্রগামী করো না। তবে যদি তা রোজাদারের রোজা অনুযায়ী হয় যা সে রেখেছিল।" উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজা রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। তবে যদি এই রোজা তার অভ্যাস অনুযায়ী হয়ে যায়। যেমন কারো অভ্যাস হলো, প্রতি বৃহস্পতিবার রোজা রাখার। ঘটনাক্রমে বৃহস্পতিবারই সন্দেহপূর্ণ দিন (يَوْمُ الشَّكِّ) পড়ে গেল। তবে এ অবস্থায় সেদিন নফল রোজা রাখা মাকরূহ হবে না।

আমাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- لَا صِيَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ الخ -এর মধ্যে إِلَّا تَطَوُّعًا বাক্যটি। কেননা, উক্ত হাদীসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহপূর্ণ দিনে নফল রোজা রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। চাই তা তার অভ্যাস অনুযায়ী হোক বা না হোক। সুতরাং উক্ত হাদীসটি তার ব্যাপকতার কারণে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত হাদীসের জবাব হলো, যে রোজাকে রমজানের উপর অগ্রগামী করতে নিষেধ করা হয়েছে তা রমজানের রোজা। অর্থাৎ রমজানের পূর্বে কোনো রোজা রমজান মনে করে না রাখা। কেননা যদি রমজানের পূর্বে রমজানের রোজা রাখা হয় তবে সময়ের পূর্বেই রোজা রাখা হয়ে যায়। আর রমজানের রোজা রমজান মাসের পূর্বে রাখার দ্বারা আদায় হবে না। হাদীসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়নি। এজন্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর "নতুনভাবে সন্দেহপূর্ণ দিনে নফল রোজা রাখা মাকরূহ বলা ঠিক হবে না।"

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি এই নফল রোজা এমন দিনে পড়ে যায় যেদিনে রোজা রাখা তার অভ্যাস ছিল। তবে এই সুরতে রোজা রাখা সকলের মতে উত্তম। যেমন- সোমবার রোজা রাখা তার অভ্যাস ছিল বিধায় সে প্রত্যেক সোমবারে রোজা রাখতো। এখন ঘটনাক্রমে সন্দেহপূর্ণ দিনটিও সোমবারেই পড়ে গেল। তবে এই দিনে নফল রোজা রাখা সকলের মতে উত্তম। এমনিভাবে যদি তার অভ্যাস প্রত্যেক মাসের শেষ তিনদিন কিংবা ততোধিক দিন রোজা রাখার হয়। এ সুরতেও সন্দেহপূর্ণ দিনে নফল রোজা রাখা উত্তম হবে। আর যদি সন্দেহপূর্ণ দিন তার অভ্যাস অনুযায়ী না পড়ে এবং তার প্রত্যেক মাসের শেষ তিনদিন কিংবা কমবেশি রোজা রাখার অভ্যাসও নেই; বরং এমনিতেই সন্দেহপূর্ণ দিনে নফল রোজা রাখে। তবে শায়খ মুহাম্মদ বিন সালামার মতে রোজা না রাখা উত্তম। যাতে প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞা لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ থেকে বিমুখতা প্রকাশ পায়। নাসীর ইবনে ইয়াহইয়ার মতে রোজা রাখা উত্তম। দলিল, রোজা রাখার মধ্যে হযরত আলী ও আয়েশা (রা.)-এর অনুসরণ হয়ে থাকে। কেননা তাঁরা উভয়েই সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজা রাখতেন। আর বলতেন, শাবানের দিনে রোজা রাখা পছন্দনীয়- রমজানের দিনে রোজা না রাখার তুলনায়। অর্থাৎ এ দিন যদি শাবানের দিন হয় তবে রোজা রাখতে কি অসুবিধা? কিন্তু যদি রমজানের দিন হয় আর আমরা রোজা না রাখি তবে রমজানের মধ্যে রোজা ভঙ্গ করা বুঝাবে। উল্লেখ্য যে, এটি একেবারেই অপছন্দনীয়। এজন্য এ দিনে রোজা রাখাও উত্তম। চাই তা [সন্দেহপূর্ণ দিনটি] শাবানের দিন হোক বা রমজানের দিন হোক।

হিদায়া গ্রন্থকারের মতে গ্রহণযোগ্য মাজহাব হলো, মুফতি নিজে সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজা রাখবে, তাহলে সতর্কতার উপর আমল হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু ঐ দিনে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি রমজানের দিন, সেহেতু মুফতি যদি ঐ দিন রোজা না রাখে তাহলে রমজানের মধ্যে ইফতার করার নামান্তর হবে। আর এটি সতর্কতা বিরোধী কাজ। তাই সতর্কতা রোজা রাখার মধ্যে নিহিত। তবে মুফতি সাধারণ লোকদেরকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ফতোয়া দেবে। যদি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত চাঁদের প্রমাণ পাওয়া যায় তো ভালো। নতুবা পুনরায় রোজা না রাখার ফতোয়া দেবেন। কেননা, এর দ্বারা অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকা যাবে। প্রথমত-এজন্যে যে, যেহেতু রাফিজীদের মতে সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজা রাখা ওয়াজিব। এখন যদি মুফতি সন্দেহপূর্ণ দিনে সাধারণ লোকদেরকে রোজা রাখার ফতোয়া দেয়, তবে দুনিয়ার লোকেরা মুফতিকে অপবাদ দেবে যে, দেখো! মুফ্তি সাহেব রাফিজী হয়ে গেছে। এই অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে রোজা ভঙ্গের ফতোয়া দেবে। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা হাদীসের পূর্ণ মর্ম তো বুঝবে না; বরং মুফতিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরোধিতার অভিযোগ দেবে। এজন্য মুফ্তির উচিত হবে সন্দেহপূর্ণ দিনে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সাধারণ লোকদেরকে রোজা ভঙ্গের ফতোয়া দেওয়া।

وَالرَّابِعُ اَنْ يَضْجَعَ فِى اَصْلِ النِّيَّةِ بِاَنْ يَنْوِىَ اَنْ يَصُوْمَ غَدًا اِنْ كَانَ رَمَضَانُ وَلَا يَصُوْمُهُ اِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَفِىْ هٰذَا الْوَجْهِ لَا يَصِيْرُ صَائِمًا لِاَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ عَزِيْمَتَهُ فَصَارَ كَمَا اِذَا نَوٰى اَنَّهُ اِنْ وَجَدَ غَدًا غِذَاءً يُفْطِرُ وَاِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُوْمُ وَالْخَامِسُ اَنْ يَضْجَعَ فِىْ وَصْفِ النِّيَّةِ بِاَنْ يَنْوِىَ اِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ يَصُوْمُ عَنْهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَهٰذَا مَكْرُوْهٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ اَمْرَيْنِ مَكْرُوْهَيْنِ ثُمَّ اِنْ ظَهَرَ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ اَجْزَاهُ لِعَدَمِ التَّرَدُّدِ فِىْ اَصْلِ النِّيَّةِ وَاِنْ ظَهَرَ اَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ لِاَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَثْبُتْ لِلتَّرَدُّدِ فِيْهَا وَاَصْلُ النِّيَّةِ لَا يَكْفِيْهِ لٰكِنَّهُ يَكُوْنُ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَضْمُوْنٍ بِالْقَضَاءِ لِشُرُوْعِهِ فِيْهِ مُسْقِطًا وَاِنْ نَوٰى عَنْ رَمَضَانَ اِنْ كَانَ غَدًا مِنْهُ وَعَنِ التَّطَوُّعِ اِنْ كَانَ غَدًا مِنْ شَعْبَانَ يُكْرَهُ لِاَنَّهُ نَاوٍ لِلْفَرْضِ مِنْ وَجْهٍ ثُمَّ اِنْ ظَهَرَ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ اَجْزَاهُ عَنْهُ لِمَا مَرَّ وَاِنْ ظَهَرَ اَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ جَازَ عَنْ نَفْلِهِ لِاَنَّهُ يَتَاَدّٰى بِاَصْلِ النِّيَّةِ وَلَوْ اَفْسَدَهُ يَجِبُ اَنْ لَّا يَقْضِيَهُ لِدُخُوْلِ الْاِسْقَاطِ فِىْ عَزِيْمَتِهِ مِنْ وَجْهٍ .

অনুবাদ : চতুর্থ প্রকার হলো, মূল নিয়তের মধ্যে দোদুল্যমান হওয়া। এভাবে নিয়ত করা যে, আগামীকাল রমজান হলে রোজা রাখবে। আর শাবান হলে রোজা রাখবে না। এভাবে সে রোজাদার হবে না। কেননা সে তার নিয়তকে স্থির করেনি। সুতরাং এমনই হলো, যেন সে নিয়ত করল যে, আগামীকাল যদি সে খাবার পায় তাহলে রোজা রাখবে না, আর খাবার না পেলে রোজা রাখবে। পঞ্চম প্রকার হলো, নিয়তের প্রকৃতির ক্ষেত্রে দ্বিধা পোষণ করা। অর্থাৎ এই নিয়ত করা যে, আগামীকাল রমজানের দিন হলে রমজানের রোজা রাখবে। আর শাবানের দিন হলে অন্য ওয়াজিব রোজা রাখবে। এটা মাকরূহ। কেননা সে দুটি মাকরূহ বিষয়ের মাঝে দোদুল্যমান রয়েছে। অতঃপর যদি প্রকাশ পায় যে, দিবসটি রমজানের দিবস, তাহলে ঐ রোজাই যথেষ্ট হবে। কেননা মূল নিয়তের ক্ষেত্রে তো কোনো দ্বিধা নেই। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ পায় যে, তা শাবানের দিবস, তাহলে এ রোজা অন্য কোনো ওয়াজিব রোজারূপে যথেষ্ট হবে না। কেননা দ্বিধান্বিত থাকার কারণে দিক নির্ধারিত হয়নি। আর মূল নিয়ত তার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে তা এমন নফল রোজায় রূপান্তরিত হবে, যা [ভঙ্গ করলে] কাজা জিম্মায় আসে না। কেননা সে তা শুরুই করেছে জিম্মা থেকে অব্যাহতির নিয়তে। আর যদি সে এই নিয়ত করে যে, আগামীকাল রমজান হলে তার রোজা রমজানের রোজা হবে, আর শাবান হলে নফল রোজা হবে, তাহলে তাও মাকরূহ। কেননা এক দিক থেকে সে [রমজানের] ফরজ রোজার নিয়ত করেছে। অতঃপর যদি প্রকাশ পায় যে, সে দিবসটি রমজানের দিবস, তাহলে তা রমজানের রোজা হিসেবে যথেষ্ট হবে। কারণ ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে [অর্থাৎ মূল নিয়তে কোনো দ্বিধা নেই]। আর যদি প্রকাশ পায় যে, তা শাবানের দিবস, তাহলে নফল হিসেবে তা জায়েজ হবে। কেননা নফল মূল নিয়তের দ্বারা আদায় হয়ে যায়। যদি তা ফাসেদ করে ফেলে তাহলে কাজা না হওয়াই উচিত। কেননা, তার নিয়তের মধ্যেই এক হিসেবে জিম্মা হতে অব্যাহতির লক্ষ্য বিদ্যমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চতুর্থ প্রকার হলো, নিয়তকে রোজা রাখা-না রাখার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা অর্থাৎ সন্দেহপূর্ণ রাত্রে (لَيْلَةُ يَوْمِ الشَّكِّ) এই নিয়ত করা যে, যদি আগামীকাল রমজান হয় তবে রোজা রাখব। আর যদি শাবান হয় তবে রোজা রাখব না। এ ধরনের নিয়ত দ্বারা রোজা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ সুরতে তার নিয়ত অকাট্য নয়; বরং মূল নিয়তের মধ্যে দোদুল্যমান। যদি মূল নিয়তে সংশয় পাওয়া যায় তবে রোজা গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন– কেউ এই নিয়ত করল যে, যদি আগামীকাল খাবার পায় তবে রোজা রাখবে না। আর যদি খাবার না পায় তবে রোজা রাখবে। এই সুরতেও রোজা দুরস্ত হবে না। হ্যাঁ যদি সন্দেহপূর্ণ দিনে মধ্যাহ্নের পূর্বেই রমজানের চাঁদের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সে দৃঢ় নিয়ত করে নেয় তবে রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি মধ্যাহ্নের পর চাঁদের প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ঐ দিনের রোজা মূল নিয়তের মধ্যে সংশয়ের কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সন্দেহপূর্ণ দিনের রোজার পঞ্চম প্রকার হলো, নিয়তের প্রকৃতির মধ্যে সংশয় পোষণ করা। যেমন, এভাবে বলল, যদি আগামীকাল রমজানের দিন হয় তবে আমি রমজানের রোজা রাখব। আর যদি শাবানের দিন হয়, তবে অন্য ওয়াজিব অর্থাৎ কাজা কিংবা কাফফারার রোজা রাখব। এই সুরতটি মাকরূহ। কেননা, যে দুটি রোজার মাঝে নিয়তকে সম্পৃক্ত রেখেছে এতদুভয় রোজাই ঐ দিন মাকরূহ। অর্থাৎ সন্দেহপূর্ণ দিনে রমজানের রোজার নিয়ত করা যেমন মাকরূহ তদ্রূপ অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করাও মাকরূহ। অতঃপর রোজা রাখার পর যদি প্রকাশ পায় যে, দিনটি রমজানের দিন ছিল তবে রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে। কেননা মূল নিয়তের মধ্যে কোনো সংশয় পাওয়া যায়নি। আর রমজানের রোজা মূল নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। এজন্য এই নিয়ত দ্বারাও রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, দিনটি শাবানের দিন ছিল তবে অন্য ওয়াজিবের রোজা আদায় হবে না। কেননা নিয়তের প্রকৃতির মধ্যে সংশয়ের কারণে ওয়াজিব হওয়ার দিকটি প্রমাণিত হয়নি। তবে মূল নিয়ত পাওয়া গেছে। কিন্তু মূল নিয়ত অন্য ওয়াজিবের রোজা আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, মূল নিয়তের দ্বারা অন্য কোনো ওয়াজিব রোজা নির্ধারণ হয় না। অথচ নির্ধারণ করা জরুরি। তবে এই রোজাটি এমন নফল হবে, যা ভঙ্গ করলে কাজা অপরিহার্য হবে না। অর্থাৎ যদি ঐ রোজা ভঙ্গ করে তবে তার কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা সে এই রোজা এমন নিয়ত দ্বারা আরম্ভ করেছিল যার কারণে তার জিম্মা থেকে ওয়াজিব রহিত হয়ে যায় অর্থাৎ রমজানের রোজা আদায় হয়ে যায়। কিন্তু জানা গেল, তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়নি। এ কারণে যে, রমজানের প্রমাণই হয়নি। সুতরাং তা ভঙ্গের দ্বারা কাজা অপরিহার্য হবে না। কেননা এটিও ধারণাপ্রসূত রোজার ন্যায় হয়ে গেল।

আর যদি সন্দেহপূর্ণ দিনের রাত্রে এই নিয়ত করে যে, যদি আগামীকাল রোজা হয় তবে আমার রোজা রমজানের হবে আর যদি শাবান হয় তবে আমার রোজা নফল হবে– এটাও মাকরূহ। কেননা এই সুরতেও একদিক থেকে ফরজের নিয়ত পাওয়া গেছে, অথচ ঐ দিন ফরজের নিয়ত করা মাকরূহ। আর যদি পরে প্রকাশ পায় যে, ঐ দিন রমজানের ছিল তবে রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে। কেননা মূল নিয়তের মধ্যে সংশয় পাওয়া যায়নি। আর যদি প্রকাশ পায় যে, ঐ দিন শাবানের ছিল তবে নফল রোজা হয়ে যাবে। কেননা, নফল রোজা মূল নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। যদি তা ভঙ্গ করে দেয় তবে তার কাজা করতে হবে না। কেননা কাজা তখন ওয়াজিব হয় যখন নিয়তের মধ্যে দৃঢ়তা পাওয়া যায়। আর এখানে দৃঢ়তা নেই। কারণ যেখানে সে নফল রোজার নিয়ত করেছে তার সাথে সাথে তা রমজানের হওয়ার সুরতে নিজের জিম্মা থেকে ফরজের অব্যাহতিরও নিয়ত করেছে। সুতরাং এটাও ধারণাপ্রসূত রোজার সদৃশ হয়ে গেল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধারণাপ্রসূত রোজা ভঙ্গ করলে তার কাজা ওয়াজিব হয় না।

وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ لِقَوْلِهِ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَقَدْ رَأَى ظَاهِرًا وَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ أَفْطَرَ بِالْوِقَاعِ لِأَنَّهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ حَقِيقَةً لِتَيَقُّنِهِ بِهِ وَحُكْمًا لِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلَنَا أَنَّ الْقَاضِيَ رَدَّ شَهَادَتَهُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ تُهْمَةُ الْغَلَطِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً وَهٰذِهِ الْكَفَّارَةُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَلَوْ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيهِ وَلَوْ أَكْمَلَ هٰذَا الرَّجُلُ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْوُجُوْبَ عَلَيْهِ لِلْاِحْتِيَاطِ وَالْاِحْتِيَاطُ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي تَاخِيْرِ الْاِفْطَارِ وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ اِعْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ الَّتِي عِنْدَهُ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি একা রমজানের চাঁদ দেখল, সে রোজা রাখবে। যদিও ইমাম তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো।" যদি সে রোজা ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে; কাফফারা ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি স্ত্রী সহবাস দ্বারা রোজা ভঙ্গ করে, তাহলে তার উপর কাফফারাও ওয়াজিব হবে। কেননা সে রমজান সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। আর হুকুম হিসেবেও [সে রমজানের রোজা ভঙ্গ করেছে], কেননা তার উপর রোজা ওয়াজিব ছিল। আমাদের মতে, কাজি শরিয়তসম্মত দলিলের ভিত্তিতে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। দলিলটি হলো ভুল দেখার সম্ভাবনা। ফলে তা সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আর এরূপ কাফফারা সন্দেহের দ্বারা রহিত হয়ে যায়। ইমাম তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার পূর্বেই যদি সে রোজা ভঙ্গ করে ফেলে, তাহলে সে বিষয়ে মাশায়েখগণের মতভেদ রয়েছে। [সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত] এই লোক যদি ত্রিশদিন রোজা পূর্ণ করে, তাহলে সে একমাত্র ইমামের সঙ্গেই রোজা বর্জন করতে পারবে। কেননা সতর্কতা হিসেবেই তার উপর রোজা ওয়াজিব হয়েছিলো। আর পরবর্তীতে সতর্কতা হলো, রোজা বর্জন বিলম্বিত করার মধ্যে, তবে যদি রোজা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার ধারণা অনুযায়ী সাব্যস্তকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ একাকী চন্দ্রের উদয়স্থল পরিষ্কার থাকাবস্থায় জাগ্রত থেকে সজ্ঞানে রমজানের চাঁদ দেখে তবে এ ব্যক্তি নিজে রোজা রাখবে, যদি ইমাম তার সাক্ষ্য কোনো কারণে গ্রহণ না করে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো।' যেহেতু তার ক্ষেত্রে চাঁদ দেখা গিয়েছে, সুতরাং তার উপর রোজা ওয়াজিব হয়ে গেছে। অধিকন্তু যখন সে জাগ্রত অবস্থায় বাহ্যত চাঁদ দেখেছে, তার ক্ষেত্রে মাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে রমজান উপস্থিত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "সুতরাং যার ক্ষেত্রে রমজান মাস উপস্থিত তার উপর রমজানের রোজা ফরজ হয়ে গেল।" সুতরাং আয়াত ও হাদীস উভয়টি তার ক্ষেত্রে রমজানের রোজা ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। যদি সে ঐ দিন রোজা রেখে ভেঙ্গে ফেলে, যদিও সহবাস দ্বারা ভঙ্গ করে, তবে তার উপর শুধু কাজা ওয়াজিব হবে; কাফফারা ওয়াজিব হবে

না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি সহবাস দ্বারা ঐ রোজা ভেঙ্গে দেয় তবে তার উপর কাজার সাথে সাথে কাফফারাও ওয়াজিব হবে। আর যদি পানাহার দ্বারা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর রোজার কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এ অভিমতটিই ব্যক্ত করেছেন ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, ঐ লোকটির ক্ষেত্রে রমজানের রোজা বাস্তবিক পক্ষে এবং হুকুম হিসেবে তথা শরিয়তের বিধান মতে পাওয়া গেছে। বাস্তবিক পক্ষে এভাবে যে, চাঁদ দেখার কারণে তার রমজানের আগমনের কথা বিশ্বাস হয়ে গেছে। আর হুকুম হিসেবে এভাবে যে, শরিয়ত তার উপর রোজা ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং যখন তার ব্যাপারে রমজান প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান এবং বিধানগতভাবেও বিদ্যমান, তখন সে যেন রমজানের রোজা রেখে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভেঙ্গে দিয়েছে। রমজানের রোজা ইচ্ছাকৃত ভাঙ্গার কারণে কাজা এবং কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়। এজন্য ঐ ব্যক্তির উপর কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হলো, কাজি যখন তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন এই ব্যক্তি শরয়ীভাবে মিথ্যুক সাব্যস্ত হলো। কাজি তার সাক্ষ্যকে শরিয়তের দলিলের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে। শরয়ী দলিল হলো, ভুলের উপর অপবাদ। কেননা আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও শুধু সেই চাঁদ দেখেছে আর কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি। অথচ ঐ দিন অনেক মুসলমানের ভিড় হয়ে থাকে। সবাই চাঁদ দেখার চেষ্টা করে। সুতরাং চাঁদ একা তার দৃষ্টিগোচর হওয়া এবং অন্য কারো দৃষ্টিতে না আসা এক ধরনের সন্দেহের উদ্রেক করে। আর কাফফারা সন্দেহের দ্বারা রহিত হয়ে যায়। অতএব এ সুরতে তার উপর রোজা ভঙ্গের কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

আর যদি ইমাম এখনো তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেনি; কিন্তু এর পূর্বেই ঐ ব্যক্তি রোজা ভেঙ্গে ফেলেছে, তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মাশায়েখগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ সুরতে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা সংশয় সৃষ্টিকারীর সাক্ষ্যকে কাজি প্রত্যাখ্যান করার কথা ছিল; কিন্তু কাজির পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। এ কারণে সংশয়ও সৃষ্টি হয়নি। যেহেতু রমজানের প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো সংশয় থাকল না, সেহেতু রমজানের রোজা ভাঙ্গার কারণে তার উপর কাজার সাথে সাথে কাফফারাও ওয়াজিব হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এ সুরতেও কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পূর্বেও সংশয় ছিল। এর কারণ হলো, ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন–

اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ .

অর্থ–রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে দিন তোমরা রোজা রাখবে সে দিন রোজার দিন আর যেদিন তোমরা ইফতার করবে সে দিন ইফতারের দিন।

মোট কথা যে দিন সাধারণ লোকেরা রোজা রাখে সেদিন হলো ফরজকৃত রোজার দিন। আর যে দিন সাধারণ লোকেরা ইফতার করে সেদিন হলো ফরজকৃত ইফতারের দিন। উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল, ফরজ রোজা তখনই গণ্য হবে যখন সাধারণ লোকেরা ঐ দিন রোজা রাখে। আর উপরিউক্ত সুরতগুলোর মধ্যে সাধারণ লোকেরা রোজা রাখেনি। এ জন্য ফরজ রোজাও গণ্য হবে না। তাই ঐ রোজা ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি হলো। আর যেহেতু সন্দেহ কাফফারাকে রহিত করে দেয়, তাই এ সুরতেও রোজা ভাঙ্গার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

এখন যদি ঐ ব্যক্তি ত্রিশ রোজা পূর্ণ করে আর ইমাম ও সাধারণ লোকেরা উনত্রিশ দিন রাখে এবং উনত্রিশ রোজা শেষে ঈদের চাঁদ দেখা গেল না; তখন উক্ত ব্যক্তিও এই কথা ভেবে ইফতার করবে না যে, আমার ত্রিশ রোজা পূর্ণ হয়ে গেছে; বরং ইমামের সাথে ইফতার করবে এবং ইমামের সাথে আগামী দিনেরও রোজা রাখবে। কেননা, রমজানের চাঁদ তার একা দেখার কারণে তার উপর সতর্কতাবশত রোজা ওয়াজিব করা হয়েছিল; অকাট্য রমজানের ফরজ রোজা মনে করে ওয়াজিব করা হয়নি। আর এ স্থলে ইফতারকে বিলম্ব করার মধ্যে সতর্কতা রয়েছে। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে যে, রমজানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে সে ভ্রমে পতিত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথম রোজা যেটি সে রমজানের রোজা মনে করে রেখেছিল, তা রমজানের রোজা ছিল না; বরং শাবানের ছিল। তবে তার রমজানের রোজাও উনত্রিশটি হবে। সুতরাং সতর্কতাবশত এ ব্যক্তিও ইমামের সাথে ইফতার করবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যদি সে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে একাকী ইফতার করে তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা ত্রিশ রোজা পূর্ণ করে ঐ ব্যক্তির এই একিন জন্মেছে যে, আজকের দিন ঈদের দিন। তাই ঈদের দিনের সংশয়ের কারণে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ إِمْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ فَأَشْبَهَ رِوَايَةَ الْإِخْبَارِ وَلِهٰذَا لَا يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَتُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ لِأَنَّ قَوْلَ الْفَاسِقِ فِى الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَتَاوِيلُ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا وَالْعِلَّةُ غَيْمٌ أَوْ غُبَارٌ أَوْ نَحْوُهُ وَفِى إِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ يَدْخُلُ الْمَحْدُودُ فِى الْقَذْفِ بَعْدَ مَا تَابَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَعَنْ أَبِى حَنِيفَةَ (رحـ) أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) فِى أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَشْتَرِطُ الْمُثَنَّى وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبِلَ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ فِى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ ثُمَّ إِذَا قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ وَصَامُوا ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا لَا يُفْطِرُونَ فِيمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ لِلْاِحْتِيَاطِ وَلِأَنَّ الْفِطْرَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يُفْطِرُونَ وَيَثْبُتُ الْفِطْرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ثُبُوتَ الرَّمَضَانِيَّةِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ بِهَا إِبْتِدَاءً كَاسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ بِنَاءً عَلَى النَّسَبِ الثَّابِتِ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ .

অনুবাদ : আর যদি আকাশ অপরিষ্কার থাকে তাহলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে ইমাম একজন 'আদিল' [সৎ ব্যক্তি] ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক, স্বাধীন হোক কিংবা দাস। কেননা এটা দীনি বিষয়। সুতরাং তা হাদীস বর্ণনার সদৃশ হলো। এজন্য তা সাক্ষ্য শব্দের উপর নির্ভরশীল নয়। ন্যায়পরায়ণতার শর্ত আরোপ করার কারণ হলো, দীনি বিষয়ে ফাসিকের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম ত্বাহাভীর বক্তব্য "ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা না হোক" এ অবস্থার উপর প্রযোজ্য, যখন তার ন্যায়পরায়ণতা অজানা থাকে। আর আকাশ 'অপরিষ্কার'-এর অর্থ মেঘ, ধুলিঝড় ইত্যাদি থাকা। ইমাম কুদূরী (র.)-এর নিঃশর্ত বিবরণে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত, যে জেনার অপবাদ দেওয়ার কারণে শাস্তিপ্রাপ্তির পর তওবা করে নিয়েছে। এটা হলো জাহির রেওয়ায়েত। কেননা এটি হচ্ছে একটি সংবাদ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত এক মতে, তার কথা গ্রহণ করা হবে না। কেননা একদিক থেকে এটি সাক্ষ্যের পর্যায়ের। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটিতে দু'জনের শর্তারোপ করেছেন। তার বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। এরপর ইমাম একজনের সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে যদি লোকেরা রোজা ত্রিশদিন পূর্ণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান [ইবনে জিয়াদ] কর্তৃক বর্ণিত মতে সতর্কতা হিসেবে রোজা ত্যাগ করবে না। কেননা, রোজা ত্যাগ করার বৈধতা একজনের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা রোজা ত্যাগ করবে। কেননা রোজা ত্যাগ করার বৈধতা এই ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে যে, রমজান এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছিল। যদিও স্বতন্ত্রভাবে প্রথম অবস্থায় এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রোজা ত্যাগ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। যেমন– ধাত্রীর সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণিত 'নসব'-এর উপর ভিত্তি করে মিরাসের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা এই যে, আকাশ যদি পরিষ্কার না থাকে; বরং মেঘ, ধুলিঝড় কিংবা ধোঁয়া ইত্যাদি থাকে তবে রমজানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক, স্বাধীন হোক বা দাস। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) দুটি মতের মধ্যে একটিতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির শর্তারোপ করেছেন। উক্ত ইমামদ্বয় বলেন, রমজানের চাঁদের সাক্ষ্য হলো শাহাদাত। আর শাহাদাতের জন্য সংখ্যা তথা দুই ব্যক্তি হওয়া শর্ত। রমজানের চাঁদ দেখার জন্যও দুই সংখ্যা হওয়া শর্ত হবে। আমাদের দলিল হলো, এটি একটি দীনি বিষয়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি এ সংবাদ দিয়েছে যে, মানুষের উপর রমজানের রোজা ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর মানুষের উপর রোজা ওয়াজিব হওয়া এটি একটি সুস্পষ্ট দীনি ব্যাপার। আর দীনি কোনো ব্যাপার প্রমাণের জন্য ন্যায়পরায়ণতা তো শর্ত কিন্তু সংখ্যা, স্বাধীন এবং পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। যেমন হাদীস বর্ণনা করা একটি দীনি কাজ। এর মধ্যে সংখ্যা, স্বাধীন এবং পুরুষ হওয়া শর্ত নয়; বরং একজনের হাদীস বর্ণনাও কবুল করা হয়। দাস এবং স্ত্রীলোকের হাদীস বর্ণনাও কবুল করা হয়। চাঁদ দেখা যেহেতু একটি দীনি ব্যাপার, তাই তা সাব্যস্ত করার জন্য 'সাক্ষ্য' শব্দটি শর্ত নয় অর্থাৎ এভাবে বলা শর্ত নয় যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি; কিংবা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রমজানের চাঁদ দেখেছি। যেমনটি দুনিয়াবী বিষয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাক্ষ্য শব্দের প্রয়োজন হয়। তবে ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করার কারণ হলো, দীনি বিষয়ে কাফিরের কথা গ্রহণযোগ্য হয় না।

কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, হিদায়া গ্রন্থকার غَيْرُ مَقْبُوْلٍ বলেছেন, কিন্তু এ কথা কেন বলেননি যে, কাফিরের কথা দীনি বিষয়ে অগ্রাহ্য। অর্থাৎ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ-এর স্থলে مَرْدُوْدٌ কেন ব্যবহার করেননি? এর জবাব হলো, কাফিরের কথা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য নয়; বরং মওকূফ তথা স্থগিত থাকে। যদি অনুসন্ধানের পর তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا "হে মু'মিনগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের নিকট সংবাদ নিয়ে আসে তবে তা অনুসন্ধান করো।" মোট কথা রমজানের চাঁদের বিষয়ে ফাসিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর উপর সকল ইমাম একমত। কিন্তু ইমাম ত্বাহাভী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, রমজানের চাঁদের বিষয়ে এক ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য। সে ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম ত্বাহাভীর মতে, গায়রে আদিল তথা ফাসিকের কথা কবুল করা হবে। অথচ ইমাম ত্বাহাভী (র.)-এর মতেও ফাসিকের কথা গ্রহণযোগ্য হয় না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম ত্বাহাভী (র.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর বক্তব্য 'ন্যায়পরায়ণ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার ন্যায়পরায়ণ ও পরহেজগার হওয়ার বিষয়টি লোকদের জানা থাকা। আর غَيْرُ عَادِلٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লোকদের অজানা থাকা, তার অবস্থা অস্পষ্ট থাকা। সুতরাং গায়রে আদিল দ্বারা مَسْتُوْرُ الْحَالِ তথা অজানা অবস্থা উদ্দেশ্য; ফাসিক উদ্দেশ্য নয়। এখন খোলাসা এই দাঁড়াল যে, ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর মতে, রমজানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির কথাও কবুল করা হবে যার ন্যায়পরায়ণতা লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধ থাকে। আর তার বক্তব্যও কবুল করা হবে যার ন্যায়পরায়ণতা অস্পষ্ট থাকে। তবে যার ফাসিক হওয়া লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধ থাকে তার বক্তব্য ইমাম ত্বাহাভী (র.)-এর মতেও গ্রহণযোগ্য হবে না। 'আকাশ অপরিষ্কার'-এর অর্থ হলো আকাশে মেঘ, ধুলিঝড় কিংবা ধোঁয়া থাকা।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কুদূরীর ইবারত- قَبِلَ الْاِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ মুতলক হওয়া এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, তওবার পর مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذْفِ তথা জেনার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কথাও চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কবুল এবং গ্রহণযোগ্য হবে। এ হলো জাহিরে রেওয়ায়েত। কেননা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করা মূলত সংবাদ দেওয়া; সাক্ষ্য দেওয়া নয়। আর তওবার পর যেহেতু জেনার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হয়ে গেছে এজন্য চাঁদ দেখার সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। আর এটাও দলিল যে, হযরত আবূ বকরাহ (রা.) যিনি জেনার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন, তওবা করার পর চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম তার কথাকে গ্রহণ করেছেন। -[কিফায়া]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি অভিমত এই বর্ণিত আছে যে, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে জেনার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না। তিনি নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেছেন যে, চাঁদ দেখার খবর একদিক থেকে সাক্ষ্যের পর্যায়ের। আর তা এভাবে যে, ঐ সংবাদের উপর আমল করা কাজির কাজার [বিচার] পর ওয়াজিব হবে। তার বিশেষত্ব ও কাজির মজলিসের সাথে। আর সংবাদদাতার জন্য ন্যায়পরায়ণতা শর্ত। এ সবকিছু সাক্ষ্যের প্রমাণ বহন করে। আর জেনার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য তওবার পরও কবুল করা হয় না। যেমন কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে- وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا "কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।" অর্থাৎ তওবার পূর্বেও না , পরেও না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর এক বক্তব্যে বলেছেন, চাঁদ দেখা দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে। তাঁর বিপরীতে প্রথম একটা দলিল আমরা বর্ণনা করেছি যে, এটা হলো একটা দীনি বিষয়। সুতরাং তা হাদীস বর্ণনার সদৃশ হয়েছে। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন- নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِىْ هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا .

অর্থ- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করল, আমি রমজানের চাঁদ দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ এক? সে বলল, জি-হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দাও? সে বলল, জি-হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে বেলাল! লোকদেরকে জানিয়ে দাও তারা আগামীকাল যাতে রোজা রাখে।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রমজানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করা হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, ইমামুল মুসলিমীন এক ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল করত রমজানের রোজা রাখার ঘোষণা করিয়ে দিয়েছেন। লোকেরা সাক্ষ্যের দিন থেকে ত্রিশ দিনের রোজা পূর্ণ করল। কিন্তু ত্রিশ তারিখ দিবাগত রাত্রে চাঁদ দেখা যায়নি। এ অবস্থায় লোকেরা পরের দিন ইফতার করবে, না রোজা রাখবে; এতদ সম্পর্কিত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান বিন জিয়াদ (র.)-এর বর্ণনা এরূপ- সতর্কতাস্বরূপ লোকেরা একত্রিশতম দিনেও ইফতার করবে না; বরং রোজা রাখবে। যেন ইফতার না করার ভিত্তি হলো সতর্কতার উপর। দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি ত্রিশ রোজা পূর্ণ করার পর ইফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে এই ইফতার এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা প্রথম রোজা রেখেছিল, যেন তারই সাক্ষ্য দ্বারা ইফতার হলো। অথচ ইফতার এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয় না; বরং সর্বনিম্ন দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য জরুরি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ত্রিশ রোজা পূর্ণ করার পর লোকেরা ইফতার করবে। যদিও ত্রিশ রোজার দিবাগত রাতে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয়। দলিল এই যে, অনেক সময় কোনো বস্তু মোটামুটিভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায়। যদিও প্রথমাবস্থায় তা সাব্যস্ত না হয়। যেমন- বকরির গর্ভের বেচাকেনা প্রথমত জায়েজ নয়; কিন্তু বকরির আওতায় গর্ভের বেচাকেনাও জায়েজ হয়ে যায়। সুতরাং এমনিভাবে ঈদের দিন যদিও প্রথমত এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় না; কিন্তু রমজানের অধীনে হওয়ার কারণে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রমজান সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন- যখন এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রমজান সাব্যস্ত হলো এবং লোকেরা পুরো ত্রিশ দিনের রোজা রেখেছে, তবে আগামী দিন স্বাভাবিকভাবেই ঈদুল ফিতরের দিন হয়ে যাবে। কেননা শরয়ীভাবে কোনো মাস ত্রিশ দিনের অধিক হয় না। আর এটি ঠিক এমন যেমন ধাত্রী অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিল যে, এই শিশুটি অমুকের। তবে এই স্ত্রীলোকটির সাক্ষ্য দ্বারা ঐ বাচ্চাটির নসব ঐ ব্যক্তির সাথে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর নসব প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে মিরাসের অধিকারও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঐ দুই পিতা-পুত্রের মাঝে উত্তরাধিকারিত্ব স্থাপিত হবে। পিতা তার ঐ ছেলের ওয়ারিশ হবে। আর ছেলেও তার পিতার ওয়ারিশ হবে। অথচ শুরুতে যদি কেউ তার ওয়ারিশ হওয়ার এক জন সাক্ষ্য পেশ করত তবে কবুল হতো না; যতক্ষণ না দু'জন সাক্ষী হতো।

وَاِذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتّٰى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ لِاَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّؤْيَةِ فِيْ مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ يُوْهِمُ الْغَلَطَ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ جَمْعًا كَثِيْرًا بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لِاَنَّهُ قَدْ يَنْشَقُّ الْغَيْمُ عَنْ مَوْضِعِ الْقَمَرِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ النَّظَرُ ثُمَّ قِيْلَ فِيْ حَدِّ الْكَثِيْرِ اَهْلُ الْمَحَلَّةِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) خَمْسُوْنَ رَجُلًا اِعْتِبَارًا بِالْقَسَامَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَهْلِ الْمِصْرِ وَمَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيْ اَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ اِذَا جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ لِقِلَّةِ الْمَوَانِعِ وَاِلَيْهِ الْاِشَارَةُ فِيْ كِتَابِ الْاِسْتِحْسَانِ وَكَذَا اِذَا كَانَ عَلٰى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فِى الْمِصْرِ وَمَنْ رَاٰى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ اِحْتِيَاطًا وَفِى الصَّوْمِ الْاِحْتِيَاطُ فِى الْاِيْجَابِ .

অনুবাদ : আর আকাশ যদি অপরিষ্কার না থাকে তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না এমন একটা বড় দল তা দেখতে পায়, যাদের সংবাদে নিশ্চিত হওয়া যায়। কেননা এমন অবস্থায় একা চাঁদ দেখার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং একটা বড় দলের দেখা পর্যন্ত সে ক্ষেত্রে অপেক্ষা করা কর্তব্য হবে। আকাশ অপরিষ্কার থাকার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা কখনো কখনো চাঁদের স্থান [উদয়স্থল] থেকে মেঘ কেটে যায়। ফলে কারো পক্ষে চাঁদ দেখা সম্ভব হতে পারে। 'বড় দলের' সংজ্ঞায় কেউ কেউ মহল্লাবাসী বুঝিয়েছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে পঞ্চাশ জনের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'কাসামাহ'-এর উপর কিয়াস করে। শহরবাসী এবং শহরের বাহির থেকে আগত লোকদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম ত্বাহাভী (র.) বলেন, শহরের বাহির থেকে আগত হলে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা [তথায় ধোঁয়া-ধুলা ইত্যাদির] প্রতিবন্ধকতা কম। এ অভিমতের প্রতিই 'কিতাবুল ইসতিহসান'– এ ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি কেউ শহরের উঁচু স্থান থেকে চাঁদ দেখে তবে তার হুকুম অনুরূপ। যে ব্যক্তি একা ঈদের চাঁদ দেখেছে সে রোজা ভঙ্গ করবে না। এর কারণ সতর্কতা অবলম্বন। আর রোজার ক্ষেত্রে ওয়াজিব করার মধ্যেই হলো সতর্কতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি আকাশে মেঘ, ধুলি-বালি ইত্যাদি না থাকে; বরং আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়, তবে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে এমন বড় দলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে যাদের সংবাদের দ্বারা চাঁদ দেখার বিশ্বাস অর্জিত হয়। কেননা আকাশ পরিষ্কার হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু এক দুই জনের চাঁদ দেখা আর অন্যান্যদের না দেখা সন্দেহের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এ সংশয় এসে যায় যে, যদি চাঁদ উদিত হতো তবে অন্যরাও তা দেখতে পেত। তাই এখন মনে হয় যে, ঐ দু'একজনের চাঁদ দেখার মধ্যে ভুল হয়ে গেছে। হ্যাঁ যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে দু'একজনের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়। কেননা মেঘ থাকা অবস্থায় কখনো এমন হয় যে, চাঁদের স্থান থেকে হঠাৎ মেঘ কেটে গেছে। ফলে কারো দৃষ্টি চাঁদের উপর পড়ে যায়। অতঃপর পুনরায় মেঘ মিলে যায়। 'বড় দলের' পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা মহল্লার সকল লোক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মহল্লার সকল লোক চাঁদ দেখেছে, তাহলে 'চাঁদ দেখা' সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এর দ্বারা পঞ্চাশ ব্যক্তি উদ্দেশ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কাসামতের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ মহল্লায় যদি কোনো নিহত ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং হত্যাকারী জানা না থাকে, তবে মহল্লার পঞ্চাশ ব্যক্তি থেকে তাদের না জানার উপর কসম গ্রহণ করা হবে। সুতরাং যেমনিভাবে এখানে পঞ্চাশ ব্যক্তির কসম দ্বারা হত্যাকারীর ব্যাপারে না জানার বিশ্বাস স্থাপন হয়ে যায়, তেমনিভাবে চাঁদ দেখার ব্যাপারেও পঞ্চাশ ব্যক্তির দেখার দ্বারা চাঁদ দেখা সাবিত হয়ে যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি আকাশ পরিষ্কার হয় তবে এক দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ না বড় দল হয়। এরপর ঐ সাক্ষ্যদাতারা এমন ব্যক্তি হতে হবে যারা শহর এবং শহরের আবাদিতে চাঁদ দেখেছে কিংবা শহরের বাইরে দেখে এসেছে। সর্বোপরি আকাশ পরিষ্কার থাকলে বড় দলের দেখা শর্ত। ইমাম ত্বাহাভী (র.) বলেছেন, চাঁদ দেখা ব্যক্তি যদি শহরের বাইরে চাঁদ দেখে আসে তবে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা শহরের বাইরে চাঁদ দেখার প্রতিবন্ধক কম। অর্থাৎ শহরের ভিতরে তো ধোঁয়া-ধুলা ইত্যাদি থাকে, কিন্তু বাহিরে কিছুই নেই। এজন্য তার কথা গ্রহণ করা হবে। 'কিতাবুল ইসতিহসানে' এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম ত্বাহাভী (র.)-এর মতে, এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শহরের কোনো উঁচু স্থান থেকে চাঁদ দেখে তবে সেখানেও এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلْ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ وَهُوَ الْفِطْرُ فَأَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ فِي هٰذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَهِلَالِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعِبَادِ وَهُوَ التَّوَسُّعُ بِلُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ كَمَا ذَكَرْنَا وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْنِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَالْخَيْطَانِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ فِي الشَّرْعِ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي حَقِيْقَةِ اللُّغَةِ هُوَ الْإِمْسَاكُ لِوُرُوْدِ الْإِسْتِعْمَالِ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ زِيْدَ عَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي الشَّرْعِ لِتَتَمَيَّزَ بِهَا الْعِبَادَةُ مِنَ الْعَادَةِ وَاخْتُصَّ بِالنَّهَارِ لِمَا تَلَوْنَا وَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوِصَالُ كَانَ تَعْيِيْنُ النَّهَارِ أَوْلَى لِيَكُوْنَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْعِبَادَةِ وَالطَّهَارَةُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ الْأَدَاءِ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ.

অনুবাদ : আর যদি আকাশ অপরিষ্কার থাকে তাহলে ঈদের চাঁদ কমপক্ষে দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য ব্যতীত প্রমাণিত হবে না। কেননা, এই চাঁদ দেখার সাথে বান্দার উপকারের সম্পর্ক রয়েছে। তা হলো রোজা না রাখা। সুতরাং এটা তার অন্যান্য হক সমূহের সদৃশ হয়ে গেল। জাহির রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঈদুল আজহা এ ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের অনুরূপ। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ভিন্নমত বর্ণিত আছে। এজন্য যে, তা রমজানের চাঁদ দেখার মতো। [জাহির রেওয়ায়েতের দলিল হলো] কারণ এর সাথে বান্দাদের উপকার সম্পর্কিত রয়েছে। আর তা হলো কুরবানির গোশত আহারের সুযোগ গ্রহণ। আর যদি আকাশ অপরিষ্কার না থাকে তাহলে এমন এক জামাতের সাক্ষ্য ব্যতীত চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে না, যাদের সংবাদ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। যেমনটি ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। রোজার সময় হলো ফজরে ছানী [সুবহে সাদেক]-এর উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ "শুভ্র রেখা ফজরের কৃষ্ণরেখা হতে পৃথক হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো। এমনকি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অতঃপর তোমরা রোজা পূর্ণ করো রাত্র পর্যন্ত"। আর উভয় রেখা দ্বারা দিবসের শুভ্রতা এবং রাত্রির কৃষ্ণতা উদ্দেশ্য। শরিয়তের পরিভাষায় সিয়াম হলো, নিয়তসহ দিবসে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। কেননা, আভিধানিক অর্থে শুধু বিরত থাকার নামই সিয়াম। কারণ,

এ অর্থেই তার ব্যবহার রয়েছে। তবে শরিয়ত তার সঙ্গে নিয়ত যুক্ত করেছে, যাতে ইবাদত অভ্যাস হতে পৃথক হয়ে যায়। দিবসের সঙ্গে বিশিষ্ট হওয়ার কারণ হলো আমাদের বর্ণিত আয়াত। তা ছাড়া যুক্তি সঙ্গত কারণ এই যে, দিনরাতে একটানা রোজা রাখা যখন দুঃসাধ্য তখন দিবসের অংশকে নির্ধারণ করাই উত্তম, যাতে আমলটি অভ্যাসের বিপরীত হয়। আর ইবাদতের ভিত্তিই হলো অভ্যাসের বিপরীত করার উপর। নারীদের ক্ষেত্রে রোজা আদায়ের বৈধতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য হায়েজ ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, কেউ যদি একাকী ঈদের চাঁদ দেখে, আকাশ পরিষ্কার হোক বা না হোক, সতর্কতাবশত ঐ ব্যক্তি ইফতার করবে না। আর যদি ইফতার করে তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। রোজা ভঙ্গের দ্বারা কাজা ওয়াজিব হবে না। রমজানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে সতর্কতা হলো রোজা ওয়াজিব করার মধ্যে। তাইতো রমজানের চাঁদ একা এক ব্যক্তির দেখার সাক্ষ্য দ্বারা রোজাকে ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : রমজানের উনত্রিশ তারিখে যদি আকাশে মেঘমালা কিংবা ধুলি-বালু ইত্যাদি থাকে, তবে ঈদুল ফিতরে চাঁদের প্রমাণের জন্য দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুই স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। একজন পুরুষের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না। সাক্ষীদের স্বাধীন হওয়া এবং জেনার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত না হওয়াও জরুরি। জেনার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তওবা করে তবুও ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনিভাবে তার সাক্ষ্যের শব্দ 'শাহাদাত' দ্বারা হওয়াও জরুরি। দলিল হলো, ঈদুল ফিতরের চাঁদের সাথে বান্দাদের স্বার্থ জড়িত আছে। তা হলো রোজা না রাখা। অর্থাৎ রমজানে পানাহারের উপর যে নিষেধাজ্ঞাগুলো ছিল সেগুলো ঈদের চাঁদের কারণে শেষ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে বান্দার উপকার রয়েছে। আর যেহেতু এর মধ্যে বান্দার উপকার রয়েছে যেহেতু এটা শুধু দীনি বিষয় নয়; বরং এটা বান্দার হকসমূহের সদৃশ হয়ে গেল। আর বান্দার হকগুলো সাব্যস্ত করার জন্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্যের প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেবে। তবে শর্ত হলো, তাদের স্বাধীন এবং মুসলমান হওয়া। ন্যায়পরায়ণ হওয়া, জেনার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত না হওয়া আর শাহাদাত শব্দের দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া। সুতরাং যখন ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার বিষয়টিও বান্দার হকসমূহের অনুরূপ হয়ে গেল তখন তা সাবিত করার জন্যও পরিপূর্ণ সাক্ষ্যের প্রয়োজন। এক ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ঈদুল আজহার চাঁদের হুকুমও ঈদুল ফিতরের অনুরূপ। অর্থাৎ ঈদুল আজহার চাঁদের প্রমাণও এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা হবে না; বরং দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি। তবে শর্ত হলো, উপরিউক্ত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকতে হবে। এই হুকুমটি হলো জাহির রিওয়ায়েত অনুযায়ী। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। তবে 'নাওয়াদির'-এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এর খেলাফ বর্ণনা রয়েছে। 'নাওয়াদির'-এর বর্ণনা মতে ঈদুল আজহার চাঁদ রমজানের চাঁদের অনুরূপ। অর্থাৎ রমজানের চাঁদের ন্যায় ঈদুল আজহার চাঁদও এক বক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ বিধান আকাশ পরিষ্কার না থাকার পরিস্থিতিতে কার্যকর হবে। 'নাওয়াদির' এর রেওয়ায়েতের দলিল এই যে, ঈদুল আজহার চাঁদের সাথে একটি দীনি বিষয় সম্পর্কিত আছে। তা হলো হজের দিন-তারিখ নির্ধারণ। আর দীনি বিষয় প্রমাণিত করার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট। তাই রমজানের ন্যায় ঈদুল আজহার চাঁদের প্রমাণের জন্য এক ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে। জাহির রেওয়ায়েতের দলিল হলো, ঈদুল আজহার চাঁদের সাথে বান্দার উপকার জড়িত আছে। অর্থাৎ ঈদুল আজহার দিনগুলোতে বান্দা আল্লাহর মেহমান হয়ে যায় এবং কুরবানির গোশতের সমাহার থাকে।

উল্লেখ্য যে, গোশতের মধ্যে ব্যাপকতা দ্বারা বান্দার উপকার রয়েছে। তাই এটাও বান্দার হকসমূহের সদৃশ হয়ে গেল। আর বান্দার হক সাব্যস্ত করার জন্য এক ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। এজন্য ঈদুল আজহার চাঁদের প্রমাণের জন্যও এক ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না; বরং ঈদুল ফিতরের চাঁদের ন্যায় ঈদুল আজহার চাঁদের জন্যও পরিপূর্ণ সাক্ষ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

قَوْلُهُ وَوَقْتُ الصَّوْمِ الخ : উক্ত ইবারতের মধ্যে রোজার শুরু ও শেষ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন গ্রন্থকার বলেন, রোজার শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা হলো, সুবহে সাদেকের উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ .

এরপর ইরশাদ করেছেন– ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ উক্ত আয়াতে خَيْطٌ اَبْيَضُ দ্বারা ভোরের শুভ্রতা এবং خَيْطٌ اَسْوَدُ দ্বারা রাত্রের কৃষ্ণতা উদ্দেশ্য। সুতরাং উক্ত আয়াতে রাত্রের অন্ধকারকে কৃষ্ণতা আর ভোরের আলোকে শুভ্রতার উপমা দ্বারা রোজার শুরু এবং পানাহার হারাম হয়ে যাওয়ার বিশুদ্ধ সময়কে নির্ধারণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالصَّوْمُ هُوَ الْاِمْسَاكُ الخ : উপরিউক্ত ইবারত দ্বারা রোজার সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন গ্রন্থ প্রণেতা (র.) বলেন, শরয়ীভাবে রোজা বলা হয় নিয়তসহ দিবসে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে। কেননা আভিধানিক অর্থে শুধু বিরত থাকার নামই সিয়াম। এজন্য যে, ইসলামের পূর্বেও এ শব্দটি বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শরিয়ত তার উপর নিয়ত শব্দটি বৃদ্ধি করে দিয়েছে। যাতে নিয়তের কারণে বিরত থাকা এবং অভ্যাস হিসেবে বিরত থাকা-এর মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। শরয়ী রোজা দিবসের সাথে নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ এবং اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -এর কারণে। উক্ত আয়াতের মধ্যে রোজার পরিচয় সুবহে সাদেকের উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বলা হয়েছে।

আকলী দলিল এই যে, সাওমে বেসাল তথা রাত দিন রোজা রাখা তো দুঃসাধ্য ব্যাপার। এজন্য যে, একাধারে একমাস দিবা-রাত্রি পানাহার না করার কারণে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছার প্রবল আশঙ্কা থাকে। তাই দিবা-রাত্রির মধ্য থেকে একটাকে রোজার জন্য নির্ধারণ করা জরুরি হবে। সুতরাং জ্ঞান ও যুক্তির দাবি মোতাবেক রোজাকে দিনের সঙ্গে নির্ধারণ করাই উত্তম। যাতে দিনে পানাহার বর্জন করার দ্বারা অভ্যাসের বিপরীত হয়ে যায়। আর ইবাদতের ভিত্তিই হলো এর উপর, যাতে তা অভ্যাসের বিপরীত হয়ে পুণ্যের কারণ হয়। নারীদের ক্ষেত্রে রোজা আদায়ের বৈধতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য তাদের হায়েজ ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত। হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় রোজা আদায় সহীহ হবে না। তবে ফরজ হওয়ার কারণে পবিত্র হওয়ার পর কাজা আদায় ওয়াজিব হবে। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

بَابُ مَا يُوْجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ

إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (رح) لِوُجُوْدِ مَا يُضَادُّ الصَّوْمَ فَصَارَ كَالْكَلَامِ نَاسِيًا فِي الصَّلٰوةِ وَوَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِيْ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا تِمَّ عَلٰى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ وَإِذَا ثَبَتَ هٰذَا فِيْ حَقِّ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثَبَتَ فِي الْوِقَاعِ لِلْاِسْتِوَاءِ فِي الرُّكْنِيَّةِ بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ لِأَنَّ هَيْئَةَ الصَّلٰوةِ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يَغْلِبُ النِّسْيَانُ وَلَا مُذَكِّرَ فِي الصَّوْمِ فَيَغْلِبُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَفْصِلْ.

পরিচ্ছেদ : যে সব কারণে কাজা ও কাফফারা ওয়াজিব

অনুবাদ : রোজাদার যখন ভুলে পানাহার বা সহবাস করে ফেলে তখন তার রোজা ভঙ্গ হয় না। আর কিয়াসের দাবি হলো ভঙ্গ হয়ে যাওয়া। এটি ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত। কেননা রোজার বিপরীত কর্ম পাওয়া গেছে। সুতরাং এটা নামাজের মধ্যে ভুলে কথা বলার মতো হয়ে গেল। ইসতিহসানের কারণ হলো, ভুলে পানাহারকারী ব্যক্তিকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– تِمَّ عَلٰى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ "তুমি তোমার সিয়াম পূর্ণ করো। কেননা আল্লাহই তোমাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন। পানাহারের ক্ষেত্রে যখন এটি প্রমাণিত হলো তখন সহবাসের ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হবে। কারণ, রুকন হিসেবে সবগুলোই সমান। সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা নামাজের অবস্থাই নিজে স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভুল প্রভাব বিস্তার করে না। পক্ষান্তরে রোজার ক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো কিছু নেই। সুতরাং ভুল প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ফরজ ও নফল রোজার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উক্ত হাদীসে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রোজার ধরন ও প্রকারাদি আলোচনার পর এ পরিচ্ছেদে ঐ সুরত ও কারণগুলো বর্ণনা করছেন, যার দ্বারা রোজা ফাসেদ হয়ে যায়, ফাসাদের কোন কোন সুরতে কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব এবং কোন কোন সুরতে শুধু কাজা ওয়াজিব হয় তাও বর্ণনা করছেন।

মাসআলা : রোজাদার যদি ভুল করে পানাহার করে কিংবা সহবাস করে তবে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কিয়াসের দাবি হলো, রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটাই ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত। কিয়াসের কারণ এই যে, পানাহার করা কিংবা সহবাস করা এগুলো হলো রোজার বিপরীত কর্ম। আর কোনো জিনিসের বিপরীত দ্বারা ঐ জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কারণ, একই সময় দুই বিপরীত বস্তু একসাথে পাওয়া যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং যখন রোজার বিপরীত তথা পানাহার করা ইত্যাদি পাওয়া গেল, তখন রোজা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়লো। আর এটা এমন হয়ে গেল, যেমন কোনো ব্যক্তি নামাজে ভুল করে ফেলল। সুতরাং যেমনিভাবে নামাজে ভুলবশত কথার দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়, তেমনিভাবে ভুলবশত পানাহার ইত্যাদি করলেও নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো নিম্নোক্ত হাদীস– এক ব্যক্তি রোজা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করেছে, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি তোমার রোজা পূর্ণ করো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, উক্ত হাদীসটি আল্লাহর কিতাবের বিরোধী। কেননা কুরআনে মাজীদে এরশাদ أَتِمُّوا الصِّيَامَ আর সিয়াম ও সাওমের অর্থ হলো– বিরত থাকা। ভুলবশত খাওয়ার দ্বারা বিরত থাকা পাওয়া যায়নি। সুতরাং আয়াত দ্বারা বুঝা যায় ভুলবশত পানাহার করলে রোজা ভেঙ্গে যায়; আর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ভঙ্গ হয় না। এর জবাব হলো, আল্লাহর কালামের মধ্যে 'ভুল ক্ষমাযোগ্য' কথাটিও বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا সুতরাং نِسْيَانٌ তথা ভুল যেহেতু ক্ষমাযোগ্য সেহেতু হাদীস ও কুরআনের মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাকল না।

আমাদের মাজহাবের সমর্থন নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারাও হয়–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ـ

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ভুলে গেল যে, সে রোজাদার অতঃপর পানাহার করল, তবে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।– [বুখারী, মুসলিম]

দারা কুতনীতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ كُنْتُ صَائِمًا فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتِمَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ

অর্থ– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি রোজাদার ছিলাম, ভুলে পানাহার করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তোমার রোজা পূর্ণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পানাহার করিয়েছেন।

অধিকন্তু আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে– إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ "যে ব্যক্তি ভুলবশত রমজানের মাঝে ইফতার করল, তার উপর কাজা ও কাফফারা কিছুই নেই।"

মোট কথা, উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, ভুলবশত পানাহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না।

قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ هٰذَا فِيْ حَقِّ الْأَكْلِ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, ভুলবশত খানাপিনা দ্বারা রোজা ভঙ্গ না হওয়া কিয়াস বিরোধী নস তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর যে জিনিস কিয়াস বিরোধী হয়ে সাব্যস্ত হয় তা অন্যের দিকে مُتَعَدِّيْ তথা সম্প্রসারিত হয় না। তাই এই রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুম ভুলবশত সহবাস করার দিকে সম্প্রসারিত না হওয়া উচিত। অর্থাৎ ভুলবশত সহবাস করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যাওয়া উচিত। অথচ আপনি ভুলবশত সহবাস করাকে ভুলবশত খানাপিনার উপর কিয়াস করে তারও রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুম দিয়েছেন।

এর জবাব এই যে, ভুলবশত সহবাস করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ না হওয়া কিয়াস দ্বারা সাবিত নয়; বরং دَلَالَةُ النَّصِّ তথা হাদীসের ইঙ্গিত দ্বারা সাব্যস্ত। এভাবে সে, পানাহার এবং সহবাস থেকে বিরত থাকা এসব রোজার রুকন হওয়ার ব্যাপারে বরাবর। সুতরাং সহবাসও পানাহারের সদৃশ হলো। আর যেহেতু নস তথা হাদীসের কারণে ভুলবশত পানাহারের ক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত, তাই ভুলবশত সহবাসের ক্ষেত্রেও রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ الخ : উক্ত ইবারতটুকু দ্বারা ইমাম মালিক (র.)-এর নামাজের উপর রোজাকে কিয়াস করার জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সার নির্যাস হলো, রোজাকে নামাজের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা নামাজের অবস্থা হলো স্মরণকারীর অবস্থা অর্থাৎ নামাজের অবস্থায় সব সময় এই কথা স্মরণ থাকে যে, আমি নামাজরত। কেননা নামাজের অবস্থা ও গায়রে নামাজের অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। সুতরাং নামাজের মধ্যে ভুলের অবস্থা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এর বিপরীত হলো রোজা। কেননা রোজাদার ও বে-রোজাদারীর অবস্থা বরাবর। কারণ, রোজার সম্পর্ক হলো আত্মার সাথে, বাহ্যিক অঙ্গের সাথে নয়। তাই যেহেতু রোজাদারের জাহিরী অবস্থা সাধারণ মানুষের অনুরূপ। এজন্য তার উপর ভুলের প্রভাব হওয়া অধিক সম্ভাবনাময়। সুতরাং নামাজ ও রোজার মাঝে উপরিউক্ত ব্যবধান থাকা অবস্থায় রোজাকে নামাজের উপর কিয়াস করা কিভাবে ঠিক হবে?

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, রোজা নফল কিংবা ফরজ হোক, ভুলবশত পানাহার এবং সহবাস করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। কেননা হাদীসের মধ্যে ফরজ ও নফল রোজার কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি।

وَلَوْ كَانَ مُخْطِئًا اَوْ مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالنَّاسِيْ وَلَنَا اَنَّهُ لَا يَغْلِبُ وُجُوْدُهُ وَعُذْرُ النِّسْيَانِ غَالِبٌ وَلِاَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَالْاِكْرَاهُ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهٖ فَيَفْتَرِقَانِ كَالْمُقَيَّدِ وَالْمَرِيْضِ فِيْ قَضَاءِ الصَّلٰوةِ -

অনুবাদ : আর যদি বিচ্যুতি কিংবা জবরদস্তির কারণে তা করে থাকে তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তিনি এ দুজনকে ভুলকারী ব্যক্তির উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলিল হলো, এ দুটি অবস্থার অস্তিত্ব অধিক নয়। পক্ষান্তরে ভুলের ওজর অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। তা ছাড়া বিস্মৃতি ঐ সত্তার পক্ষ থেকে ঘটে থাকে, যিনি রোজার হকদার। পক্ষান্তরে বলপ্রয়োগ অন্যের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং এ দুটির হুকুমে পার্থক্য হবে। যেমন নামাজ কাজা করার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলিত ও অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে [পার্থক্য] রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

نِسْيَانٌ ও خَطَاءٌ-এর মধ্যকার পার্থক্য এই যে, نِسْيَانٌ-এর সূরতে ভুলকারী ব্যক্তি কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু রোজা স্মরণ থাকে না। অর্থাৎ نَاسِيْ তথা ভুলকারী ব্যক্তি পানাহারের ইচ্ছে তো করে তবে তার নিজের রোজাদার হওয়ার কথা স্মরণ হয় না। আর خَاطِئْ তথা বিচ্যুতিকারী ব্যক্তির রোজার কথা স্মরণ থাকে; কিন্তু সে কাজের ইচ্ছা করে না। যেমন– রোজাদার ব্যক্তি কুলি করল, কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে তার হলকে পানি চলে গেল। মোট কথা আমাদের মতে, যদি কোনো রোজাদার বিচ্যুতিবশত পানাহার করে কিংবা সে জবরদস্তি পানাহার করেছে, তবে তার উপর ঐ রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাজা ওয়াজিব হবে না। এটাই ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বিচ্যুতিকারী ও জবরদস্তিকৃত ব্যক্তিকে ভুলকারীর উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে ভুলবশত পানাহারের দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না এবং তার কাজা ওয়াজিব হয় না তেমনিভাবে বিচ্যুতি ও জবরদস্তির কারণে আহার করার দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হবে না এবং তার কাজা ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল, উপরিউক্ত কিয়াস ঠিক নয়। কেননা বিচ্যুতি ও জবরদস্তির অস্তিত্ব একেবারেই নগণ্য। কিন্তু ভুলের ওজর অধিকহারে পাওয়া যায়। তা ছাড়া বিচ্যুতি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর জবরদস্তি অন্যের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই مَقِيْسٌ عَلَيْهِ ও مَقِيْسٌ-এর মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য হয়ে গেছে। আর পার্থক্য থাকা অবস্থায় কিয়াস করা ঠিক নয়। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপরিউক্ত কিয়াসও গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা এমন হলো যেমন– এক ব্যক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আছে। তার দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার শক্তি নেই। যদি সে বসে নামাজ পড়ে তবে মুক্তি পাওয়ার পর তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। আর যদি অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে বসে নামাজ পড়ে তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা অসুস্থতা হলো ইবাদতের হকদার তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর কয়েদ ও বন্দী হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের পক্ষ থেকে; কিন্তু কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, رُفِعَ عَنْ اُمَّتِيْ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ হাদীসটির মধ্যে نِسْيَانٌ ও خَطَأٌ উভয়টির হুকুম হলো مَرْفُوْعٌ [যা উঠিয়ে নেওয়া হয়] সুতরাং উভয় সুরতে রোজা ভঙ্গ না হওয়া উচিত। এর জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে পারলৌকিক হুকুম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ভুল ও বিচ্যুতির সুরতে পরকালে শাস্তির মধ্যে নিপতিত হবে না; বরং পরকালের শাস্তি তার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। দুনিয়াবী হুকুম দূর করা হয়নি, না হয় 'কতলে খাতা' তথা ভুলবশত হত্যা দ্বারা দিয়ত ও কাফফারা ওয়াজিব হতো না। অথচ এগুলোর প্রমাণ আল্লাহর কালামে পাকে রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে একজন মুসলমান দাস আজাদ করে দেবে আর তার পরিবারের নিকট দিয়ত পৌঁছিয়ে দেবে। লক্ষণীয় যে, تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ দ্বারা ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা আর دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ দ্বারা তার দিয়ত বর্ণনা করা হয়েছে। যদি বিচ্যুতির হুকুম দুনিয়াবী দিক থেকে দূর করে দেওয়া হতো, তবে قَتْلُ خَطَأً -এর সুরতে দিয়ত ও কাফফারা কেন ওয়াজিব হবে?

فَنَامَ فَاحْتَلَمَ لَمْ يُفْطِرْ لِقَوْلِهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصِّيَامَ اَلْقَئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْاِحْتِلَامُ وَلِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُوْرَةُ الْجِمَاعِ وَلَا مَعْنَى وَهُوَ الْاِنْزَالُ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ وَكَذَا اِذَا نَظَرَ اِلَى امْرَأَةٍ فَاَمْنٰى لِمَا بَيَّنَّا وَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ اِذَا اَمْنٰى وَكَالْمُسْتَمْنِىْ بِالْكَفِّ عَلٰى مَا قَالُوْا .

অনুবাদ : যদি রোজাদার ঘুমিয়ে পড়ে আর তার স্বপ্নদোষ হয় তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ثَلٰثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصِّيَامَ اَلْقَئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْاِحْتِلَامُ "তিনটি বিষয় রোজা ভঙ্গ করে না। যথা– বমি, সিঙ্গা লাগানো ও স্বপ্নদোষ।" কারণ, এখানে সহবাস পাওয়া যায়নি। বাহ্যত না মর্মগত। আর সহবাসের মর্মার্থ হলো, সঙ্গমযোগে উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া। তদ্রূপ [সিয়াম ভঙ্গ হবে না] যদি কোনো স্ত্রীলোকের দিকে তাকানোর কারণে বীর্যস্খলিত হয়ে যায়। উক্ত কারণে যা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। এটা এমন হলো যেমন [কোনো স্ত্রীলোক সংক্রান্ত] কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি, যখন তার বীর্যপাত হয় এবং সে হস্তমৈথুনকারীর অনুরূপ হয়ে গেল। এটা এ বক্তব্যের ভিত্তিতে যা মাশায়েখগণ বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো রোজাদার শুয়ে পড়ে এবং এতে তার স্বপ্নদোষ হয়ে যায় তবে এর দ্বারা তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা হাদীসে এসেছে– ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصِّيَامَ اَلْقَئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْاِحْتِلَامُ "তিনটি জিনিস দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। ১. বিনা ইচ্ছায় বমি আসা, ২. শিঙ্গা লাগানো, ৩. স্বপ্নদোষ হওয়া। দ্বিতীয় দলিল হলো, স্বপ্নদোষের মধ্যে প্রকৃত সহবাস পাওয়া যায়নি। বাহ্যত না মর্মগতভাবে। বাহ্যত এজন্যে পাওয়া যায়নি যে, সহবাসের সূরত হলো, একের গুপ্তাঙ্গ অপরের গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করবে। আর স্বপ্নদোষের মধ্যে এ জিনিসটি পাওয়া যায়নি। মর্মগতভাবে এজন্য পাওয়া যায়নি যে, সহবাসের মর্ম হলো, পুরুষ-মহিলা উত্তেজনা দ্বারা পরস্পর জড়িয়ে ধরবে, [গুপ্তাঙ্গে] প্রবেশ পাওয়া যাবে না, তবে বীর্যস্খলিত হয়ে যাবে। সুতরাং স্বপ্নদোষের সুরতে যেহেতু বাহ্যত ও মর্মগত কোনোভাবেই সহবাস পাওয়া যায়নি, তাই রোজা বিনষ্ট হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا اِذَا نَظَرَ اِلَى امْرَأَةٍ الخ : যদি কোনো রোজাদার কোনো সুশ্রী নারী কিংবা তার গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকায় এবং এতে তার বীর্যপাত ঘটে যায় তবে তার রোজা ফাসেদ হবে না। কেননা, এ সুরতেও বাহ্যত ও মর্মগতভাবে সহবাস পাওয়া যায়নি। এটা এমন হলো যেমন, কোনো রোজাদার ব্যক্তি কোনো সুন্দরী নারীর কল্পনা করে বসে পড়ল এবং ঐ কল্পনার কারণেই তার বীর্যস্খলিত হয়ে গেল। এতে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে রোজাদার যদি হস্তমৈথুন দ্বারা বীর্যপাত ঘটায় তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কোনো কোনো মাশায়েখ এমনটিই বলেছেন। তবে কারো কারো মত হলো, হস্তমৈথুনের সুরতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তার কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা হস্তমৈথুনের সুরতে মর্মগতভাবে সহবাস পাওয়া গিয়েছে।

তবে রোজাদার ছাড়া অন্যান্য লোকের জন্য হস্তমৈথুন জায়েজ আছে কি, না এ ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন হস্তমৈথুন দ্বারা যদি উত্তেজনা পূর্ণ করা উদ্দেশ্য হয় তবে তা একেবারেই জায়েজ হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ .

ইবনে জুরাইজ (র.) বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি শুনেছি যে, কিয়ামতের ময়দানে একটি সম্প্রদায় এমনভাবে আসবে যে, তাদের হাতগুলো গর্ভধারণকারী হবে। আমার মনে হয়, এরাই হবে হস্তমৈথুনকারী ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُوْنٌ 'হাতের সাথে সহবাসকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত।' আর হাত দ্বারা সহবাসকারী ব্যক্তি হলো– হস্তমৈথুনকারী। আর যদি হস্তমৈথুন দ্বারা উত্তেজনাকে ঠাণ্ডা করা উদ্দেশ্য হয় তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। –[ইনায়া, শরহে নিক্বায়া]

وَلَوْ اِدَّهَنَ لَمْ يُفْطِرْ لِعَدَمِ الْمُنَافِيْ وَكَذَا اِذَا احْتَجَمَ لِهٰذَا وَلِمَا رَوَيْنَا وَلَوْ اِكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ لِاَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّمَاغِ مَنْفَذٌ وَالدَّمْعُ يَتَرَشَّحُ كَالْعِرْقِ وَالدَّاخِلِ مِنَ الْمَسَامِ لَا يُنَافِيْ كَمَا لَوْ اِغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ ـ

অনুবাদ : আর যদি তৈল লাগায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা এতে রোজা বিরোধী কিছু পাওয়া যায়নি। তদ্রূপ সিঙ্গা লাগালেও রোজা ভঙ্গ হবে না। উপরিউক্ত দলিলের কারণে এবং ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে। আর যদি সুরমা ব্যবহার করে তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা চক্ষু ও মস্তিষ্কের মাঝে কোনো ছিদ্রপথ নেই। আর যে অশ্রু ঘামের মতো চুইয়ে বের হয় এবং লোমকূপ দিয়ে যা প্রবেশ করে, তা রোজার বিরোধী নয়। যেমন কেউ যদি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করে তবে রোজা ভঙ্গ হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : শরীর কিংবা মাথায় তৈল ব্যবহার করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। কেননা রোজা তখন ভঙ্গ হয় যখন রোজা বিরোধী কোনো জিনিস পাওয়া যায়। আর তৈল ব্যবহার করা রোজা বিরোধী নয়। সুতরাং এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না। দ্বিতীয়ত ঐ হাদীসের কারণে যা আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ হাদীসটি হলো– لَا يُفَطِّرْنَ الصِّيَامَ الْقَيْئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْاِحْتِلَامُ আর যদি সুরমা ব্যবহার করে তবুও রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও হলকের মধ্যে তার স্বাদ অনুভূত হয়। কেননা চোখ ও মস্তিষ্কের মাঝে কোনো রাস্তা নেই। এজন্য সুরমা হলকে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি চোখ ও মস্তিষ্কের মাঝে কোনো রাস্তা নেই তবে হলকের মধ্যে তর স্বাদ কিভাবে অনুভূত হয়?

এর জবাব হলো, স্বাদটি হলো সুরমার প্রতিক্রিয়া; হুবহু সুরমা নয়। হুবহু সুরমা হলকের মধ্যে প্রবেশ করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়; সুরমার প্রতিক্রিয়া দ্বারা ভঙ্গ হয় না। পুনরায় প্রশ্ন জাগে যে, চোখ আর মস্তিষ্কের মাঝে যখন কোনো রাস্তা নেই তখন অশ্রু কোথা থেকে বিগলিত হয়? এর জবাব হলো, অশ্রু ঘামের মতো লোমকূপ দিয়ে চুইয়ে বের হয়। আর যা কিছু লোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করে তা রোজা বিরোধী নয়। তাই এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না। যেমন– কোনো রোজাদার যদি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করে আর ঠাণ্ডার প্রভাব তার দিল-দেমাগে প্রবেশ করে তবে এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা ঠাণ্ডা লোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করে থাকে।

যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যেমন– মা'বাদ বিন হাওযা আনসারী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ وَقْتَ النَّوْمِ وَلْيَتَّقِهِ الصَّائِمُ "তুমি শোয়ার সময় আরামদায়ক ইছমিদ সুরমা ব্যবহার করো। আর রোজাদার তা ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকবে।" এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, রোজাদার ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করবে না। এর জবাব হলো, ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার রোজা ও সে দিনে সুরমা ব্যবহার করাকে মোস্তাহাব বলেছেন। উম্মত আশুরার দিনে সুরমা ব্যবহারের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং এই হাদীসটি উপরিউক্ত হাদীসের উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। তা ছাড়া কিফায়া গ্রন্থকার আবূ রাফে'-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِمِكْحَلَةِ اِثْمِدٍ فِيْ رَمَضَانَ فَاكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ "রাসূলুল্লাহ ﷺ ইছমিদ সুরমার সুরমাদানী রমজানে তালাশ করেছেন, অতঃপর তিনি রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করেছেন।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مِنْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَعَيْنَاهُ مَمْلُوْئَتَانِ كُحْلًا كَحَلَتْهُ اُمُّ سَلَمَةَ (رض) "একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘর থেকে এ অবস্থায় বের হয়েছেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় সুরমায় ভর্তি ছিল। হযরত উম্মে সালামা (রা.)-ও সুরমা ব্যবহার করেছিলেন।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এটা তখনকার কথা যখন আশুরার রোজা ফরজ ছিল; অতঃপর রহিত হয়ে গেছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) শরহে নিক্বায়ার মধ্যে ইবনে মাজাহ শরীফের উদ্ধৃতিতে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন– اَنَّهُ ﷺ اِكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ "রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করেছেন।" উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করেছেন।

وَلَوْ قَبَّلَ اِمْرَأَةً لَا يُفْسِدُ صَوْمَهٗ يُرِيْدُ بِهٖ اِذَا لَمْ يَنْزِلْ لِعَدَمِ الْمُنَافِىْ صُوْرَةً وَمَعْنًى بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ لِاَنَّ الْحُكْمَ هُنَاكَ اُدِيْرَ عَلَى السَّبَبِ عَلٰى مَا يَاْتِىْ فِىْ مَوْضِعِهٖ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ اَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَ وُجُوْدُ الْمُنَافِىْ صُوْرَةً اَوْ مَعْنًى يَكْفِىْ لِاِيْجَابِ الْقَضَاءِ اِحْتِيَاطًا اَمَّا الْكَفَّارَةُ فَتَفْتَقِرُ اِلٰى كَمَالِ الْجِنَايَةِ لِاَنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُوْدِ ـ

অনুবাদ : আর যদি স্ত্রীকে চুম্বন করে, তবে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ যদি বীর্যস্খলন না হয়। কেননা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রোজা বিরোধী কোনো কিছুই ঘটেনি। রুজু করা এবং মুসাহারাতের সম্পর্ক [অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাকে রজয়ী প্রদানের পর তাকে চুম্বন করলে স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেওয়া সাব্যস্ত হওয়া] সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এখানে হুকুমটি সবব বা কার্যকারণের উপর আবর্তিত। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আর যদি চুম্বন কিংবা স্পর্শের কারণে বীর্যস্খলিত হয়ে যায়, তাহলে তার রোজার কাজা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, এতে সহবাসের মর্ম বিদ্যমান। আর সতর্কতার খাতিরে বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ যে কোনোরূপে রোজা বিরোধী বিষয়ের অস্তিত্ব রোজার কাজা ওয়াজিব করার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য অপরাধ পূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা সন্দেহের কারণে কাফফারাসমূহ রহিত হয়ে যায়। যেমন হদসমূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : রোজাদার ব্যক্তি যদি কোনো নারীকে চুম্বন করে এবং তার বীর্যস্খলন না হয় তবে তার রোজা ফাসেদ হবে না। কেননা বীর্য ছাড়া চুম্বন দেওয়ার সুরতে সহবাস পাওয়া যায় না। বাহ্যতও না, মর্মগতও না। কেননা রোজা বিনষ্টকারী হলো সহবাস করা। তা বাহ্যিকভাবে হোক বা অভ্যন্তরীণভাবে হোক। রুজু করা ও মুসাহারাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এগুলো উত্তেজনার সাথে চুম্বন দেওয়া ও উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করার দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ রজয়ী তালাক প্রদানের পর যদি স্বামী ই'দ্দত পালনকালে তার রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উত্তেজনার সাথে চুম্বন করে তবে রুজু করা সাব্যস্ত হয়ে তার দেওয়া তালাক বাতিল হবে। এমনিভাবে যদি কোনো নারীকে উত্তেজনার সাথে চুম্বন করে তবে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধন সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যদিও তাকে চুম্বন করার দ্বারা বীর্যস্খলন না হয়। কেননা এগুলোর ভিত্তি হলো সহবাসের উপলক্ষ্যের উপর। অর্থাৎ রাজ'আত ও মুসাহারাত যেমনিভাবে সহবাস দ্বারা সাবিত হয় তেমনিভাবে সহবাসের উপলক্ষ্যের দ্বারাও সাবিত হয়ে যায়। এর বিস্তারিত বিবরণের আশরাফুল হিদায়ার ৪র্থ খণ্ড كِتَابُ النِّكَاحِ এবং ৫ম খণ্ড بَابُ الرَّجْعَةِ দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهٗ وَلَوْ اَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ الخ : মাসআলা হলো, যদি রোজাদার ব্যক্তি স্ত্রীকে চুম্বন করে কিংবা তাকে স্পর্শ করে এবং বীর্যপাত হয়ে যায় তবে তার রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় তার উপর এ রোজার কাজা ওয়াজিব হবে; কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কাজা এ কারণে ওয়াজিব হবে যে, এখানে যদিও বাহ্যিকভাবে সহবাস পাওয়া যায়নি; কিন্তু মর্মগতভাবে পাওয়া গেছে। কেননা পুরুষ ও মহিলা উত্তেজনা দ্বারা একে অপরের সাথে জড়িত হয়ে গেছে এবং বীর্যপাত ঘটেছে। একেই তো মর্মগতভাবে সহবাস বলা হয়। আর সতর্কতাবশত কাজা ওয়াজিব করার জন্য রোজা বিরোধী কোনো কাজ পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। তা বাহ্যত হোক বা মর্মগত হোক। আর কাফফারা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো, কাফফারা তখন ওয়াজিব হয় যখন পরিপূর্ণরূপে অপরাধ সংঘটিত হয়। এখানে বাহ্যত সহবাস না পাওয়া যাওয়ার কারণে অপরাধ লঘু হয়ে গেছে। উপরন্তু এক ধরনের সহবাস না হওয়ার সন্দেহ এসে গেল। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সন্দেহের কারণে কাফফারাকে দূর করে দেওয়া হয়। যেমনটি সংশয়ের কারণে হদসমূহকে দূর করে দেওয়া হয়।

وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلٰى نَفْسِهٖ أَىْ الْجِمَاعَ أَوِ الْإِنْزَالَ وَيُكْرَهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ بِمُفْطِرٍ وَرُبَّمَا يَصِيْرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهٖ فَإِنْ أَمِنَ يُعْتَبَرُ عَيْنُهُ وَأُبِيْحَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ تُعْتَبَرُ عَاقِبَتُهُ وَكُرِهَ لَهُ وَالشَّافِعِيُّ أَطْلَقَ فِيْهِ فِى الْحَالَيْنِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ مِثْلُ التَّقْبِيْلِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّهُ كَرِهَ الْمُبَاشَرَةَ الْفَاحِشَةَ لِأَنَّهُ قَلَّ مَا تَخْلُوْ عَنِ الْفِتْنَةِ وَلَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهٖ لَمْ يُفْطِرْ وَفِى الْقِيَاسِ يُفْسِدُ صَوْمَهُ لِوُصُوْلِ الْمُفْطِرِ إِلٰى جَوْفِهٖ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَذّٰى بِهٖ كَالتُّرَابِ وَالْحَصَاةِ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْغُبَارَ وَالدُّخَانَ وَاخْتَلَفُوْا فِى الْمَطَرِ وَالثَّلْجِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُفْسِدُ لِإِمْكَانِ الْإِمْتِنَاعِ عَنْهُ إِذَا أَوَاهُ خَيْمَةٌ أَوْ سَقْفٌ ـ

অনুবাদ : আর যদি নিজের ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকে [নিজের উপর নির্ভরতা থাকে] তবে চুম্বন করাতে কোনো দোষ নেই। অর্থাৎ সহবাস কিংবা বীর্যস্খলনে প্রলুব্ধ হবে না। আর যদি এ ভরসা না থাকে তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা মূল চুম্বন রোজা ভঙ্গকারী নয়; বরং পরিণতির দিক থেকে হয়তো তা কখনো বা ভঙ্গকারী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যদি নিজের উপর ভরসা থাকে তাহলে মূল চুম্বনের দিকটি বিবেচনা করে তা তার জন্য মুবাহ হবে। পক্ষান্তরে যদি নিজের উপর ভরসা না থাকে তাহলে চুম্বনের পরিণতির দিকটি বিবেচনা করে তার জন্য তা মাকরূহ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) উভয় অবস্থাতেই চুম্বন বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তার বিপক্ষে প্রমাণ তা-ই, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। নগ্নদেহে পরস্পর জড়াজড়ি জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী চুম্বনেরই অনুরূপ। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নগ্নদেহে পরস্পর জড়াজড়ি মাকরূহ। কেননা এরূপ আচরণ খুব কমই ফিতনা থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। আর রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায় যদি তার গলার ভিতরে মাছি প্রবেশ করে তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কিয়াস অনুযায়ী তার রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা, রোজা ভঙ্গকারী বস্তু তার উদরে পৌঁছে গেছে, যদিও তা খাদ্য জাতীয় নয়। যেমন– মাটি ও কঙ্কর। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তা ধুলা ও ধোঁয়ার সদৃশ হয়ে গেল। বৃষ্টি ও বরফ সম্পর্কে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, তাতে রোজা ভঙ্গ হবে। কেননা তাঁবুতে বা ছাদে [ঘরে] আশ্রয় নিয়ে তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : রোজাদারের যদি নিজের উপর নির্ভরতা থাকে, তবে তার নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করাতে কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ সহবাসে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ হলে এবং বীর্যপাত হওয়া থেকে নিরাপদ হলে, তবে তার চুম্বন করার দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি নিজের উপর নির্ভরতা না থাকে; বরং সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে কিংবা বীর্যপাত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে এই অবস্থায় রোজাদারের জন্য চুম্বন করা জায়েজ নেই; বরং মাকরূহ হবে। কেননা চুম্বন করা স্বয়ং রোজা বিনষ্ট করে না; কিন্তু অনেক সময় পরিণামের দিক থেকে রোজা বিনষ্ট হওয়ার উপলক্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ রোজাদার তার স্ত্রীকে চুম্বন করেছে এবং অগত্যা সহবাস করে ফেলেছে। কিংবা এই পরিমাণ লিপ্ত হয়ে গেছে যে, চুম্বন করতে করতে বীর্য বের হয়ে গেছে। তবে উপরিউক্ত উভয় সুরতে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। সুতরাং রোজাদার যদি এ কথার উপর নিশ্চিত হয় যে, খারাপ পরিণামের সুযোগ আসবে না; তবে হুবহু চুম্বনের দিকে লক্ষ্য করে চুম্বন করার অনুমতি দেওয়া হবে। আর যদি নিশ্চিত না হয় তবে পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে মাকরূহ বলা হবে।

যাই হোক, এ কথা প্রমাণিত হলো যে, রোজাদারের জন্য নিরাপদের অবস্থায় চুম্বন করা মাকরূহ ব্যতীতই জায়েজ। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে– إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ "রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করতেন এবং পরস্পর জড়িয়ে ধরতেন।" হযরত উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ "হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে রোজা অবস্থায় চুম্বন করতেন।" উপরিউক্ত রেওয়ায়েতদ্বয় দ্বারাও রোজার জন্য চুম্বন করার অনুমতি পাওয়া যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) নির্ভর ও অ-নির্ভর উভয় অবস্থাতেই চুম্বন করা মাকরূহ ছাড়াই জায়েজ বলেন, কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত দলিল তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ হবে।

قَوْلُهُ وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ الخ : مُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ বলা হয়, নারী-পুরুষ উভয়ে নগ্নদেহে লজ্জাস্থানকে [প্রজনন তন্ত্রকে] পরস্পর জড়াজড়ি করা। প্রবেশ না করানো। জাহির রেওয়ায়েত অনুযায়ী নগ্নদেহে জড়াজড়ি হলো চুম্বনেরই অনুরূপ। অর্থাৎ যদি এর পরও নিজের উপর নিশ্চয়তা থাকে তবে তা মাকরূহ ছাড়া জায়েজ। আর যদি নির্ভরতা না থাকে তবে মাকরূহ। এর সমর্থন আবূ দাউদ শরীফের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারাও হয়–

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ اٰخَرُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِىْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِىْ نَهَاهُ شَابٌّ ـ

অর্থ– হযরত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রোজাদারের নগ্নদেহে জড়াজড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। অপর ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। যাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, সে ছিল বৃদ্ধ আর যাকে নিষেধ করেছিলেন, সে ছিল যুবক।

লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসে ঐ ব্যাখ্যাই রয়েছে, যা আমরা গ্রহণ করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) রোজা অবস্থায় নগ্নদেহে জড়াজড়িকে সম্পূর্ণভাবে মাকরূহ বলেছেন। কেননা এর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হবে, আর তা জ্বালাবে না, অর্থাৎ নারী-পুরুষ নগ্নদেহে একেবারে মিলে যাবে যার দ্বারা কিছু হবে না এটা কিভাবে সম্ভব? এ জন্য উত্তম হলো مُبَاشَرَةْ فَاحِشَةْ-এ একেবারেই লিপ্ত না হওয়া। তাই ইমাম মুহাম্মদ (র.) রোজা অবস্থায় তা সম্পূর্ণভাবে মাকরূহ লিখেছেন।

মাসআলা : যদি রোজাদারের গলায় মাছি নিজে নিজে প্রবেশ করে পাকস্থলীতে চলে যায়। আর রোজাদারের তার রোজার কথা স্মরণও থাকে, তবে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে [সূক্ষ্ম কিয়াস] তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কিয়াস অনুযায়ী রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিয়াসের কারণ এই যে, রোজা ভঙ্গকারী এক বস্তু তার উদরে পৌঁছে গেছে, যদিও তা স্বভাবত খাদ্য জাতীয় নয়। যেমন– মাটি ও কঙ্কর। এগুলো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। যদিও এগুলো স্বাভাবিকভাবে খাদ্য জাতীয় নয়। ইসতিহসানের কারণ হলো, মাছি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়; বরং মাছি অনেক সময় ইচ্ছা ব্যতীতই মুখে প্রবেশ করে উদরে পৌঁছে যায়। সুতরাং মাছি ধোঁয়া ও ধূলার সদৃশ হয়ে গেল। ধোঁয়া আর ধূলা যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রবেশ করে তবে এগুলোর দ্বারা সকলের মতে রোজা ফাসেদ হয় না। এমনিভাবে মাছিও অনিচ্ছাকৃতভাবে উদরে চলে যাওয়ার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না।

যদি রোজাদারের মুখে বৃষ্টির ফোঁটা ও বরফ প্রবেশ করে পাকস্থলীতে চলে যায় তবে রোজা ভঙ্গ হবে কি না? এ ব্যাপারে মাশায়েখগণের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, বৃষ্টির ফোঁটা রোজা ভঙ্গকারী; কিন্তু বরফ রোজা ভঙ্গকারী নয়। আর কেউ কেউ তার উল্টো বলেছেন। অধিকাংশ মাশায়েখের মতে, উভয়টি দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। তার দলিল হলো, বৃষ্টির ফোঁটা ও আসমানী বরফ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। যখন বৃষ্টি হয় কিংবা বরফ পড়ে তখন কোনো তাঁবু কিংবা ছাদের ছায়ার আশ্রয় নেওয়া যায়। সুতরাং যেহেতু উভয়টি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব তাই এগুলো ধূলি-বালি ও ধোঁয়ার অনুরূপ হয়নি। 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থকার উক্ত কারণের উপর প্রশ্ন করে বলেছেন যে, রোজাদার যদি মুসাফির হয় সেখানে কোনো তাঁবু কিংবা ছায়ানীড় না থাকে তবে এই অবস্থায় বৃষ্টি ও বরফ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য রোজা ভঙ্গ না হওয়া উচিত, অথচ রোজা ঐ সুরতেও ভঙ্গ হয়ে যায়। 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থকার বলেন, সর্বোত্তম হলো এ কারণ বর্ণনা করা যে, মুখ বন্ধ করে বৃষ্টির পানি ও বরফ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। সুতরাং এই সমস্ত সুরতকে অন্তর্ভুক্ত করবে। রোজাদার মুকীম অবস্থায় হোক কিংবা সফর অবস্থায় হোক। কিন্তু আমরা বলি, বিজ্ঞ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো, বৃষ্টি ও বরফ এমন বস্তু নয় যে, তার থেকে বেঁচে থাকা মানুষের শক্তির বাহিরে। বরং এগুলো থেকে বেঁচে থাকা মানুষর সমর্থ্যের মধ্যে। চাই সে মুখ বন্ধ করুক কিংবা তাঁবু বা ছাদের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুক। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

وَلَوْ اَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ اَسْنَانِهِ فَاِنْ كَانَ قَلِيْلًا لَمْ يُفْطِرْ وَاِنْ كَانَ كَثِيْرًا يُفْطِرُ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) يُفْطِرُ فِى الْوَجْهَيْنِ لِاَنَّ الْفَمَ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ حَتّٰى لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِالْمَضْمَضَةِ وَلَنَا اَنَّ الْقَلِيْلَ تَابِعٌ لِاَسْنَانِهِ بِمَنْزِلَةِ رِيْقِهِ بِخِلَافِ الْكَثِيْرِ لِاَنَّهُ لَا يَبْقٰى فِيْمَا بَيْنَ الْاَسْنَانِ وَالْفَاصِلُ مِقْدَارُ الْحِمَّصَةِ وَمَا دُوْنَهَا قَلِيْلٌ ـ

অনুবাদ : আর যদি দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা গোশত ভক্ষণ করে, তবে কম হলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বেশি পরিমাণে হলে ভঙ্গ হবে। ইমাম জুফার (র.) বলেন, উভয় অবস্থাতেই রোজা ভঙ্গ হবে। কেননা মুখ বাহিরের অংশ রূপে বিবেচিত। এ কারণেই কুলি করার দ্বারা তার রোজা নষ্ট হয় না। আমাদের দলিল এই যে, অল্প পরিমাণ দাঁতের অনুগত, যেমন তার থুথু। অধিক পরিমাণের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, শেষ পর্যন্ত তা দাঁতের ফাঁকে বিদ্যমান থাকে না। কম ও বেশির মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হলো একটি বুটের পরিমাণ। এর চেয়ে কম অল্প হিসেবে গণ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : গোশতের রেশা যা দাঁতের সাথে মিশে থাকে এবং রোজাদার তা মুখের ভিতর থেকেই জিহ্বা দ্বারা নেড়ে খেয়ে ফেলে। এ পর্যায়ে রেশা যদি কম পরিমাণ হয় তবে রোজা ভঙ্গ হবে না। আর যদি অধিক পরিমাণে হয় তবে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম জুফার (র.)-এর মতে উভয় সুরতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাঁর দলিল হলো, মুখের ভিতরের অংশ শরীরের বাহিরের অংশরূপে বিবেচিত। তাই তো রোজা অবস্থায় কুলি করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। অথচ বাহির থেকে পানি মুখে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যখন মুখের ভিতরের অংশ শরীরের বাইরের অংশরূপে বিবেচিত তখন গোশতের রেশা যা মুখের অভ্যন্তরে ছিল তা গলার নীচে অবতরণ করানো এমন যেমন মুখের বাহির থেকে কোনো জিনিস উঠিয়ে মুখে দেওয়া হয়েছে। আর বাহিরের অল্প জিনিস আহার দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই ঐ গোশতের রেশা গিলে খাওয়ার দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল হলো, গোশতের রেশার অল্প পরিমাণ দাঁতের তাবে' বা অনুগত। কারণ, তার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই এটা থুথুর অনুরূপ হয়ে গেল। আর থুথু আহার করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। তাই গোশতের ঐ স্বল্প রেশা দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হবে না। তবে অধিক পরিমাণ হলো এর বিপরীত। কেননা অধিক পরিমাণে গোশত দাঁতের মধ্যে সাধারণত লেগে থাকে না। তাই তার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। কম ও বেশির মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হলো 'চানা বুটের পরিমাণ'। অর্থাৎ চানা বুটের পরিমাণকে অধিক বলা হবে, এর চেয়ে কম পরিমাণকে স্বল্প বা কম বলা হবে।

وَاِنْ اَخْرَجَهُ وَاَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ اَكَلَهُ يَنْبَغِيْ اَنْ يُفْسِدَ صَوْمَهُ كَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّ الصَّائِمَ اِذَا ابْتَلَعَ سِمْسِمَةً بَيْنَ اَسْنَانِهِ لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَلَوْ اَكَلَهَا ابْتِدَاءً يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَلَوْ مَضَغَهَا لَا يُفْسِدُ لِاَنَّهَا تَتَلَاشٰى وَفِيْ مِقْدَارِ الْحِمَّصَةِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ وَعِنْدَ زُفَرَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ اَيْضًا لِاَنَّهُ طَعَامٌ مُتَغَيِّرٌ وَلِاَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ يُعَافُهُ الطَّبْعُ ـ

অনুবাদ : আর যদি তা বের করে হাতে নিয়ে নেয় অতঃপর তা ভক্ষণ করে তাহলে রোজা ফাসেদ হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে– কোনো রোজা পালনকারী যদি দাঁতের ফাঁকে [আটকে থাকা] তিল গিলে ফেলে তবে রোজা নষ্ট হবে না। আর যদি সরাসরি তা মুখে নিয়ে খায় তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে। আর যদি তা শুধু চিবায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা তা মিশে যায়। আর চানাবুটের পরিমাণের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, তার উপর শুধুমাত্র কাজা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়। আর ইমাম জুফার (র.)-এর মতে তার উপর কাফফারাও ওয়াজিব হবে। কেননা তা বিকৃত খাদ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, মানুষের রুচি তা ঘৃণা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে জিনিস দাঁতের মাঝে আটকে আছে, রোজাদার তা হাত দ্বারা মুখ থেকে বের করেছে। অতঃপর তা খেয়ে ফেলেছে তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাওয়া সমীচীন। যদিও তা চানাবুটের চেয়ে কম পরিমাণের হয়। তাই তো ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রোজাদার যদি দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা তিল গিলে ফেলে তবে রোজা ভঙ্গ হবে না। আর যদি তিল কিংবা তিলের পরিমাণ কোনো জিনিস প্রথমত মুখে রাখে তারপর খায়, তবে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তিল মুখে রেখে চিবায়, পরে গিলে ফেলে তবে এর দ্বারা রোজা ফাসেদ হবে না। কেননা তিলের দানা যখন তখন দাঁত ও জিহ্বার ঘসায় মুখেই শেষ হয়ে যায়। তাই ভিতরে প্রবেশ করার মতো থাকে না। আর যেহেতু উদরে প্রবেশ করা সাব্যস্ত হয়নি, সেহেতু রোজা ভঙ্গ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, চানাবুটের পরিমাণ কোনো জিনিস দাঁত থেকে বের না করে অভ্যন্তরীণভাবেই গিলে ফেলেছে, পূর্বে এর বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। ইমাম জুফার (র.) বলেন, কাফফারাও ওয়াজিব হবে। ইমাম জুফার (র.)-এর দলিল এই যে, চানাবুটের পরিমাণ যে জিনিস দাঁতে আটকে থাকে তাও খাদ্য। যদিও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য। আর ইচ্ছাকৃত খাদ্য জাতীয় বস্তু আহার করার দ্বারা কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়, তবে শর্ত হলো রমজানের রোজা হওয়া। এজন্য ঐ সুরতেও কাজা-কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, যে জিনিস দাঁতের মধ্যে আটকে আছে, তা খাদ্য হওয়ার মধ্যে ক্ষতি এসে গেছে। এজন্য অনেক সময় এগুলো দ্বারা রুচিতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুতরাং এগুলো খাওয়া দ্বারা অপরাধ তো পাওয়া গেছে, তবে কম। আর স্বল্প অপরাধ দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হয় না। এজন্য এ সুরতে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْئُ لَمْ يُفْطِرْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اِسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَيَسْتَوِى فِيْهِ مِلْءُ الْفَمِ فَمَا دُوْنَهُ فَلَوْ عَادَ وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاَنَّهُ خَارِجٌ حَتّٰى انْتَقَضَ بِهِ الطَّهَارَةُ وَقَدْ دَخَلَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَا يَفْسِدُ لِاَنَّهُ لَمْ تُوْجَدْ صُوْرَةُ الْفِطْرِ وَهُوَ الْاِبْتِلَاعُ وَكَذَا مَعْنَاهُ لِاَنَّهُ لَا يُتَغَذّٰى بِهِ عَادَةً وَاِنْ اَعَادَ فَسَدَ بِالْاِجْمَاعِ لِوُجُوْدِ الْاِدْخَالِ بَعْدَ الْخُرُوْجِ فَيَتَحَقَّقُ صُوْرَةُ الْفِطْرِ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ فَعَادَ لَمْ يَفْسِدْ صَوْمَهُ لِاَنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ وَلَا صُنْعَ لَهُ فِىْ اِدْخَالٍ وَاِنْ اَعَادَ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِعَدَمِ الْخُرُوْجِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَفْسِدُ صَوْمَهُ لِوُجُوْدِ الصُّنْعِ مِنْهُ فِى الْاِدْخَالِ .

অনুবাদ : যদি অনিচ্ছাকৃত বমি এসে পড়ে তাহলে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اِسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . "যে ব্যক্তি বমি করে, তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যে ইচ্ছাকৃত বমি করে, তার উপর কাজা [পরিমাণ] ওয়াজিব হবে।" অনিচ্ছাকৃত বমির ক্ষেত্রে মুখ ভরা বমি ও কম বমির হুকুম সমান। যদি বমি ভিতরে ফেরত যায় আর তা মুখ ভরা থাকে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাতে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা তা বাইরের। এমনকি এতে পবিত্রতা বিনষ্ট হবে তথা অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সে বমিই ভিতরে প্রবেশ করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, রোজা ফাসেদ হবে না। কেননা রোজা ভঙ্গের বাহ্যিক রূপ অর্থাৎ গলাধঃকরণ পাওয়া যায়নি। তদ্রূপ রোজা ভঙ্গ করার প্রকৃত মর্মও পাওয়া যায়নি। কেননা তা সাধারণত খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। যদি উক্ত বমি সে নিজেই গলাধঃকরণ করে, তাহলে সকলের মতেই রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা বের হওয়ার পর প্রবেশ করানো পাওয়া গেছে। সুতরাং রোজা ভঙ্গের বাহ্যিক রূপ বিদ্যমান আছে। বমি যদি মুখ ভরা পরিমাণ থেকে কম হয় আর তা নিজেই ফেরত যায় তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা এটা বাহিরের নয় এবং এর প্রবেশের ব্যাপারে তার কোনো প্রয়াস নেই। যদি সে নিজে ইচ্ছা করে গিলে ফেলে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে তার প্রয়াস রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : বমি যদি নিজে নিজেই হয়ে যায় তবে রোজা ভঙ্গ হবে না। কম হোক বা বেশি হোক। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ "যার বমি নিজে নিজে হয়ে যায় তার উপর কাজা নেই। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করে তার উপর কাজা ওয়াজিব।" তিরমিযী শরীফে হাদীসটি এভাবে এসেছে যে- مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْئُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ "যে রোজাদারের নিজে নিজে বমি হয়ে যায় তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করে তার উপর কাজা ওয়াজিব।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরিউক্ত হুকুমের মধ্যে মুখ ভরে বমি করুক বা কম করুক উভয়টি বরাবর। অর্থাৎ বমি যদি অনিচ্ছাবশত নিজে নিজেই হয়ে যায়, তা মুখ ভরে হোক বা কম হোক উভয় অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা হাদীসটি হলো মুতলক [শর্তবিহীন] যার মধ্যে কম-বেশির কোনো ব্যাখ্যা নেই। এখন কথা হলো, মুখ ভরে বমি যদি নিজে নিজে এসে যায় অতঃপর নিজেই ফিরে যায় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ফাসেদ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, নিজে নিজে মুখ ভরে বমি আসা শরয়ীভাবে 'বের হওয়ার' অনুরূপ। তাই তার দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়।

অতঃপর যখন তা পুনরায় ফিরে গেল, যেন বাহির থেকে কোনো জিনিস ভিতরে প্রবেশ করল। আর বাহির থেকে কোনো জিনিস ভিতরে প্রবেশ করার দ্বারা রোজা ফাসেদ হয়ে যায়। এজন্য এই সুরতেও রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, বমি 'যদিও মুখ ভরা হয়' ভিতরে চলে যাওয়ার দ্বারা বাহ্যিক রূপে রোজা ভঙ্গ পাওয়া যায়নি তেমনি মর্মও পাওয়া যায়নি। বাহ্যিকরূপে তো এভাবে পাওয়া যায়নি যে, মানুষ যখন রোজাবস্থায় মুখে দিয়ে কোনো জিনিস গিলে ফেলে তাকে বাহ্যিকরূপ রোজা ভঙ্গ বলা হয়, এখানে তা পাওয়া যায়নি। সুতরাং বাহ্যিকরূপে রোজাও ভঙ্গ হয়নি। আর রোজা ভঙ্গের মর্ম এজন্য পাওয়া যায়নি যে, সাধারণত বমি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। অথচ ইফতারের অর্থই হলো কোনো জিনিস দ্বারা খাদ্য হাসিল করা। সুতরাং যেহেতু বাহ্যিক ও মর্মগত কোনোভাবেই রোজা ভঙ্গ পাওয়া যায়নি সেহেতু এর দ্বারা রোজাও ভঙ্গ হবে না। আর যদি বমি মুখ ভরা পরিমাণ নিজে নিজে বের হয় অতঃপর ইচ্ছা করেই তা গলাধঃকরণ করা হয় তবে সকলের মতে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা এ সুরতে বের হওয়ার পর প্রবেশ করানো পাওয়া গেছে। এতে রোজা ভঙ্গের বাহ্যিক রূপ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই এর দ্বারা রোজাও ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা ইফতার দ্বারা রোজা অবশিষ্ট থাকে না। আর সে ইফতার বাহ্যত হোক বা মর্মগত হোক। আর যদি নিজে নিজে বের হওয়া বমি মুখ ভরার চেয়ে কম হয় এবং তা নিজেই গলাধস্ত হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) উভয়ের মতে রোজা ফাসেদ হবে না। কেননা তা শরয়ীভাবে বাহিরের হুকুমেও না এবং এতে রোজাদারেরও কোনো ইচ্ছাকৃত প্রয়াস ছিল না। আর যদি মুখ ভরার চেয়ে কম পরিমাণ বমিকে স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রোজা ফাসেদ হবে না। কেননা خروج তথা বের হওয়া পাওয়া যায়নি। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা বমি ভিতরে প্রবেশ করানোর মধ্যে রোজাদারের ইচ্ছাকৃত প্রয়াস ছিল।

ফায়দা : বমি ফিরা বা ফিরানোর ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মূলনীতি হলো, خروج তথা বের হওয়ার দিকে লক্ষ্য করা হবে। আর 'খুরূজ' মুখ ভরা বমি দ্বারা সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ যদি বমির বের হওয়া পাওয়া যায় তবে রোজা ফাসেদ হবে। আর যদি না পাওয়া যায় তবে ফাসেদ হবে না। বমি নিজেই ফিরে যাক বা তাকে ফিরানো হোক। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতি এই যে, বমি যদি ফিরানো হয় অর্থাৎ স্বেচ্ছায় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে; নতুবা নয়। বমি কম হোক বা বেশি হোক।— [ফতহুল কাদীর]

فَإِنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا مَلأَ فِيْهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِمَا رَوَيْنَا وَالْقِيَاسُ مَتْرُوْكٌ بِهِ وَلَا كَفَّارَةَ لِعَدَمِ الصُّوْرَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لِإِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) لَا يُفْسِدُ لِعَدَمِ الْخُرُوْجِ حُكْمًا ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يُفْسِدْ عِنْدَهُ لِعَدَمِ سَبْقِ الْخُرُوْجِ وَإِنْ أَعَادَهُ فَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ لِمَا ذَكَرْنَا وَعَنْهُ أَنَّهُ يُفْسِدُ فَأَلْحَقَهُ بِمِلْءِ الْفَمِ لِكَثْرَةِ الصُّنْعِ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيْدَ أَفْطَرَ لِوُجُوْدِ صُوْرَةِ الْفِطْرِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمَعْنٰى .

অনুবাদ : [যদি রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায়] স্বেচ্ছায় মুখ ভরে বমি করে তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীস। আর এই হাদীসের কারণে কিয়াস বর্জিত হয়েছে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা [রোজা ভঙ্গ হওয়ার] বাহ্যিক রূপ পাওয়া যায়নি। যদি উক্ত বমি ভরা মুখের চেয়ে কম হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা হাদীসটি নিঃশর্ত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রোজা ফাসেদ হবে না। কেননা, শরিয়তের হুকুম মতে বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। অতঃপর যদি তা ফেরত যায়, তাহলে তাঁর মতে রোজা ফাসেদ হবে না। কেননা ফেরত যাওয়ার পূর্বে বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। যদি সে ইচ্ছা করে ফেরত নেয় তবে তার পক্ষ হতে বর্ণিত একটি মতে পূর্ব বর্ণিত কারণেই ফাসেদ হবে না। কিন্তু তার পক্ষ হতে বর্ণিত অন্য একটি মতে রোজা ফাসেদ হবে। কেননা, এটাকে তিনি মুখ ভরা বমির সাথে যুক্ত করেছেন। তার ইচ্ছাকৃত কর্মের [ইচ্ছাকৃত বমন ও গলাধঃকরণ] আধিক্যের কারণে। যে ব্যক্তি কঙ্কর কিংবা লোহা গিলে ফেলে তার রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, রোজা ভঙ্গের বাহ্যিক সুরত পাওয়া গেছে। আর তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, ইফতারের অর্থ বিদ্যমান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : রোজাদার যদি স্বেচ্ছায় বমি করে এবং তা মুখভর্তি হয় তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। মতনের মধ্যে عَمْدًا -এর قَيْد এ কারণে বৃদ্ধি করেছেন যে, যদি ভুলবশত বমি করে এবং মুখ ভরে করে তবে তার রোজা ফাসেদ হবে না। যেমন– ভুলবশত আহার করা দ্বারা রোজা ফাসেদ হবে না। মোদ্দা কথা, ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। দলিল ঐ হাদীস যা পূর্বের মাসআলায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ কিয়াসের চাহিদা তো এই ছিল যে, বমি দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা, রোজা কোনো জিনিস ভিতরে প্রবেশ করানোর দ্বারা ভঙ্গ হয়; ভিতর থেকে বের করার দ্বারা ভঙ্গ হয় না। যেমন– পেশাব-পায়খানা বের হওয়া দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বমির ক্ষেত্রে مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ হাদীসটির কারণে কিয়াসকে বর্জন করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন জাগে যে, যখন স্বেচ্ছায় বমি করা রোজা ভঙ্গকারী, তখন স্বেচ্ছায় রোজা ভঙ্গের কারণে কাজার সাথে কাফফারাও ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল। অথচ ঐ সূরতে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। এর জবাব হলো, স্বেচ্ছায় মুখ ভরে বমি করার সুরতে বাহ্যত ইফ্তার [রোজা ভঙ্গ] পাওয়া যায়নি। কেননা বাহ্যত ইফতারের জন্য কোনো জিনিস ভিতরে প্রবেশ করানো জরুরি। আর বমির সুরতে প্রবেশ করানো পাওয়া যায়নি; বরং তা উদর থেকে বের হয়েছে। আর যেহেতু ইফ্তার পাওয়া যায়নি তাই পরিপূর্ণ অপরাধও হয়নি। আর পরিপূর্ণ অপরাধ না হওয়ার কারণে কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। কেননা, কাফফারা পরিপূর্ণ অপরাধ দ্বারা ওয়াজিব হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় জবাব হলো, বমি করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যাওয়া খেলাফে কিয়াস হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসের মধ্যে নিরেট কাজা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কাফফারার কথা নয়। তাই হাদীসের ভিত্তিতে শুধু কাজা ওয়াজিব হবে; কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি স্বেচ্ছায় মুখভরা পরিমাণের কম বমি করে তবুও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। কারণ مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ হাদীসটি মুতলক বা নিঃশর্ত। এর মধ্যে কম-বেশির কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি; বরং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করেছে তার উপর কাজা ওয়াজিব। বমি কম অর্থাৎ ভরা মুখের কম হোক বা বেশি অর্থাৎ মুখভর্তি হোক।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কম বমির সুরতে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ, কম বমির সুরতে শরিয়তের হুকুম মতে বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। এ কারণেই কম বমি বের হওয়া কিংবা নিজেই বের হওয়ার দ্বারা অজু ভঙ্গ হয় না। সুতরাং যখন কম বমির সুরতে বের হওয়া পাওয়া যায়নি তাই রোজাও ভঙ্গ হবে না। কেননা, রোজা পাকস্থলীতে কোনো জিনিস প্রবেশ হওয়ার দ্বারা ভঙ্গ হয়, কিংবা মুখ দিয়ে কোনো জিনিস বের হওয়ার দ্বারা ভঙ্গ হয়। আর এখানে এর কোনোটিই পাওয়া যায়নি। তাই রোজা ভঙ্গ হবে না।

যদি স্বেচ্ছায় কম বমি করে অতঃপর তা নিজেই ফেরত যায় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ, কম বমির সুরতে খুরূজ-ই পাওয়া যায় না। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর যেহেতু বের হওয়া পাওয়া যায়নি তাই প্রবেশের প্রশ্নই উঠে না। পাকস্থলী থেকে যখন বের হওয়া এবং প্রবেশ করা কোনোটিই পাওয়া যায়নি তবে রোজা কিভাবে ভঙ্গ হবে?

আর যদি ঐ কম বমিকে সে ফেরত পাঠায় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ১. রোজা ভঙ্গ হবে না। ২. রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রথমটির দলিল তা যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কম বমির সুরতে 'বের হওয়া'-ই সাব্যস্ত হয় না। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের দলিল, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কম বমিকে মুখ ভরা বমির সাথে যুক্ত করেছেন। কারণ, ঐ সুরতে অধিক কার্য (فِعْلٌ كَثِيْرٌ) হয়ে গেছে। কেননা, একবার কম বমি করেছে অতঃপর তা গলায় ঢুকিয়েছে। এটি বারবার করার কারণে এমন হয়ে গেল– যেমন সে দুবার কিছু কিছু করে বমি করেছে যা অধিক হয়ে গেছে। আর অধিক বমি দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই এর দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ الخ মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি কঙ্কর কিংবা লোহার খণ্ড আহার করে তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে; কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কাজা তো এ কারণে ওয়াজিব হবে যে, রোজা ভঙ্গের বাহ্যিক রূপ পাওয়া গেছে। কেননা একটি জিনিস উদরে পৌঁছানো হয়েছে। কাফফারা এজন্য ওয়াজিব হবে না যে, মর্মগতভাবে রোজা ভঙ্গের কারণ পাওয়া যায়নি। কারণ, মর্মের দিক থেকে ইফ্তার হলো কোনো উপকারী বস্তু উদরে প্রবেশ করানো। তা খাদ্য জাতীয় হোক বা ঔষধ জাতীয় হোক। যেহেতু মর্মের দিক থেকে রোজা ভঙ্গের কারণ না পাওয়া যাওয়ার কারণে অপরাধ কম হয়েছে সেহেতু কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِسْتِدْرَاكًا لِلْمَصْلَحَةِ الْفَائِتَةِ وَالْكَفَّارَةُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلَّيْنِ اِعْتِبَارًا بِالْاِغْتِسَالِ وَهٰذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ وَإِنَّمَا ذٰلِكَ شِبْعٌ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْجِمَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوْهِ اِعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَجِبُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مُتَكَامِلَةٌ لِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি [রোজার স্মরণ অবস্থায়] দুপথের কোনো এক পথে ইচ্ছাকৃতভাবে সঙ্গম করবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। রোজার বিনষ্ট উদ্দেশ্য পুনরায় অর্জনের জন্য। আর কাফফারাও ওয়াজিব হবে। পূর্ণ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে। উভয় সঙ্গমের ক্ষেত্রেই বীর্যস্খলনের শর্ত নেই। এটাকে গোসলের উপর কিয়াস করা হয়েছে। এর কারণ হলো, বীর্যস্খলন ছাড়াই আনন্দ পাওয়া যায়। তা দ্বারাতো তৃপ্তি লাভ হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঘৃণিত স্থানে [গুহ্যদ্বারে] সঙ্গম দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তাঁর মতে কাফফারা হদ্দের সাথে বিবেচ্য। [অর্থাৎ গুহ্যদ্বারে সঙ্গম দ্বারা যেমন জেনা ওয়াজিব হয় না। তেমনি কাফফারাও ওয়াজিব হবে না] আর বিশুদ্ধ মত এই যে, কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা শাহ্ওয়াত [মনকামনা] পূর্ণ হওয়ার কারণে অপরাধ পূর্ণতা লাভ করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো রোজাদার ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সঙ্গম করে। গুপ্তাঙ্গে হোক, যা হালাল স্থান বা গুহ্যদ্বার হোক, যা হারাম স্থান। তার উপর কাজা ও কাফফারা ওয়াজিব। কাজা এ কারণে ওয়াজিব হবে, যাতে উদ্দেশ্য এবং নেকী পূর্ণ অর্জন হয়ে যায়। রোজার উদ্দেশ্য হলো নফসে আম্মারাকে দমন করা। আর সঙ্গম দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, রোজা অবস্থায় সঙ্গম দ্বারা নফসে আম্মারা প্রবল হয়; দমন হয় না। সুতরাং সঙ্গমের কারণে যেহেতু রোজার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে গেল, সেহেতু রোজা আর অবশিষ্ট থাকল না। আর যেহেতু রোজা অবশিষ্ট থাকল না ফলে ঐ দিনের রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। আর কাফফারা এ জন্য ওয়াজিব হবে যে, পরিপূর্ণ অপরাধ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ একজনের গুপ্তাঙ্গ অন্যজনের গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করা পাওয়া গিয়েছে। আর এটা বাহ্যত ও মর্মগত উভয়ভাবে সঙ্গম।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সঙ্গমের কারণে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যস্খলন শর্ত নয়। অর্থাৎ রোজাদার ব্যক্তি যদি গুপ্তাঙ্গ কিংবা গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে তবে কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। বীর্যস্খলন ঘটুক বা না ঘটুক। কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রবেশ করানো শর্ত; বীর্যস্খলন শর্ত নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) কাফফারা ওয়াজিব হওয়াকে গোসল ওয়াজিব হওয়ার উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে গুপ্তাঙ্গ গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করানো দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও বীর্যপাত না ঘটে, তেমনিভাবে বীর্যস্খলন ছাড়াও কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, 'বীর্য ছাড়া সহবাস' তাতো বাহ্যিক সঙ্গম, কিন্তু মর্মগতভাবে সঙ্গম নয়। কারণ, সঙ্গমের মর্মের মধ্যে জৈব চাহিদা পূর্ণ করা অন্তর্ভুক্ত। আর বীর্য ছাড়া এ চাহিদা পূর্ণ হওয়া সাব্যস্ত হয় না। তাই সঙ্গমের মর্ম না পাওয়া যাওয়ার কারণে সঙ্গম না হওয়ার সংশয় এসে গেছে। আর সংশয়ের কারণে কাফফারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এজন্য বীর্যবিহীন সঙ্গম দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব না হওয়া উচিত ছিল। আর গোসল ওয়াজিব হওয়াটা তো সতর্কতার ভিত্তিতে।

এর জবাব হলো, বীর্য ছাড়া কামভাব পূর্ণ না হওয়ার কথাটি আমরা মানতে পারি না। কারণ, কামভাব পূর্ণ হওয়া তো বীর্য ছাড়াও হয়। তবে বীর্য দ্বারা তৃপ্তি লাভ হয়। তাই বুঝা গেল যে, শাহওয়াত পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বীর্যের কোনো দখল নেই। আরো বুঝা গেল যে, বীর্য ছাড়াও সহবাসের মর্ম পাওয়া যায়। আর বীর্য ছাড়া যেহেতু সহবাসের মর্ম পাওয়া যায় সেহেতু সহবাস না হওয়ার আর কোনো সংশয় থাকল না। আর সংশয় না থাকার কারণে কাফফারা বিলুপ্ত হবে না; বরং সাব্যস্ত হবে। আপনি বোধ হয় কখনো এ ব্যাপারে চিন্তা করেননি যে, যদি রোজাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক লোকমা আহার করে তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। অথচ এক লোকমা দ্বারা তৃপ্তি হাসিল হয় না। এমনিভাবে সহবাসের সুরতে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া তৃপ্তি অর্জন করার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং চাহিদা মেটানোর উপর নির্ভরশীল হবে। আর চাহিদা মেটানো বীর্য ছাড়াও হতে পারে। তাই বীর্য ছাড়া সহবাস দ্বারাও কাফফারা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্য শর্ত না হওয়ার উপর কিফায়া গ্রন্থকার একটি দলিল বর্ণনা করেছেন। তা হলো, হদ ওয়াজিব করার জন্য বীর্য শর্ত নয়। অর্থাৎ যদি এক গুপ্তাঙ্গ অন্য গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করা পাওয়া যায় তবে হদ ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদিও বীর্যপাত না ঘটে। অথচ হদ হলো একটি সাজা মাত্র। সুতরাং কাফফারা যা ইবাদত ও সাজা উভয়টিকে শামিল করে তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য অবশ্যই বীর্যপাত হওয়া শর্ত হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এই আছে যে, গুহ্যদ্বারে সহবাস দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। ইমাম সাহেব (র.) তাকে হদ ওয়াজিব হওয়ার উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে এই ঘৃণিত কাজ দ্বারা হদ [সাজা] ওয়াজিব হয় না তেমনিভাবে এই ঘৃণিত কাজ দ্বারা রোজার কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। عِلَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ হলো পরিপূর্ণ অপরাধ সংঘটিত না হওয়া। অর্থাৎ হদ ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ অপরাধ পাওয়া যাওয়া জরুরি। ইমাম আযম (র.) তাকে পূর্ণ অপরাধে গণ্য করেন না। সুস্থ মানসিকতা উক্ত পশুসুলভ কাজকে ঘৃণা করে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য একটি বর্ণনা হলো, فَاعِلٌ ও مَفْعُوْلٌ অর্থাৎ কর্তা ও কৃত উভয় যদি রোজাদার হয় তাহলে উভয়ের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। এটাই সাহেবাইনের অভিমত। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, গুহ্যদ্বারে সহবাস দ্বারা যেহেতু চাহিদা মিটে যায় এজন্য ঐ সুরতেও পরিপূর্ণ অপরাধ পাওয়া গেছে। আর পূর্ণ অপরাধ দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যায়। এজন্য ঐ সুরতেও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

وَلَوْ جَامَعَ مَيْتَةً اَوْ بَهِيْمَةً فَلَا كَفَّارَةَ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) لِاَنَّ الْجِنَايَةَ تُكَامِلُهَا بِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ فِيْ مَحَلٍّ مُشْتَهًى وَلَمْ يُوْجَدْ ثُمَّ عِنْدَنَا كَمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ عَلَى الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَى الْمَرْاَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيْ قَوْلٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا لِاَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ فِعْلُهُ وَاِنَّمَا هِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِ وَفِيْ قَوْلٍ تَجِبُ وَيَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا اِعْتِبَارًا بِمَاءِ الْاِغْتِسَالِ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ وَكَلِمَةُ مَنْ تَنْتَظِمُ الذُّكُوْرَ وَالْاِنَاثَ وَلِاَنَّ السَّبَبَ جِنَايَةُ الْاِفْسَادِ لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ وَقَدْ شَارَكَتْهُ فِيْهَا وَلَا تَحْمِلُ لِاَنَّهَا عِبَادَةٌ اَوْ عُقُوْبَةٌ وَلَا يَجْرِيْ فِيْهَا الْحَمْلُ ـ

অনুবাদ : যদি মৃতদেহের সাথে কিংবা জন্তুর সাথে সঙ্গম করে তবে বীর্যস্খলন ঘটুক বা না ঘটুক, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। [আমাদের দলিল] কেননা 'স্বাভাবিক আকর্ষণীয় স্থানে' বাসনা চরিতার্থ করার দ্বারা অপরাধ পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এখানে তা পাওয়া যায়নি। অতঃপর আমাদের মতে সঙ্গম দ্বারা পুরুষের উপর যেমন কাফফারা ওয়াজিব, তেমনিভাবে স্ত্রীলোকের উপরও ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি অভিমতে স্ত্রী লোকের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফফারার সম্পর্ক হলো সঙ্গমের সাথে। আর এটা হলো পুরুষের কাজ। স্ত্রী লোকটি হলো কেবল সঙ্গমক্ষেত্র। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্য একটি মতে স্ত্রী লোকের উপরও ওয়াজিব হবে। তবে [এ দায়] তার পক্ষ হতে পুরুষ বহন করবে। গোসলের পানির উপর কিয়াস করে। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী – مَنْ اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ "যে ব্যক্তি রমজানে রোজা ভঙ্গ করবে তার উপর তা-ই ওয়াজিব হবে, যা জিহারকারীর উপর ওয়াজিব হয়।" مَنْ (যে) শব্দটি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তা ছাড়া এজন্য যে, কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে রোজা বিনষ্ট করা। শুধু সহবাসই নয়। আর উক্ত অপরাধে সেও পুরুষের সাথে শরিক। আর দায় বহনের প্রশ্নই উঠে না। কেননা, এ কাফফারা হয় ইবাদত, না হয় শাস্তি। আর উভয়টির মধ্যে অন্যের বহন চলে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা : যদি কোনো রোজাদার পুরুষ মৃত স্ত্রীলোক বা কোনো জন্তুর সাথে সঙ্গম করে তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তার বীর্যস্খলন ঘটুক বা না ঘটুক। হ্যাঁ যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। আর বীর্যপাত না হলে কাজাও ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই যে, কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো এমন সঙ্গম যা বিরত রাখার সুরতকে [সঙ্গম না করার সুরতকে] নিঃশেষকারী। আর এখানে এমন সঙ্গমই পাওয়া গিয়েছে, তাই কাফফারা ওয়াজিব হবে। আমাদের দলিল হলো,

কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে অপরাধের পূর্ণতা লাভ করা। আর অপরাধ পূর্ণতা লাভ করে مَحَلُّ الشَّهْوَةِ তথা স্বাভাবিক আকর্ষণীয় স্থানে বাসনা চরিতার্থ করার দ্বারা। কিন্তু এখানে তা নেই। কেননা সুস্থ মস্তিষ্কবান ব্যক্তি মৃত স্ত্রীলোক এবং জন্তুর সাথে সঙ্গম করতে ঘৃণা করে। তাই কেউ যদি এমনটি করে ফেলে তবে এটা তার উন্মাদনা বা সাংঘাতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করবে। মোদ্দা কথা, উক্ত সুরতে পরিপূর্ণ অপরাধ সংঘটিত হয়নি, তাই তার উপর কাফফারাও ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে সঙ্গম দ্বারা পুরুষের উপর কাফফারা ওয়াজিব হয় তা দ্বারা স্ত্রীলোকের উপরও ওয়াজিব হবে শর্ত হলো স্ত্রীলোকটির সন্তুষ্টচিত্তেই তা করা হবে। যদি স্ত্রীলোকটির সাথে জবরদস্তি করে সঙ্গম করা হয় তবে স্ত্রীলোকের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে স্ত্রী লোকটির সাথে শুরুতে যদি জবরদস্তি করা হয়, মাঝপথে আনন্দ ভোগ করার পর সেও রাজি হয়ে যায় এই সুরতেও তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থকার বলেন, হিদায়া প্রণেতা যদি عَلَى الْمَرْأَةِ -এর স্থলে عَلَى الْمَفْعُوْلِ بِهِ বলতেন তাহলে অতি উত্তম হতো। কেননা এতে যে ব্যক্তি আগ্রহ ও আনন্দের সাথে সমকামিতা/ হস্তমৈথুন করে সেও কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্ত্রীলোকের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফফারার সম্পর্ক হলো সঙ্গমের সাথে। আর সহবাস করা হলো পুরুষের কাজ; স্ত্রীলোকের কাজ নয়। স্ত্রীলোক তো হলো সহবাসের ক্ষেত্রস্বরূপ। সহবাস যেহেতু পুরুষের কাজ তাই পুরুষের উপরই ওয়াজিব হবে; স্ত্রীলোকের উপর ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অপর একটি মত হলো, সহবাস দ্বারা স্ত্রীলোকের উপরও কাফফারা ওয়াজিব হবে। তবে স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে পুরুষ আদায় করবে। উক্ত মতটি তিনি গোসলের পানির উপর কিয়াস করে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ রাতে যদি পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে আর গোসলের পানি মূল্য দ্বারা গ্রহণ করতে হয় তবে স্ত্রীর গোসলের পানি সংগ্রহ করা পুরুষের উপর কর্তব্য।

আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস– مَنْ أَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ "যে ব্যক্তি রমজানের রোজা ভঙ্গ করে তার উপর তা-ই ওয়াজিব হবে যা জিহারকারীর উপর ওয়াজিব হয়।" হাদীসের মধ্যে مَنْ শব্দটি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কে শামিল করে। তাই রোজা ভঙ্গ করলে কাফফারা পুরুষের উপর তো ওয়াজিব হবেই এবং স্ত্রীলোকের উপরও ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে রোজা নষ্ট করার অপরাধ। নিরেট সহবাস নয়। আর উক্ত অপরাধে পুরুষের সাথে স্ত্রীলোকও জড়িত। তাই যেমনিভাবে পুরুষের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে, তেমনিভাবে স্ত্রীলোকের উপরও ওয়াজিব হবে।

তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় মত, স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে বটে, তবে তার আদায়ের ভার পুরুষের উপর বর্তাবে -এর জবাব হলো, কাফফারা হয় ইবাদত, না হয় শাস্তি। আর এই উভয়টির মধ্যে অন্যের বহন চলে না। অর্থাৎ এমনটি নয় যে, কারো পক্ষ থেকে কোনো ফরজ আদায় করে দেওয়া হবে আর তা আদায় হয়ে যাবে। আর এটাও নয় যে, কারো উপর শাস্তি ওয়াজিব হবে, আর তা অন্যজন বহন করবে। তাই ইবাদত আর শাস্তি যেহেতু অন্য কেউ আদায় করলে আদায় হয় না, সেহেতু রোজার কাফফারা যদি স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হয় তবে তার কাফফারা তাকেই আদায় করতে হবে। পুরুষ আদায় করলে আদায় হবে না।

وَلَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَذّٰى بِهٖ اَوْ يُدَاوٰى بِهٖ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِاَنَّهَا شُرِعَتْ فِى الْوِقَاعِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِاِرْتِفَاعِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَنَا اَنَّ الْكَفَّارَةَ تَعَلَّقَتْ بِجِنَايَةِ الْاِفْطَارِ فِىْ رَمَضَانَ عَلٰى وَجْهِ الْكَمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ وَبِاِيْجَابِ الْاِعْتَاقِ تَكْفِيْرًا عُرِفَ اَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لِهٰذَا الْجِنَايَةِ ـ

অনুবাদ : যদি এমন কিছু আহার করে বা পান করে, যা খাদ্যরূপে কিংবা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার উপর কাজা ও কাফফারা দুটোই ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়। কেননা সহবাসের ক্ষেত্রে শরিয়ত কিয়াস বহির্ভূতভাবে কাফফারা প্রবর্তন করেছে। কারণ, পাপ তো তওবা দ্বারাই মোচন হয়ে যায়। এ কারণে [রোজা ভঙ্গের] অন্য ব্যাপারকে সহবাসের উপর কিয়াস করা যাবে না। আমাদের দলিল হলো, কাফফারার সম্পর্ক রমজান মাসে পূর্ণরূপে রোজা ভঙ্গ করার সাথে। আলোচ্য অবস্থায় তা সাব্যস্ত হয়। আর কাফফারা হিসেবে গোলাম আজাদ করার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই অপরাধ তওবা দ্বারা মোচন হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো রোজাদার যদি খাদ্যরূপে বা ঔষধরূপে কোনো কিছু ইচ্ছাকৃত আহার করে তবে তার উপর কাজা ও কাফফারা দুটোই ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এটাই ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রোজা অবস্থায় সহবাসের ক্ষেত্রে শরিয়ত কিয়াসের বিরুদ্ধে কাফফারা প্রবর্তন করেছে। কেননা তওবা দ্বারা গুনাহ মোচন হয়ে যাওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– اَلتَّوْبَةُ تَمْحُو الْحَوْبَةَ "তওবা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।" কিন্তু একবার যখন এক বেদুইন রমজানের রোজা অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে লজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ দরবারে উপস্থিত হলো তখন তার তওবা এবং লজ্জার দাবি এটাই ছিল যে, তার গুনাহ দূর হয়ে গেছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর রোজার কাফফারা ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, কাফ্ফারার প্রবর্তন কিয়াস বিরোধী। আর যে জিনিস কিয়াসের বিপরীত প্রবর্তন হয় তার উপর অন্য কোনো বস্তুর কিয়াস করা ঠিক হয় না। তাই রমজানের রোজার মধ্যে পানাহার করার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল এই যে, কাফফারার সম্পর্ক হলো রোজা ভঙ্গ করার অপরাধের সাথে, যা রমজান মাসে পরিপূর্ণভাবেই পাওয়া যায়। আর পূর্ণ অপরাধ যেমনভাবে সহবাসের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তেমনি পানাহার করার ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। তাই পানাহার দ্বারাও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ وَبِاِيْجَابِ الْاِعْتَاقِ الخ -এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারাংশ হলো, রমজানের মধ্যে সহবাসের অপরাধ তওবা দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যায় এ কথাটি আমরা মানি না। কারণ, শরিয়ত গোলাম আজাদ করাকে ঐ অপরাধের কাফফারা হিসেবে ওয়াজিব করেছে। যদি তওবা ঐ অপরাধ মোচনকারী হতো তবে কাফফারা হিসেবে গোলাম আজাদ করাকে ওয়াজিব করা হতো না। সুতরাং বুঝা গেল, এ অপরাধ শুধু তওবা দ্বারা নিঃশেষ হবে না। যেমন– চুরি ও ব্যভিচারের অপরাধ তওবা দ্বারা দূর হয় না; বরং হদ্ দ্বারা দূর হয়।

আর যেহেতু রমজানের রোজার মধ্যে সহবাস করার অপরাধ কাফফারা দ্বারা দূর হয় সেহেতু কাফফারার প্রবর্তন কিয়াস বিরোধী হচ্ছে না; বরং কিয়াস অনুযায়ীই হলো। আর যখন কিয়াস মোতাবেক হলো তখন তার উপর অন্য কোনো বস্তুর কিয়াস করাও জায়েজ হবে। অর্থাৎ রমজানের রোজার মধ্যে পানাহার করার সুরতে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার বিধানকেও এর উপর কিয়াস করা যাবে।

ثُمَّ قَالَ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِحَدِيْثِ الْاَعْرَابِيِّ فَاِنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ وَاَهْلَكْتُ فَقَالَ مَاذَا صَنَعْتَ قَالَ وَاقَعْتُ اِمْرَأَتِىْ فِىْ نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَا اَمْلِكُ اِلَّا رَقَبَتِىْ هٰذِهٖ فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ هَلْ جَاءَنِىْ مَا جَاءَنِىْ اِلَّا مِنَ الصَّوْمِ فَقَالَ اَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا فَقَالَ لَا اَجِدُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ وَيُرْوٰى بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَقَالَ فَرِّقْهَا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لَابَتَىِ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اَحْوَجُ مِنِّىْ وَمِنْ عِيَالِىْ فَقَالَ كُلْ اَنْتَ وَعِيَالُكَ يُجْزِيْكَ وَلَا يُجْزِىْ اَحَدًا بَعْدَكَ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِىْ قَوْلِهٖ يُخَيَّرُ لِاَنَّ مُقْتَضَاهُ التَّرْتِيْبُ وَعَلٰى مَالِكٍ فِىْ نَفْيِ التَّتَابُعِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ .

অনুবাদ ঃ তারপর ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [রোজার] কাফফারা জিহারের কাফফারার অনুরূপ। প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীস এবং জনৈক বেদুইন সাহাবীর ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস। তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হালাক হয়েছি এবং [স্ত্রীকেও] হালাক করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেছো? সাহাবী আরজ করলেন, রমজানের দিনে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটি গোলাম আজাদ করো। তিনি আরজ করলেন, নিজের এই গ্রীবা ছাড়া আমি আর কারো মালিক নই। তখন তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রেখ। তিনি আরজ করলেন, আমি যে বিপদে এসেছি তা তো এ রোজার কারণেই এসেছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাও। তিনি আরজ করলেন, এর সামর্থ্য আমার নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ফারাক খেজুর আনার হুকুম দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি পনের সা' খেজুরে পূর্ণ একটি থলে আনার হুকুম দিলেন এবং বললেন, এগুলো মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দাও। তিনি আরজ করলেন। আল্লাহর কসম, মদীনার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে আমার এবং আমার পরিজনের চেয়ে অভাবী আর কেউ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এবং তোমার পরিবার-পরিজন তা খাও। তবে তোমার জন্যই এটা যথেষ্ট, কিন্তু তোমার পরে অন্য কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না। এ হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ মতামতের বিপক্ষে দলিল যে, তার জন্য এর মধ্যে যে কোনো একটি করার অধিকার রয়েছে। কেননা হাদীসের দাবি হলো [তিনটির মাঝে] তরতিব রক্ষা করা। তদ্রূপ ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষেও দলিল যে, রোজা লাগাতার করতে হবে না। কেননা হাদীসের মধ্যে লাগাতার করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রোজার কাফফারা জিহারের কাফফারার মতো। জিহারের কাফফারা হলো, মুজাহির তথা জিহারকারী ব্যক্তি একটি গোলাম আজাদ করবে। যদি তার সামর্থ্য না থাকে তবে লাগাতার দু' মাস রোজা রাখবে। যদি তা না পারে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا . ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .

অর্থ– যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে [মা বলে] অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম আজাদ করে দেবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। যার এ সামর্থ্য নেই সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে লাগাতার দুমাস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে।– [২৮, মুজাদালা– ৩, ৪ নং]

মোদ্দা কথা, রোজার কাফফারা ও জিহারের কাফফারা হুবহু এক রকম। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত তিন জিনিস তথা গোলাম আজাদ, লাগাতার দু মাসের রোজা এবং ষাট মিসকিনের আহার এর মধ্যে ঐ তরতিবই [ধারাবাহিকতা] ধর্তব্য হবে যা জিহারের কাফফারার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গোলাম আজাদ করবে। এতে সক্ষম না হলে লাগাতার দু মাস রোজা রাখবে। তারও শক্তি না থাকলে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরিউক্ত তিন জিনিসের স্বাধীনতা দেন। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির গোলাম আজাদ করার সামর্থ্য থাকে তবুও সে রোজা দ্বারা কাফফারা আদায় করতে পারবে। আর গোলাম আজাদ করা ও রোজা রাখার শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিনকে আহার করিয়ে কাফফারা আদায় করতে পারবে। ইমাম মালিক (র.) রোজা রাখার ক্ষেত্রে লাগাতার এর শর্তের ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে দু'মাসের রোজা লাগাতার রাখা ওয়াজিব নয়; বরং যদি ধারাবাহিকতা ছাড়াও দু মাসের রোজা রাখে তবুও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

হযরত মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্মৌভী (র.) হিদায়ার হাশিয়ায় [প্রান্তটীকায়] লিখেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.)-এর মত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থকারের ভুল হয়ে গেছে। কেননা, শাফেয়ীগণের কিতাব পাঠে বুঝা যায়, ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরিউক্ত তিন জিনিসের মধ্যে এখতিয়ারের প্রবক্তা নন; বরং তিনি আমাদের মাজহাবের অনুরূপই তরতিবের প্রবক্তা, যা জিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে ইমাম মালিক (র.)-ও 'লাগাতার নয়' -এর প্রবক্তা নন; বরং এর প্রবক্তা হলেন ইবনে আবী লায়লা। আর ইবনে আবী লায়লাই ঐ তিন জিনিসের মধ্যে স্বাধীনতা প্রদানের প্রবক্তা। মোট কথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.)-ও তরতিব এবং লাগাতারের প্রবক্তা। তবে ইবনে আবী লায়লা (র.) 'তরতিব ও লাগাতার' কোনোটিরই প্রবক্তা নন; বরং তাখ্য়ীর ও লাগাতার নয় এর প্রবক্তা।

যাই হোক যারা তাখ্য়ীর [যে কোনো একটি অধিকার প্রদান]-এর প্রবক্তা তাদের দলিল হলো, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) এর বর্ণিত হাদীস–

اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَفْطَرْتُ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً اَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ اَوْ اَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا

অর্থ–এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, আমি রমজানের রোজা ভেঙ্গে ফেলেছি। রাসূল ﷺ বললেন, একটি গোলাম আজাদ করো বা দুই মাস রোজা রেখ কিংবা ষাটজন মিসকিনকে আহার করাও।

উক্ত হাদীসের মধ্যে তিন জিনিসকে اَوْ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। আর اَوْ দ্বারা তাখ্য়ীর বা স্বাধীনতা প্রদান বুঝা যায়। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল, কাফফারা আদায় হওয়ার জন্য তরতিব তথা ধারাবাহিকতা শর্ত নয়; বরং যেভাবেই আদায় করা হবে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

যারা ধারাবাহিকতার প্রবক্তা নন তাঁরা কাফফারার রোজাকে কাজা রোজার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমন রমজানের কাজা রোজার মধ্যে ধারাবাহিকতা শর্ত নয় তেমনি কাফফারার রোজার মধ্যেও ধারাবাহিকতা শর্ত হবে না।

আমাদের দলিল হলো বেদুইন সাহাবীর ঘটনা। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) হাদীসের বিশুদ্ধ ছয় কিতাবের (صِحَاحُ سِتَّةٌ) বরাত দিয়ে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ اِجْلِسْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلٰى أَفْقَرَ مِنِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ فَضَحِكَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ وَفِيْ لَفْظٍ أَنْيَابُهُ وَفِيْ لَفْظٍ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ خُذْهُ فَاَطْعِمْهُ أَهْلَكَ وَفِيْ لَفْظِ أَبِيْ دَاوُدَ زَادَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً .

অর্থ– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, কি করেছো তুমি? সে বলল, রমজানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে [ইচ্ছাকৃত] সহবাস করেছি। রাসূল ﷺ বললেন, কোনো গোলাম আছে কি তোমার যাকে আজাদ করতে পার? সে বলল, না। তিনি বললেন, লাগাতার রোজা রাখার শক্তি আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবার শক্তি আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, বসো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক টুকরী [যাকে عَرَقٌ বলা হয়] নিয়ে আসলেন, যার মধ্যে প্রচুর খেজুর ছিল। আর বললেন যাও, এগুলো সদকা করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়েও কোনো গরিব [মানুষ] আছে কি? আল্লাহর শপথ! এই দুই কৃষ্ণ পাথরবিশিষ্ট ভূমি মদীনায় কোনো পরিবার আমার পরিবারের চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী নয়। [এ কথা শুনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর সামনের দন্ত মুবারকগুলো বেরিয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় اَنْيَابٌ ও অপর বর্ণনায় نَوَاجِذُ শব্দ এসেছে। অতঃপর তিনি বললেন, নাও। তুমি ও তোমার পরিবার-পরিজন মিলে খাও। আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় ইমাম জুহরী (র.) এটাও বৃদ্ধি করেছেন যে, এটা শুধু তোমারই জন্য নির্দিষ্ট।

হিদায়া গ্রন্থকার সামান্য কিছু শাব্দিক পার্থক্যের সাথে উক্ত রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন। যার অনুবাদ ইবারতের অনুবাদের সময় করা হয়েছে। উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রথমত এ কথা বুঝা গেল যে, গোলাম আজাদ করা, দু'মাস রোজা রাখা এবং ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবার মধ্যে কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি; বরং এই তরতিব লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যদি গোলাম আজাদ করতে সক্ষম হয় তবে গোলাম আজাদ করা জরুরি। আর যদি সক্ষম না হয় তবে লাগাতার দু'মাস রোজা রাখা জরুরি। আর যদি তার উপরও শক্তি না রাখে তবে ষাটজন মিসকিনকে আহার করানো জরুরি। দ্বিতীয়ত এ কথা বুঝা গেল যে, দুই মাস রোজা রাখার মধ্যে ধারাবাহিকতা শর্ত। তাখ্য়ীরের প্রবক্তাদের পক্ষ থেকে পেশকৃত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাদীসের জবাব এই যে, উক্ত হাদীস দ্বারা ঐ সকল জিনিস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যার দ্বারা কাফফারা আদায় হয়ে যায়। তরতিব বা তাখ্য়ীর বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। আর অ-ধারাবাহিকতার প্রবক্তাদের কিয়াস-এর জবাব হলো, নস তথা আয়াতের বিপরীতে কিয়াস অগ্রাহ্য।

আমাদের দলিল পূর্বের মাসআলায় বর্ণিত হাদীসটিও। অর্থাৎ, مَنْ أَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ উক্ত হাদীসে রোজার কাফফারাকে জিহারের কাফফারার উপর কিয়াস করা হয়েছে। আর জিহারের কাফফারার মধ্যে তরতিব ও ধারাবাহিকতা উভয়টি শর্ত। সুতরাং রোজার কাফফারার মধ্যেও উভয়টি শর্ত হবে।

وَمَنْ جَامَعَ فِيمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَانْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ مَعْنًى وَ لَاكَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِهِ صُوْرَةً وَلَيْسَ فِيْ اِفْسَادِ صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِاَنَّ الْاِفْطَارَ فِيْ رَمَضَانَ اَبْلَغُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যস্থানে সঙ্গম করে এবং বীর্যপাত ঘটে, তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা এতে সঙ্গমের মর্ম বিদ্যমান। আর তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সঙ্গমের বাহ্যরূপ পাওয়া যায়নি। রমজানের রোজা ব্যতীত অন্য রোজা নষ্ট করার ক্ষেত্রে কাফফারা নেই। কেননা রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করা গুরুতর অপরাধ। সুতরাং অন্য রোজাকে তার সাথে যুক্ত করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَرْجٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সম্মুখদ্বার বা গুহ্যদ্বার। এখন উপরে বর্ণিত ইবারতের মর্ম হলো, যদি কেউ সম্মুখদ্বার ও গুহ্যদ্বার ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেমন– রান বা পেটে রোজা অবস্থায় সঙ্গম করে এবং এতে বীর্যপাত ঘটে তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কাজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, মর্মগতভাবে সঙ্গম পাওয়া গেছে। আর কাফফারা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো, বাহ্যিক সঙ্গম পাওয়া যায়নি। কেননা বাহ্যিক সঙ্গমের জন্যে লজ্জাস্থান লজ্জাস্থানে প্রবেশ করানো জরুরি যা এখানে পাওয়া যায়নি।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيْ اِفْسَادِ صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ الخ : **মাসআলা :** রমজানের রোজা ভিন্ন অন্য কোনো রোজা রেখে যদি ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। দলিল হলো, রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করা অন্য মাসে রোজা ভঙ্গ করার তুলনায় গুরুতর অপরাধ। কেননা রমজানের রোজা ভঙ্গ করার দ্বারা দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়। ১. جِنَايَةٌ عَلَى الصَّوْمِ তথা রোজার অপরাধ, ২. جِنَايَةٌ عَلَى شَهْرِ رَمَضَانَ তথা রমজান মাসস্থ অপরাধ। আর রমজান ছাড়া অন্য মাসে রোজা ভঙ্গ করার দ্বারা একটি অপরাধ হয়। তা হলো جِنَايَةٌ عَلَى الصَّوْمِ তথা রোজার অপরাধ। সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, রমজানের রোজা ভঙ্গ করার অপরাধ বৃহৎ। আর অন্য মাসের রোজা ভঙ্গ করার অপরাধ লঘু। আর বৃহৎ -এর বিধান সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা লঘু-এর বিধান সাব্যস্ত হওয়া জরুরি নয়। সুতরাং কাফফারার হুকুম রমজানের রোজা ভঙ্গ করার সাথে যুক্ত হবে। অন্য রোজার সাথে যুক্ত করা যাবে না।

অধিকন্তু রমজানের রোজা ভঙ্গ করার দ্বারা কাফফারা দেওয়া কিয়াস বিরোধী নস দ্বারা প্রমাণিত। তাই তার উপর অন্য রোজা ভঙ্গ করার কিয়াস করা যাবে না।

وَمَنِ احْتَقَنَ اَوْ اِسْتَعَطَ اَوْ اَقْطَرَ فِىْ اُذُنِهٖ اَفْطَرَ لِقَوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلِوُجُوْدِ مَعْنَى الْفِطْرِ وَهُوَ وُصُوْلُ مَا فِيْهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ اِلَى الْجَوْفِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِهٖ صُوْرَةً وَلَوْ اَقْطَرَ فِىْ اُذُنَيْهِ الْمَاءَ اَوْ دَخَلَهُمَا لَا يُفْسِدُ صَوْمَهٗ لِانْعِدَامِ الْمَعْنٰى وَالصُّوْرَةِ بِخِلَافِ مَا اِذَا اَدْخَلَهُ الدُّهْنَ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ডুশ ব্যবহার করে কিংবা নাক দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করায় কিংবা কানে ঔষধের ফোঁটা প্রয়োগ করে, তার রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– (اَبُوْ يَعْلٰى فِىْ مُسْنَدِهٖ) اَلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ "কিছু প্রবেশ করার কারণে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।" এ কারণে যে, রোজা ভঙ্গের মর্ম পাওয়া গেছে। আর তা হলো শরীরের উপকারী বস্তু ভিতরে প্রবেশ করা, তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা রোজা ভঙ্গের বাহ্যিক রূপ পাওয়া যায়নি। যদি কানে পানির ফোঁটা ঢেলে দেয় কিংবা নিজে নিজেই প্রবেশ করে তাহলে তার রোজা নষ্ট হবে না। কেননা, রোজা ভঙ্গের মর্ম ও বাহ্যিক রূপ কোনোটাই পাওয়া যায়নি। কিন্তু তেল প্রবেশ করানোর বিষয়টি এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি রোজাদার ব্যক্তি গুহ্যদ্বারে ঔষধ প্রবেশ করায় বা নাক দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করায় কিংবা কানে ঔষধের ফোঁটা প্রয়োগ করে, তাহলে এই তিন সুরতের প্রত্যেক সুরতেই রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। দলিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ "কোনো কিছু প্রবেশের কারণে রোজা ভঙ্গ হয় বের হওয়ার দ্বারা ভঙ্গ হয় না।" দ্বিতীয় দলিল এই যে, উপরিউক্ত সুরতগুলোতে রোজা ভঙ্গের মর্ম পাওয়া গেছে। কেননা রোজা ভঙ্গ করার অর্থ হলো শরীরের উপকারী কোনো কিছু পেটের ভিতরে প্রবেশ করানো।

قَوْلُهٗ وَلَوْ اَقْطَرَ فِىْ اُذُنَيْهِ الْمَاءَ الخ মাসআলা : যদি রোজাদার কানের ভিতর পানির ফোঁটা ঢেলে দেয় বা নিজে নিজেই পানি প্রবেশ করে। যেমন– নদী পার হওয়ার সময় কানে পানি ঢুকে গেল। তবে উক্ত দুই অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা, এতে রোজা ভঙ্গের মর্ম ও বাহ্যিক রূপ কোনোটাই পাওয়া যায়নি। মর্মগত এভাবে পাওয়া যায়নি যে, শরীরের উপকারী কোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করানো হয়নি। আর বাহ্যিক রূপ এভাবে পাওয়া যায়নি যে, কোনো কিছু মুখে দিয়ে বের করা হয়নি। সুতরাং রোজা ভঙ্গের মর্ম ও বাহ্যিক রূপ কোনোটিই না পাওয়া যাওয়ার কারণে রোজা নষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে যদি কানে তেল প্রবেশ করানো হয় তবে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তেল ঢেলে দেওয়ার মধ্যে যেহেতু শরীরের উপকার নিহিত সেহেতু এতে মর্মগত রোজা ভঙ্গ হওয়ার কারণ পাওয়া গেছে। তাই রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وَلَوْ دَاوَى جَائِفَةً اَوْ اٰمَّةً بِدَوَاءٍ فَوَصَلَ اِلَى جَوْفِهٖ اَوْ دِمَاغِهٖ اَفْطَرَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَالَّذِىْ يَصِلُ هُوَ الرَّطْبُ وَقَالَا لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِالْوُصُوْلِ لِانْضِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَاتِّسَاعِهٖ اُخْرٰى كَمَا فِى الْيَابِسِ مِنَ الدَّوَاءِ وَلَهٗ اَنَّ رُطُوْبَةَ الدَّوَاءِ تُلَاقِىْ رُطُوْبَةَ الْجِرَاحَةِ فَيَزْدَادُ مَيْلًا اِلَى الْاَسْفَلِ فَيَصِلُ اِلَى الْجَوْفِ بِخِلَافِ الْيَابِسِ لِاَنَّهٗ يُنَشِّفُ رُطُوْبَةَ الْجِرَاحَةِ فَيَنْسَدُّ فَمُهَا ـ

অনুবাদ : যদি পেটের ভিতর পর্যন্ত কিংবা মাথার ভিতর পর্যন্ত উপনীত ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা করে, আর ঔষধ পেটে কিংবা মস্তিষ্কে পৌছে যায়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর যে ঔষধ পৌছে, তা হলো তরল জাতীয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা, ঔষধ পৌছার ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই। কারণ, ছিদ্রপথ কখনো প্রসারিত হয় আবার কখনো সংকুচিত হয়। যেমন শুষ্ক ঔষধের ক্ষেত্রে [রোজা ভঙ্গ হয় না]। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল, ঔষধের তরলতা ক্ষতের তরলতার সাথে যুক্ত হয়ে, নিম্নমুখী আকর্ষণ বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে তা উদরে পৌছে যায়। শুষ্ক ঔষধের অবস্থার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, ঔষধ ক্ষতের তরলতা চুষে নেয়। ফলে ক্ষতের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

جَائِفَةٌ ঐ ক্ষতকে বলা হয় যা পেটের ভিতর পর্যন্ত পৌছে যায়। আর اٰمَّةٌ ঐ ক্ষতকে বলা হয় যেটা মাথার ভিতর পর্যন্ত পৌছে যায়। সুরতে মাসআলা এই যে, রোজাদার ব্যক্তি যদি পেটের ভিতর বা মাথার ভিতর পর্যন্ত ক্ষতস্থানে ঔষধ ঢেলে দেয় আর তা ছড়িয়ে পেট বা মস্তিষ্কে পৌছে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে ভঙ্গ হবে না। সাহেবাইনের দলিল হলো, ক্ষতের ছিদ্রপথ দিয়ে পেট বা মস্তিষ্ক পর্যন্ত ঔষধ পৌছার রাস্তা কখনো প্রসারিত হয় আবার কখনো বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভিতর পর্যন্ত ঔষধ পৌছার নিশ্চয়তা নেই। আর যখন নিশ্চয়তা নেই; বরং সন্দেহ আছে, তখন সন্দেহের কারণে রোজা ভঙ্গ হবে না। সুতরাং এই সুরতে রোজা ভঙ্গ হবে না। যেমন– শুষ্ক ঔষধ ঢেলে দেওয়ার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল, পেটের ক্ষত বা মাথার ক্ষতের মধ্যে ঢেলে দেওয়া ঔষধ পেট বা মস্তিষ্কে পৌছার নিশ্চয়তা তো কঠিন ব্যাপার। কেননা এটা হলো একটা অভ্যন্তরীণ বিষয়। কার্যত স্পষ্ট কথা হলো, যখন ঔষধের তরলতা ক্ষতের তরলতার সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তখন নিম্নমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তখন পেট বা মস্তিষ্কে ঔষধ অবশ্যই পৌছে যাবে। যখন পেট বা মস্তিষ্কে ঔষধ পৌছে তখন রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর বিপরীত হলো শুষ্ক ঔষধ। কেননা যখন তা ক্ষতের উপর ঢেলে দেওয়া হয় তখন তা ক্ষতের তরলতাকে নিজের মধ্যে চুষে নিয়ে ক্ষতের মুখকে বন্ধ করে দেয়। যখন ক্ষতের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, তখন ভিতরে ঔষধ প্রবেশ করার সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেল। এজন্য শুষ্ক ঔষধ ঢেলে দেওয়ার সুরতে রোজা ভঙ্গ হবে না এবং তরল ঔষধকে শুষ্ক ঔষধের উপর কিয়াস করাও ঠিক হবে না।

وَلَوْ اَقْطَرَ فِيْ اِحْلِيْلِه لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يُفْطِرُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ (رح) مُضْطَرِبٌ فِيْهِ فَكَاَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوْفِ مَنْفَذًا وَلِهٰذَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَوَقَعَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّ الْمَثَانَةَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَالْبَوْلُ يَتَرَشَّحُ مِنْهُ وَهٰذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْفِقْهِ ـ

অনুবাদ : যদি পুরুষাঙ্গের ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা করে ঔষধ ঢালে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাজহাব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামত স্ববিরোধী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সম্ভবত মনে করেছেন যে, পেট ও পুরুষাঙ্গের মাঝে সংযোগ পথ রয়েছে। এজন্যই পুরুষাঙ্গ দিয়ে পেশাব নির্গত হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মনে করেছেন, অণ্ডকোষ হলো উভয়ের মাঝে আড়স্বরূপ। আর পেশাব তা থেকে চুইয়ে পড়ে। এটি অবশ্য ফিকহ সংক্রান্ত বিষয় নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি রোজাদার ব্যক্তি পুরুষাঙ্গের ছিদ্রপথে ঔষধ প্রবেশ করায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে রোজা ভঙ্গ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামত স্ববিরোধী। উল্লেখ্য, 'মাবসূত' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে রয়েছেন। আর ইমাম ত্বাহাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে রয়েছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উক্ত মতানৈক্যের ভিত্তি হলো, পুরুষাঙ্গের ছিদ্রপথ ও পেটের মাঝখানে এমন কোনো সংযোগপথ আছে কি নেই, যার দ্বারা কোনো প্রবহমান জিনিস প্রবেশ করানো যায়। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ছিদ্রপথ ও পেটের মাঝখানে পথ আছে। দলিল এই যে, পেশাব ভিতর থেকে এ পথ দিয়েই নির্গত হয়। যদি কোনো পথ না থাকে তবে পেশাব কিভাবে নির্গত হয়? সুতরাং উক্ত সংযোগপথ থাকার কারণে যে ঔষধ পুরুষাঙ্গের ছিদ্রপথে দেওয়া হয়েছে। তা পেট পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর পেট পর্যন্ত কোনো জিনিস শরীরের উপকারের জন্য পৌঁছানোর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই এর দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে ঢুস দ্বারা ভঙ্গ হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, পুরুষাঙ্গের ছিদ্র ও পেটের মাঝে অণ্ডকোষ হলো প্রতিবন্ধক। আর পেশাব তা থেকেই চুইয়ে পড়ে। তাই পুরুষাঙ্গের ছিদ্রপথ ও পেটের মাঝে অণ্ডকোষ আড়স্বরূপ থাকার কারণে পুরুষাঙ্গের ছিদ্রপথে যে ঔষধ ঢালা হয় তা পেট পর্যন্ত পৌঁছে না। আর যেহেতু পেট পর্যন্ত যায় না সেহেতু রোজাও ভঙ্গ হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, পেট ও পুরুষাঙ্গের মাঝে সংযোগ পথ থাকা না থাকা ফিকহ সংক্রান্ত বিষয় নয়; বরং এর সম্পর্ক ডাক্তারদের শারীরিক বিদ্যার সাথে। তাই এই মাসআলা তাদের উপরই ন্যস্ত হবে। যদি ডাক্তারগণ বলেন যে, পেট ও পুরুষাঙ্গের ছিদ্রের মাঝে পথ আছে তবে রোজা ভঙ্গ হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে, যা কাজি আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাজহাব। আর যদি বলেন, সংযোগপথ নেই তবে রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাজহাব।

وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرْ لِعَدَمِ الْفِطْرِ صُوْرَةً وَمَعْنًى وَيُكْرَهُ لَهُ ذَالِكَ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْرِيْضِ الصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ اِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ لِمَا بَيَّنَّا وَلاَ بَأْسَ اِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْهُ بُدًّا صِيَانَةً لِلْوَلَدِ اَلاَ تَرٰى اَنَّ لَهَا اَنْ تُفْطِرَ اِذَا خَافَتْ عَلٰى وَلَدِهَا ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মুখে কোনো কিছুর সামান্য স্বাদ গ্রহণ করে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা রোজা ভঙ্গের বাহ্যিক রূপ ও মর্ম কোনোটিই বিদ্যমান নেই। তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা এতে রোজা ভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়। স্ত্রীলোকের যদি বিকল্প কোনো উপায় থাকে তাহলে তার পক্ষে আপন সন্তানের খাদ্য চিবিয়ে দেওয়া মাকরূহ। কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। আর যদি বিকল্প কোনো উপায় না পায় তাহলে এতে কোনো দোষ নেই; সন্তান রক্ষার নিমিত্তে। তুমি কি লক্ষ করনি যে, সন্তানের জীবনাশঙ্কা দেখা দিলে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো রোজাদার মুখ দ্বারা কোনো কিছুর আস্বাদন করে তবে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা এ সুরতে রোজা ভঙ্গ করার বাহ্যিক রূপ কিছু পাওয়া যায়নি যে, কোনো কিছু গিলে ফেলা হয়েছে এবং মর্মগতভাবেও রোজা ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি যে, শরীরের উপকারের জন্য কোনো কিছু পেটে পৌঁছানো হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক রূপ ও মর্মগত দিক থেকে রোজা ভঙ্গের কোনো কারণই পাওয়া যায়নি; তাই রোজা কিভাবে ভঙ্গ হবে? তবে এই কাজটি মাকরূহ। কেননা এর দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَمْضَغَ الخ : রোজা অবস্থায় স্ত্রীলোকের তার শিশুকে চিবিয়ে খাবার খাওয়ানো মাকরূহ। তবে শর্ত হলো, যদি স্ত্রীলোকের অন্য কোনো বিকল্প উপায় থাকে। যেমন– তার পার্শ্বে এমন কোনো লোক বসা আছে যার উপর রোজা ফরজ নয়। আর সে চিবিয়ে ঐ শিশুকে খাওয়াতে পারে, তবে এই অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকের চিবানো মাকরূহ। কারণ, এই সুরতে রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি নিজের চিবানো ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প উপায় না থাকে তবে চিবানোতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা শিশুর জীবন রক্ষা করাও জরুরি। যেমন– আপনি লক্ষ করেছেন যে, যদি দুধের শিশুর জীবনাশঙ্কা দেখা দেয় এবং স্ত্রীলোকের রোজার অবস্থায় দুধ নির্গত না হয়, তবে এই অবস্থায় স্ত্রীলোকের জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ আছে।

وَمَضْغُ الْعِلْكِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ وَقِيلَ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَئِمًا يُفْسِدُ لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ بَعْضُ أَجْزَائِهِ وَقِيلَ إِذَا كَانَ أَسْوَدَ يُفْسِدُ وَإِنْ كَانَ مُلْتَئِمًا لِأَنَّهُ يَتَفَتَّتُ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ وَلِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالْإِفْطَارِ وَلَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً لِقِيَامِهِ مَقَامَ السِّوَاكِ فِي حَقِّهِنَّ وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ عَلَى مَا قِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِلَّةٍ وَقِيلَ لَا يُسْتَحَبُّ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ .

অনুবাদ : আঠা চিবালে রোজাদারের রোজা ভঙ্গ হয় না। কেননা তা তার উদরে পৌছে না। কোনো কোনো মতে যদি তা জমাট না হয়, তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, তখন কিছু অংশ উদরে পৌছবে। কোনো কোনো মতে যদি তা কালো জাতীয় হয় তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি জমাট হলেও রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তা ভেঙ্গে যায়। তবে রোজাদারের জন্য এমনটি করা মাকরূহ। কেননা, এতে রোজা ভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়। তা ছাড়া [মুখ নাড়ার কারণে] তার প্রতি রোজা না রাখার অভিযোগ আরোপিত হবে। তবে রোজাদার না হলে স্ত্রীলোকের জন্য তা মাকরূহ নয়। কেননা তাদের ক্ষেত্রে তা মিসওয়াকের স্থলবর্তী। কেউ কেউ বলেন, দন্তরোগের কারণে না হলে পুরুষদের জন্য তা মাকরূহ। আবার কেউ বলেন, তা পছন্দনীয় নয়। কেননা, এতে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি রোজাদার আঠা চিবায় তাহলে তার রোজা নষ্ট হবে না। কেননা তা আঠাযুক্ত হওয়ার কারণে দাঁতের সাথে মিশে থাকে। উদর পর্যন্ত পৌছে না। আর যে জিনিস উদর পর্যন্ত পৌছে না তা রোজা ভঙ্গ করে না। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, গাঁদ [আঠা] যদি জমাট না হয়; বরং পাতলা পাতলা হয় তাহলে তা চিবানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এই সুরতে গাঁদের কিছু অংশ উদরে পৌছে যায়। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, গাঁদ যদি কালো বর্ণের হয় তাহলে তা চিবানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও সেগুলো পরস্পর মিশ্রিত হয়। কেননা, কালো বর্ণের গাঁদ টুকরা টুকরা হয়ে যায়। টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার কারণে তার কিছু অংশ উদর পর্যন্ত পৌছে যায়।

মোট কথা, গাঁদ চিবানো দ্বারা যদি রোজা ভঙ্গ নাও হয়; তবুও রোজাদারের জন্য তা চিবানো মাকরূহ। কেননা, এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, হতে পারে কিছু অংশ উদরে চলে যাবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, লোকেরা তাকে রোজা না রাখার অপবাদ দেবে। অর্থাৎ যখন কেউ তাকে দেখবে যে, সে কিছু খাচ্ছে তখন তাকে রোজা না রাখার অপবাদ দেবে এবং তারা তাকে মন্দ ভাববে। আর যে সকল কাজ বাহ্যত লোকেরা মন্দ মনে করে তা মাকরূহ। এজন্য এ কাজটিও মাকরূহ হবে। স্ত্রীলোক যদি রোজাদার না হয়; তবে তার গাঁদ চিবানো মাকরূহ নয়। কেননা স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে গাঁদ চিবানো মিসওয়াক করার স্থলবর্তী। আর গাঁদকে মিসওয়াকের স্থলবর্তী এ কারণে করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকেরা সাংঘাতিক দুর্বল ও ভঙ্গুর এবং তাদের দাঁতও দুর্বল এবং মাড়ি ভঙ্গুর হয়। তাই মিসওয়াকের ন্যায় শরীর ক্ষতকারী বস্তুকে কিভাবে বরদাশত করবে। হ্যাঁ পুরুষের যদি কোনো অসুস্থতা না থাকে, তাহলে তাদের জন্য গাঁদ চিবানো মাকরূহ। কেউ কেউ বলেছেন, পুরুষের জন্য গাঁদ চিবানো মোবাহ [বৈধ] তো বটে তবে মোস্তাহাব নয়। মোস্তাহাব না হওয়ার কারণ হলো, পুরুষের গাঁদ চিবানোর ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রীলোকদের সদৃশ হওয়া লাজিম আসে। আর স্ত্রীলোকদের সদৃশ হওয়া আদৌও সমীচীন নয়; এজন্য পুরুষদের গাঁদ চিবানোকে মাকরূহ বা অ-মোস্তাহাব বলা হয়েছে।

وَلَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ وَدُهْنِ الشَّارِبِ لِاَنَّهُ نَوْعُ إِرْتِفَاقٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَحْظُوْرِ الصَّوْمِ وَقَدْ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْاِكْتِحَالِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاِلَى الصَّوْمِ فِيْهِ وَلَا بَأْسَ بِالْاِكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ اِذَا قَصَدَ بِهِ التَّدَاوِيْ دُوْنَ الزِّيْنَةِ وَيُسْتَحْسَنُ دُهْنُ الشَّارِبِ اِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الزِّيْنَةُ لِاَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِضَابِ وَلَا يَفْعَلُ لِتَطْوِيْلِ اللِّحْيَةِ اِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُوْنِ وَهُوَ الْقُبْضَةُ .

অনুবাদ : সুরমা ব্যবহার করা এবং গোঁফে তেল দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। কেননা এটা এক ধরনের উপকার লাভ। আর তা রোজার নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরা দিবসে সুরমা ব্যবহার করা ও রোজা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যদি সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য না হয়ে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে পুরুষদের জন্য সুরমা ব্যবহারে দোষ নেই। তদ্রূপ সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে না হলে গোঁফে তেল দেওয়া উত্তম। কেননা এটা খেজাবের কাজ করে। তবে দাড়ি সুন্নত পরিমাণ তথা এক মুষ্টি পরিমাণ থাকলে তা লম্বা করার উদ্দেশ্যে এটা করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা, গোঁফে তেল লাগানো বিনা মাকরূহ জায়েজ। কারণ, এ দুটো জিনিস জীবনোপকরণের বস্তু। আর যে জিনিস এমন হয় সেগুলো রোজার নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্য এগুলো ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিবসে এ দুটো জিনিস ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছেন। যথা– ১. রোজা রাখা, ২. সুরমা ব্যবহার করা। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো, রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজার দিবসে সুরমা ব্যবহার করা কেন মোস্তাহাব করলেন?

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, পুরুষের জন্য চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। তবে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে পুরুষের সুরমা ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কেননা, সুরমা ব্যবহার করা হলো স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য। এমনিভাবে যদি গোঁফে তেল ব্যবহারে সৌন্দর্য বর্ধন করা উদ্দেশ্য না হয় তবে উত্তম। কেননা গোঁফে তেল ব্যবহার করা খেজাবের কাজ করে। আর খেজাব ব্যবহার করা সুন্নত। এজন্য গোঁফে তেল ব্যবহার করাও মোস্তাহাব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দাড়ি লম্বা করার উদ্দেশ্যেও তেল ব্যবহার না করা উচিত, তবে শর্ত হলো যদি দাড়ি সুন্নত পরিমাণ তথা এক মুষ্টি হয়। দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা করা সুন্নত। দলিল হলো তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীস–

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ اللِّحْيَةِ مِنْ طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থেকে গ্রহণ করতেন।" অর্থাৎ কর্তন করতেন, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস এর বিপরীত। হাদীসটি হলো– اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللُّحٰى "গোঁফ কামাও আর দাড়ি বাড়াও। এর জবাব এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর যিনি উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী স্বয়ং তার আমল হলো এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা। যেমন বর্ণিত আছে যে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ ثُمَّ يَقُصُّ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ .

"ইবনে ওমর (রা.) তার দাড়ি ধরতেন আর এক মুষ্টির নীচের দাড়ি কেটে ফেলতেন।"

وَلاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطَبِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ لِقَوْلِهِ ﷺ خَيْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يُكْرَهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَثَرِ الْمَحْمُودِ وَهُوَ الْخَلُوفُ فَشَابَهَ دَمَ الشَّهِيْدِ قُلْنَا هُوَ أَثَرُ الْعِبَادَةِ وَالْأَلْيَقُ بِهِ الْإِخْفَاءُ بِخِلَافِ دَمِ الشَّهِيْدِ لِأَنَّهُ أَثَرُ الظُّلْمِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّطَبِ الْأَخْضَرِ وَبَيْنَ الْمَبْلُوْلِ بِالْمَاءِ لِمَا رَوَيْنَا .

অনুবাদ : রোজাদারের পক্ষে সকাল-বিকাল কাঁচা মিসওয়াক ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই। কেনননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– خَيْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ 'রোজাদারের সর্বোত্তম আমল হলো মিসওয়াক করা।' এতে সময়ের কোনো পার্থক্য করা হয়নি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিকাল বেলা মিসওয়াক করা মাকরূহ। কেননা তাতে একটি প্রশংসিত চিহ্ন দূর করা হয়। আর তা হলো রোজাদারের মুখের গন্ধ। সুতরাং তা শহীদের রক্তের সদৃশ। আমাদের বক্তব্য এই যে, এটা হলো ইবাদতের চিহ্ন। আর এ ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করাই হলো অধিক সমীচীন। শহীদের রক্তের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, এটি হলো জুলুমের চিহ্ন। আমাদের বর্ণিত হাদীসের আলোকে মূলত কাঁচা, আর্দ্র এবং পানি দ্বারা ভিজানো মিসওয়াকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : আমাদের মতে, রোজাদারের জন্য আর্দ্র ও পানিতে ভিজানো মিসওয়াক ব্যবহার করা সকালেও জায়েজ এবং সন্ধ্যায়ও বিনা মাকরূহে জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে রোজাদারের জন্য বিকালে মিসওয়াক করা মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো ত্বাবারানী ও দারা কুতনীতে বর্ণিত হাদীস–

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا يَبِسَتْ شَفَتَاهُ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

অর্থ– তোমরা রোজা অবস্থায় সকালে মিসওয়াক করো; বিকালে মিসওয়াক করো না। কারণ, যখন রোজাদারের ঠোঁট শুকিয়ে যাবে, [এর বিনিময়ে] কিয়ামতের দিবসে একটি নূর সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, রোজাদারের মুখের গন্ধ যাকে হাদীসের ভাষায় মিশকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে– মিসওয়াক করার দ্বারা তা দূর হয়ে যায়। তাই সে সুগন্ধি অবশিষ্ট রাখার মানসে বিকালে মিসওয়াক করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এ গন্ধ শহীদের খুনের সদৃশ হয়ে গেছে। সুতরাং যেমনিভাবে শহীদের রক্ত দূর করা হয় না; গোসল ছাড়াই তাকে দাফন করা হয়, তেমনি রোজাদারের মুখের গন্ধও দূর করা যাবে না।

আমাদের দলিল হলো, ইবনে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হাদীস– خَيْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ "রোজাদারের সর্বোত্তম অভ্যাস/আমল হলো মিসওয়াক করা।" উক্ত হাদীসে সকাল-সন্ধ্যার কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি এবং আর্দ্র ও শুষ্কেরও কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এজন্য রোজা অবস্থায় সব ধরনের মিসওয়াক করা এবং সব সময় করা জায়েজ। দ্বিতীয় দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ "যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন না হতো তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।" উক্ত হাদীস দ্বারা যদিও মিসওয়াক

ওয়াজিব না হওয়া বুঝা যায়; কিন্তু প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করা সুন্নত হওয়াও প্রমাণিত হয়। 'প্রত্যেক নামাজ' কথাটি ব্যাপক। যা জোহর, আসর, মাগরিব সব ওয়াক্তকে অন্তর্ভুক্ত করে। ওয়াক্ত শব্দটিও ব্যাপক। যা রোজার সময় ও রোজার বাইরের সময় সব ওয়াক্তকে শামিল করে। এজন্য উক্ত হাদীস দ্বারা রমজানের আসর আর মাগরিবের সময়েও মিসওয়াক করার বিধান প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ কথাটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, রোজাদারের জন্য বিকাল বেলায়ও মিসওয়াক করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

- তৃতীয় দলিল হলো, মুসনাদে আহমদে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– صَلٰوةٌ بِسِوَاكٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ "মিসওয়াক করে নামাজ পড়া আল্লাহর নিকট মিসওয়াক ছাড়া সত্তর ওয়াক্ত নামাজ পড়া থেকে উত্তম।" উক্ত হাদীস রোজাদারের আসরের নামাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে, তবে শর্ত হলো, সে মিসওয়াক করে নামাজ আদায় করেছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, রোজাদারের জন্য সন্ধ্যাবেলায় মিসওয়াক করা মাকরূহ ছাড়াই জায়েজ। অধিকন্তু তিরমিযী শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُعِدُّهُ وَلَا أُحْصِىْ "হযরত আবদুল্লাহ (রা.) স্বীয় পিতা আমির বিন রাবীআ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রোজা অবস্থায় বহুবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আমাদের দলিল নিম্নোক্ত হাদীসটিও–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَتَسَوَّكُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَىُّ النَّهَارِ اَتَسَوَّكُ قَالَ اَىَّ النَّهَارِ شِئْتَ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً قُلْتُ اِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُوْنَهُ عَشِيَّةً وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَقَدْ اَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَابُدَّ بَقِىَ الصَّائِمُ الْخَلُوْفُ . وَاِنِ اسْتَاكَ وَمَا كَانَ بِالَّذِىْ يَأْمُرُهُمْ اَنْ يُنْتِنُوْا اَفْوَاهَهُمْ عَمْدًا مَا فِىْ ذَالِكَ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ بَلْ فِيْهِ شَرٌّ اِلَّا مَنِ ابْتُلِىَ بِبَلَاءٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا .

অর্থ– আব্দুর রহমান ইবনে গনম (রা.) বলেন, আমি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি বললাম দিনের কোন সময় মিসওয়াক করব? তিনি বললেন, সকাল-সন্ধ্যা, যখন তোমার মন চায়। আমি বললাম, লোকেরা তো সূর্য হেলে যাওয়ার পর মিসওয়াক করাকে মাকরূহ বলে এবং তারা [আরো] বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশ্‌ক আম্বর থেকেও উত্তম। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তাঁর জানা ছিল যে, রোজাদারের মুখে গন্ধ অবশ্যই আছে, যদিও মিসওয়াক করে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন ছিলেন না যে, লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন, মুখকে দুর্গন্ধময় বানাও, এর মধ্যে তো কোনো কল্যাণ নেই; বরং অ-কল্যাণ আছে। তবে যে কোনো বালা-মসিবতে আক্রান্ত হয়ে উপায়ান্তর না দেখে।

উপরিউক্ত বিস্তারিত ঘটনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, রোজা অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যা মিসওয়াক করা মাকরূহ ছাড়াই জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিলের জবাব হলো– خَلُوْف তথা মুখের গন্ধ এটা হলো ইবাদতের চিহ্ন। আর ইবাদতের মধ্যে গোপনীয়তাই অধিক শ্রেয়, যাতে লোক দেখানো কোনো ভাব না থাকে। আর গোপনীয়তা তখনই হবে যখন মিসওয়াক করে তার গন্ধকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে শহীদের খুন হলো জুলুমের চিহ্ন। যে তার প্রতিপক্ষ থেকে ইনসাফের আশাবাদী। এজন্য তার অবশিষ্ট থাকা জরুরি। এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনে হুমাম ﷺ খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, খুলূফ তথা গন্ধ দ্বারা ঐ ভাপ বা উষ্ণ বায়ু উদ্দেশ্য যা পাকস্থলীর [পেটের] খালি হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। মিসওয়াক করার দ্বারা তা দূরীভূত করা যায় না। মিসওয়াক দ্বারা দাঁতের ময়লা ও হরিদ্রাবর্ণ দূর করা হয়। সুতরাং সন্ধ্যাবেলা যদি মিসওয়াক করা হয় তাহলে তার দ্বারা খুলূফ তথা পাকস্থলীর উষ্ণ বায়ু যা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় তা দূর হয় না; বরং দাঁতের হরিদ্রাবর্ণ যা উদ্দেশ্য নয়; তা দূর হয়ে যায়।

فَصْلٌ : وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا فِيْ رَمَضَانَ فَخَافَ اِنْ صَامَ اِزْدَادَ مَرَضُهُ اَفْطَرَ وَقَضٰى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُفْطِرُ هُوَ يَعْتَبِرُ خَوْفَ الْهَلَاكِ اَوْ فَوَاتَ الْعُضْوِ كَمَا يَعْتَبِرُ فِي التَّيَمُّمِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ زِيَادَةَ الْمَرَضِ وَامْتِدَادَهُ قَدْ تُفْضِيْ اِلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ .

অনুচ্ছেদ : রোজা ভঙ্গ

অনুবাদ : যদি কেউ রমজানে অসুস্থ থাকে এবং এ আশঙ্কা করে যে, রোজা রাখলে তার অসুস্থতা বেড়ে যাবে, তাহলে রোজা রাখবে না এবং কাজা করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রোজা ভাঙ্গবে না। তিনি তায়াম্মুমের মতো এখানেও প্রাণ নাশের কিংবা অঙ্গহানির আশঙ্কার কথা বিবেচনা করেন। আমরা বলি, রোগ বৃদ্ধি ও রোগের দীর্ঘায়িত হওয়া কখনো প্রাণ নাশের দিকে উপনীত করে, সুতরাং তা থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই পর্যন্ত রোজার মাসআলা-মাসায়িলের আলোচনা ছিল। এ অনুচ্ছেদে ঐ সকল ওজর বর্ণনা করা হবে, যার কারণে রোজা না রাখা জায়েজ। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, যে সকল ওজর দ্বারা রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ সেগুলো সাতটি। যথা– ১. রোগ-ব্যাধি, ২. সফর/পর্যটন, ৩. গর্ভধারণ, যখন স্ত্রীলোক বা গর্ভের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, ৪. দুগ্ধ পান করানো, যখন রোজা শিশুর ক্ষতির কারণ হয়, ৫. বার্ধক্য যখন সে রোজা রাখার উপর সামর্থ্যবান না হয়। ৬. কঠিন পিপাসা, ৭. অধিক ক্ষুধা যখন রোজার কারণে প্রাণনাশ বা আকলের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

সর্বপ্রথম ওজর হলো অসুস্থতা। কিন্তু রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি বিধান নিরেট অসুস্থতার সাথে যুক্ত নয়; বরং রোগ-ব্যাধি দুই প্রকার। ১. যা রোজার কারণে বৃদ্ধি পায়। ২. যা রোজার কারণে হাসান বা সহজ হয়। সুতরাং যে অসুস্থতার মধ্যে রোজার কারণে সামান্য নিরাময়তা আসে অর্থাৎ রোজা এ রোগের উপকারী, তবে এ ধরনের রোগের সাথে রোজা ভঙ্গ করার সম্পর্ক নেই। আর যে রোগ রোজার কারণে বৃদ্ধি পায় বা দীর্ঘায়িত হয় এ ধরনের অসুস্থতার সাথে রোজা ভঙ্গ করার সম্পর্ক আছে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) তা-ই বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে অসুস্থ হয় এবং তার এই আশঙ্কা হয় যে, যদি রোজা রাখে তাহলে রোগ বৃদ্ধি পাবে, তবে এই সুরতে আমাদের মতে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ আছে। সুস্থ হওয়ার পর তার কাজা করে নেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ ধরনের রোগী রোজা ভঙ্গ করবে না; বরং তার রোজা রাখা জরুরি। হ্যাঁ যদি রোজা রাখার কারণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে বা কারো অঙ্গহানির আশঙ্কা হয়; তবে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। যেমনিভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঐ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমের অবকাশ আছে, যার পানি ব্যবহার করলে জীবননাশ বা অঙ্গহানির আশঙ্কা আছে। যদি আশঙ্কা না থাকে তবে তার মতে তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়। আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ উক্ত আয়াত দ্বারা সব ধরনের অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ বুঝা যায়। কিন্তু যেহেতু এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, রোজা ভঙ্গ করার প্রবর্তন রাখা হয়েছে কষ্ট লাঘব করার জন্য। আর কষ্ট তখন হবে যখন রোগ বৃদ্ধি পাবে, যা আরোগ্য লাভে বিলম্বিত হবে। এ জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি শুধু ঐ সুরতগুলোতেই হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব এই যে, কখনো কখনো রোগ বৃদ্ধি বা আরোগ্য লাভের বিলম্বতা মানুষের হালাক হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এজন্য রোগ বৃদ্ধি বা রোগের আরোগ্য লাভে বিলম্ব হওয়া থেকেও, সর্তক থাকা একান্ত জরুরি।

وَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ اَفْضَلُ وَاِنْ اَفْطَرَ جَازَ لِاَنَّ السَّفَرَ لَا يَعْرِىْ عَنِ الْمَشَقَّةِ فَجُعِلَ نَفْسُهُ عُذْرًا بِخِلَافِ الْمَرَضِ فَاِنَّهُ قَدْ يَخِفُّ بِالصَّوْمِ فَشُرِطَ كَوْنُهُ مُفْضِيًا اِلَى الْحَرَجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْفِطْرُ اَفْضَلُ لِقَوْلِهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ وَلَنَا اَنَّ رَمَضَانَ اَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ فَكَانَ الْاَدَاءُ فِيْهِ اَوْلٰى وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى حَالَةِ الْجُهْدِ .

অনুবাদ : মুসাফিরের যদি রোজার কারণে কষ্ট না হয় তাহলে তার রোজা রাখাই উত্তম। তবে রোজা না রাখাও জায়েজ। কেননা, সফর কষ্টশূন্য হয় না। সুতরাং মূল সফরকেই ওজররূপে গণ্য করা হয়েছে। অসুস্থতার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা কোনো কোনো অসুস্থতা রোজা দ্বারা উপশম হয়। সুতরাং রোজার ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রোজা না রাখাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ "সফরে রোজা রাখা নেকীতে গণ্য নয়।" [বুখারী] আমাদের দলিল হলো, রমজান দুই সময়ের মধ্যে অধিকতর উত্তম সময়। সুতরাং তাতে আদায় করাই উত্তম হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি কষ্টের অবস্থার উপর প্রযোজ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুসাফির যদি রোজা রাখতে কষ্ট অনুভব না করে তবে তার রোজা রাখা উত্তম। আর যদি রোজা ভঙ্গ করে তাও জায়েজ। দলিল হলো, মূল সফরটাই কষ্টের কারণ। এজন্য নিরেট সফরকেই ওজর ধরা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, সাধারণত মুসাফিরের জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। রোজা রাখতে তার কষ্ট হোক বা না হোক।

পক্ষান্তরে অসুস্থতার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা রোজা কোনো কোনো অসুস্থতার জন্য উপকারী। যেমন- পেটের ব্যাধির জন্যে রোজা উপকারী। সুতরাং এই ধরনের ব্যাধির মধ্যে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ হবে না; বরং এই শর্তারোপ করা হবে যে, রোজা যদি কষ্টের কারণ হয় তবে রোজা ভঙ্গ করার অবকাশ আছে। আর যদি রোজা কষ্টের কারণ না হয়; বরং রোজা ঐ ব্যাধির জন্য উপকারী হয়, তবে ঐ ধরনের রোগের জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মুসাফিরের জন্য সম্পূর্ণরূপে রোজা না রাখা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَ رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ .

অর্থ-রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। তিনি ভিড় দেখলেন, আরো এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার উপর ছায়া দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা কি? লোকেরা বলল, এই লোকটি রোজাদার। তিনি বললেন, সফরে রোজা রাখাতে কোনো নেকী নেই। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে-

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ .

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর রমজান মাসে সফর করছিলেন। যখন তিনি কুরাউলগামীমে পৌছলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, লোকেরাও রোজা রেখেছে। অতঃপর তিনি এক পেয়ালা পানি চেয়ে পান করে ফেললেন। তারপর বললেন, কিছু লোক রোজা রেখেছে, [আরো] বললেন এরা নাফরমান।

উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো দ্বারা বুঝা গেল মুসাফিরের জন্য রমজান মাসে রোজা না রাখা উত্তম। কেননা যদি রোজা রাখা উত্তম হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা রাখার কারণে তাদেরকে নাফরমান কেন বললেন এবং এ কথা কেন বললেন যে, সফরে রোজা রাখাতে কোনো নেকী নেই।

আমাদের দলিল হলো, মুসাফিরের জন্য রমজানের রোজার দুটো সময় রয়েছে। ১. খোদ রমজান মাসে, যেমন আয়াতে কারীমা– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -এর ব্যাপকতা দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসাফির ও মুকীম উভয়ে রমজান মাসে রোজা রাখবে। ২. রমজানের বাহিরের সময়। যেমনটি আয়াতে কারীমা– (أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) -এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ হলো রমজানের খলিফা [স্থলাভিষিক্ত] আর খলিফা আসলের বরাবর হয় না। এজন্য গাইরে রমজান রমজানের বরাবর হবে না; বরং রমজানের সময়ই উত্তম হবে। কোনো ইবাদত উত্তম সময়ে আদায় করাও উত্তম। এজন্য রমজান মাসে মুসাফিরের জন্য রোজা রাখা রোজা ভঙ্গ করার চেয়ে উত্তম। এ কথাটির সমর্থন কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারাও পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ "রমজানে রোজা রাখা না রাখার চেয়ে উত্তম।" এটি তখনকার হুকুম যখন রমজানে ফিদিয়া দিয়ে রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি ছিল। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত হাদীসগুলোর জবাব হলো, এরূপ ঐ হাদীসগুলো কষ্টের অবস্থার উপর প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি সফরে রোজা রাখা সাংঘাতিক বোঝা মনে হয় এবং পেরেশানির কারণ হয়, তবে এ অবস্থায় রোজা রাখা বাস্তবিক পক্ষেই কোনো নেকীর কাজ নয় এবং এ অবস্থায় রোজা রাখা নাফরমানি ও অপরাধের কাজ।

ফায়দা : হিদায়া গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাজহাব বর্ণনা করতে গিয়ে ভ্রম হয়ে গিছে। কেননা শাফেয়ীগণের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি মুসাফিরের রোজা রাখতে কষ্ট মনে না হয় তবে রোজা রাখাই উত্তম। রোজা ভঙ্গ করা উত্তম নয়। এটাই ইমাম মালিক (র.) এবং আমাদের মাজহাব। কিন্তু যেহেতু হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, মুসাফিরের জন্য সম্পূর্ণভাবে রোজা না রাখা উত্তম। এজন্য তাঁর উক্ত বক্তব্যকে সামনে রেখে শাফেয়ীদের দলিলাদি বর্ণনা করেছি।

وَإِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ وَالْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلٰى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُدْرِكَا عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَلَوْ صَحَّ الْمَرِيْضُ وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ لِوُجُوْدِ الْإِدْرَاكِ بِهٰذَا الْمِقْدَارِ وَفَائِدَتُهُ وُجُوْبُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِطْعَامِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ خِلَافًا فِيْهِ بَيْنَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي النَّذْرِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ فَيَظْهَرُ الْوُجُوْبُ فِيْ حَقِّ الْخَلَفِ وَفِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ السَّبَبُ إِدْرَاكُ الْعِدَّةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ ـ

অনুবাদ : অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির ব্যক্তি যদি তাদের সেই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তাদের উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [অন্য দিনসমূহের পর্যাপ্ত সংখ্যা] সে পায়নি। আর অসুস্থ ব্যক্তি যদি সুস্থতা লাভ করে এবং মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকীম হয়ে যায়, তারপর তারা মারা যায়, তাহলে সুস্থ হওয়ার এবং মুকীম হওয়ার দিনের পরিমাণ কাজা তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা যে পরিমাণ সময় সে পেয়েছে, কাজা ওয়াজিব হওয়ার ফল এই দাঁড়ায় যে, [কাজা আদায় না করে থাকলে রোজার ফলে] ফিদিয়া দানের অসিয়ত করা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম ত্বাহাভী (র.) এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যে মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়; বরং মতপার্থক্য হলো মান্নতের ক্ষেত্রে [উদাহরণস্বরূপ অসুস্থ ব্যক্তি যদি মান্নত করে যে, আমি রোজা রাখব, এরপর সুস্থ হয়ে মারা যায়। সেক্ষেত্রে শায়খাইনের বক্তব্য হলো পুরো এক মাসের রোজা তার উপর ওয়াজিব হবে। সুতরাং এক মাসের রোজার পরিমাণ ফিদিয়া দানের অসিয়ত করা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যে কয়দিন সুস্থ ছিল, সে কয়দিনের রোজা ওয়াজিব হবে]। শায়খাইনের মতে পার্থক্যের কারণ হলো, নজর হলো রোজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। সুতরাং [রোজার] স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় [রোজা ওয়াজিব হওয়ার] কারণ হলো নির্ধারিত সময় পাওয়া। সুতরাং যে পরিমাণ সময় সে পাবে, সে পরিমাণ সময়ের সাথেই ওয়াজিব হওয়ার বিধান সীমিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় মারা যায় এবং মুসাফির সফরকালে মারা যায় তবে তাদের উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ অসুস্থ ও সফরের কারণে রমজানের যে রোজা কাজা হয়েছিল তার জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হবে না এবং তার কোনো ফিদিয়াও ওয়াজিব হবে না। কেননা তাদের উপর কাজা তখন ওয়াজিব হবে, যখন অসুস্থ ও সফরের পর তারা এই পরিমাণ সময় পায় যার মধ্যে রোজা রাখতে সক্ষম। অথচ তারা কাজা আদায়ের কোনো সময়ই পায়নি। এজন্য তাদের উপর কাজা ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ صَحَّ الْمَرِيْضُ وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ الخ : যদি অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়, মুসাফির মুকীম হয়ে যায় তারপর তারা মারা যায় তাহলে তাদের উপর কাজা ওয়াজিব হবে। সুতরাং যদি সুস্থ হওয়ার পর এবং মুকীম হওয়ার পর এ পরিমাণ দিন জীবিত থাকে যে পরিমাণ দিনের রোজা কাজা হয়েছিল, তবে ছুটে যাওয়া সবগুলো রোজার কাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি কিছুদিন জীবিত থাকে তাহলে যে কয়দিন সুস্থ ছিল এবং যে কয়দিন মুকীম ছিল সে পরিমাণ রোজার কাজা ওয়াজিব হবে।

যেমন– অসুস্থতা ও সফরের কারণে বিশ রোজা ছুটে গিয়েছিল। এরপর সুস্থ হওয়ার পর বা মুকীম হওয়ার পর দশদিন জীবিত থেকে অন্য কোনো কারণে মারা গেছে। তবে তার উপর দশ রোজার কাজা করা ওয়াজিব হবে। কারণ, অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "যে কয়দিন অসুস্থতা বা সফরের কারণে রোজা রাখতে পারেনি, সে কয় দিনেরই কাজা ওয়াজিব হবে।" আর যতদিনের কাজা ওয়াজিব হবে, ততদিনই জীবিত থাকা জরুরি। কিন্তু যখন এ ব্যক্তি যার বিশ দিনের রোজা অসুস্থতা বা সফরের কারণে ছুটে গিয়েছিল, সুস্থতা বা মুকীম হওয়ার পর দশ দিনই জীবিত ছিল, তখন দশ দিনের রোজারই কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা এর অধিক কাজার সময় সে পায়নি। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো সুস্থ হওয়ার পর বা মুকীম হওয়ার পর দশ দিন তো নিঃসন্দেহে জীবিত ছিল। কিন্তু তখন কাজা না করে মারা গেল। এখন কাজা ওয়াজিব করার দ্বারা কি লাভ? এর জবাব এই যে, কাজা ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার এই অসিয়ত করে যেতে হবে যে, আমার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা রোজার যে পরিমাণ ফিদিয়া ওয়াজিব হয়েছে তা আদায় করে দেবে। সুতরাং যদি সে অসিয়ত করে যায় আর ওয়ারিশরা তা আদায় করে দেয় তবে ইন্‌শাআল্লাহ আল্লাহর নিকট তার পাকড়াও হবে না। আর অসিয়ত না করার ক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে এবং আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবে। মোদ্দা কথা, প্রকাশ্য মাজহাব অনুযায়ী সুস্থ ও ইকামতের পরিমাণ ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়া ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইমাম ত্বাহাভী (র.) তাদের মধ্যকার ইখতিলাফকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যদি রোজা ভঙ্গ করার ওজর তথা অসুস্থতা ও সফর দূর হয়ে যায় এবং ছুটে যাওয়া কিছু রোজার কাজা আদায় করতে সক্ষম হয় আর কিছুর সক্ষম না হয়। যেমন– ওজর দূর হয়ে যাওয়ার পর দশদিন জীবিত ছিল; অথচ ছুটে যাওয়া রোজার সংখ্যা হলো বিশ। সুতরাং যদি সে সামর্থ্যের পরিমাণ অর্থাৎ দশ রোজার কাজা আদায় করে এবং এতে কোনো অলসতা প্রদর্শন না করে অতঃপর মারা যায় তবে অবশিষ্ট দশ রোজার কাজা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা সে অবশিষ্ট দশ রোজার কাজা আদায়ের সময় পায়নি। আর যেহেতু সময় পায়নি তাই তার কাজাও ওয়াজিব হবে না। আর যদি সামর্থ্যের পরিমাণ অর্থাৎ যে দশদিন জীবিত ছিল সে দিনগুলোতেও রোজা না রাখে এবং এই অবস্থায়ই মারা যায়, তবে শায়খাইনের মতে তার উপর পূর্ণ বিশ রোজার কাজা করাই ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তার বিশ রোজার ফিদিয়া আদায়ের অসিয়ত করা ওয়াজিব হবে। আর অবশিষ্ট দশ দিন যা সে পায়নি, সেগুলোর ফিদিয়া আদায়ের অসিয়ত করা ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম ত্বাহাভী (র.)-এর উক্ত মতবিরোধ বর্ণনা করা ঠিক হয়নি; বরং উক্ত মাসআলায় শায়খাইনের মতামতও তা-ই যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) গ্রহণ করেছেন। তবে মান্নতের মাসআলায় শায়খাইন ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি আল্লাহর জন্য এক মাস রোজা রাখার মান্নত করছি। অতঃপর সে সুস্থ হওয়ার পূর্বেই মারা যায় তাহলে তার উপর একেবারেই কাজা ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে একদিনও সুস্থ থাকে অতঃপর হঠাৎ মারা যায়; তবে শায়খাইনের মতে পূর্ণ একমাস রোজার ফিদইয়া আদায়ের অসিয়ত করা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার উপর যতদিন সে সুস্থ ছিল ততদিনের অসিয়ত করাই ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বান্দার ওয়াজিব করাকে আল্লাহর ওয়াজিব করার উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে রমজানের কাজা রোজার মধ্যে যে কয়দিন সুস্থ ছিল সে পরিমাণ কাজা আদায় করা জরুরি এবং কাজা না করার ক্ষেত্রে ফিদিয়া আদায়ের অসিয়ত করা জরুরি, তেমনিভাবে মান্নতের রোজায়ও সুস্থ পরিমাণ দিনের ওয়াজিব হবে। আর রোজা না রাখার ক্ষেত্রে ফিদিয়া আদায়ের অসিয়ত করা জরুরি হবে। শায়খাইনের মতে রোজার কাজা ও মান্নতের রোজার মধ্যকার পার্থক্যের কারণ এই যে, মান্নতের রোজা ওয়াজিব হওয়ার সবব বা কারণ হলো মান্নত। আর এখানে মান্নত বিদ্যমান, তবে প্রতিবন্ধক তথা অসুস্থতা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং যেহেতু সবব বিদ্যমান আছে আর প্রতিবন্ধক দূর হয়ে গেছে সেহেতু অবশ্যই রোজার অপরিহার্যতা প্রকাশ পাবে। আর যখন ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে এবং আদায় না পাওয়া যায় তবে তার খলীফা তথা ফিদিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ, পুরা একমাস রোজার ফিদিয়া আদায়ের অসিয়ত করা জরুরি হবে। অপর দিকে রমজানের রোজার কাজার ক্ষেত্রে কাজার سَبَبُ হলো অন্য দিন পাওয়া যাওয়া। আর যেহেতু সে অন্য দিন পূর্ণভাবে পায়নি; বরং কিছুদিন পেয়েছে, তবে সে যে পরিমাণ দিন পেয়েছে, সে পরিমাণ রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। আর কাজা না করার সুরতে এ দিনগুলোর ফিদিয়া আদায়ের অসিয়ত করাই জরুরি হবে। অবশিষ্টগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে না।

وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ لٰكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ التَّتَابُعُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ ـ

অনুবাদ : রমজানের কাজা রোজা ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্নভাবে রাখবে অথবা ইচ্ছা করলে লাগাতার রাখবে। কেননা নস (نَصّ) হলো শর্তমুক্ত (مُطْلَقْ)। তবে ওয়াজিব দ্রুত আদায়ের লক্ষ্যে লাগাতার রাখাই মোস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'ইনায়া' গ্রন্থকার বলেন, কিতাবুল্লাহর মধ্যে আট প্রকার রোজার উল্লেখ রয়েছে।-[১] রমজান মাসের রোজা। যেমন ইরশাদ হয়েছে- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "তোমাদের মধ্যে যে কেউ [রমজানের] মাস পাবে তাতে যেন সে অবশ্যই রোজা রাখে।"

[২] হত্যার কাফফারার রোজা। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ ـ

অর্থ-যদি সে তোমাদের চুক্তিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে উক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গুনাহ মাফ করানোর জন্য উপর্যুপরি দুই মাস রোজা রাখবে। আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ চেয়ে নেওয়ার জন্য।- [৪ : নিসা আয়াত, ৯৩]

[৩] জিহারের কাফফারার রোজা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ـ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ـ

অর্থ- যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করে দেবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। আর যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধিকক্রমে দুই মাস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে।- [৫৮ : মুজাদালা, ৩-৪]

[৪] শপথের কাফফারার রোজা। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ـ

অর্থ- কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে। মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে। অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোজা রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর।- [৫ : মায়িদা, ৮৯]

[৫] রমজানের কাজা রোজা। যেমন ইরশাদ হয়েছে- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে বা সফরে থাকবে তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে দিতে হবে।-[২ : বাকারা, ১৮৪]

[৬] হজ্জে তামাত্তু' ও কিরানের রোজা। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ـ

অর্থ-তোমাদের মধ্যে যারা হজ ও ওমরাহ একত্রে একই সাথে পালন করতে চায়, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানি করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুত যারা কুরবানির পশু পাবে না তারা হজের দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি। আর সাতটি রোজা রাখবে ফিরে যাওয়ার পর। এভাবে দশটি রোজা পূর্ণ হয়ে যাবে।"- [২ : বাকারা, ১৯৭]

[৭] মাথা মুণ্ডানোর কাফফারার রোজা। যেমন ইরশাদ হয়েছে- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়বে, কিংবা মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে কিংবা খয়রাত দেবে বা কুরবানি করবে।-[২ : বাকারা, ১৯৭]

[৮] শিকারের ক্ষতিপূরণের রোজা। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهٗ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ .

অর্থ-হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে। বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌঁছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজিব কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোজা রাখতে হবে, যাতে সে স্বীয় সৎকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে।

উপরিউক্ত বর্ণনায় প্রথম চারটিতে লাগাতার আদায় করার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর পরের চারটিতে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করবে বা লাগাতার আদায় করবে। রমজানের রোজার ক্ষেত্রে লাগাতার ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তা ছাড়া মাশায়েখগণ একটি নীতি নির্ধারণ করেছেন। নীতিটি হলো এই, যে সকল স্থানে দাস আজাদ (عِتْقُ الرَّقَبَةِ)-এর বর্ণনা রয়েছে সে সকল স্থানে রোজার মধ্যে লাগাতার (تَتَابُعْ) শর্ত। আর যে সকল স্থানে (عِتْقُ الرَّقَبَةِ)-এর বর্ণনা নেই, সে সকল স্থানে লাগাতার (تَتَابُعْ) শর্ত নয়। উক্ত নীতি অনুযায়ী কুরআনে কারীমের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে রমজানের রোজার কাজার আলোচনা রয়েছে, সেখানে দাসমুক্তি (عِتْقُ الرَّقَبَةِ)-এর বর্ণনা নেই। অর্থাৎ এমন নয় যে, রমজানের কাজার স্থলে দাস মুক্ত করা যথেষ্ট হবে। সুতরাং রমজানের রোজার কাজার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বা লাগাতার আদায় ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয় দলিল এই যে, নস তথা فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ মুতলক বা শর্তহীন, সুতরাং নস শর্তহীন হওয়ার কারণে লাগাতার বা অ-লাগাতার [থেমে থেমে] কোনোটিই শর্ত নয়; বরং ইচ্ছা লাগাতার আদায় করুক বা অ-লাগাতার আদায় করুক।

এখানে দুটি প্রশ্ন উথাপিত হয়। একটি প্রশ্ন হলো, কাজা হচ্ছে আদা-এর স্থলাভিষিক্ত। আর রমজানের রোজা আদায়ের ক্ষেত্রে লাগাতার আদায় করা ওয়াজিব, তাই তার স্থলাভিষিক্ত তথা রমজানের রোজা কাজা আদায়ের মধ্যেও লাগাতার আদায় করা ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাত হলো- فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ সুতরাং যেমনিভাবে ইয়ামীনের কাফফারার মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর- مُتَتَابِعَاتٌ -এর কেরাত গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনিভাবে রমজানের রোজার কাজার মধ্যেও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর- مُتَتَابِعَاتٌ -এর কেরাতকে গ্রহণ করা উচিত। প্রথম প্রশ্নের জবাব এই যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তি রমজানের কাজা রোজাকে বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন তিনি বললেন-

ذٰلِكَ اِلَيْكَ اَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلٰى اَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاءُ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ اَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يَعْفُوَ وَ يَغْفِرَ .

অর্থ-তোমার এর স্বাধীনতা রয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা বলতো, যদি তোমাদের মধ্য থেকে যদি কারো ঋণ থাকে এবং এক দিরহাম বা দুই দিরহাম করে আদায় করে তবে এতে কি তার আদায় হবে না? প্রশ্নকারী বলল, নিশ্চয়ই আদায় হয়ে যাবে। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ এর চেয়ে আরো অধিক উপযুক্ত যে, তাকে মাফ করে দেবেন এবং ক্ষমা করে দেবেন। অর্থাৎ বান্দা যখন তার ঋণ বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করতে পারে, তখন আল্লাহর হক বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করলে কেন আদায় হবে না? লক্ষণীয় যে, যদি ব্যাপারটি তা-ই হতো যা আপনারা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ রমজানের কাজার জন্য লাগাতার আদায় করা শর্ত হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নকারীকে এভাবে জবাব দিতেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাতটি এমন মাশহুর নয়, যেমনটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত মাশহুর। তাই হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাতটি হলো খবরে ওয়াহিদের পর্যায়ে। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর زِيَادَتِيْ [বৃদ্ধি] করা যায় না। এজন্য হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাত مُتَتَابِعَاتٌ দ্বারা কিতাবুল্লাহ তথা فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ-এর উপর বৃদ্ধি বা হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, রমজানের কাজার মধ্যে যদিও লাগাতার আদায়ের শর্ত নেই, তবে মোস্তাহাব অবশ্যই। তাহলে দ্রুত ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ أٰخَرُ صَامَ الثَّانِيَ لِأَنَّهُ فِيْ وَقْتِهِ وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ وُجُوْبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاخِيْ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ـ

অনুবাদ : আর যদি তা বিলম্বিত করে এমনকি অন্য রমজান এসে পড়ে তাহলে দ্বিতীয় রমজানের রোজা রাখবে। কেননা তা দ্বিতীয় রমজানেরই সময়। আর প্রথম রোজার কাজা তার পরে করবে। কেননা রমজান বহির্ভূত সময়ই হলো কাজার সময়, তবে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা বিলম্বের ভিত্তিতেই কাজা ওয়াজিব হয়। এ জন্যই তো সে [কাজা আদায় না করে] নফল রোজা রাখতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যার উপর রমজানের কাজা ওয়াজিব সে যদি কাজাকে বিলম্ব করে এমনকি অন্য রমজান এসে পড়ে তাহলে দ্বিতীয় রমজানের রোজা রাখবে। কারণ, এই রোজাটি তার সময়ের মধ্যেই রয়েছে। আর দ্বিতীয় রমজানের রোজা তার উপর নির্ধারিত আছে। এজন্য এই সময়ে অন্য কোনো রোজার অবকাশ নেই। পিছনের রমজানের রোজার কাজা এই দ্বিতীয় রমজানের রোজার পর আদায় করবে। কারণ, এটিও কাজার সময়। তবে এই বিলম্বের কারণে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী, মালিক এবং আহমদ (র.)-এর মতে, যদি বিনা ওজরে বিলম্ব করে তবে তার কাজা করতে হবে এবং প্রত্যেক রোজার বিনিময়ে ফিদিয়াও আদায় করবে। তাদের দলিল এই যে, কাজার সময়, দু রমজানের মধ্যকার সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রমজানে আগত ঋতুস্রাবের দিনগুলোর কাজা তিনি শাবান পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, কাজার সর্বশেষ জায়েজ ওয়াক্ত হলো শাবান পর্যন্ত। অর্থাৎ রমজানের ছুটে যাওয়া রোজাগুলোর কাজা সর্বাধিক শাবান পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারবে। কিন্তু যখন শাবান পর্যন্ত কাজা করল না; বরং অন্য রমজান এসে গেল, তবে যেন সে কাজকে তার সময় থেকে বিলম্ব করে দিয়েছে। অর্থাৎ কাজাকে তার সময় থেকে বিলম্ব করার কারণে ফিদিয়া আদায় করতে হবে।

আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলা 'কাজা'-এর নির্দেশ শর্তহীনভাবে দিয়েছেন। আর শর্তহীন বিষয় দ্বারা কোনো জিনিস তাৎক্ষণিক হয় না; বরং বিলম্বিতভাবে হয়। এ কারণে যদি কেউ রমজান চলে যাওয়ার পর রমজানের রোজা কাজা করার পূর্বে নফল রোজা রাখে তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। যদি রমজানের কাজা তাৎক্ষণিক (عَلَى الْفَوْرِ) ওয়াজিব হতো, তবে রমজানের রোজা কাজা করা ব্যতীত নফল রোজা আদায় করা জায়েজ হতো না। সুতরাং রমজানের রোজা যেহেতু বিলম্বিতভাবে (عَلَى التَّرَاخِيْ) ওয়াজিব হয় তাই জীবনের যে কোনো সময়ে মৃত্যুর পূর্বে যখন ইচ্ছা কাজা করে নেবে। পুরো জীবনই কাজা এর সময়।

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ إِفْطَارٌ بِعُذْرٍ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِيمَا إِذَا خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالشَّيْخِ الْفَانِي وَلَنَا أَنَّ الْفِدْيَةَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فِي الشَّيْخِ الْفَانِي وَالْفِطْرَ بِسَبَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالْوَلَدُ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ أَصْلًا ـ

অনুবাদ : গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী যদি নিজেদের কিংবা তাদের শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা করে তাহলে রোজা পরিহার করতে পারে এবং পরে কাজা করবে। এ হুকুমের উদ্দেশ্য হলো সমস্যা দূরীভূত করা। আর তাদের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এ রোজা ভঙ্গ হলো ওজরের কারণে। তদ্রূপ তাদের উপর 'ফিদিইয়া" ওয়াজিব হবে না। তবে [ফিদিয়ার ব্যাপারে] ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন, যখন শিশুর ব্যাপারে আশঙ্কা হয়। তিনি শায়খে ফানী [থুরথুরে বুড়ো] বা অতি বৃদ্ধার উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলিল হলো শায়খে ফানীর ক্ষেত্রে ফিদিয়া ওয়াজিব হয়েছে কিয়াসের বিপরীতে (خِلَافُ الْقِيَاسِ)। আর শিশুর আশঙ্কার কারণে রোজা ভঙ্গ করা তার সমপর্যায়ের নয়। কেননা শায়খে ফানী [থুরথুরে বুড়ো] তার উপর রোজা ওয়াজিব হওয়ার পর অপারগ হয়েছে। পক্ষান্তরে শিশুর উপর তো মূলত ওয়াজিবই হয়নি; বরং তার মায়ের উপর ওয়াজিব, তাই সে পরবর্তীতে কাজা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারিণী নারী যদি রোজা রাখার কারণে তাদের নিজেদের প্রাণের আশঙ্কা বা তাদের শিশুদের ক্ষতির আশঙ্কা হয়। অর্থাৎ গর্ভবতীর গর্ভের শিশুর আশঙ্কা এবং স্তন্যদানকারিণীর দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা হয়; তবে এতদুভয়ে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে। পরে রোজাগুলোর কাজা করে নেবে। তবে তাদের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। সমস্যা দূরীভূত করার মানসে রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর কাফফারা এজন্য ওয়াজিব নয় যে, তাদের রোজা ভঙ্গ করা ছিল ওজরের কারণে। আর ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করা কোনো অপরাধ বা অন্যায় নয়। যেহেতু অন্যায় নয় সেহেতু তার কারণে কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। আমাদের মতে তাদের উপর ফিদিয়াও ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী যদি তাদের শিশুর ক্ষতির আশঙ্কায় রোজা ভঙ্গ করে তাহলে তাদের উপর কাজার সাথে সাথে ফিদিয়াও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এই মাসআলাটিকে শায়খে ফানী বা অতি বৃদ্ধের উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে শায়খে ফানীর উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হয় তেমনিভাবে তাদের উপরও ফিদিয়া ওয়াজিব হবে।

'ইনায়া' গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দলিল বর্ণনা করেছেন যে, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীর রোজা ভঙ্গ করার দ্বারা তাদের নিজেদের ফায়িদা আছে এবং তাদের শিশুদেরও ফায়িদা আছে। সুতরাং তাদের নিজেদের ফায়িদার দিকে লক্ষ্য করে তাদের উপর কাজা ওয়াজিব করা হয়েছে। আর তাদের শিশুদের ফায়িদার দিকে লক্ষ্য করে ফিদিয়া ওয়াজিব করা হয়েছে।

আমাদর দলিল এই যে, শায়খে ফানীর ক্ষেত্রে ফিদিয়া নস দ্বারা কিয়াসের বিপরীতে সাব্যস্ত হয়েছে। এজন্য এর উপর অন্য কোনো সুরতকে কিয়াস করা ঠিক হবে না। আর শিশুর কারণে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীর রোজা ভঙ্গ করা শায়খে ফানীর অনুরূপ নয়। কেননা শায়খে ফানী রোজা ওয়াজিব হওয়ার পর অপারগ হয়ে গেছে। অথচ শিশুর উপর শুরু থেকেই রোজা ওয়াজিব হয়নি। সুতরাং যেহেতু শিশুর কারণে রোজা ভঙ্গ করা শায়খে ফানীর অনুরূপ নয়, তাই শায়খে ফানীর হুকুম গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য হবে না।

وَالشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِيْ لَايَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا كَمَا يُطْعِمُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قِيْلَ مَعْنَاهُ لَا يُطِيْقُوْنَهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ يَبْطُلُ حُكْمُ الْفِدَاءِ لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلْفِيَّةِ إِسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ .

অনুবাদ : শায়খে ফানী [থুরথুরে বুড়ো], যিনি রোজা রাখতে সক্ষম নন, তিনি প্রতিদিনের পরিবর্তে রোজা না রেখে একজন মিসকিনকে খাওয়াবেন, যেমনিভাবে কাফফারার ক্ষেত্রে খাওয়াতে হয়। এ বিষয়ে দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ "যারা রোজা রাখতে সক্ষম নয়, তাদের উপর ফিদিয়া ওয়াজিব এক মিসকিনের আহার বরাবর।" কোনো কোনো তাফসীর অনুযায়ী يُطِيْقُوْنَ -এর মানে হলো لَا يُطِيْقُوْنَ অর্থাৎ সক্ষম না হওয়া। ফিদিয়া আদায় করার পর যদি রোজা রাখতে পুনরায় সক্ষম হয়, তাহলে ফিদিয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা স্থলবর্তিতার জন্য শর্ত হলো অক্ষমতা অব্যাহত থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খে ফানী [থুরথুরে বুড়ো] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ বৃদ্ধ লোক যিনি রোজা রাখতে অক্ষম। ফানী এ জন্য বলা হয় যে, সে ফানী এর নিকটবর্তী পৌঁছে গেছে বা তার শক্তি ফানী বা নিঃশেষ হয়ে গেছে। শায়খে ফানীর ব্যাপারে আমাদের মাজহাব হলো সে রোজা ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক রোজার বিনিময়ে ফিদিয়া আদায় করবে। যেমন কাফফারার মধ্যে ফিদিয়া দেওয়া হয়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও অভিমত।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল এই যে, রমজান মাসে মৌলিকভাবে রোজা ছিল, কিন্তু শায়খে ফানীর উপর রোজা ওয়াজিব নয়। যেহেতু রোজা ওয়াজিব নয়, তাই তার স্থলবর্তী অর্থাৎ ফিদিয়াও ওয়াজিব হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, রমজানের রোজা ওয়াজিব হওয়ার সবব বা কারণ হলো মাসের উপস্থিতি। আর মাসের উপস্থিতি যেমনিভাবে রোজার উপর সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে ঠিক তেমনি শায়খে ফানীর ক্ষেত্রেও পাওয়া গেছে। কিন্তু বার্ধক্যজনিত ওজরের কারণে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করাকে বৈধ করা হয়েছে। আর ওজরটিও এমন যা দূরীভূত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যদি ওজর দূর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকতো তবে কাজা ওয়াজিব করে দেওয়া হতো। যেমন– অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের উপর কাজা ওয়াজিব। সুতরাং শায়খে ফানী যেহেতু রোজা রাখতে অক্ষম। আর ওজর দূর না হওয়ার কারণে কাজাও ওয়াজিব করা যাচ্ছে না। তাই ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। যেমন– কারো উপর রোজা ওয়াজিব ছিল। সে মারা গেল, তবে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ বিষয়ে মূল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এর অর্থ হলো لَا يُطِيْقُوْنَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম। অর্থাৎ শায়খে ফানী। তাদের উপর ফিদিয়া ওয়াজিব। যেমন আল্লাহর বাণী– يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا يَعْنِيْ اَنْ لَا تَضِلُّوْا "আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তোমরা বিপথগামী না হও।" উক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করার উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সম্পদশালী লোকেরা রোজা রাখত না; বরং রোজার ফিদিয়া আদায় করত আর দরিদ্ররা রোজা রাখত। এক কারণ ছিল ইসলামের সূচনাতে মানুষের স্বাধীনতা ছিল– হয় তারা রোজা রাখবে, না হয় ফিদিয়া দেবে। পরবর্তীতে এই স্বাধীনতা আল্লাহর বাণী فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আর রহিত হওয়া বস্তু দ্বারা দলিল দেওয়া যায় না। এর জবাব হলো, যদি এই আয়াত শায়খে ফানীর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় যা পূর্ববর্তীদের মত, তবে উক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি রোজা ও ফিদিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তবে আমরা বলব, রোজার উপর সামর্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু শায়খে ফানীর ক্ষেত্রে বলবৎ রয়েছে। যেমনটি রহিত হওয়ার পূর্বে ছিল।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, শায়খে ফানী যদি রোজা না রেখে ফিদিয়া আদায় করে অতঃপর রোজা রাখার শক্তি পায়, তবে ফিদিয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, স্থলবর্তী তথা ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো স্থায়ী অক্ষমতা। কিন্তু যখন এই ব্যক্তি রোজার উপর শক্তি পেয়ে গেল তখন আর স্থায়ী অপারগতা থাকল না তাই ফিদিয়াও ওয়াজিব হলো না। আর যখন ফিদিয়া ওয়াজিব হলো না তখন আদায়কৃত ফিদিয়াও "যেন কিছুই করা হয়নি"-এর পর্যায়ে হয়ে গেল এবং রোজার কাজা ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَاَوْصٰى بِهٖ اَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ لِاَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْاَدَاءِ فِىْ اٰخِرِ عُمْرِهٖ فَصَارَ كَالشَّيْخِ الْفَانِىْ ثُمَّ لَابُدَّ مِنَ الْاِيْصَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَعَلٰى هٰذَا الزَّكٰوةُ هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِدُيُوْنِ الْعِبَادِ اِذْ كُلُّ ذٰلِكَ حَقٌّ مَالِيٌّ يَجْرِىْ فِيْهِ النِّيَابَةُ وَلَنَا اَنَّهُ عِبَادَةٌ وَلَابُدَّ فِيْهِ مِنَ الْاِخْتِيَارِ وَذٰلِكَ فِى الْاِيْصَاءِ دُوْنَ الْوِرَاثَةِ لِاَنَّهَا جَبْرِيَّةٌ ثُمَّ هُوَ تَبَرُّعٌ اِبْتِدَاءً حَتّٰى يُعْتَبَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَالصَّلٰوةُ كَالصَّوْمِ بِاسْتِحْسَانِ الْمَشَائِخِ وَكُلُّ صَلٰوةٍ تُعْتَبَرُ بِصَوْمِ يَوْمٍ هُوَ الصَّحِيْحُ وَلَا يَصُوْمُ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَلَا يُصَلِّىْ لِقَوْلِهٖ ﷺ لَا يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلَا يُصَلِّىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রমজানের কাজা জিম্মায় থাকা অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয় আর সে ঐ বিষয়ে অসিয়ত করে তাহলে তার অলি বা তত্ত্বাবধায়ক তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিনকে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা জব দান করবে। কেননা জীবনের শেষ মুহূর্তে সে রোজা আদায় করতে অপারগ হয়ে গেছে। সুতরাং সে শায়খে ফানী [থুরথুরে বুড়ো]-এর অনুরূপ হয়ে যাবে। তবে আমাদের মতে অসিয়ত করে যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। জাকাতের ক্ষেত্রেও এই মতানৈক্য রয়েছে। এটাকে তিনি বান্দাদের ঋণের উপর কিয়াস করেন। [অর্থাৎ তার উপর মানুষের যে সকল ঋণ রয়েছে, সেগুলো যেমন অসিয়ত না করলেও আদায় করতে হয়, তেমনি এটাও অসিয়ত ছাড়াই আদায় করতে হবে।] কেননা দুটোই অর্থ সংক্রান্ত হক। যাতে স্থলবর্তিতা কার্যকর হবে। আমাদের দলিল হলো, এটা ইবাদত। আর তাতে ইচ্ছার প্রয়োগ অপরিহার্য। তা ছাড়া তা অসিয়তের মাধ্যমে প্রকাশ পায়; উত্তরাধিকারের মাধ্যমে নয়। কেননা উত্তরাধিকারিতা তো বাধ্যতামূলক ব্যাপার। আর যেহেতু এই অসিয়ত একটি নতুন দান, সুতরাং তা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকরী। মাশায়েখগণের সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী নামাজ রোজার মতোই এবং প্রতিটি নামাজ এক দিনের রোজার সমান। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অলি রোজা রাখবে না বা নামাজ আদায় করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلَا يُصَلِّىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ "কেউ কারো পক্ষ থেকে রোজা রাখবে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে নামাজ আদায় করবে না।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা : এমন একজন ব্যক্তি যার উপর রমজানের কাজা রোজা ওয়াজিব, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হলো, ফলে সে তার উত্তরাধিকারীদেরকে ফিদিয়া দেওয়ার অসিয়ত করল। এখন তার অলি বা অভিভাবক তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের রোজার জন্য একজন মিসকিনকে অর্ধ সা' গম বা এক সা' জব বা খেজুর দেবে। দলিল এই যে, যখন এই ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্তে কাজা রোজা আদায় করতে অপারগ হয়ে গেল। তখন সে থুরথুরে বুড়োর অনুরূপ হয়ে গেল। সুতরাং যেমনিভাবে শায়খে ফানীর উপর প্রত্যেক রোজার ফিদিয়া ওয়াজিব। তেমনিভাবে এর উপরও প্রত্যেক দিনের ফিদিয়া ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের মতে ওয়ারিশদের ফিদিয়া আদায় করা অবধারিত করার জন্য মৃত ব্যক্তির অসিয়ত করে যাওয়া আবশ্যক। সুতরাং মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত না করে তবে ওয়ারিশদের উপর তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া আদায় করা জরুরি নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে অসিয়ত করা জরুরি নয়; বরং উত্তরাধিকারীদের উপর তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া আদায় করা জরুরি। মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করুক বা না করুক। এটা ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত। জাকাতের ক্ষেত্রেও একই মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ যদি কারো জাকাত ওয়াজিব হয়; কিন্তু সে জাকাত আদায় করল না। মারা গেল। আমাদের মতে তার হুকুম এই যে, যদি সে মৃত্যুর পূর্বে তার ওয়ারিশদেরকে তার নিজের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করার অসিয়ত করে তবে তো ওয়ারিশদের তার পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করা জরুরি হবে। অন্যথায় নয়। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) -এর মতে ওয়ারিশদের উপর তার পক্ষ থেকে সর্বাবস্থায় জাকাত আদায় করা জরুরি; সে অসিয়ত করুক বা অসিয়ত না করুক।

দ্বিতীয় মতবিরোধ হলো, ফিদিয়া আদায় করা বা জাকাত আদায় করার অসিয়তকে অর্থের এক তৃতীয়াংশ থেকে বাস্তবায়িত করা হবে। অর্থাৎ, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ মাল থেকে আদায় করা হবে। অর্থাৎ ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফিদিয়া বা জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে যদি তার পরিত্যক্ত সম্পূর্ণ মালও দিতে হয় তবুও সম্পূর্ণ মাল দিয়ে দেবে। আর আমাদের মতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ ফিদিয়া বা জাকাত আদায় হোক বা না হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.) ফিদিয়া এবং জাকাত তথা আল্লাহর ঋণকে বান্দার ঋণের উপর কিয়াস করেছেন। কারণ, উভয়টিই অর্থ সংক্রান্ত হক এবং উভয়টির মধ্যে স্থলবর্তিতা চলে। সুতরাং যেমনিভাবে মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ অর্থ থেকে বান্দাদের ঋণ আদায় করা যায়, যদিও মৃত ব্যক্তি তার অসিয়ত না করে থাকে তেমনিভাবে তার সম্পূর্ণ মাল থেকে আল্লাহর ঋণ তথা ফিদিয়া এবং জাকাতও আদায় করা হবে। যদিও সে অসিয়ত না করে।

আমাদের দলিল এই যে, ফিদিয়া আর জাকাত একটি ইবাদত। আর যে জিনিস ইবাদত হয় তার মধ্যে বান্দার বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা অবশ্যই থাকে। এখন আমরা লক্ষ করছি, মৃত ব্যক্তি যখন ফিদিয়া বা জাকাত আদায় করার অসিয়ত করে তবে তার বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন অসিয়ত না করে মারা যায় তখন ওয়ারিশদের মালের মধ্যে তার এখতিয়ার পরিদৃষ্ট হয় না। কেননা মৃত্যুর পর আর কোনো এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকে না। মৃত্যুর পর এখতিয়ার এ কারণে বাকি থাকে না যে, উত্তরাধিকারিতা নিজেই বাধ্যতামূলক [গায়রে এখতিয়ারী] বিষয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুর সময় এ কথা বলে যে, আমি এই ওয়ারিশদেরকে নিজের ওয়ারিশ বানাব না তবুও তারা তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ হবে। আর যদি কোনো এক ওয়ারিশ অন্য ওয়ারিশদেরকে বলে, তোমরা বণ্টন করো, আমি মালের ওয়ারিশ হইনি। তবে এই ব্যক্তি এ কথা বলার দ্বারা ওয়ারিশ হওয়া থেকে বাদ পড়বে না। বুঝা গেল, উত্তরাধিকারিতা একটি বাধ্যতামূলক [গায়রে এখতিয়ারী] বিষয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে থাকে তবে ওয়ারিশদের উপর মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে তার পক্ষ হতে ফিদিয়া আদায় করা জরুরি হবে, অন্যথায় হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মৃত ব্যক্তির ফিদিয়া আদায় করা বা জাকাত আদায় করার অসিয়ত করা প্রথমত তো একটি নতুন দান। যদিও আখিরাতে ঐ বিষয়ের স্থলবর্তী হবে যা মৃত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। অর্থাৎ রোজাও জাকাতের স্থলবর্তী হবে। আর প্রথমত দান এজন্যই যে, রোজা হলো প্রাপ্তবয়স্ক (مُكَلَّفٌ)-এর কাজ। আর মৃত্যুর দরুন সব আমল বাদ পড়ে গেছে। তাই রোজা যেন দুনিয়ার ক্ষেত্রে তার জিম্মা থেকে বাদ পড়ে গেল। আর যখন দুনিয়ার ক্ষেত্রে রোজা বাদ পড়ে যাবে তখন ফিদিয়া আদায়ের অসিয়তও দান হবে। তবে আখিরাতে এই ফিদিয়া ওয়াজিব তথা রোজার বিনিময় হবে। মোদ্দা কথা, যখন অসিয়ত করা প্রথমত দান তাই তার বাস্তবায়নও অর্থের এক তৃতীয়াংশ থেকে হবে। কেননা অসিয়তের বাস্তবায়ন অর্থের এক তৃতীয়াংশ থেকেই হয়ে থাকে।

মাশায়েখগণ ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী বলেছেন যে, নামাজ হলো রোজার অনুরূপ। অর্থাৎ যেমনভাবে মৃত্যুর পর রোজার ফিদিয়া দেওয়া যায় তেমনি নামাজের ফিদিয়া দেওয়াও বৈধ হবে। তবে কিয়াসের দাবি হলো নামাজের ফিদিয়া জায়েজ না হওয়া। কেননা জীবদ্দশায় নামাজ যেমনিভাবে মাল দ্বারা আদায় হয় না, তেমনিভাবে মৃত্যুর পরও আদায় করা হবে না। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবিতে এজন্য জায়েজ বলা হয়েছে যে, দৈহিক ইবাদত হিসেবে নামাজ রোজার সদৃশ। উল্লেখ্য যে, এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ একদিনের রোজার সমান। একদিনের ফরজ নামাজের ফিদিয়া তা-ই হবে যা এক রোজার হয়ে থাকে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেউ কেউ বলেছেন, এক দিনের নামাজ এক রোজার তুল্য। তবে এ মতটি বিশুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَصُومُ عَنْهُ الخ **মাসআলা :** মৃত ব্যক্তির জিম্মায় যদি রোজা বা নামাজ থাকে আর তার অলি তার পক্ষ থেকে রোজা রাখে বা নামাজ আদায় করে তবে এই রোজা ও নামাজ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির অলির রোজা রাখা জায়েজ। তার দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস- إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ الصِّيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

অর্থ- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রোজা জিম্মায় রেখে মারা গেল তার পক্ষ থেকে তার অলি রোজা রাখবে।

আমাদের দলিল : আমাদের দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-

لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ . "কেউ কারো পক্ষ থেকে রোজা রাখবে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে নামাজ আদায় করবে না।"

দ্বিতীয় দলিল এই যে, রোজার ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নফসে আম্মারাকে পরাজিত করা। আর এই উদ্দেশ্যটি অন্যের কাজ দ্বারা হাসিল হবে না। এ কারণে অন্য কারো জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোজা রাখা জায়েজ হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ-এর ব্যাখ্যা হলো- فَعَلَ عَنْهُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الصَّوْمِ مِنَ الْإِطْعَامِ إِذَا أَوْصٰى بِذَالِكَ

অর্থ-মৃত ব্যক্তির অলি রোজার স্থলবর্তী হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ ফিদিয়া আদায় করবে তবে শর্ত হলো মৃত ব্যক্তির ফিদিয়া আদায় করার অসিয়ত করে যেতে হবে।'

وَمَنْ دَخَلَ فِىْ صَلٰوةِ التَّطَوُّعِ اَوْ فِىْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ اَفْسَدَهُ قَضَاهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رح) لَهُ اَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالْمُؤَدّٰى فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ وَلَنَا اَنَّ الْمُؤَدّٰى قُرْبَةٌ وَعَمَلٌ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ بِالْمُضِىِّ عَنِ الْاِبْطَالِ وَاِذَا وَجَبَ الْمُضِىُّ وَجَبَ الْقَضَاءُ بِتَرْكِهِ ثُمَّ عِنْدَنَا لَا يُبَاحُ الْاِفْطَارُ فِيْهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِىْ اِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا وَيُبَاحُ بِعُذْرٍ وَالضِّيَافَةُ عُذْرٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْطِرْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নফল নামাজ কিংবা নফল রোজা আরম্ভ করলো অতঃপর তা নষ্ট করে ফেলল, সে তা কাজা করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু সে স্বেচ্ছায় করেছে; সুতরাং পরবর্তী যেটুকু সে করেনি, তা তার উপর আবশ্যক হতে পারে না। আমাদের দলিল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু একটি আমল ও ইবাদত। সুতরাং অব্যাহত রাখার মাধ্যমে উক্ত আমলকে বাতিল হয়ে যাওয়া থেকে পূর্ণ করে হেফাজত করা ওয়াজিব হবে। আর যখন পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে, তখন তা তরক করার কারণে কাজা করাও ওয়াজিব হবে। অতঃপর আমাদের নিকট দুটি বর্ণনার একটির মতে বিনা ওজরে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য ওজরের কারণে জায়েজ হবে। মেহমানদারী গ্রহণ করাও একটি ওজর। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَفْطِرْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ "রোজা ভঙ্গ করো এবং তদস্থলে একদিন কাজা রোজা পালন করবে।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি নফল নামাজ বা নফল রোজা শুরু করে অতঃপর তা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার উপর তার কাজা করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, নিঃশর্তভাবে তার উপর কাজা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, যদি কোনো ওজরবশত রোজা ভঙ্গ করা হয় তবে তার কাজা জরুরি নয়। আর যদি বিনা ওজরে করা হয় তবে তার কাজা ওয়াজিব। আমাদের ও শাফেয়ীদের মধ্যকার মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, রোজা শুরু করার পর বিনা ওজরে ভঙ্গ করা আমাদের মতে জায়েজ নয়। আর শাফেয়ীদের মতে জায়েজ। সুতরাং আমাদের মতে যেহেতু ভঙ্গ করা জায়েজ নেই তাই রোজা ভঙ্গ করার কারণে অপরাধ সাব্যস্ত হবে। আর অপরাধীর উপর কাজা ওয়াজিব হয়। এজন্য নফল রোজা ভঙ্গ করার কারণে আমাদের মতে কাজা ওয়াজিব হবে। শাফেয়ীদের মতে যেহেতু অপরাধ হয় না তাই তাদের মতে কাজা করাও জরুরি নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) নফল নামাজ এবং নফল রোজা ভঙ্গ করা সত্ত্বেও কাজা ওয়াজিব না হওয়ার উপর এর দ্বারাও দলিল পেশ করেন যে, নফল রোজা বা নফল নামাজ আরম্ভ করে যখন তার কিছু অংশ আদায় করল, তখন উক্ত অংশ আদায় করার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি একটি নেক কাজ স্বেচ্ছায় আদায়কারী হলো। সুতরাং যে অংশ সে এখনো আরম্ভ করেনি তা তার উপর অবধারিত হবে না। অন্যথায় আল্লাহর বাণী– مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ -এর বিরোধিতা করা লাজিম আসবে। অর্থাৎ মুহসিনীনদের তথা সৎকর্মপরায়ণশীলদের পাকড়াও করার কোনো পথ নেই।

মোদ্দা কথা, নফলের অবশিষ্টাংশ যখন তার উপর নাজিল হলো না তখন তা ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা কাজাও ওয়াজিব হবে না। কেননা কাজা তো তারই উপর ওয়াজিব হয় যার উপর আদায় করা জরুরি হয়। আর যার উপর আদায় করা জরুরি নয় তার কাজা করাও লাজিম হবে না। এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি সদকা করার ইচ্ছায় দুই দিরহাম পকেটে রাখল। তারপর সে এক দিরহাম সদকা করল। তখন দ্বিতীয় দিরহামটি সদকা করা তার উপর অবধারিত হবে না। কেননা সে যদি একটিও

সদকা না করে তবে তার উপর কিছুই লাজিম থাকবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, উম্মে হানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র.) তদীয় কিতাবদ্বয়ে রেওয়ায়েত করেছেন–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْرُ نَفْسِهٖ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ .

অর্থ–নফল রোজা আদায়কারী ব্যক্তি নিজে নিজের হাকিম। চাই সে রোজা রাখুক বা রোজা ভঙ্গ করুক।'– [শরহে নিক্বায়া] উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, বিনা ওজরে নফল রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। যেহেতু ভঙ্গ করা জায়েজ, সেহেতু তার দ্বারা কোনো অপরাধও নেই। আর যেহেতু কোনো অপরাধ নেই, তাই তার কাজাও ওয়াজিব হবে না।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَاِنِّىْ اِذًا صَائِمٌ ثُمَّ اَتَانَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ قَالَ اَرِنِيْهِ فَلَقَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ -

অর্থ–হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট তশরিফ আনলেন এবং বললেন, তোমার নিকট কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, আচ্ছা তবে তো আমি রোজাদার। তারপর দ্বিতীয় দিন তিনি আমাদের নিকট তশরিফ আনলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট হাদিয়ার 'হায়স' নামক হালুয়া আছে। তিনি বললেন, আচ্ছা আমার নিকট নিয়ে এস। আমি তো রোজা অবস্থায় সকাল করেছি। অতঃপর তিনি তা থেকে খেলেন। উক্ত হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল, রোজা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। পরিপূর্ণতা ওয়াজিব হওয়ার উপর কাজা জরুরি হয়। সুতরাং যখন রোজা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয় তখন তার কাজাও জরুরি হবে না।

আমাদের দলিল এই যে, যে নফল রোজা শুরু করা হলো তা ইবাদত এবং আমল। আর আমল বাতিল হওয়া থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা তোমাদের আমলগুলো বিনষ্ট কর না।" আর আমল বিনষ্ট করা থেকে তখন বাঁচা যাবে যখন তা পূর্ণ করা হবে। মোদ্দা কথা, আমল আরম্ভ করার পর পূর্ণ করা ওয়াজিব। যখন আমল পূর্ণ করা ওয়াজিব তখন বিনষ্ট করলে তার কাজাও ওয়াজিব হবে। আমাদের মাজহাবের সমর্থন ঐ হাদীস যা ইমাম মালিক (র.) তার মুয়াত্তা–এ বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ اَصْبَحْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَاُهْدِىَ اِلَيْنَا طَعَامٌ فَاَفْطَرْنَا عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَتْنِىْ حَفْصَةُ وَكَانَتْ اِبْنَةَ اَبِيْهَا فَسَاَلَتْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهٗ .

অর্থ–হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও হাফসা নফল রোজা অবস্থায় ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার আসল। আমরা রোজা ভঙ্গ করে ফেললাম। আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তশরিফ আনলেন। হাফসা আমার থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তাঁকে উপরিউক্ত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এর স্থলে একদিন রোজা কাজা করে নাও। উক্ত হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, নফল রোজা ভঙ্গ করলে তার কাজা করা ওয়াজিব। হাদীসটির মধ্যে وَكَانَتْ اِبْنَةَ اَبِيْهَا বাক্যটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর। বাক্যটির মধ্যে হযরত হাফসার বিরত্ব ও বাহাদুরির বর্ণনা রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত হাফসার অগ্রবর্তিতার কারণে বললেন, সে তার বাপের বেটি। অথচ হাফসা ওমরের বেটি। আর হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত বীর ও বাহাদুর ব্যক্তি। সুতরাং তার বেটিও তারই অনুরূপ বীর ও বাহাদুর।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে পেশকৃত উম্মে হানীর হাদীসের জবাব এই যে, হাদীসের মধ্যে اِفْطَارٌ-এর অর্থ রোজা ভঙ্গ করা নয়; বরং রোজা না রাখা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নফল রোজা রাখার ইরাদা করবে সে নিজের উপর হাকিম। চাই রোজা রাখুক বা না রাখুক। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জবাব এই যে, হাদীসে শুধু এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, হাদিয়ার 'হায়স' আসার কারণে তিনি রোজা ভঙ্গ করেছেন। আর জিয়াফত-এর ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। কাজা ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়া উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না, কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঐ হাদীস যা

আমাদের মাজহাবের সমর্থনে আমরা পেশ করেছি তা সুস্পষ্টভাবে কাজা ওয়াজিব হওয়ার উপর দালালাত করে। তাই এই হাদীসকে ঐ হাদীসের উপর প্রযুক্ত করা হবে যার মধ্যে কাজা ওয়াজিব হওয়ার কথা অতিরিক্ত রয়েছে। সর্বশেষ কথা, ওজরের কারণে নফল রোজা ভঙ্গ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। তবে বিনা ওজরে ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে একটি হলো জায়েজের অপরটি হলো নাজায়েজের। নাজায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ -

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জিয়াফতও ওজর। অর্থাৎ কেউ যদি কাউকে দাওয়াত করে আর সে যদি নফল রোজা অবস্থায় হয় এখন সে যদি ঐ নফল রোজাটি জিয়াফত বা দাওয়াতের কারণে ভঙ্গ করতে চায় তবে ভঙ্গ করতে পারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) বর্ণনা করে বলেন, জিয়াফত কোনো ওজর নয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ .

অর্থ–তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে দাওয়াত করা হয় তাহলে সে (তা) কবুল করবে। যদি রোজাদার না হয় তাহলে আহার করবে আর যদি রোজাদার হয় তবে দাওয়াতকারীর জন্য কল্যাণের দোয়া করবে।

এর দ্বারা বুঝা গেল, জিয়াফত ওজর নয়। এজন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

প্রথম মতের দলিল হলো এই হাদীস–

اِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ فِىْ ضِيَافَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَامْتَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْاَكْلِ وَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّمَا دَعَاكَ اَخُوْكَ لِتُكْرِمَهُ فَاَفْطِرْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ .

অর্থ– রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর দাওয়াতে শরিক ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আহার থেকে বিরত থাকল এবং বলল, আমি রোজাদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ভ্রাতা তোমাকে দাওয়াত করেছে। তোমার তার সম্মান করা উচিত। তুমি রোজা ভঙ্গ করো এবং এর স্থলে একদিন রোজা কাজা করে নিও।

কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, মেজবান যদি শুধু উপস্থিত হওয়া দ্বারাই খুশি হয়ে যায় এবং আহার না করলে কষ্ট অনুভব না করে তবে রোজা ভঙ্গ করবে না। আর যদি আহার না করলে কষ্ট অনুভব করে তবে ভঙ্গ করা উচিত। পরে তার কাজা করে নেবে। তবে এ কথা খেয়াল রাখবে যে, রোজা ভঙ্গ করার উক্ত ইজাযত হলো সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে। সূর্য হেলে যাওয়ার পর ভঙ্গ না করা উচিত। হ্যাঁ, যদি রোজা ভঙ্গ না করলে মাতাপিতা বা তাদের মধ্য থেকে কারো নাফরমানি হয় তাহলে সূর্য হেলে পড়ার পরও রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ আছে।

وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ بِالتَّشَبُّهِ وَلَوْ أَفْطَرَا فِيهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِيهِ وَصَامَا مَا بَعْدَهُ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَالْأَهْلِيَّةِ وَلَمْ يَقْضِيَا يَوْمَهُمَا وَلَا مَا مَضَى لِعَدَمِ الْخِطَابِ وَهٰذَا بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ لِأَنَّ السَّبَبَ فِيهَا الْجُزْءُ الْمُتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ فَوُجِدَتِ الْأَهْلِيَّةُ عِنْدَهُ وَفِي الصَّوْمِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَالْأَهْلِيَّةُ مُنْعَدِمَةٌ عِنْدَهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا زَالَ الْكُفْرُ أَوِ الصَّبِيُّ قَبْلَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ وَقْتَ النِّيَّةِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّى وُجُوبًا وَأَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ مُنْعَدِمَةٌ فِي أَوَّلِهِ إِلَّا أَنَّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَنْوِيَ لِلتَّطَوُّعِ فِي هٰذِهِ الصُّوْرَةِ دُوْنَ الْكَافِرِ عَلَى مَا قَالُوْا لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّطَوُّعِ أَيْضًا وَالصَّبِيُّ أَهْلٌ لَهُ ـ

অনুবাদ : বালক যদি রমজানের দিনে প্রাপ্তবয়স্ক হয় কিংবা কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে উভয়ে দিনের অবশিষ্টাংশ [পানাহার থেকে] বিরত থাকবে। যাতে [রোজাদারের সঙ্গে] সাদৃশ্যের মাধ্যমে সময়ের হক আদায় হয়ে যায়। তবে যদি দিনের অবশিষ্টাংশে তারা পানাহার করে ফেলে তাহলে তাদের উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা ঐ দিনে তার রোজা ওয়াজিব ছিল না। তবে পরবর্তী দিনগুলোতে রোজা রাখবে। কেননা রোজার [ওয়াজিব হওয়ার] কারণ এবং [তা আদায় করার] যোগ্যতা সাব্যস্ত হয়েছে। আর সেই দিনটির এবং পূর্ববর্তী দিনগুলোর তারা কাজা করবে না। কেননা [ঐ দিনগুলোতে তার প্রতি] রোজার নির্দেশ পাওয়া যায়নি। এটি নামাজের বিপরীত। [অর্থাৎ যেই ওয়াক্তে অপ্রাপ্তবয়স্কতা ও কুফরি বিলুপ্ত হবে সেই ওয়াক্তের নামাজ ওয়াজিব হবে] কেননা নামাজের ক্ষেত্রে [ওয়াজিব হওয়ার] কারণ হলো সময়ের আদায়ের নিকটবর্তী অংশটি। আর সেই মুহূর্তটিতে [উভয়ের মধ্যে নামাজ আদায় করার] যোগ্যতা পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে রোজার ক্ষেত্রে [ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো] দিনের প্রথম অংশটি। আর সেই মুহূর্তে যোগ্যতা অনুপস্থিত ছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জাওয়ালের পূর্বে যদি কুফরি বা অপ্রাপ্ত বয়স্কতা বিলুপ্ত হয় তাহলে তার উপর রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা, সে নিয়তের সময় পেয়েছে। জাহিরী রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে রোজা বিভাজ্য নয়। আর দিনের প্রথমাংশে ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। তবে বালকের ক্ষেত্রে এই অবস্থায় নফল রোজার নিয়ত করা জায়েজ রয়েছে, কিন্তু কাফিরের ক্ষেত্রে নেই। যেমন মাশায়েখগণ বলেছেন। কেননা কাফির [দিনের প্রথমাংশে] রোজা পালনের যোগ্য ছিল না। আর বালক নফলের যোগ্য ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলাটির ভিত্তি হলো একটি নীতিমালার উপর। নীতিমালাটি হলো এই যে, রমজানের দিনগুলোর মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি দিনের শেষাংশে এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, যদি এই ব্যক্তি দিনের প্রথমাংশে এই অবস্থার সম্মুখীন হতো তবে তার উপর রোজা রাখা ফরজ হতো। তাই এই ব্যক্তির উপর দিনের অবশিষ্টাংশে পানাহার থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ অন্যান্য রোজাদারের মতো থাকা ওয়াজিব। যেমন– ঋতুময়ী বা নিফাসওয়ালী কোনো নারী ফজরের নামাজের পর দিনের কোনো অংশে হায়েজ বা নিফাস থেকে পাক হয়ে গেল, কিংবা কোনো ব্যক্তি পাগল ছিল যে ভালো হয়ে গেল, বা অসুস্থ ছিল সুস্থ হয়ে গেল। কিংবা মুসাফির ছিল মুকিম হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি উপরিউক্ত অবস্থায় হবে না তার উপর পানাহার থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ অন্যান্য রোজাদারের মতো থাকা ওয়াজিব নয়।

যেমন কোনো নারী পুরো দিন হায়েজ বা নিফাস অবস্থায় ছিল তার উপর পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়; বরং তার জন্য পানাহার করা জায়েজ। এখন কথা হলো, দিনের অবশিষ্ট অংশে বিরত থাকা ওয়াজিব না মোস্তাহাব এ ব্যাপারে মুহাম্মদ

বিন ওজা বলেন, এই বিরত থাকা মোস্তাহাব। কেননা যখন দিনের কিছু অংশ রোজা ভঙ্গ অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে গেল তখন দিনের অবশিষ্ট অংশে আহার থেকে বিরত রাখা কিভাবে ওয়াজিব হবে? শায়খ ইমাম জাহিদ এর দিকে নিসবত করে বলেন, এই বিরত থাকা ওয়াজিব। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'মবসূত' নামক গ্রন্থের সাওম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ - فَلْيَصُمْ শব্দটি أَمْر -এর সীগাহ্। আর আমর-এর সীগাহ দ্বারা ওয়াজিব বুঝা যায়। অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে বলেছেন– إِذَا طَهُرَتْ فِيْ بَعْضِ النَّهَارِ فَلْتَدَعِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ - لِتَدَعْ শব্দটিও أَمْر যা দ্বারা ওয়াজিব বুঝা যায়।

উপরিউক্ত নীতিমালার আলোকেই নিম্নোক্ত মাসআলাটি। অর্থাৎ রমজানের দিনে যদি কোনো বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় বা কাফির মুসলমান হয়ে যায়, তবে এরা দিনের অবশিষ্ট অংশে পানাহার ও সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে তাহলে রোজাদারদের সাদৃশ্যের কারণে রমজানের ওয়াক্তের পুরা হক আদায় করা হবে। কেননা এটা খুবই খারাপ কথা যে, পুরো দুনিয়া রোজা রাখবে আর এই ব্যক্তি আহার-বিহারে দিনাতিপাত করবে। এজন্য তাকেও রোজা ভঙ্গের কার্যাদি থেকে বিরত রাখা উচিত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বালক যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এবং কাফির মুসলমান হওয়ার পর রমজানের দিনে কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে তাদের উপর এই দিনের কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা তাদের উপর এই দিনের রোজা ওয়াজিবই হয়নি; বরং এই দিনের অবশিষ্ট অংশ আহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। আর রোজার কাজা ওয়াজিব হয়; বিরত থাকার কাজা ওয়াজিব হয় না। এজন্য তাদের উপর ঐ দিনের কাজা ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, ঐ দিনের পর রমজানের যে দিনগুলো অবশিষ্ট থাকবে ঐ দিনগুলোর রোজা তার উপর ফরজ হবে। কারণ, সেগুলোর মধ্যে রোজা আদায়ের যোগ্যতাও রয়েছে। যেমন আকিল, বালিগ মুসলমান এবং শরয়ী ওজর থেকে পবিত্র। রোজা ফরজ হওয়ার সবব বা কারণ অর্থাৎ রমজানও বিদ্যমান। সুতরাং যখন যোগ্যতাও আছে, সববও সাব্যস্ত আছে, তবে রোজা ফরজ হওয়ার আর কি বাধা থাকতে পারে? তবে বিগত দিনগুলো, বালিগ হওয়ার দিন এবং ইসলাম গ্রহণ করার দিনের কাজা ওয়াজিব নয়। কেননা ঐ সময় এরা শরিয়তের মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তিই ছিল না। আর যেহেতু শরিয়তের মুখাতাব ছিল না সেহেতু তাদের উপর আদায় করাও ওয়াজিব হবে না। আর যখন আদায় করা ওয়াজিব হবে না তখন কাজা কোত্থেকে ওয়াজিব হবে? এর বিপরীত হলো নামাজ। নামাজের একেবারে শেষ ওয়াক্তে যদি বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয় বা কাফির মুসলমান হয় তবে তাদের উপর ঐ নামাজের কাজা ওয়াজিব হবে। কারণ, নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো ওয়াক্তের ঐ অংশ যে অংশ আদায়ের নিকটবর্তী বা আদায়ের সাথে যুক্ত। কিন্তু যদি ওয়াক্ত কমে যায় আর নামাজ আদায় না করে তাহলে ঐ কম ওয়াক্তই সবব হবে। সুতরাং যখন ঐ কম ওয়াক্তের মধ্যে কাফির মুসলমান হলো বা বালক প্রাপ্তবয়স্ক হলো, তখন তো তাদের মধ্যে নামাজের যোগ্যতাও পাওয়া গেছে। এখন যখন তাদের মধ্যে নামাজের যোগ্যতাও আছে এবং নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণও আছে তখন তাদের উপর এই নামাজ লাজিম হয়ে গেল। তবে যেহেতু আদায়ের ওয়াক্ত বাকি নেই তাই কাজা ওয়াজিব হবে। আর রোজা তার ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো ঐ দিনের প্রথম অংশ। অর্থাৎ ঐ অংশটি সবব যা ফজরের ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই ওয়াক্তের মধ্যে অর্থাৎ ঐ দিনের প্রথম অংশে কুফরি ও অপ্রাপ্তের কারণে যোগ্যতা অনুপস্থিত। আর যোগ্যতা যেহেতু অনুপস্থিত তাই এই দিনের রোজা লাজিম হলো না। আর যখন রোজা লাজিম হলো না তখন তার কাজাও ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কুফরি বা অপ্রাপ্ত বয়স্কতা জাওয়ালের পূর্বেই দূর হয়ে যায় অর্থাৎ জাওয়ালের পূর্বে কাফির মুসলমান হয়ে গেল বা বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেল তাহলে তাদের উপর ঐ দিনের রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা তারা ঐ দিনে নিয়তের ওয়াক্ত পেয়েছে। এজন্য জাওয়ালের পূর্বেই যদি রোজার নিয়ত করে তবে রোজা সহীহ হয়ে যাবে। এর উপমা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত রোজা ভঙ্গ করার নিয়ত করে তারপর কিছু পানাহার করেনি অতঃপর জাওয়ালের পূর্বেই রোজার নিয়ত করে তবে তার রোজা গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও রোজা ভঙ্গ করা হুকুম হিসেবে রোজার বিপরীত। এমনিভাবে কুফরি হুকুম হিসেবে রোজার বিপরীত। হাকীকাতান বা বাস্তবে বিপরীত নয়। সুতরাং যদি জাওয়ালের পূর্বে মুসলমান হয়ে যায় এবং রোজার নিয়ত করে তবে তার রোজা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে শর্ত হলো সকাল থেকে কিছু পানাহার করতে পারবে না।

জাহিরী রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, রোজা ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে বিভাজ্য হয় না। অর্থাৎ এটা হতে পারে না যে, রোজা দিনের প্রথমার্ধে ওয়াজিব নয় আর দ্বিতীয়ার্ধে ওয়াজিব। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দিনের প্রথমার্ধে অপ্রাপ্ত বয়স্কতা ও কুফরির কারণে তাদের উভয়ের মধ্যে রোজার যোগ্যতা অনুপস্থিত। যেহেতু দিনের প্রথমার্ধে ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা না থাকার কারণে তাদের উপর রোজা ওয়াজিব হয়নি। আর দিনের অবশিষ্ট অংশে এই কারণে ওয়াজিব হবে না যে, রোজা ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে বিভাজ্য হয় না।

মোট কথা ঐ দিনের রোজা তাদের উপর ওয়াজিব হয়নি। যেহেতু ঐ দিনের রোজা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয়নি, তাই তাদের উপর কাজাও ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, বালক যদি জাওয়ালের পূর্বে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নফলের নিয়ত করে তবে নফল রোজা দুরস্ত হবে। শর্ত হলো সকালে কোনো কিছু আহার করতে পারবে না। আর যদি জাওয়ালের পূর্বে কাফির মুসলমান হয়ে নফল রোজার নিয়ত করে তবে তার নফল রোজা সহীহ হবে না। কেননা কাফির নফল রোজার যোগ্য নয়। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক নফল রোজার যোগ্য।

وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَى الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْوُجُوْبِ وَلَا صِحَّةَ الشُّرُوْعِ وَإِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُوْمَ لِزَوَالِ الْمُرَخِّصِ فِيْ وَقْتِ النِّيَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيْمًا فِيْ أَوَّلِ الْيَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ تَرْجِيْحًا لِجَانِبِ الْإِقَامَةِ فَهٰذَا أَوْلٰى إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الْمُبِيْحِ ـ

অনুবাদ : মুসাফির যদি [রমজান ছাড়া অন্য সময়ে] রোজা না রাখার নিয়ত করে অতঃপর জাওয়ালের পূর্বে শহরে প্রবেশ করে রোজার নিয়ত করে নেয় তাহলে [রোজা বৈধ হওয়ার জন্য] তা যথেষ্ট হবে। কেননা সফর রোজা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতার বিরোধী নয় এবং রোজা শুরু করার বৈধতারও বিরোধী নয়। আর যদি বিষয়টি রমজানের দিনে হয় তাহলে রোজা আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব। কেননা নিয়তের সময়সীমার মাঝেই রুখসতের কারণের অবসান ঘটেছে। দেখুন না, যদি সে দিনের প্রথমাংশে মুকীম থাকতো, অতঃপর সফরে বের হতো তাহলে মুকীম হওয়ার দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রেক্ষিতে রোজা ভঙ্গ করা তার জন্য বৈধ হতো না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৈধ না হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। তবে উভয় ক্ষেত্রে যদি রোজা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, বৈধতার সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা এই যে, যদি রমজান ছাড়া অন্য সময়ে মুসাফির রাতে এই নিয়ত করে যে, আগামীকাল রোজা রাখব না। অতঃপর জাওয়ালের পূর্বেই নিজের বাড়ি পৌঁছে নফল রোজার নিয়ত করে, অথচ এখনো পর্যন্ত সে কিছুই আহার করেনি। তবে তার এই নফল রোজা আদায় হয়ে যাবে। কেননা সফর রোজা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতারও বিরোধী নয় এবং রোজা আরম্ভ করার বৈধতারও বিরোধী নয়। অর্থাৎ মুসাফিরের রোজা রাখার যোগ্যতাও আছে এবং সে রোজা আরম্ভ করলে তা সহীহও হয়ে যায়। এমনকি মুসাফির যদি নফল রোজা ভঙ্গ করে দেয় তাহলে তার কাজা ওয়াজিব হবে। আর যদি মুসাফিরের রাতে রোজা ভঙ্গ করার নিয়ত করা এবং জাওয়ালের পূর্বে তার বাড়ি পৌঁছে যাওয়া রমজানের সময়ে হয় তাহলে তার উপর ঐ দিনের রোজা রাখা ওয়াজিব। কেননা নিয়তের সময়ে তথা জাওয়ালের পূর্বে مُرَخِّصْ অর্থাৎ সফর যে রোজা ভঙ্গ করার অবকাশ দিয়েছিল তা দূরীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং যখন নিয়তের সময়ে মুরাখখিস দূরীভূত হয়ে গেল তখন রোজা রাখা জরুরি হয়ে গেল। তাই আপনি লক্ষ করুন যে, যদি কোনো ব্যক্তি দিনের প্রথমার্ধে মুকীম হয়। তারপর সে সফর আরম্ভ করে তবে সফরের কারণে তার রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ হবে না। কেননা দিনের প্রথমার্ধে মুকীম হওয়ার দাবি এই যে, রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ না হওয়া। আর দিনের শেষার্ধে মুসাফির হওয়ার দাবি এই যে, রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ হওয়া। সুতরাং মুকীম হওয়ার দিকটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে রোজা ভঙ্গ করাকে নাজায়েজ বলা হয়েছে। সুতরাং যখন এই সুরতে রোজা ভঙ্গ করা নাজায়েজ তাই প্রথম সুরতে [অর্থাৎ যখন মুসাফির জাওয়ালের পূর্বে মুকীম হয়ে গেল] অবশ্যই রোজা ভঙ্গ করা নাজায়েজ হবে। কেননা দ্বিতীয় মাসআলায় রোজা ভঙ্গ করার সময় মুরাখখিস তথা সফর বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নেই। তাই যে সুরতে রোজা ভঙ্গের সময় মুরাখখিস তথা সফরও বিদ্যমান নেই, সেখানে অবশ্যই রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ হবে না। হ্যাঁ এতটুকুন কথা অবশ্যই থেকে যায় যে, উভয় সুরতে যদি রোজা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে শুধু কাজা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, রোজা ভঙ্গকারী অর্থাৎ সফরের সন্দেহ বিদ্যমান। আর সন্দেহের কারণে কাফফারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ জন্য উপরিউক্ত উভয় মাসআলায়ও রোজা ভঙ্গ করার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

وَمَنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فِىْ رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِىْ حَدَثَ فِيْهِ الْاِغْمَاءُ لِوُجُوْدِ الصَّوْمِ فِيْهِ وَهُوَ الْاِمْسَاكُ الْمَقْرُوْنُ بِالنِّيَّةِ اِذِالظَّاهِرُ وُجُوْدُهَا مِنْهُ وَقَضٰى مَا بَعْدَهُ لِانْعِدَامِ النِّيَّةِ وَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ اَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْهُ قَضَاهُ كُلَّهُ غَيْرَ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِمَا قُلْنَا وَقَالَ مَالِكٌ (رح) لَا يَقْضِىْ مَا بَعْدَهُ لِاَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عِنْدَهُ يَتَادّٰى بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْاِعْتِكَافِ وَعِنْدَنَا لَابُدَّ مِنَ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ لِاَنَّهَا عِبَادَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ لِاَنَّهُ يَتَخَلَّلُ بَيْنَ كُلِّ يَوْمَيْنِ مَا لَيْسَ بِزَمَانٍ لِهٰذِهِ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ الْاِعْتِكَافِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রমজানের দিনে বেহুঁশ হয়ে গেল, সে ঐ দিনের রোজার কাজা করবে না যেদিন বেহুঁশ হয়েছে। কেননা ঐ দিনটিতে রোজা [অর্থাৎ পানাহার ও সঙ্গম থেকে] বিরতি পাওয়া গেছে। কারণ, বাহ্যত নিয়ত বিদ্যমান থাকাটাই স্বাভাবিক। পরবর্তী দিনগুলোর কাজা করতে হবে। কেননা নিয়ত পাওয়া যায়নি। যদি রমজানের প্রথম রাতেই বেহুঁশ হয়ে যায় তাহলে ঐ রাতের পরবর্তী দিনটি ছাড়া পূর্ণ রমজানের কাজা করবে। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি। ইমাম মালিক (র.) বলেন, পরবর্তী দিনগুলোর রোজাও কাজা করবে না। কেননা, তাঁর মতে ইতিকাফের ন্যায় রমজানের রোজাও একই নিয়তে আদায় হয়ে যায়। আর আমাদের মতে প্রত্যেক দিনের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ত অপরিহার্য। কেননা এগুলো বিচ্ছিন্ন ইবাদত। কারণ, প্রতি দুই দিনের মাঝে এমন সময় প্রতিবন্ধক যা উক্ত ইবাদতের সময়ভুক্ত নয়। ইতিকাফের বিষয়টি এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি রমজানের ফজরের পর কেউ বেহুঁশ হয়ে যায় এবং কিছু দিন বেহুঁশ অবস্থায় থাকে তাহলে যেদিন বেহুঁশ হয়েছিল সে দিনের তো কাজা করবে না; এর পরের দিনগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে। ঐদিনের কাজা এই কারণে ওয়াজিব নয় যে, সে দিনের রোজা পাওয়া গেছে। আর তা এভাবে যে, এই ব্যক্তি রোজার নিয়ত দ্বারা রোজা ভঙ্গের কাজ থেকে বিরত ছিল। আর নিয়তও এভাবে পাওয়া গেছে যে, এই ব্যক্তি মুসলমান। আর রমজানের রাতগুলোতে মুসলমানের বাহ্যত অবস্থা হলো এই যে, তার কোনো রাত নিয়ত ছাড়া অতিবাহিত হয় না। সুতরাং যখন বাহ্যত নিয়তের সাথে রোজা ভঙ্গের কাজ থেকে বিরতি পাওয়া গেল তবে তো রোজা পাওয়া গেল। আর যখন ঐ দিনের রোজা পাওয়া গেল তবে তো তার কাজা করার কোনোই জরুরত নেই। এর পরের দিনগুলোতে যেহেতু নিয়ত পাওয়া যায়নি তাই সেগুলোর মধ্যে রোজা ভঙ্গ থেকে বিরতি বলে গণ্য হবে না। নিয়ত এজন্য পাওয়া যায়নি যে, ইগমা তথা বেহুঁশ হওয়া নিয়তের প্রতিবন্ধক।

وَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ اَوَّلَ لَيْلَةٍ : সূরতে মাসআলা এই যে, যদি রমজান মাসের প্রথম রাতেই কেউ বেহুঁশ হয়ে যায় এবং পুরো মাস বেহুঁশ অবস্থায় থাকে তবে প্রথমে রোজা ছাড়া পুরা মাসের কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা, রমজানের চাঁদ পরিদৃষ্ট হওয়ার পরেই একজন মুসলমানের বাহ্য অবস্থা এই যে, সে প্রথমেই রোজার নিয়ত করে নেয়। তাই যখন প্রথমে রোজার নিয়ত করা হয়েছে তবে তার এই রোজা শরয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার কাজা ওয়াজিব হবে না। আর যেহেতু এর পরের রোজাগুলোর নিয়ত পাওয়া যায়নি তাই সেগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, যদি এই ব্যক্তি চাঁদ দেখার পূর্বেই বেহুঁশ হয়ে যায় তখন প্রথম রোজাটিরও কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা চাঁদ দেখার পূর্বের নিয়তের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ইমাম মালিক

(র.) বলেন, যদি রমজানের প্রথম রাতেই বেহুঁশ হয়ে যায়, আর পুরো মাস বেহুঁশ থাকে এবং রোজা ভঙ্গের আহার-বিহার থেকে বিরত থাকে, তবে তার উপর একেবারেই কাজা ওয়াজিব হবে না; বরং পুরো মাসের রোজাই শরয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল এই যে, রমজানের সবগুলো রোজা একই নিয়তে আদায় করা যায়। প্রত্যেক রোজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন– ইতিকাফের পুরো দশ দিনের জন্য একই নিয়ত যথেষ্ট। প্রত্যেক দিনের ইতিকাফের নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। মোদ্দা কথা, যখন ইমাম মালিক (র.)-এর মতে রমজানের সকল রোজার জন্য একই নিয়ত যথেষ্ট। আর প্রথম রাতে জাহিরী অবস্থা অনুযায়ী নিয়ত পাওয়া গেল। যেমন হানাফীগণও এর প্রবক্তা, তখন পুরো রমজান নিয়তের সাথে রোজা ভঙ্গ থেকে বিরতি পাওয়া গেছে। সুতরাং এই হিসেবে পুরো রমজানের রোজাই আদায় হয়ে গেছে। আর যখন পুরো রমজানের রোজা আদায় হয়ে গেল তখন এগুলোর কাজা কিভাবে ওয়াজিব হবে? আমাদের মতে প্রত্যেক দিনের রোজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত করা জরুরি। কেননা প্রত্যেক দিনের রোজা ভিন্ন একটি ইবাদত। তাই তো আপনি দেখুন যদি একদিনের রোজা নষ্ট হয়ে যায় তবে অন্যান্য দিনের রোজা নষ্ট হয় না। এমনিভাবে যদি কোনো কোনো দিনে রোজার যোগ্যতার বিলুপ্তি ঘটে তবে এর দ্বারা এ কথা বুঝে আসে না যে, অন্যান্য দিনেরও যোগ্যতা নেই; বরং হতে পারে কোনো ব্যক্তি রমজানের কোনো কোনো দিনে কুফরির কারণে রোজার যোগ্য নয়, কিন্তু যখন মুসলমান হয়ে গেল তখন অন্যান্য দিনের রোজার যোগ্য হয়ে গেল। মোট কথা রমজানের সকল রোজা একটি ইবাদত নয়; বরং প্রত্যেক দিনের রোজা আলাদা আলাদা ইবাদত। যেমন– প্রত্যেক নামাজ আলাদা ইবাদত। আর রমজানের রোজা আলাদা আলাদা ইবাদত এ কারণে যে, প্রত্যেক দুই রোজার মাঝে রাতের এমন প্রতিবন্ধক ওয়াক্ত আসে যা ঐ রোজার ইবাদতের সময় নয়। তাই তো এক রোজার সময় অন্য রোজার সাথে সম্পৃক্ত হলো না। আর যখন উভয় রোজার মাঝে সম্পৃক্ততা থাকল না তখন এটি দুটি ইবাদতরূপে গণ্য হবে; একটি ইবাদত হিসেবে নয়। অন্যথায় যদি সকল রোজাকে একটি ইবাদত বলা হয় তখন এক ইবাদতের মাঝে এমন প্রতিবন্ধক ওয়াক্ত আসবে যা মূলে ঐ ইবাদতের ওয়াক্ত নয়। আর এটি তো ইবাদতের বিপরীত। এজন্য আমরা বলেছি যে, সকল রোজা এক ইবাদত নয়। যেমনটি ইমাম মালিক (র.) বলেছেন; বরং প্রত্যেক দিনের রোজা আলাদা আলাদা ইবাদত। আর যখন প্রত্যেক রোজা আলাদা আলাদা ইবাদত, তখন প্রত্যেক রোজার জন্য আলাদা আলাদা নিয়ত করাও জরুরি। ই'তিকাফের বিষয়টি এর বিপরীত। তার মধ্যে রাতদিন পুরোটাই ই'তিকাফের ওয়াক্ত। এজন্য ই'তিকাফ পুরোটাই একই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য এক দিনই যথেষ্ট। তাই ই'তিকাফের উপর রোজাকে কিয়াস করা জায়েজ হবে না।

وَمَنْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيْ رَمَضَانَ كُلِّهِ قَضَاهُ لِاَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ يُضْعِفُ الْقُوٰى وَ لَا يُزِيْلُ الْحِجٰى فَيَصِيْرُ عُذْرًا فِي التَّاخِيْرِ لَا فِي الْاِسْقَاطِ وَمَنْ جُنَّ فِيْ رَمَضَانَ كُلِّهِ لَمْ يَقْضِهِ خِلَافًا لِمَالِكٍ (رح) وَهُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْاِغْمَاءِ وَلَنَا اَنَّ الْمُسْقِطَ هُوَ الْحَرَجُ وَالْاِغْمَاءُ لَا يَسْتَوْعِبُ الشَّهْرَ عَادَةً فَلَا حَرَجَ وَالْجُنُوْنُ يَسْتَوْعِبُهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি পুরো রমজান মাস বেহুঁশ অবস্থায় থাকে সে তা কাজা করবে। কেননা, সংজ্ঞাহীনতা হলো এক ধরনের অসুস্থতা, যা শক্তিশালীকে দুর্বল করে দেয়, কিন্তু তা আমলকে বিলুপ্ত করে না। সুতরাং তা রোজাকে বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে ওজররূপে গণ্য হবে; রহিত করার ক্ষেত্রে নয়। আর যে ব্যক্তি পুরো রমজান মাসে পাগল থাকে, সে তার কাজা করবে না। ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এটাকে বেহুঁশীর উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে রহিতকারী হলো কষ্টসাধ্য হওয়া। আর বেহুঁশী সাধারণত মাসব্যাপী হয় না। সুতরাং তা কষ্টসাধ্য নয়। পক্ষান্তরে মস্তিষ্ক বিকৃতি মাসব্যাপী হতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে অসুবিধা আপতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি পুরো রমজান বেহুঁশ অবস্থায় থাকে তাহলে সে পুরো রমজানের কাজা করবে। হাসান বসরী (র.)-এর মতে এ ধরনের লোকের উপর কাজা ওয়াজিব নয়। তাঁর দলিল এই যে, রোজা আদায় ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো রমজান মাসের উপস্থিতি। আর এটা তার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। কেননা রমজান আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বেহুঁশীর কারণে তার জ্ঞান বা আকল লোপ পেয়ে গেছে। আর আকল ছাড়া কোনো ব্যক্তি শরিয়তের বিধি-বিধানের মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি হয় না। সুতরাং যখন এই ব্যক্তি শরিয়তের মুখাতাব হলো না তখন তার উপর আদায় লাজিম হবে না। আর যখন আদায় লাজিম হবে না তখন কাজা কিভাবে ওয়াজিব হবে? আমাদের দলিল বুঝার পূর্বে এ কথা বুঝতে হবে যে, বেহুঁশীর কারণে জ্ঞান বিলোপ হয়, কিন্তু দূরীভূত হয় না। আর মাতালের কারণে আকল দূরীভূত হয়ে যায়। তাই তো আপনার অবগতি থাকবে যে, অসুস্থতার জমানায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বেহুঁশ হয়েছিলেন অথচ তিনি আকল দূরীভূত হওয়া থেকে মা'সূম ছিলেন। যেমন তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে- مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ সুতরাং যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, বেহুঁশী শক্তিশালীকে তো কমজোর করে দেয়, কিন্তু আকলকে ঘায়েল করে না; বরং আকল অবশিষ্ট থাকে; তবে কিছু সময়ের জন্য লোপ পেয়ে যায়। যেমন ঘুমের সময় আকল বিলোপ হয়ে যায়। এজন্য বেহুঁশীর কারণে রোজাকে বিলম্ব তো করা যায়, কিন্তু বাদ দেওয়া যায় না। আর যখন তার থেকে রোজা বাদ যায় না তখন তার উপর আবশ্যিকভাবে কাজা ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ جُنَّ فِيْ رَمَضَانَ كُلِّهِ الخ কিফায়া গ্রন্থকার লিখেছেন ওজর চার প্রকার-

১. যা সাধারণত এক দিবারাত্রের কম দীর্ঘায়িত হয়। যেমন- ঘুম। তার হুকুম এই যে, এর কারণে কোনো ইবাদত বাদ যাবে না। কেননা এই ওজরটি কোনো কষ্টের কারণ নয়।

২. এমন ওজর যা সৃষ্টিগত এবং প্রকৃতিগতভাবে দীর্ঘায়িত হয়। যেমন- অপ্রাপ্ত বয়স্কের জমানা। এর হুকুম এই যে, এর দ্বারা সমস্ত ইবাদত বাদ পড়ে যায়। কেননা এই ওজরটি কষ্টের কারণ। সুতরাং কষ্টকে দূর করার জন্য বালক থেকে সমস্ত ইবাদতকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩. এমন ওজর যা সাধারণত এক নামাজের সময় পরিমাণ দীর্ঘায়িত হয়, কিন্তু রোজার সময় পরিমাণ দীর্ঘায়িত হয় না। যেমন– বেহুঁশী। তার হুকুম এই যে, যদি বেহুঁশী একদিন ও রাত থেকে অধিক হয়ে যায় তবে কষ্ট লাঘবের জন্য তাকে ওজর ধরা হবে। অর্থাৎ যদি বেহুঁশীর কারণে ছয় ওয়াক্ত নামাজ ফউত হয়ে যায় তবে সেগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ অসুবিধা দূর করার জন্য কাজা বাদ হয়ে গেছে।

৪. এমন ওজর যা নামাজ ও রোজা উভয়টির সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। আবার কখনো দীর্ঘায়িত হয় না। যেমন– পাগল। তার হুকুম এই যে, যদি উভয়টি পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, তবে উভয়টি বাদ পড়ে যাবে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, যদি কোনো ব্যক্তি পুরো রমজান মাতাল থাকে তাহলে তার উপর ঐ রমজানের রোজাগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে না। ইমাম মালিক (র.) বলেন, মাতালের সুরতেও কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) মাতালকে বেহুঁশীর উপর কিয়াস করেন। কেননা বেহুঁশীর ন্যায় মাতলামিও আকল বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং যেমনিভাবে বেহুঁশীর সুরতে কাজা ওয়াজিব হয় তেমনিভাবে মাতালের সুরতেও কাজা ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল এই যে, উপরে বর্ণিত চার প্রকার ওজর দ্বারা বুঝা গেল রোজা বা নামাজ বিনষ্টকারী বস্তু হলো কষ্ট। অর্থাৎ যদি ওজর এমন হয় যা কষ্টের সবব তাহলে দায়িত্ব থেকে ইবাদত বাদ পড়ে যাবে। আর যদি ওজর কষ্টের কারণ না হয় তাহলে ঐ ওজরের কারণে ইবাদত বাদ যাবে না। এখন আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখি যে, সাধারণত বেহুঁশী এক মাস পর্যন্ত বাকি থাকে না। এখন কখনো যদি এক মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, তবে যেহেতু এটি একটি বিরল ঘটনা এজন্য এক মাসের রোজা কাজা করতে কোনো অসুবিধা নেই। আর মাতাল যেহেতু সাধারণত এক মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, এজন্য মাতালের সুরতে এক মাস রোজা কাজা করার মধ্যে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং যেহেতু এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বেহুঁশীর সুরতে কষ্ট নেই, মাতালের সুরতে কষ্ট আছে। তাই আমরা বলেছি যে, পুরো রমজান মাস মাতাল থাকা অবস্থায় কাজা ওয়াজিব হবে না, কিন্তু পুরো রমজান মাস বেহুঁশ থাকলে কাজা ওয়াজিব হবে।

وَإِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُوْنُ فِىْ بَعْضِهِ قَضٰى مَا مَضٰى خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِىِّ (رحـ) هُمَا يَقُوْلَانِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْاَدَاءُ لِانْعِدَامِ الْاَهْلِيَّةِ وَالْقَضَاءُ يُرَتَّبُ عَلَيْهِ وَصَارَ كَالْمُسْتَوْعَبِ وَلَنَا اَنَّ السَّبَبَ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الشَّهْرُ وَالْاَهْلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ وَفِى الْوُجُوْبِ فَائِدَةٌ وَهُوَ صَيْرُوْرَتُهُ مَطْلُوْبًا عَلٰى وَجْهٍ لَا يَحْرُجُ فِىْ اَدَائِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَوْعَبِ لِاَنَّهُ يَحْرُجُ فِى الْاَدَاءِ فَلَا فَائِدَةَ وَتَمَامُهُ فِى الْخِلَافِيَّاتِ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْاَصْلِىِّ وَالْعَارِضِىِّ قِيْلَ هٰذَا فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِاَنَّهُ اِذَا بَلَغَ مَجْنُوْنًا اِلْتَحَقَ بِالصَّبِىِّ فَانْعَدَمَ الْخِطَابُ بِخِلَافِ مَا اِذَا بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ وَهٰذَا مُخْتَارُ بَعْضِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ ـ

অনুবাদ : যদি বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি রমজানের কোনো অংশে সুস্থতা লাভ করে তাহলে সে বিগত দিনগুলোর কাজা করবে। ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা উভয়ে বলেন, যোগ্যতা না থাকার কারণে তার উপর আদায় করা ওয়াজিব হয়নি। আর কাজা প্রবর্তিত হয় আদায় ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে। সুতরাং সে পুরা রমজান ব্যাপী বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির মতো হবে। আমাদের দলিল এই যে, রোজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ অর্থাৎ রমজান মাস তো বিদ্যমান রয়েছে। আর যোগ্যতা দায়িত্ব পালনে সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। আর এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব করার মধ্যে ফায়দাও রয়েছে। আর তা হলো [শরিয়তের পক্ষ হতে] এমনভাবে দায়বদ্ধ হওয়া, যা আদায় করতে কোনো অসুবিধা হবে না। মাসব্যাপী বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে ক্ষেত্রে আদায়ে অসুবিধা রয়েছে। সুতরাং ওয়াজিব করার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। পূর্ণ আলোচনা মতপার্থক্য বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে থেকেই মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকা এবং পরবর্তীতে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা এ দু'য়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেউ কেউ বলেন, তা হলো জাহির রেওয়ায়েত অনুসারে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কেননা যদি সে বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে সে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সঙ্গেই যুক্ত। তখন শরিয়তের পক্ষ থেকে তার প্রতি নির্দেশ অনুপস্থিত। যদি সুস্থ মস্তিষ্ক অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয় তারপর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, তার অবস্থা এর বিপরীত। আর এটা পরবর্তী কোনো কোনো মাশায়েখের কাছে গ্রহণীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা এই যে, যদি বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি রমজানের কোনো অংশে সুস্থতা লাত করে তাহলে সে বিগত দিনগুলোর কাজা করবে। আর সামনের দিনগুলোয় রোজা পালন করবে। ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর বিগত দিনগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে না। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত। তাদের সকলের দলিল এই যে, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি যেহেতু যোগ্যতা রাখে না তাই তার উপর আদায় ওয়াজিব হয়নি। আর কাজা ওয়াজিব হয় আদা ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে। এজন্য তার উপর যেহেতু মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার পূর্বের দিনগুলোর আদায় ওয়াজিব হয়নি তাই তার উপর কাজাও ওয়াজিব হবে না। এই সুরতটি এমন হলো– যেমন কোনো ব্যক্তি পুরো রমজান মাস মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ যেমনিভাবে পুরো রমজান মাসে মস্তিষ্ক বিকৃত থাকার কারণে কাজা ওয়াজিব হয় না তেমনিভাবে কিছু দিন মস্তিষ্ক বিকৃত থাকার সুরতেও কাজা ওয়াজিব হবে না। যেন তারা রমজানের কিছু অংশে মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াকে পুরো রমজানে [মাসব্যাপী] মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় থাকার উপর কিয়াস করেছেন। আমাদের দলিল এই যে, যে ব্যক্তি রমজানের কিছু দিনে মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় ছিল তারপর সুস্থ হয়ে গেল তার ক্ষেত্রে রোজা ওয়াজিব হওয়ার সবব পাওয়া গেছে। আর সবব হলো মাসের উপস্থিতি। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আর এ কথা সিদ্ধান্তকৃত যে, আয়াতের মধ্যে شَهْر দ্বারা কিছু মাস উদ্দেশ্য। কেননা যদি সকল মাসকে সবব বলা হয় তাহলে শাওয়াল মাসে রোজা রাখতে হবে। কারণ, মুসাব্বাব

(مُسَبَّبْ)-এর অস্তিত্ব সববের পরেই হয়। এখন আয়াতের মূল ইবারত হবে– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ بَعْضَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ بَعْضَهُ। উক্ত আয়াতে فَلْيَصُمْهُ-এর-مَفْعُول এর-ضَمِيْر এর مَرْجِعْ হলো اَلشَّهْرُ। যা ইবারতে উল্লেখ আছে। اَلشَّهْرُ كُلُّهُ। তার مَرْجِعْ নয় যাকে উহ্য ধরা হয়েছে। এখন আয়াতের মতলব এই হবে যে, যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি মাসব্যাপী ছিল না; বরং মাসের কিয়দংশে ছিল। সে মাহের কিছু অংশ পেল, এজন্য তার পুরো মাস রোজা রাখা উচিত। কিন্তু যেহেতু মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে কিছু দিনের রোজা রাখতে পারেনি এজন্য সেগুলোর কাজা করবে আর বাকিগুলো আদায় করবে।

وَاَهْلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো এই যে, মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদিও সবব তথা মাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, কিন্তু তার অসুস্থতা প্রথম দিবসগুলোর রোজাকে ওয়াজিব করার জন্য প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ মস্তিষ্ক বিকৃতির সময় রোজা রাখার যোগ্যতা না পাওয়া যাওয়া। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রোজা ওয়াজিব হওয়ার সবব ব্যতীত উপযুক্ততার মুকাল্লাফ হওয়া জরুরি। এ কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের উপর রমজানের রোজা ওয়াজিব হয় না। অথচ সবব তথা মাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। কিন্তু যেহেতু যোগ্যতা অনুপস্থিত তাই তার উপর রমজানের রোজা ওয়াজিব হয়নি। সুতরাং এমনিভাবে যে ব্যক্তি যে জমানায় মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় ছিল তার মধ্যে ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা পাওয়া যায়নি। আর যেহেতু যোগ্যতা পাওয়া যায়নি। তাই তার উপর ঐ জমানার আদায় ওয়াজিব হবে না। আর যখন আদায় ওয়াজিব হবে না তখন কাজাও ওয়াজিব না হওয়া উচিত অথচ আপনারা অতীতের দিনগুলোর কাজা ওয়াজিব করেছেন। এ প্রশ্নের জবাব এই যে, উপযুক্ততার ভিত্তি শুধু এতটুকুন কথার উপর যে, এই ব্যক্তি কার্যত যদিও রোজা রাখার যোগ্যতা রাখে না; কিন্তু এতটুকুন যোগ্যতা অবশ্যই রাখে যে, রোজা তার জিম্মায় দেওয়া যায়। আর দায়িত্ব অর্পণের এই হলো উপযুক্ততা বা যোগ্যতা। সুতরাং যখন উপযুক্ততা পাওয়া গেল তখন মস্তিষ্ক বিকৃতির জমানার রোজাও তার জিম্মায় অবধারিত হয়ে গেল; কিন্তু যেহেতু সেগুলো আদায় করতে পারেনি এজন্য তার উপর সেগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, যদি [উপরিউক্ত] কথা যথাযথই হয় তাহলে যে ব্যক্তি পুরো রমজান মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় ছিল তার উপরও কাজা ওয়াজিব হওয়া উচিত। অথচ আপনারা তার উপর কাজা ওয়াজিব করেন না। এর জবাব এই যে, শুধুমাত্র জিম্মাদারী গ্রহণের যোগ্য হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং তার মধ্যে ফায়দাও রয়েছে। আর ফায়দা হলো এই যে, এমনভাবে রোজা রাখা উদ্দেশ্য যে, তা আদায় করতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়। সুতরাং আমরা দেখছি যে, এ মাসের কম রোজা রাখার মধ্যে ফায়দা [ফলাফল] বিদ্যমান। এভাবে যে, কোনো এক মাসের কমের কাজার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। এজন্য যে, এক মাসের কম রোজা যখন ওয়াজিব করা হয়েছে তখন তার উপর সেগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে। কিন্তু এক মাস বা তার চেয়ে অধিক মস্তিষ্ক বিকৃত থাকা অবস্থায় তার উপর রোজা ওয়াজিব করার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। কেননা এক মাসের রোজার কাজা অসুবিধার কারণে বাদ পড়ে যায়। সুতরাং যদি এক মাসের রোজা ওয়াজিব করেও দেওয়া হয় তা-ও অসুবিধার কারণে বাদ পড়ে যাবে। তাই এই সুরতে কাজা ওয়াজিব করার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই।

মোদ্দা কথা এই যে, وُجُوْبُ فِى الذِّمَّةِ জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া বেহুঁশী তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু যেহেতু বেহুঁশী দীর্ঘদিন থাকে না তাই কাজাকে বাদ দেয় না। আর অপ্রাপ্তবয়স্কতা যেহেতু দীর্ঘায়িত হয় তাই কাজাকে একদল বাতিল করে দেয়। আর মস্তিষ্ক বিকৃতি দীর্ঘায়িতও হয় আবার সংক্ষেপও হয়। যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে তা অপ্রাপ্তবয়স্কতার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি দীর্ঘায়িত না হয় তবে বেহুঁশীর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। আর রোজার মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির দীর্ঘ সময় হলো এক মাস। আর নামাজের মধ্যে একদিন ও রাতের অধিক। সুতরাং রমজানের পুরো মাস যদি মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় অতিবাহিত হয় তবে কাজা বাদ হয়ে যাবে। আর যদি এর চেয়ে কম হয় তবে কাজা বাদ হবে না।

মাসআলাটির পরিপূর্ণ আলোচনা মতপার্থক্য বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান রয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, جُنُوْنٌ اَصْلِىٌّ ও جُنُوْنٌ عَارِضِىٌّ অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব থেকেই মস্তিষ্ক বিকৃত থাকা এবং পরবর্তীতে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত হুকুমের ক্ষেত্রে উভয়টি বরাবর। কেউ কেউ বলেছেন, এই পার্থক্যটি হলো জাহিরী রেওয়ায়েত অনুসারে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, جُنُوْنٌ اَصْلِىٌّ-এর সুরতে যদি রমজানের কোনো অংশে সুস্থতা লাভ করে তাহলে তার উপর অতীত দিনগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে না। যেমন– বালক যদি রমজানের মাঝে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় তবে তার উপর অতীত দিনগুলোর কাজা ওয়াজিব হয় না। আর جُنُوْنٌ عَارِضِىٌّ-এর সুরতে অতীত দিনগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পার্থক্যটি কোনো কোনো মাশায়েখ পছন্দ করেছেন।

ফায়দা : جُنُوْنٌ اَصْلِىٌّ হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব থেকেই মাজনূন ছিল। তারপর প্রাপ্তবয়স্কও এই অবস্থায় হয়েছে। আর جُنُوْنٌ عَارِضِىٌّ হলো প্রাপ্তবয়স্ক ভালো অবস্থায় হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

وَمَنْ لَمْ يَنْوِ فِيْ رَمَضَانَ كُلِّهِ لَا صَوْمًا وَلَا فِطْرًا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَتَأَدّٰى صَوْمُ رَمَضَانَ بِدُوْنِ النِّيَّةِ فِيْ حَقِّ الصَّحِيْحِ الْمُقِيْمِ لِاَنَّ الْاِمْسَاكَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فَعَلٰى اَيِّ وَجْهٍ يُؤَدِّيْهِ يَقَعُ عَنْهُ كَمَا اِذَا وَهَبَ كُلَّ النِّصَابِ لِلْفَقِيْرِ وَلَنَا اَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْاِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ وَلَا عِبَادَةَ اِلَّا بِالنِّيَّةِ وَفِيْ هِبَةِ النِّصَابِ وُجِدَ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ عَلٰى مَا مَرَّ فِي الزَّكٰوةِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি পূর্ণ রমজান [বিরতি পালন সত্ত্বেও] রোজা রাখার বা না রাখার কোনো নিয়ত করেনি, তার উপর পূর্ণ রমজানের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম জুফার (র.) বলেন, রমজানের রোজা সুস্থ, মুকীম ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিয়ত ছাড়াই আদায় হয়ে যাবে। কেননা সংযম পালন তার উপর অপরিহার্যকৃত বিষয়। সুতরাং যেভাবেই সে তা আদায় করবে, তা তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেমন [নিয়ত ছাড়া] কেউ পূর্ণ নিসাব কোনো ফকিরকে দান করে দিল [তবে জাকাত আদায় হয়ে যাবে]। আমাদের দলিল এই যে, বান্দার উপর ফরজকৃত বিষয় হলো ইবাদত হিসেবে সংযম পালন করা। আর নিয়ত ছাড়া ইবাদত করা হয় না। আর পুরা নিসাব দান করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছওয়াবের নিয়ত বিদ্যমান রয়েছে। জাকাত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি রমজানের দিনে রমজানের আহার-বিহার থেকে বিরত থাকে, কিন্তু সে রোজা রাখার বা না রাখার কিছুই নিয়ত করেনি। এখন এই ব্যক্তি যদি মুসাফির বা অসুস্থ হয় তবে সকলের মতে কাজা করা ওয়াজিব। আর যদি সুস্থাবস্থায় মুকীম হয় তবে আমাদের মতে কাজা ওয়াজিব, কিন্তু ইমাম জুফার (র.)-এর মতে কাজা করা ওয়াজিব নয়। ইমাম জুফার (র.)-এর মাজহাব এই যে, রমজানের রোজা সুস্থ মুকীম ব্যক্তির ক্ষেত্রে রোজার নিয়ত ছাড়াও আদায় হয়ে যায়। তার দলিল এই যে, রমজানের দিনে খানাপিনা এবং সঙ্গম থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তাই যেমনিভাবেই এই রোজা আদায় করা হয় আদায় হয়ে যাবে। নিয়ত করুক বা না করুক। যেমন– কোনো ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুরো নিসাব কোনো ফকিরকে দান করে দিল, কিন্তু জাকাত আদায় করার নিয়ত করেনি তাহলেও জাকাত আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি রমজানের দিনে নিয়ত ছাড়া আহার-বিহার থেকে বিরতি পাওয়া যায় তবে এর দ্বারা রমজানের রোজা আদায় হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল এই যে, রমজানের দিনে খানাপিনা এবং সঙ্গম থেকে বিরত থাকা শর্তহীনভাবে ওয়াজিব নয়; বরং ইবাদত হিসেবে বিরত থাকার নামই হলো ইবাদত। আর বিনা নিয়তে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা ইবাদত নয়। আর উপরিউক্ত আলোচিত মাসআলায় বলা হয়েছে যে, সে নিয়ত করেনি। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবাদতের রোজা আদায় করেনি। আর যখন ইবাদতের রোজা আদায় করেনি তখন তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। পুরো নেসাবকে দান করার মধ্যে ইবাদতের নিয়ত পাওয়া গেছে। কেননা হয়তো সে ছওয়াব লাভের জন্য ফকিরকে মাল দান করেছে। সুতরাং যখন ইবাদতের নিয়ত পাওয়া গেছে তখন জাকাতও আদায় হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনা জাকাত অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।

وَمَنْ اَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فَاَكَلَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ زُفَرُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِاَنَّهُ يَتَاَدّٰى بِغَيْرِ النِّيَّةِ عِنْدَهُ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) اِذَا اَكَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِاَنَّهُ فَوَّتَ اِمْكَانَ التَّحْصِيْلِ فَصَارَ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْكَفَّارَةَ تَعَلَّقَتْ بِالْاِفْسَادِ وَهٰذَا اِمْتِنَاعٌ اِذْ لَا صَوْمَ اِلَّا بِالنِّيَّةِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রোজার নিয়ত না করেই ভোর করেছে। এরপর আহার করেছে, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর ইমাম জুফার (র.) বলেন, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা তাঁর মতে নিয়ত ছাড়া রোজা আদায় হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জাওয়ালের পূর্বে যদি আহার করে তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা সে ফরজ আদায়ের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে গসবকারীর ন্যায় হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো ফাসেদ করার সাথে। কিন্তু এটাতো বিরত থাকা। কেননা নিয়ত ছাড়া রোজাই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা এই যে, এক ব্যক্তি রমজানের মধ্যে রোজার নিয়ত না করে ভোর করেছে। অতঃপর ভোর বেলায় কিছু পানাহার করেছে– জাওয়ালের পূর্বে বা পরে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তবে কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম জুফার (র.)-এর মতে কাজার সাথে কাফফারাও ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, যদি জাওয়ালের পূর্বে রোজা ভঙ্গ করে তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি জাওয়ালের পর রোজা ভঙ্গ করে তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম জুফার (র.)-এর দলিল এই যে, তার মতে রমজানের রোজা যেহেতু নিয়ত ছাড়া আদায় হয়ে যায় এজন্য বলা হবে যে, রোজা শরয়ীভাবে ওয়াজিব হয়েছিল তা সে তঙ্গ করে ফেলেছে। আর স্বেচ্ছায় রমজানের রোজা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয় এজন্য এ সুরতেও কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর এই মাসআলাটি এমন যেমন নিয়তের সাথে রোজা রেখে ভঙ্গ করে ফেলেছে।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, জাওয়ালের পূর্বেই নিয়ত করে রোজা রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু যখন সে জাওয়ালের পূর্বে কিছু আহার করে ফেলেছে তাই সে রোজার সম্ভাবনাকে নষ্ট করা এমন, যেমন রোজা রেখে তঙ্গ করে দিয়েছে। রোজা রেখে ভঙ্গ করা কাফফারার সবব বা কারণ, তাই এই সুরতেও কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর এটি غَاصِبُ الْغَاصِبِ তথা গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে গসবকারীর ন্যায় হলো। যেমন– জায়েদ খালিদের কোনো কিছু গসব করল, তখন জায়েদের উপর ঐ গসবকৃত বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু সে ফিরিয়ে দিল না। এক পর্যায়ে জায়েদ থেকে হামেদ বস্তুটি গসব করে ধ্বংস করে দিল। এতে হামেদ গসবকৃত বস্তুটি ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিল। এখন খালিদের জায়েদ গাসেব থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার অধিকার আছে। এমনিভাবে হামেদ غَصِبُ الْغَاصِبِ থেকেও ক্ষতি পূরণ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু এ কারণে নয় যে, হামেদ খালিদ থেকে বস্তুটি গসব করেছে; বরং এই কারণে যে, হামেদ ঐ বস্তুটিকে মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আর সম্ভাবনাময় বস্তুকে নষ্ট করা এমন যেমন বস্তুকেই নষ্ট করা। যেন হামেদ খালিদ থেকে একটি বস্তু গসব করে নষ্ট করে দিল। আর গাসেব যদি গসবকৃত বস্তুকে নষ্ট করে দেয় তবে তার উপর ক্ষতি পূরণ দেওয়া ওয়াজিব হয়। এজন্য হামেদ غَاصِبُ الْغَاصِبِ-এর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করা হবে। সুতরাং এমনিভাবে জাওয়ালের পূর্বে পানাহার করে ঐ ব্যক্তি রোজার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আর রোজার সম্ভাবনাকে নষ্ট করা মূলত রোজাকেই নষ্ট করার নামান্তর। আর রোজাকে নষ্ট করা এবং ভঙ্গ করার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয়। এজন্য জাওয়ালের পূর্বে রোজা ভঙ্গ করার সুরতে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর জাওয়ালের পরে রোজা ভঙ্গ করার সুরতে যেহেতু রোজা অর্জনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করা লাজিম আসে না। কেননা, জাওয়ালের পর রোজার নিয়তের সময় নেই। এজন্য জাওয়ালের পর রোজা ভঙ্গ করার সুরতে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, কাফফারা ওয়াজিব হয় স্বেচ্ছায় রোজা ভঙ্গ করার দ্বারা। আর রোজা ভঙ্গ করার দাবি হলো যে, রোজা পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। আর রোজা নিয়ত ছাড়া বিদ্যমান হতে পারে না। সুতরাং মতনে বর্ণিত সুরতের মধ্যে রোজার নিয়ত না করার কারণে রোজাই পাওয়া যায়নি। আর যখন রোজা পাওয়া যায়নি, তখন ভঙ্গ করা হবে কোত্থেকে? বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যাবে যে, এই ব্যক্তি রোজা রাখা হতে বিরত রইল। আর এ কথা সকলেরই জানা যে, রোজা ভঙ্গ করার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হয়। রোজা না রাখার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হয় না। বুঝা গেল, এই সুরতে কাফফারা ওয়াজিব হয় না।

وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ لِأَنَّهَا تَحْرَجُ فِىْ قَضَائِهَا وَقَدْ مَرَّ فِى الصَّلٰوةِ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِىْ بَعْضِ النَّهَارِ اَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ كُلُّ مَنْ صَارَ اَصْلًا لِلُّزُوْمِ وَلَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ فِىْ اَوَّلِ الْيَوْمِ هُوَ يَقُوْلُ التَّشَبُّهُ خَلَفٌ فَلَا يَجِبُ اِلَّا عَلٰى مَنْ يَتَحَقَّقُ الْاَصْلُ فِىْ حَقِّهِ كَالْمُفْطِرِ مُتَعَمِّدًا اَوْ مُخْطِئًا وَلَنَا اَنَّهُ وَجَبَ قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ لَا خَلَفًا لِاَنَّهُ وَقْتٌ مُعَظَّمٌ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ حَالَ قِيَامِ هٰذِهِ الْاَعْذَارِ لِتَحَقُّقِ الْمَانِعِ عَنِ التَّشَبُّهِ حَسْبَ تَحَقُّقِهِ عَنِ الصَّوْمِ .

অনুবাদ : রোজা অবস্থায় যদি স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় কিংবা সন্তান প্রসব করে তাহলে সে রোজা রাখবে না এবং পরে তার কাজা করতে হবে। নামাজের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, [সংখ্যাধিক্যের কারণে] নামাজ কাজা করতে হলে সে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। নামাজ অধ্যায়ে এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। মুসাফির যদি রমজানের দিবসের কোনো অংশে [বাড়িতে] ফিরে আসে কিংবা ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীলোক যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে দিনের অবশিষ্ট অংশ তারা বিরতি পালন করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিরতি পালন ওয়াজিব নয়। আর এই মতপার্থক্য রয়েছে ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যারা রোজা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। অথচ দিবসের শুরুতে তাদের যোগ্যতা ছিল না। তিনি বলেন, সাদৃশ্যের অবলম্বন হলো মূলের স্থলবর্তী। সুতরাং এটি তার উপরই ওয়াজিব হবে, যার উপর মূল রোজা ওয়াজিব হয়েছিল। যেমন– কেউ রোজা ভেঙ্গে ফেলল ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত। আমাদের দলিল এই যে, তা ওয়াজিব হয়েছে সময়ের হক আদায়ের জন্য, স্থলবর্তী হিসেবে নয়। কেননা, এটি হলো মর্যাদাপূর্ণ সময়। ঋতুগ্রস্ত, নিফাসগ্রস্ত, অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তিগণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এ সকল ওজর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদের উপর বিরতি পালন ওয়াজিব নয়। কেননা, এগুলো রোজার ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধক তেমনি সাদৃশ্যের ক্ষেত্রেও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : রমজান মাসে যদি কোনো স্ত্রীলোকের হায়েজের রক্ত আসে কিংবা বাচ্চা প্রসব করে, তবে তার হুকুম এই যে, হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় রোজা রাখবে না। রমজানের পর এই রোজাগুলোর কাজা করবে। নামাজের বিষয়টি এর বিপরীত। অর্থাৎ হায়েজ ও নিফাসের কারণে রোজার কাজা বাদ হবে না। তবে নামাজের কাজা বাদ হয়ে যাবে। পার্থক্যের কারণ এই যে, নামাজের আধিক্য এবং প্রত্যেক মাসে হায়েজের মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার কারণে কাজা আদায়ে কষ্ট হবে। আর ইসলামি শরিয়ত কষ্টকে দূর করেছে। এই মতানৈক্যটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে দিনের কোনো অংশে পূর্ণ রোজার যোগ্য হয়ে যায়। যেমন– কাফির মুসলমান হয়ে গেল বা বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেল, বা মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে গেল। তবে আমাদের মতে তাদের উপর দিনের অবশিষ্ট অংশে বিরতি পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই যে, রোজাদারদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হলো রোজার স্থলবর্তী। আর কায়দা

আছে, স্থলবর্তী তার উপর ওয়াজিব হয় যার উপর মূল ওয়াজিব হয়। আর যার উপর মূল ওয়াজিব নয় তার উপর স্থলবর্তীও ওয়াজিব নয়। সুতরাং যখন মুসাফির ও ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীলোকের উপর মূল অর্থাৎ রোজা ওয়াজিব নয় তখন তার স্থলবর্তী অর্থাৎ বিরতি পালন করা কিভাবে ওয়াজিব হবে? যেমন- কেউ যদি ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত রোজা ভেঙ্গে দেয় সে সন্দেহের দিনে (يَوْمُ الشَّكِّ) কিছু পানাহার করেছে তারপর জানা গেল যে, আজকে তো রমজান। বা এই ভেবে সাহরী খেলো যে, এখনো রাত বাকি আছে। অথচ পরবর্তীতে জানা হলো যে, ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তাই যেহেতু স্বেচ্ছায় বা ভুলবশত রোজা ভঙ্গকারীর উপর মূল বা রোজা ওয়াজিব ছিল তাই রোজা ভঙ্গ করার পর তার উপর তার স্থলবর্তী তথা বিরতি পালনও ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল এই যে, রোজাদারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা রোজার স্থলবর্তী নয়। কেননা রোজাদারদের সাথে সাদৃশ্য দিনের কিয়দংশে পাওয়া গেছে। আর রোজা হলো পুরো দিন। কিছু অংশ পূর্ণ অংশের স্থলবর্তী হয় না। সুতরাং বুঝা গেল, দিনের কিয়দংশে পানাহার থেকে বিরত থাকা রোজার স্থলবর্তী হওয়ার কারণে নয়; বরং সময় তথা রমজানের হক আদায় করার জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা, রমজানের দিন হলো একটি মর্যাদাপূর্ণ সময়। এ কারণে রমজানের রোজা স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয়। আর রমজান ছাড়া অন্য সময়ে বিনষ্ট করার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ -

অর্থ-যে ব্যক্তি রমজানে কোনো নফল কাজ করে সে যেন অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি রমজানে একটি ফরজ আদায় করল সে যেন রমজান ছাড়া অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করল। মোট কথা রমজানের দিন যেহেতু একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন তাই রমজানের দিনের হক আদায় করা ওয়াজিব। এখন কোনো ব্যক্তি যদি রোজার যোগ্য হয় তাহলে রোজা রেখে তার হক আদায় করবে। আর যদি রোজার যোগ্য না হয় তবে পানাহার থেকে বিরত থেকেই তার হক আদায় করবে। আর এই পানাহার থেকে বিরত থাকা যেহেতু রোজার স্থলবর্তী নয় এজন্য তার ওয়াজিব হওয়া মূল তথা রোজার ওয়াজিব হওয়ার উপরই নির্ভরশীল হবে। আর যখন তার ওয়াজিব হওয়া রোজার ওয়াজিব হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয় তখন পানাহার থেকে বিরতি পালন করা তার উপরও ওয়াজিব করা হবে যার উপর রোজা ওয়াজিব নয়। এর বিপরীত ঋতুগ্রস্ত স্ত্রলোক, নিফাসওয়ালী নারী এবং অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির এদের উপর তাদের ওজর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিরতি পালন করা ওয়াজিব নয়। কেননা উপরিউক্ত ওজরগুলো, [হায়েজ, নিফাস, সফর, অসুস্থতা] যেমনিভাবে রোজা রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক তেমনিভাবে রোজাদারদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক। সুতরাং ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও নিফাসওয়ালী নারীর ক্ষেত্রে রোজাদারদের সাথে সাদৃশ্য এজন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের উপর রোজা হারাম। আর হারাম কাজের সাদৃশ্যও হারাম। এজন্য তাদের ক্ষেত্রে রোজাদারদের সাথে সাদৃশ্য হারাম। আর অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে রোজাদারদের সাথে সাদৃশ্য এ কারণে নিষিদ্ধ যে, তাদের উভয়ের জন্য রোজা ভঙ্গ করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে কষ্ট দূর করার জন্যে। সুতরাং তাদের উপর যদি রোজাদারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করাকে অবধারিত করা হয় তবে نَقْضِ مَوْضُوْع [আলোচ্যসূচির বিরোধিতা] করা জরুরি হবে। অর্থাৎ রোজা না রাখার অবকাশ অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরকে কষ্ট দূর করার জন্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রোজাদারদের সাদৃশ্যকে জরুরি করে পুনরায় কষ্টে নিপতিত করা হয়েছে। এটাই হলো نَقْضِ مَوْضُوْع

قَالَ وَإِذَا تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ قَدْ طَلَعَ أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرٰى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَغْرُبْ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ أَوْ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ حَقٌّ مَضْمُوْنٌ بِالْمِثْلِ كَمَا فِي الْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَاصِرَةٌ لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَفِيْهِ قَالَ عُمَرُ (رض) مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ قَضَاءُ يَوْمٍ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ الْفَجْرُ الثَّانِيْ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الصَّلٰوةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি এই মনে করে সাহ্‌রী খায় যে, এখন ফজর হয়নি, কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেলো যে, আসলে তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল, কিংবা কেউ এ কথা মনে করে ইফতার করল যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে, কিন্তু পরে জানা গেল যে, সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, তাহলে ঐ দিনের অবশিষ্ট সময় সে বিরতি পালন করবে। উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব সময়ের মর্যাদা রক্ষা করা কিংবা অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকা। তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব। কেননা রোজা আদায় করার হুকুম এমন একটি হক, যা অনুরূপ আমলের মাধ্যমে আদায় করা তার জিম্মায় রয়েছে। যেমন– অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে। তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়। কেননা, ইচ্ছা না থাকায় অপরাধ এখানে লঘু। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, গুনাহ করার মনোবৃত্তি আমাদের ছিল না আর একদিনের রোজা কাজা করা আমাদের পক্ষে সহজ। উল্লিখিত ফজর দ্বারা দ্বিতীয় ফজর [সুবহে সাদিক] উদ্দেশ্য। সালাত অধ্যায়ে আমরা তা ব্যাখ্যা করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : রমজানের রাতে কেউ এই ধারণা করে সাহ্‌রী খেল যে, এখনো সুবহে সাদিক হয়নি। পরে জানা গেল যে, সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছিল। অথবা কেউ এ কথা মনে করে ইফতার করল যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে। পরবর্তীতে জানা গেল যে, সূর্য তখনো অস্ত যায়নি, তবে এই দুই সুরতে দিনের অবশিষ্ট অংশে বিরতি পালন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রথম সুরতে তো আনুমানিক পূর্ণ দিনের বিরতি পালন করা ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় সুরতে সূর্য অস্ত যাওয়ার যতটুকু সময় বাকি থাকে তার বিরতি পালন করা ওয়াজিব এবং ঐ দিনের রোজার কাজা ওয়াজিব। কিন্তু এই ব্যক্তি তার উক্ত কাজের দ্বারা গুনাহ্‌গার হবে না এবং তার উপর কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। এই উভয় সুরতে বিরতি পালন করা এ কারণে ওয়াজিব যে, যাতে রমজানের দিনের হক যথাসম্ভব আদায় হয়ে যায়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বের মাসআলায় আলোচিত হয়েছে। কিংবা অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য। কেননা, সে যদি কোনো কিছু পানাহার করে এবং বাহ্যত কোনো ওজরও নেই। তবে লোকেরা তাকে পাপাচারের বা অন্যায়ের তোহ্‌মত দেবে। আর তোহ্‌মতের অভিযোগ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে– اِتَّقُوْا مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ আর কাজা এ কারণে ওয়াজিব যে, রোজা এমন একটি শরয়ী হক যা مَضْمُوْنٌ بِالْمِثْلِ তথা অনুরূপ আমলের মাধ্যমে আদায় করা তার জিম্মায় বর্তায়। অর্থাৎ আদায় ছুটে গেলেও বাদ যাবে না; বরং শরয়ীভাবে ضَمَانٌ بِالْمِثْلِ তথা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ রোজার পরিবর্তে রোজা ওয়াজিব হবে। যেমন– অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে জিমান (ضَمَانٌ) ওয়াজিব হয়। আর কাফফারা এ কারণে ওয়াজিব হবে না যে, এটি লঘু অপরাধ। কেননা সুবহে সাদিকের পর আহার করা বা সূর্য অস্তের পূর্বে ইফতার করা তার ইচ্ছাপূর্বক ছিল না; বরং সে রাত মনে করে সাহরী খেয়েছে, সূর্য অস্তের ধারণা করে ইফতার করেছে।

মোট কথা অপরাধটি লঘু। আর লঘু অপরাধের কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য জুরমে কামিল তথা পরিপূর্ণ অপরাধের প্রয়োজন। এর সমর্থন হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্য দ্বারাও পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, একবার রমজান মাসে সন্ধ্যাবেলায় হযরত ওমর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম কুফার মসজিদের বারান্দায় বসা ছিলেন। ইত্যবসরে এক পেয়ালা দুধ আনা হলো। তিনি নিজেও পান করেন এবং সাহাবাগণও পান করলেন। অতঃপর মুয়াজ্জিনকে বললেন, যাও আজান দাও। মুয়াজ্জিন যখন আজান দিতে উপরে উঠলো দেখল যে, এখনো সূর্য অস্ত যায়নি। সে চিৎকার দিয়ে বলল– وَالشَّمْسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! সূর্য এখনো আছে, অস্ত যায়নি। হযরত ওমর (রা.) বললেন–

بَعَثْنَاكَ دَاعِيًا وَلَمْ نَبْعَثْكَ رَاعِيًا مَا تَجَانَفْنَا لِاِثْمٍ قَضَاءُ يَوْمٍ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ .

অর্থ–আমরা তোমাকে আহ্বানকারীরূপে প্রেরণ করেছি; রাখাল বানিয়ে পাঠাইনি। [আমরা আল্লাহ না চাহেত] গুনাহর ইচ্ছা করিনি। আমাদের জন্য একটি রোজা কাজা করা সহজ।

উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, এমন ইজতিহাদী ভুল দ্বারা যদি রোজা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে শুধু কাজা ওয়াজিব হবে। গুনাহগার হবে না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বললেন–

مَنْ كَانَ اَفْطَرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَمْ يَكُنْ اَفْطَرَ فَلْيُتِمَّ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

অর্থাৎ যখন মুয়াজ্জিন বলল যে, এখনো সূর্য অস্ত যায়নি, তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, "যে রোজা ভেঙ্গে ফেলেছে সে তার স্থলে একটি রোজা রাখবে অর্থাৎ কাজা করবে। আর যে রোজা ভঙ্গ করেনি সে পুরা করবে। এমনকি সূর্য অস্ত যাবে।"

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, مَتْنٌ -এর মধ্যে ফজর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজরে ছানী অর্থাৎ সুবহে সাদিক।

ثُمَّ التَّسَحُّرُ مُسْتَحَبٌّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً وَالْمُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُرْسَلِيْنَ تَعْجِيْلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَالسِّوَاكُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ وَمَعْنَاهُ تَسَاوِى الظَّنَّيْنِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَدَعَ الْأَكْلَ تَحَرُّزًا عَنِ الْمُحَرَّمِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ وَلَوْ أَكَلَ فَصَوْمُهُ تَامٌّ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ اللَّيْلُ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) إِذَا كَانَ فِيْ مَوْضَعٍ لَا يَسْتَبِيْنُ الْفَجْرُ أَوْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً أَوْ مُتَغَيِّمَةً أَوْ كَانَ بِبَصَرِهِ عِلَّةٌ وَهُوَ يَشُكُّ لَا يَأْكُلُ وَلَوْ أَكَلَ فَقَدْ أَسَاءَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ وَالْفَجْرُ طَالِعٌ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ عَمَلًا بِغَالِبِ الرَّأْيِ وَفِيْهِ الْإِحْتِيَاطُ وَعَلٰى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْيَقِيْنَ لَا يَزَالُ إِلَّا بِمِثْلِهِ -

অনুবাদ : আর সাহ্‌রী খাওয়া মোস্তাহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً 'তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা, সাহ্‌রীতে বরকত রয়েছে।' সাহরীকে বিলম্বিত করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُرْسَلِيْنَ تَعْجِيْلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَالسِّوَاكُ "তিনটি বিষয় রাসূলগণের আচরণের অন্তর্ভুক্ত– ইফতার ত্বরান্বিত করা, বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং মিসওয়াক করা।" তবে যদি ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয় তথা ফজর উদয় হয়েছে কি হয়নি অর্থাৎ উভয় দিকের ধারণা সমান হয়, তখন পানাহার পরিহার করাই উত্তম। যাতে হারাম থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু তার উপর তা ওয়াজিব নয়। সুতরাং যদি পানাহার করে তবে তার রোজা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা রাত্র বিদ্যমান থাকাই হলো মূল অবস্থা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি সে এমন কোনো স্থানে থাকে যেখানে ফজর বোঝা যায় না, কিংবা পূর্ণিমার রাত হয় কিংবা মেঘাচ্ছন্ন রাত হয় কিংবা তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয় আর এই সকল কারণে তার সন্দেহ হয়, তাহলে পানাহার করবে না। যদি করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ "যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা পরিহার করে ঐ বিষয় গ্রহণ করো, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না।" যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে ফজর উদয় হওয়া অবস্থায় পানাহার করেছে, তাহলে প্রবল ধারণার উপর আমল হিসেবে কাজা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। এতেই সতর্কতা রয়েছে। তবে জাহির রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার উপর কাজা নেই। কেননা, কোনো নিশ্চিত বিষয় অনুরূপ নিশ্চিত বিষয় ছাড়া বিলুপ্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাহার (سَحَر) শেষ রাতের নামবিশেষ। কেউ কেউ বলেছেন, রাতের শেষ ষষ্ঠাংশ (سُدُسُ الْأَخِيْر), সুহূর (سُحُوْر) ঐ বস্তুর নাম, যা ঐ সময় আহার করা হয়। মোট কথা সাহারী খাওয়া মোস্তাহাব। দলিল হলো এই হাদীস تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً উক্ত হাদীসে বরকত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগামীকালের রোজার উপর শক্তি অর্জন করা। হাদীসটির অর্থ হলো, সাহরী খাও, কেননা সাহরী খেলে শক্তি আহরিত হয়। এর সমর্থন নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা পাওয়া যায়–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِسْتَعِيْنُوْا بِقَائِلِهِ النَّهَارَ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ وَبِأَكْلِ السَّحَرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ -

"দিনে কায়লূলা ও আরাম করে রাতের সাহায্য অনুসন্ধান করো। আর সাহরী খাওয়ার দ্বারা দিনের রোজার সাহায্য অনুসন্ধান করো।" অর্থাৎ দিনে কিছু আরাম কারো, যাতে রাতে নামাজ পড়তে শক্তি পাওয়া যায়। আর সাহারী খাও তাহলে দিনের রোজা পালনে শক্তি পাওয়া যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসের মধ্যে বরকত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অধিক ছওয়াব অর্জন করা। কেননা, সাহরী খাওয়া নবীগণের সুন্নত। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, আম্বিয়াগণের সুন্নতের উপর আমল করা অধিক ছওয়াব লাভের কারণ। এ জন্য 'বরকত' শব্দ দ্বারা অধিক ছওয়াবও উদ্দেশ্য হতে পারে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সাহরীকে বিলম্বিত করা মোস্তাহাব। দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস–

ثَلَاثٌ مِنْ اَخْلَاقِ الْمُرْسَلِيْنَ تَعْجِيْلُ الْاِفْطَارِ وَتَاخِيْرُ السُّحُوْرِ وَالسِّوَاكُ ـ

"তিনটি বিষয় রাসূলগণের আদতের অন্তর্ভুক্ত– ১. ইফতার ত্বরান্বিত করা, ২. বিলম্বে সাহরী খাওয়া, ৩. মিসওয়াক করা।"
উক্ত হাদীসের উপর বাহ্যত একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সাহরী খাওয়া মুসলমান ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সাহরীতে বিলম্ব করা নবী ও রাসূলগণের আচরণ বা আদতের অন্তর্ভুক্ত কিভাবে হয়? তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ইরশাদ করেছেন– فَرْقُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلُ السُّحُوْرِ "আমাদের ও আহলে কিতাবদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।" উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হলো যে, পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে সাহরী খাওয়ার প্রচলন ছিল না। সুতরাং যখন পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে সাহ্‌রী ছিল না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– ثَلَاثٌ مِنْ اَخْلَاقِ الْمُرْسَلِيْنَ এটা কিভাবে ঠিক হতে পারে?
উক্ত প্রশ্নের এক জবাব তো এই যে, উভয় হাদীসে কোনো সংঘাত নেই। কেননা, হতে পারে পূর্ববর্তী নবীগণ সাহরী খেতেন, কিন্তু তাদের উম্মতের জন্য সাহরী ছিল না। সুতরাং এখন প্রথম হাদীসের মধ্যে সাহ্‌রীর বিলম্বীকরণকে রাসূলগণের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত বলা এবং আহলে ইসলাম ও আহলে কিতাবদের মধ্যকার সাহরী খাওয়া পার্থক্যরূপে ধরে নেওয়া উভয়টিই ঠিক।
অন্য একটি জবাব 'ইনায়া' ইত্যাদি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত পরিসরের কারণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, নিঃসন্দেহে সাহরী খাওয়া মোস্তাহাব। কিন্তু যদি ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, ফজর উদয় হয়েছে কি হয়নি এবং উভয় দিকের সম্ভাবনা সমান হয়, তবে উত্তম হলো এই যে, পানাহার বর্জন করবে এবং কোনো সুগন্ধিযুক্ত বস্তু ব্যবহার করবে না। তাহলে নিশ্চয়তার সাথে হারাম কর্ম থেকে বাঁচা যাবে। এই পানাহার বর্জন করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর যদি সন্দেহ সত্ত্বেও কিছু পানাহার করে ফেলে তবে তার রোজা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা মূল তো হলো রাত। তাই ঐ মূলের হুকুমই বহাল থাকবে। যতক্ষণ তার বিপরীত অর্থাৎ ফজরের প্রবল ধারণা সৃষ্টি না হয়। যদি খাওয়ার পর তার মনে এই প্রবল ধারণা হয় যে, আমি ফজর উদিত হওয়ার পর খেয়েছি, তবে তার উপর ঐ রোজার কাজা ওয়াজিব হবে।
ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে 'নাওয়াদির' -এর মধ্যে এই বর্ণনা রয়েছে যে, যদি ঐ ব্যক্তি এমন স্থানে হয় যেখানে ফজর উদিত হওয়া বুঝা যায় না। যেমন– পাহাড়ে অবস্থানরত কিংবা পূর্ণিমার রাত হয়। অর্থাৎ এমন রাত যার মধ্যে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সূর্য থাকে এবং চাঁদের আলোর কারণে ফজর উদয় হওয়া বুঝা যায় না। কিংবা রাত মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে ফজর বুঝা যায় না। কিংবা ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয় যদ্দরুন ফজর উদিত হওয়াকে দেখে না এবং তার ফজর উদিত হওয়া বা না হওয়া একই রকম মনে হয়, তবে তার সাহরী না খাওয়া উচিত। আর যদি সাহ্‌রী খায় তবে খারাপ কাজ করবে [গুনাহ্‌গার হবে]। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ 'সন্দেহযুক্ত বস্তু পরিহার করে সন্দেহমুক্ত বস্তু গ্রহণ করো।' আর যদি তার এই প্রবল ধারণা হয় যে, আমি ফজর উদিত হওয়ার পর সাহরী খেয়েছি তাহলে তার উপর ঐ দিনের রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা প্রবল ধারণার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর এরই মধ্যে সতর্কতা নিহিত। তবে জাহির রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার উপর কাজা ওয়াজিব নয়। কেননা রাতের অস্তিত্ব হলো মৌলিক ও ইয়াকীনী আর নিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত বিষয় দ্বারা বিলুপ্ত হয়; অ-নিশ্চিত বিষয় দ্বারা নয়। প্রবল ধারণা নিশ্চিত বিষয় নয়। সুতরাং রাতের অস্তিত্ব যা নিশ্চিত তা তখন বিলুপ্ত হবে যখন ফজর উদিত হওয়া নিশ্চিত হবে। প্রবল ধারণা দ্বারা বিলুপ্ত হবে না। সুতরাং যখন প্রবল ধারণা দ্বারা রাত হওয়া বিলুপ্ত হলো না তাই সে সাহরী রাতে খেয়েছে। ফজর উদিত হওয়ার পর খায়নি। আর যখন সাহরী রাতে খাওয়া হয়েছে তখন তার এই রোজা শরয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যখন এই রোজা গ্রহণযোগ্য হবে তখন তার কাজা ওয়াজিব হবে না।

وَلَوْ ظَهَرَ اَنَّ الْفَجْرَ طَالِعٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ بَنَى الْاَمْرَ عَلَى الْاَصْلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَمْدِيَّةُ وَلَوْ شَكَّ فِى غُرُوْبِ الشَّمْسِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ لِاَنَّ الْاَصْلَ هُوَ النَّهَارُ وَلَوْ اَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَمَلًا بِالْاَصْلِ وَاِنْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهِ اَنَّهُ اَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ رِوَايَةً وَاحِدَةً لِاَنَّ النَّهَارَ هُوَ الْاَصْلُ وَلَوْ كَانَ شَاكًّا فِيْهِ وَتَبَيَّنَ اَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ يَنْبَغِىْ اَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ نَظَرًا اِلَى مَا هُوَ الْاَصْلُ وَهُوَ النَّهَارُ ـ

অনুবাদ : যদি প্রকাশ পায় যে, ফজর উদিত হয়েছে, তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে মূল অবস্থার উপর বিষয়টির ভিত্তি করেছে। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার সাব্যস্ত হয় না। যদি সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে তার জন্য ইফতার করা জায়েজ হবে না। কেননা এখানে দিন অব্যাহত থাকাই হলো মূল অবস্থা। আর যদি পানাহার করে তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে, মূল অবস্থা কার্যকর করার প্রেক্ষিতে। আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সে ফজরের সূর্যাস্তের পূর্বে পানাহার করেছে তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে একই বর্ণনা রয়েছে। [এতে কোনো দ্বিমত নেই] কেননা দিবস অব্যাহত থাকাই হলো মূল অবস্থা। যদি এ বিষয়ে সন্দিহান হয় আর পরে প্রকাশ পায় যে, সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে মূল অবস্থার অর্থাৎ দিবস অব্যাহত থাকার দিকে লক্ষ করে কাফফারা ওয়াজিব হওয়াই উচিত। [এভাবে বলার কারণ এই যে, বিষয়টিতে মাশায়েখগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি সাহরী খাওয়ার পর জানা যায় যে, সাহরী খাওয়ার পূর্বেই ফজর উদিত হয়েছিল তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সে এই ভেবে সাহ্‌রী খেয়েছিল যে, এখনো রাত বাকি আছে। সুতরাং যখন এই ভেবে সাহরী খেয়েছে তখন ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা সাব্যস্ত হয় না। আর যখন ইচ্ছাকৃত পানাহার করা পাওয়া যায়নি তখন কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা ইচ্ছাকৃত পানাহার করার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ فِىْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ الخ : মাসআলা এই যে, যদি রোজাদার ব্যক্তির সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ হয়। অর্থাৎ অস্ত যাওয়া-না যাওয়া উভয়দিক একই রকম [বরাবর] হয় তবে তার রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নেই। কেননা মূল তো হলো দিন অব্যাহত থাকা। কেননা দিন প্রথম থেকেই চলে আসছে। তাই দিন হওয়াটা নিশ্চিত হলো। আর এক নিশ্চিত অপর নিশ্চিত দ্বারাই বিলুপ্ত হয়; সন্দেহ দ্বারা বিলুপ্ত হয় না। সুতরাং যেহেতু দিনের অস্তিত্ব নিশ্চিত এজন্য রোজা ভঙ্গ করাও হালাল হবে না। তা ছাড়া রোজা ভঙ্গ করা হালালও ছিল না। যদি সে কিছু আহার করে তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। তাহলে মূলের উপর আমল হয়ে যাবে। কেননা মূল তো হলো এটাই যে, দিন অব্যাহত থাকবে। আর যদি তার এই প্রবল ধারণা থাকে যে, সে সূর্যাস্তের পূর্বে আহার করেছে তবে সকল বর্ণনা মতে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা দিন হওয়া তো মূল ছিল, কিন্তু তার সাথে প্রবল ধারণাও মিশে গেছে তাই অবশ্যই কাজা ওয়াজিব হবে। আর যদি তার সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং রোজা ভঙ্গ করে দেয়, পরে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, সূর্যাস্ত হয়নি। তবে উচিত তো হলো তার উপর কাজার সাথে সাথে কাফফারাও ওয়াজিব হওয়া। কেননা, মূল তো এটাই যে, দিন বিদ্যমান থাকবে। আর দলিল দ্বারাও দিন হওয়া অর্থাৎ সূর্য অস্ত না যাওয়া প্রমাণিত হলো। তাই যেন সে ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে রোজা ভঙ্গ করেছে। আর দিনে রোজা ভঙ্গ করা কাজা ও কাফফারা উভয়কে ওয়াজিব করে। এজন্য কাজার সাথে সাথে কাফফারাও ওয়াজিব করা সমীচীন হবে।

وَمَنْ اَكَلَ فِيْ رَمَضَانَ نَاسِيًا وَظَنَّ اَنَّ ذٰلِكَ يُفْطِرُهُ فَاَكَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ لِاَنَّ الْاِشْتِبَاهَ اِسْتَنَدَ اِلَى الْقِيَاسِ فَتَحَقَّقَ الشُّبْهَةُ وَاِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ وَعَلِمَهُ فَكَذٰلِكَ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهَا تَجِبُ وَكَذَا عَنْهُمَا لِاَنَّهُ لَا اِشْتِبَاهَ فَلَا شُبْهَةَ وَجْهُ الْاَوَّلِ قِيَامُ الشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ بِالنَّظَرِ اِلَى الْقِيَاسِ فَلَا يَنْتَفِيْ بِالْعِلْمِ كَوَطْيِ الْاَبِ جَارِيَةَ اِبْنِهِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রমজানের দিনে ভুলে পানাহার করে ফেলল এবং [অজ্ঞতাবশত] ধারণা করে বসল যে, ভুলক্রমে পানাহার রোজা ভঙ্গ করে তাই অতঃপর সে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করল, তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে; কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা তার ধারণা কিয়াসনির্ভর ছিল। [কেননা কিয়াসের দাবি তো এটাই যে, পানাহারের কারণে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়]। সুতরাং এখানে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যদি এতদ্সংক্রান্ত হাদীস তার গোচরে এসেও থাকে এবং সে তা জানতে ও পেরেছে তবুও জাহিরী রেওয়ায়েত মতে একই হুকুম। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি মত বর্ণিত আছে যে, কাফফারা ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। কেননা, এখানে অস্পষ্টতা নেই। সুতরাং সন্দেহেরও অবকাশ নেই। প্রথমোক্ত মতের দলিল এই যে, কিয়াসের দিকে লক্ষ করলে নীতিগত সংশয় অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অবগতির কারণে তা রহিত হবে না। যেমন– পুত্রের দাসীর সঙ্গে পিতার সঙ্গমের বিষয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা এই যে, এক ব্যক্তি রমজানের দিনে ভুলে কিছু পানাহার করে ফেলল। অতঃপর তার খেয়াল হলো যে, ভুলবশত আহার করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই সে ভাবল যে, রোজা তো ভেঙ্গেই গেল, তাই সে স্বেচ্ছায়ও আহার করে ফেলল। তার উপর শুধু কাজা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। দলিল এই যে, ভুলবশত পানাহার দ্বারা রোজা বাকি না থাকার সন্দেহ কিয়াস দ্বারা সৃষ্টি হয়। কেননা কিয়াসের দাবি হলো এই যে, ভুলবশত পানাহার দ্বারা রোজা বাকি থাকবে না। কেননা ঐ সুরতের মধ্যেও রোজার রুকন অর্থাৎ বিরত থাকা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই যখন এই সন্দেহ বিশুদ্ধ কিয়াসের সাথে যুক্ত তখন ভুলবশত আহার দ্বারা রোজা বাকি না থাকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেল। এরপর যখন সে ইচ্ছাকৃত পানাহার করল, তার এই আহার যেন রোজা অবস্থায় হলো না। আর যখন ইচ্ছাকৃত আহার রোজা অবস্থায় হলো না তখন তার উপর কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফফারা তো তখন ওয়াজিব হয় যখন রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত খানাপিনা কিংবা সঙ্গম করা পাওয়া যায়। আর যদি ঐ ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস পৌছে থাকে– مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ "যে ব্যক্তি রোজাদার অবস্থায় রোজার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে ফেলেছে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন" এবং সে হাদীস দ্বারা বুঝেও থাকে যে, ভুলবশত পানাহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সে ভুলবশত পানাহারের পর ইচ্ছাকৃত পানাহার করে ফেলেছে। তবে জাহিরী রেওয়ায়াত অনুযায়ী তার উপরও কাফফারা ওয়াজিব নয়। তবে 'নাওয়াদির'-এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ঐ সুরতে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর একই হুকুম সাহেবাইন থেকেও বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ঐ রেওয়ায়েতের দলিল এই যে, যখন তার ঐ হাদীস জানা ছিল যে, ভুলবশত পানাহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না, তখন তার এটাও জানা আছে যে, হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াস অগ্রহণযোগ্য ও বর্জিত। আর বর্জিত বস্তু কোনো ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই ঐ সুরতেও রোজা না হওয়ার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে না। আর যখন সন্দেহ পাওয়া যায়নি তখন কাফফারাও বাতিল হবে না। জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাফফারা ওয়াজিব না হওয়ার দলিল এই যে, কিয়াসের দিকে তাকালে নীতিগত সংশয় অবশ্যই রয়েছে। আর তা এভাবে যে, কোনো বস্তু তার রুকন ফউত হওয়ার দ্বারা বাকি থাকে না। সুতরাং এর মধ্যে বিজ্ঞ ও অজ্ঞ উভয়েই সমান। অর্থাৎ এ কথা জ্ঞানীও জানে যে, কোনো বস্তু তার রুকন ফউত হওয়ার দ্বারা বাকি থাকে না এবং মূর্খও উক্ত কথা জানে। এজন্য مَنْ نَسِيَ الخ হাদীসটি জানার দ্বারা কিয়াস বাদ যাবে না। যেমন– পিতা যদি নিজের ছেলের দাসীর সাথে সঙ্গম করে তবে পিতার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। পিতা তা হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকুক বা না থাকুক। কেননা হাদীস– اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ-এর কারণে মালিকানার সন্দেহ সুস্পষ্ট। সুতরাং এমনিভাবে ভুলবশত আহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়ার সন্দেহ কিয়াসের দিকে তাকালে বিদ্যমান। সুতরাং যখন সন্দেহ বিদ্যমান, তখন কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সন্দেহ দ্বারা কাফফারা বাদ পড়ে যায়।

وَلَوِ احْتَجَمَ وَظَنَّ اَنَّ ذٰلِكَ يُفْطِرُهُ ثُمَّ اَكَلَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لِاَنَّ الظَّنَّ مَا اسْتَنَدَ اِلٰى دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ اِلَّا اِذَا اَفْتَاهُ فَقِيْهٌ بِالْفَسَادِ لِاَنَّ الْفَتْوٰى دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ فِىْ حَقِّهٖ وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لِاَنَّ قَوْلَ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْزِلُ عَنْ قَوْلِ الْمُفْتِىْ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) خِلَافُ ذٰلِكَ لِاَنَّ عَلَى الْعَامِىِّ الْاِقْتِدَاءُ بِالْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ الْاِهْتِدَاءِ فِىْ حَقِّهٖ اِلٰى مَعْرِفَةِ الْاَحَادِيْثِ وَاِنْ عَرَفَ تَاوِيْلَهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِاِنْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُ الْاَوْزَاعِىِّ (رحـ) لَا يُوْرِثُ الشُّبْهَةَ لِمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ ـ

অনুবাদ : যদি কেউ শিঙ্গা লাগায় আর ধারণা করে যে, তাতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়, এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফেলে তাহলে তার উপর কাজা ও কাফফারা দুটোই ওয়াজিব হবে। কেননা এ ধারণা শরয়ী কোনো দলিলের উপর নির্ভরশীল নয়, তবে যদি কোনো নির্ভরযোগ্য ফকীহ রোজা ফাসিদ হয়েছে বলে কাফফারা দান করে থাকেন। কেননা তার জন্য ফতোয়া শরয়ী দলিলরূপে গণ্য। আর যদি তার নিকট এতদ্সংক্রান্ত হাদীস পৌঁছে থাকে এবং তার উপর সে নির্ভর করে থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। [অর্থাৎ কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী মুফতির ফতোয়া-এর নিম্নে যেতে পারে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.)-এর নিকট থেকে এর বিপরীত মত [অর্থাৎ কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার মত] বর্ণিত হয়েছে। কেননা সাধারণ লোকের পক্ষে যেহেতু হাদীস জানা ও বুঝা সম্ভব নয়, সেহেতু ফকীহ্গণের ইক্তিদা ও অনুসরণ করাই তার অবশ্য কর্তব্য। যদি হাদীসের ব্যাখ্যা জেনে থাকে তাহলে সংশয় রহিত হওয়ার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর কিয়াসের বিপরীত হওয়ার কারণে ইমাম আওযায়ী (র.)-এর মতামত সন্দেহ সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি রোজা অবস্থায় শিঙ্গা লাগায়। তারপর এই ধারণা করে যে, শিঙ্গা লাগানো রোজা ভঙ্গকারী। এজন্য শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে গেল। আর যখন রোজা ভঙ্গ হয়ে গেল, তখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফেলে। এই সুরতে তার উপর কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। কেননা তার এই ধারণা যে, শিঙ্গা লাগানো রোজা ভঙ্গকারী এটি কোনো শরয়ী দলিল নির্ভরশীল নয়; বরং শরয়ী দলিল তো হলো রোজা ভঙ্গ না হওয়া। কারণ, শিঙ্গা লাগানো হলো রগ থেকে রক্ত বের করার অনুরূপ। আর রগ থেকে রক্ত বের করা রোজা ভঙ্গকারী নয়। তাই শিঙ্গা লাগানোও রোজা ভঙ্গকারী হবে না। মোদ্দা কথা, তার উক্ত ধারণার উপর যখন শরয়ী কোনো দলিল নেই তখন তো রোজা ভঙ্গ হওয়ার সংশয়ই সৃষ্টি হয়নি। আর যখন সংশয় সৃষ্টি হয়নি তখন কাফফারা বাতিল হবে না। কেননা, কাফফারা সংশয়ের পরই বাতিল হয়। হ্যাঁ, যদি শিঙ্গা ব্যবহারকারীর রোজা বিনষ্ট হওয়ার ফতোয়া এমন ফকীহ দান করে যার ফতোয়ার উপর লোকদের বিশ্বাস রয়েছে তারপর সে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করেছে তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা ফতোয়া তার ক্ষেত্রে শরয়ী দলিলের ভূমিকা রাখে। তাই উক্ত ফতোয়ার কারণে শিঙ্গা লাগানোর দ্বারা তার রোজা ভঙ্গ হয়ে গেছে। এরপর যখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করেছে তখন সে রোজাদার ছিল না; বরং বে-রোজা ছিল। আর রোজা না থাকা অবস্থায় রমজানে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হয় না; বরং নিরেট কাজা ওয়াজিব হয়। আর যদি শিঙ্গা ব্যবহারকারীর নিকট এই হাদীস– اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ পৌঁছে। অর্থাৎ শিঙ্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের রোজা ভঙ্গ হয়ে গেছে। অতঃপর উক্ত হাদীসের উপর সে নির্ভরও করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এই সুরতেও একই হুকুম হবে যে, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী মুফতির ফতোয়ার চেয়ে নিম্নমানের হতে পারে না। অর্থাৎ মুফতির ফতোয়ার উপর ই'তিমাদ তথা নির্ভর করার দ্বারা কাফফারা ছিল না। তাই হাদীসের উপর নির্ভর করার দ্বারা তো কাফফারা

অবশ্যই ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ঐ সুরতে কাফফারা বিলুপ্ত হবে না। কেননা, শুধু সাধারণ লোকদের উপর ফকীহগণের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কারণ, তাদের হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। যেমন– কোনো হাদীস তার জাহির-এর উপর নেই কিংবা রহিত হয়ে গেছে-এ কথাগুলো একজন সাধারণ লোক কিভাবে বুঝবে? তাই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একজন মুফতির ফতোয়া শরয়ী দলিল তো হবে, কিন্তু হাদীসে তার ক্ষেত্রে শরয়ী দলিল হবে না। সুতরাং যখন সাধারণ লোকের বেলায় হাদীস শরয়ী দলিল নয়, তাই শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়ারও সংশয় সৃষ্টি হয় না। আর যখন রোজা ভঙ্গ হওয়ার সংশয় নেই তাই কাফফারা বিলুপ্ত হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি শিঙ্গা ব্যবহারকারীর কাছে উপরিউক্ত হাদীস পৌঁছে থাকে এবং হাদীসের তাবীল বা ব্যাখ্যাও তার জানা থাকে। আর ব্যাখ্যা হলো এই যে, শিঙ্গা ব্যবহারকারী ও শিঙ্গাদাতা উভয়ে একে অন্যের গিবত করত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন– أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ অর্থাৎ গিবত করার কারণে তাদের উভয়ের রোজার ছওয়াব খতম হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী ভাবল যে, তিনি শিঙ্গার কারণে বলেছেন। তাই সে তার ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, শিঙ্গা ব্যবহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। দ্বিতীয় তাবীল বা ব্যাখ্যা এই যে, একবার শিঙ্গা ব্যবহারকারী ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে গেল, শিঙ্গাদাতা তার গলায় পানি ঢেলে দিল অথচ সে রোজাদার ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, أَفْطَرَ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُوْمُ অর্থাৎ শিঙ্গাদাতা শিঙ্গা ব্যবহারকারীর গলায় পানি ঢেলে দিয়ে তার রোজা ভঙ্গ করে দিল। বর্ণনাকারী মনে করল যে, তিনি أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ বলেছেন। অর্থাৎ হাদীসের মধ্যে اَلْحَاجِمُ শব্দটি فَاعِلٌ আর اَلْمَحْجُوْمُ শব্দটি مَفْعُوْلٌ অথচ রাবী মনে করল, উভয়টি عَطْف হিসেবে فَاعِلٌ, তৃতীয় তাবীল বা ব্যাখ্যা এই যে, এই হাদীসটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। মোদ্দা কথা, শিঙ্গা ব্যবহারকারীর যদি উক্ত হাদীসের তাবীল জানা থাকে তাহলে শিঙ্গা ব্যবহার করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করার দ্বারা অবশ্যই কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা হাদীসের ব্যাখ্যা জানার পর উক্ত হাদীস দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয় না। আর যেহেতু শিঙ্গা ব্যবহার দ্বারা রোজা নষ্ট হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয় না, সেহেতু কাফফারাও বাতিল হবে না। কিন্তু কেউ যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, উলামায়ে কেরামের মতবিরোধও সংশয় সৃষ্টি করে। আর ইমাম আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্যও এটাই যে, শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই এই সন্দেহের কারণে কাফফারা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এর জবাব এই যে, ইমাম আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্য সংশয় সৃষ্টি করে না। কেননা ইমাম আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্য কিয়াস বিরোধী। কারণ, কিয়াস তো হলো এই যে– إِنَّ الْفِطْرَ مِمَّا يَدْخُلُ لَا مِمَّا يَخْرُجُ অর্থাৎ যে বস্তু উদরে প্রবেশ করে তার দ্বারা [রোজা] ভঙ্গ হয়ে যায়। আর যে বস্তু নির্গত হয় তার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রক্ত রগ থেকে বের হয়ে যায়। ভিতরে কোনো কিছু প্রবেশ করে না। সুতরাং কিয়াসের দাবি এই হলো যে, শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না। আর ইমাম আওযায়ী (র.) রোজা ভঙ্গ হওয়ার প্রবক্তা। তাই তার বক্তব্য কিয়াস বিরোধী হলো। সন্দেহ তখন সৃষ্টি হতো যখন তার বক্তব্য কিয়াস অনুযায়ী হতো। তাই যখন ইমাম আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়ার কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হলো না তখন কাফফারাও বাতিল হবে না।– [ইনায়া]

এই স্থানে হিদায়া গ্রন্থকারের ইবারতের মধ্যে কিছুটা বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আর তা এভাবে যে, প্রথমে তিনি বলে এসেছেন যে, যদি কোনো ফকীহ শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়ার ফতোয়া দিয়ে দেয় এবং তারপর সে ইচ্ছাকৃত কিছু পানাহার করে নেয় তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা ফতোয়ার কারণে ভঙ্গ হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর এখানে বলছেন যে, ইমাম আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্য সন্দেহ সৃষ্টি করে না। অথচ ইমাম আওযায়ী (র.) নিজেই অনেক বড় একজন ফকীহ্। জবাব এই যে, ফকীহ্‌র ফতোয়া দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়ার সন্দেহ সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। আর ইমাম আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়া ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি হাদীস أَفْطَرَ الْحَاجِمُ الخ -এর ব্যাখ্যা ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

ফায়দা : আমাদের মতে শিঙ্গা লাগানো রোজা ভঙ্গকারী নয়। হাম্বলীদের মতে রোজা ভঙ্গকারী। হাম্বলীদের দলিল হলো এই হাদীস– أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ আর আমাদের প্রথম দলিল হলো, إِنَّهُ ﷺ إِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ দ্বিতীয় দলিল হলো– إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَصَائِمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ উপরিউক্ত রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যকার সংঘাতের কারণে কিছুই প্রমাণিত হলো না। তাই কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর কিয়াস হলো এই যে, শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ না হওয়া। কেননা, রোজা কোনো বস্তু পেটে প্রবেশের দ্বারা ভঙ্গ হয়; পেট থেকে কোনো জিনিস বের হওয়ার দ্বারা ভঙ্গ হয় না।

وَلَوْ اَكَلَ بَعْدَ مَا اغْتَابَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ كَيْفَ مَا كَانَ لِاَنَّ الْفِطْرَ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ وَالْحَدِيْثُ مُأَوَّلٌ بِالْاِجْمَاعِ وَاِذَا جُوْمِعَتِ النَّائِمَةُ وَالْمَجْنُوْنَةُ وَهِيَ صَائِمَةٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ (رح) لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا اِعْتِبَارًا بِالنَّاسِيْ وَالْعُذْرُ اَبْلَغُ لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَلَنَا اَنَّ النِّسْيَانَ يَغْلِبُ وُجُوْدُهُ وَهٰذَا نَادِرٌ وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِاِنْعِدَامِ الْجِنَايَةِ ـ

অনুবাদ : গিবত করার পর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে বসে তাহলে যেভাবেই করে থাকুক তার উপর কাজা ও কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে। কেননা গিবতের কারণে রোজা ভঙ্গ হওয়া কিয়াসের বিপরীত। আর সংশ্লিষ্ট হাদীস সর্বসম্মতভাবেই অন্য [ছওয়াব না হওয়ার] অর্থে প্রযোজ্য। যদি ঘুমন্ত কিংবা বিকৃতমস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করা হয় আর ঐ স্ত্রীলোক রোজাদার থাকে তাহলে স্ত্রীলোকটির উপর কাজা ওয়াজিব হবে; কাফফারা ওয়াজিব হবে না। ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ঐ স্ত্রীলোকদ্বয়ের উপর কাজাও ওয়াজিব হবে না। এটা তারা বলেছেন ভুলে পানাহারকারীর উপর কিয়াস করে; বরং এদের ওজর আরো প্রবল। কেননা এখানে তাদের কোনো ইচ্ছাই পাওয়া যায়নি। আমাদের দলিল এই যে, ভুল সচরাচর হয়ে থাকে। আর উক্ত ঘটনাবলি বিরল। কাফফারা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো [তার পক্ষ থেকে] অপরাধ না হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ রোজা অবস্থায় গিবত করে। আর এ কথা ভেবে যে, গিবত দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায় স্বেচ্ছায় পানাহার করে ফেলেছে, তাহলে তার উপর কাজা ও কাফফারা দুটোই ওয়াজিব। তার নিকট ঐ হাদীস পৌছুক বা না পৌছুক যার মধ্যে গিবতকে রোজা ভঙ্গকারী বলা হয়েছে। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত হোক বা না হোক। কিংবা কোনো মুফতি রোজা ভঙ্গ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করুক বা না করুক। কারণ, গিবত দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়া কিয়াস বিরোধী। আর اَلْغِيْبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ হাদীসটি সকলের মতে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো এই যে, গিবত করার কারণে রোজাদারের ছওয়াব ও প্রতিদান দূর হয়ে যায়। সুতরাং যখন সর্বসম্মতিক্রমে হাদীসটি ব্যাখ্যার দাবিদার তখন উক্ত হাদীসের কারণে রোজা ভঙ্গ হওয়ার সংশয় সৃষ্টি হবে না। আর যখন সংশয় নেই তখন কাফফারাও বাতিল হবে না। কিফায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন–

ثَلَاثٌ يُفَطِّرْنَ الصِّيَامَ وَيَنْقُضْنَ الْوُضُوْءَ وَيَهْدِمْنَ الْعَقْلَ اَلْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّظْرُ اِلٰى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ

তিনটি বস্তু রোজা ভঙ্গ করে দেয়, অজু ভেঙ্গে দেয় এবং আকল বা জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটায়– [১] গিবত, [২] চোগলখুরী বা কুটনামী, [৩] স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্যের দিকে অবলোকন। হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো উপরিউক্ত জিনিসগুলো দ্বারা রোজা ও অজুর ছওয়াব দূরীভূত হয়ে যায় এবং জ্ঞানের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَاِذَا جُوْمِعَتِ النَّائِمَةُ وَالْمَجْنُوْنَةُ الخ সুরতে মাসআলা এই যে, যদি কোনো রোজাদার ঘুমন্ত কিংবা বিকৃতমস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের সঙ্গে সঙ্গম করা হয় তবে উভয় স্ত্রীলোকের উপর কাজা তো ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাদের উপর কাজাও ওয়াজিব নয়। এখানে ইবারতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা এই যে, বিকৃতমস্তিষ্ক স্ত্রীলোক রোজাদার কিভাবে হয়? কারণ বিকৃতমস্তিষ্ক ও রোজা একত্রিত হতে পারে না? এই প্রশ্নের দুটি জবাব হতে পারে–

১. মূলত শব্দটি مَجْبُوْرَةٌ ছিল আর مَجْبُوْرَةٌ অর্থ مُكْرَهَةٌ অর্থাৎ ঐ স্ত্রীলোক যার সাথে জোরপূর্বক সঙ্গম করা হয়েছে। লিপিকার ভুলে مَجْنُوْنَةٌ লিখে দিয়েছে। তারপর কিতাবের অনেক পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তাই শব্দটি কেটে مَجْبُوْرَةٌ লেখা সমীচীন মনে করা হয়নি। যদিও শব্দটির ব্যাখ্যা করাও সম্ভব ছিল।

২. দ্বিতীয় জবাব এই যে, مَجْنُوْنَةٌ দ্বারা ঐ স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য যে দিনের প্রথম অংশে জ্ঞানবান ছিল। সে রোজার নিয়ত করে রোজা রেখে দিয়েছিল। তারপর সে মাতাল হয়ে পড়ে। তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে ফেলে। তারপর ঐ দিনই সে হুঁশ ফিরে পায় এবং তার স্বামীর কৃতকর্মও তার মনে পড়ে। [উক্ত জবাবগুলোর পর আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।]

মোদ্দা কথা, মূল মাসআলায় ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল রোজা অবস্থায় ভুলবশত পানাহারকারীর উপর কিয়াস। অর্থাৎ যেমনিভাবে ভুলবশত রোজা বিরোধী কোনো কিছুর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না তেমনিভাবে ঘুম ও মাতাল অবস্থায় সঙ্গম দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা, ঘুম ও মাতালের ওজর ভুলচুক (نِسْيَانٌ) থেকেও প্রবল। কারণ, ভুলবশত আহারকারী ব্যক্তি অন্তত আহার করার তো ইচ্ছা করে। আর ঘুম ও মাতালের সুরতে তাদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাও পাওয়া যায়নি। সুতরাং যখন ভুলবশত আহারকারী ব্যক্তির উপর কাজা ওয়াজিব হয়নি, তখন ঘুমন্ত কিংবা মস্তিষ্কবিকৃত স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম দ্বারা তাদের উভয়ের উপর অবশ্যই কাজা ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল এই যে, ঘুমন্ত ও মস্তিষ্কবিকৃতাকে ভুলবশত কার্য সম্পাদনকারীর (نَاسِىْ) সাথে যুক্ত করা তখনই ঠিক হবে যখন ঘুমন্ত এবং মস্তিষ্কবিকৃতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নাসী (نَاسِىْ) -এর অর্থ পাওয়া যায়। অথচ এমনটি নয়। কারণ, ভুলের অস্তিত্ব প্রবল। অর্থাৎ মানুষের ভুল প্রায় হয়ে থাকে আর ঘুমন্ত ও বিকৃতমস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করার ঘটনা বিরল। তাই যেহেতু ভুল অধিক হওয়ার কারণে কাজা-এর হুকুম কষ্টসাধ্য সেহেতু কষ্ট দূর করার জন্য ভুলের সুরতে কাজা ওয়াজিব করা হয়নি। আর ঘুমন্ত ও বিকৃতমস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করার সুরতে কাজা ওয়াজিব করার দ্বারা যেহেতু কষ্ট নেই তাই এই সুরতে কাজা ওয়াজিব করা হয়েছে। তবে তাদের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ তাদের পক্ষ থেকে ইচ্ছা না পাওয়া যাওয়ার কারণে অপরাধ পাওয়া যায়নি। আর কাফ্ফারা অপরাধ ব্যতীত ওয়াজিব হয় না। এজন্য তাদের উপর কাফফারা ওয়াজিব করা হয়নি।

فَصْلٌ : فِيمَا يُوجِبُهُ عَلٰى نَفْسِهِ وَإِذَا قَالَ لِلّٰهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ اَفْطَرَ وَقَضٰى فَهٰذَا النَّذْرُ صَحِيحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) هُمَا يَقُولَانِ إِنَّهُ نَذَرَ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ لِوُرُوْدِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ هٰذِهِ الْاَيَّامِ وَلَنَا اَنَّهُ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشْرُوْعٍ وَالنَّهْيُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ تَرْكُ إِجَابَةِ دَعْوَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَصِحُّ نَذْرُهُ لٰكِنَّهُ يُفْطِرُ اِحْتِرَازًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْمُجَاوِرَةِ ثُمَّ يَقْضِيْ إِسْقَاطًا لِلْوَاجِبِ وَاِنْ صَامَ فِيْهِ يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ لِاَنَّهُ اَدَّاهُ كَمَا الْتَزَمَهُ ـ

অনুচ্ছেদ : নিজের উপর ওয়াজিবকৃত রোজা

অনুবাদ : সে রোজা প্রসঙ্গে যা বান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করে। কেউ যদি বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানির দিনে আমার জিম্মায় রোজা, তাহলে সে ঐ দিন রোজা না রেখে কাজা করবে। অর্থাৎ আমাদের নিকট এই নজর বিশুদ্ধ। ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের বক্তব্য এই যে, সে এমন বিষয়ের মান্নত করেছে, যা গুনাহ। কেননা এই দিনগুলোতে রোজা রাখার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। [সুতরাং তার মান্নত সংঘটিত হবে না]। আমাদের দলিল এই যে, সে শরিয়তে প্রমাণিত রোজার মান্নত করেছে। আর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ভিন্ন কারণে। সেটা হলো আল্লাহর দাওয়াতে সাড়া দান বর্জন করা। সুতরাং মান্নত তো শুদ্ধ হবে। তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট গুনাহ পরিহার করার উদ্দেশ্যে রোজা [পালন] থেকে বিরত থাকবে। এরপর তা কাজা করবে জিম্মায় ওয়াজিব আদায়ের জন্য। আর যদি সেদিন রোজা রেখে ফেলে তাহলে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কেননা সে যেভাবে নিজের উপর বাধ্যবাধকতা করেছিল, সেভাবেই আদায় করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ পর্যন্ত ঐ সকল ইবাদতের বর্ণনা ছিল, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার উপর ওয়াজিব করেছিলেন। যেমন– ফরজ নামাজ, জাকাত, রমজানের রোজা ইত্যাদি। এই অনুচ্ছেদে ঐ সকল ইবাদতের বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলো বান্দা তার নিজের উপর ওয়াজিব করে। বান্দা নিজের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব করাকে নজর (نَذْر) বা মান্নত বলা হয়।

মান্নত দুই প্রকার– [১] مُنْجِزْ [২] مُعَلَّقْ।

মুনজিয (مُنْجِزْ) বলা হয় যা কোনো শর্তের সাথে যুক্ত না হয়। যেমন– কেউ বলল, আমার উপর একটি রোজা আছে। আর মু'আল্লাক (مُعَلَّقْ) বলা হয় যা কোনো শর্তের সাথে যুক্ত হয়। যেমন– কেউ বলল, যদি আমার এই কাজ হয়ে যায়, তবে আল্লাহর ওয়াস্তে একটি রোজা রাখব। আবার মান্নত দুই প্রকার– [১] নির্দিষ্ট, [২] অনির্দিষ্ট।

নির্দিষ্ট যেমন– আগামী জুমাবারে আমি রোজা রাখব। অনির্দিষ্ট যেমন– আমি একটি রোজা রাখব।

মান্নত শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন–

১. মান্নতকৃত বস্তুর উপকরণ (جِنْس) থেকে শরয়ীভাবেও ওয়াজিব হওয়া। যেমন– অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার মান্নত করা সহীহ নয়। কারণ, শরিয়তে তার উপকরণ থেকে কোনো কিছু ওয়াজিব নয়।
২. মান্নতকৃত বস্তু নিজেই উদ্দেশ্য হওয়া; কোনো ইবাদতের অসিলা না হওয়া। যেমন– অজু ও কুরআন তেলাওয়াতের মান্নত করা সহীহ নয়। কেননা এগুলো নিজে উদ্দেশ্য নয়; বরং নামাজের অসিলা।

৩. মান্নতকৃত বস্তু এমন না হওয়া যা তার নিজের উপরই ওয়াজিব। চাই তা তাৎক্ষণিকভাবে হোক বা ভবিষ্যৎকালে হোক। সুতরাং কেউ যদি জোহর নামাজ পড়ার মান্নত করে তবে তার এই মান্নত সহীহ নয়। কেননা জোহর তো নিজেই ওয়াজিব।

৪. মান্নতকৃত বস্তু স্বয়ং অপরাধযোগ্য না হওয়া। যেমন– গায়রুল্লাহর জন্য রোজা রাখার মান্নত করা। কারণ, এ কাজটি নিজেই হারাম। এজন্য তা কখনো জায়েজ নয়।

৫. মান্নতকৃত বস্তু দুঃসাধ্য না হওয়া। যেমন– চলে যাওয়া দিনের মান্নত করা সহীহ নয়।

সুরতে মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি কুরবানির দিনে রোজা রাখার মান্নত করে তবে তার উচিত ঐ দিন রোজা না রাখা; বরং তার স্থলে কাজা করবে। মোট কথা কুরবানির দিনের রোজার মান্নত করা আমাদের মতে সহীহ বটে, কিন্তু ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সহীহ নয়। এটাই ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত।

তাদের দলিল এই যে– ঈদুল ফিতরের দিন, কুরবানির দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের [১১. ১২ ও ১৩ যিলহজ] তিন দিন, সর্বমোট এই পাঁচদিন রোজা রাখা শরয়ীভাবে নিষেধ। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلَا لَا تَصُوْمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ শুনে রেখ! এই দিনগুলোতে রোজা রেখো না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে– اَلَا لَا تَصُوْمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ "খবরদার! এই দিনগুলোতে রোজা রেখে না। কেননা এগুলো হলো পানাহার ও সঙ্গমের দিন।" মোদ্দা কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধের কারণে এই দিনগুলোতে রোজা রাখার মান্নত করা অপরাধযোগ্য মান্নত (نَذْرِ مَعْصِيَتْ) আর অপরাধযোগ্য মান্নত করা সহীহ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– لَا نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ "যে কাজে আল্লাহর নাফরমানি হয় তার মান্নত করা সহীহ নয়। তাই প্রমাণিত হলো যে, ঐ দিনগুলোতে রোজা রাখার মান্নত করা সহীহ নয়।"

আমাদের দলিল এই যে, কুরবানির রোজা সত্তাগতভাবে শরিয়ত অনুমোদিত রোজা, তবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ভিন্ন কারণে। অর্থাৎ এমন জিনিসের কারণে ঐ দিনগুলোতে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে যা তার জাতের মধ্যে দাখিল নয়। তা হলো আল্লাহর দাওয়াত থেকে বিমুখ হওয়া। অর্থাৎ ঐ দিনগুলোতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জিয়াফত করেন। এখন কোনো ব্যক্তি যদি ঐ দিনগুলোতে রোজা রাখে সে যেন আল্লাহর দাওয়াত থেকে বিমুখ হলো। আর আল্লাহর দাওয়াত থেকে বিমুখ হওয়া খুবই খারাপ কথা।

মোদ্দা কথা ঐ পাঁচদিনে রোজা রাখা সত্তাগতভাবে তো অনুমোদিত যদিও গুণগতভাবে অপরাধ বা অননুমোদিত। আর অনুমোদিত কাজের মান্নত করা সহীহ এবং জায়েজ। এজন্য এই দিনগুলোতে রোজা রাখার মান্নত করা সহীহ। কিন্তু ঐ মান্নত সহীহ হওয়া সত্ত্বেও ঐ দিনের রোজা রাখবে না। তাহলে ঐ অপরাধ ও খারাপি থেকে বাঁচা যাবে যা আল্লাহর দাওয়াত থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে রোজার সাথে সম্পৃক্ত। হ্যাঁ, মান্নতের কারণে যে রোজা ওয়াজিব হয়েছিল তা আদায় করার জন্য কাজা ওয়াজিব। আর যদি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কুরবানির দিনে রোজা রাখে তাহলে মান্নত পুরা হয়ে যাবে। কারণ, সে যে ধরনের রোজার বাধ্যবাধকতা করেছিল সে ধরনের রোজা সে আদায় করেছে। অর্থাৎ কুরবানির দিনে রোজা রাখার মান্নত করার কারণে যে রোজা তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল তা অসম্পূর্ণ (نَاقِصْ)। আর অসম্পূর্ণই সে আদায় করেছে। সুতরাং যেমন ওয়াজিব হয়েছিল তেমনই সে আদায় করেছে। তাই মান্নত পুরা হয়ে গেছে।

وَإِنْ نَوٰى يَمِيْنًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ يَعْنِىْ إِذَا أَفْطَرَ وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلٰى وُجُوْهٍ سِتَّةٍ إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ نَوَى النَّذْرَ لَا غَيْرَ أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَأَنْ لَا يَكُوْنَ يَمِيْنًا يَكُوْنُ نَذْرًا لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِصِيْغَتِهِ كَيْفَ وَقَدْ قَرَّرَهُ بِعَزِيْمَتِهِ وَإِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ وَنَوٰى أَنْ لَا يَكُوْنَ نَذْرًا يَكُوْنُ يَمِيْنًا لِأَنَّ الْيَمِيْنَ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ وَقَدْ عَيَّنَهُ وَنَفٰى غَيْرَهُ وَإِنْ نَوَاهُمَا يَكُوْنُ نَذْرًا وَيَمِيْنًا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَعِنْدَ أَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) يَكُوْنُ نَذْرًا وَلَوْ نَوَى الْيَمِيْنَ فَكَذٰلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَكُوْنُ يَمِيْنًا لِأَبِىْ يُوْسُفَ أَنَّ النَّذْرَ فِيْهِ حَقِيْقَةٌ وَالْيَمِيْنُ مَجَازٌ حَتّٰى لَا يَتَوَقَّفُ الْأَوَّلُ عَلَى النِّيَّةِ وَيَتَوَقَّفُ الثَّانِىْ فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا ثُمَّ الْمَجَازُ يَتَعَيَّنُ بِنِيَّةٍ وَعِنْدَ نِيَّتِهِمَا تَتَرَجَّحُ الْحَقِيْقَةُ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تُنَافِىْ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَقْتَضِيَانِ الْوُجُوْبَ إِلَّا أَنَّ النَّذْرَ يَقْتَضِيْهِ لِعَيْنِهِ وَالْيَمِيْنَ لِغَيْرِهِ فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالدَّلِيْلَيْنِ كَمَا جَمَعْنَا بَيْنَ جِهَتَىِ التَّبَرُّعِ وَالْمُعَاوَضَةِ فِى الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ ـ

অনুবাদ : যদি [উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা] কসমের নিয়ত করে থাকে, তাহলে তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি সে ঐ দিন রোজা না রেখে থাকে। আলোচ্য মাসআলাটি মোট ছয় প্রকার। প্রথমত [উক্ত বাক্য দ্বারা কসম বা নজর] কোনোটারই নিয়ত করল না। দ্বিতীয়ত শুধু নজরের নিয়ত করল। [অন্য কিছুর নিয়ত করল না]। তৃতীয়ত নজরের নিয়ত করল এবং ইয়ামীন না হওয়ার নিয়ত করল। এই তিন অবস্থায় নজর হবে। কেননা বাক্যটি শব্দগত দিক থেকেই নজর নির্দেশক। আর তা কেন হবে না? অথচ তার নিয়ত দ্বারা নজরকে স্থির করেছে। আর যদি সে উক্ত বাক্য দ্বারা কসমের নিয়ত করে থাকে এবং নজর না হওয়ার নিয়ত করে থাকে, তাহলে তা কসম হবে। কেননা, উক্ত বাক্যে কসমের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা সে নিয়ত দ্বারা নির্ধারিত করে নিয়েছে এবং অন্যটিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। আর যদি উভয়টির নিয়ত করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নজর ও কসম উভয়টিই হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শুধু নজর হবে। আর যদি কসমের নিয়ত করে, তাহলে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। [অর্থাৎ নজর ও ইয়ামীন দুটোই হবে] কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শুধু কসম হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, এখানে মান্নতের অর্থ হলো মৌলিক আর কসমের অর্থ হলো রূপক। এ কারণেই প্রথমটি নিয়তের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু দ্বিতীয়টি নিয়তের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এ বাক্য একই সঙ্গে উভয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং নিয়ত দ্বারা রূপক অর্থ নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর উভয়টি নিয়ত করার ক্ষেত্রে মূল অর্থই অগ্রাধিকার লাভ করবে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এই যে, নজর ও কসম এ উভয়ের লক্ষ্যের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা উভয়টির চাহিদা হলো ওয়াজিব হওয়া, তবে নজর তা দাবি করে স্বকীয়ভাবে আর কসম তা

দাবি করে ভিন্ন কারণে। সুতরাং উভয় দলিল কার্যকরি করার জন্য উভয় অর্থকে আমরা এখানে একত্র করেছি। যেমন বিনিময় শর্তে 'হেবা'-এর ক্ষেত্রে দান ও বিনিময় এ উভয় দিককে আমরা একত্র করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নজর ও ইয়ামীন-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, নজরের মধ্যে শুধু কাজা ওয়াজিব হয় আর ইয়ামীনের মধ্যে কাজা ও কাফফারা দুটোই ওয়াজিব হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট রোজা রাখার নজর করে আর ঐ নির্ধারিত দিনে রোজা রাখতে না পারে তাহলে তার কাজা ওয়াজিব হবে। আর যদি শপথ করে যে, জুমার দিন রোজা রাখবে এবং রাখতে না পারে তবে কাজাও ওয়াজিব হবে আর ইয়ামীনের কাফফারাও ওয়াজিব হবে।

এখন সুরতে মাসআলা এই যে, যদি কেউ لِلّٰهِ عَلَىَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ দ্বারা ইয়ামীনের নিয়ত করে এবং ঐ দিন রোজা না রাখে তবে তার উপর কাজার সাথে ইয়ামীনের কাফফারাও ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, উক্ত মাসআলার ছয়টি সুরত রয়েছে।

১. উক্ত বাক্য দ্বারা কোনো কিছুর নিয়ত না করা।

২. নিরেট নজরের নিয়ত করা।

৩. নজরের নিয়ত করার সাথে সাথে এও নিয়ত করা যাতে ইয়ামীন না হয়।

৪. ইয়ামীনের নিয়ত করা এবং এও নিয়ত করা যাতে নজর না হয়।

৫. নজর ও ইয়ামীন উভয়টির নিয়ত করা।

৬. শুধু ইয়ামীনের নিয়ত করা।

প্রথম তিন সুরতে উপরিউক্ত বাক্য সকলের মতে নজর হবে। দলিল এই যে, উক্ত বাক্যের মধ্যে মৌলিকভাবে নজর আছে। আর রূপকভাবে ইয়ামীন আছে। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, হাকীকতের [মূলের] মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন হয় না তবে রূপকের (مَجَازْ) মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং প্রথম সুরতের মধ্যে এই বাক্যটি নজর এজন্য হবে যে, ঐ সুরতের মধ্যে কোনো নিয়ত করা হয়নি। আর নিয়ত ও ইরাদাবিহীন বাক্য হাকীকতের উপর প্রযুক্ত হয়; রূপকের উপর নয়। আর হাকীকত হলো নজর। এজন্য এই সুরতের মধ্যে এই বাক্যটি নজরের উপর প্রযুক্ত (مَحْمُوْل) হবে। দ্বিতীয় সুরতের মধ্যে যেহেতু নিয়তের সাথে নজরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এজন্য অবশ্যই এই বাক্যটি নজর হবে। তৃতীয় সুরতে যেহেতু নজরকে নিয়তের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং ইয়ামীনকেও বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে তাই এই বাক্যটি অবশ্যই নজরের উপর প্রযুক্ত হবে। চতুর্থ সুরতে বাক্যটি শুধু ইয়ামীন হবে আর এই হুকুমটি সর্বজনস্বীকৃত। তার দলিল এই যে, ঐ বাক্যটির হাকীকত যদিও নজর, কিন্তু বাক্যটি ইয়ামীনেরও রূপকভাবে সম্ভাবনা রাখে। আর তা এ ভাবে যে– لِلّٰهِ عَلَىَّ الخ-এর মধ্যে لَامْ আছে। আর لَامْ কখনো بَاء-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই لَامْ-কে بَاء-এর অর্থে ধরলে بِاللّٰهِ হয়ে যাবে। আর بَاء ইয়ামীন ও কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বুঝা গেল, বাক্যটির মধ্যে ইয়ামীনের অর্থেরও সম্ভাবনা আছে। আর বাক্য যে অর্থের অবকাশ রাখে তার নিয়ত করা সহীহ আছে। তাই উক্ত বাক্য দ্বারা ইয়ামীনের নিয়ত করা সহীহ হবে। আর যখন উক্ত বাক্য দ্বারা ইয়ামীনের নিয়ত করা সহীহ আছে তখন এই বাক্য ইয়ামীন হবে। পঞ্চম সুরতে তরফাইনের মতে এই বাক্য নজর ও ইয়ামীন উভয়টি হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শুধু নজর হবে। আর ষষ্ঠ সুরতের মধ্যে তরফাইনের মতে নজর ও ইয়ামীন উভয়টি হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শুধু ইয়ামীন হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, لِلّٰهِ عَلَىَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ-এর মধ্যে নজর হলো হাকীকত। আর ইয়ামীন হলো মাজায তথা রূপক। তাই তো বাক্যটির নজর হওয়া নিয়তের উপর মওকূফ নয়, তবে ইয়ামীন হওয়া নিয়তের উপর মওকূফ। এখন যদি নজর ও ইয়ামীন উভয়টি উদ্দেশ্য নেওয়া। হয় তবে হাকীকত ও মাজায একত্রিত হয়ে যাবে। অথচ وَاحِدْ শব্দ দ্বারা হাকীকত ও মাজাযকে

একত্রিত করা জায়েজ নেই। সুতরাং উক্ত বাক্য দ্বারা নজর ও ইয়ামীন উভয়টি উদ্দেশ্য নেওয়া দুঃসাধ্য। সুতরাং যখন উভয়টির নিয়ত করল তখন হাকীকতের প্রাধান্য হবে। আর হাকীকত তথা নজর উদ্দেশ্য হবে। আর যখন হাকীকত উদ্দেশ্য হলো তখন মাজায উদ্দেশ্য হবে না। আর যখন ইয়ামীনের নিয়ত করল তখন নামাজ নিয়ত দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তাই হাকীকত উদ্দেশ্য হবে না। তরফাইনের দলিল এই যে, উক্ত বাক্য দ্বারা নজর ও ইয়ামীন উভয়টি উদ্দেশ্য নেওয়া সত্ত্বেও হাকীকত ও মাজায একত্রিত হয় না। কারণ– لِلّٰهِ عَلَىَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ ওয়াজিব হওয়ার জন্য وَضْع করা হয়েছে এবং উজূবের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। উজূব ছাড়া অন্যত্র ব্যবহারই হয় না। তবে এই বাক্যটি উজূবের মধ্যে দুই দিক থেকে ব্যবহৃত হয়। উভয় দিকের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এতে একদিক হলো নজর অপর দিক হলো ইয়ামীন। তবে এতটুকুন পার্থক্য যে, নজর স্বকীয়ভাবে উজূবের দাবি করে। কেননা আল্লাহর বাণী রয়েছে– وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ "তোমরা তোমাদের নজরকে পূর্ণ করো।" আর ইয়ামীন উজূবের দাবি করে ভিন্ন কারণে। তা হলো গায়রুল্লাহর নামকে অসম্মান থেকে বাঁচানো। অর্থাৎ ইয়ামীন পুরা করা এজন্য ওয়াজিব, যাতে আল্লাহর নামের অসম্মান না হয়। অন্যথায় ইয়ামীন ভঙ্গ করার মধ্যে অহেতুক আল্লাহর নামের অসম্মান হবে। সুতরাং সার-সংক্ষেপ কথা হলো, ঐ বাক্যের দাবি বা হাকীকত তো হলো–ওয়াজিব হওয়া আর উজূবের দাবি হলো দুভাবে। একটি হলো নজরের দিক থেকে অপরটি হলো ইয়ামীনের দিক থেকে। আর উভয়টির উপর আমল করাও সম্ভবপর। কেননা উভয়টির মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। তাই আমরা উজূবের উভয় দিক এবং উভয় দলিলের উপর আমল করতে গিয়ে নজর ও ইয়ামীন উভয়টি একত্র করে দিয়েছি। যেমন– বিনিময় শর্তে 'হেবা'-এর ক্ষেত্রে আমরা দান ও বিনিময় উভয় দিককে একত্রিত করেছি। যেমন শাহেদ মামুনকে একটি জায়গা এই শর্তের উপর হেবা করল যে, মামুন বিনিময়ে তাকে এক হাজার টাকা দেবে। সুতরাং হেবা যা সাধারণত দান হয়ে থাকে [কিন্তু] বিনিময়ের শর্তারোপের কারণে পরবর্তীতে তা মু'আওজা তথা বিক্রয়রূপে গণ্য হয়ে যায়। এ কারণে শফী'র শোফা দাবি করার অধিকার আছে। অথচ যদি নিরেট হেবা হতো তবে শোফার দাবি করতে পারত না। সুতরাং যেমনিভাবে এখানে দান ও বিনিময়ের দিককে পার্থক্য না থাকার কারণে একত্র করা হলো তেমনি উপরে বর্ণিত মাসআলায়ও বৈপরীত্য না থাকার কারণে নজর ও ইয়ামীন উভয়টিকে একত্র করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত বাক্যে হাকীকত ও মাজাযের মাঝে একত্রিকরণ তখন লাজিম আসত যখন আমরা ঐ বাক্য দ্বারা উজূব ও গায়রে উজূব উভয়টি উদ্দেশ্য করতাম। অথচ আমরা তো শুধু উজূবের ইরাদা করেছি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের এক জবাব নূরুল আনোয়ার গ্রন্থকার দিয়েছেন। জবাবের সার-সংক্ষেপ হলো এই যে, হাকীকত ও মাজায একই শব্দে একত্রিত করা নাজায়েজ। তবে দুই শব্দের একটি দ্বারা যদি হাকীকত আর অপরটি দ্বারা মাজায উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তা হলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর এখানেও এই ব্যাপারটিই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ, لِلّٰهِ بِمَعْنٰى وَاللّٰهِ يَا بِاللّٰهِ দ্বারা ইয়ামীন উদ্দেশ্য আর عَلَىَّ দ্বারা নজর উদ্দেশ্য।

وَلَوْ قَالَ لِلّٰهِ عَلَىَّ صَوْمُ هٰذِهِ السَّنَةِ اَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَاَيَّامَ التَّشْرِيْقِ وَقَضَاهَا لِاَنَّ النَّذْرَ بِالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ نَذْرٌ بِهٰذِهِ الْاَيَّامِ وَكَذَا اِذَا لَمْ يُعَيِّنْ لٰكِنَّهُ شَرَطَ التَّتَابُعَ لِاَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَعْرِىْ عَنْهَا لٰكِنْ يَقْضِيْهَا فِىْ هٰذَا الْفَصْلِ مَوْصُوْلَةً تَحْقِيْقًا لِلتَّتَابُعِ بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ وَيَتَاتّٰى فِىْ هٰذَا خِلَافُ زُفَرَ وَالشَّافِعِىِّ (رح) لِلنَّهْىِ عَنِ الصَّوْمِ فِيْهَا وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا لَا تَصُوْمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيْهِ وَالْعُذْرَ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ لَمْ يُجْزِهٖ صَوْمُ هٰذِهِ الْاَيَّامِ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْمَا يَلْتَزِمُهُ الْكَمَالُ وَالْمُؤَدّٰى نَاقِصٌ لِمَكَانِ النَّهْىِ بِخِلَافِ مَا اِذَا عَيَّنَهَا لِاَنَّهُ اِلْتَزَمَ بِوَصْفِ النُّقْصَانِ فَيَكُوْنُ الْاَدَاءُ بِالْوَصْفِ الْمُلْتَزَمِ ـ

অনুবাদ : আর যদি সে বলে যে, আমার জিম্মায় আল্লাহর ওয়াস্তে এই বছরের রোজা, তাহলে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা ও তাশরীকের দিনগুলোতে রোজা হতে বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে সেগুলোর কাজা আদায় করে নেবে। কেননা নির্দিষ্ট বছরের নজরের মধ্যে এই দিনগুলোর নজরও অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ হুকুম যদি বছর নির্ধারণ না করে, কিন্তু লাগাতার হওয়ার শর্ত আরোপ করে। কেননা লাগাতার হওয়া ঐ দিনগুলো হতে মুক্ত হতে পারে না। তবে এই সুরতে সেই দিনগুলোর রোজা ধারাবাহিকভাবে কাজা করবে– যথাসম্ভব লাগাতারের মর্ম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। আর এখানেও ইমাম জুফার ও শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত প্রযুক্ত হবে। কেননা এই দিনগুলোতে রোজা নিষিদ্ধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلَا لَا تَصُوْمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ "শোনো, তোমরা ঐ দিনগুলোতে রোজা রেখো না। কারণ, এগুলো হচ্ছে পানাহার ও সহবাসের দিন।" আমরা উপরে রোজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং হাদীসের ব্যাখ্যাও বর্ণনা করে এসেছি। আর যদি লাগাতার রাখার শর্ত না করে, তাহলে এই দিনগুলোতে রোজা রাখা যথেষ্ট হবে না। কেননা যে রোজা সে নিজের জিম্মায় লাজিম করেছে, তার পরিপূর্ণ হওয়াটাই হলো স্বাভাবিক। আর এ দিনগুলোতে আদায়কৃত রোজা হবে ত্রুটিপূর্ণ–নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে। পক্ষান্তরে যদি বছর নির্ধারণ করে থাকে তাহলে এই দিনগুলোতে রোজা রাখা যথেষ্ট হবে। কেননা সে ত্রুটির গুণসহ নিজের জিম্মায় লাজিম করেছিল। সুতরাং নিজের উপর আরোপিত গুণ অনুযায়ী আদায় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি এক বছর রোজা রাখার নজর করে, তবে তার দুটি সুরত রয়েছে। হয়তো তাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন এভাবে বলল, এই বছর আমি রোজা রাখব। কিংবা তাকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। যেমন বলল, এক বছর রোজা রাখব। যদি সে নির্দিষ্টভাবে এক বছরের রোজার নজর করে তাহলে তার উপর এক বছরের রোজা লাজিম হবে। কিন্তু ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এবং তাশরীকের দিনগুলোর রোজা ভঙ্গ করবে। পরবর্তীতে সেগুলোর কাজা আদায় করে নেবে। কেননা, নির্দিষ্ট এক বছরের রোজার নজর করার মধ্যে ঐ পাঁচদিনের রোজার নজরও অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে এই পাঁচটি

দিনও বছরের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি ঐ পাঁচ দিনেও রোজা রেখে দেয় তবে আদায় হয়ে যাবে। কারণ, সে যেভাবে আবশ্যক করেছে সেভাবেই আদায় করেছে। হ্যাঁ, ঐ সুরতে ঐ ব্যক্তির উপর রোজার কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা উক্ত নজর দ্বারা রমজানের মধ্যে নজরের রোজা লাজিম হবে না। কারণ, রমজানের রোজা গায়রে রমজানের রোজার যোগ্যতা রাখে না।

আর যদি বছর নির্দিষ্ট না করে বরং শর্তহীন এক বছরের রোজার নজর করে তবে তারও দুটি সুরত রয়েছে। হয়তো লাগাতারের শর্তারোপ করা হবে কিংবা করা হবে না। অর্থাৎ হয়তো এ কথা বলা হবে যে, আমি লাগাতার এক বছরের রোজা রাখব বা লাগাতারের শর্তারোপ করা হয়নি। যদি লাগাতারের শর্তারোপ করা হয় তবে তারও ঐ হুকুম হবে যে হুকুম নির্দিষ্ট বছরের। কেননা লাগাতার এক বছরের রোজার নজর করা ঐ পাঁচদিন থেকে খালি নয়। তবে এই সুরতেও লক্ষণীয় যে, ঐ পাঁচ রোজার কাজা নজরের রোজার সাথেই করবে। অর্থাৎ যখন বছর পুরা হবে তখন পরের দিনই ঐ পাঁচ রোজার কাজা করবে। যাতে যথাসম্ভব লাগাতারের মর্ম পাওয়া যায়। ঐ পাঁচ দিনের রোজার কাজার মধ্যে ইমাম জুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতবিরোধ প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ এই দুই ইমামের মতে ঐ পাঁচ দিনের কাজা ওয়াজিব নয়। কেননা أَلَا لَا تَصُومُوا الخ হাদীসটির মধ্যে ঐ পাঁচ দিনে রোজা রাখা নিষিদ্ধ রয়েছে। তাই ঐ দিনগুলোর নজরই সহীহ না। আর যখন নজর সহীহ নয় তখন এগুলোর কাজাও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে ঐ দিনগুলোর নজর সহীহ হওয়ার কারণ এবং তাদের উত্থাপিত হাদীসের জবাব অনুচ্ছেদের প্রথম মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নিন।

আর যদি বছরকে নির্দিষ্ট না করা হয় এবং লাগাতারের শর্তও আরোপ না করা হয়, তবে ঐ পাঁচদিনে রোজা রাখা জায়েজ হবে না। অর্থাৎ ঐ দিনগুলোতে রোজা রাখার দ্বারা নজর আদায় হবে না; বরং তার পঁয়ত্রিশ দিনের রোজার কাজা করা ওয়াজিব হবে। পাঁচ হলো ঐ দিনগুলোর আর ত্রিশ হলো রমজানের। ঐ পাঁচদিনের রোজার কাজা এজন্য ওয়াজিব যে, তার উপর যে রোজা লাজিম করেছে তার মধ্যে মূল হলো, তা পরিপূর্ণ হওয়া। তাহলে যেন তার উপর পূর্ণ রোজা ওয়াজিব হয়েছে। আর ঐ দিনগুলোর মধ্যে যে পাঁচদিনের রোজা রেখেছে সেগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপের হাদীসের কারণে অসম্পূর্ণ। আর মূলনীতি আছে যে- مَا وَجَبَ كَامِلًا لَا يَتَأَدَّى نَاقِصًا "যে বস্তু পূর্ণভাবে ওয়াজিব হয় তা অসম্পূর্ণভাবে আদায় করার দ্বারা আদায় হবে না।" সুতরাং যখন ঐ পাঁচদিনের মধ্যে পূর্ণ রোজা আদায় হয়নি তখন সেগুলোর কাজা ওয়াজিব হবে। এর বিপরীত সে যদি বছর নির্দিষ্ট করে দেয় এবং সে ঐ পাঁচদিনেও রোজা রেখে নেয় তবে আদায় হয়ে যাবে। কেননা বছর নির্দিষ্ট করার কারণে ঐ পাঁচদিনের যে রোজাগুলো লাজিম হয়েছিল যেগুলো হলো অসম্পূর্ণ। আর অসম্পূর্ণই সে আদায় করেছে। আর নীতিমালা আছে যে- مَا وَجَبَ نَاقِصًا جَازَ أَنْ يَتَأَدَّى نَاقِصًا "যা অসম্পূর্ণ ওয়াজিব হয় তা অসম্পূর্ণভাবেই আদায় করা জায়েজ।" মোদ্দা কথা, রমজানের ত্রিশ রোজার কাজা এজন্য ওয়াজিব যে, যখন বছর নির্দিষ্ট করেনি তখন স্বাভাবিকভাবেই বারো মাসের রোজা লাজিম হয়ে গেছে। আর ঐ বারো মাসের মধ্যে রমজান নেই। কেননা রমজানের দিনের মধ্যে গায়রে রমজানের রোজার কোনো অবকাশ নেই। এজন্য নজরের রোজা বারো মাসের পরিমাণ করার জন্য রমজানের বিনিময়ে এক মাস অর্থাৎ ত্রিশ দিনের রোজার কাজা লাজিম হবে।

قَالَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ إِنْ أَرَادَ بِهٖ يَمِيْنًا وَقَدْ سَبَقَتْ وُجُوْهُهٗ وَمَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ
صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لِأَنَّ
الشُّرُوْعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ وَصَارَ كَالشُّرُوْعِ فِي الصَّلٰوةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوْهِ وَالْفَرْقُ لِأَبِيْ
حَنِيْفَةَ (رح) وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ بِنَفْسِ الشُّرُوْعِ فِي الصَّوْمِ يُسَمّٰى صَائِمًا حَتّٰى يَحْنَثَ
بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّوْمِ فَيَصِيْرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْيِ فَيَجِبُ إِبْطَالُهٗ فَلَا تَجِبُ صِيَانَتُهٗ
وَوُجُوْبُ الْقَضَاءِ يَبْتَنِيْ عَلَيْهِ وَلَا يَصِيْرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْيِ بِنَفْسِ النَّذْرِ وَهُوَ الْمُوْجِبُ وَلَا
بِنَفْسِ الشُّرُوْعِ فِي الصَّلٰوةِ حَتّٰى يَتِمَّ رَكْعَةً وَلِهٰذَا لَا يَحْنَثُ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّلٰوةِ
فَتَجِبُ صِيَانَةُ الْمُؤَدّٰى وَيَكُوْنُ مَضْمُوْنًا بِالْقَضَاءِ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهٗ لَا يَجِبُ
الْقَضَاءُ فِيْ فَصْلِ الصَّلٰوةِ أَيْضًا وَالْأَظْهَرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে যদি সে এই বাক্য দ্বারা কসমের নিয়ত করে থাকে, তাহলে তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে। এ বাক্যটির বিভিন্ন প্রকার পিছনে বর্ণিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কুরবানির দিন রোজা অবস্থায় সকাল যাপন করে অতঃপর রোজা ভঙ্গ করে ফেলে, তার উপর [কাজা-কাফফারা] কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে 'নাওয়াদির'-এর বর্ণনা মতে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা কোনো আমল শুরু করা ঐ আমলকে লাজিম করে। যেমন– নজর করা আমলকে লাজিম করে। এটা মাকরূহ ওয়াক্তে [নফল] নামাজ শুরু করার মতো হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে আর এটি জাহিরী রেওয়ায়েতও–পার্থক্যের কারণ এই যে, রোজা শুরু করা মাত্রই লোকটিকে রোজাদার বলা হয়। এ কারণেই রোজা না রাখার কসমকারী ব্যক্তি এই দিন রোজা শুরু করা মাত্র কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। সুতরাং রোজা শুরু করার দ্বারা সে গুনাহে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে, তাই তা বাতিল করা ওয়াজিব হবে। অতএব তা রক্ষা করা ওয়াজিব হবে না। আর এর উপরই কাজা ওয়াজিব হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু শুধু নজর-এর কারণে গুনাহে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে না। আর নজরই হলো রোজাকে ওয়াজিবকারী। তদ্রূপ শুধু সালাত শুরু করার দ্বারা গোনাহে লিপ্ত বলা যায় না, যতক্ষণ না এক রাকাত পূর্ণ করে। এ কারণেই নামাজ না পড়ার কসমকারী ব্যক্তি নামাজ শুরু করার কারণে কসম ভঙ্গকারী বলে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং আদায়কৃত অংশকে রক্ষা করা ওয়াজিব হবে। তাই কাজা করা তার জিম্মায় এসে যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নামাজের ক্ষেত্রেও কাজা ওয়াজিব হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতই অধিক প্রবল। সঠিক বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে বাক্য নজরের জন্য বলা হয়েছে যদি তার দ্বারা সে কসমের নিয়ত করে তাহলে ভঙ্গ করার সুরতে তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে। এ মাসআলাটির ছয়টি সুরত রয়েছে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا الخ : সূরতে মাসআলা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ দিনগুলোর মধ্য থেকে কোনো দিনের রোজার নিয়ত করে রোজা শুরু করে দেয় তারপর তা ভঙ্গ করে ফেলে, তাহলে তার উপর উক্ত রোজার কাজা ওয়াজিব হবে না। এটাই জাহির রেওয়ায়েত। সাহেবাইন থেকে 'নাওয়াদির'-এর বর্ণনা এই যে, তার উপর কাজা ওয়াজিব। সাহেবাইনের দলিল এই যে, নফল রোজা শুরু করার দ্বারা লাজিম হয়ে যায়। সুতরাং যখন শুরু করার দ্বারা লাজিম হয়ে গেল তখন ফাসিদ করার সুরতেও তার কাজা লাজিম হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ দিনগুলোর কোনো দিনের রোজার নজর করল তবে এই রোজা নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত অন্য সময় আদায় করা ওয়াজিব হবে। আরো যেমন– কোনো ব্যক্তি মাকরূহ ওয়াক্তে নফল নামাজ শুরু করে ফাসিদ করে দিল তাহলে তার উপর উক্ত নামাজের কাজা ওয়াজিব হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ী কুরবানির দিনের রোজার নজর ও কুরবানির দিনে রোজা শুরু করার মাঝে এবং কুরবানির দিনে রোজা শুরু করা এবং মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ শুরু করার মধ্যকার পার্থক্যের কারণ এই যে, রোজা শুরু করা মাত্রই লোকটিকে রোজাদার বলা হয়। এমনকি কেউ যদি এই কসম করে যে, আমি নফল রোজা রাখব না তারপর সে কুরবানির দিনে রোজার নিয়ত দ্বারা রোজা শুরু করে দিল তবে শুরু করার সাথে সাথেই সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝা গেল, কুরবানির দিনে যখনই সে রোজা শুরু করল তখন সে সায়েম তথা রোজাদার হয়ে গেল। আর এ কথাও জানা আছে যে, কুরবানির দিন ঐ পাঁচ দিনের একদিন যার মধ্যে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং কুরবানির দিনের রোজা শুরু করা মাত্রই এই ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে গেল আর যেহেতু নিষিদ্ধ বস্তু বাতিল করা ওয়াজিব সেহেতু এই রোজার পরিপূর্ণতা এবং তার হেফাজত করা ওয়াজিব হবে না। আর যখন ঐ রোজার পরিপূর্ণতা ও পুরা করা ওয়াজিব নয় তখন তার কাজাও ওয়াজিব হবে না। কারণ, কাজা ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তি হলো পরিপূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার উপর। অর্থাৎ যে বস্তু পরিপূর্ণ করা ওয়াজিব, বিনষ্ট করার দ্বারা তারই কাজা ওয়াজিব হবে। আর যা পরিপূর্ণ করা ওয়াজিব নয় তা যদি ফাসিদ করে দেওয়া হয় তার কাজা ওয়াজিব হয় না। তাই বুঝা গেল যে, কুরবানির দিনে নফল রোজা শুরু করার পর যদি ভঙ্গ করে দেওয়া হয় তবে তার কাজা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু শুধু কুরবানির দিনের রোজার নজর করার কারণে গুনাহে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে না। কারণ, কুরবানির দিনে রোজা রাখা নিষেধ; রোজার নজর করা নিষেধ নয়। আর এ কথাও সর্বজনস্বীকৃত যে, নজরের রোজা ওয়াজিবকারী হলো নজরই; সুতরাং রোজা ওয়াজিবকারী হলো নজর। আর শুধু নজর দ্বারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হওয়া লাজিম আসে না। তাই এই নজরকে পুরা করা ওয়াজিব। কিন্তু যেহেতু কুরবানির দিনে রোজা রাখা গুনাহ্ এজন্য উক্ত নজরের রোজাকে অন্য যে কোনো দিন আদায় করে নেবে।

এমনিভাবে মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ শুরু করে ফাসিদ করে দেওয়ার সুরতেও কাজা ওয়াজিব হবে। কারণ, নামাজ শুরু করলেই তাকে নামাজি বলা হয় না; বরং নামাজ-এর ব্যবহার তখন হবে যখন এক রাকাত পুরো হয়ে যাবে। অর্থাৎ যখন এক রাকাতকে সিজদার সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে। এই কারণে যদি কেউ বলে, আমি নফল নামাজ পড়ব না, তারপর নফল নামাজ শুরু করে দেয় তবে শুরু করার দ্বারা কসম ভঙ্গকারী হবে না। সুতরাং যখন মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ শুরু করল এবং এখনো রুকু-সিজদা করেনি তবে এটাকে নামাজ বলা যাবে না। আর যখন তাকে নামাজ বলা যাবে না তখন ঐ মাকরূহ ওয়াক্তে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়াকেও সাব্যস্ত করা যাবে না। আর যখন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া সাব্যস্ত হলো না তখন মুয়াদ্দা (مُؤَدّٰى) অর্থাৎ যে অংশ আদায় করা হয়েছে তার হেফাজত করা ওয়াজিব। আর যার হেফাজত ও পরিপূর্ণতা ওয়াজিব, ফাসিদ করে দেওয়ার দ্বারা তার কাজাও ওয়াজিব হয়। এজন্য ঐ আদায়কৃত অংশ যদি ফাসিদ করে দেয় তাহলে তার কাজা ওয়াজিব হবে। উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, যদি মাকরূহ ওয়াক্তে নফল নামাজ শুরু করে এবং এক রাকাত পূর্ণ করার পর অর্থাৎ সিজদা করার পর তাকে ফাসিদ করে দেয় তবে তার কাজা ওয়াজিব হবে না। কারণ, এক রাকাত পূর্ণ হওয়ার পর তার উপর নামাজ-এর ব্যবহার করা যাবে। আর ঐ মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ পড়া নিষেধ তাই তা বাতিল করা ওয়াজিব হবে। আর যা বাতিল করা ওয়াজিব ফাসিদ করে দেওয়ার দ্বারা তার কাজা ওয়াজিব হয় না। এজন্য ঐ সুরতে কাজা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য একটি বর্ণনা এই যে, মাকরূহ ওয়াক্তে নফল নামাজ শুরু করে ফাসিদ করে দেওয়ার সুরতেও কাজা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম সাহেব (র.)-এর প্রথমোক্ত মতটিই হলো অধিক প্রবল। আল্লাহ-ই সম্যক অবগত।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

قَالَ اَلْاِعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌّ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهٗ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْمُوَاظَبَةُ دَلِيْلُ السُّنَّةِ .

পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ই'তিকাফ হলো মোস্তাহাব। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, তা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ [রমজানের] শেষে দশদিন নিয়মিতভাবে তা পালন করেছেন। আর নিয়মিত আমল সুন্নতের প্রমাণ বহন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : রোজার আলোচনা ই'তিকাফের পূর্বে এ কারণে করা হয়েছে যে, রোজা হলো ই'তিকাফের জন্য শর্ত। আর শর্ত পূর্বে হয় তাই রোজাকে ই'তিকাফের পূর্বে আনা হয়েছে। ই'তিকাফ শব্দটি بَاب اِفْتِعَالْ -এর মাসদার। عَكَفَ থেকে নির্গত। عَكَفَ হলো مُتَعَدِّيْ [সংক্রামিত] عُكُوْف হলো لَازِمْ [অসংক্রামিত] শরিয়তের পরিভাষায় নিয়তসহ মসজিদে অবস্থান করার নাম হলো ই'তিকাফ।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা মোস্তাহাব। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সর্বদা করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে–

قَالَتْ عَائِشَةُ (رض) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلٰى اَنْ تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অর্থ– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন থেকে মদীনায় তশরিফ নিলেন, তখন থেকে ওফাত পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন।

তাঁর কোনো জিনিস সর্বদা করা এ কাজ সুন্নত হওয়ার দলিল। এজন্য রমজানের শেষ দশকের ই'তিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বদা করা ওয়াজিব হওয়ার আলামত। তাই রমজানের শেষ দশকেও ই'তিকাফ করা ওয়াজিব হওয়া উচিত। এর জবাব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জিনিসকে ওয়াজিব নির্ধারণ করতে চাইতেন, তা সর্বদা করতেন এবং সর্বদা করার পর তা করার নির্দেশ দিতেন এবং ছেড়ে দিতে বারণ করতেন। সুতরাং যদি রমজানের শেষ দশকের ই'তিকাফ ওয়াজিব হতো তাহলে তিনি তা করার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন এবং ছেড়ে দিলে অসন্তোষ জ্ঞাপন করতেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এটি ওয়াজিব নয়। আর ই'তিকাফ ওয়াজিব না হওয়ার এটাও দলিল যে, একবার তিনি ই'তিকাফ করার জন্য মসজিদে তাঁবু নির্মাণের অর্থাৎ পর্দা দ্বারা [ঘর বানানোর] নির্দেশ দিলেন। তারপর মসজিদে তশরিফ নিলেন। দেখলেন আরো দুটি তাঁবু সেখানে রয়েছে। সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, একটি হযরত আয়েশার ও অপরটি হযরত হাফসার (রা.)। এটা অবলোকনে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং নিজ তাঁবু সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর ঐ বছর ই'তিকাফ থেকে বিরত থাকলেন। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হলো যে, ই'তিকাফ ওয়াজিব নয়। কারণ, ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো বিরতি ছাড়া সর্বদা করা।

وَهُوَ اللَّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ اَمَّا اللَّبْثُ فَرُكْنُهُ لِاَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْهُ فَكَانَ وُجُوْدُهُ بِهِ وَالصَّوْمُ مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ فِيْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ هُوَ يَقُوْلُ اِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ وَهُوَ اَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُوْنُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِالصَّوْمِ وَالْقِيَاسُ فِيْ مُقَابَلَةِ النَّصِّ الْمَنْقُوْلِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ ثُمَّ الصَّوْمُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوَاجِبِ مِنْهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَلِصِحَّةِ التَّطَوُّعِ فِيْمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِظَاهِرِ مَا رَوَيْنَا وَعَلٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يَكُوْنُ اَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَفِيْ رِوَايَةِ الْاَصْلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَقَلُّهُ سَاعَةٌ فَيَكُوْنُ مِنْ غَيْرِ صَوْمٍ لِاَنَّ مَبْنَى النَّفْلِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ يَقْعُدُ فِيْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَلَوْ شَرَعَ فِيْهِ ثُمَّ قَطَعَهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِيْ رِوَايَةِ الْاَصْلِ لِاَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فَلَمْ يَكُنِ الْقَطْعُ اِبْطَالًا وَفِيْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ يَلْزَمُهُ لِاَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْيَوْمِ كَالصَّوْمِ ثُمَّ الْاِعْتِكَافُ لَا يَصِحُّ اِلَّا فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ لِقَوْلِ حُذَيْفَةَ (رضـ) لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ لَا يَصِحُّ اِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ يُصَلّٰى فِيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لِاَنَّهُ عِبَادَةُ اِنْتِظَارِ الصَّلٰوةِ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ يُؤَدّٰى فِيْهِ اَمَّا الْمَرْاَةُ تَعْتَكِفُ فِيْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا لِاَنَّهُ هُوَ الْمَوْضِعُ لِصَلَاتِهَا فَيَتَحَقَّقُ اِنْتِظَارُهَا فِيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الْبَيْتِ مَسْجِدٌ تَجْعَلُ مَوْضِعًا فِيْهِ فَتَعْتَكِفُ فِيْهِ ـ

অনুবাদ : ই'তিকাফ অর্থ সায়েম অবস্থায় মসজিদে ই'তিকাফের নিয়তসহ অবস্থান করা। অবস্থান করা তো ই'তিকাফের রুকন। কেননা ই'তিকাফ শব্দটি অবস্থানের অর্থ প্রদান করে। সুতরাং অবস্থান দ্বারাই ই'তিকাফের অস্তিত্ব হবে। আমাদের নিকট সাওম হলো ই'তিকাফের শর্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আর নিয়ত হলো সমস্ত ইবাদতের শর্ত। তিনি বলেন, সাওম একটি ইবাদত এবং তা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত। সুতরাং তা অন্য ইবাদতের শর্ত হতে পারে না। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِالصَّوْمِ "ই'তিকাফ হয় না সাওম ব্যতীত।" আর বর্ণিত হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সিয়াম ওয়াজিব ই'তিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। এ সম্পর্কে একটি মাত্র বর্ণনাই রয়েছে। [অর্থাৎ দ্বিমত নেই।] ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান [ইবনে যিয়াদ] যে মত বর্ণনা করেছেন তাতে নফল ই'তিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্যও সিয়াম শর্ত। আমাদের বর্ণিত হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের প্রেক্ষিতে এই বর্ণনা মোতাবেক ই'তিকাফ একদিনের কমে হতে পারে না। কিন্তু মবসূতের (اَصْل) বর্ণনা মতে আর তা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতও–নফল ই'তিকাফের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক মুহূর্ত। সুতরাং তা সিয়াম ছাড়া হতে পারে। কেননা নফলের ভিত্তি হলো সহজতার উপর। আপনি কি

জানেন না যে, দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ বসে আদায় করা যায়। আর যদি নফল ই'তিকাফ শুরু করার পর ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে মবসূতের বর্ণনা মতে তা কাজা করা জরুরি নয়। কেননা, তার সময় নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং তা ভঙ্গ করার দ্বারা বাতিল করা নয়। হাসান (র.)-এর বর্ণনা মতে কাজা করা আবশ্যক হবে। কেননা তা রোজার মতো একদিনের সাথে সীমাবদ্ধ। আর জামাত হয় এমন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ সহীহ নয়। কেননা, হযরত হুজায়ফা (রা.) বলেছেন– لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ "জামাত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হতে পার না।" ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হয়, এমন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ সহীহ নয়। কেননা, ই'তিকাফ হলো নামাজের জন্য অপেক্ষা করার ইবাদত। সুতরাং তা এমন স্থানে সম্পৃক্ত হবে, যেখানে তা নিয়মিত আদায় করা হয়। অবশ্য স্ত্রীলোক তার ঘরের মসজিদে [অর্থাৎ নামাজ আদায়ের নির্ধারিত স্থানে] ই'তিকাফ করবে। কেননা সেটাই হলো তার নামাজের স্থান। সুতরাং নামাজের জন্য তার অপেক্ষা সেখানেই বাস্তবায়িত হয়। যদি ঘরে পূর্ব থেকে তার জন্য নামাজের নির্ধারিত কোনো স্থান না থাকে তাহলে একটি স্থান নির্ধারণ করে নেবে এবং সেখানে ই'তিকাফ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আভিধানিক অর্থে ই'তিকাফ হলো শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) অবস্থান করার নাম। যে কোনো স্থানেই হোক এবং যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ "এই মূর্তিগুলো কি যার পার্শ্বে তোমরা ঘুরপাক খাও।" শরিয়তের পরিভাষায় ই'তিকাফ বলা হয়, ই'তিকাফের নিয়তে রোজা অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা। মোট কথা ই'তিকাফের জন্য চারটি জিনিস জরুরি– [১] অবস্থান, [২] মসজিদ, [৩] ই'তিকাফের নিয়ত, [৪] রোজা।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, অবস্থান করা হলো ই'তিকাফের রুকন। কেননা ই'তিকাফ শব্দটি আভিধানিকভাবে অবস্থানের অর্থ প্রদান করে। কারণ, অবস্থান করা পাওয়া যাওয়া জরুরি। আর নিয়ত যেহেতু আদত ও ইবাদতের মধ্যকার ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য সকল ইবাদতে মাকসূদায় শর্ত, এজন্য ই'তিকাফের জন্যেও নিয়ত শর্ত হবে। তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করা আর ইবাদত হিসেবে অবস্থান করার মাঝে ব্যবধান হয়ে যাবে। আর রোজা আমাদের নিকট তো ই'তিকাফের জন্য শর্ত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে শর্ত নয়। উক্ত মাসআলায় ইমাম মালিক (র.)-ও আমাদের সাথে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিল এই যে, রোজা একটি ইবাদত এবং স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত। আর যে জিনিস স্বতন্ত্র ও মূল হয় তা অন্যের জন্য শর্ত হয় না। এজন্য রোজা ই'তিকাফের জন্য শর্ত হবে না। তাদের মাজহাবের সমর্থন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَذَرْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْفِ بِنَذْرِكَ

অর্থ–ইবনে ওমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মসজিদে এক রাত ই'তিকাফ করার নজর করেছি। তিনি বললেন নিজের নজর পুরা করো।

দারাকুতনীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে–

اِنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ سَأَلَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكَفَ عُمَرُ لَيْلَةً ـ

অর্থ–হযরত ওমর (রা.) জাহিলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার নজর করেছিলেন [অতঃপর] যখন ইসলামের জামানা আসল তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। [রাসূলুল্লাহ] ﷺ বললেন, তোমার নজর পূর্ণ করো। সুতরাং হযরত ওমর (রা.) এক রাত ই'তিকাফ করলেন।

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, ই'তিকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়। কারণ, যদি রোজা শর্ত হতো তাহলে শুধু রাতের ই'তিকাফ কিভাবে সহীহ হয়?

আমাদের [প্রথম] দলিল হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ .

অর্থ– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, রোজা ব্যতীত ই'তিকাফ নেই।

আবূ দাউদ শরীফে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে–

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ اِمْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ اِلَّا لِحَاجَةٍ اِلَّا مَالَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِىْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ .

অর্থ– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মু'তাকিফের জন্য সুন্নত হলো, রুগীর সেবা করবে না, জানাজায় উপস্থিত হবে না, স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না এবং স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না। ই'তিকাফ রোজা ব্যতীত সহীহ হবে না। আর জামে মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হবে না।

উপরে বর্ণিত উভয় হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ই'তিকাফের জন্য রোজা শর্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াস اِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ الخ-এর জবাব এই যে, সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াস প্রত্যাখ্যাত। এজন্য হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস– لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ-এর মোকাবিলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসকে পরিত্যাগ করা তাদের পেশকৃত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের জবাব এই যে, উক্ত হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং দারাকুতনীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً اَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِعْتَكِفْ وَصُمْ .

অর্থ–হযরত ওমর (রা.) জাহিলী জামানায় একদিন ও একরাত মসজিদে হারামে ই'তিকাফ করাকে নিজের উপর লাজিম করেছিলেন। তারপর নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ই'তিকাফ করো এবং রোজা রাখো।

উক্ত হাদীসে যদি لَيْلَةً শব্দটি থাকে তবে তার মতলব এই যে, রাতের ই'তিকাফ দিনকেসহ লাজিম করেছিল। আর যদি يَوْمًا-এর শব্দ থাকে, তবে তার মতলব হলো দিনের ই'তিকাফ রাতসহ লাজিম করেছিল। মোদ্দা কথা, উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফের সাথে রোজা রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। তাই এর দ্বারাও রোজা ই'তিকাফের শর্ত হওয়া প্রমাণিত হলো।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য সকল রেওয়ায়েত অনুযায়ী রোজা শর্ত। অর্থাৎ হানাফী সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য রোজা রাখা শর্ত।

ওয়াজিব ই'তিকাফের সুরত এই যে, কোনো ব্যক্তি একমাস বা একদিন ই'তিকাফের নজর করল; কিংবা এভাবে বলল, যদি আমার এই কাজ হয়ে যায় তবে আমার উপর এতদিনের ই'তিকাফ জরুরি। নফল ই'তিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য রোজা শর্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনা যা হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) ইমামে আজম আবূ হানীফা (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন তা এই যে, নফল ই'তিকাফের জন্যেও রোজা শর্ত। কারণ لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ হাদীসটি শর্তহীন (مُطْلَقٌ), এর মধ্যে নফল ও ওয়াজিব ই'তিকাফের কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি; বরং সব ধরনের ই'তিকাফের জন্য রোজা জরুরি। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, উক্ত রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে নফল ই'তিকাফ একদিনের কম হবে না। কেননা নফল ই'তিকাফের জন্য উক্ত রেওয়ায়েত অনুযায়ী রোজা শর্ত। আর একদিনের কম রোজা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত হলো মবসূতের। আর এটা জাহিরী রেওয়ায়েতও এবং এটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত যে, নফল ই'তিকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়। উক্ত রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে নফল ই'তিকাফের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই; বরং ই'তিকাফের নিয়তে যতটুকুন সময় মসজিদে কাটাবে তাকেই ই'তিকাফ বলা হবে। চাই তা এক মুহূর্তই হোক না কেন। দলিল এই যে, নফলের ভিত্তি হলো সহজ ও আসানের উপর।

তাই তো আপনি লক্ষ করে থাকবেন যে, নামাজের মধ্যে কিয়াম ফরজ। কিন্তু নফল নামাজে দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি বসে আদায় করা হয় তবে তা জায়েজ আছে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল, নফলের ভিত্তি হলো সহজতার উপর। আর সহজ হলো ই'তিকাফের সময় নির্ধারণ না করার মধ্যে। এজন্য আমরা বলেছি যে, নফল ই'তিকাফের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ওয়াক্ত

নেই। [গ্রন্থকার] উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যকার মতবিরোধের ফলাফল প্রকাশ করার জন্য বলেন, যদি কেউ নফল ই'তিকাফ আরম্ভ করে, পরে তা ভঙ্গ করে দেয় তবে মবসূতের বর্ণনা মতে তার উপর কাজা লাজিম হবে না। কেননা, নফল ই'তিকাফের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। এজন্য তা ভঙ্গ করার দ্বারা বাতিল করা হবে না; বরং পুরা করতে হবে। আর কোনো জিনিসকে পুরা করার সুরতে তার কাজা ওয়াজিব হয় না। হাসান ইবনে জিয়াদের বর্ণনা মতে তার উপর কাজা লাজিম হবে। কারণ, উক্ত রেওয়ায়েত অনুযায়ী নফল ই'তিকাফ সর্বনিম্ন একদিনের সাথে নির্ধারিত হয়। যেমন– রোজা একদিনের হয়। সুতরাং যখন সে একদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা ভঙ্গ করে দিল, তখন তা বাতিল করা হলো। আর নফল ইবাদত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি ফাসিদ করে দেওয়া হয় তবে তার কাজা লাজিম হয়ে যায়। এজন্য উক্ত রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার উপরও ই'তিকাফের কাজা করা জরুরি হবে।

ই'তিকাফ জায়েজ হওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত হলো, জামাত হয় এমন মসজিদ হওয়া। অর্থাৎ ই'তিকাফ ঐ মসজিদে সহীহ হবে যার মধ্যে ইমাম ও মুয়াজ্জিন রয়েছেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয় বা কিছু কিছু নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয়। এর দলিল হলো হযরত হুজায়ফা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ـ

আর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাণী–

إِنَّ اَبْغَضَ الْاُمُوْرِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْبِدَعُ وَإِنَّ مِنَ الْبِدَعِ الْاِعْتِكَافُ فِى الْمَسَاجِدِ الَّتِىْ فِى الدُّوْرِ ـ

অর্থ– আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু হলো বিদ্‌আতসমূহ। আর বিদ্‌আতসমূহের মধ্যে একটি হলো ঐ সকল মসজিদে ই'তিকাফ করা যেগুলো ঘরের মধ্যে। উক্ত দুটো রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা গেল, ই'তিকাফের জন্য এমন মসজিদ হওয়া জরুরি যার মধ্যে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা হলো এই যে, ই'তিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য এমন মসজিদ হওয়া শর্ত যার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয়। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত। এর দলিল এই যে, ই'তিকাফ হলো নামাজের জন্য অপেক্ষা করার ইবাদত। সুতরাং ই'তিকাফের ইবাদত এমন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হবে যে স্থানে নামাজ আদায় করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেক নামাজ আদায় করা হয়। সাহেবাইন, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ করা সহীহ আছে। সেখানে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা হোক বা না হোক। তাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ আয়াতটি শর্তহীন বা মুতলক। ইনায়া গ্রন্থকার শরহে তাহাভীর রেফারেন্সে লিখেছেন যে, সবচেয়ে উত্তম ই'তিকাফ হলো মসজিদে হারামের ই'তিকাফ। তারপর মসজিদে নববীর মধ্যে। তারপর মসজিদে আকসার মধ্যে এবং তারপর বড় বড় মসজিদগুলোতে যেখানে প্রচুর লোক সমবেত হয়।

আমাদের মতে স্ত্রীলোকদের জন্য উত্তম হলো তারা তাদের ঘরের মসজিদে ই'তিকাফ করবে। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে নামাজের জন্য যে জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে সেখানে ই'তিকাফ করা স্ত্রীলোকদের জন্য উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলের জন্য জামাতের মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েজ। ঘরের মধ্যে ই'তিকাফ করা পুরুষ-মহিলা কারো জন্য জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই যে, ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হলো জমিনের ঐ অংশের তাজীম করা যার মধ্যে ই'তিকাফ করা হয়। সুতরাং ই'তিকাফ ঐ অংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে যা শরয়ীভাবেও সম্মানিত। আর শরয়ীভাবে মসজিদগুলো তো সম্মানিত-ই হয়, কিন্তু ঘরের মধ্যে যে স্থানগুলো নামাজ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলো এই পর্যায়ের সম্মানিত হয় না। এজন্য ই'তিকাফ শুধু মসজিদের মধ্যে জায়েজ হবে। মসজিদ ছাড়া ঘর ইত্যাদিতে জায়েজ হবে না। আমাদের দলিল এই যে, আমরা পূর্বে বলেছি যে, ই'তিকাফ হলো নামাজের জন্য অপেক্ষা করার ইবাদত। আর স্ত্রীলোক ঘরের মসজিদের মধ্যে নামাজের অপেক্ষা করে; শরয়ী মসজিদের মধ্যে অপেক্ষা করে না। সুতরাং যখন ঘরের মসজিদের মধ্যে নামাজের অপেক্ষা করে তবে ই'তিকাফও তার মধ্যে করবে। আর যদি ঘরের মধ্যে নামাজের জন্য কোনো নির্ধারিত স্থান না থাকে তাহলে অন্য কোনো জায়গা নির্ধারণ করে তার মধ্যে ই'তিকাফ করবে।

وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ اَوِ الْجُمُعَةِ اَمَّا الْحَاجَةُ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ (رض) كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهٖ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ وَلِاَنَّهٗ مَعْلُوْمٌ وُقُوْعُهَا وَلَابُدَّ مِنَ الْخُرُوْجِ فِىْ تَقْضِيَتِهَا فَيَصِيْرُ الْخُرُوْجُ لَهَا مُسْتَثْنًى وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَ فَرَاغِهٖ مِنَ الطُّهُوْرِ لِاَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُوْرَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَاَمَّا الْجُمُعَةُ فَلِاَنَّهَا مِنْ اَهَمِّ حَوَائِجِهٖ وَهِىَ مَعْلُوْمٌ وُقُوْعُهَا وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) اَلْخُرُوْجُ اِلَيْهَا مُفْسِدٌ لِاَنَّهٗ يُمْكِنُهُ الْاِعْتِكَافُ فِى الْجَامِعِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ الْاِعْتِكَافُ فِىْ كُلِّ مَسْجِدٍ مَشْرُوْعٌ وَاِذَا صَحَّ الشُّرُوْعُ فَالضَّرُوْرَةُ مُطْلَقَةٌ فِى الْخُرُوْجِ وَيَخْرُجُ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ لِاَنَّ الْخِطَابَ يَتَوَجَّهُ بَعْدَهٗ وَاِنْ كَانَ مَنْزِلُهٗ بَعِيْدًا عَنْهُ يَخْرُجُ فِىْ وَقْتٍ يُمْكِنُهٗ اِدْرَاكُهَا وَيُصَلِّىْ قَبْلَهَا اَرْبَعًا وَفِىْ رِوَايَةٍ سِتًّا اَلْاَرْبَعُ سُنَّةٌ وَرَكْعَتَانِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا اَوْ سِتًّا عَلٰى حَسْبِ الْاِخْتِلَافِ فِىْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ وَسُنَّتُهَا تَوَابِعُ لَهَا فَاُلْحِقَتْ بِهَا وَلَوْ اَقَامَ فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَا يَفْسُدُ اِعْتِكَافُهٗ لِاَنَّهٗ مَوْضَعُ اِعْتِكَافٍ اِلَّا اَنَّهٗ لَا يُسْتَحَبُّ لِاَنَّهُ الْتِزَامُ اَدَاءِهٖ فِىْ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا يُتِمُّهَا فِىْ مَسْجِدَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ ـ

অনুবাদ : প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এবং জুমার উদ্দেশ্য ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হলো আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস– হযরত নবী করীম ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁর ই'তিকাফের স্থান থেকে বের হতেন না। তা ছাড়া এ প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ও জানা বিষয়। আর তা সারার জন্য বের হওয়া অনিবার্য। সুতরাং এই প্রয়োজনে বের হওয়াটা ই'তিকাফের আওতা বহির্ভূত। তবে তাহারাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর বাইরে বিলম্ব করবে না। কেননা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যা কার্যকরী, তা প্রয়োজন পরিমাণেই সীমাবদ্ধ। আর জুমার বিষয় এ কারণে যে, তা তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ [দীনি] প্রয়োজন এবং এ প্রয়োজন দেখা দেওয়া জানা কথা। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জুমার উদ্দেশ্যে বের হওয়া ই'তিকাফকে ফাসিদ করে দেবে। কেননা, জামে মসজিদে ই'তিকাফ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। আর এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সকল মসজিদেই ই'তিকাফ করা শরিয়তসম্মত। আর শুরু করা যখন শুদ্ধ হলো তখন প্রয়োজনে বের হওয়ার বৈধতা অবশ্যই দান করবে। সূর্য যখন ঢলে পড়বে তখনই বের হবে। কেননা জুমার নামাজ আদায়ের জন্য ঐ সময়ের পরই সম্বোধন তার অভিমুখী হয়। যদি তার ই'তিকাফের স্থান জুমার মসজিদ থেকে দূরে হয়, তাহলে এমন সময়ে বের হবে যেন জুমার নামাজ পাওয়া সম্ভব হয় এবং তার পূর্বে চার রাকাত পড়া সম্ভব হয়। আরেক বর্ণনা মতে ছয় রাকাত– চার রাকাত সুন্নত এবং দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করতে পারে। আর সেখানে জুমার পরে জুমার সুন্নত সম্পর্কিত মতভেদ অনুযায়ী চার বা ছয় রাকাত আদায় করবে। জুমার সুন্নত হলো জুমার আনুষঙ্গিক। সুতরাং এগুলোকে জুমার সঙ্গেই যুক্ত করা হয়। যদি জামে মসজিদে এর চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করে তাহলে তার ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। কেননা, এটাও ই'তিকাফের স্থান। তবে তা পছন্দনীয় নয়। কেননা সে এক মসজিদে ই'তিকাফ আদায়ের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে দুই মসজিদে তা আদায় করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা এই যে, মু'তাকিফের জন্য ই'তিকাফের মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েজ নেই, তবে দুটো প্রয়োজনে বের হওয়া যায়। এক. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। যেমন– পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন। দুই. দীনি প্রয়োজনে। যেমন– জুমা ও জানাবাতের গোসলের প্রয়োজনে। মোট কথা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও মানবিক প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েজ। এর দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهٖ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় ই'তিকাফের স্থান থেকে বের হতেন না, তবে মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে [বের হতেন]।" অর্থাৎ পায়খানা ও প্রস্রাবের জন্য। দ্বিতীয় দলিল এই যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অবস্থা পূর্ব থেকেই জানা যায়। আর এটাও জানা যায় যে, সেগুলো পুরা করার জন্য বের হওয়া জরুরি। এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। সুতরাং এই জরুরতগুলোর জন্য বের হওয়াটা নিজেই [ই'তিকাফের] আওতা বহির্ভূত। কেননা, মানুষ গায়রে এখতিয়ারী [সাধ্যের বাইরের] বিষয়ের মুকাল্লাফ [শরিয়ত প্রয়োগ হয় যার উপর] হয় না। তবে এতটুকুন অবশ্যই লক্ষণীয় যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার পর তাহারাত থেকে ফারিগ হয়ে সাথে সাথে ই'তিকাফের স্থানে চলে যাবে। তাহারাত থেকে ফারিগ হয়ে ঘরে অবস্থান করবে না। কেননা, প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য বের হওয়া প্রয়োজনসাপেক্ষে প্রমাণিত। আর যে জিনিস প্রয়োজনসাপেক্ষে প্রমাণিত হয় তা প্রয়োজন পরিমাণেই প্রমাণিত হয়। এজন্য প্রয়োজন পরিমাণ সময় ই'তিকাফের মসজিদ থেকে বাইরে থাকার এজাযত হবে। এর চেয়ে অধিক পরিমাণের এজাযত নেই। তবে জুমার জন্য বের হওয়া এটা তো আমাদের মাজহাব।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে জুমার জন্য বের হওয়াও জায়েজ নেই। এমনকি যদি [তারা] জুমার নামাজ আদায়ের জন্য বের হয় তবে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। তাদের দলিল এই যে, বের হওয়া এটা হলো ই'তিকাফ তথা অবস্থানের বিপরীত। আর কোনো বস্তু তার বিপরীত দ্বারা ফাসিদ হয়ে যায়। এজন্য ই'তিকাফ মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ঐ সকল সুরতে ফাসিদ হবে না, যে সকল সুরতে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন– পায়খানা-পেশাবের জন্য বের হওয়া। আর জুমার নামাজের জন্য বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, সে যদি সাত দিনের কমের ই'তিকাফ করে তাহলে যে মসজিদে ইচ্ছা ই'তিকাফ করতে পারে। আর যদি সাত দিন বা তার চেয়ে অধিকের ই'তিকাফ করে তবে জামে মসজিদে ই'তিকাফ করবে। সুতরাং এই দুই সুরতে এমন কোনো জরুরত পাওয়া যায়নি যা জুমার নামাজের জন্য বের হওয়াকে জায়েজ করে। আর যখন এমন জরুরত পাওয়া যায়নি জুমার নামাজের জন্য বের হওয়ারও এজাযত হবে না।

আমাদের দলিল এই যে, দলিল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ করার বিধান শরিয়তসম্মত। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ সুতরাং যখন প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ শরিয়ত সম্মত তখন জুমার জন্য বের হওয়া তার ই'তিকাফের নজরের থেকে এমনভাবে বহির্ভূত হবে যেমনিভাবে মানবিক প্রয়োজনের জন্য বের হওয়া বহির্ভূত। কেননা ই'তিকাফের এজাযতের জন্য জুমার নামাজ তরক করা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না। কারণ, নজরের কারণে ই'তিকাফ ওয়াজিব হওয়া জুমার নামাজ ওয়াজিব হওয়ার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের। জুমার নামাজ আল্লাহ তা'আলা ওয়াজিব করলে ওয়াজিব হয়। আর ই'তিকাফ বান্দা ওয়াজিব করলে ওয়াজিব হয়। যেমন– বান্দা ই'তিকাফের নজর করল। বান্দার জন্য আল্লাহর ওয়াজিবকৃত অজীফাকে বিলুপ্ত করার এজাজত নেই। সুতরাং বুঝা গেল, ই'তিকাফের কারণে জুমার নামাজ তরক করা যাবে না। আর যখন জুমার নামাজ তরক করা যাবে না তখন জুমার নামাজের জন্য বের হওয়ার এজাজত হবে। তবে জুমার নামাজের জন্য কখন বের হওয়ার এজাজত রয়েছে? এর হুকুম হলো এই যে, ই'তিকাফের স্থান যদি জামে মসজিদের নিকটবর্তী হয় তাহলে জাওয়ালের পর বের হবে। কারণ, জুমার নামাজের জন্য সম্বোধন জাওয়ালের পরেই তার অভিমুখী হয়। আর যখন এই সম্বোধন তার অভিমুখী হবে তখনই জরুরত দেখা দেবে। আর যখন জরুরত দেখা দেবে তখনই জুমার নামাজের জন্য বের হওয়া জায়েজ হবে।

কিন্তু ই'তিকাফের স্থান যদি জামে মসজিদ থেকে দূরে হয় তবে এতটুকুন পূর্বে বের হওয়ার এজাজত রয়েছে যে, তার জুমার নামাজ খুতবাসহ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং খুতবার পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়তে পারে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জুমার পূর্বে ছয় রাকাত পড়তে পারে– চার রাকাত সুন্নত আর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ। মু'তাকিফের জন্য এজাজত রয়েছে যে, সে জুমার পর চার রাকাত সুন্নত জামে মসজিদে আদায় করবে। যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে। কিংবা ছয় রাকাত পড়বে। যেমনটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন। তার দলিল এই যে, জুমার সুন্নত হলো জুমার আনুষঙ্গিক। তাই সুন্নতগুলোকেও জুমার নামাজের সাথে যুক্ত করা হবে। অর্থাৎ যেমনিভাবে জুমার নামাজের জন্য দীনি জরুরত সাব্যস্ত আছে, তেমনিভাবে তার সুন্নতের জন্যও সাব্যস্ত হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদে ই'তিকাফকারী ব্যক্তির জন্য জামে মসজিদে জুমার নামাজ, খুতবা এবং তার সুন্নতগুলো আদায় করা যায় এই পরিমাণ সময় অবস্থান করার এজাজত রয়েছে। তবে যদি এর চেয়ে অধিক সময় অবস্থান করে, তবে তার ই'তিকাফ ফাসিদ তো হবে না, কিন্তু অনুত্তম বা অপছন্দনীয় হবে। ই'তিকাফতো এ কারণে ফাসিদ হবে না যে, জামে মসজিদও ই'তিকাফের স্থান। আর অপছন্দনীয় এজন্য যে, সে এক মসজিদে ই'তিকাফ আদায় নিজের উপর লাজিম করেছিল। তাই বিনা জরুরতে দুই মসজিদে পুরা করবে না। উক্ত ইবারত দ্বারা বুঝা গেল, যদি সে জামে মসজিদে পুরা করে ফেলে কিংবা অধিক সময় অবস্থান করে তবে ই'তিকাফ তো হয়ে যাবে, কিন্তু মাকরূহ হবে এবং এ কথাও জানা গেল যে, ওজরের কারণে এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে স্থানান্তর হওয়া জায়েজ আছে। যেমন– যে মসজিদে ই'তিকাফ করছিল সে মসজিদের ছাদ ধ্বসে গেল কিংবা ঐ মসজিদে প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে তবে এই মসজিদ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েজ আছে। আল্লাহ-ই সম্যক অবগত।

وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اِعْتِكَافُهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِوُجُوْدِ الْمُنَافِىْ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَالَا لَا يَفْسُدُ حَتّٰى يَكُوْنَ اَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ الْاِسْتِحْسَانُ لِاَنَّ فِى الْقَلِيْلِ ضَرُوْرَةً قَالَ وَاَمَّا الْاَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ يَكُوْنُ فِىْ مُعْتَكَفِهٖ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مَاْوٰى اِلَّا الْمَسْجِدَ وَلِاَنَّهٗ يُمْكِنُ قَضَاءُ هٰذِهِ الْحَاجَةِ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا ضَرُوْرَةَ اِلَى الْخُرُوْجِ -

অনুবাদ : যদি বিনা প্রয়োজনে কিছু সময়ের জন্যও মসজিদ থেকে বাইরে যায় তাহলে তার ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কেননা ই'তিকাফের বৈপরীত্য পাওয়া গেছে। এটাই কিয়াসের দাবি। সাহেবাইন (র.) বলেন, অর্ধেক দিনের বেশি না হলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। এটাই সূক্ষ্ম কিয়াসের (اِسْتِحْسَانٌ) দাবি। কেননা সামান্য সময় প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পানাহার ও ঘুম ই'তিকাফ স্থলেই হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ-এর মসজিদ ছাড়া এ সবের জন্য আর কোনো স্থান ছিল না। তা ছাড়া এই প্রয়োজনগুলো তো মসজিদে সমাধা করা সম্ভব। সুতরাং বের হওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মু'তাকিফ যদি বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বের হয় এবং তা যদি সামান্য সময়ের জন্যেও হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর এটাই হলো কিয়াসের দাবি। সাহেবাইন (র.) বলেন, ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। হ্যাঁ যদি অর্ধেক দিনের বেশি সময় বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বাইরে থাকে তাহলে ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই ইস্তিহ্সানের দাবি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, ই'তিকাফের রুকন হলো মসজিদে অবস্থান করা। মসজিদ থেকে বের হওয়া তার বিপরীত। আর বস্তু তার বিপরীত বা উল্টো বস্তু দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্য ই'তিকাফ মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা ফউত হয়ে যাবে। বের হওয়াটা চাই অল্প সময়ের জন্য হোক বা বেশি সময়ের জন্য হোক। যেমন– রোজা অবস্থায় আহার করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। সামান্য আহার করুক বা বেশি আহার করুক। আরো যেমন– হদস হওয়া শর্তহীনভাবে অজু ভঙ্গকারী। হদস অল্প হোক বা বেশি হোক। সাহেবাইনের দলিল এই যে, সামান্য সময়ের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া কষ্ট লাঘবের জন্য ক্ষমাযোগ্য। আর অধিক সময়ের জন্য বের হওয়া ক্ষমাযোগ্য নয়। কম-বেশির মাঝে ব্যবধানকারী হলো অর্ধেক দিনের বেশি। অর্থাৎ অর্ধেক দিনের বেশি হলে অধিক বলা হবে। আর অর্ধেক দিন বা তার চেয়ে কম হলে স্বল্প বলা হবে। যেমন রমজানে অর্ধেক দিনের বেশি সময়ে নিয়ত পাওয়া গেলে রোজা হয়ে যাবে; অন্যথায় হবে না।

قَالَ وَاَمَّا الْاَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ মাসআলা : মু'তাকিফের জন্য মসজিদে পানাহার করা এবং ঘুম যাওয়া জায়েজ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থান ছিল না। আর যখন মসজিদ ভিন্ন অন্য কোনো ঠিকানা ছিল না বুঝা গেল, পানাহার করা ও শয়ন করা তথায় হতো।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, ঐ খানাপিনা ও শয়নের জরুরতকে মসজিদে পুরা করা সম্ভবও। তাই এগুলোর জন্য বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَبِيْعَ وَيَبْتَاعَ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُحْضِرَ السِّلْعَةَ لِاَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ اِلَى ذٰلِكَ بِاَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَقُوْمُ بِحَاجَتِهٖ اِلَّا اَنَّهُمْ قَالُوْا يُكْرَهُ اِحْضَارُ السِّلْعَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِاَنَّ الْمَسْجِدَ مُحَرَّزٌ عَنْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَفِيْهِ شُغْلُهُ بِهَا وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيْهِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ اِلَى اَنْ قَالَ وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ ـ

অনুবাদ : মসজিদে পণ্য উপস্থিত না করে ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা এর প্রয়োজন হতে পারে। যেমন– তার প্রয়োজন সম্পন্ন করে দেওয়ার মতো কাউকে পায় না। তবে ফকীহ্গণ বলেছেন যে, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পণ্য উপস্থিত করা মাকরূহ। কেননা মসজিদকে বান্দার হক থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। আর পণ্য উপস্থিত করায় মসজিদকে তাতে লিপ্ত করা হয়। মু'তাকিফ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ .... وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ "তোমাদের মসজিদ গুলোকে তোমাদের বাচ্চাদের থেকে পৃথক রাখবে এবং তোমাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকেও।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মু'তাকিফের জন্য মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হলো পণ্য মসজিদের বাইরে রাখতে হবে। কেননা, অনেক সময় মু'তাকিফের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর কোনো ব্যক্তি তার কাছে এমনও থাকে না, যে তা ব্যবস্থা করে দেবে। তাই প্রয়োজনসাপেক্ষে মু'তাকিফকে তার এজাজত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফকীহ্গণ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মসজিদে দ্রব্যসামগ্রী উপস্থিত করাকে মাকরূহ বলেছেন। কারণ, মসজিদ হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং বান্দার হক থেকে তাকে মুক্ত রাখা হয়েছে। সুতরাং যেহেতু মসজিদে পণ্য উপস্থিত করার মধ্যে তাকে বান্দার হক ও পণ্যের সাথে লিপ্ত হওয়া লাজিম আসে, এজন্য মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হাজির করার এজাজত নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মু'তাকিফ ছাড়া অন্য ব্যক্তির জন্যও মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ। দলিল এই যে, ইমাম ইবনে মাজাহ্ (র.) তার সুনানের মধ্যে হযরত ওয়ায়িলা ইবনুল আসকা' সূত্রে বর্ণনা করেছেন–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ وَاتَّخِذُوْا عَلَى اَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوْهَا فِى الْجُمَعِ ـ

অর্থ–রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে তোমাদের বাচ্চাদের থেকে, মাতালদের থেকে, ক্রয়-বিক্রয় থেকে, ঝগড়া-বিবাদ থেকে, উচ্চৈঃস্বর করা থেকে, হদ তথা বিচারকার্য সম্পাদন করা থেকে এবং তলোয়ার গুলোকে উন্মুক্ত রাখা থেকে পৃথক রাখবে এবং তোমাদের মসজিদগুলোর দরজায় তাহারাতের স্থল বানাও এবং জুমার দিনে [মসজিদগুলোতে] সুগন্ধির ধুনী দাও।

হাদীসের চার সুনানের কিতাবের মধ্যে আমর ইবনে শুআইব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ يُنْشِدَ فِيْهِ ضَالَّةً اَوْيُنْشِدَ فِيْهِ شِعْرًا وَنَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

অর্থ–রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা, হারানো বস্তু অনুসন্ধান করা, কবিতা আবৃত্তি করা এবং জুমার নামাজের পূর্বে হালকা বন্দী [গোলাকার হয়ে] বসা থেকে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) ও ইমাম নাসাঈ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক হাদীস বর্ণনা করেছেন যে– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاَيْتُمُوْهُ يَبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا رَبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَمَنْ رَاَيْتُمُوْهُ يُنْشِدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ ـ

অর্থ–হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তোমরা যাকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে বলবে, আল্লাহ তোমার ব্যবসায় বরকত না দিক। আর যাকে মসজিদে হারানো জিনিস তালাশ করতে দেখবে তাকে বলবে, আল্লাহ তোমাকে তা ফেরত না দিক।

এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ এবং মাকরূহ।

قَالَ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ لِأَنَّ صَوْمَ الصَّمْتِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فِي شَرِيْعَتِنَا لٰكِنَّهُ يَتَجَانَبُ مَا يَكُوْنُ مَاثَمًا وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْئُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَذَا اللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ لِأَنَّهُ دَوَاعِيْهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذْ هُوَ مَحْظُوْرُهُ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّ الْكَفَّ رُكْنُهُ لَا مَحْظُوْرُهُ فَلَمْ يَتَعَدَّ إِلٰى دَوَاعِيْهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর ই'তিকাফকারী কল্যাণমূলক ছাড়া কোনো কথা বলবে না। তবে তার পক্ষে একেবারে চুপ থাকা মাকরূহ। কেননা, আমাদের শরিয়তে নীরবতার রোজা ইবাদতরূপে গণ্য নয়। কিন্তু যেসব কথায় গুনাহ হয়, তা পরিহার করে চলবে। আর মু'তাকিফের জন্য সহবাস করা হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ "তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে না।" অনুরূপভাবে স্পর্শ ও চুম্বনও হারাম। কেননা, তা সহবাসের আবেদন সৃষ্টিকারী। সুতরাং তা হারাম হবে। কারণ, সহবাস হলো ই'তিকাফের নিষিদ্ধ কাজ। যেমন– ইহরাম অবস্থায় [এগুলো হারাম] সিয়াম-এর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বিরত থাকা সিয়ামের রুকন; সিয়ামের নিষিদ্ধ কাজ নয়। সুতরাং আবেদন সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর দিকে তা সম্প্রসারিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মু'তাকিফ-এর উচিত খারাপ কথাবার্তা না বলা; বরং ভালো ভালো কথাবার্তা বলা। আবার ইবাদত মনে করে একদম চুপ থাকাও মাকরূহ। এর একটি মতলব তো এই যে, একদম কথা না বলার নজর করে নেওয়া, যা পূর্ববর্তী শরিয়তে ছিল। আরেকটি মতলব হলো এই যে, নজর ছাড়াই চুপ থাকে, একদম কথাবার্তা বলে না। অপর একটি মতলব এই যে, রোজার নিয়ত করবে। অর্থাৎ তিনটি রোজা ভঙ্গকারী বস্তু থেকে বিরত থাকার নিয়ত করবে এবং এর সাথে সাথে কথা না বলারও নিয়ত করবে। উপরিউক্ত আলোচনায় এই তৃতীয় সুরতটিই অধিক সমীচীন। কারণ, হিদায়া গ্রন্থকার এই দলিল বর্ণনা করেছেন যে, চুপ থাকার রোজা আমাদের শরিয়তে ইবাদত নয়; বরং অগ্নিপূজকদের কাজ। সুতরাং অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য একদম চুপ থাকা মাকরূহ। কিন্তু গুনাহের কথাবার্তা থেকে আলাদা থাকবে।

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْئُ الخ **মাসআলা :** মু'তাকিফ যদি প্রাকৃতিক জরুরতের জন্য মসজিদের বাইরে গমন করে এবং প্রাকৃতিক জরুরত পুরা করে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসও করে ফেলে, তবে তার এই কাজ হারাম হবে। অর্থাৎ ই'তিকাফ অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম। কারণ, নবী যুগে লোকদের এই অভ্যাস ছিল যে, তারা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন। পরে গোসল সেরে নিজের ই'তিকাফ স্থানে এসে বসে পড়তেন। তখন আল্লাহর বাণী– وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ অবতীর্ণ হলো। যার মধ্যে ই'তিকাফ অবস্থায় সঙ্গম করতে বারণ করা হয়েছে। মু'তাকিফের জন্য স্ত্রীকে স্পর্শ করা এবং চুম্বন করাও হারাম। কেননা এ দুটো কাজ সহবাসের আবেদন সৃষ্টিকারী। সহবাস যেহেতু ই'তিকাফের নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্য থেকে একটি। আর যে জিনিস নিষিদ্ধ হয় তা হারাম হয়। তাই এই দু'কাজও মু'তাকিফের উপর হারাম হবে। যেমন– ইহরাম অবস্থায় যেমনিভাবে সহবাস হারাম, তেমনিভাবে সহবাসের আবেদন সৃষ্টিকারীও হারাম। রোজার বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ, রোজা অবস্থায় সহবাস তো হারাম এবং রোজা ভঙ্গকারী। তবে স্পর্শ ও চুম্বন রোজা ভঙ্গকারী নয়। কেননা সহবাস রোজার নিষিদ্ধ-এর মধ্য থেকে নয়; বরং সহবাস থেকে বিরত থাকা রোজার রুকন। আর কোনো বস্তুর রুকন অন্যের দিকে সম্প্রসারিত হয় না। এজন্য সহবাস রোজার মধ্যে সহবাসের আবেদন সৃষ্টিকারীর দিকে সম্প্রসারিত হবে না। অর্থাৎ এটা হবে না যে, যেমনিভাবে সহবাস থেকে বিরত থাকা রোজার রুকন তেমনিভাবে স্পর্শ ও চুম্বন থেকে বিরত থাকাও রোজার রুকন। আর যখন ঐ দুটি বস্তু থেকে বিরত থাকা রোজার রুকন নয় তখন এগুলোর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা রোজাও ভঙ্গ হবে না।

فَإِنْ جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ لِأَنَّ اللَّيْلَ مَحَلُّ الْاِعْتِكَافِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَحَالَةُ الْعَاكِفِيْنَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ وَلَوْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَاَنْزَلَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمِسَ فَاَنْزَلَ يَبْطُلُ اِعْتِكَافُهُ لِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْجِمَاعِ حَتّٰى يَفْسُدَ بِهِ الصَّوْمُ وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَا يَفْسُدُ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ الْمُفْسِدُ وَلِهٰذَا لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ .

অনুবাদ : যদি রাতে কিংবা দিনে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলে সহবাস করে তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা [দিবসের ন্যায়] রাত্রও ই'তিকাফের সময়। রোজার বিষয়টি এর বিপরীত। [অর্থাৎ ভুলের দ্বারা ফাসিদ হয় না, কিন্তু] ই'তিকাফকারীর অবস্থা স্বয়ং স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং ভুলের কারণে তাকে মাযূর ধরা হবে না। যদি যোনিপথ ছাড়া অন্যভাবে সঙ্গম করে আর বীর্যস্খলন ঘটে কিংবা যদি স্পর্শ বা চুম্বন করার ফলে বীর্যস্খলন ঘটে তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এর মধ্যে সঙ্গমের মর্ম বিদ্যমান। এ কারণেই তা দ্বারা রোজা ফাসিদ হয়ে যায়। যদি বীর্যস্খলন না ঘটে তাহলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না, যদিও তা হারাম। কেননা, তাতে সঙ্গমের মর্ম বিদ্যমান নেই। আর সেটাই হলো ফাসিদকারী। এ কারণেই তা দ্বারা রোজা ফাসিদ হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মু'তাকিফ রাতে বা দিনে স্বেচ্ছায় বা ভুলে সহবাস করে ফেলে তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। বীর্যপাত ঘটুক বা বীর্যপাত না ঘটুক। কেননা রাতও ই'তিকাফের সময়। সুতরাং যে সকল জিনিস ই'তিকাফের কারণে দিনে নিষিদ্ধ এগুলো রাতেও নিষিদ্ধ হবে। রোজার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা রাত রোজার সময় নয়। তাই রোজার কারণে যে সকল জিনিস দিনে নিষিদ্ধ সেগুলো রোজার কারণে রাতে নিষিদ্ধ হবে না। সুতরাং যারা ই'তিকাফ করে না তাদের জন্য রমজানের রাতগুলোতে সহবাস করা জায়েজ, কিন্তু মু'তাকিফের জন্য জায়েজ নয়। হ্যাঁ, কেউ যদি এই প্রশ্ন করে যে, ই'তিকাফ হলো রোজার শাখা (فَرْع) আর শাখা (فَرْع) হুকুমের ক্ষেত্রে আসল (اَصْل) তথা মূলের সাথে যুক্ত হয়। তাই যেমনিভাবে রমজানের দিনে ভুলবশত সহবাস করার দ্বারা রোজা ফাসিদ হয় না তেমনিভাবে ভুলবশত সহবাস করার দ্বারাও ই'তিকাফ ফাসিদ না হওয়া উচিত। অথচ আপনাদের কথা মতে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়। এর জবাব এই যে, ই'তিকাফের অবস্থা হলো স্মারক (مُذَكِّرٌ) অর্থাৎ ই'তিকাফের অবস্থা সর্বদা মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি ই'তিকাফরত। আর রোজার অবস্থা স্মারক নয়। কারণ, কার্যত রোজাদারও অ-রোজাদার উভয়ে বরাবর। সুতরাং যেহেতু ই'তিকাফের অবস্থা হলো স্মারক এজন্য ই'তিকাফের অবস্থায় ভুলকে ওজর ধরা হবে না। আর রোজার অবস্থা যেহেতু স্মারক নয় তাই রোজার অবস্থায় ভুলকে ওজর ধরা হয়েছে।

وَلَوْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ الخ সূরতে মাসআলা এই যে, যদি মু'তাকিফ যোনিপথ ছাড়া রান ইত্যাদিতে সহবাস করে এবং বীর্যস্খলন ঘটে। কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ করে বা চুম্বন করে এবং বীর্যপাত ঘটে তবে এই সকল সুরতে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, এভাবে চাহিদা মেটানোর মধ্যে সহবাসের মর্ম পাওয়া যায়। এ কারণেই এর দ্বারা রোজা ফাসিদ হয়ে যাবে। আর সহবাস দ্বারা রোজা ফাসিদ হয়ে যায়, তাই যা কিছুতে সহবাসের মর্ম পাওয়া যাবে তা দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি উপরিউক্ত সুরতগুলোতে বীর্যপাত না ঘটে তাহলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। যদিও ই'তিকাফ অবস্থায় এই কাজগুলো হারাম। কেননা বীর্য ছাড়া এ কাজগুলো সহবাসের মর্মে হবে না। অথচ সহবাস হলো ই'তিকাফ বিনষ্টকারী। আর যেহেতু যোনিপথ ছাড়া অন্য স্থানের মধ্যে বীর্যপাত ছাড়া রতিক্রিয়া সহবাসের মর্মে পড়ে না, তাই এর দ্বারা রোজা ফাসিদ হবে না।

وَمَنْ اَوْجَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ اِعْتِكَافَ اَيَّامٍ لَزِمَهٗ اِعْتِكَافُهَا بِلَيَالِيْهَا لِاَنَّ ذِكْرَ الْاَيَّامِ عَلٰى سَبِيْلِ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ مَا بِاِزَائِهَا مِنَ اللَّيَالِيْ يُقَالُ مَارَاَيْتُكَ مُنْذُ اَيَّامٍ وَالْمُرَادُ بِلَيَالِيْهَا وَكَانَتْ مُتَتَابِعَةً وَاِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ لِاَنَّ مَبْنَى الْاِعْتِكَافِ عَلَى التَّتَابُعِ لِاَنَّ الْاَوْقَاتَ كُلَّهَا قَابِلَةٌ لَهٗ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِاَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ لِاَنَّ اللَّيَالِيَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُّقِ حَتّٰى يَنُصَّ عَلَى التَّتَابُعِ وَاِنْ نَوَى الْاَيَّامَ خَاصَّةً صَحَّتْ نِيَّتُهٗ لِاَنَّهٗ نَوَى الْحَقِيْقَةَ وَمَنْ اَوْجَبَ اِعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ يَلْزَمُهٗ بِلَيَالِيْهِمَا وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ (رح) لَا تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْاُوْلٰى لِاَنَّ الْمُثَنّٰى غَيْرُ الْجَمْعِ وَفِي الْمُتَوَسِّطَةِ ضَرُوْرَةُ الْاِتِّصَالِ وَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ فِي الْمُثَنّٰى مَعْنَى الْجَمْعِ فَيُلْحَقُ بِهٖ اِحْتِيَاطًا لِاَمْرِ الْعِبَادَةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নিজের উপর কতক দিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব করল, তার উপর সেই দিনগুলোর রাত্রিসহ ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। কেননা, বহুবচনরূপে দিনগুলো উল্লেখ করলে তার পাশাপাশি রাত্রিগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন বলা হয়– আমি তোমাকে কয়েকদিন থেকে দেখিনি। এখানে সে দিনগুলোর দ্বারা রাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর দিনগুলো অবিরাম হবে। যদিও ধারাবাহিকতার শর্ত আরোপ না করা হয়। কেননা ই'তিকাফের ভিত্তিই হলো ধারাবাহিকতার উপর। কারণ রাত্র-দিন সমগ্র সময়টুকুই ই'তিকাফযোগ্য। রোজার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা রোজার ভিত্তি হলো বিচ্ছিন্নতার উপর। কারণ রাত্রগুলো রোজার উপযুক্ত নয়। সুতরাং যতক্ষণ না অবিরামতার কথা স্পষ্ট বলবে, ততক্ষণ বিচ্ছিন্নভাবে রোজা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি শুধু দিবসগুলোর ই'তিকাফের নিয়ত করে থাকে তাহলে তার নিয়ত সহীহ হবে। কেননা সে শব্দটির হাকীকত বা মৌল অর্থ উদ্দেশ্য করেছে। যে ব্যক্তি দু'দিনের ই'তিকাফ নিজের উপর ওয়াজিব করল, তার উপর ঐ দু'দিনের রাত্রসহ ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, প্রথম রাত্রটি দাখিল হবে না। কেননা, দ্বিবচন তো বহুবচন থেকে ভিন্ন। আর মধ্যবর্তী রাত্রটির সংযুক্তি প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত হবে। জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল এই যে, দ্বিবচনের মাঝে বহুবচনের অর্থ রয়েছে। সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য দ্বিবচনকে বহুবচনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। আল্লাহই অধিক জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের উপর কিছু দিনের ই'তিকাফ লাজিম করে। যেমন সে বলল– আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর দশ দিনের ই'তিকাফ লাজিম। তাহলে দশ দিনের ই'তিকাফ তার রাতসহ লাজিম হবে এবং অবিরাম লাজিম হবে, যদিও ধারাবাহিকতার শর্ত আরোপ করা না হয়। দিনের উল্লেখ দ্বারা রাত্র এজন্য শামিল হবে যে, নীতি রয়েছে, বহুবচনরূপে দিনগুলোর উল্লেখ দ্বারা তার বিপরীত জাতগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন কেউ বলল– مَا رَاَيْتُكَ مُنْذُ اَيَّامٍ 'আমি তোমাকে কয়েক দিন থেকে দেখিনি', এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কয়েক দিন তাকে রাতসহ দেখেনি। এ উদ্দেশ্য কখনো

নয় যে, আমি তোমাকে কয়েক দিন অর্থাৎ দিনে দেখিনি, রাতে দেখেছি। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে যে, আমি অমুক ব্যক্তির সাথে একমাস কথাবার্তা বলব না। তার এই শপথ রাত-দিন উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন আপনি হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনার দিকে লক্ষ্য করুন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একবার বলেছিলেন- أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا আরেক বার বলেছিলেন- أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا দুই আয়াতেই একই ঘটনা আলোচিত হয়েছে। শুধু এক স্থানে أَيَّامٌ শব্দ আর অপর স্থানে لَيَالٍ শব্দ রয়েছে। সুতরাং আয়াতের তাবীল তথা ব্যাখ্যা এই যে, দিনগুলো রাতসহ উদ্দেশ্য এবং রাতগুলো দিনসহ উদ্দেশ্য।

মোদ্দা কথা বুঝা গেল যে, বহুবচনরূপে দিনগুলোর উল্লেখ দ্বারা তার রাতগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি কয়েক দিনের ই'তিকাফের নজর করে তবে এই ই'তিকাফ দিনরাতসহ ওয়াজিব হবে। আর ধারাবাহিকতার এজন্য লাজিম হবে যে, ই'তিকাফের ভিত্তিই হলো ধারাবাহিকতার উপর। কারণ, রাত-দিনের সবটুকুন সময় ই'তিকাফযোগ্য। রোজার বিষয়টি এর বিপরীত। যদি কয়েক দিনের রোজার নজর করে তবে এই রোজা ধারাবাহিকতার সাথে অবধারিত হবে না; বরং তার এখতিয়ার থাকবে। অবিরাম তার সাথে রাখবে বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখবে। কেননা রোজার ভিত্তি হলো বিচ্ছিন্নতার উপর। কারণ, রাতগুলো তো রোজার যোগ্য নয়; বরং রোজা শুধু দিনেই হয়। আল্লাহ পাকের ইরশাদ রয়েছে- أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ সুতরাং যখন রোজার তিত্তি বিচ্ছিন্নতার উপর কয়েক দিনের রোজার নজর করার দ্বারা ঐ রোজাগুলোও বিচ্ছিন্নভাবে ওয়াজিব হবে। ধারাবাহিকতার ওয়াজিব হবে না; হ্যাঁ যদি রোজার মধ্যেও ধারাবাহিকতার শর্ত আরোপ করা হয় তবে অবশ্যই ধারাবাহিকতার লাজিম হবে। আর যদি কেউ কয়েক দিনের ই'তিকাফের নজর করে আর আইয়াম দ্বারা বিশেষভাবে দিনেরই নিয়ত করে, তাহলে তার নিয়ত সহীহ। কেননা সে হাকীকত-এর নিয়ত করেছে। যেমন এভাবে বলেছিল যে, আমার উপর দশ দিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব আর দশদিন দ্বারা দিনেরই নিয়ত করেছে। রাতের নিয়ত করেনি। তখন তার উপর শুধু দশ দিনেরই ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। রাতের ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে না।

وَمَنْ أَوْجَبَ إِعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ الخ **মাসআলা :** যদি কোনো ব্যক্তি দুই দিনের ই'তিকাফের নজর করে তাহলে তার উপর দুই দিনের ই'তিকাফ রাত্রসহ লাজিম হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, প্রথম রাত্রটি দাখিল হবে না। তাহলে বুঝা গেল, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুই দিন ও এক রাত্রির ই'তিকাফ লাজিম হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, দ্বিবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই দ্বিবচন ও একবচন একই রকম হবে। অর্থাৎ যে হুকুম একবচনের হবে একই হুকুম দ্বি-বচনের হবে। আর একবচন অর্থাৎ يَوْمًا বলার ক্ষেত্রে প্রথম রাত নজরের হুকুমে দাখিল হয় না। অর্থাৎ শুধু সূর্য উদয় থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। রাতের ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে না। সুতরাং এমনিভাবে দ্বিবচন অর্থাৎ يَوْمَيْنِ বলার ক্ষেত্রেও প্রথম রাত্রি দাখিল হবে না। তবে মধ্যবর্তী রাত দাখিল হবে। কেননা ই'তিকাফের জন্য সংযুক্ততা (اِتِّصَالٌ) জরুরি। আর সংযুক্ততা তখনই সম্ভব হবে যখন মধ্যবর্তী রাত্রেরও ই'তিকাফ করা হয়। সুতরাং সংযুক্ততার জরুরতের কারণে মধ্যবর্তী রাত দাখিল হবে। আর এই জরুরত যেহেতু রাতে বিদ্যমান নেই, তাই প্রথম রাত্রি দাখিল হবে না।

জাহিরী রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, দ্বিবচনের মধ্যে বহুবচনের মর্ম রয়েছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَلْإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ সুতরাং যেহেতু দ্বিবচনের মধ্যে বহুবচনের মর্ম রয়েছে আর ই'তিকাফ হলো ইবাদত। এজন্য ইবাদতের কারণে সতর্কতার জন্য দ্বিবচনকে বহুবচনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বহুবচন অর্থাৎ أَيَّامٌ-এর ক্ষেত্রে যত দিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব হয় তত রাতেরও ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। তাই দ্বিবচনের সুরতেও দুই দিনের সাথে সাথে দুই রাতেরও ই'তিকাফ লাজিম হবে। আল্লাহ-ই সম্যক অবহিত।

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় : হজ

হজ ইবাদাতে বাদানিয়্যাহ্ [শারীরিক ইবাদত] ও ইবাদাতে মালিয়্যাহ্ [অর্থ–সংক্রান্ত ইবাদত]-এর সমষ্টি। আর রোজা শুধু ইবাদাতে বাদানিয়্যাহ্। তাই রোজার পরে হজের আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, মুরাক্কাব [যৌগিক কোনো বিষয়] মুফরাদের [একক কোনো বিষয়ের] পরেই আসে। দ্বিতীয়ত রোজা প্রতিবছর ঘুরে-ফিরে আসে, কিন্তু হজের পুনরাবৃত্তি হয় না। জীবনে একবারই হজ করা ফরজ। এ কারণে হজের তুলনায় রোজার আবশ্যকতা বেশি। আর যে বিষয়ের আবশ্যকতা অধিক তা অগ্রগণ্য হওয়ার যোগ্য। তাই রোজার অধ্যায়কে হজের পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

حَجٌّ শব্দটির 'হা' যবরযুক্ত ও যেরযুক্ত উভয়ভাবে হতে পারে। 'হা' – যবরযোগে ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীতে– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ (الاية) আবার 'হা' – যেরযোগে এসেছে অপর এক আয়াতে– اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ (الاية)

حَجٌّ-এর আভিধানিক অর্থ : বড় কোনো বিষয় সম্পাদনের সংকল্প করা।

حَجٌّ-এর পারিভাষিক অর্থ : আর শরিয়তের পরিভাষায় حَجٌّ বলা হয়, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করা।

হজ কোন সালে ফরজ করা হয়েছে? এ সম্পর্কে 'বাযলুল মাজহূদ' গ্রন্থে একাধিক অভিমত বর্ণিত হয়েছে–

১. নবম হিজরিতে, ২. পঞ্চম হিজরিতে, ৩. ষষ্ঠ হিজরিতে, ৪. হিজরতের পূর্বে।

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) শরহে নিকায়াহ-তে লিখেছেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ দশম হিজরিতে ফরজ হজ পালন করেছেন– যা বিদায় হজ নামে পরিচিত। হযরত আবূ বকর (রা.) নবম হিজরিতে হজ আদায় করেছেন। এ বছরই হজ ফরজ হয়েছিল। আর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সুবাদে হযরত 'ইতাব ইবনে উসায়দ (রা.) লোকদেরকে হজ করিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর তাঁকেই মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন।

হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার হজ করেছিলেন– এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে আছীর বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে প্রতি বছরই হজ করেছেন। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার হজ করেছেন– হিজরতের পূর্বে দু-বার আর দশম হিজরিতে একবার– যা বিদায় হজ নামে খ্যাত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে তিনবার হজ করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধিক হজ করেছেন। যার সঠিক সংখ্যা আমাদের জানা নেই।

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর হজ ফরজ ছিল কিনা– এ সম্পর্কে দু ধরনের উক্তি পাওয়া যায়–

১. পূর্ববর্তী উম্মতের উপর হজ ফরজ ছিল। হাফিজ ইবনে হাজার (র.) এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. হজ ফরজ হওয়ার বিধান শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে নির্দিষ্ট; পূর্ববর্তী উম্মতের উপর হজ ফরজ ছিল না। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন যে, হাদীসে এসেছে– مَا مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا وَحَجَّ الْبَيْتَ অর্থাৎ 'প্রত্যেক নবীই (আ.) বায়তুল্লাহর হজ করেছেন।' তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) হিন্দুস্থান থেকে পায়ে হেঁটে ৪০ বার হজ করেছেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত আদম (আ.)-কে বলেছিলেন, আপনার সাত হাজার বছর পূর্ব থেকে ফেরেশতাগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করে আসছেন।

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তারা এর উত্তরে বলেন, এসব দলিল থেকে কেবল এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) সময়ে হজের বিধান প্রবর্তনের অর্থ– ফরজ বা ওয়াজিব ছিল– এমন নয়; কিংবা এও হতে পারে– পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) উপর হজ ওয়াজিব ছিল বটে, তবে তাঁদের উম্মতের উপর তা ওয়াজিব ছিল না। সুতরাং এ ভিত্তিতে বলা যায়– হজ নবীগণের (আ.) অন্যতম অনন্য বৈশিষ্ট্য আর উম্মতে মুহাম্মদীর অন্যতম বিশেষত্ব।

হজ ফরজ হওয়ার বিষয়টি কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কিতাবুল্লাহ-তে বিধৃত হয়েছে– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا এ আয়াতে عَلَى النَّاسِ-এর عَلٰى অব্যয়টি ওয়াজিব হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্নাতে রাসূলে এসেছে–

১. بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ (الحديث) অর্থাৎ 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।' তন্মধ্যে সামর্থ্যবানের উপর হজ একটি।

২. حُجُّوْا فَاِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوْبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ অর্থাৎ 'তোমরা হজ আদায় করো। কেননা হজ গুনাহসমূহকে এভাবে ধুয়ে মুছে ফেলে যেভাবে পানি ময়লাকে ধুয়ে মুছে ফেলে।

৩. مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ না করে মারা গেল সে যেন ইহুদি হয়ে মরে কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মরে।'

আর ইজমায়ে উম্মতের বিষয়টি সুস্পষ্ট। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সকল মুসলমান হজের ফরজিয়্যাতের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে আসছে।

اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْاَحْرَارِ الْبَالِغِيْنَ الْعُقَلَاءِ الْاَصِحَّاءِ اِذَا قَدَرُوْا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ اِلٰى حِيْنِ عَوْدِهِ وَكَانَ الطَّرِيْقُ اٰمِنًا وَصَفَهُ بِالْوُجُوْبِ وَهُوَ فَرِيْضَةٌ مُحْكَمَةٌ ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (اَلْاٰيَةَ) .

অনুবাদ : যারা স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক ও সুস্থ দেহের অধিকারী তাদের উপর হজ ওয়াজিব। যখন তারা পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হয়– আর তা বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পোষ্য পরিজনের খোরপোশ থেকে অতিরিক্ত হয় এবং পথও নিরাপদ হয়। গ্রন্থকার [আল্লামা কুদূরী (র.)] এখানে ওয়াজিব শব্দটি ব্যবহার করেছেন– অথচ তা অকাট্য ফরজ যা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا 'আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ ফরজ' ..... শেষ পর্যন্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার এখানে বলেছেন, হজ সেসব লোকের উপর ফরজ যারা স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক ও সুস্থ দেহের অধিকারী– যখন তারা পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হবে। এই শর্তে যে, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পোষ্য পরিজনের খোরপোশ থেকে অতিরিক্ত হয় এবং রাস্তাও নিরাপদ হয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন– আল্লামা কুদূরী (র.) হজের ক্ষেত্রে ওয়াজিব শব্দ ব্যবহার করেছেন, অথচ হজ অকাট্যভাবে ফরজ? হজ ফরজ হওয়ার বিষয়টি কিতাবুল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার বাণী– (الاية) وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ –আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত।

এর উত্তর হচ্ছে– কুদূরী গ্রন্থে ওয়াজিব শব্দ দ্বারা পরিভাষাগত ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়; বরং ওয়াজিব অর্থ হলো– সাব্যস্ত ও আবশ্যকীয়। অর্থাৎ হজ স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ দেহের অধিকারীর উপর আবশ্যক। এ ব্যাখ্যায় ওয়াজিব শব্দটি ফরজ অর্থ বহন করে।

وَلَا يَجِبُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ لَهُ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَا بَلْ مَرَّةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَلِأَنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ .

অনুবাদ : হজ জীবনে একবারই শুধু ফরজ হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– হজ কি প্রতিবছর ফরজ, না শুধু একবার ? তখন তিনি বললেন– না, বরং একবার। এর অতিরিক্ত যা করা হবে তা নফল হবে। তা ছাড়া হজ ফরজ হওয়ার কারণ হলো "বায়তুল্লাহ।" আর বায়তুল্লাহ তো একাধিক নয়। সুতরাং বারংবার ওয়াজিব হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হজ সারা জীবনে একবার ফরজ; প্রতিবছর তা ফরজ নয়। এর স্বপক্ষে দলিল হলো, মুসলিম শরীফের হাদীস–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ .

অর্থাৎ 'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বক্তৃতা করছিলেন– হে লোক সকল ! তোমাদের উপর হজ ফরজ। সুতরাং তোমরা হজ করো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, প্রতিবছর কি [তা ফরজ]? হে আল্লাহর রাসূল ! রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রইলেন – এমনকি ঐ ব্যক্তি তিনবার একই কথা বলল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে প্রতিবছর হজ ফরজ হতো। আর তা পালন করতে তোমরা কখনো সক্ষম হতে না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে এমন সব প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকো, যা আমি তোমাদের থেকে এড়িয়ে যাই। কেননা, তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত অধিক প্রশ্ন করার কারণে ও নবীদের সাথে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং যখন আমি তোমাদের কোনো কিছু করতে নির্দেশ দেই তা তোমরা সাধ্যমতো পালন করো। আর যখন তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করি তা তোমরা ছেড়ে দাও।'

এ হাদীসে لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ বাক্যটি এদিকে নির্দেশ করে যে, হজ বারংবার করতে হবে না। হজ জীবনে একবারই ফরজ। হজ বারংবার ওয়াজিব না হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে– হজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ বায়তুল্লাহ [আল্লাহর ঘর]। কেননা, হজ শব্দকে বায়তুল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে حَجُّ الْبَيْتِ বলা হয়েছে। আর সম্বন্ধযুক্তকরণ কোনো কিছুর কারণ হওয়ার চিহ্ন। [আরবিশাস্ত্রের এ নিয়মানুসারে] বুঝা গেল, হজের সবব তথা কারণ হচ্ছে বায়তুল্লাহ। আর বায়তুল্লাহ-তো একাধিক নয়; বরং তা একটি। স্মর্তব্য; সবব [কারণ] দ্বিত্ব না হলে মুসাববাব [ঐ কারণের ফলাফল]ও দ্বিত্ব হয় না। এ কারণেই বলা হয় যে, হজ জীবনে একবারই ফরজ।

ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) عَلَى التَّرَاخِىْ لِاَنَّهُ وَظِيْفَةُ الْعُمُرِ فَكَانَ الْعُمُرُ فِيْهِ كَالْوَقْتِ فِى الصَّلٰوةِ وَجْهُ الْاَوَّلِ اَنَّهُ يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ خَاصٍّ وَالْمَوْتُ فِىْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَتَضَيَّقُ اِحْتِيَاطًا وَلِهٰذَا كَانَ التَّعْجِيْلُ اَفْضَلَ بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ لِاَنَّ الْمَوْتَ فِىْ مِثْلِهِ نَادِرٌ -

---

অনুবাদ : আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে হজ [সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর] তৎক্ষণাৎ বা অবিলম্বে ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা (রা.) থেকে এক বর্ণনায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে তা বিলম্বে আদায় করা যায়। কেননা, তা পূর্ণ জীবনে অর্পিত ওয়াজিব। সুতরাং হজের ক্ষেত্রে পূর্ণ জীবন হলো সালাতের ক্ষেত্রে সময়ের মতো। প্রথমোক্ত মতের দলিল এই যে, হজ বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। আর এক বছর সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাই সতর্কতাবশত এর সময়সীমা সংকুচিত করা হয়েছে। আর এ কারণেই [সর্বসম্মতিক্রমে] তাড়াতাড়ি [হজ পালন] করা উত্তম। সালাতের সময়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটে যাওয়া বিরল ঘটনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে হজ ফরজ হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া যায় তখন সে ব্যক্তির উপর ঐ বছরই হজ আদায় করা ওয়াজিব নাকি বিলম্বে ওয়াজিব? [এ সম্পর্কে] ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত হচ্ছে – অবিলম্বে ঐ বছরই আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। সুতরাং ওজর ছাড়া হজ পালনে যদি বিলম্ব করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমতও এরূপ। ইমাম কারখী (র.)ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যা হজ অবিলম্বে ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন বর্ণিত আছে, একবার ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– যদি কোনো ব্যক্তির নিকট [শর্ত পরিমাণ] সম্পদ থাকে, তাহলে সে কি হজ করবে নাকি বিবাহ করবে? ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছিলেন, সে হজ করবে। এ থেকে বুঝা যায়, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট [সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর] অবিলম্বে হজ আদায় করা ওয়াজিব।

অপরদিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট হজ বিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব। এমনকি যে ব্যক্তির উপর ওয়াজিব সে ব্যক্তি যদি প্রথম বছর হজ পালন না করে বিলম্বিত করে, তাহলে তাঁদের নিকট সে গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিলম্বের অনুমতি এই শর্তে ধর্তব্য হবে– যাতে মৃত্যুর ফলে হজ অনাদায় থেকে না যায়। সুতরাং [তাঁর মতে] যদি সে ব্যক্তি হজ পালনে বিলম্ব করে এবং পালন না করেই মারা যায়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট বিলম্বিত করার কারণে কেউ গুনাহগার হবে না; যদিও [হজ পালনের পূর্বে] মারা যায়।

যাহোক তাঁদের [ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর] দলিল হলো– হজ পূর্ণ জীবনে অর্পিত ওয়াজিব। সুতরাং হজের ক্ষেত্রে পূর্ণ জীবন হলো, সালাতের সময়ের মতো। অতএব নামাজ যেরূপ শেষ সময়ে আদায় করা জায়েজ সেরূপ হজও জীবনের শেষে আদায় করা জায়েজ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণিত অভিমতের দলিল হলো, হজ নির্দিষ্ট সময় তথা হজের মাস– শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহজ -এর সাথে সম্পৃক্ত। যখন কোনো কিছু নির্দিষ্ট কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়, আর তা ঐ নির্দিষ্ট সময়ে ফউত হয়ে [ছুটে] যায়–তাহলে তা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আদায় করতে হবে। এখন হজের সময় চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বছরে তা আদায় করবে। আর এক বছর সময় দীর্ঘ। এ সময়ে জীবন-মরণ সমান তথা এ সময়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়; বরং মৃত্যু এসেই থাকে। তাই সতর্কতার কারণে হজের সময়সীমা সংকুচিত করা হয়েছে। তাই বলা হয়, যে বছর [কোনো ব্যক্তির মধ্যে] হজ ফরজ হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া যায়, সে বছর [তার উপর] তা আদায় করা ফরজ। তবে লক্ষণীয় যে, যদি সে ব্যক্তি ঐ বছরেই হজ আদায় না করে, তবে যখনই সে তা আদায় করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে– তা কাজা বলে পরিগণিত হবে না। কেননা, সময়সীমা সংকোচনের বিষয়টি সতর্কতার ভিত্তিতে ধরা হয়েছে–নিশ্চয়তার ভিত্তিতে নয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) স্বীয় দলিলকে আরো মজবুত করণার্থে বলেন, অবিলম্বে হজ আদায় করা সর্বসম্মতি ক্রমে উত্তম। কিন্তু নামাজের সময়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক। এ কারণে নামাজকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা সতর্কতা পরিপন্থি কাজ বলে বিবেচিত হয় না।

وَإِنَّمَا شُرِطَ الْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوْغُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَاتُ بِأَسْرِهَا مَوْضُوْعَةٌ عَنِ الصِّبْيَانِ وَالْعَقْلُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّكْلِيْفِ وَكَذَا صِحَّةُ الْجَوَارِحِ لِأَنَّ الْعَجْزَ دُوْنَهَا لَازِمٌ.

অনুবাদ : স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার শর্তের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ যে, কোনো গোলাম যদি দশবারও হজ করে অতঃপর স্বাধীন হয়, তাহলে তার উপর ইসলামের ফরজ হজ ওয়াজিব হবে। আর কোনো নাবালেগ যদি দশবারও হজ করে অতঃপর বালিগ হয়, তাহলে তার উপর ইসলামের ফরজ হজ ওয়াজিব হবে। তা ছাড়া এজন্য যে, হজ হলো একটি ইবাদত। আর যাবতীয় ইবাদত নাবালিগদের থেকে রহিত। আর মস্তিষ্কের সুস্থতার শর্ত দায়িত্ব আরোপের বৈধতার জন্য। অনুরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতার [শর্তও রয়েছে]। কেননা, তা ছাড়া অক্ষমতা অনিবার্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) [হজ ফরজ হওয়ার জন্য] প্রথম শর্ত উল্লেখ করেছেন– স্বাধীন হওয়া। এর দলিল হলো এই হাদীস– أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ অর্থাৎ 'কোনো গোলাম যদি দশবারও হজ করে অতঃপর স্বাধীন হয়, তাহলে তার উপর ইসলামের ফরজ হজ ওয়াজিব হবে।' অর্থাৎ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে সে যেসব হজ করেছে তা দ্বারা ফরজ আদায় হবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো, সম্পদ ছাড়া হজ হয় না। কেননা, হজ ফরজ হওয়ার শর্ত পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হওয়া। আর গোলাম পাথেয় ও বাহনের মালিক হতে পারে না, এ কারণে তার উপর হজ ফরজ হয় না। তৃতীয় দলিল হলো– হজের এ দীর্ঘ সময়ে মনিব সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় [যা বান্দার হক]। অথচ আল্লাহর হকের উপর বান্দার হক অগ্রগণ্য, এজন্য বান্দার হক সংরক্ষণকল্পে গোলামের উপর হজ ফরজ হয় না।

আর গ্রন্থকার ইমাম কুদূরী (র.) বালেগ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। কারণ, হাদীসে এসেছে–

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ অর্থাৎ 'কোনো নাবালিগ যদি দশবারও হজ করে অতঃপর বালিগ হয়, তাহলে তার উপর ইসলামের ফরজ হজ ওয়াজিব হবে।' অর্থাৎ বালিগ হওয়ার পূর্বে সে যেসব হজ করেছে তা দ্বারা ফরজ আদায় সাব্যস্ত হবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো, হজ একটি ইবাদত। আর বাচ্চাদের থেকে সমস্ত ইবাদত রহিত বলে হজও তাদের উপর ফরজ বলে সাব্যস্ত হবে না।

মস্তিষ্কের সুস্থতার শর্ত এজন্য করা হয়েছে, যেহেতু তা ছাড়া দায়িত্ব আরোপই বৈধ নয়। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থতার শর্তারোপ করার কারণ হলো, তা ছাড়া অক্ষমতা অনিবার্য। অক্ষম ব্যক্তি কোনো ইবাদতের মুকাল্লাফ বা যোগ্য নয়। এ কারণে তার উপর হজও ফরজ হবে না।

وَالْاَعْمٰى اِذَا وَجَدَ مَنْ يَكْفِيْهِ مَؤُنَةَ سَفَرِهِ وَ وَجَدَ زَادًا وَ رَاحِلَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لَهُمَا وَقَدْ مَرَّ فِىْ كِتَابِ الصَّلٰوةِ وَاَمَّا الْمُقْعَدُ فَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ يَجِبُ لِاَنَّهُ مُسْتَطِيْعٌ بِغَيْرِهِ فَاَشْبَهَ الْمُسْتَطِيْعَ بِالرَّاحِلَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ لَا يَجِبُ لِاَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْاَدَاءِ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْاَعْمٰى لِاَنَّهُ لَوْ هُدِىَ يُؤَدِّىْ بِنَفْسِهِ فَاَشْبَهَ الضَّالَّ عَنْهُ .

অনুবাদ : অন্ধ ব্যক্তি যদি এমন কাউকে পায়, যে তার সফরের দায়িত্বভার বহন করবে [অর্থাৎ চলাফেরায় তাকে সাহায্য করবে] এবং পাথেয় ও বাহনেও সমর্থ হয়, তবুও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর হজ ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন। সালাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঙ্গু সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তার উপর হজ ওয়াজিব হবে। কেননা, অপরের সাহায্যে সে সক্ষম। সুতরাং সে বাহনের সাহায্যে সক্ষমতা অর্জনকারীর সদৃশ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার উপর হজ ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে নিজে হজের রুকনসমূহ আদায় করতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে অন্ধ ব্যক্তিকে যদি পথ-নির্দেশনা দেওয়া হয়, তাহলে সে নিজেই আদায় করতে পারে। ফলে সে পথ হারিয়ে ফেলা ব্যক্তির মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاَعْمٰى اِذَا وَجَدَ الخ : মাসআলা হলো, কোনো অন্ধ ব্যক্তি যদি পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হয়, কিন্তু এমন কাউকে পায় না, যার দ্বারা সে হজের কার্যাবলি সম্পাদন করবে, তাহলে তার উপর সর্বসম্মতিক্রমে হজ ফরজ হবে না। আর যদি এমন কাউকে পায়, যে তার সফরের দায়িত্বভার বহন করবে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এমন ব্যক্তির উপরও হজ ওয়াজিব নয়। যেমন– অন্ধ ব্যক্তি যদি কোনো সাহায্যকারী পায় তা সত্ত্বেও তার উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়। সাহেবাইন (র.) -এর নিকট এমন অন্ধ ব্যক্তির উপর হজ ওয়াজিব। এ মতানৈক্যের ভিত্তি হলো অন্যের সাহায্যে যে সক্ষমতা অর্জিত হয় তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, আর সাহেবাইন (র.) -এর নিকট তা গ্রহণযোগ্য।

আর যদি অন্ধ ব্যক্তি তার দায়ভার বহনের কোনো লোক না পায়, কিন্তু সে পাথেয় ও বাহনে সক্ষম তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে হজ করানো ওয়াজিব কিনা–এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, অন্যকে দিয়ে হজ করানো তার উপর ওয়াজিব নয়। আর সাহেবাইন (র.) -এর মতে ওয়াজিব। সালাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْمُقْعَدُ فَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ-মাসআলা : ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ [জাহিরুর রেওয়ায়েত]-এর বর্ণনানুসারে খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং উভয় পা কর্তিত– এমন ব্যক্তির উপর হজ ওয়াজিব নয়। যদিও তারা পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হয়। এমনকি তাদের সম্পদ দ্বারা অন্য কাউকে দিয়ে হজ করানোও ওয়াজিব নয়। কেননা, যখন আসল [মূল ব্যক্তির উপর হজ করা] ওয়াজিব নয়, তখন অন্য কাউকে দিয়ে হজ করাও ওয়াজিব হবে না।

হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, পঙ্গু ও অন্যদের উপর হজ ওয়াজিব। হিদায়া গ্রন্থকার এ বর্ণনাটিকেই উল্লেখ করেছেন। দলিল হলো, পঙ্গু ব্যক্তি অন্য কোনো লোকের সাহায্যে সক্ষমতা লাভ করে। সুতরাং সে বাহনে সক্ষম ব্যক্তির সদৃশ হলো। আর বাহনে সক্ষম ব্যক্তির উপর হজ করা ফরজ। এ কারণে যে পঙ্গু অন্যের সহায়তায় হজ করতে সক্ষম তার উপরও হজ ফরজ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, পঙ্গু ব্যক্তির উপর হজ ফরজ নয়। কেননা, সে নিজের হাত-পায়ের সাহায্যে হজ করতে অক্ষম। কিন্তু অন্ধের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, যদি তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়, তাহলে সে নিজের হাত ও পায়ে হজের রুকনসমূহ আদায় করতে পারে। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি পথ হারিয়ে ফেলা ব্যক্তির মতো হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি পথ হারিয়ে ফেলেছে– সে যদি কোনো পথ-নির্দেশক পায়, তাহলে তার উপর হজ আবশ্যক। এমনিভাবে অন্ধ ব্যক্তিও যদি পথ-নির্দেশক পায়– তার উপরও হজ আবশ্যক বলে পরিগণিত হবে।

وَلَابُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْتَرِى بِهِ شِقَّ مَحْمَلٍ اَوْ رَأْسَ زَامِلَةٍ وَقَدْرُ النَّفَقَةِ ذَاهِبًا وَجَائِيًا لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنِ السَّبِيْلِ اِلَيْهِ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَاِنْ اَمْكَنَهُ اَنْ يَكْتَرِى عُقْبَةً فَلَا شَئَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُمَا اِذَا كَانَا يَتَعَاقَبَانِ لَمْ تُوجَدِ الرَّاحِلَةُ فِىْ جَمِيْعِ السَّفَرِ وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَعَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ كَالْخَادِمِ وَاَثَاثِ الْبَيْتِ وَثِيَابِهِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ مَشْغُوْلَةٌ بِالْحَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ اِلٰى حِيْنِ عَوْدِهِ لِاَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ بِاَمْرِهِ ـ

অনুবাদ : পাথেয় ও বাহন ব্যবস্থায় সক্ষম হওয়া জরুরি। বাহন সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার অর্থ হলো, এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকা, যাতে হাওদার একাংশ এবং সামানপত্র বহনে একটি উট ভাড়া করতে সমর্থ হয়। আর যাওয়া-আসার সময় পর্যন্ত খরচের ব্যবস্থায় সক্ষম হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত রাস্তায় সক্ষম হওয়ার অর্থ কি ? তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'পাথেয় ও বাহন'। যদি সে 'পালাক্রমে' সওয়ারি ভাড়া করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার উপর হজ ওয়াজিব হবে না। কেননা, দুজন যদি পালাক্রমে সওয়ার হয়, তাহলে পুরা সফরে বাহন পাওয়া হলো না। এই খরচ বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজন হতে উদ্বৃত্ত হতে হবে। যেমন– খাদেম, ঘরের আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়। কেননা, এগুলো তার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। [অদ্রূপ এই সম্পূর্ণ খরচ] তার ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে। কেননা, ভরণ-পোষণ হলো স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার আর শরিয়তের নির্দেশ মতেই শরিয়তের হকের উপর বান্দার হক অগ্রগণ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَابُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ الخ : এই ইবারতে اِذَا قَدَرُوْا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ [যখন তারা পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হবে] -এর আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ হজ ওয়াজিব হওয়ার পূর্বশর্ত পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হওয়া। এ সক্ষমতা বাহনের মালিক হয়েও হতে পারে কিংবা বাহন ভাড়া নিয়েও হতে পারে। এভাবে যে, ব্যক্তির নিকট এ পরিমাণ অর্থ থাকে যাতে সে হাওদার একাংশ ভাড়া করতে পারে। কেননা, হাওদার দুটি অংশ থাকে। একজন আরোহীর জন্য একাংশই যথেষ্ট। কিংবা মালামাল বহনে একটি উট ভাড়া করতে সক্ষম হয়। "زَامِلَةٌ" এমন উটকে বলা হয় যার উপর মুসাফির নিজের সামানপত্র নিতে পারে। এর বিস্তারিত আলোচনা এই যে, ব্যক্তি যদি দুর্বল হয়, তাহলে নিজে আরোহণের জন্য হাওদার একাংশ ভাড়া করতে সক্ষম হবে। আর যদি সে শক্তিশালী হয়, তাহলে মালামাল বহনে একটি উট ভাড়া করতে সক্ষম হবে। [পাশাপাশি ব্যক্তিকে] যাতায়াতের খরচের ব্যবস্থায়ও সক্ষম হতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا [বাইতুল্লাহ পর্যন্ত রাস্তায় সক্ষম হওয়া] -এর অর্থ কি ? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তা হলো পাথেয় ও বাহন।

আর যদি কোনো ব্যক্তি পুরা সফরের জন্য আরোহণের জানোয়ার ভাড়া করতে সক্ষম না হয়, তবে 'পালাক্রমে' সওয়ারি ভাড়া করতে সক্ষম হয়– এ পদ্ধতিতে যে, দু'জন মিলে একটি উট এভাবে ভাড়া নেয় যে, একজন এক মঞ্জিল আরোহণ করবে আর অপরজন আরেক মঞ্জিল আরোহণ করবে– তাহলে সে ব্যক্তির উপর হজ ওয়াজিব হবে না। কেননা, যখন এ দু'জন ব্যক্তি পালাক্রমে সওয়ার হয়, তাহলে পুরা সফরে বাহন পাওয়া গেল না। অথচ হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পুরা সফরে বাহনের ব্যবস্থা করা পূর্বশর্ত।

قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ : পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হওয়া। এর মধ্যে আবার শর্ত করা হয়েছে, পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হতে যে খরচ হয়, তা বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজন হতে উদ্বৃত্ত হতে হবে। জরুরি প্রয়োজন যেমন– খাদেম; গৃহস্থালির সামানপত্র যেমন– বস্ত্র, বিছানা, খাবার রান্না করার সামগ্রী এবং ব্যবহারের কাপড়-চোপড়, আরোহণের ঘোড়া, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। কেননা, এ সবকিছু মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর যেসব জিনিস মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো না থাকার মতোই। এ খরচ তার ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে। কেননা, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব। আর বান্দার হক শরিয়তের হকের উপর অগ্রগণ্য। যেমন– কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য যা হারাম তা তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে যা করতে তোমরা বাধ্য হও।' – এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার অপারগতায় ও বাধ্যবাধকতায় হারাম জিনিসও বৈধ করে বান্দার হককে তার হকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوْبِ عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ الرَّاحِلَةُ لِاَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِى الْاَدَاءِ فَاَشْبَهَ السَّعْىَ اِلَى الْجُمُعَةِ وَلَابُدَّ مِنْ اَمْنِ الطَّرِيْقِ لِاَنَّ الْاِسْتِطَاعَةَ لَايَثْبُتُ دُوْنَهُ ثُمَّ قِيْلَ هُوَ شَرْطُ الْوُجُوْبِ حَتّٰى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْاِيْصَاءُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقِيْلَ هُوَ شَرْطُ الْاَدَاءِ دُوْنَ الْوُجُوْبِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَّرَ الْاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَا غَيْرَ .

অনুবাদ : মক্কাবাসীদের উপর এবং তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর হজ ফরজ হওয়ার জন্য সওয়ারি শর্ত নয়। কেননা, হজ আদায় করার জন্য তাদের অতিরিক্ত কষ্টে লিপ্ত হতে হয় না। সুতরাং তা জুমার জন্য পথ চলার অনুরূপ হলো। পথের নিরাপত্তা অপরিহার্য। কেননা, এ ছাড়া সক্ষমতা সাব্যস্ত হয় না। কোনো কোনো মতে এটা হলো হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। এমনকি [মৃত্যুর সময়] অসিয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ মত বর্ণিত রয়েছে। কারো কারো মতে এটা হজ আদায় করার শর্ত, ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সক্ষমতার ব্যাখ্যা করেছেন শুধু 'পাথেয় ও বাহন' দ্বারা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হওয়া অন্যতম শর্ত; কিন্তু মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের জন্য হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য বাহন শর্ত নয়। সুতরাং এসব এলাকাবাসীর মধ্য থেকে কেউ যদি বাহনে সক্ষম নাও হয় তথাপি তার উপর হজ ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো, পায়ে হাঁটতে সক্ষম হতে হবে। হ্যাঁ, এ শর্তও জরুরি যে, তার যাওয়া থেকে আসা পর্যন্ত সময়ে পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ হিসেবে খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে।

'মক্কার আশপাশ' বলতে কি বুঝায়– এ সম্পর্কে দু ধরনের উক্তি পাওয়া যায়।

এক. যারা মক্কা শরীফ ও মীকাতসমূহের মধ্যে বসবাস করেন তাদের সবাইকে মক্কার আশপাশের বাসিন্দা বলা হয়।

দুই. মক্কা থেকে তিনদিনের কম দূরত্বে যারা বসবাস করেন। আর এদের জন্য বাহন শর্ত না হওয়ার দলিল হলো, এসব লোকের বাহন ছাড়া হজ আদায় করতে অতিরিক্ত কষ্টে লিপ্ত হতে হয় না। এ কারণে তাদের জন্য হজ আদায়ে গমন জুমার জন্য পথ চলার মতো। আর জুমায় যাওয়ার জন্য বাহন শর্ত নয়, যদিও কষ্ট হয়। তাই মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তীদের জন্য ও হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য বাহন শর্ত নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পথ নিরাপদ হওয়া শর্ত। অর্থাৎ রাস্তা অধিকাংশই নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত হতে হবে। কেননা, রাস্তা নিরাপদ হওয়া ব্যতীত সক্ষম বলেই সাব্যস্ত হয় না। 'পুরা রাস্তা নিরাপদ হওয়া' হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত নাকি হজ আদায় করার জন্য শর্ত– এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো মাশায়েখ বলেন, রাস্তা নিরাপদ হওয়া হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে نَوَادِرْ গ্রন্থে বর্ণিত এক বর্ণনা। ইমাম কারখী ও ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর অভিমত এটি। আবার কোনো কোনো মাশায়েখ বলেন, রাস্তা নিরাপদ হওয়া হজ আদায় করার জন্য শর্ত। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। এ মতানৈক্যের ফলাফল হলো– যদি কোনো ব্যক্তি পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হয় এবং অন্যান্য শর্তও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার কারণে সে হজ করে না। এমনকি সে মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে চলে আসে, তাহলে প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তাদের নিকট ঐ ব্যক্তির উপর হজের অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, রাস্তা নিরাপদ হওয়া শর্ত না থাকার কারণে তার উপর যখন হজই ওয়াজিব হয়নি, তখন অসিয়ত করার প্রশ্নই উঠে কি করে? আর দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের নিকট এমন ব্যক্তির উপর হজের অসিয়ত করা ওয়াজিব। কেননা, মূলত হজ তো তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল, কিন্তু রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার কারণে সে তা আদায় করতে পারেনি। এ কারণে হজের এ ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির লক্ষ্যে স্বীয় সম্পদ থেকে হজ করার জন্য অসিয়ত করা তার জন্য অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয় মতের স্বপক্ষে দলিল বর্ণনার্থে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا 'বায়তুল্লাহ পর্যন্ত রাস্তায় সক্ষম হওয়া'র অর্থ শুধু পাথেয় ও বাহন করেছেন। যদি রাস্তা নিরাপদ হওয়া– হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হতো, তাহলে পাথেয় ও বাহনের সাথে সাথে রাস্তা নিরাপদ হওয়ার কথাও রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন। সুতরাং পাথেয় ও বাহনের বর্ণনার সাথে রাস্তা নিরাপদ হওয়ার কথা উল্লেখ না করাটা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, রাস্তা নিরাপদ হওয়া وُجُوْبُ حَجٍّ [হজ ওয়াজিব হওয়া]-এর জন্য শর্ত নয়; বরং তা اَدَاءُ حَجٍّ [হজ আদায় করা]-এর জন্য শর্ত।

قَالَ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَةِ اَنْ يَكُوْنَ لَهَا مَحْرَمٌ تَحُجُّ بِهِ اَوْ زَوْجٌ وَلَا يَجُوْزُ لَهَا اَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا اِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجُوْزُ لَهَا الْحَجُّ اِذَا خَرَجَتْ فِيْ رُفْقَةٍ وَمَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِحُصُوْلِ الْاَمْنِ بِالْمُرَافَقَةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحُجَّنَّ اِمْرَأَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ وَلِاَنَّهَا بِدُوْنِ الْمَحْرَمِ يَخَافُ عَلَيْهَا الْفِتْنَةُ وَتَزْدَادُ بِانْضِمَامِ غَيْرِهَا اِلَيْهَا وَلِهٰذَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْاَجْنَبِيَّةِ وَاِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ اَقَلُّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ لِاَنَّهُ يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوْجُ اِلٰى مَا دُوْنَ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَاِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَهُ اَنْ يَمْنَعَهَا لِاَنَّ فِي الْخُرُوْجِ تَفْوِيْتَ حَقِّهِ وَلَنَا اَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْفَرَائِضِ وَالْحَجُّ مِنْهَا حَتّٰى لَوْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا لَهُ اَنْ يَمْنَعَهَا وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا قَالُوْا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ لَا يَحْصُلُ بِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্ত্রীলোকের জন্য শর্ত হলো– তার সঙ্গে তার স্বামী কিংবা কোনো মাহরাম থাকতে হবে, যাকে সঙ্গে নিয়ে সে হজ করে আসবে। যদি তার ও মক্কা শরীফের মাঝে তিনদিনের দূরত্ব থাকে, তাহলে স্বামী বা মাহরাম ছাড়া হজ করতে যাওয়া তার জন্য জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি সে [কোনো স্ত্রীলোক] কাফেলার সাথে রওয়ানা হয় এবং তার সাথে নির্ভরযোগ্য কতিপয় স্ত্রীলোক থাকে, তাহলে তার জন্য হজ করা জায়েজ হবে। কেননা, সফরসঙ্গী হওয়ার কারণে সে নিরাপত্তা পাবে। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– لَا تَحُجَّنَّ اِمْرَأَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 'কোনো স্ত্রীলোক যেন মাহরাম ছাড়া হজে না যায়।' আর এটা এজন্য যে, মাহরাম ছাড়া তার ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। আর অন্যান্য স্ত্রীলোক তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দ্বারা ফিতনার আশঙ্কা আরো বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেই সঙ্গে অন্য কোনো স্ত্রীলোক থাকা সত্ত্বেও পর-নারীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হওয়া হারাম। পক্ষান্তরে তার ও মক্কার মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনদিনের কম হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সফরের কম দূরত্বে মাহরাম ছাড়া বের হওয়া তার জন্য জায়েজ আছে। যদি সে মাহরাম পেয়ে যায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর থাকবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে। কেননা, সফরে বের হওয়াতে তার হক নষ্ট হয়। আমাদের দলিল হলো– ফরজসমূহের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার প্রকাশ পাবে না। আর হজ ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নফল হজের ক্ষেত্রে তার বাধা প্রদানের অধিকার রয়েছে। মাহরাম যদি ফাসিক হয় সে ক্ষেত্রে ফকীহ্গণ বলেছেন যে, তার উপর হজ ফরজ হবে না। কেননা, সফরসঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্য তার হাসিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَةِ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, স্ত্রীলোকের অবস্থিত শহর ও মক্কা শরীফের মাঝে যদি তিনদিনের কিংবা তার চেয়ে বেশি দূরত্ব থাকে, তাহলে স্বামী কিংবা মাহরামের সাথে হজের জন্য রওয়ানা হওয়া তার পক্ষে জায়েজ। মাহরাম বলা হয় যার সাথে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। চাই তা নৈকট্যের কারণে হোক কিংবা দুগ্ধপানের কারণে হোক অথবা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে হোক।

তবে মাহরামের সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। চাই সে স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক, কাফির হোক কিংবা মুসলমান হোক। আর যদি মাহরাম ফাসিক, অগ্নিপূজক, বাচ্চা ছেলে কিংবা পাগল হয়, তাহলে স্ত্রীলোকের সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে সে গণ্য হবে না। কেননা, এসব লোকের দ্বারা সফরের উদ্দেশ্য তথা হেফাজত ও নিরাপত্তা অর্জিত হয় না। ফাসিক তার পাপাচারিতার কারণে স্ত্রীলোক নিজেই নিরাপদ নয়। আর অগ্নিপূজকদের ধর্মমতে মাহরামকে বিবাহ করা বৈধ বলে তার সাথেও স্ত্রীলোকের নিরাপদ থাকা সম্ভব নয়। ফাসিক ও অগ্নিপূজককে মুহাফিজ [সংরক্ষক] নিয়োগ করা বিড়ালকে দুধের পাহারায় নিয়োগের মতোই। আর বাচ্চা ছেলে ও পাগল তো নিজেদের হেফাজতের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী– সে অন্যের কিভাবে হেফাজত করবে ?

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মহিলা যদি কাফেলার সাথে রওয়ানা হয় আর তার সাথে নির্ভরযোগ্য কতিপয় স্ত্রীলোক থাকে, তাহলে তার জন্য হজ করা জায়েজ। যদিও তার সাথে মাহরাম অথবা স্বামী না থাকে। কেননা, এতে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার দ্বারা নিরাপত্তা হাসিল হয়।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাহরাম ব্যতীত কোনো স্ত্রীলোক যেন হজ না করে। মুসলিম শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে–

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلَّا وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اِبْنُهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ مَحْرَمٌ مِنْهَا–

অর্থাৎ আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাসী কোনো স্ত্রীলোকের জন্য, তিনদিন কিংবা ততোধিক দূরত্বের সফর করা বৈধ নয়– পিতা, ছেলে, স্বামী, ভাই কিংবা মাহরাম ছাড়া। এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাহরাম ছাড়া মহিলাদের জন্য সফর করা জায়েজ নেই। যদিও সেটা হজের সফর হয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মাহরাম ছাড়া মহিলাদের ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা থাকে। আর যখন কতিপয় স্ত্রীলোক একত্র হয় যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে অসম্পূর্ণ, তখন তো ফিতনার সম্ভাবনা আরো বাড়ে। এ কারণেই কোনো পুরুষের জন্য অপরিচিত কোনো মহিলার সাথে একান্তে মিলিত হওয়া হারাম, যদিও সে মহিলার সাথে অন্য স্ত্রীলোকও থাকে। কেননা, প্রথমে একটা ফিতনা ছিল আর এখন তা দাঁড়িয়েছে দুই-এ। সুতরাং বুঝা গেল, মাহরাম ছাড়া তিনদিন দূরত্বের সফর কোনো স্ত্রীলোকের জন্য জায়েজ নেই।

তবে হ্যাঁ যদি স্ত্রীলোক আর মক্কা শরীফের মধ্যে তিনদিনের কম দূরত্ব হয়, তাহলে তার জন্য মাহরাম কিংবা স্বামী ছাড়া হজে গমন জায়েজ আছে। কেননা, শরিয়ত সফরের কম পরিমাণ দূরত্বে মাহরাম ছাড়া সফর করতে অনুমতি দিয়েছে। এ অল্প পরিমাণ দূরত্বে ফিতনার আশঙ্কা থাকে না।

قَوْلُهُ وَاِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا الخ : সূরতে মাসআলা হলো, হজের ইচ্ছা পোষণকারী কোনো স্ত্রীলোক যদি মাহরাম পেয়ে যায়, তাহলে স্বামীর অধিকার থাকবে না তাকে হজের ফরজিয়্যাত পালন থেকে বাধা দেওয়ার। এটাই ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বামীর বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, স্ত্রীলোক মাহরামের সাথে হজে গমন করলে স্বামীর হক নষ্ট হয়ে যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বান্দার হক আল্লাহর হকের উপর অগ্রগণ্য। এজন্য স্বামী নিজের হক রক্ষার্থে স্ত্রীকে হজে গমনে বাধা দিতে পারবে। সুতরাং এ বিষয়টি এমন হলো যে, কোনো স্ত্রীলোক হজের মানত করেছে তখন স্বামীর অধিকার থাকবে স্ত্রীকে সেই মানত পুরা করা হতে বাধা দেওয়ার।

আমাদের দলিল হলো, ফরজসমূহের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার প্রকাশ পাবে না। তাইতো দেখা যায়, নামাজ আদায় করতে কিংবা রমজানের রোজা রাখতে স্ত্রীকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। তবে হ্যাঁ, যদি নফল হজ করতে চায় সে ক্ষেত্রে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে। কেননা, তা ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাহরাম যদি ফাসিক হয় তথা বেপরোয়াভাবে খারাপে লিপ্ত হয়, তাহলে ফকীহ্গণ বলেছেন, মহিলার উপর হজ ফরজ হবে না। কেননা, এমন মাহরামের দ্বারা সফরসঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَجُوْسِيًّا لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ مُنَاكَحَتِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ لِأَنَّهُ لَا تَتَأَتَّى مِنْهُمَا الصِّيَانَةُ وَالصَّبِيَّةُ الَّتِيْ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغَةِ حَتّٰى لَا يُسَافَرُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلٰى أَدَاءِ الْحَجِّ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطُ الْوُجُوْبِ أَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلٰى حَسْبِ اخْتِلَافِهِمْ فِيْ أَمْنِ الطَّرِيْقِ .

অনুবাদ : যে কোনো মাহ্‌রামের সাথে বের হওয়া তার জন্য জায়েজ হবে; কিন্তু অগ্নিপূজক হলে জায়েজ হবে না। কেননা, সে তার সঙ্গে বিবাহের বৈধতার কথা বিশ্বাস করে। বাচ্চা কিংবা মস্তিষ্ক বিকৃত মাহরাম গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাদের পক্ষ থেকে হেফাজত হাসিল হবে না। যে বালিকা যৌনাবেদনের সীমায় উপনীত হয়ে গেছে, সে প্রাপ্তবয়স্কার সমতুল্য। সুতরাং মাহরাম ছাড়া তাকে নিয়ে সফর করা জায়েজ নেই। মাহরামের ব্যয়ভার স্ত্রীলোকটিকেই বহন করতে হবে। কেননা, সে তার মাধ্যমেই হজ আদায়ে সক্ষম হচ্ছে।

মাহরাম সঙ্গে থাকা কি হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, না হজ আদায় করার জন্য শর্ত– এ বিষয়ে ফকীহ্‌গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন– পথের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা এই যে, স্ত্রীলোকের জন্য যে কোনো মাহরামের সাথে সফরে বের হওয়া জায়েজ। চাই সে স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম হোক, মুসলমান হোক কিংবা জিম্মি কাফির হোক। তবে অগ্নিপূজকের সাথে সফরে বের হওয়ার অনুমতি নেই। কেননা, অগ্নিপূজকের বিশ্বাস হলো মা-বোনদের সাথে বিবাহ ছাড়া সহবাস জায়েজ এবং মাহরামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহবাস জায়েজ। সুতরাং এ নষ্টামি বিশ্বাস মতে কোনোক্রমেই স্ত্রীলোক তার ক্ষেত্রে ফিতনামুক্ত নয়। ফলে অগ্নিপূজক মাহরামের সাথে সফরে বের হওয়া জায়েজ হবে না।

অপ্রাপ্ত বাচ্চা, মস্তিষ্ক বিকৃত বা পাগল মাহরাম হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, তাদের পক্ষ থেকে হেফাজত হাসিল হবে না। আর যখন হেফাজত অর্জিত হবে না তখন তাদের সঙ্গই বা কি কাজে আসবে?

যে বালিকা প্রাপ্তবয়স্কা হয়নি, তবে যৌনাবেদনের সীমায় উপনীত হয়ে গেছে, সে প্রাপ্তবয়স্কার সমতুল্য। কাজেই মাহরাম ছাড়া তাকে নিয়ে সফর করা জায়েজ নেই, যদিও তার উপর হজ ফরজ নয়।

সফরসঙ্গী মাহরামের ব্যয়ভার কার উপর ওয়াজিব? হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাহরামের ব্যয়ভার ঐ স্ত্রীলোকের উপর বর্তাবে যে তাকে সফরসঙ্গী বানিয়েছে। কেননা, ঐ স্ত্রীলোকই তো তাকে হজ আদায় করার মাধ্যম বানিয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি মহিলার ক্ষেত্রে মাহরামের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হতে হবে।

মাহরাম হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত নাকি হজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত– এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যেমন পথের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ রয়েছে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। মতভেদের ফলাফল হলো– যাদের নিকট 'মাহরাম' হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, তাদের মতে সম্পদশালী স্ত্রীলোক যদি মাহরাম না পাওয়ার কারণে হজ না করে, তাহলে মৃত্যুর সময় স্বীয় সম্পদ থেকে হজ করানোর অসিয়ত করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, তার উপর তো হজই ফরজ হয়নি। তাহলে অসিয়ত কিভাবে ফরজ হবে? আর যারা মাহরামকে হজ আদায়ের শর্ত বলেন তাঁদের মতে ঐ স্ত্রীলোকের উপর অসিয়ত করা ওয়াজিব। কেননা, তাঁদের দৃষ্টিতে তার উপর হজ ফরজ হয়েছে. তবে মাহরাম না পাওয়ার কারণে আদায় করেনি। তাই হজ্জের ফরজিয়্যাত স্বীয় জিম্মা থেকে অব্যাহতির জন্য এই অসিয়ত করা তার উপর ওয়াজিব যে, 'আমার সম্পদ থেকে অন্য কাউকে দিয়ে বদল হজ্জ করাবে', অন্যথায় সে গুনাহগার হবে।

وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ فَمَضَيَا لَمْ يُجْزِهِمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ إِحْرَامَهُمَا اِنْعَقَدَ لِأَدَاءِ النَّفْلِ فَلَا يَنْقَلِبُ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ وَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ وَنَوٰى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ جَازَ وَالْعَبْدُ لَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ إِحْرَامَ الصَّبِيِّ غَيْرُ لَازِمٍ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ أَمَّا إِحْرَامُ الْعَبْدِ لَازِمٌ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوْجُ مِنْهُ بِالشُّرُوْعِ فِيْ غَيْرِهِ - وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : ইহ্‌রাম বাঁধার পর 'নাবালক' যদি 'সাবালক' হয় কিংবা দাস স্বাধীনতা লাভ করে, তারপর হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে, তাহলে তা তাদের ফরজ হজের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা, তাদের ইহ্‌রাম তো নফল আদায়ের জন্য সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা ফরজ আদায়ের ইহ্‌রামে পরিবর্তিত হবে না। যদি নাবালক [বালেগ হওয়ার পর] আরাফায় অবস্থানের পূর্বে ইহ্‌রামের নবায়ন করে ফরজ হজের নিয়ত করে নেয়, তাহলে জায়েজ হবে। কিন্তু দাস এরূপ করলে জায়েজ হবে না। কেননা, যোগ্যতা না থাকার কারণে নাবালকের ইহ্‌রাম অবশ্যপালনীয় নয়, পক্ষান্তরে দাসের ইহ্‌রাম অবশ্যপালনীয়। সুতরাং অন্য ইহ্‌রাম শুরু করার মাধ্যমে বর্তমান ইহ্‌রাম হতে বের হয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ الخ : মাসআলা হলো, নাবালক যদি ইহ্‌রাম বাঁধার পর সাবালক [প্রাপ্তবয়স্ক] হয় কিংবা দাস স্বাধীনতা লাভ করে অতঃপর তারা হজের ক্রিয়াদি সম্পাদন করে, তাহলে তা দ্বারা হজের ফরজিয়্যাত আদায় হবে না; বরং তারা যদি পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হয়, তাহলে প্রত্যেকের উপর ফরজ আদায় করা অত্যাবশ্যক। কেননা, তারা নফল হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, সুতরাং তা ফরজ আদায়ের ইহ্‌রামে পরিবর্তিত হবে না। সুতরাং এই ইহরামের দ্বারা নফল হজই আদায় হবে। ফরজ হজের জন্য আগামীতে তাকে আবার সফর করতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, হজের মধ্যে যেমন ইহ্‌রাম বাঁধা শর্ত, তেমনি নামাজের জন্য অজু করা শর্ত। বালেগ হওয়ার পূর্বে কৃত অজু দ্বারা সাবালক হওয়ার পর নামাজ পড়া জায়েজ তবে এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন সে বয়সের গণনায় প্রাপ্তবয়স্ক হবে। কিন্তু স্বপ্নদোষের দ্বারা যদি সাবালক হওয়া প্রতিভাত হয়, তখন তো তার অজুই ভেঙ্গে যাবে। যাহোক, যেভাবে সাবালক হওয়ার পূর্বের অজু দ্বারা সাবালক হওয়ার পরে নামাজ পড়া জায়েজ, তেমনিভাবে সাবালক হওয়ার পূর্বের বাঁধা ইহ্‌রাম দ্বারা সাবালক হওয়ার পরে ফরজ হজ আদায় করা জায়েজ হওয়া উচিত?

এর উত্তর হলো, আমাদের নিকট নিয়তের দ্বারা ইহ্‌রাম প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়। ইহ্‌রাম বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে হজের ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ হয়। হজের কর্মসমূহ আরম্ভ করার জন্য নতুন কোনো নিয়তের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে অজু নামাজ শুরু করার পূর্বে পাওয়া যাওয়া জরুরি। মোদ্দাকথা, ইহ্‌রাম ও হজের কার্যাবলির মাঝখানে পৃথককারী কোনো সময় নেই; বরং ইহ্‌রাম বাঁধার সাথে সাথে হজের ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ হয়ে যায়। অপরদিকে অজু ও নামাজের মাঝখানে পৃথককারী সময় থাকে। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে একটিকে অপরটির উপরে কিয়াস করা সঠিক হবে না। অতএব যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা অজু করতঃ নামাজ আরম্ভ করে, তারপর বয়সের দিক থেকে এ সময়ে সাবালক হয়ে যায় আর সে নামাজ ফরজ হওয়ার নিয়ত করে, তাহলে এর দ্বারা ফরজ নামাজ আদায় হবে না।

এমনিভাবে যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো ছেলে ইহ্‌রাম বেঁধে নফল হজ শুরু করে তারপর সাবালক হয় আর সে ফরজ হজের নিয়ত করে ফেলে, তাহলে এর দ্বারা ফরজ আদায় হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি কোনো নাবালক ইহ্‌রাম বাঁধার পর সাবালক হয় আর আরাফার ময়দানে অবস্থানের পূর্বে সে ইহ্‌রাম ভেঙ্গে ফরজ হজ আদায়ের ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে তা জায়েজ। কিন্তু যদি কোনো দাস ইহ্‌রাম বাঁধার পর স্বাধীন হয় এবং আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সে ইহ্‌রাম নবায়ন করে ফরজ হজ আদায়ের নিয়ত করে, তাহলে জায়েজ হবে না। [এ দু মাসআলার] পার্থক্যের কারণ এই যে, শরিয়তের হুকুম পালনের যোগ্যতা না থাকার কারণে নাবালকের ইহ্‌রাম অবশ্যপালনীয় ছিল না। এর কারণ, নাবালক যদি নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে বসে, তাহলে সে দণ্ড বা শাস্তিযোগ্য হয় না। সুতরাং যখন তার ইহ্‌রাম অবশ্যপালনীয় নয় তখন তা ভেঙ্গে ফেলা তার জন্য জায়েজ। অপরদিকে দাস শরিয়তের হুকুম পালনের যোগ্য বলে তার ইহ্‌রাম অবশ্যপালনীয়। এর কারণ হলো, যদি সে ইহ্‌রাম অবস্থায় কোনো কিছু শিকার করে, তাহলে ইহ্‌রামের ক্ষতিপূরণে তার উপর রোজা রাখা ওয়াজিব। দাস সম্পদের মালিক না হওয়ার কারণে মাল-সম্পদ দ্বারা কাফফারা দেওয়ার যোগ্য নয় বলে সে মাল-সম্পদ দ্বারা কাফফারা আদায় করবে না। যাহোক, দাসের ইহ্‌রাম যখন অবশ্যপালনীয় তখন তা ভেঙ্গে দ্বিতীয় ইহ্‌রাম বাঁধা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

فَصْلٌ : وَالْمَوَاقِيْتُ الَّتِيْ لَا يَجُوْزُ اَنْ يَجَاوِزَهَا الْاِنْسَانُ اِلَّا مُحْرِمًا خَمْسَةٌ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُوالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَلِاَهْلِ الشَّامِ جُحْفَةُ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ هٰكَذَا وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هٰذِهِ الْمَوَاقِيْتَ لِهٰؤُلَاءِ وَفَائِدَةُ التَّاقِيْتِ اَلْمَنْعُ عَنْ تَاخِيْرِ الْاِحْرَامِ عَنْهَا لِاَنَّهُ يَجُوْزُ التَّقْدِيْمُ عَلَيْهَا بِالْاِتِّفَاقِ ثُمَّ الْاٰفَاقِيُّ اِذَا اِنْتَهٰى اِلَيْهَا عَلٰى قَصْدِ دُخُوْلِ مَكَّةَ عَلَيْهِ اَنْ يُحْرِمَ قَصَدَ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ اَوْ لَمْ يَقْصُدْ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُجَاوِزُ اَحَدٌ الْمِيْقَاتَ اِلَّا مُحْرِمًا وَلِاَنَّ وُجُوْبَ الْاِحْرَامِ لِتَعْظِيْمِ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِيْفَةِ فَيَسْتَوِىْ فِيْهِ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَغَيْرُهُمَا .

অনুচ্ছেদ : ইহরামের স্থানসমূহ

অনুবাদ : ইহরাম বাঁধা ছাড়া যে সকল স্থান অতিক্রম করা কারো জন্য জায়েজ নেই, সেগুলো মোট পাঁচটি। মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলাইফা', ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইরক', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহফা', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' এবং ইয়ামেনবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'। এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল এলাকার লোকদের জন্য এ সকল স্থানকে 'মীকাত' রূপে নির্ধারণ করেছেন। এ নির্ধারণের ফলাফল হলো, ইহ্রাম বাঁধার কাজটি এ সকল স্থান থেকে পিছানো নিষেধ। কেননা, এ সকল স্থান হতে অগ্রবর্তী করা তো সকলের মতেই জায়েজ। বহিরাগত লোকেরা যখন মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে ঐ সকল মীকাত পর্যন্ত উপনীত হয়, তখন আমাদের মতে ইহ্রাম বেঁধে নেওয়া তার জন্য জরুরি। হজ বা উমরার উদ্দেশ্য থাকুক কিংবা অন্য উদ্দেশ্য থাকুক। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا يُجَاوِزُ اَحَدٌ الْمِيْقَاتَ اِلَّا مُحْرِمًا 'ইহ্রাম ছাড়া কেউ যেন মীকাত অতিক্রম না করে।' তা ছাড়া এজন্য যে, ইহরাম ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্য হলো এ পবিত্র অঞ্চলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। সুতরাং এ বিষয়ে হজকারী, উমরাকারী ও অন্যান্য সকলে সমান হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ وَالْمَوَاقِيْتُ الَّتِيْ الخ : এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচিত হলো হজ কার উপর ফরজ- কার উপর ফরজ নয়। হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কি কি? এখন হজ কোথা থেকে আরম্ভ হবে এ পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَوَاقِيْت শব্দটি مِيْقَاتٌ-এর বহুবচন। مِيْقَاتٌ অর্থ- নির্দিষ্ট সময়। কিন্তু এখানে রূপকার্থে তা নির্দিষ্ট স্থানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। مِيْقَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন স্থান যা ইহ্রাম ছাড়া অতিক্রম করা জায়েজ নেই। মীকাত মোট পাঁচটি। যথা-

১. মদীনাবাসীদের জন্য মীকাত হলো 'যুলহুলাইফা'। حَلْفَةٌ শব্দের তাসগীর حُلَيْفَةٌ [হুলাইফা]। প্রথমে এখানে একটা বৃক্ষ ছিল। এখন এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ স্থানটি মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

২. ইরাকবাসীদের মীকাত হলো 'যাতু ইরক'। এ স্থানটি মক্কা শরীফ থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত ওমর (রা.) কূফা ও বসরা বিজয় করার পর এ স্থানটিকে মীকাত নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, যদি ব্যাপারটি এমন হয়,

তাহলে হিদায়া গ্রন্থকারের উক্তি– هٰكَذَا وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْمَوَاقِيْتَ অর্থাৎ "এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল এলাকার লোকদের জন্য এ সকল স্থানকে মীকাতরূপে নির্ধারণ করেছেন।" তবে এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ কথাটি সঠিক নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে ইরাক বিজিত হয়নি। এর উত্তর হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন যে, ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হবে এবং ইরাক সিরিয়ার মতো দারুল ইসলামে রূপায়িত হবে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিরিয়া ও ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত নির্দিষ্ট করেছিলেন।

৩. সিরিয়াবাসীদের মীকাত হলো 'জুহফা', এটা মিসরবাসীদেরও মীকাত। এ স্থানটি মক্কা থেকে বিরাশি মাইল, মদীনা থেকে তিন মঞ্জিল ও লোহিত সাগর থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

৪. নজদবাসীদের মীকাত হলো 'কারন'।

৫. ইয়ামেনবাসীদের মীকাত 'ইয়ালামলাম'। এটা মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এসব মীকাত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। 'যাতু ইরক' ব্যতীত বাকি চারটি মীকাতের বর্ণনা সহীহাইন [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]-এ এসেছে। আর 'যাতু ইরক' মুসলিম শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস এই–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ شَاءَ حَتّٰى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ–

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলাইফা' এবং সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহফা' এবং নজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল' এবং ইয়ামেনবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' -কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এসব মীকাত এখানে যারা অবস্থান করে ও যারা এ স্থানসমূহ দিয়ে হজ ও উমরা করতে ইচ্ছা পোষণ করে– তাদের জন্য প্রযোজ্য। আর এ ছাড়া যারা আছে তারা যেখান থেকে ইচ্ছা ইহ্রাম বাঁধতে পারে। এমনকি মক্কাবাসীরা মক্কা থেকে ইহ্রাম বাঁধবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এসব মীকাত নির্ধারণের ফলাফল হলো ইহরাম বাঁধার কাজটি এ সকল স্থান থেকে পিছানো নিষিদ্ধ। এর অর্থ এ নয় যে, এই সকল স্থানে পৌছার পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা যাবে না। কেননা, মীকাতের পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْآفَاقِيُّ الخ : آفَاقِيٌّ ঐ সব লোকদেরকে বলা হয় যারা মীকাতের বাইরে অবস্থান করে। আর যারা মীকাতের সীমানায় অবস্থান করে তাদেরকে মাক্কী বলা হয়। آفَاقِيٌّ তথা বহিরাগতদের মীকাত ঐ সবস্থান, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মাক্কী তথা যারা মীকাত ও হরমের মধ্যখানে অবস্থান করেন তাদের মীকাত হলো حِلٌّ [হিল]। অর্থাৎ 'হরম' শুরু হওয়ার পূর্বেই তারা ইহ্রাম বাঁধবে।

عِنَايَةٌ [ইনায়া] গ্রন্থকারের বর্ণনানুসারে মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি آفَاقِيٌّ ও مَكِّيٌّ উভয়ের মীকাত থেকে সামনে অগ্রসর হতে চায় তার জন্য ইহ্রাম ছাড়া অগ্রসর হওয়া জায়েজ নেই। আর যে ব্যক্তি শুধু آفَاقِيٌّ -এর মীকাত অতিক্রম করতে চায় مَكِّيٌّ -এর মীকাত অতিক্রম করতে ইচ্ছা পোষণ করে না, তার জন্য ইহ্রাম ছাড়া যাওয়া জায়েজ। যেমন– কোনো ব্যক্তি জিদ্দা কিংবা হিল-এর কোনো এক স্থানে যেতে চায়, তার জন্য ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব নয়।

এ মূলনীতির আলোকে মাসআলা দাঁড়ায়, বহিরাগত কেউ যদি মক্কায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে মীকাতে পৌছে, তাহলে আমাদের নিকট তার জন্য ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব। চাই সে হজ কিংবা উমরা কিংবা ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাক। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি হজ কিংবা উমরার উদ্দেশ্য মক্কায় যেতে চায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় যেতে চাইলে ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, ইহ্‌রাম হজ কিংবা উমরার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং যখন কেউ হজ কিংবা উমরার ইচ্ছা পোষণ করবে কেবল তখনি তার উপর ইহ্‌রাম আবশ্যক হবে, অন্যথায় নয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনে ইহ্‌রাম ছাড়াই মক্কা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন– হজ কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করেননি; বরং মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি তথায় গমন করেছিলেন।

আমাদের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস–

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يُجَاوِزُ الْمِيْقَاتَ اَحَدٌ إِلَّا مُحْرِمًا

অর্থাৎ 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, ইহ্‌রাম অবস্থা ছাড়া কেউ যেন মীকাত অতিক্রম না করে।' এ হাদীসের নির্দেশনা হলো, মীকাত অতিক্রম করে মক্কা শরীফে গমনকারী ব্যক্তির উপর ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। হজ, উমরা, ব্যবসা কিংবা অন্য যে কোনো ইচ্ছাই সে পোষণ করুক না কেন।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল এই যে, ইহ্‌রাম ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্য হলো এ পবিত্র অঞ্চলের সম্মান প্রদর্শন। হজ কিংবা উমরার শর্ত হওয়ার কারণে তা ওয়াজিব নয়। এ কারণে যে ব্যক্তি মীকাত ও হরমের মাঝখানে অবস্থান করবে তার উপরও ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। যাহোক, ইহ্‌রাম ওয়াজিব হয়েছে এই পবিত্র অঞ্চলের সম্মানার্থে। আর হরমের সম্মান প্রদর্শন সবার উপরই ওয়াজিব। চাই সে হজের ইচ্ছা পোষণ করুক কিংবা উমরা অথবা ব্যবসা বা অন্য কিছুর ইচ্ছা করুক না কেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল হিসেবে মক্কা বিজয়ের যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তার উত্তর হলো, মক্কা বিজয়ের সময়ে ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু সময়ের জন্যই ছিল। যেমন মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় ভাষণে বলেছেন–

إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ 'মক্কা শরীফ সম্মানিত ও পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই তাকে সম্মানিত করেছেন। আমার পূর্বে কারো জন্য তা হালাল ছিল না এবং আমার পরও কারো জন্য তা হালাল নয়। আমার জন্য তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। তারপর তা কিয়ামত পর্যন্ত হারামে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ এখন আমি যদি মক্কায় প্রবেশ করি, তাহলে আমার জন্যও ইহ্‌রাম বাঁধা আবশ্যক হবে।'

وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ لَهُ اَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ لِحَاجَتِهِ لِاَنَّهُ يَكْثُرُ دُخُوْلُهُ مَكَّةَ وَفِىْ اِيْجَابِ الْاِحْرَامِ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ بَيِّنٌ فَصَارَ كَاَهْلِ مَكَّةَ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُمُ الْخُرُوْجُ مِنْهَا ثُمَّ دُخُوْلُهَا بِغَيْرِ اِحْرَامٍ لِحَاجَتِهِمْ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَصَدَ اَدَاءَ النُّسُكِ لِاَنَّهُ يَتَحَقَّقُ اَحْيَانًا فَلَا حَرَجَ ـ

অনুবাদ : যারা মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী, তাদের জন্য নিজস্ব প্রয়োজনে ইহ্রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ। কেননা, তাকে তো সচরাচর মক্কায় প্রবেশ করতেই হয়। আর প্রতিবার ইহ্রাম বাধ্যতামূলক করলে তাতে সুস্পষ্ট অসুবিধা রয়েছে। সুতরাং তারা মক্কাবাসীদের মতোই হবে। আর মক্কাবাসীদের জন্য প্রয়োজনে ইহ্রাম ছাড়া মক্কা হতে বের হওয়া ও মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে হজ বা উমরা আদায়ের নিয়ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা বিশেষ সময়ে হয়ে থাকে। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, যে ব্যক্তি মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করে বা যে কোনোভাবে সেখানে রয়েছে তার জন্য ইহ্রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, হারামের সম্মান প্রদর্শন যদিও বিশ্বাসগতভাবে তার উপরেও ওয়াজিব, কিন্তু ইহ্রামের মাধ্যমে শারীরিকভাবে সম্মান প্রদর্শন তার থেকে মওকূফ করা হয়েছে। এজন্য যে, মানবিক ও দুনিয়াবি প্রয়োজনে তাকে একাধিকবার মক্কায় প্রবেশ করতে হয়। একদিনে তাকে বেশ কয়েকবার ঢুকতে ও বের হতে হয়। সুতরাং প্রতিবারই যদি তার জন্য ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব করে দেওয়া হয়, তাহলে সে অসুবিধায় পড়বে। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের থেকে কষ্ট বিদূরিত করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে– مَا جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ কাজেই মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী মক্কাবাসীদের মতোই হবে। আর মক্কাবাসীদের জন্য প্রয়োজনে ইহ্রাম ছাড়া মক্কা হতে বের হওয়া ও মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং এভাবে মীকাতের অভ্যন্তরে অবস্থানকারীদের জন্য ইহ্রাম ছাড়া মক্কা হতে বের হওয়া ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ।

তবে যদি মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের কেউ হজ কিংবা উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করে, তাহলে তার জন্য ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব। কেননা, তার এ ধরনের ইচ্ছার প্রকাশ কখনো কখনো ঘটে আর মাঝে-মধ্যে ইহ্রাম বাঁধা কষ্টের কিছু নয়। এ কারণে এ ধরনের ইচ্ছা পোষণ করে মক্কায় প্রবেশকারীদের জন্য ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত। عِنَايَة [ইনায়া]

গ্রন্থকার লিখেছেন, মূলত কাঠ ও জ্বালানি সংগ্রহকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, মক্কা শরীফ ও মীকাতের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনে ইহ্রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ।

فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هٰذِهِ الْمَوَاقِيْتِ جَازَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَاِتْمَامُهُمَا اَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ اَهْلِهِ كَذَا قَالَهُ عَلِيٌّ (رض) وَابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) وَالْاَفْضَلُ التَّقْدِيْمُ عَلَيْهَا لِاَنَّ اِتْمَامَ الْحَجِّ مُفَسَّرٌ بِهِ وَالْمَشَقَّةُ فِيْهِ اَكْثَرُ وَالتَّعْظِيْمُ اَوْفَرُ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اِنَّمَا يَكُوْنُ اَفْضَلَ اِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ اَنْ لَا يَقَعَ فِىْ مَحْظُوْرٍ -

অনুবাদ : যদি এ সকল মীকাতে পৌছার আগেই ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়, তাহলে তা জায়েজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা পূর্ণ করো'। আর পূর্ণতা হলো এ দুটির জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা স্বীয় পরিবারের গৃহ থেকে। হযরত আলী (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.) এরূপই বলেছেন। সুতরাং ইহ্‌রাম মীকাতের আগে বাঁধাই উত্তম, কেননা হজের পূর্ণতা -এ ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এতে কষ্টও অধিক এবং ভক্তির প্রকাশও অধিক। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আগে থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা তখনই উত্তম হবে, যখন কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বহিরাগত লোকদের জন্য স্বীয় মীকাতে পৌছে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। এর অর্থ– কখনো এই নয় যে, মীকাতের আগে তার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা জায়েজ নেই; বরং কেউ যদি হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে বের হয়, তাহলে তা শুধু তার জন্য জায়েজ বলে গণ্য হবে না; বরং তা উত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে। এর দলিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা পূর্ণ করো'। এ আয়াতের কয়েক ধরনের তাফসীর করা হয়েছে। একটি তাফসীর হলো হজ ও উমরা পুরা করার অর্থ– নিজের এলাকা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে বের হবে। হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এ তাফসীর বর্ণিত আছে। এ থেকে বুঝা যায়, মীকাতের আগে ইহ্‌রাম বাঁধা জায়েজ।

আর এ স্থানে دَارٌ [গৃহ] -এর তাসগীর دُوَيْرَةٌ [ক্ষুদ্রগৃহ] ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মানের তুলনায় তা নগণ্য ও তুচ্ছ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মীকাতের আগে ইহরাম বাঁধা উত্তম। প্রথমত এজন্য যে, وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আয়াতে পূর্ণতার তাফসীর এভাবেই করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত স্বীয় গৃহ থেকে ইহরাম বেঁধে বের হওয়া অধিক কষ্টের ব্যাপার। আর যে কাজ সম্পাদনে অধিক কষ্ট হয় তা উত্তম। যেমন হাদীসে এসেছে– اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَزُهَا 'সর্বোত্তম ইবাদত হলো যার মধ্যে অধিক কষ্ট হয়।' তৃতীয়ত এতে বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান অধিক প্রকাশ পায়। আর হজ ও উমরার উদ্দেশ্যও তাই। সুতরাং মীকাতের আগেই ইহরাম বাঁধার মধ্যে বায়তুল্লাহর সম্মান আরো বৃদ্ধি পাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এক বর্ণনা পাওয়া যায় যে, মীকাতের আগে ইহ্‌রাম বাঁধা তখনই উত্তম হবে, যখন অন্যায় কোনো কাজে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। আর যদি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে মীকাতে এসে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম।

وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ فَوَقْتُهُ الْحِلُّ مَعْنَاهُ الْحِلُّ الَّذِى بَيْنَ الْمَوَاقِيْتِ وَبَيْنَ الْحَرَمِ لِاَنَّهُ يَجُوْزُ اِحْرَامُهُ مِنْ دُوَيْرَةِ اَهْلِهِ وَمَا وَرَاءَ الْمِيقَاتِ اِلَى الْحَرَمِ مَكَانٌ وَاحِدٌ وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَوَقْتُهُ فِى الْحَجِّ الْحَرَمُ وَفِى الْعُمْرَةِ الْحِلُّ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ اَصْحَابَهُ (رض) اَنْ يُحْرِمُوْا بِالْحَجِّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ وَاَمَرَ اَخَا عَائِشَةَ (رض) اَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَهُوَ فِى الْحِلِّ وَلِاَنَّ اَدَاءَ الْحَجِّ فِىْ عَرَفَةَ وَهِىَ فِى الْحِلِّ فَيَكُوْنُ الْاِحْرَامُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَاَدَاءُ الْعُمْرَةِ فِى الْحَرَمِ فَيَكُوْنُ الْاِحْرَامُ مِنَ الْحِلِّ لِهٰذَا اِلَّا اَنَّ التَّنْعِيْمَ اَفْضَلُ لِوُرُوْدِ الْاَثَرِ بِهِ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মীকাতের অভ্যন্তরে বাস করে, তার মীকাত হলো, হিল্ [হারামের বাইরের এলাকা]। অর্থাৎ হারাম ও মীকাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। কেননা, আপন পরিবারের নিকট থেকে ইহ্রাম বেঁধে যাওয়া তার জন্য জায়েজ আছে। আর মীকাতের পর থেকে হারাম পর্যন্ত অঞ্চলটি অভিন্ন স্থানরূপে বিবেচিত। যে ব্যক্তি মক্কায় বাস করে, তার মীকাত হলো, হজের ক্ষেত্রে হারাম এবং উমরার ক্ষেত্রে হিল্। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে হজের জন্য মক্কার অভ্যন্তর থেকে ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাই আব্দুর রহমান (রা.)-কে তানঈম থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-কে উমরা করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তানঈম 'হিল্'-এ অবস্থিত। কেননা, হজ আদায় করা হয় আরাফাতে। আর তা 'হিল্' -এর মধ্যে। সুতরাং ইহ্রাম হারাম থেকে হওয়া উচিত, যাতে এক ধরনের সফর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উমরা আদায় করা হয় হরমের ভিতর সুতরাং উক্ত কারণে হিল্ থেকে ইহরাম হওয়া উচিত। তবে হাদীসে তানঈম উল্লিখিত হওয়ার কারণে 'তানঈম' থেকে ইহ্রাম বাঁধাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ الخ : মাসআলা হলো, যে ব্যক্তি মীকাতের ভিতরে বাস করে তার ইহ্রাম বাঁধার স্থান হলো হিল্। হিল্ হচ্ছে বহিরাগত লোকদের মীকাত ও হরমে মক্কার মধ্যবর্তী স্থান। দলিল পূর্বে আলোচিত হয়েছে– হজ ও উমরা পালনকারী ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে ইহ্রাম বাঁধতে পারে। আর যখন তার গৃহ মীকাতের অভ্যন্তরে হবে, তখন 'হিল্'-ই হবে তার ইহ্রাম বাঁধার স্থান। সুতরাং নিজ গৃহ থেকে ব্যক্তির জন্য যখন ইহ্রাম বেঁধে বের হওয়া জায়েজ তখন হিল্-এর ভিতর বাসকারীদের জন্য হিল্-এর মধ্যে যে কোনো স্থানে ইহ্রাম বাঁধার অধিকার থাকে। কেননা, মীকাত থেকে হরমে মক্কা পর্যন্ত অঞ্চলটি অভিন্ন স্থানরূপে বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে থাকে, চাই সে মক্কার বাসিন্দা হোক কিংবা সাময়িকের জন্য সেখানে অবস্থান করুক তার জন্য হজের ক্ষেত্রে ইহ্রাম বাঁধার মীকাত হলো হারাম। অর্থাৎ হারামের যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সে ইহ্রাম বাঁধতে পারে। আর উমরা পালনের ক্ষেত্রে তার মীকাত হলো, 'হিল্'। অর্থাৎ উমরার ইহ্রাম বাঁধতে হলে হারামের সীমানা থেকে বের হয়ে 'হিল্'-এর ভিতর ইহ্রাম বেঁধে উমরার কার্যাদি সম্পন্ন করবে।

এর দলিল, বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে আসনি তারা উমরা করে হালাল হয়ে যাও। সাহাবায়ে কেরাম তা-ই করলেন। তারপরে জিলহজের ৮ তারিখে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে মক্কায় ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন; মক্কার বাইরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন না। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করে, তার জন্য মক্কায় হজের ইহ্রাম বাঁধা জায়েজ।

উল্লেখ্য যে, হযরত আয়েশা (রা.)ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। কিন্তু ঋতুস্রাবের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উমরার ইহ্রাম ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। তারপর জিলহজের ৮ তারিখে হজের ইহ্রামের জন্য নির্দেশ দেন। হজের কার্যাদি শেষে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَانْطَلِقُ بِحَجٍّ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ .

অর্থাৎ 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি ও সাহাবীগণ তো হজ ও উমরা একই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। আর আমি শুধু হজ করছি? রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর (রা.) -কে তানঈম থেকে তাঁকে উমরা করানোর নির্দেশ দিলেন।' অর্থাৎ তানঈম নামক স্থান থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধার হুকুম করলেন। এ স্থানটি হারাম সীমানার বাইরে 'হিল্'-এ অবস্থিত। এ থেকে বুঝা যায়, উমরার জন্য 'হিল্'-এ গিয়ে ইহ্রাম বাঁধবে তারপর হারামে প্রবেশ করে উমরার কার্যাদি সম্পাদন করবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, হজ ও উমরার জন্য সফর তো হওয়া চাই। আমরা দেখলাম, হজ আরাফার ময়দানে আদায় করা হয়, যা 'হিল্'-এর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য হজের ইহ্রাম হারাম থেকে হওয়া উচিত, যাতে এক ধরনের সফর হয়ে যায়। অর্থাৎ ইহ্রাম বেঁধে হারাম থেকে 'হিল্'-এ যাওয়া এক ধরনের সফর। পক্ষান্তরে উমরা সম্পাদন করা হয় হারামে। এজন্য উমরার ইহ্রাম 'হিল্' -এ হওয়া উচিত। যাতে এখানেও এক ধরনের সফর পাওয়া যায়। তাই 'হিল্'-এর যে কোথাও থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধা জায়েজ। তবে 'তানঈম' নামক স্থান থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধা উত্তম, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ প্রকাশ পায়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে 'তানঈম' থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

بَابُ الْإِحْرَامِ

وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ إِغْتَسَلَ أَوْتَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ إِلَّا أَنَّهُ لِلتَّنْظِيْفِ حَتّٰى تُؤْمَرَ بِهِ الْحَائِضُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فَرْضًا عَنْهَا فَيَقُوْمُ الْوُضُوْءُ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ لٰكِنَّ الْغُسْلَ أَفْضَلُ لِأَنَّ مَعْنَى النَّظَافَةِ فِيْهِ أَتَمُّ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِخْتَارَهُ ـ

পরিচ্ছেদ : ইহ্‌রাম

অনুবাদ : যখন কেউ ইহ্‌রাম বাঁধতে মনস্থ করবে তখন সে গোসল বা অজু করে নেবে। তবে গোসল করাই উত্তম। কেননা বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইহ্‌রামের জন্য গোসল করেছিলেন। তবে এ গোসল হলো পরিচ্ছন্নতার জন্য [পবিত্রতা অর্জনের জন্য নয়।] তাই ঋতুগ্রস্ত মহিলাকেও গোসল করতে বলা হবে, যদিও তাতে তার গোসলের ফরজ আদায় হবে না। সুতরাং অজু গোসলের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন জুমার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে গোসলই উত্তম। কেননা, গোসলের মাঝে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি পূর্ণতর। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এটিই গ্রহণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَابُ الْإِحْرَامِ : মীকাতের বর্ণনার পর ইহ্‌রামের পদ্ধতি নিয়ে এখন আলোচনা হবে, যা ঐ সকল মীকাতে বাঁধা হয়। অভিধানে إِحْرَامٌ [ইহ্‌রাম] অর্থ– নিষিদ্ধ কোনো কিছুতে প্রবেশ করা। ফকীহ্‌গণের পরিভাষায়– নিজের উপর বৈধ সব কিছুকে হারাম করা হজ ও নামাজ ইবাদতদ্বয় আদায়করণার্থে। নামাজ ও হজ এমন ইবাদত যার জন্য তাহ্‌রীম ও তাহ্‌লীল আছে। পক্ষান্তরে রোজা ও জাকাতের জন্য কোনো তাহ্‌রীম ও তাহ্‌লীল নেই।

قَوْلُهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ الخ : মাসআলা হলো, যখন কেউ ইহ্‌রাম বাঁধতে মনস্থ করে তখন প্রথমে গোসল কিংবা অজু করে নেবে। তবে গোসল করাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইহ্‌রামের জন্য গোসল করেছিলেন। যদি কেউ প্রশ্ন করে, যদি গোসল করাই উত্তম হয়, তাহলে অজু গোসলের স্থলাভিষিক্ত হয় কি করে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ গোসল না করে, তাহলে সে অজু করবে। এর উত্তরে বলা হবে যে, ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করার বিধানটি ওয়াজিব হওয়ার কারণে হয়নি; বরং পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য হয়েছে। তাই ঋতুবতী কিংবা নিফাসওয়ালী স্ত্রীলোককেও গোসল করতে বলা হবে, যদিও তাতে তার গোসলের ফরজ আদায় হবে না। কেননা, রক্ত বন্ধ হওয়ার পূর্বে গোসলের দ্বারা সে পবিত্র হবে না। সুতরাং ইহ্‌রামের আগে যখন তার উপর গোসল ওয়াজিব নয় তখন পরিচ্ছন্নতার জন্য অজুই গোসলের স্থলবর্তী হবে। যেমন– জুমার ক্ষেত্রে গোসলের পরিবর্তে অজুই যথেষ্ট। তবে গোসল করা উত্তম। কেননা, প্রথমত অজুর তুলনায় গোসলের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি পূর্ণতর। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাঁর ইহ্‌রামের জন্য গোসল করেছিলেন।

قَالَ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيْدَيْنِ اَوْ غَسِيْلَيْنِ اِزَارًا وَ رِدَاءً لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِئْتَزَرَ وَ ارْتَدٰى عِنْدَ اِحْرَامِهِ وَلِاَنَّهُ مَمْنُوْعٌ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيْطِ وَلَابُدَّ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَ ذٰلِكَ فِيْمَا عَيَّنَّاهُ وَالْجَدِيْدُ اَفْضَلُ لِاَنَّهُ اَقْرَبُ اِلَى الطَّهَارَةِ قَالَ وَمَسَّ طِيْبًا اِنْ كَانَ لَهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهُ يُكْرَهُ اِذَا تَطَيَّبَ بِمَا يَبْقٰى عَيْنُهُ بَعْدَ الْاِحْرَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (رح) لِاَنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِالطِّيْبِ بَعْدَ الْاِحْرَامِ وَ وَجْهُ الْمَشْهُوْرِ حَدِيْثُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِاَنَّ الْمَمْنُوْعَ عَنْهُ التَّطَيُّبُ بَعْدَ الْاِحْرَامِ وَالْبَاقِيْ كَالتَّابِعِ لَهُ لِاِتِّصَالِهِ بِهِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ لِاَنَّهُ مُبَايِنٌ عَنْهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এবং নতুন ও ধৌত করা দুটি কাপড় পরিধান করবে। একটি তহবন্দ অন্যটি চাদর। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইহ্‌রামের সময় চাদর ও তহবন্দ পরিধান করেছেন। তা ছাড়া এজন্য যে, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ সতর ঢাকা এবং গরম ও শীত নিবারণ জরুরি। আর তা আমাদের নির্ধারিত কাপড়েই সম্ভব। তবে নতুন কাপড়ই উত্তম। কেননা, তা পবিত্রতার অধিক নিকটবর্তী। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তার কাছে আতর থাকলে তা ব্যবহার করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এমন আতর ব্যবহার করা মাকরূহ হবে, যার অস্তিত্ব ইহ্‌রামের পরও অবশিষ্ট থেকে যায়। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.)-এরও অভিমত এটিই। কেননা, সে ইহ্‌রামের পর আতর থেকে উপকৃত হচ্ছে। প্রসিদ্ধ অভিমতের দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহ্‌রামের পূর্বে ইহ্‌রামের জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম। তা ছাড়া এজন্য যে, নিষিদ্ধ বিষয় হলো ইহ্‌রামের পর খোশবু ব্যবহার করা। আর যা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা তার সঙ্গে সংযুক্তির কারণে যেন তার আনুষঙ্গিক। কাপড়ের বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা তা তার থেকে বিচ্ছিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ الخ-মাসআলা : গোসলের পর ইহ্‌রামের দুটি কাপড় তহবন্দ ও চাদর পরিধান করবে। চাই তা নতুন হোক বা ধৌত করা হোক। তহবন্দ হলো নাভি থেকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত লম্বা, আর চাদর হলো পিঠ, দুই কাঁধ ও বক্ষ ঢাকা পরিমাণ লম্বা। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইহ্‌রামে এ দুটি কাপড় পরিধান করেছিলেন। আর যুক্তি [আকলী দলিল] হলো মুহ্‌রিমের জন্য সেলাই করা কাপড় পরিধান করা নিষেধ। অথচ সতর ঢাকা এবং শীত ও গরম নিবারণও জরুরি। আর উভয়টিই আমাদের বর্ণিত কাপড়দ্বয় দ্বারা সম্ভব। কেননা, তহবন্দ ও চাদর পরিধানের মাধ্যমে একদিকে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতেও হয় না আবার সতর ঢাকাও হয়ে যায় অন্যদিকে গরম ও শীত নিবারণও সম্ভব হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদিও ধোয়া কাপড় দিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধা যায়, তথাপি নতুন কাপড় পরা উত্তম। কেননা, তা পবিত্রতার অধিক নিকটবর্তী। কারণ, এখনো এতে বাহ্যিক কোনো নাপাক লাগেনি।

قَوْلُهُ قَالَ وَمَسَّ طِيْبًا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সম্ভব হলে শরীরে খোশবু ব্যবহার করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এমন খোশবু ব্যবহার করা মাকরূহ যার ঘ্রাণ ও অস্তিত্ব ইহ্‌রামের পরও অবশিষ্ট থাকে। যেমন– মিশ্‌ক ও ঘন আতর গালিয়া [মিশক আম্বর মিশ্রিত সুগন্ধি বিশেষ]। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) -এর মতামতও অনুরূপ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, এমন খোশবু ব্যবহারের ফলে ইহ্‌রামের পরও তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। অথচ ইহ্‌রামের পর খোশবু ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের স্বপক্ষে সহীহাইন -এ ইয়ালা হযরত ইবনে উমাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস এসেছে–

قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِيْ جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيْبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِيْ لَكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِيْ حَجَّتِكَ .

অর্থাৎ 'আতর মাখা ও জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? যে আতর মেখে জুব্বা পরিধান করে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যে আতর তুমি লাগিয়েছ তা তিনবার ধুয়ে ফেল। আর জুব্বা খুলে ফেল তারপরে হজ্জে যা কর তা উমরায় সম্পাদন করো।' এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রতিভাত হয়–

১. এমন খোশবু ব্যবহার করবে না, যার অস্তিত্ব ইহ্‌রামের পরও অবশিষ্ট থাকে।

২. সেলাই করা কাপড় পরিধান করে ইহ্‌রাম বাঁধবে না।

আমাদের দলিল হলো, সহীহাইনে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহ্‌রামের পূর্বে ইহরামের জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম। অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরে আতর মাখিয়ে দিতেন তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্‌রামের জন্য সজ্জিত হতেন।

كِفَايَةٌ [কিফায়া] গ্রন্থকার লিখেছেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে সুগন্ধি দ্বারা এমন সুগন্ধি বুঝানো হয়েছে যার অস্তিত্ব ও ঘ্রাণ ইহ্‌রামের পরও অবশিষ্ট থেকে যেত। কেননা, অপর এক বর্ণনায় এসেছে–

وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِيْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ .

অর্থাৎ 'হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে ইহ্‌রাম বাঁধার পরে সুগন্ধির চিহ্ন ও ঝলক দেখেছি।' এটা এমন সুগন্ধির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যার অস্তিত্ব ইহ্‌রামের পরও থাকে। সুতরাং এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইহ্‌রামের পূর্বে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ হবে না যার অস্তিত্ব ইহ্‌রামের পরও অবশিষ্ট থাকে।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল এই যে, নিষিদ্ধ বিষয় হলো ইহ্‌রামের পরে খোশবু ব্যবহার করা। যে সুগন্ধি ইহ্‌রামের পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ নয়। আর যা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা তার সঙ্গে সংযুক্তির কারণে যেন তার আনুষঙ্গিক বিষয়। কেননা, ঐ সুগন্ধি তার শরীরের সাথে মিশে গেছে। যাহোক, তা আনুষঙ্গিকে পরিণত হওয়ার কারণে ভিন্ন কোনো বিধানের আওতাভুক্ত হবে না। সুতরাং তা না থাকার পর্যায়ে পড়বে।

পক্ষান্তরে সেলাই করা কাপড়ের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধার আগে কেউ সেলাই করা কাপড় পরিহিত থাকলে ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা শরীরে রাখা নিষিদ্ধ এবং তাকে প্রথম থেকেই সেলাই করা কাপড় পরিহিত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করত তার উপর জিনায়াতের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। তার কারণ হলো, কাপড় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জিনিস যা ব্যক্তির শরীরের আনুষঙ্গিক নয়।

আর হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রা.)-এর হাদীসের জবাবে বলা হয় ঐ সাহাবী জাফরান মিশ্রিত আতর ব্যবহার করেছিলেন। অথচ পুরুষের জন্য জাফরান ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তিনবার ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِمَا رَوٰى جَابِرٌ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلّٰى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ اِحْرَامِهِ قَالَ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ لِاَنَّ اَدَاءَهُ فِىْ اَزْمِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَاَمَاكِنَ مُتَبَايِنَةٍ فَلَا يَعْرِىْ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَادَةً فَيَسْأَلُ التَّيَسُّرَ وَفِى الصَّلٰوةِ لَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ هٰذَا الدُّعَاءِ لِاَنَّ مُدَّتَهَا يَسِيْرَةٌ وَاَدَاؤُهَا عَادَةً مُتَيَسِّرٌ قَالَ ثُمَّ يُلَبِّىْ عَقِيْبَ صَلَاتِهِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبّٰى فِىْ دُبُرِ صَلَاتِهِ وَاِنْ لَبّٰى بَعْدَ مَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ جَازَ وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ اَفْضَلُ لِمَا رَوَيْنَا وَاِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنْوِىْ بِتَلْبِيَةِ الْحَجِّ لِاَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর দু রাকাত সালাত আদায় করবে। কেননা, হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁর ইহ্রামের সময় যুলহুলায়ফায় দু রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর এ দোয়া পড়বে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ 'হে আল্লাহ ! আমি হজের নিয়ত করছি। সুতরাং তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করো।' কেননা হজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আদায় করা হয়। সুতরাং সাধারণত তা কষ্টমুক্ত হয় না, তাই সহজতার প্রার্থনা করবে। আর ফরজ নামাজ আদায়ের বেলায় এ ধরনের দোয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, নামাজের সময় সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণত তা আদায় করা সহজ। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর নামাজের পরে তালবিয়া পাঠ করবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের পরে তালবিয়া পড়েছিলেন। তবে যদি বাহন তাকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে তালবিয়া পড়ে, তাহলেও জায়েজ হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীসটির কারণে প্রথমটিই উত্তম। যদি সে শুধু হজ আদায়কারী হয়, তাহলে তালবিয়া দ্বারা শুধু হজের নিয়ত করবে। কেননা, এটা ইবাদত। আর আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ الخ-মাসআলা : যখন কেউ ইহ্রাম বাঁধার মনস্থ করবে, তখন প্রথমে দু রাকাত নামাজ পড়বে। তবে তা যেন মাকরূহ সময়ে না হয়। আর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে যদি কেউ ফরজ নামাজ আদায় করে, তাহলে ইহ্রামের জন্য ভিন্ন করে দু রাকাত নফল নামাজ পড়তে হবে না। দলিল হলো– হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলায়ফায় ইহ্রাম বাঁধার সময় দু রাকাত নামাজ পড়েছিলেন।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুলহুলায়ফার মসজিদে নামাজ পড়ার কথা এসেছে, তবে কত রাকাত পড়েছেন তা উল্লেখ নেই। মোল্লা আলী ক্বারী (র.)ও شَرْحُ نِقَايَةٌ -এর মধ্যে এমনটি বর্ণনা করেছেন। যাহোক, হযরত জাবির (রা.) -এর হাদীস থেকে যুলহুলায়ফায় নামাজ পড়ার কথা প্রমাণিত। তবে দু রাকাতের কথা সেখানে উল্লেখ নেই। তবে আবূ দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণিত হাদীসে দু রাকাতের কথা পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীসটি হলো–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلّٰى فِىْ مَسْجِدِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَاَوْجَبَ فِىْ مَجْلِسِهِ .

অর্থাৎ 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজের উদ্দেশ্যে বের হলেন। অতঃপর যুলহুলায়ফার মসজিদে দু রাকাত নামাজ পড়ে সেই বৈঠকেই হজ ওয়াজিব করলেন অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধলেন।' এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে দু রাকাত নামাজ পড়া সুন্নত। এ দু রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা মিলিয়ে পড়তে পারে। তবে উত্তম হলো, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস পাঠ করা। কেননা, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর فِعْل [কর্ম] থেকে বরকত হাসিলের সৌভাগ্য হয়।

قَوْلُهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দু রাকাত নামাজ পড়ে যখন ইহ্‌রামের নিয়ত করবে, তখন এ দোয়া পড়বে— "হে আল্লাহ ! আমি হজের নিয়ত করছি। সুতরাং তুমি তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করো"। সহজতার দোয়া করবে এজন্য যেহেতু হজ একটি বড় ইবাদত এবং তা আদায় করতে বহু কষ্ট করতে হয়। হজে কষ্ট হওয়ার কারণ হলো— হজ নির্দিষ্ট কোনো সময়ে আদায় করা হয় না; বরং ৮ই জিলহজ থেকে শুরু করে ১৩ ও ১৪ ই জিলহজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হয়ে আদায় করতে হয়। কখনো আরাফার মাঠে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে হয়; কখনো সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। মুযদালিফায় রাত কাটিয়ে মিনার কঙ্করময় উপত্যকায় দিন অতিবাহিত করতে হয়। কখনো ব্যাকুল হয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে হয় আবার কখনো প্রচণ্ড রৌদ্রে বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করতে হয়। সুতরাং এই সীমাহীন কষ্টের মধ্য দিয়ে হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা হয়। তখন অবশ্যই তার সহজতার জন্য হজের ফরজ আদায় করতে দোয়া করা মোস্তাহাব।

আর হজ কবুল হওয়ার দোয়া এজন্য করা হয় যে, প্রত্যেকটি ইবাদত কবুল হওয়া আবশ্যক নয়। এ কারণেই বাইতুল্লাহ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) বারবার এ দোয়া করেছেন—

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।' তবে ফরজ নামাজ আদায়ের বেলায় এ ধরনের দোয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, নামাজের সময় সংক্ষিপ্ত এবং এ কারণে সাধারণত তা আদায় করা সহজ। সুতরাং যখন নামাজ আদায় করা সহজ, তখন সহজতার দোয়া করার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

قَوْلُهُ قَالَ ثُمَّ يُلَبِّىْ الخ : শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর তালবিয়া পাঠ করে হজের নিয়ত করবে। কেননা হজ হলো একটা ইবাদত। আর কোনো ইবাদতই নিয়ত ছাড়া আদায় হয় না। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, উত্তম হলো, প্রথমত ইহ্‌রামের নামাজ পড়ে দোয়া করবে তারপর এ কথা বলবে— 'আমি হজের নিয়ত করছি এবং আল্লাহর জন্য ইহ্‌রাম বাঁধছি।' এরপরে তালবিয়া পাঠ করবে।

কিন্তু আমাদের নিকট উত্তম পন্থা হলো, ইহ্‌রামের নামাজের পরপরই তালবিয়া পাঠ করবে। অর্থাৎ নামাজ ও তালবিয়ার মাঝখানে অন্য কোনো কাজ করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের পরে তালবিয়া পড়েছিলেন। যেমন বর্ণিত আছে—

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبّٰى دُبُرَ صَلَاتِهِ

অর্থাৎ, 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের পরই তালবিয়া পড়েছিলেন।' তবে যদি বাহন ব্যক্তিকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে তালবিয়া পড়ে তাহলেও জায়েজ হবে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলের কারণে প্রথমটি উত্তম। অর্থাৎ নামাজের পরক্ষণেই তালবিয়া পাঠ করা।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ مُفْرِدًا الخ : যদি কোনো ব্যক্তি উমরার নিয়ত না করে শুধু হজের নিয়ত করে, তাহলে সে তালবিয়া দ্বারা শুধুমাত্র হজেরই নিয়ত করবে। কেননা, হজ একটা ইবাদত। আর আমল কিংবা ইবাদতসমূহের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

وَالتَّلْبِيَةُ اَنْ يَقُوْلَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ قَوْلُهُ اِنَّ الْحَمْدَ بِكَسْرِ الْاَلِفِ لَا بِفَتْحِهَا لِيَكُوْنَ اِبْتِدَاءً لَا بِنَاءً اِذِ الْفَتْحَةُ صِفَةُ الْاُوْلٰى وَهُوَ اِجَابَةٌ لِدُعَاءِ الْخَلِيْلِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلٰى مَا هُوَ الْمَعْرُوْفُ فِى الْقِصَّةِ وَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ لِاَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُوْلُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ فَلَا يُنْقَصُ عَنْهُ وَلَوْ زَادَ فِيْهَا جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) فِىْ رِوَايَةِ الرَّبِيْعِ (رحـ) عَنْهُ هُوَ اِعْتَبَرَهُ بِالْاَذَانِ وَالتَّشَهُّدِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ ذِكْرٌ مَنْظُوْمٌ وَلَنَا اَنَّ اَجِلَّاءَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) زَادُوْا عَلَى الْمَاثُوْرِ وَلِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ الثَّنَاءُ وَاِظْهَارُ الْعُبُوْدِيَّةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : আর তালবিয়া হলো এ বাক্যে বলা– لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ অর্থাৎ আমি হাজির, হে আল্লাহ ! আমি হাজির। আমি হাজির, আপনার কোনো শরিক নেই। আমি হাজির, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই এবং নিয়ামত ও রাজত্ব তোমারই এবং তোমার কোনো শরিক নেই। إن الحمد -এর হামযাটি যেরযুক্ত– যবরযুক্ত নয়, যাতে বক্তব্যটি স্বতন্ত্র হয়, পূর্ব সম্পর্কিত না হয়। কেননা, যবরযুক্ত হলে [ব্যাকরণের দৃষ্টিতে] তা পূর্ববর্তী বাক্যের বিশেষণ হবে। এই তালবিয়া হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দান, যেমন সংশ্লিষ্ট ঘটনায় সুবিদিত। উল্লিখিত শব্দগুলোর কোনো কিছুই বাদ দেওয়া উচিত নয়। কেননা, বর্ণনাকারীদের সর্বসম্মতিক্রমেই তা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তা থেকে কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না। তবে যদি কিছু বৃদ্ধি করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। রবী' -এর বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি একে আজান ও তাশাহহুদের উপর কিয়াস করেন, এদিক থেকে যে, তা বিধিবদ্ধ জিকির। আর আমাদের দলিল হলো– হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ হাদীসে বর্ণিত শব্দের সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ করেছেন। তা ছাড়া তালবিয়ার উদ্দেশ্য হলো প্রশংসা ও বন্দেগির প্রকাশ। সুতরাং তার সাথে অতিরিক্ত যোগ করা নিষিদ্ধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুন্নত তালবিয়া হলো– لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন– اِنَّ الْحَمْدَ বাক্যের হামযাটি যেরযুক্ত, যবরযুক্ত নয়। কেননা, যেরযোগে বাক্যটি স্বতন্ত্র হয়। পূর্ব সম্পর্কিত হয় না। আর যবরযোগে পূর্ববর্তী বাক্যের বিশেষণ হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তালবিয়া হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহ্বানে সাড়াদান। যেমন– সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ শেষে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ ! আমিতো শেষ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, ইবরাহীম! হজের জন্য আহ্বান করো। হযরত ইবরাহীম (আ.) আরজ করলেন, প্রভু ! আমার আওয়াজ কত দূরইবা পৌঁছবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি ডাকো, পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। হযরত ইবরাহীম (আ.) আবার বললেন, প্রভু ! কি বলে

ডাকব? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, এই বলে ডাক দাও- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ حَجُّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ অর্থাৎ 'হে লোক সকল! তোমাদের উপর প্রাচীন গৃহের হজ ফরজ করা হয়েছে।' হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর এই আহ্বান এত উঁচু আওয়াজে হয়েছিল যে, পৃথিবীর সকলেই তা শুনতে পেয়েছিল। এমনকি মায়ের গর্ভেও এ আহ্বান পৌঁছে যায়। আর এ আহ্বানে কেউ একবার, কেউবা দু বার আর কেউ কেউ একাধিকবার সাড়া দিয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যতবার সাড়া দিয়েছে খোদা চাহে তো সে ততবার হজ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। [আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকেও সেই আহ্বানে সাড়া প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।]

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাই উল্লেখ করেছেন-

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

অর্থাৎ 'স্মরণ করো, যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো, তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাজে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুকূ-সেজদাকারীদের জন্য আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।' [শায়খুল হিন্দ]

গ্রন্থকার বলেন, তালবিয়ার উল্লিখিত শব্দগুলোর কোনো শব্দই বাদ দেওয়া যাবে না। কেননা, অধিকাংশ বর্ণনাকারীর সর্বসম্মতিক্রমে এ তালবিয়া বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তা থেকে কোনো কিছুই বাদ দেওয়া সমীচীন নয়। তবে যদি কিছু শব্দ বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে রবী'-এর বর্ণনানুসারে তালবিয়ার শব্দে কোনো কিছু বৃদ্ধি করা জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) তালবিয়াকে আজান ও তাশাহহুদের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেভাবে আজান ও তাশাহহুদের শব্দাবলিতে পরিবর্তন ও সংযোজন জায়েজ নেই, তেমনিভাবে তালবিয়ার শব্দাবলিতেও অতিরিক্ত কিছু সংযোজন জায়েজ হবে না। উভয়টির মধ্যে عِلَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ [ইল্লাতে মুশতারিকা] হলো, যেভাবে আজান ও তাশাহহুদের শব্দাবলি সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত সেভাবে তালবিয়ার শব্দগুলোও সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত।

আমাদের দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ হাদীসে বর্ণিত তালবিয়ার সাথে অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন। যেমন হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীসে নিম্নোক্ত শব্দাবলি অতিরিক্ত আছে- لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসে অতিরিক্ত এসেছে- لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে- لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে।

যাহোক, তালবিয়ার বর্ণিত শব্দাবলিতে অতিরিক্ত সংযোজন করা সাব্যস্ত তথা জায়েজ।

দ্বিতীয় দলিল হলো, তালবিয়ার উদ্দেশ্য প্রশংসা ও বন্দেগির প্রকাশ। সুতরাং এর সাথে কোনো শব্দ সংযোজন এ উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক নয়; বরং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হবে।

قَالَ وَإِذَا لَبَّى فَقَدْ أَحْرَمَ يَعْنِي إِذَا نَوَى لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَأَدَّى إِلَّا بِالنِّيَّةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا لِتَقَدُّمِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا فِي قَوْلِهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ وَلَا يَصِيْرُ شَارِعًا فِي الْإِحْرَامِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَالَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيْمَةِ الصَّلٰوةِ وَيَصِيْرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْمُ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَرَبِيَّةً هٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ عَنْ أَصْحَابِنَا (رحـ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلٰوةِ عَلٰى أَصْلِهِمَا أَنَّ بَابَ الْحَجِّ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى يُقَامَ غَيْرُ الذِّكْرِ مَقَامَ الذِّكْرِ كَتَقْلِيْدِ الْبُدْنِ فَكَذَا غَيْرُ التَّلْبِيَةِ وَغَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন তালবিয়া পড়বে তখন ইহ্রাম বাঁধা হয়ে যাবে অর্থাৎ যদি নিয়ত করে থাকে। কেননা, ইবাদত নিয়ত ছাড়া আদায় হয় না। কিন্তু ইমাম কুদূরী তা উল্লেখ করেননি। কেননা, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَ – এ দোয়ার মধ্যে নিয়তের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। শুধু নিয়ত দ্বারা সে ইহ্রাম আরম্ভকারী বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ না সে তালবিয়া বলবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। [আমাদের দলিল] কেননা, ইহ্রাম একটি আমল আদায় করার সংকল্প। এজন্য জিকির জরুরি হবে, যেমন নামাজের তাহ্রীমার ক্ষেত্রে। তবে তালবিয়া ছাড়া এমন জিকির যা দ্বারা তা'জীম উদ্দেশ্য হয়, তার দ্বারাও ইহ্রাম শুরুকারী গণ্য হবে। সেটা চাই ফারসিতে হোক কিংবা আরবিতে হোক। আমাদের ইমামদের পক্ষ থেকে এটাই প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত। আর সাহেবাইনদের নীতি অনুযায়ী হজ ও নামাজের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো– হজের মধ্যে নামাজের চেয়ে অধিক অবকাশ রয়েছে। এ কারণেই হজের ক্ষেত্রে গায়রে জিকিরকে জিকিরের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। যেমন উটের গলায় হার পরিয়ে দেওয়া। সুতরাং অন্য জিকিরকে তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে এবং আরবি ছাড়া অন্য ভাষাকেও আরবির স্থলবর্তী করা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا لَبَّى فَقَدْ أَحْرَمَ الخ : মাসআলা হলো, যে ব্যক্তি ইহ্রাম বাঁধতে চায় সে যখন নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ করে তখন মুহ্রিম হয়ে যায়। যদি নিয়ত ছাড়া শুধু তালবিয়া পাঠ করে, কিংবা তালবিয়া ছাড়া শুধু নিয়ত করে, তাহলে মুহ্রিম হবে না। কারণ, মুহ্রিম হওয়ার জন্য নিয়ত ও তালবিয়া উভয়টিই আবশ্যক। নিয়ত আবশ্যক হওয়ার কারণ, ইবাদত নিয়ত ছাড়া আদায় হয় না। তবে ইমাম কুদূরী (র.) এখানে নিয়তের কথা উল্লেখ করেননি, তার উত্তর পূর্বে উল্লিখিত اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ দোয়ার মধ্যে নিয়তের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। বিধায় দ্বিতীয়বার নিয়তের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَلَا يَصِيْرُ شَارِعًا الخ : এ ইবারতে দ্বিতীয় আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তালবিয়া ছাড়া শুধু নিয়তের দ্বারা মুহ্রিম হবে না; বরং নিয়তের সাথে সাথে তালবিয়াও জরুরি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু নিয়তের দ্বারা মুহ্রিম হবে– তালবিয়া পাঠ করুক বা না করুক। এটাই ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) হজকে রোজার উপর কিয়াস করেছেন। নিষিদ্ধ কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকার নাম যেমন রোজা, তেমনি কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে বিরত থাকার নাম হলো হজ। আর রোজা আরম্ভ করার জন্য শুধু নিয়তই যথেষ্ট, সুতরাং হজের ক্ষেত্রেও সেরূপ নিয়তই যথেষ্ট হবে– তালবিয়ার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু হানাফীগণ হজকে নামাজের উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, বান্দা নামাজের মধ্যে দাঁড়ানো, রুকূ, সিজদাসহ কতিপয় ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে, তেমনি হজের ক্ষেত্রেও তওয়াফ, সাঈ, ওকূফে আরাফাহ্, পাথর নিক্ষেপ, কুরবানি ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করে। আর নিষিদ্ধ কিছু থেকে বিরত থাকাটা অন্তর্নিহিত বিষয়। সুতরাং নামাজ শুরু করতে যেমন শুধু নিয়তই যথেষ্ট নয় এমন জিকির জরুরি যার দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা হবে– যেমন তাকবীরে তাহ্রীমা, তেমনিভাবে হজ আরম্ভ করার জন্যও শুধু নিয়তই যথেষ্ট হবে না; বরং এমন জিকির জরুরি যার দ্বারা হজের কার্যাদি আরম্ভ হবে। চাই তা তালবিয়া হোক কিংবা তার স্থলবর্তী অন্য কিছু হোক। যাহোক, আমাদের নিকট মুহ্রিম হওয়ার জন্য নিয়তের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠও আবশ্যক।

দলিল হলো, ইহ্রাম এমন একটি ইবাদত আদায় করার সংকল্প করা যাতে বিভিন্ন ধরনের কার্যাদি সন্নিবেশিত আছে। আর এ জাতীয় ইবাদত শুরু করার জন্য এমন জিকির জরুরি, যার দ্বারা বড়ত্ব ও বন্দেগি প্রকাশ পায়। চাই তা তালবিয়া হোক কিংবা অন্য কিছু হোক– আরবিতে হোক আর ফারসিতে হোক। আমাদের ইমামদের প্রসিদ্ধ মাযহাব এটিই।

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلٰوةِ الخ বাক্য দ্বারা সাহেবাইনের নীতির আলোকে নামাজ ও হজের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ পার্থক্য বর্ণনার কারণ হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নামাজ শুরু করাকে তাকবীরের সাথে খাস করেছেন, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) আরবির সাথে খাস করেছেন। আর হজ শুরু করার জন্য তালবিয়া নির্ধারিত নয় এবং আরবি ভাষাও নির্দিষ্ট নয়; বরং এমন জিকিরের দ্বারা ইহ্রাম শুরুকারী হবে যা বড়ত্ব প্রকাশ করে চাই সেটা তালবিয়া হোক কিংবা তালবিয়া ছাড়া অন্য কিছু এবং তা আরবি ভাষায়ও হতে পারে অন্য ভাষায়ও হতে পারে।

সুতরাং নামাজ ও হজের মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, হজের মধ্যে নামাজের তুলনায় অধিক অবকাশ রয়েছে। এমনকি হজের ক্ষেত্রে গায়রে জিকিরকে জিকিরের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। যেমন– তালবিয়া পাঠ না করেও হজের উদ্দেশ্যে উটকে হার পরিয়ে দিলে মুহ্রিম বলে গণ্য হবে। সুতরাং গায়রে জিকির [উটকে হার পরিয়ে দেওয়া] যখন তালবিয়ার স্থলবর্তী হয়, তখন অন্য জিকির অবশ্যই তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে। এমনিভাবে তালবিয়া আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পড়লেও যথেষ্ট হবে। কিন্তু নামাজের মধ্যে অবকাশ না থাকার কারণে তা তাকবীর দিয়েই শুরু করা জরুরি, যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। আর তাকবীর আরবিতে হওয়াও জরুরি, যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত।

قَالَ وَيَتَّقِيْ مَا نَهَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوْقِ وَالْجِدَالِ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ فَهٰذَا نَهْىٌ بِصِيْغَةِ النَّفْىِ وَالرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ اَوِ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ اَوْ ذِكْرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَالْفُسُوْقُ الْمَعَاصِىْ وَهُوَ فِىْ حَالِ الْاِحْرَامِ اَشَدُّ حُرْمَةً وَالْجِدَالُ اَنْ يُّجَادِلَ رَفِيْقَهُ وَقِيْلَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ تَقْدِيْمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَتَاخِيْرِهِ وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ.

অনুবাদ : সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি যে সকল বিষয় আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তা পরিহার করে চলবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটিই হলো মূল– فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ অর্থাৎ 'হজে সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ নেই।' এখানে না-বাচক শব্দে নিষেধ বুঝানো হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত رَفَثٌ অর্থ সহবাস কিংবা অশ্লীল কথা কিংবা নারীদের উপস্থিতিতে যৌনবিষয়ক আলোচনা। আর فُسُوْقٌ অর্থ নাফরমানি। ইহ্‌রাম অবস্থায় এগুলো কঠোরভাবে হারাম। আর جِدَالٌ অর্থ সঙ্গীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, বিবাদ না করার অর্থ হলো হজের সময় অগ্রপশ্চাৎ নিয়ে মুশরিকদের সাথে ঝগড়া বিবাদ না করা এবং কোনো শিকার হত্যা করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মুহ্‌রিম অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা করো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয় করতে নিষেধ করেছেন যেমন– সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি সেগুলো ইহ্‌রাম বেঁধে পরিহার করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ অর্থাৎ 'যে হজের দিনসমূহে নিজের উপর হজ ফরজ করে নেয় সে যেন সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ না করে।'

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আয়াতে না-বাচক শব্দ দ্বারা নিষেধ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এগুলো করো না। বর্ণিত তিনটি শব্দের মর্মার্থ কি, এ সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন– رَفَثٌ অর্থ– সহবাস। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ -এ رَفَثٌ অর্থ– সহবাস। অর্থাৎ রোজার রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বৈধ। কিংবা رَفَثٌ অর্থ– অশ্লীল ও অনর্থক বাজে কথা বলা। কিংবা নারীদের উপস্থিতিতে যৌন বিষয়ক যৌন উত্তেজক আলোচনা। আর فُسُوْقٌ অর্থ– সর্বপ্রকার নাফরমানি ও পাপাচার। নাফরমানি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ হলেও ইহ্‌রাম অবস্থায় তা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যেমন– পুরুষদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা হারাম, কিন্তু নামাজের অবস্থায় তা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর جِدَالٌ হলো, সঙ্গী-সাথী কিংবা খাদেমের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা। আর কেউ কেউ বলেন, جِدَالٌ -এর অর্থ হলো হজের সময় অগ্রপশ্চাৎ নিয়ে মুশরিকদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হওয়া।

ইহ্‌রাম অবস্থায় স্থলের শিকার হত্যা করা হারাম। জবাই বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন। তবে সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করার অনুমতি আছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ অর্থাৎ 'তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না।' অন্য আয়াতে স্থলের শিকারের কথা বিবৃত হয়েছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে– وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا অর্থাৎ 'ইহ্‌রাম অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থল প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

وَلَا يُشِيْرُ إِلَيْهِ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ أَبِيْ قَتَادَةَ (رض) أَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ حَلَالٌ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ دَلَلْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ فَقَالُوْا لَا فَقَالَ إِذًا فَكُلُوْا وَلِأَنَّهُ إِزَالَةُ الْأَمْنِ عَنِ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ أَمِنٌ بِتَوَحُّشِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْأَعْيُنِ .

অনুবাদ : শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করবে না এবং শিকার সম্পর্কে অবহিত করবে না। কেননা, হযরত আবূ কাতাদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, তিনি হালাল অবস্থায় একটি বন্যগাধা শিকার করেছিলেন। আর তার সঙ্গীরা মুহ্‌রিম ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের জিজ্ঞাসা করছিলেন– তোমরা কি ইঙ্গিত করেছিলে? তোমরা কি নির্দেশনা দিয়েছিলে? তোমরা কি সহায়তা করেছিলে? তারা সকলে বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা খেতে পার। তা ছাড়া এজন্য যে, এগুলোর দ্বারা শিকারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কেননা, শিকার তার বন্যতা ও চক্ষুর আড়ালে থাকার কারণে নিরাপদ ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা কিংবা শিকার সম্পর্কে অবহিত করা জায়েজ নেই। ইশারা দ্বারা বুঝা যায় শিকার উপস্থিত। আর নির্দেশনা ও অবহিত দ্বারা বুঝা যায় শিকার উপস্থিত নেই। নির্দেশনা ও অবহিতকরণের পদ্ধতি হলো– মুহ্‌রিম গায়রে মুহ্‌রিমকে বলে, অমুক স্থানে শিকার আছে। যাহোক, ইশারা করা কিংবা বলে দেওয়া উভয়ই মুহ্‌রিমের জন্য নিষিদ্ধ। দলিল হলো, হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-একবার বন্যগাধা শিকার করেছিলেন। তিনি অবশ্য হালাল অবস্থায় ছিলেন। তবে তাঁর সঙ্গীরা মুহ্‌রিম অবস্থায় ছিলেন। সকলেই এর গোশ্‌ত খেয়েছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ঘটনা জানানো হলে তিনি হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কি আবূ কাতাদাকে ইঙ্গিত করে ছিলে? তোমরা কি শিকারের অবস্থান বলে দিয়েছিলে? তোমরা কি তাকে সাহায্য করেছিলে? তারা সকলেই বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যদি তা-ই হয় তাহলে খেতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং অবশিষ্ট গোশতও তোমরা খাও। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা, শিকারের পথ বলে দেওয়া কিংবা শিকার করতে সাহায্য করা সবই নিষেধ।

দ্বিতীয় দলিল– শিকারের প্রাণী তার বন্যতা ও চক্ষুর আড়ালে থাকার কারণে নিরাপদে ছিল। আর উল্লিখিত বিষয়গুলো তার নিরাপত্তা বিনষ্ট করে। অথচ কারো নিরাপত্তা বিনষ্ট করা হারাম। এজন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলো মুহ্‌রিমের জন্য হারাম।

وَقَالَ وَلَا يَلْبَسُ قَمِيْصًا وَلَا سَرَاوِيْلَ وَلَا عِمَامَةً وَلَا خُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ وَلَا خُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَالْكَعْبُ هٰنَا الْمَفْصَلُ الَّذِىْ فِىْ وَسْطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقَدِ الشِّرَاكِ فِيْمَا رَوٰى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন– পাঞ্জাবি, পাজামা, পাগড়ি ও মোজা পরবে না। তবে যদি জুতা না পায়, তাহলে كَعْبٌ থেকে নিচের দিকে মোজা কেটে দেবে। কেননা বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহ্‌রিমকে এ সকল জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং শেষে বলেছেন–وَلَا خُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ। এখানে كَعْبٌ অর্থ পায়ের পাতার মধ্যস্থলের গ্রন্থি যেখানে ফিঁতা বাঁধা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম তা বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : পাঞ্জাবি, পাজামা, পাগড়ি, টুপি, মোজা ইত্যাদি সেলাই করা কাপড় মুহ্‌রিমের জন্য পরিধান করা জায়েজ নেই। তবে যদি সে জুতা না পায়, তাহলে এমন মোজা পরিধান করতে পারবে যার كَعْبٌ থেকে নিচের অংশ কর্তিত। এখানে كَعْبٌ অর্থ টাখনু নয়; বরং পায়ের পাতার মধ্যস্থলের জোড় উদ্দেশ্য। দলিল নিম্নোক্ত হাদীস–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَاْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَ لَهٗ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهٗ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ .

অর্থাৎ 'হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! ইহ্‌রাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরতে আপনি নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পাঞ্জাবি, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি এবং মোজা পরিধান করবে না। আর যদি কারো কাছে জুতা না থাকে, তাহলে সে যেন মোজা পরিধান করে, তবে كَعْبٌ -এর নিচ থেকে কেটে দেবে। এমন কিছু পরিধান করবে না যা জাফরান কিংবা ওরস [তিলের মতো একজাতীয় ঘাস যা রং এর কাজ করে] মিশ্রিত। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় উপরোল্লিখিত কাপড় পরিধান করা নিষেধ। তবে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের মোজা পরিধান করা জায়েজ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, كَعْبٌ -এর দু ধরনের বিশ্লেষণ করা হয়।

১. টাখনু তথা পায়ের দু পার্শ্বে স্ফীত গ্রন্থি।

২. পায়ের পাতার মধ্যস্থল যেখানে ফিতা বাঁধা হয় এবং আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলো একত্রিত হয়েছে। হিশাম ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ স্থলে كَعْبٌ -এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি উদ্দিষ্ট। আর 'পবিত্রতা' অধ্যায়ে اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ। -এর মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য।

وَلَا يُغَطِّى وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِحْرَامُ الرَّجُلِ فِىْ رَأْسِهِ وَاِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِىْ وَجْهِهَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا قَالَهُ فِىْ مُحْرِمٍ تُوُفِّىَ وَلِاَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُغَطِّىْ وَجْهَهَا مَعَ اَنَّ فِى الْكَشْفِ فِتْنَةً فَالرَّجُلُ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى وَفَائِدَةُ مَا رَوٰى الْفَرْقُ فِىْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ .

অনুবাদ : এবং চেহারা ও মাথা ঢাকবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পুরুষের জন্য চেহারা ঢাকা জায়েজ আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اِحْرَامُ الرَّجُلِ فِىْ رَأْسِهِ وَاِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِىْ وَجْهِهَا 'পুরুষের ইহ্‌রাম হলো তার মাথায় এবং স্ত্রীলোকের ইহ্‌রাম হলো তার চেহারায়।' আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– لَا تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُلَبِّيًا 'তার চেহারা ও মাথা ঢাকবে না [কাফনের কাপড়ে]। কেননা, কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া বলা অবস্থায় উত্থিত করা হবে।' এ কথা তিনি ﷺ বলেছেন ঐ মুহ্‌রিম সম্পর্কে যে মারা গিয়েছিল। তা ছাড়া এজন্য যে, স্ত্রীলোকের চেহারা ঢাকা হয় না, অথচ তা খুলে রাখাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব পুরুষের চেহারা তো খুলে রাখা অধিক সঙ্গত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মাথা ঢাকার দ্বারা [পুরুষ ও মহিলার মধ্যে] পার্থক্য করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুহ্‌রিম পুরুষের জন্য চেহারা ও মাথা ঢাকা জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পুরুষের জন্য চেহারা ঢাকা জায়েজ। এটিই ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো এই হাদীস اِحْرَامُ الرَّجُلِ فِىْ رَأْسِهِ وَاِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِىْ وَجْهِهَا অর্থাৎ 'পুরুষের ইহ্‌রাম হলো তার মাথায় এবং স্ত্রীলোকের ইহ্‌রাম হলো তার চেহারায়।' মোটকথা, পুরুষের ইহ্‌রাম যেহেতু মাথায় সেহেতু মাথা ঢাকা জায়েজ নেই। আর যেহেতু চেহারার সাথে তার ইহ্‌রাম সম্পৃক্ত নয় সেহেতু চেহারা ঢাকা জায়েজ। হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–
اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় নিজের চেহারা মোবারক ঢেকে নিতেন।'

আমাদের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস–
اِنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوْهُ طِيْبًا وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

অর্থাৎ 'জনৈক মুহ্‌রিমকে তার সওয়ারি ফেলে দিলে সে মৃত্যু বরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে বরই পাতা মেশানো পানিতে গোসল দেবে এবং দু কাপড়ে তাকে কাফন পরিধান করাবে। তাকে সুগন্ধি মাখবে না এবং তার মাথা ও চেহারা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া বলা অবস্থায় উত্থিত করা হবে।' এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পুরুষ মুহ্‌রিমের চেহারা ও মাথা ঢাকা জায়েজ নেই।

দ্বিতীয় দলিল হলো, স্ত্রীলোক ইহ্‌রাম অবস্থায় চেহারা ঢাকবে না, অথচ তা খুলে রাখাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু পুরুষের চেহারা খুলে রাখার মধ্যে ফিতনার কোনো আশঙ্কাই নেই, অতএব না ঢাকাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মাথা ঢাকার মধ্যে পুরুষ ও মহিলার পার্থক্য প্রকাশ করা অর্থাৎ ইহ্‌রাম অবস্থায় মহিলার জন্য মাথা ঢেকে রাখা জায়েজ। কেননা, তার ইহ্‌রাম হলো তার চেহারায়, মাথায় নয়। অপরদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ঢাকা জায়েজ নেই। কেননা, তার ইহ্‌রাম তার মাথায় প্রকাশ পায়।

হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উত্তর হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় নিজের নাকের উপর হাত রেখেছিলেন যা বর্ণনাকারী চেহারা আবৃত করা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চেহারা ঢেকে ফেলেননি। ফতোয়ায়ে কাযীখানে বর্ণিত আছে, ইহ্‌রাম অবস্থায় নাকে হাত রাখাতে কোনো অসুবিধা নেই।

قَالَ وَلَا يَمَسُّ طِيْبًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ وَكَذَا لَا يَدَّهِنُ لِمَا رَوَيْنَا وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ (الاية) وَلَا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ لِاَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْحَلْقِ وَلِاَنَّ فِيْهِ اِزَالَةُ الشَّعِثِ وَقَضَاءُ التَّفَثِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَلْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ 'হাজী হলেন ধূলিমলিন ও অপরিপাটি'। অদ্রূপ তেল ব্যবহার করবে না, আমাদের বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে। আর মাথা মুণ্ডন করবে না এবং শরীরের পশমও না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ 'তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডাবে না'। আর দাড়ি ছাঁটবে না। কেননা, এটা মুণ্ডানোর সমার্থক। তা ছাড়া এতে ধূলিমলিনতা এবং ময়লা দূর করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুহরিম সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-اَلْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ 'হজকারী হলেন, ধূলামলিন ও অপরিপাটি।' شَعِث -এর 'শীন' যবরযুক্ত এবং 'আইন' যেরযুক্ত। অর্থ–চুল উষ্কখুষ্ক ও ধূলামলিন হওয়া। আর تَفِلْ -এর 'তা' যবরযুক্ত এবং 'ফা' যেরযুক্ত। অর্থ– সুগন্ধি ব্যবহার না করা, অপরিপাটি। অর্থাৎ হাজি হলেন উষ্কখুষ্ক, ধূলামলিন ও অপরিপাটি, সুগন্ধিহীন চুলবিশিষ্ট।

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে তেল ব্যবহারও নিষিদ্ধ। আর মাথার চুল ও শরীরের পশমও মুণ্ডাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ 'তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডাবে না'। দাড়িও ছাঁটবে না। কেননা, দাড়ি ছাঁটা মাথা মুণ্ডানোর সমার্থক। তা ছাড়া মাথা মুণ্ডানো ও দাড়ি ছাঁটার মাধ্যমে ধূলামলিনতা ও ময়লা বিদূরিত হয়ে যায়, যা হাজীদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়। এজন্যই মাথা মুণ্ডাবে না ও দাড়ি ছাঁটবে না।

قَالَ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ وَلَا عُصْفُرٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ غَسِيْلًا لَا يَنْفُضُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِلطِّيْبِ لَا لِلَّوْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِأَنَّهُ لَوْنٌ لَا طِيْبَ لَهُ وَلَنَا أَنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুসুম, জাফরান ও ওরস রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ [মুহ্‌রিম এমন কোনো কাপড় পরিধান করবে না যাকে জাফরান বা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে।] তবে তা যদি এমনভাবে ধোয়া হয় যে, আর সুগন্ধ বের হয় না [তাহলে পরিধান করা যাবে]। কেননা, নিষেধ করা হয় সুগন্ধির কারণে, রঙের কারণে নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুসুম রঞ্জিত কাপড় পরিধানে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এটা শুধু রঙ, তাতে সুগন্ধি নেই। আমাদের দলিল হলো– তাতে সুঘ্রাণ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَرْسٌ - 'ওয়াও'-যবরযুক্ত, 'রা' জযমযুক্ত। এক ধরনের কড়া সুগন্ধি উদ্ভিদবিশেষ, যা ইয়েমেনে উৎপন্ন হয়। قَامُوْس গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, জাফরানের মতো লাল রঙের উদ্ভিদ। صِحَاح -এর মধ্যে হলুদ বর্ণের উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে।

عُصْفُرٌ -কুসুম ঘাসের নাম। হলুদ রঙ। زَعْفَرَانٌ বহুবচনে زَعَافِرُ অর্থ– জাফরান গাছ, জাফরান।

মাসআলা হলো–কুসুম, জাফরান ও ওরস রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা মুহ্‌রিমের জন্য জায়েজ নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহ্‌রিম এমন কোনো কাপড় পরিধান করবে না, যাকে জাফরান বা ওরস দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে। এমনকি হাদীসের বিশুদ্ধতম কিতাবে মুহ্‌রিম সম্পর্কে এভাবে বিবৃত হয়েছে– لَا تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ তবে উল্লিখিত সুগন্ধিযুক্ত রঙ মিশ্রিত কাপড় যদি এমনভাবে ধোয়া হয় যে, তা থেকে আর সুগন্ধি বের হয় না, তাহলে তা পরিধান করা যাবে যদিও তাতে রং অবশিষ্ট থাকে। কেননা, মুহ্‌রিমের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ; রং তার জন্য নিষেধ নয়। এ ক্ষেত্রে মূল হলো 'ত্বাহাবী' শরীফে উল্লিখিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوْا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ غَسِيْلًا

অর্থাৎ 'হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জাফরান কিংবা ওরস রঞ্জিত কাপড় তোমরা পরিধান করবে না। তবে তা ধৌত করা হলে [পরিধান করতে পারবে]।'

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুহ্‌রিমের জন্য কুসুম রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা জায়েজ। কেননা, এটা শুধু রং, এতে কোনো সুগন্ধি নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুহ্‌রিমের জন্য সুগন্ধি নিষিদ্ধ, রং নয়।

আমাদের দলিল হলো– কুসুমের মধ্যেও এক ধরনের ঘ্রাণ রয়েছে। এ স্থলে আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানৈক্যের মূল বিষয় হচ্ছে– তাঁর মতে কুসুমে কোনো সুগন্ধি নেই আর আমাদের মতে এতে সুগন্ধি আছে।

قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ وَيَدْخُلَ الْحَمَّامَ لِاَنَّ عُمَرَ (رضـ) اِغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ اَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْفُسْطَاطِ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ وَلَنَا اَنَّ عُثْمَانَ (رضـ) كَانَ يُضْرَبُ لَهُ فُسْطَاطٌ فِىْ اِحْرَامِهٖ وَلِاَنَّهُ لَا يَمَسُّ بَدَنَهُ فَاَشْبَهَ الْبَيْتَ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোসল করা কিংবা গোসলখানায় প্রবেশ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, হযরত ওমর (রা.) মুহ্‌রিম অবস্থায় গোসল করেছেন। গৃহের কিংবা হাওদার [কিংবা অন্য কিছুর] ছায়া গ্রহণ করাতে অসুবিধা নেই। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শামিয়ানা বা এ ধরনের কিছুর ছায়া গ্রহণ করা মাকরূহ হবে। কেননা, হযরত এটা মাথা ঢাকার সদৃশ। আমাদের দলিল হলো হযরত উসমান (রা.)-এর জন্য ইহ্‌রামের অবস্থায় শামিয়ানা টাঙ্গানো হতো। তা ছাড়া এটা তার শরীরকে স্পর্শ করে না। অতএব গৃহের সদৃশ হলো [মাথা ঢাকার নয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يَغْتَسِلَ الخ মাসআলা : মুহ্‌রিমের উপর ফরজ গোসল ওয়াজিব। কিন্তু মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে তার জন্য গোসল করা মোস্তাহাব। কেননা, ইহ্‌রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করেছেন। আর মুহ্‌রিম গরম পানি দ্বারা গোসল করার লক্ষ্যে হাম্মামখানায় [গোসল খানায়] প্রবেশ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, হযরত ওমর (রা.) মুহ্‌রিম অবস্থায় গোসল করেছেন।

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يَسْتَظِلَّ الخ মাসআলা হলো– 'আমাদের নিকটে মুহ্‌রিমের জন্য গৃহের ছাদের কিংবা হাওদার বা অন্য কিছুর ছায়া গ্রহণ করা জায়েজ। আর ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে শামিয়ানা বা এ ধরনের কিছুর ছায়া গ্রহণ করা মাকরূহ। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, শামিয়ানার ছায়া গ্রহণ করা মাথা ঢাকার মতোই– আর মুহ্‌রিমের জন্য মাথা ঢাকা জায়েজ নেই। তবে শামিয়ানার ছায়া গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে মাথা ঢাকা হয় না বলে তা মুহ্‌রিমের জন্য নাজায়েজ হবে না বটে তবে এর সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে মাকরূহ হবে।

আমাদের দলিল এই যে, হযরত উকবা ইবনে হিব্বান বলেন, আমি উসমান (রা.)-কে দেখেছি, মুহ্‌রিম অবস্থায় তার জন্য শামিয়ানা টাঙ্গানো হতো এবং তার তরবারি গাছে ঝুলানো থাকত।

মুসলিম শরীফে হযরত উম্মুল হুসাইন (রা.)-এর হাদীস এসেছে–

حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَ بِلَالاً وَاَحَدُهُمَا اٰخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ـ

অর্থাৎ 'হযরত উম্মুল হুসাইন (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ করেছি। আমি উসামা ও বিলাল (রা.)-কে দেখলাম, তাদের একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটের লাগাম ধরেছিলেন আর অপরজন নিজের কাপড় উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রোদ থেকে আড়াল করেছিলেন, জামরায়ে আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত।'

আক্বলী [যুক্তির ভিত্তিতে] দলিল হলো, শামিয়ানা ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করে না। সুতরাং তা ঘরের ছাদের মতোই। আর গৃহের ছাদের ছায়া গ্রহণে কোনো অসুবিধা নেই। তাই শামিয়ানার ছায়া গ্রহণে মাকরূহ হবে না।

وَلَوْ دَخَلَ تَحْتَ اَسْتَارِ الْكَعْبَةِ حَتّٰى غَطَّتْهُ اِنْ كَانَ لَا يُصِيْبُ رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَلَا بَأْسَ لِاَنَّهُ اِسْتِظْلَالٌ وَلَا بَأْسَ اَنْ يَشُدَّ فِيْ وَسْطِهِ الْهِمْيَانَ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) يُكْرَهُ اِذَا كَانَ فِيْهِ نَفَقَةُ غَيْرِهٖ لِاَنَّهُ لَا ضَرُوْرَةَ وَلَنَا اَنَّهُ لَيْسَ فِيْ مَعْنَى لُبْسِ الْمَخِيْطِ فَاسْتَوَتْ فِيْهِ الْحَالَتَانِ.

অনুবাদ : আর যদি মুহ্‌রিম কা'বা শরীফের গিলাফের ভিতরে ঢুকে যায় আর তা তাকে ঢেকে ফেলে, তবে যদি তার মাথা ও চেহারায় কাপড় না লাগে তাহলে কোনো দোষ নেই। কেননা, এটা ছায়া গ্রহণেরই মতো। কোমরে টাকার থলে বাঁধায় কোনো দোষ নেই। ইমাম মালিক (র.) বলেন, যদি তাতে অন্য কারো খরচের টাকা থাকে, তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের দলিল হলো– এটা সেলাইকৃত কাপড় পরার সমার্থক নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উভয় অবস্থাই সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ دَخَلَ تَحْتَ الخ : মুহ্‌রিম কা'বা শরীফের গিলাফের ভিতর ঢুকে গেলে এবং কা'বার গিলাফ তাকে ঢেকে ফেললে- দু ধরনের অবস্থা হতে পারে।

১. চেহারা ও মাথাকে গিলাফ স্পর্শ না করলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এটা ছায়া গ্রহণের মতো।

২. যদি গিলাফ মাথা কিংবা চেহারায় লেগে যায়, তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা, তখন মাথা ঢাকার সদৃশ হবে।

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ اَنْ يَشُدَّ الخ : هِمْيَانٌ 'হা' যেরযুক্ত, কোমরবন্দ যা থলির কাজ করে। এতে টাকা-পয়সা রেখে কোমরে বাঁধা হয়। আমাদের নিকট মুহ্‌রিমের জন্য কোমরে থলে বাঁধতে কোনো অসুবিধা নেই। চাই সে তহবন্দের উপরে বাঁধুক কিংবা নিচে বাঁধুক। ইমাম মালিক (র.) বলেন, যদি তাতে নিজের খরচের টাকা থাকে, তাহলে তা বাঁধা জায়েজ– মাকরূহ হবে না। আর যদি তাতে অন্য কারো খরচের টাকা থাকে, তাহলে তা মাকরূহ হবে। ইমাম মালিক (র.) -এর দলিল হলো, থলের মধ্যে অন্যের খরচের টাকা থাকলে তা বাঁধার কোনো প্রয়োজন নেই। আর প্রয়োজন ছাড়া থলে কোমরে বাঁধা মুহ্‌রিমের জন্য মাকরূহ। হ্যাঁ, যদি তাতে নিজের খরচের টাকা-পয়সা থাকে, তাহলে তা প্রয়োজন বলে জায়েজ।

আমাদের দলিল হলো– টাকার থলে যেহেতু সেলাইকৃত কাপড়ের মতো নয়, তাই তা বাঁধতে কোনো অসুবিধা নেই। চাই তাতে নিজের খরচের টাকা থাক বা অন্য কারো খরচের টাকা থাক।

মূল দলিল হলো, একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, মুহ্‌রিম কি [কোমরে] থলে বাঁধতে পারবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন– اِسْتَوْثِقْ فِيْ نَفَقَتِكَ بِمَا شِئْتَ 'যেভাবে পার নিজের খরচের হেফাজত করো।' এ থেকেও থলে বাঁধা জায়েজ সাব্যস্ত হয়।

হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত আকলী দলিলের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়–

ক. মুহ্‌রিমের জন্য তার তহবন্দ কিংবা চাদরের উপর রশি কিংবা অন্য কিছু দিয়ে বাঁধা সর্বসম্মতিক্রমে 'মাকরূহ' অথচ রশি সেলাইকৃত কাপড়ের মতো নয়।

খ. মুহ্‌রিমের জন্য মাথায় পট্টি বাঁধাও মাকরূহ। এমনকি যদি সে পূর্ণ একদিন বেঁধে রাখে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। অথচ পট্টি সেলাইকৃত কাপড়ের সমার্থক নয়।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো মুহ্‌রিমের জন্য রশি বা অন্যকিছু বাঁধা মাকরূহের বিষয়টি হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন হাদীসে এসেছে– اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلًا قَدْ شَدَّ فَوْقَ اِزَارِهٖ حَبْلًا فَقَالَ اَلْقِ هٰذَا الْحَبْلَ وَيْلَكَ অর্থাৎ 'একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে স্বীয় তহবন্দের উপর রশি বাঁধতে দেখে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! এ রশি খুলে ফেল।'

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, পট্টি বাঁধার ফলে মাথার একাংশ ঢেকে যাওয়ার কারণে তার উপর সদকা ওয়াজিব হয়। কেননা, ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ।

وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ لِأَنَّهُ نَوْعُ طِيْبٍ وَلِأَنَّهُ يَقْتُلُ هَوَامَّ الرَّأْسِ قَالَ

وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا اَوْ هَبَطَ وَادِيًا اَوْ لَقِيَ رُكْبَانًا

وَبِالْاَسْحَارِ لِاَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوْا يُلَبُّوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْاَحْوَالِ وَالتَّلْبِيَةُ

فِي الْاِحْرَامِ عَلٰى مِثَالِ التَّكْبِيْرِ فِي الصَّلٰوةِ فَيُؤْتٰى بِهَا عِنْدَ الْاِنْتِقَالِ مِنْ حَالٍ اِلٰى حَالٍ .

অনুবাদ : মাথা ও দাড়ি 'খিতমী' দ্বারা ধৌত করবে না। কেননা, এটা এক ধরনের সুগন্ধি। তা ছাড়া এটা মাথার উকুন ধ্বংস করে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সকল নামাজের পরে এবং যখনই কোনো উঁচু স্থানে আরোহণ করবে কিংবা উপত্যকায় অবতরণ করবে কিংবা সওয়ারদের দেখা পাবে তখনই বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে এবং শেষ রাতের সময়ও। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ এ সকল অবস্থায় তালবিয়া পড়তেন। ইহ্‌রামের ক্ষেত্রে তালবিয়া হলো সালাতের ক্ষেত্রে তাকবীরের মতো। সুতরাং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের সময় তা বলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ الخ-**মাসআলা :** মুহ্‌রিমের জন্য মাথা ও দাড়ি 'খিতমী'-দ্বারা ধৌত করা জায়েজ নেই। প্রথম দলিল হলো–'খিতমী' এক ধরনের সুগন্ধি। আর মুহ্‌রিমের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েজ নেই। দ্বিতীয় দলিল হলো–'খিতমী' মাথার উকুন ধ্বংস করে। আর মুহ্‌রিমের জন্য প্রাণী হত্যা বৈধ নয়। এ দুটি দলিলের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, যদি কোনো মুহ্‌রিম 'খিতমী' দ্বারা মাথা ধৌত করে, তাহলে পরিপূর্ণ জিনায়াত [হজের সময় নিষিদ্ধ অপরাধ] হওয়ার কারণে তার উপর [ক্ষতিপূরণার্থে] কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে, কুরবানি নয়। কেননা, 'খিতমী' সুগন্ধি নয়, বরং তা উশনানের ন্যায় এক ধরনের সুগন্ধি জাতীয় উদ্ভিদ। তবে যেহেতু তা উকুন ধ্বংস করে, তাই সদকা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ الخ-**মাসআলা :** ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুহ্‌রিম ফরজ, নফল, আদা, কাজা যে কোনো নামাজের পরই বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, শুধু ফরজ নামাজ আদায় করার পর তালবিয়া পড়বে। কাজা নামাজ কিংবা নফল নামাজের পর তালবিয়া পড়বে না। যখন উঁচুতে আরোহণ করবে কিংবা উপত্যকায় অবতরণ করবে কিংবা সওয়ারদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখনই বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। এমনিভাবে শেষ রাতেও বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। প্রথম দলিল হলো, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ সকল অবস্থায় বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করতেন। দ্বিতীয় দলিল হলো, নামাজের মধ্যে তাকবীর যেমন– ইহ্‌রামের মধ্যে তালবিয়া তেমন। নামাজে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সময় যেমন তাকবীর বলতে হয় ঠিক তেমনি ইহ্‌রামের মধ্যে তালবিয়া পাঠ করতে হয়।

وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ إِسَالَةُ الدَّمِ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ اِبْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ وَهُوَ فِيْهِ وَلَا يَضُرُّهُ لَيْلًا دَخَلَهَا اَوْ نَهَارًا لِاَنَّهُ دُخُوْلُ بَلْدَةٍ فَلَا تَخُصُّ بِاَحَدِهِمَا وَاِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (رض) يَقُوْلُ اِذَا لَقِىَ الْبَيْتَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَمُحَمَّدٌ (رح) لَمْ يُعَيِّنْ فِى الْاَصْلِ لِمَشَاهِدِ الْحَجِّ شَيْئًا مِنَ الدَّعْوَاتِ لِاَنَّ التَّوْقِيْتَ يَذْهَبُ بِالرِّقَّةِ وَاِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَنْقُوْلِ مِنْهَا فَحَسَنٌ ـ

অনুবাদ : উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়বে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ 'উত্তম হজ হলো 'আজ্জ' ও 'ছাজ্জ' আজ্জের অর্থ– উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া আর ছাজ্জের অর্থ– রক্ত প্রবাহিত করা [কুরবানি করা]। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন প্রথমে মসজিদুল হারামে যাবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তখন প্রথমে মসজিদুল হারামে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া আসল উদ্দেশ্য তো হলো বায়তুল্লাহ জিয়ারত করা, আর তা অবস্থিত মসজিদুল হারামের মধ্যে এবং মসজিদুল হারামে রাত্রে বা দিনে প্রবেশ করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা, তা হলো একটি শহরে প্রবেশ। সুতরাং রাত্র বা দিন কোনো একটির বিশেষত্ব নেই। আর যখন বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আল্লাহু আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বায়তুল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকালে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলতেন। 'মাবসূত' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হজের স্থানগুলোর জন্য কোনো দোয়া নির্ধারণ করেননি। কেননা, দোয়ার নির্ধারণ হৃদয়ের বিগলিত ভাব দূরীভূত করে দেয়। তবে কেউ যদি হাদীসে বর্ণিত দোয়া বরকত লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করে, তবে তা উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ الخ : আমাদের আহনাফের মতে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া সুন্নত যদিও অন্যান্য দোয়া ও জিকির চুপিসারে পড়া মোস্তাহাব। এর কারণ হলো, কুরআন মাজীদে এসেছে– اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সাথে ও চুপিসারে ডাকো।' এ আয়াতের দাবি হলো, দোয়া ও জিকির আস্তে ও চুপিসারে পড়া। কিন্তু যেখানে 'ইলান' বা মানুষের আহ্বান করা উদ্দেশ্য সেখানে আস্তে পড়া মোস্তাহাব হবে না; বরং উচ্চৈঃস্বরে পড়াই মোস্তাহাব বলে বিবেচিত হবে। যেমন– আজান ও খুতবার ক্ষেত্রে 'ইলান' উদ্দেশ্য। তালবিয়াও মূলত এজন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। তাই উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া মোস্তাহাব ও সুন্নত।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ 'উত্তম হজ হলো আজ্জ ও ছাজ্জ।' عَجٌّ বলা হয়– উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া, আর ثَجٌّ বলা হয়– রক্ত প্রবাহিত করা। অর্থাৎ উত্তম হজ হলো তাই যেখানে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া হয় ও কুরবানির পশু জবাই করা হয়।

قَوْلُهُ قَالَ فَاِذَا دَخَلَ الخ : মুহরিম মক্কায় প্রবেশ করে প্রথমে মসজিদুল হারামে যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তখন সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামে গিয়েছিলেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে–

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ .

'মক্কা শরীফে আগমনের সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রথম কাজ ছিল তিনি অজু করত বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেছিলেন।' দ্বিতীয় দলিল হলো, হজের সফরে উদ্দেশ্যই হলো বায়তুল্লাহ শরীফ জেয়ারত করা। আর বায়তুল্লাহ শরীফ মসজিদুল হারামের অন্তর্গত। এজন্যই প্রথমে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।

মসজিদুল হারামের 'বাবুস্ সালাম' গেট দিয়ে প্রবেশ করা মোস্তাহাব। কেননা, মদীনার সর্দার রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ গেট দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। আর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ جِئْتُ لِأُؤَدِّيَ فَرْضَكَ وَأَطْلُبَ رَحْمَتَكَ وَأَلْتَمِسُ رِضَاكَ مُتَّبِعًا لِأَمْرِكَ رَاضِيًا بِقَضَائِكَ أَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ الْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ أَنْ تَسْتَقْبِلَنِيَ الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَتَحْفَظَنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَتَتَجَاوَزَ عَنِّيْ بِمَغْفِرَتِكَ وَتُعِيْنَنِيْ عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِكَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِيْ فِيْهَا وَأَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, আর আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার ফরজ পালন করতে এসেছি। তোমার রহমতের প্রত্যাশী আমি। তোমার আদর্শকে মেনে নিয়ে তোমার সন্তুষ্টি কামনা করছি। তোমার ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট। তোমার শাস্তিকে ভয় করে ভীত-প্রকম্পিত ভিখারির ন্যায় আবেদন করছি– আজ তুমি আমার সাথে তোমার ক্ষমার বিনিময় করো, তোমার রহমত দিয়ে আমাকে হেফাজত করো, তোমার মাগফিরাত দিয়ে আমাকে ক্ষমা করে দাও আর তোমার ফরজ পালনে আমাকে সাহায্য করো। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দাও এবং আমাকে তথায় প্রবেশ করিয়ে দাও আর বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাকে রক্ষা করো।'

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মুহরিমের জন্য মক্কা শরীফে রাত্রেও প্রবেশ করা জায়েজ এবং দিনেও। কেননা, মক্কা শরীফে প্রবেশ করা একটি শহরে প্রবেশের নামান্তর। আর শহরে প্রবেশ করা দিন কিংবা রাত্রের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এজন্য মক্কা শরীফে প্রবেশের ক্ষেত্রে দিন কিংবা রাত নির্ধারিত নেই।

আর বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) রাত্রে মক্কায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধ সুন্নতের কারণে নয়; বরং চোর থেকে সতর্ক হওয়ার জন্য তিনি হাজীদের মক্কায় রাতের বেলায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

قَوْلُهُ وَإِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ الخ - মাসআলা : বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে আল্লাহু আকবার বলবে এবং হৃদয়ে এ পবিত্র ভূমির মহত্ত্ব উপস্থিত করবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে আল্লাহর একত্ববাদকে নবায়ন করবে এবং এ সময় যা খুশি দোয়া করবে। কেননা, [হাদীসে আছে] বায়তুল্লাহ শরীফ দেখার সময় দোয়া কবুল হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) সা'দ ইবনে যুবায়ের থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে নিম্নোক্ত দোয়াটি বর্ণনা করেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَبِرًّا .

হযরত 'আতা' (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতেন তখন এ দোয়া পাঠ করেছিলেন– أَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ যাহোক বায়তুল্লাহ শরীফ দেখে আল্লাহু আকবার বলা ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার ক্ষেত্রে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর আমল হলো দলিল। তিনি বায়তুল্লাহ শরীফ জেয়ারতকালে "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" বলতেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) হজের স্থানসমূহের জন্য কোনো দোয়া নির্ধারণ করেননি। কেননা, দোয়া নির্ধারণ হৃদয়ের বিগলিত ভাব দূর করে দেয়। অথচ দোয়ার ক্ষেত্রে হৃদয়ের বিগলিত ভাব জরুরি। তবে কেউ যদি হাদীসে বর্ণিত দোয়া বরকত লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করে, তবে তা জায়েজ বরং উত্তম। হাদীসে বর্ণিত দোয়াগুলো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالَ ثُمَّ ابْتَدَأَ بِالْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَابْتَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ قَالَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُرْفَعُ الْاَيْدِىْ اِلَّا فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا اِسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَاسْتَلَمَهُ اِنِ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُؤْذِىَ مُسْلِمًا لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَبَّلَ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ وَ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لِعُمَرَ (رض) اِنَّكَ رَجُلٌ اَيِّدٌ تُؤْذِى الضَّعِيْفَ فَلَا تُزَاحِمِ النَّاسَ عَلَى الْحَجَرِ وَلٰكِنْ اِنْ وَجَدْتَّ فُرْجَةً فَاسْتَلِمْهُ وَاِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ وَلِاَنَّ الْاِسْتِلَامَ سُنَّةٌ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ اَذَى الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর হাজারে আসওয়াদ থেকে [তওয়াফ] শুরু করবে। অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে হাজারে আসওয়াদ থেকে আমল [তওয়াফ] শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়েছিলেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উভয় হাত উপরে উঠাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাত স্থান ছাড়া হাত উত্তোলন করবে না। আর সেগুলোর মধ্যে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার কথাও উল্লেখ করেছেন। কোনো মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবে। কেননা বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় স্থাপন করে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেছিলেন এবং হযরত ওমর (রা.)-কে বলেছিলেন, তুমি শক্তিশালী মানুষ, দুর্বলকে কষ্ট দেবে সুতরাং তুমি হাজারে আসওয়াদের সামনে মানুষের প্রতি চাপ সৃষ্টি করো না। তবে কখনো ফাঁক পেয়ে গেলে তা স্পর্শ করে নিও, অন্যথায় তার মুখোমুখি হয়ে 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়ে নিও। তা ছাড়া হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা হলো সুন্নত। আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, মসজিদুল হারামে প্রবেশকারীর প্রথম কাজ হলো তওয়াফ করা। চাই সে মুহ্‌রিম হোক বা গায়রে মুহ্‌রিম হোক। হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করবে। কেননা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করেছেন এবং হাজারে আসওয়াদ -এর দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লালাহু বলেছেন।

শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, তওয়াফের শুরুতে তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا تُرْفَعُ الْاَيْدِىْ اِلَّا فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ 'সাত স্থান ব্যতীত হাত উত্তোলন করবে না।' অর্থাৎ শুধু সাত স্থানে হাত উত্তোলন করবে। তন্মধ্যে একটি হলো হাজারে আসওয়াদ স্পর্শের সময়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবে। اِسْتِلَامٌ শব্দটি سَلِمَةٌ থেকে গৃহীত। অর্থ-পাথর, কিন্তু اِسْتِلَامٌ-এর অর্থ হলো, পাথরকে হাতে নেবে কিংবা চুম্বন করবে বা হাতের তালু দ্বারা স্পর্শ করবে।

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার পদ্ধতি হলো, যদি তা ওষ্ঠ দিয়ে চুম্বন সম্ভব না হয়, তাহলে তার উপর হাত রেখে হাতে চুম্বন করবে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদের উপর ওষ্ঠদ্বয় রেখে চুম্বন করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফতের সময় হাজারে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে বলেছিলেন– আমি জানি, তুমি নিছক একটি পাথর। তোমার উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না।

হযরত আলী (রা.) -এর নিকট এ কথা পৌঁছলে তিনি বললেন, পাথর উপকারী। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কি উপকার রয়েছে? উত্তরে হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন আল্লাহ তা'আলা أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى -এর দ্বারা সমস্ত আদম সন্তান থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তখন এ অঙ্গীকার ঐ পাথরের নিকট গচ্ছিত রাখেন। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি ঐ পাথরে চুম্বন করে তখন সে যেন তার অঙ্গীকারনামা নবায়ন করে নিল। আর পাথরও কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দেবে।–[ইনায়া]

যাহোক, কোনো মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে যদি সম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদে তার পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় রেখে চুম্বন করেছেন এবং হযরত ওমর (রা.)-কে বলেছিলেন, তুমি শক্তিশালী পুরুষ, দুর্বলকে কষ্ট দেবে। সুতরাং তুমি হাজারে আসওয়াদের সামনে মানুষের প্রতি চাপ সৃষ্টি করো না। তবে ফাঁক পেলে মুখ কিংবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিও।

দ্বিতীয় দলিল হলো– হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা সুন্নত। আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। সুন্নত পালন করতে গিয়ে ওয়াজিব পরিত্যাগ করার অনুমতি নেই। এজন্যই যদি কোনো মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে স্পর্শ করা সম্ভব হয়, তাহলে করবে অন্যথায় তার মুখোমুখি হয়ে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে।

قَالَ وَاِنْ اَمْكَنَهُ اَنْ يَمَسَّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ فِيْ يَدِهٖ كَالْعُرْجُوْنِ وَغَيْرِهٖ ثُمَّ قَبَّلَ ذٰلِكَ فَعَلَهُ لِمَا رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَاسْتَلَمَ الْاَرْكَانَ بِمِحْجَنِهٖ وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ اِسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهٖ مِمَّا يَلِي الْبَابَ وَقَدِ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِمَا رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ اَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهٖ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَطَافَ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَالْاِضْطِبَاعُ اَنْ يَجْعَلَ رِدَاءَهُ تَحْتَ اِبِطِهِ الْاَيْمَنِ وَيُلْقِيْهِ عَلٰى كَتِفِهِ الْاَيْسَرِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَقَدْ نُقِلَ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি হাতের কোনো জিনিস যেমন– খেজুরের ডাল কিংবা অন্যকিছু দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব হয় অতঃপর সেটাকে চুম্বন করে, তাহলে তা-ই করে নেবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারিতে আরোহণ করা অবস্থায় বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেছিলেন এবং হাতের লাঠি দ্বারা রুকনসমূহ [হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী] স্পর্শ করেছিলেন। আর যদি তার কিছুই করা সম্ভব না হয়, তাহলে শুধু হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি দাঁড়াবে, আল্লাহু আকবার ও লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করবে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর বায়তুল্লাহর দরজা সংলগ্ন দিকটি নিজের ডান দিকে রাখবে এবং চাদরকে اِضْطِبَاعٌ- করবে। অতঃপর বায়তুল্লাহ সাত চক্কর তওয়াফ করবে। কেননা বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন এবং দরজার সংলগ্ন দিকটি নিজের ডান পার্শ্বে রেখেছেন অতঃপর সাতবার বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেছেন। আর اضطباع-এর অর্থ– চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলা। আর এটা হলো সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ আমল বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ اَمْكَنَهُ اَنْ يَمَسَّ الخ : مِحْجَنٌ শব্দটি হাদীসে 'মীম' যেরযোগে ও 'জিম' যবরযোগে এসেছে। অর্থ– বাঁকা মাথাবিশিষ্ট লাঠি। যেমন বর্তমানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হাতে লাঠি রাখেন। যাহোক, যদি চুম্বন করে কিংবা হাত দিয়ে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে পারতপক্ষে হাতের লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করত সেই লাঠিতে চুম্বন করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ তওয়াফকালে নিজের হাতের লাঠি দ্বারা রুকনসমূহ তথা হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করেছিলেন। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهٖ الخ মাসআলা : হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করা যেরূপ ওয়াজিব, তেমনি ডান দিক থেকে তওয়াফ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ বায়তুল্লাহর দরজার সংলগ্ন ডান দিক হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বাম দিক থেকে তওয়াফ শুরু করে সাত চক্কর দেয়, তাহলে তাকে 'উল্টো তওয়াফ' (طَوَافٌ مَنْكُوْسٌ) বলে। আমাদের নিকট এ ধরনের তওয়াফের বিধান হলো, যতক্ষণ হাজী মক্কায় অবস্থান করবে– সে সময়ে পুনরায় [বিধিসম্মত ডান দিক থেকে শুরু করে] তওয়াফ করবে। কিন্তু পুনরায় তওয়াফ করার আগেই যদি সে বাড়ি ফিরে আসে, তাহলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। মোটকথা, ডানপার্শ্বে হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করবে এবং এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এভাবেই তওয়াফ করেছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, اِضْطِبَاعٌ শব্দটি ضَبْعٌ [বাহু] থেকে নেওয়া হয়েছে। এর পদ্ধতি হলো, নিজের চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলবে। তিনি বলেন, এ সাধুবেশ সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ আমল বর্ণিত আছে।

قَالَ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيْمِ وَهُوَ اِسْمٌ لِمَوْضَعٍ فِيْهِ الْمِيْزَابُ يُسَمّٰى بِهِ لِاَنَّهُ حُطِمَ مِنَ الْبَيْتِ اَىْ كُسِرَ وَسُمِّىَ حِجْرًا لِاَنَّهُ حُجِرَ مِنْهُ اَىْ مُنِعَ وَهُوَ مِنَ الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ فَاِنَّ الْحَطِيْمَ مِنَ الْبَيْتِ فَلِهٰذَا يَجْعَلُ الطَّوَافَ مِنْ وَرَائِهِ حَتّٰى لَوْ دَخَلَ الْفُرْجَةَ الَّتِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ لَا يَجُوْزُ اِلَّا اَنَّهُ اِذَا اسْتَقْبَلَ الْحَطِيْمَ وَحْدَهُ لَا يُجْزِيْهِ الصَّلٰوةُ لِاَنَّ فَرْضِيَّةَ التَّوَجُّهِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا يَتَاَدّٰى بِمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اِحْتِيَاطًا وَالْاِحْتِيَاطُ فِى الطَّوَافِ اَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাতীমের বাইরে দিয়ে তওয়াফ করবে। হাতীম হলো ঐ স্থান যেখানে 'মীযাবে রহমত' রয়েছে। [হাতীম অর্থ–ভাঙ্গা অংশ] এ অংশটাকে হাতীম বলার কারণ, তাকে বায়তুল্লাহ থেকে ভেঙ্গে আলাদা করে রাখা হয়েছে। আবার এ অংশটাকে 'হিজর'-ও বলা হয়। কেননা, এ অংশটাকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্তি হতে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। বস্তুত তা বায়তুল্লাহর অংশ। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– فَاِنَّ الْحَطِيْمَ مِنَ الْبَيْتِ [হাতীম বায়তুল্লাহর অংশবিশেষ]। এজন্য হাতীমের বাইরে দিয়ে তওয়াফ করবে। এমনকি কেউ যদি হাতীম ও বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী ফাঁকে প্রবেশ করে তওয়াফ করে, তাহলে জায়েজ হবে না। অবশ্য মুসল্লি যদি হাতীমকে কেবলা বানিয়ে নামাজ আদায় করে, তাহলে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। কেননা, নামাজে কা'বা অভিমুখী হওয়া যে ফরজ তা কুরআনের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং সতর্কতার প্রেক্ষিতে যা শুধু খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত, তাতে ফরজ আদায় হবে না। আর তওয়াফের ক্ষেত্রে সতর্কতা হলো হাতীমের বাইরে দিয়ে তওয়াফ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَطِيْم ঐ স্থানের নাম যেখানে 'মীযাবে রহমত' অবস্থিত। হাতীম অর্থ– ভাঙ্গা অংশ। এ অংশকে হাতীম বলার কারণ হলো, বায়তুল্লাহ শরীফ পুনঃনির্মাণের সময় মক্কার মুশরিকরা অর্থের স্বল্পতার কারণে এ অংশটিকে ভেঙ্গে ফেলে ও পুনঃনির্মাণ থেকে বাদ দেয়। হাতীমকে হিজর [حِجْر -'হা' যেরযুক্ত]ও বলা হয়। অর্থ– বাধা দেওয়া। তথা এ অংশটিকে বাইতুল্লাহর পুনঃনির্মাণের সময় বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্তি হতে বাদ দেওয়া হয়েছে [বাদ দেওয়াটি মূলত বাধা দেওয়ারই নামান্তর]। উল্লিখিত হাতীম বায়তুল্লাহর একটি অংশ। এজন্য বায়তুল্লাহর যে হুকুম হাতীমে কা'বারও সেই একই হুকুম। হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়।

عِنَايَةٌ [ইনায়া] গ্রন্থকার যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তার অনুবাদ হলো হযরত আয়েশা (রা.) মানত করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয় করলে বায়তুল্লাহ শরীফে দু রাকাত নামাজ আদায় করবেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাত ধরে তাঁকে হাতীমে কা'বায় প্রবেশ করালেন এবং নির্দেশ দিলেন– صَلِّ هٰهُنَا فَاِنَّ الْحَطِيْمَ مِنَ الْبَيْتِ 'এখানে নামাজ পড়ো। কেননা, হাতীম বায়তুল্লাহর অংশ।' কিন্তু তোমার সম্প্রদায়ের [কুরাইশের] অর্থাভাবের ফলে তারা এ অংশটিকে বায়তুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। দেখো আয়েশা ! যদি তোমার কওমের সময়টা এত নিকটবর্তী না হতো, তাহলে আমি বায়তুল্লাহকে ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর নির্মাণের ভিত্তিতে পুনঃনির্মাণ করতাম এবং হাতীমকে কা'বার

অন্তর্ভুক্ত করতাম। চৌকাঠকে জমিনের সাথে মিশিয়ে দিতাম আর পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে একটি করে দরজা নির্মাণ করতাম। আগামী বছর বেঁচে থাকলে এ কাজগুলো অবশ্যই করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পরের বছর বেঁচে ছিলেন না।

খোলাফায়ে রাশেদীন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের কারণে এ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর শাসনামলে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস মোতাবেক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাশিত কাজ দুটি তিনি সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর নির্মাণের ভিত্তিতে বায়তুল্লাহ শরীফ পুনঃনির্মাণ করেন এবং হাতীমকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর শাহাদাতের পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছাকাফী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর নির্মিত কা'বাকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং কুরাইশদের ছকে কা'বাকে নির্মাণ করেন। তবে পরবর্তীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি অবগত হয়ে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন। আব্বাসীয় খেলাফতকালে বাদশাহ হারুনুর রশীদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মাণের ভিত্তিতে পুনরায় কা'বা নির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ইমাম মালিক (র.) ও অন্যান্য বুজুর্গানে দীন তাঁকে এই বলে বারণ করলেন যে, এভাবে চলতে থাকলে পরবর্তীতে মানুষ কা'বাকে খেলনার বিষয়ে পরিণত করবে। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক নির্মাণ করার চেষ্টা করবে।

যাহোক মাসআলা হলো, হাতীমের বাইরে দিয়ে তওয়াফ করবে, হাতীমের ভিতরে প্রবেশ করবে না। এমনকি কেউ যদি হাতীম ও বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী ফাঁকে প্রবেশ করে তওয়াফ করে, তাহলে জায়েজ হবে না। দলিল হলো, হাতীম বায়তুল্লাহর অংশ। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– إِنَّ الْحَطِيْمَ مِنَ الْبَيْتِ থেকে তা প্রতিভাত হয়। আর কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে বায়তুল্লাহর প্রদক্ষিণ; বায়তুল্লাহর মধ্যে তওয়াফ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ 'আর তারা যেন প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে।' লক্ষণীয় যে, আয়াতে প্রাচীন গৃহের তওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।' প্রাচীন গৃহের মধ্যে তওয়াফের নির্দেশ নয়। আর প্রাচীন গৃহ দ্বারা সম্পূর্ণ বায়তুল্লাহ উদ্দেশ্য। এ কারণেই পুরা বায়তুল্লাহ তওয়াফ করা জরুরি। আর বায়তুল্লাহর মধ্যে হাতীমের অংশও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাতীমকেও তওয়াফের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

إِلَّا أَنَّهُ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْحَطِيْمَ وَحْدَهُ الخ দ্বারা গ্রন্থকার একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি হাতীম কা'বার অংশ হয়, তাহলে শুধু হাতীমের দিকে মুখ করে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার কথা। অথচ শুধু হাতীমের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই।

উত্তর হলো– নামাজে বায়তুল্লাহমুখী হওয়া যে ফরজ তা কিতাবুল্লাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ [আর তোমরা তোমাদের মুখকে কা'বার দিকে ফিরাও]। আর হাতীম বায়তুল্লাহর অংশ সাব্যস্ত হয়েছে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা। সতর্কতার দাবি হলো, যা অকাট্য নস দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা, যা শুধু খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত এমন বিষয়ের উপর আমল করার দ্বারা আদায় হবে না। আর তওয়াফের ক্ষেত্রে সতর্কতাবশত হাতীমকে তওয়াফের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

قَالَ وَيَرْمُلُ فِى الثَّلٰثِ الْاَوَّلِ مِنَ الْاَشْوَاطِ وَالرَّمْلُ اَنْ يَهُزَّ فِىْ مَشْيَتِهِ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَ ذٰلِكَ مَعَ الْاِضْطِبَاعِ وَكَانَ سَبَبُهٗ اِظْهَارَ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حِيْنَ قَالُوْا اَضْنَاهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ثُمَّ بَقِىَ الْحُكْمُ بَعْدَ زَوَالِ السَّبَبِ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَعْدَهٗ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। রমল অর্থ–হাঁটার সময় কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে চলা, যুদ্ধমুখী দুই সারির মাঝখানে দম্ভকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো। চাদর ডান বগলের নীচে বাম কাঁধের উপর ফেলে তা সম্পন্ন করবে। রমলের কারণ ছিল– মুশরিকদের সামনে বীরত্ব প্রকাশ করা। কেননা, মুশরিকরা বলাবলি করেছিল– মদীনার জ্বর মুসলমানদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। অতঃপর কারণ দূরীভূত হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে ও পরবর্তীতেও [এই রমলের] বিধান বহাল থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رَمَلٌ অর্থ–বুক ফুলিয়ে দুই বাহু ঝাঁকি দিয়ে মুজাহিদের মতো চলা। রমলের কারণ হলো হুদায়বিয়ার বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'উমরা' করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কায় প্রবেশ করে উমরা পালন করতে ও বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করতে বারণ করে। এভাবে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, এ বছর উমরা না করে তিনি মদিনায় ফিরে যাবেন। আগামী বছর যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করত উমরা পালন করবেন। আর তিনি তিনদিন মক্কায় থাকতে পারবেন। পরের বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় তাশরীফ আনলে মক্কাবাসী তিনদিনের জন্য বায়তুল্লাহ খালি করে পাহাড়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সাথে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করলেন।

এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় মুশরিককে বলতে শুনলেন, মদীনার তাপ মুসলমানদেরকে কাহিল করে ফেলেছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় বাহুদ্বয় ঝাঁকি দিয়ে রমল করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে 'রমল' করতে নির্দেশ দিলেন, যাতে মুশরিকরা স্বচক্ষে মুসলমানদের বাহাদুরি দেখতে পায়। এই কারণ যদিও দূরীভূত হয়েছে, কিন্তু বিধান রয়ে গেছে। কেননা, হযরত জাবির (রা.) ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জে কুরবানির দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন। অথচ সে বছর মক্কায় মুশরিকদের কেউ অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং কারণ দূরীভূত হওয়ার পর যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ রমল করেছেন, তখন সুন্নতের অনুসরণার্থে আমরা তা পালনের আরো বেশি দাবিদার।

قَالَ وَيَمْشِىْ فِى الْبَاقِىْ عَلٰى هَيْئَتِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ اِتَّفَقَ رُوَاةُ نُسُكِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّمَلُ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ هُوَ الْمَنْقُوْلُ مِنْ رَمَلِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فِى الرَّمَلِ قَامَ فَاِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ لِاَنَّهٗ لَا بَدَلَ لَهٗ فَيَقِفُ حَتّٰى يُقِيْمَهٗ عَلٰى وَجْهِ السُّنَّةِ بِخِلَافِ الْاِسْتِلَامِ لِاَنَّ الْاِسْتِقْبَالَ بَدَلٌ لَهٗ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অবশিষ্ট চক্করগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হজের বিবরণ বর্ণনাকারী সবাই এ বিষয়ে একমত। আর রমল অব্যাহত থাকবে হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রমল সম্পর্কে এরূপই বর্ণিত আছে। রমলের সময় যদি ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার যখন ফাঁক পাবে, তখন রমল করবে। কেননা, রমলের স্থলবর্তী কিছু নেই। তাই সে থেমে যাবে যেন সুন্নত মোতাবেক তা আদায় করতে পারে। হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, মুখোমুখি হওয়াই তার স্থলবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَمْشِىْ فِى الْبَاقِىْ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, অবশিষ্ট চার চক্করে রমল করবে না; বরং ধীর ও স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যেসব সাহাবী হজের বিবরণ প্রদান করেছেন তারা সকলেই একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন। আর বাকি চক্করগুলোতে রমল করেননি। আর রমলের ক্ষেত্রে চক্কর হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু হয়ে হাজরে আসওয়াদে এসে শেষ হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রমল সম্পর্কে এরূপই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهٗ فَاِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ الخ : পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, প্রথম তিন চক্করে রমল করা ওয়াজিব। যদি ভিড়ের কারণে কারো পক্ষে রমল করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে দাঁড়িয়ে যাবে– রমল ছাড়া তওয়াফ করবে না। যখন ফাঁক পাবে ও রমল করতে পারবে বলে মনে হবে, তখন রমল করবে। দলিল এই যে, রমলের বিকল্প কিছুই নেই। এজন্য প্রথম তিন চক্করে ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভব না হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, যাতে সুন্নত মোতাবেক রমল আদায় করতে পারে। পক্ষান্তরে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার বিষয়টি ভিন্ন। যদি হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা সহজসাধ্য না হয় তাহলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে না; বরং হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে সামনে অগ্রসর হবে। কেননা, হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি হওয়া হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করারই স্থলবর্তী।

قَالَ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ أَشْوَاطَ الطَّوَافِ كَرَكَعَاتِ الصَّلٰوةِ فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِالتَّكْبِيْرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِسْتِلَامَ إِسْتَقْبَلَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَهُوَ حَسَنٌ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّهُ سُنَّةٌ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَلِمُ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْإِسْتِلَامِ يَعْنِيْ إِسْتِلَامَ الْحَجَرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখনই হাজারে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যাবে, সম্ভব হলে তা স্পর্শ করবে। কেননা, তওয়াফের চক্করগুলো নামাজের রাকাতের মতো। সুতরাং প্রত্যেক রাকাত যেমন তাকবীর দিয়ে শুরু করা হয়, তেমনি প্রতিটি চক্কর হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে শুরু করবে। আর যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আর রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করবে। জাহিরে রেওয়ায়েত মতে তা মোস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি বর্ণনায় এটি সুন্নত। এ দুটি ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুটি রুকন স্পর্শ করতেন; অন্য কোনো রোকন স্পর্শ করতেন না। আর তাওয়াফ শেষ করবে চুম্বনের মাধ্যমে অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, তওয়াফকারী হাজারে আসওয়াদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে সম্ভব হলে স্পর্শ তথা চুম্বন করবে। কেননা, তওয়াফের চক্করগুলো নামাজের রাকাতের মতো। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ [নিশ্চয়ই বায়তুল্লাহর তওয়াফ সালাতের ন্যায়।] সুতরাং নামাজের প্রত্যেক রাকাত যেমন তাকবীর দিয়ে শুরু করা হয়, তেমনি প্রতিটি চক্করে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে শুরু করবে। এর সমর্থনে বুখারী শরীফে হাদীস এসেছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتٰى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيْ يَدِهٖ .

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আরোহীর উপর তওয়াফকালে যখনই হাজারে আসওয়াদের নিকটবর্তী হতেন তখনই স্বীয় হস্ত মোবারকে যা থাকত তা দিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করতেন।'

যদি হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেদিকে মুখ করে তাকবীর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, তওয়াফকারী রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করবে। জাহিরে রেওয়ায়েত মতে রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা মোস্তাহাব। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর একটি বর্ণনায় তা সুন্নত। হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত রুকনে শামী ও রুকনে ইরাকী স্পর্শ করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করতেন। এছাড়া রুকনে শামী ও রুকনে ইরাকী স্পর্শ করতেন না। শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের মাধ্যমে তওয়াফ শেষ করবে; রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে নয়।

قَالَ ثُمَّ يَأْتِيْ الْمَقَامَ فَيُصَلِّيْ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ اَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) سُنَّةٌ لِانْعِدَامِ دَلِيْلِ الْوُجُوْبِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ اُسْبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ وَالْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর মাকামে [ইবরাহীমে] এসে দু রাকাত নামাজ আদায় করবে কিংবা মসজিদের যে স্থানে সহজে সম্ভব হয় সেখানে পড়বে। আমাদের মতে এ নামাজ ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা সুন্নত। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার কোনো দলিল নেই। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস- وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ اُسْبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ 'তওয়াফকারী যেন প্রতি সাত চক্করের পরে দু রাকাত নামাজ আদায় করে।' আর 'আমর' ওয়াজিব-এর জন্য প্রযোজ্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাকামে ইবরাহীম দ্বারা ঐ পাথরকে বুঝানো হয়, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন। পাথরের উপর দাঁড়ানোর কারণে তাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পায়ের চিহ্ন পড়েছিল।

মাসআলা হলো, তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে কিংবা মসজিদে হারামের যে স্থানে সহজে সম্ভব হয় দু রাকাত নামাজ পড়বে। আমাদের মতে এ নামাজ ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, এ নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কোনো ধরনের দলিল নেই। অতএব তা ওয়াজিব বলে পরিগণিত হবে না। আর আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ اُسْبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ 'তওয়াফকারী যেন প্রতি সাত চক্করের পর দু রাকাত সালাত আদায় করে।' এ হাদীসে وَلْيُصَلِّ হলো اَمْر তথা নির্দেশজ্ঞাপক শব্দ যা ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়। আরেক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফ শেষে যখন মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছলেন তখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন- وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى অতঃপর দু রাকাত নামাজ পড়লেন। এ আয়াতেও اِتَّخِذُوْا নির্দেশজ্ঞাপক শব্দ এসেছে, যা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হয়- রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গ্রাম্য সাহাবীকে পাঁচ নামাজের শিক্ষা দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন- هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ এ ছাড়া কি আমার উপর [অন্য কোনো নামাজ] ওয়াজিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন- لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ না, তবে নফল আদায় করতে পার।'

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ ওয়াজিব কিংবা ফরজ নেই। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, গ্রাম্য সাহাবী সংক্রান্ত হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ পরিত্যক্ত। কেননা, জানাজা ও দু ঈদের নামাজ সর্বসম্মতিতে ওয়াজিব। অথচ এ হাদীসে এসব নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয় উত্তর হলো, গ্রাম্য সাহাবী সংক্রান্ত হাদীসটি যতদূর সম্ভব এ হাদীসের পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ لِأَنَّ الطَّوَافَ كَمَا كَانَ يَفْتَتِحُ بِالْإِسْتِلَامِ فَكَذَا السَّعْيُ يَفْتَتِحُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ سَعْيٌ قَالَ وَهٰذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ وَيُسَمَّى طَوَافَ التَّحِيَّةِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) إِنَّهُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَتَى الْبَيْتَ فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ وَلَنَا أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى أَمَرَ بِالطَّوَافِ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَقَدْ تَعَيَّنَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِيْمَا رَوَاهُ سَمَّاهُ تَحِيَّةً وَهُوَ دَلِيْلُ الْإِسْتِحْبَابِ وَلَيْسَ عَلٰى أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِانْعِدَامِ الْقُدُوْمِ فِيْ حَقِّهِمْ.

অনুবাদ : অতঃপর হাজারে আসওয়াদের নিকট এসে আবার চুম্বন করবে। কেননা বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু রাকাত নামাজ পড়ার পর হাজারে আসওয়াদের নিকট ফিরে এসেছিলেন। আর মূলনীতি হলো– যে সকল তওয়াফের পর 'সা'ঈ' রয়েছে, সে ক্ষেত্রে হাজারে আসওয়াদের নিকট ফিরে আসবে। কেননা, তওয়াফ যেমন হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দ্বারা শুরু করা হয়, তদ্রূপ সা'ঈও তা দ্বারা শুরু করা হয়। পক্ষান্তরে যে তওয়াফের পর সা'ঈ নেই সে ক্ষেত্রে হাজারে আসওয়াদের নিকট ফিরে আসতে হবে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ তওয়াফের নাম তওয়াফে কুদূম। এটাকে তায়াফুত তাহিয়্যাও বলে। এটা সুন্নত; ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, তা ওয়াজিব। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنْ أَتَى الْبَيْتَ فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হবে, সে যেন তওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্‌কে সম্মান প্রদর্শন করে।' আমাদের দলিল, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তওয়াফের আদেশ করেছেন। আর নিঃশর্ত আদেশ পুনরাবৃত্তি দাবি করে না। এদিকে 'ইজমা'-এর মাধ্যমে তওয়াফে জিয়ারত নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর ইমাম মালিক (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেখানে তওয়াফকে তওয়াফে তাহিয়্যা বলা হয়েছে। আর তা মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণ করে। আর মক্কাবাসীদের জন্য তওয়াফে কুদূম নেই। কেননা, তাদের ক্ষেত্রে তো আগমন পাওয়া যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ الخ : তওয়াফ এবং তওয়াফের নামাজের পর কেউ সা'ঈ করতে চাইলে হাজারে আসওয়াদের নিকট ফিরে এসে চুম্বন করবে। কেননা, হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীসে এসেছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফের দু রাকাত নামাজ আদায় করলেন তখন হাজারে আসওয়াদের নিকট ফিরে এসে চুম্বন করলেন। এ ক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থকার এই মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, যে তওয়াফের পর সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে সা'ঈ রয়েছে সে ক্ষেত্রে তওয়াফ ও তওয়াফের নামাজের পর হাজারে আসওয়াদের নিকট ফিরে আসবে এবং চুম্বন করবে। আর যে তওয়াফের পরে সা'ঈ নেই, সে ক্ষেত্রে হাজারে আসওয়াদের নিকট ফিরে আসার প্রয়োজন নেই।

দলিল হলো : তওয়াফ যেমন হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দ্বারা শুরু করা হয়, তেমনি সা'ঈও হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দ্বারা শুরু করা হয়।

قَوْلُهُ قَالَ وَهٰذَا الطَّوَافُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, মক্কা শরীফে প্রবেশ করে প্রথমত যে তওয়াফ করা হয় তাকে তওয়াফে কুদূম বলে। এর অপর নাম তওয়াফে তাহিয়্যা, তাওয়াফে লিক্বা ও তওয়াফু আউয়ালি আহ্‌দ। আমাদের নিকট মক্কার বহিরাগতদের জন্য এ তওয়াফ সুন্নত; ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক (র.) -এর নিকট তা ওয়াজিব। তাঁর দলিল হলো এই হাদীস– مَنْ اَتَى الْبَيْتَ فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ উপস্থিত হবে, সে যেন তওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্‌কে সম্মান প্রদর্শন করে।' এ হাদীসে তওয়াফের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি 'নির্দেশবাচক'– শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে, যা ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়। আর আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলা– وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ এ আয়াতে শুধুমাত্র তওয়াফের আদেশ করেছেন। আর নিঃশর্ত আদেশ পুনরাবৃত্তি দাবি করে না। তবে 'তওয়াফে জিয়ারত' যে ফরজ তা 'ইজমা' -এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং 'তওয়াফে জিয়ারত' ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি যখন নির্ধারিত হয়ে গেল, তখন অন্য কোনো তওয়াফ ওয়াজিব হবে না, অন্যথায় ওয়াজিবের পুনরাবৃত্তি আবশ্যক হয়ে যায়।

ইমাম মালিক (র.)-এর উপস্থাপিত হাদীসের উত্তরে বলা হয়, বর্ণিত হাদীসে তওয়াফকে তওয়াফে 'তাহিয়্যা' বলা হয়েছে। আর তা মোস্তাহাব হওয়াকে প্রমাণ করে। কেননা, অভিধানে তাহিয়্যা বলা হয় নিঃস্বার্থভাবে সম্মান প্রদর্শন করাকে। সুতরাং 'তাহিয়্যা' শব্দের দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না।

জ্ঞাতব্য যে, মক্কাবাসীদের জন্য তওয়াফে কুদূম সুন্নত নয়। কেননা, এ তওয়াফ বহিরাগতদের জন্য আগমনের ফলে সুন্নত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর মক্কাবাসীদের ক্ষেত্রে আগমন পাওয়া যায় না। সুতরাং তাদের জন্য এ তওয়াফ প্রযোজ্য নয়।

قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَدْعُو اللّٰهَ لِحَاجَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَعِدَ الصَّفَا حَتّٰى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو اللّٰهَ وَلِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلٰوةَ يُقَدَّمَانِ عَلَى الدُّعَاءِ تَقْرِيبًا إِلَى الْإِجَابَةِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَالرَّفْعُ سُنَّةُ الدُّعَاءِ وَإِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيْرُ الْبَيْتُ بِمَرْأَى مِنْهُ لِأَنَّ الْاِسْتِقْبَالَ هُوَ الْمَقْصُوْدُ بِالصُّعُوْدِ وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ وَإِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُوْمٍ وَهُوَ الَّذِيْ يُسَمّٰى بَابَ الصَّفَا لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ الْأَبْوَابِ إِلَى الصَّفَا لَا أَنَّهُ سُنَّةٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করবে ও তাতে আরোহণ করবে। আর বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করবে এবং আল্লাহু আকবার বলবে, লা-ইলা ইল্লাল্লাহ বলবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পড়বে এবং উভয় হাত উপরে উঠাবে ও স্বীয় প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন, এমনকি যখন বায়তুল্লাহ শরীফ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, তখন বায়তুল্লাহ্মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। এ ছাড়াও ছানা ও দরুদকে দোয়ার উপর অগ্রবর্তী করা হয় যাতে কবুলিয়্যাতের নিকটবর্তী হয়, যেমন অন্যান্য দোয়ার ক্ষেত্রে। আর হাত তোলা হলো দোয়ার সুন্নত। বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়া পরিমাণ পাহাড়ের উপরে আরোহণ করবে। কেননা, বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করাই আরোহণের উদ্দেশ্য। আর যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাবে বনী মাখযূম তথা বাবে সাফা দিয়ে শুধু এজন্য বের হয়েছিলেন যে, সেটা সাফার দিকে যাওয়ার নিকটতম দরজা ছিল। এজন্য নয় যে, তা সুন্নত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : তওয়াফে কুদূম শেষে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার জন্য বের হবে। প্রথমত সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করবে এবং আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর দরুদ পড়বে এবং হাত উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করবে। কেননা, মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু এরূপ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন। এমনকি যখন বায়তুল্লাহ শরীফ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, তখন বায়তুল্লাহমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ছানা ও দরুদকে দোয়ার উপর অগ্রবর্তী করা হয়, যাতে কবুলিয়াতের নিকটবর্তী, যেমন অন্যান্য দোয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ শরীফ ও ছানা পড়ার উদ্দেশ্যেই পড়া হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সাফা পাহাড়ে এতটুকু আরোহণ করবে, যাতে বায়তুল্লাহ তার দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা, বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করাই সাফা পাহাড়ে আরোহণের উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য উক্ত অবস্থায়ই অর্জন সম্ভব।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সাফা পাহাড়ের দিকে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাবে বনী মাখযূম দিয়ে বের হয়েছিলেন। এই বাবকে বাবে সাফাও বলে। এই বাব দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য বের হয়েছিলেন যে, সেটা সাফার দিকে যাওয়ার নিকটতম দরজা ছিল। সুতরাং এ 'বাব' দিয়ে বের হওয়া মোস্তাহাব; সুন্নত নয়। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) বাবে সাফা দিয়ে বের হওয়াকে সুন্নত বলেছেন।

قَالَ ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحْوَ الْمَرْوَةِ وَيَمْشِيْ عَلٰى هِيْنَتِهٖ فَاِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِيْ يَسْعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ سَعْيًا ثُمَّ يَمْشِيْ عَلٰى هِيْنَتِهٖ حَتّٰى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ وَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَجَعَلَ يَمْشِيْ نَحْوَ الْمَرْوَةِ وَسَعٰى فِيْ بَطْنِ الْوَادِيْ حَتّٰى اِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ مَشٰى حَتّٰى صَعِدَ الْمَرْوَةَ وَطَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَهٰذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর মারওয়ার উদ্দেশ্যে অবতরণ করবে এবং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে যাবে। যখন 'বাতনুল ওয়াদী' পৌছবে, তখন সবুজ নিশানদ্বয়ের মাঝে সাধারণভাবে দৌড়াবে। অতঃপর মারওয়া পর্যন্ত ধীরস্থিরভাবে হেঁটে যাবে ও তাতে আরোহণ করবে এবং সাফায় যা করেছে এখানেও তা করবে। কেননা বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা থেকে অবতরণ করে মারওয়ার উদ্দেশ্যে হেঁটে যান এবং 'বাতনুল ওয়াদী'তে দৌড়েছেন। 'বাতনুল ওয়াদী' থেকে বের হয়ে হেঁটে চলেন এবং মারওয়ায় আরোহণ করেন। এখানে উভয়ের মাঝে সাত চক্কর তওয়াফ করেন। এ হলো এক চক্কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাফা থেকে মারওয়ার দিকে যাবে এবং খুবই ধীরস্থিরভাবে হেঁটে যাবে। যখন 'বাতনে ওয়াদী'তে পৌছবে তখন দুই সবুজ নিশানদ্বয়ের মাঝে দৌড়াবে। অতঃপর মারওয়া পর্যন্ত ধীরস্থিরভাবে হেঁটে যাবে ও তাতে আরোহণ করবে এবং সাফা পাহাড়ে যা করেছে এখানেও তা করবে। এর দলিল হলো হিদায়া গ্রন্থকার যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সেটি। অতএব হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সাফা থেকে মারওয়ায় গমন এক চক্কর আর মারওয়া থেকে সাফায় গমন দ্বিতীয় চক্কর। ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, সাফা থেকে মারওয়ায় গমন ও মারওয়া থেকে সাফায় প্রত্যাবর্তন সবটি মিলে এক চক্কর। কিন্তু বিশুদ্ধতম অভিমত হলো যা হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজের কার্যাবলি বর্ণনাকারী সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত চক্কর দিয়েছেন। আর ইমাম ত্বাহাবী (র.) -এর মতানুসারে সাতের স্থলে চৌদ্দ হয়ে যায়। এ কারণেই হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত মতকেই বিশুদ্ধতম বুঝা যায়।

فَيَطُوْفُ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَيَسْعٰى فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ فِىْ كُلِّ شَوْطٍ لِمَا رَوَيْنَا وَاِنَّمَا يَبْدَأُ بِالصَّفَا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِ اِبْدَءُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ ثُمَّ السَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) اِنَّهٗ رُكْنٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ فَاسْعَوْا وَلَنَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمِثْلُهٗ يُسْتَعْمَلُ لِلْاِبَاحَةِ فَيَنْفِى الرُّكْنِيَّةَ وَالْاِيْجَابُ اِلَّا اَنَّا عَدَلْنَا عَنْهُ فِى الْاِيْجَابِ وَلِاَنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ اِلَّا بِدَلِيْلٍ مَقْطُوْعٍ بِهٖ وَلَمْ يُوْجَدْ ثُمَّ مَعْنٰى مَا رَوٰى كُتِبَ اِسْتِحْبَابًا كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (الاية) ـ

অনুবাদ : এভাবে সাত চক্কর দেবে। সাফা থেকে শুরু করবে এবং মারওয়ায় গিয়ে শেষ করবে। আর প্রতি চক্করের সময় 'বাতনুল ওয়াদী'তে দৌড়াবে। দলিল হলো– আমাদের পূর্ববর্ণিত হাদীস। সাফা থেকে শুরু করার কারণ হলো, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اِبْدَءُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى 'আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে [সাফা] শুরু করেছেন, তোমরাও তা থেকে শুরু করো।' আর সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সা'ঈ হলো ওয়াজিব, রুকন নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এটি রুকন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ فَاسْعَوْا 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সা'ঈ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা সা'ঈ করো।' আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا 'ঐ দুটির মধ্যে তওয়াফ করায় তার কোনো গুনাহ্ নেই।' এ ধরনের বাক্য বৈধতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং তা রুকন হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়া উভয়টিকেই 'নফী' করে। তবে আমরা রুকনের পরিবর্তে ওয়াজিব হওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি এজন্য যে, অকাট্য দলিল ছাড়া রুকন সাব্যস্ত হয় না, আর এখানে তা [অকাট্য দলিল] পাওয়া যায়নি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসে كُتِبَ শব্দ মোস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর সময় অসিয়ত করা প্রসঙ্গে বলেছেন– كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ 'তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় আর সে কিছু সম্পদ রেখে যায়, তখন তার উপর অসিয়ত করার বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে।' [অথচ অসিয়ত করা ওয়াজিব নয়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, তওয়াফ সাত চক্কর। সাফা থেকে শুরু হবে এবং মারওয়ায় গিয়ে শেষ হবে। আর প্রতি চক্করে 'বাতনুল ওয়াদী'তে দৌড়াতে হবে। দলিল হলো, পূর্ববর্তী মাসআলায় বর্ণিত হাদীস–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَجَعَلَ يَمْشِىْ نَحْوَ الْمَرْوَةِ ـ اَلْحَدِيْثُ

আর সাফা থেকে সা'ঈ শুরু হওয়ার দলিল হলো এই হাদীস– اِبْدَءُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা প্রথমে যেটি দিয়ে [অর্থাৎ সাফা] শুরু করেছেন, তোমরাও তা থেকে শুরু করো।' আর আল্লাহ তা'আলা সাফা দিয়ে শুরু করেছেন যেমন ইরশাদ হচ্ছে– اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

উক্ত হাদীসে ابدءوا নির্দেশবাচক শব্দ। এ কারণে সাফা থেকে সা'ঈ শুরু করা ওয়াজিব।

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সা'ঈ করা ওয়াজিব না রুকন এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আমাদের নিকট তা রুকন নয়; বরং ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট তা রুকন। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো এই হাদীস– إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সা'ঈ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা সা'ঈ করো।' كَتَبَ শব্দটি ফরজ ও রুকনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এজন্যেই সা'ঈ করা রুকন বলে পরিগণিত হবে।

আমাদের দলিল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا 'ঐ দুটির মাঝে তওয়াফ করায় তার কোনো গুনাহ্ নেই।' এ আয়াতে لَا جُنَاحَ ব্যবহার করা হয়েছে বৈধতা প্রকাশের জন্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতে لَا جُنَاحَ দ্বারা বৈধতা প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারি স্ত্রীলোককে ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ; ওয়াজিব কিংবা ফরজ নয়। মোদ্দাকথা হলো, لَا جُنَاحَ শব্দটি বৈধ ভাব প্রকাশ করে। আর যে শব্দকে বৈধতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তা রুকন হওয়া কিংবা ওয়াজিব হওয়া উভয়টিকে 'নফী' করে। সুতরাং আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা রুকন কিংবা ওয়াজিব নয়, কিন্তু আমরা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ– ওয়াজিব না হওয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি। অর্থাৎ সা'ঈ ওয়াজিব না হওয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক আয়াতের উপর আমল পরিত্যাগ করেছি। তথা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ নির্দেশ করে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে 'সা'ঈ' করা ওয়াজিব নয়, কিন্তু আমরা এর উপর আমল পরিত্যাগ করেছি। তার কারণ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا হাদীসটি হলো খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। দ্বিতীয়ত আয়াতের প্রথম অংশ হলো– إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ আর شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– আলামত, চিহ্ন। আর আলামতে দীন হলো ফরজ। এই আয়াতের এ অংশ দ্বারা সা'ঈ ফরজ সাব্যস্ত হয়। আর এ আয়াতের শেষাংশ– لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا দ্বারা সা'ঈ বৈধ হওয়াকে সাব্যস্ত করে। আমরা উভয়টির উপরই আমল করি এবং সা'ঈ করাকে ওয়াজিব বলে থাকি। কেননা, সা'ঈ করা আকীদাগতভাবে ফরজ নয়, তবে আমলের দিক থেকে তা ফরজ। তৃতীয়ত সা'ঈ ফরজ না হওয়ার উপর আমলকে 'ইজমা'-এর কারণে পরিত্যাগ করা হয়েছে। কেননা, সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে সা'ঈ করাকে কেউই বৈধ বলেন না।

সা'ঈ করা ওয়াজিব; রুকন নয়–এ সম্পর্কে আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, রুকন হওয়া সাব্যস্ত হয় অকাট্য প্রমাণ সাপেক্ষ। আর এ ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং 'সা'ঈ' রুকন হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে উপস্থাপিত إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ -এর জবাবে বলা হয়– এখানে كَتَبَ শব্দটি মোস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -এ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করা মোস্তাহাব, ফরজ নয়। সুতরাং যেভাবে এ আয়াতে كُتِبَ عَلَيْكُمْ মোস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অনুরূপভাবে সা'ঈ সংক্রান্ত মাসআলায়ও كَتَبَ শব্দ মোস্তাহাব তথা ফরজ নয়– অর্থে এসেছে।

ثُمَّ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَرَامًا لِاَنَّهُ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَلَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْاِتْيَانِ بِاَفْعَالِهِ وَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ الصَّلٰوةَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ وَالصَّلٰوةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ فَكَذَا الطَّوَافُ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَسْعٰى عَقِيْبَ هٰذِهِ الْاَطْوِفَةِ فِيْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ لِاَنَّ السَّعْىَ لَا يَجِبُ فِيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَالتَّنَفُّلُ بِالسَّعْىِ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ وَيُصَلِّىْ لِكُلِّ اُسْبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ وَهِىَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : অতঃপর মক্কা শরীফে ইহ্‌রাম অবস্থায় অবস্থান করবে। কেননা, সে হজের ইহ্‌রাম বেঁধেছে। সুতরাং হজের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার পূর্বে সে ইহ্‌রামমুক্ত হবে না। যখনই তার ইচ্ছা হবে সে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবে। কেননা, তওয়াফ হলো সালাত সদৃশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ 'বায়তুল্লাহর তওয়াফ হলো সালাত।' আর সালাতকে উত্তম ইবাদত রূপেই বানানো হয়েছে। সুতরাং তওয়াফও অনুরূপ। তবে এ সময়ের মধ্যে এ সকল [নফল] তওয়াফের পরে সা'ঈ করবে না। কেননা, সা'ঈ একবারই শুধু ওয়াজিব হয়। আর নফল সা'ঈ শরিয়ত অনুমোদিত নয়। আর প্রতি সাত চক্করের জন্য দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। এ দু রাকাত হলো তওয়াফের সালাত। যেমন ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, তওয়াফে কুদূম ও সা'ঈ সম্পন্ন করত হাজী ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কা শরীফে অবস্থান করবে। কেননা, সে হজের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বেঁধেছে। এজন্য হজের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার পূর্বে সে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হবে না। অর্থাৎ এমন কোনো কাজ করবে না যা দ্বারা ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর এ সময়ে যখনই হাজীর ইচ্ছা হবে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে। দলিল হলো– তওয়াফ নামাজ সদৃশ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ اَحَلَّ فِيْهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فِيْهِ فَلَا يَنْطِقُ اِلَّا بِخَيْرٍ .

অর্থাৎ 'বায়তুল্লাহর তওয়াফ হলো নামাজ। তবে আল্লাহ তা'আলা তওয়াফের মধ্যে কথা বলা বৈধ করেছেন।' সুতরাং যে তওয়াফের মধ্যে কথা বলবে সে যেন ভালো কথা বলে। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, তওয়াফ নামাজ সদৃশ। আর নামাজ হলো উত্তম ইবাদত– যা নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাড়া সর্বদা আদায় করা যায়। সুতরাং তওয়াফও সেভাবে সবসময় করা যাবে। তবে লক্ষণীয় হলো, এসব নফল তওয়াফের পরে সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে সা'ঈ করবে না। কেননা, সা'ঈ করা শুধু তওয়াফে কুদূমের পর একবারই ওয়াজিব। আর নফল সা'ঈ শরিয়ত অনুমোদিত নয়। সুতরাং একবার সা'ঈ করার পর দ্বিতীয়বার আর সা'ঈ করবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, নফল তওয়াফকারী প্রতি সাত চক্কর পর দু রাকাত নামাজ পড়বে। এ দু রাকাত নামাজকে 'সালাতে তওয়াফ' বলা হয় যা ইতঃপূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ فَاِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْاِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيْهَا النَّاسَ الْخُرُوْجَ اِلَى مِنًى وَالصَّلٰوةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوْفَ وَالْاِفَاضَةَ وَالْحَاصِلُ اَنَّ فِى الْحَجِّ ثَلٰثُ خُطَبٍ اَوَّلُهَا مَا ذَكَرْنَا وَالثَّانِيَةُ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالثَّالِثَةُ بِمِنًى فِى الْيَوْمِ الْحَادِىْ عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) يَخْطُبُ فِىْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ اَوَّلُهَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ لِاَنَّهَا اَيَّامُ الْمَوْسِمِ وَمُجْتَمَعُ الْحَاجِّ وَلَنَا اَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهَا التَّعْلِيْمُ وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ اِشْتِغَالٍ فَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ اَنْفَعَ وَفِى الْقُلُوْبِ اَنْجَعُ فَاِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ اِلٰى مِنًى فَيُقِيْمُ بِهَا حَتّٰى يُصَلِّىَ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَاحَ اِلٰى مِنًى فَصَلّٰى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ رَاحَ اِلٰى عَرَفَاتٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইয়াওমুত তারবিয়ার [৮ ই জিলহজের] পূর্বের দিনে ইমাম একটি খুতবা দেবেন, যার মাধ্যমে মানুষকে মিনায় যাওয়া, আরাফায় নামাজ আদায় করা, উকূফ করা এবং আরাফা থেকে ফিরে আসার নিয়মাবলি শিক্ষা দেবেন। মোটকথা, হজে তিনটি খুতবা রয়েছে। প্রথমটি যা আমরা উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয়টি হলো আরাফার দিবসে আরাফায় এবং তৃতীয়টি হলো [এগার তারিখে] মিনায়। অতএব প্রতি দুই খুতবার মাঝে একদিনের ব্যবধান রয়েছে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, লাগাতার তিনদিন খুতবা দেওয়া হবে। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো ইয়াওমুত তারবিয়া [৮-ই জিলহজ]। কেননা, এ দিনগুলো হজ মৌসুমের দিন এবং হাজীদের একত্র হওয়ার সময়। আমাদের দলিল হলো, খুতবার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদান। অথচ 'ইয়াওমুত তারবিয়া' ও 'ইয়াওমুন নহর' হলো ব্যস্ততার দিন। সুতরাং আমরা যা বলেছি, তা অধিকতর উপকারী ও অন্তরে ক্রিয়াশীল। ইয়াওমুত তারবিয়ায় [৮ ই জিলহজে] মক্কায় ফজরের নামাজ আদায় করে মিনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং আরাফা দিবসের ফজরের নামাজ আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৮ তারিখে মক্কায় ফজরের নামাজ আদায় করেন এবং সূর্যোদয়ের পর মিনার উদ্দেশ্যে যান এবং সেখানে জোহর, আসর, মাগরিব, 'ইশা ও ফজর নামাজ আদায় করেন। অতঃপর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ৭ ই জিলহজে জোহরের নামাজের পর ইমাম একটি খুতবা দেবেন। যাতে তিনি হাজীদেরকে হজের যাবতীয় কার্যাবলি যথা– মিনায় যাওয়া, আরাফার ময়দানে জোহর ও আসর নামাজ একত্রে আদায় করা, আরাফায় অবস্থান করা অতঃপর সেখান থেকে মুযদালিফায় গমন ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেবেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হজে তিনটি খুতবা রয়েছে। প্রথম খুতবা হলো– ৭ ই জিলহজ জোহরের নামাজের পরে। দ্বিতীয় খুতবা ৯ ই জিলহজ আরাফার ময়দানে জোহর নামাজের পূর্বে। আর তৃতীয় খুতবা ১১ ই জিলহজ মিনায় জোহরের নামাজের পরে। প্রথম ও তৃতীয় খুতবার ক্ষেত্রে উভয় খুতবার মাঝখানে কোনো বৈঠক হবে না; বরং শুধু একটি খুতবা হবে। আর দ্বিতীয় খুতবা তথা আরাফার দিবসে উভয় খুতবার মধ্যে বৈঠক জরুরি। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বর্ণিত তিনটি খুতবার মাঝখানে একদিন করে ব্যবধান হবে। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় খুতবার মধ্যে ৮ ই জিলহজের ব্যবধান থাকবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খুতবার মাঝখানে ১০ ই জিলহজের ব্যবধান থাকবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ তিনটি খুতবা ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হবে। অর্থাৎ প্রথম খুতবা ৮ ই জিলহজে, দ্বিতীয় খুতবা ৯ ই জিলহজে এবং তৃতীয় খুতবা ১০ ই জিলহজে প্রদান করা হবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো– এই তিনদিন হজের সময় এবং হাজীদের একত্র হওয়ার দিন। সুতরাং এ দিনগুলোতেই খুতবা দেওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত।

আমাদের দলিল– এ খুতবাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে হাজীদেরকে হজের কার্যাবলি শিক্ষাদান। আর ৮ ও ১০ ই জিলহজ হলো হজের কার্যাবলি সম্পাদনের ব্যস্ততার দিন। কিন্তু অপরদিকে ৭, ৯ ও ১১ জিলহজে হাজীগণ অবকাশ যাপনের সময় পান। এজন্য এ দিনগুলোতে খুতবা প্রদান হাজীদের ক্ষেত্রে অধিক উপকারী ও অন্তরে অধিক ক্রিয়াশীল বলে সাব্যস্ত হবে। এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর হেরা গুহার সাথী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর আমলও এমন ছিল।

قَوْلُهُ فَإِذَا صَلَّى الخ : হজের কার্যাবলির ধারাবাহিক বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ৮ ই জিলহজে মক্কায় ফজরের নামাজ আদায় করে মিনায় চলে যাবে এবং সেখানে ৯ ই জিলহজের ফজর নামাজ পর্যন্ত অবস্থান করবে। এমনকি ফজরের নামাজ মিনাতেই আদায় করবে। ইমাম কুদূরী (র.)-এর বর্ণিত ইবারত থেকে বুঝা যায় যে, ৮ ই জিলহজে ফজর নামাজ পড়েই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। অথচ এটা সুন্নত পরিপন্থি। সুন্নত হলো সূর্যোদয়ের পর মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। যেমন, হিদায়া গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَاحَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ رَاحَ إِلَى عَرَفَاتٍ .

وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَصَلَّى بِهَا الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِمِنًى أَجْزَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمِنًى فِي هٰذَا الْيَوْمِ إِقَامَةُ نُسُكٍ وَلٰكِنَّهُ أَسَاءَ بِتَرْكِهِ الْاِقْتِدَاءَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيْمُ بِهَا لِمَا رَوَيْنَا وَهٰذَا بَيَانُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَازَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهٰذَا الْمَقَامِ حُكْمٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيَنْزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ لِأَنَّ الْاِنْتِبَاذَ تَجَبُّرٌ وَالْحَالُ حَالُ تَضَرُّعٍ وَالْإِجَابَةُ فِي الْجَمْعِ أَرْجٰى وَقِيْلَ مُرَادُهُ أَنْ لَا يَنْزِلَ عَلَى الطَّرِيْقِ كَيْلَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ ـ

অনুবাদ : যদি হাজী আরাফার রাত্রি [৯ ই জিলহজ] মক্কায় যাপন করে এবং সেখানেই ফজরের নামাজ পড়ে অতঃপর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং মিনা দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা, এদিনে মিনায় হজের কোনো ক্রিয়াকর্ম নেই। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত অনুসরণ না করার কারণে সে মন্দ কাজ করল। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। এর দলিল হলো আমাদের পূর্ববর্ণিত হাদীস। এ হলো উত্তম হওয়ার বিবরণ। তবে কেউ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হয়, তাহলে তা জায়েজ। কেননা, এ স্থানের সঙ্গে তার পালনীয় আর কোনো হুকুম নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'মাবসূত' গ্রন্থে বলেছেন, আরাফার মাঠে লোকদের সাথে অবস্থান করবে। কেননা, আলাদা অবস্থানে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। অথচ অবস্থা হলো বিনয় প্রকাশের। আর জামাতের সাথে দোয়া কবুলের আশা অধিক। কোনো কোনো মতে লোকদের সাথে বসার উদ্দেশ্য হলো চলাচলের পথে অবতরণ না করা, যাতে চলাচলকারীদের অসুবিধা না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি/ হাজী ৮ই জিলহজ মিনায় না পৌছে বরং ৮ ই জিলহজের দিবস ও ৯ তারিখের রাত্র মক্কায় যাপন করে এবং সেখানে ফজরের নামাজ পড়ে মিনা দিয়ে অতিক্রম করত আরাফার মাঠে পৌছে তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা, ৮ তারিখ মিনায় হজের কোনো ক্রিয়াকর্ম নেই। তবে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল পরিপন্থি কাজ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত অনুসরণ না করার কারণে সে মন্দকাজে লিপ্ত হলো বলে পরিগণিত হবে।

কুদূরী গ্রন্থকার মূল মাসআলায় ফিরে গিয়ে বলেন, হাজী যখন ৯ তারিখ ফজরের নামাজ মিনায় আদায় করে ফেলেছে তখন সূর্যোদয়ের পরে আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হবে। দলিল পূর্ববর্ণিত হাদীস। লক্ষণীয় হলো, সূর্যোদয়ের পর বের হওয়া উত্তমতার বিষয়। তবে কেউ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তাহলে তা জায়েজ। কেননা, মিনায় তার পালনীয় হজের আর কোনো হুকুম নেই। এজন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফায় গমন করতে কোনো অসুবিধা নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'মাবসূত' গ্রন্থে বলেছেন, হাজী আরাফার মাঠে লোকদের সাথে অবস্থান করবে। অর্থাৎ লোকদের থেকে আলাদা হবে না। কেননা, লোকদের থেকে ভিন্ন থাকায় অহঙ্কার প্রকাশ পায়। অথচ এ অবস্থা হলো বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের। দ্বিতীয়ত জামাতের সাথে দোয়া কবুল হওয়ার আশা অধিক। কেউ কেউ বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, রাস্তায় বসবে না। কেননা, এতে চলাচলকারীদের অসুবিধা হয়।

قَالَ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَيَبْتَدِئُ بِالْخُطْبَةِ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَرَمْيَ الْجِمَارِ وَالنَّحْرَ وَالْحَلْقَ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ هٰكَذَا فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ لِأَنَّهَا خُطْبَةُ وَعْظٍ وَتَذْكِيرٍ فَأَشْبَهَ خُطْبَةَ الْعِيْدِ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهَا تَعْلِيمُ الْمَنَاسِكِ وَالْجَمْعُ مِنْهَا وَفِيْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ كَمَا فِيْ الْجُمُعَةِ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ يُؤَذِّنُ قَبْلَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَ الصَّحِيْحُ مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَرَجَ وَاسْتَوٰى عَلٰى نَاقَتِهِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُقِيْمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِأَنَّهُ أَوَانُ الشُّرُوْعِ فِي الصَّلٰوةِ فَأَشْبَهَ الْجُمُعَةَ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সূর্য যখন হেলে পড়বে তখন ইমাম লোকদের নিয়ে জোহর ও আসর পড়বেন। প্রথমে তিনি খুতবা পাঠ করবেন। আর খুতবায় লোকদেরকে আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানি, মাথামুণ্ডন এবং তওয়াফে জিয়ারত করার নিয়মাবলি শিক্ষা দেবেন। ইমাম দুটি খুতবা দেবেন। উভয় খুতবার মধ্যে একটি বৈঠকের দ্বারা পার্থক্য করবেন। যেমন জুমায় করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন। আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, নামাজের পর খুতবা প্রদান করবেন। কেননা, এটা ওয়াজ ও উপদেশের খুতবা। সুতরাং তা ঈদের খুতবার সদৃশ। আমাদের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐ হাদীস যা আমরা বর্ণনা করেছি। তা ছাড়া এ খুতবার উদ্দেশ্য হলো হজের কার্যাবলি শিক্ষা দেওয়া। আর দুই নামাজকে একত্রে আদায় করা উক্ত আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। জাহিরী মাযহাব মতে ইমাম মিম্বরে আরোহণ করে উপবেশন করলে মুয়াজ্জিনগণ আজান দেবেন। যেমন জুমার জন্য দেওয়া হয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম বের হওয়ার পূর্বে আজান দেওয়া হবে। তাঁর থেকে অপর এক বর্ণনা মতে খুতবার পরে আজান দেবে। আর বিশুদ্ধ হলো আমরা যা উল্লেখ করেছি। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বের হলেন এবং নিজ উটনীর উপর আরোহণ করলেন, তখন মুয়াজ্জিনগণ তাঁর সামনে আজান দিয়েছিলেন। ইমাম খুতবা থেকে অবসর হওয়ার পরে মুয়াজ্জিন ইকামত দেবেন। কেননা, এ হলো নামাজ শুরু করার সময়। সুতরাং তা জুমার সদৃশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ৯ ই জিলহজ আরাফায় সূর্য [পশ্চিমাকাশে] ঢলে যাওয়ার পর ইমামুল মুসলিমীন কিংবা তার প্রতিনিধি লোকদেরকে নিয়ে জোহরের সময়ে জোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করবেন। পদ্ধতি হবে, প্রথমে ইমাম খুতবা দেবেন যাতে লোকদেরকে হজের নিয়মাবলি শিক্ষা দেবেন। জুমার ন্যায় দুটি খুতবা হবে। উভয় খুতবার মধ্যে একটি বৈঠকের দ্বারা পার্থক্য করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল এরূপই ছিল।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, আরাফার দিবসের খুতবা নামাজের পরে হবে; নামাজের পূর্বে নয়। তাঁর দলিল হলো, এ খুতবা ওয়াজ ও নসিহতের খুতবা। সুতরাং তা ঈদের খুতবার সদৃশ। আর দু ঈদের খুতবা নামাজের পর প্রদান করা হয়। এজন্য আরাফা দিবসের খুতবাও নামাজের পর প্রদান করা হবে।

আমাদের দলিল হযরত জাবির (রা.) -এর বর্ণিত ঐ হাদীস যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফার ময়দানে জোহরের নামাজের পূর্বে খুতবা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলিল হলো– আরাফার মাঠে খুতবার উদ্দেশ্য হজের কার্যাবলি শিক্ষা দেওয়া। আর এই দুই নামাজ [জোহর ও আসর] একত্রে আদায় করা হজের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নামাজের পূর্বে খুতবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত হয়– নামাজের পরে নয়। এজন্য আমাদের নিকট জোহরের নামাজের পূর্বে খুতবা প্রদানের বিধান দেওয়া হয়েছে।

আরাফার ময়দানে মুয়াজ্জিন আজান কখন দেবে খুতবার পূর্বে নাকি খুতবার পরে এ বিষয়ে আমাদের উলামায়ে কেরামের জাহিরী মাযহাব হলো, ইমাম যখন মিম্বরে উঠে বসবেন তখন মুয়াজ্জিন ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে আজান দেবেন। যেমন জুমার খুতবার ক্ষেত্রে ইমাম প্রথমে মিম্বরে বসেন অতঃপর মুয়াজ্জিন আজান দেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইমাম তাঁবু থেকে বের হওয়ার পূর্বে আজান দেওয়া হবে। এমনকি মুয়াজ্জিন যখন আজান থেকে ফারিগ হবেন তখন ইমাম স্বীয় তাঁবু থেকে বের হবেন। কেননা, জোহরের নামাজ আদায় করার জন্য এই আজান, যেমন অন্যান্য দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর জোহরের নামাজ আদায় করার জন্য আজান দেওয়া হয়। সুতরাং অন্যান্য দিন যেমন ইমামের আগমনের পূর্বে আজান দেওয়া হয় তেমনিভাবে আরাফার দিবসেও ইমামের আগমনের পূর্বে আজান দেওয়া হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আরেকটি মতে খুতবার পরে আজান দেবে। ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। এ মতের স্বপক্ষে দলিল, হযরত জাবির (রা.) -এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বিলাল (রা.) আরাফার মাঠে খুতবার পরে আজান দিয়েছিলেন। তবে বিশুদ্ধতম মাযহাব হলো যা আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ ইমাম মিম্বরে বসার পর আজান দেওয়া হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁবু থেকে বের হয়ে স্বীয় উটনীর উপর আরোহণ করলেন তখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আজান দিয়েছিলেন।

জাহিরী মাযহাব বিশুদ্ধ হওয়ার দলিল হলো, হযরত জাবির (রা.) -এর বর্ণিত হাদীসের দাবি হলো খুতবা প্রদানের পরে আজান দেওয়া হবে। আর বর্ণিত রেওয়ায়েতের দাবি হলো খুতবার পূর্বে আজান দেওয়া হবে। সুতরাং পরস্পর বৈপরীত্যের কারণে উভয় রেওয়ায়েতকে ছেড়ে দিয়ে জুমার উপর কিয়াসের ভিত্তিতে আমল করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম খুতবা থেকে ফারিগ হওয়ার পর মুয়াজ্জিন ইক্বামত বলবেন। কেননা, এটাই নামাজ শুরু করার সময়। সুতরাং যেভাবে জুমার খুতবার পরে ইক্বামত বলা হয় তেমনিভাবে আরাফার খুতবার পরেও জোহরের নামাজের জন্য ইক্বামত দেওয়া হবে।

قَالَ وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَقَدْ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيْضُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَفِيْمَا رَوٰى جَابِرٌ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ ثُمَّ بَيَانُهُ اَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ وَيُقِيْمُ لِلظُّهْرِ ثُمَّ يُقِيْمُ لِلْعَصْرِ لِاَنَّ الْعَصْرَ يُؤَدّٰى قَبْلَ وَقْتِهِ الْمَعْهُوْدِ فَيُفْرَدُ بِالْاِقَامَةِ اِعْلَامًا لِلنَّاسِ وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُوْدِ الْوُقُوْفِ وَلِهٰذَا قُدِّمَ الْعَصْرُ عَلٰى وَقْتِهِ فَلَوْ اَنَّهُ فَعَلَ فَعَلَ مَكْرُوْهًا وَاَعَادَ الْاَذَانَ لِلْعَصْرِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ خِلَافًا لِمَا رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) لِاَنَّ الْاِشْتِغَالَ بِالتَّطَوُّعِ اَوْ بِعَمَلٍ اٰخَرَ يَقْطَعُ فَوْرَ الْاَذَانِ الْاَوَّلِ فَيُعِيْدُهُ لِلْعَصْرِ فَاِنْ صَلّٰى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ اَجْزَاَهُ لِاَنَّ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِفَرِيْضَةٍ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর ইমাম লোকদের নিয়ে জোহরের সময়ে এক আজান ও দুই ইক্বামতসহ জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করবেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের ঐকমত্যে দুই নামাজ একত্রিত করা সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দুই নামাজ এক আজান ও দুই ইক্বামত দ্বারা আদায় করেছেন। এর বর্ণনা এই– প্রথমে জোহরের জন্য আজান দেবে এবং জোহরের জন্য ইক্বামত বলবে, অতঃপর আসরের জন্য ইক্বামত বলবে। কেননা, আসরের নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং মানুষের অবগতির জন্য আলাদা ইক্বামত বলবে। আর উভয় নামাজের মাঝে নফল পড়বে না– উকূফের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য। এ কারণেই আসরকে তার নির্ধারিত সময় থেকে এগিয়ে আনা হয়েছে। কেউ যদি নফল আদায় করে, তাহলে সে মাকরূহ কাজ করল। আর জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী আসরের নামাজের জন্য পুনরায় আজান দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে অবশ্য ভিন্নমত বর্ণিত হয়েছে। কেননা, নফল বা অন্য কোনো আমলে নিয়োজিত হওয়া প্রথম আজানের সংযুক্তি নষ্ট করে দেয়। সুতরাং আসরের জন্য পুনরায় আজান দেবে। যদি খুতবা ছাড়া নামাজ আদায় করে, তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। কেননা, এ খুতবা ফরজ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ الخ : আরাফার মাঠে ইমাম লোকদেরকে নিয়ে জোহরের সময়ে এক আজান ও দুই ইক্বামতসহ জোহর ও আসর নামাজ আদায় করবে। দুই নামাজ একত্রিত করার দলিল হলো– এ সম্পর্কিত মশহুর হাদীসসমূহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই দু নামাজ একত্রে আদায় করা সম্পর্কে বর্ণনাকারীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।
আর এক আজান ও দুই ইক্বামতের দলিল হলো– হযরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস– যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দুই নামাজ আরাফায় এক আজান ও দুই ইক্বামতের সাথে আদায় করেছেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা হলো, প্রথমে জোহরের জন্য আজান দেবে অতঃপর ইক্বামত বলবে। এরপর আসরের জন্য ইক্বামত বলবে। কেননা, আসরের নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা হচ্ছে। আর লোকজনও উপস্থিত আছেন। এজন্য উপস্থিত লোকদের অবগতিকল্পে শুধু ইক্বামতই যথেষ্ট; আজানের প্রয়োজন নেই।
قَوْلُهُ وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الخ মাসআলা : ইমাম বা মুক্তাদী কেউই এ দু নামাজের মাঝে কোনো নফল নামাজ পড়বে না। অর্থাৎ ফরজ নামাজ ব্যতীত সুন্নত ও অন্য কোনো নামাজ পড়বে না। কেননা, এ দিনটি উকূফে আরাফার উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য নির্ধারিত। আর এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যেই স্বীয় সময়কে নফল নামাজ কিংবা অন্য কোনো কাজে ব্যয় করবে না। আর এ উদ্দেশ্যেই আসরের নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এগিয়ে আনা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ইমাম কিংবা মুক্তাদী যদি এ দু নামাজের মাঝে নফল নামাজ আদায় করে, তাহলে তা মাকরূহ কাজ বলে পরিগণিত হবে।
আর ইমাম যদি উভয় নামাজের মাঝে কোনো নফল নামাজ আদায় করে, তাহলে জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী আসরের জন্য দ্বিতীয় আজান দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এ অবস্থায় পুনর্বার আজান দিতে হবে না।
জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল হলো– জোহরের নামাজের পরে নফল কিংবা অন্য কোনো আমলে নিয়োজিত হওয়া আসরের সাথে প্রথম আজানের সংযুক্তি নষ্ট করে দেয়। সুতরাং আসরের জন্য পুনরায় আজান দিতে হবে।

قَالَ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِيْ رَحْلِهِ وَحْدَهُ صَلَّى الْعَصْرَ فِيْ وَقْتِهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالاَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنْفَرِدُ لِاَنَّ جَوَازَ الْجَمْعِ لِلْحَاجَةِ اِلَى اِمْتِدَادِ الْوُقُوْفِ وَالْمُنْفَرِدُ مُحْتَاجٌ اِلَيْهِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْوَقْتِ فَرْضٌ بِالنُّصُوْصِ فَلاَ يَجُوْزُ تَرْكُهُ اِلاَّ فِيْمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ وَهُوَ الْجَمْعُ بِالْجَمَاعَةِ مَعَ الْاِمَامِ وَالتَّقْدِيْمُ لِصِيَانَةِ الْجَمَاعَةِ لِاَنَّهُ يَعْسُرُ عَلَيْهِمُ الْاِجْتِمَاعُ لِلْعَصْرِ بَعْدَ مَا تَفَرَّقُوْا فِى الْمَوْقِفِ لاَ لِمَا ذَكَرَاهُ اِذْ لاَ مُنَافَاةَ ثُمَّ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلْاِمَامُ شَرْطٌ فِى الصَّلاَتَيْنِ جَمِيْعًا وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) فِى الْعَصْرِ خَاصَّةً لِاَنَّهُ هُوَ الْمُغَيَّرُ عَنْ وَقْتِهِ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلاَفِ اَلْاِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ التَّقْدِيْمَ عَلٰى خِلاَفِ الْقِيَاسِ عُرِفَتْ شَرْعِيَّتُهُ فِيْمَا اِذَا كَانَتِ الْعَصْرُ مُرَتَّبَةً عَلٰى ظُهْرٍ مُؤَدًّى بِالْجَمَاعَةِ مَعَ الْاِمَامِ فِيْ حَالَةِ الْاِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ثُمَّ لاَبُدَّ مِنَ الْاِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْلَ الزَّوَالِ فِيْ رِوَايَةٍ تَقْدِيْمًا لِلْاِحْرَامِ عَلٰى وَقْتِ الْجَمْعِ وَفِيْ اُخْرٰى يَكْتَفِيْ بِالتَّقْدِيْمِ عَلَى الصَّلٰوةِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ الصَّلٰوةُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের অবস্থানে থেকে একা জোহর পড়বে, সে আসরের নামাজ আসরের সময়েই আদায় করবে। এটি হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। আর সাহেবাইন বলেন, মুনফারিদও উভয় নামাজ একত্রে আদায় করবেন। কেননা, উকূফকে প্রলম্বিত করার প্রয়োজনে একত্র করার বৈধতা এসেছে। আর মুনফারিদও সে প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– নামাজের ওয়াক্তের হিফাজত করা কুরআনের বাণী দ্বারা ফরজ। সুতরাং যে ব্যাপারে শরিয়তের বিধান এসেছে, সে ব্যাপার ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এ ফরজ তরক করা জায়েজ হবে না। আর তা হলো ইমাম ও জামাতের সাথে উভয় নামাজকে একত্র করা। আর আসরকে একত্রিত করার কারণ হলো জামাত সংরক্ষণ করা। কেননা, সকলে স্বীয় উকূফের স্থানে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আসরের জন্য পুনরায় একত্র হওয়া কঠিন ব্যাপার। সাহেবাইন একত্র হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা নয়। কেননা, [নামাজ ও উকূফের মাঝে তো] কোনো বিরোধ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয় নামাজের জন্য ইমামের উপস্থিতি শর্ত। ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু আসরের জন্য এ শর্ত। কেননা, আসরকেই তার নির্ধারিত সময় থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। হজের ইহ্রাম সম্পর্কেও একই মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– আসরকে কিয়াস পরিপন্থিভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করার বিধান তখনই কার্যকর হবে যখন আসর এমন জোহরের পরে আসবে যা ইহ্রামের অবস্থায় ইমামের সাথে জামাতে আদায় করা হবে। সুতরাং তা এ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে এক বর্ণনা মতে হজের ইহ্রাম যাওয়ালের [সূর্য ঢলে যাওয়ার] পূর্বে হওয়া জরুরি, যাতে উভয় নামাজ একত্র করার সময় আসার পূর্বে ইহ্রাম অবস্থায় থাকে। অন্য বর্ণনা মতে নামাজের উপর অগ্রবর্তী করাই যথেষ্ট। কেননা, সালাতই হলো উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, কোনো হাজী যদি নিজের অবস্থানে থেকে একা জোহরের নামাজ আদায় করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে ব্যক্তি আসরের নামাজ আসরের ওয়াক্তে আদায় করবে। অর্থাৎ জোহর ও আসরকে জোহরের সময়ে একত্রে পড়বে না। সাহেবাইন বলেন, একাকী নামাজ আদায়কারীও উভয় নামাজ একত্রে আদায় করবে। অর্থাৎ মুনফারিদ ও জামাতে নামাজ আদায়কারী উভয় ব্যক্তি দুই নামাজ একত্রে আদায় করার বিধানের ব্যাপারে সমান।

সাহেবাইনের দলিল হলো, আরাফার মাঠে হাজীকে জোহর ও আসর নামাজ একত্র করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে উকূফে আরাফাকে প্রলম্বিত করার প্রয়োজনে। আর এ কারণেই তো যার উপর উকূফ ফরজ নয় তার জন্য দুই নামাজ একত্রিত করারও অনুমতি নেই। আর এ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুনফারিদ ও জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী উভয়ে সমান। সুতরাং দুই নামাজ একত্র করার বিধান উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নামাজের ওয়াক্তের হেফাজত করা ফরজ। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অন্য আয়াতে এসেছে– اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا কুরআনের বাণী দ্বারা যা সাব্যস্ত তা তরক করা জায়েজ নেই, তবে যে ব্যাপারে এর বিপরীতে শরিয়তের বিধান এসেছে তা ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো ইমাম ও জামাতের সাথে উভয় নামাজ একত্রে আদায় করা। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি আরাফার দিবসে হাজী জোহর ও আসরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, তাহলে আসরকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করে দুই নামাজকে একত্রিত করার অনুমতি আছে– অন্যথায় নয়।

وَالتَّقْدِيْمُ لِصِيَانَةِ الخ : দ্বারা সাহেবাইনের দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরের সারকথা হলো, আসরকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করার কারণ উকূফকে প্রলম্বিত করা নয়, যা সাহেবাইন উল্লেখ করেছেন। কেননা, নামাজ ও উকূফের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। উভয়টা একত্রিত হতে পারে; বরং আসরকে অগ্রবর্তী করার কারণ হলো জামাত সংরক্ষণ করা। কেননা, জোহর পড়ে লোকেরা যদি আরাফার ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে আসরের জন্য তাদেরকে একত্রিত করা কঠিন হবে। সুতরাং এই কাঠিন্যের কারণে ও জামাতের ফজিলত অর্জনার্থে আসরকে তার সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করে জোহর ও আসরকে একত্রিত করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয় নামাজে ইমামুল মুসলিমীন কিংবা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি শর্ত। ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু আসরের জন্য এই শর্ত। আর সাহেবাইনের মতে কোনো নামাজের জন্যই ইমাম শর্ত নয়। হজের ইহ্রাম সম্পর্কেও একই মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট দুই নামাজ একত্র করার জন্য ইহ্রাম পূর্বশর্ত। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে শুধু আসরের পূর্বে ইহ্রাম বেঁধে নেওয়া শর্ত।

এই মতভেদের ফলাফল হলো, যদি কোনো গায়রে মুহরিম ইমামের সাথে জোহরের নামাজ আদায় করার পর হজের ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে ব্যক্তির জন্য আসরের নামাজ জোহরের সময় আদায় করা জায়েজ নেই। কিন্তু ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট তা জায়েজ। মোটকথা হলো, সাহেবাইনের মতে দুই নামাজ একত্র করা জায়েজ হওয়া হজের ইহ্রামের সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ইহ্রাম, জামাত ও ইমামুল মুসলিমীনের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইমাম যুফার (রা.)-এর মতে এসব শর্ত শুধু আসরের নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সাহেবাইনের দলিল তো স্পষ্ট। কেননা, তাঁদের মতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করার জন্য জামাত শর্ত নয়; বরং মুনফারিদও উভয় নামাজ একত্রে আদায় করতে পারবে। সুতরাং জামাতই যখন শর্ত নয়, তখন ইমাম কিংবা তাঁর প্রতিনিধির শর্ত কি করে হবে? ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো– আসরের নামাজ নির্দিষ্ট সময় থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। এ পরিবর্তনের জন্যই ইমাম শর্ত। এজন্য বিশেষ করে আসরের নামাজে ইমাম শর্ত করা হয়েছে, জোহরের নামাজের ক্ষেত্রে নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আসরের নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করা কিয়াস পরিপন্থি। এ বিধান প্রযোজ্য হবে তখনই যখন আসরের নামাজ এমন জোহরের পরে আদায় করা হবে– যা হজের ইহ্রাম অবস্থায়, জামাতের সাথে হবে। আর মূলনীতি হলো, যে বিধান কিয়াস পরিপন্থি প্রবর্তিত হয় তা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে। আর এ ক্ষেত্রে শরিয়তের অবস্থান হলো আরাফার মাঠে ৯ ই জিলহজে ইমামের সাথে জামাতে নামাজ আদায় করা হবে এবং তা হবে ইহ্রাম অবস্থায়। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এ সব শর্ত আবশ্যক বিধায় কোনো একটি শর্ত না থাকলে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা জায়েজ হওয়ার বিধান পরিত্যাজ্য হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আরাফার দিবসে দুই নামাজ একত্র করা জায়েজ হওয়ার জন্য সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা জরুরি।

কেননা, দুই নামাজ একত্র করা জায়েজ হওয়ার জন্য ইহ্রাম পূর্বশর্ত। আর কোনো জিনিসের শর্ত ঐ জিনিসের উপর অগ্রবর্তী হয়। এজন্য ইহ্রাম দুই নামাজ একত্র করা জায়েজ হওয়ার উপর অগ্রবর্তী হবে। আর সূর্য হেলে যাওয়ার দ্বারা দুই নামাজ একত্র করা জায়েজ হওয়ার বিষয়টি পাওয়া যায়। এ কারণেই সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা জরুরি।

অপর এক বর্ণনা মতে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে ইহ্রামকে অগ্রবর্তী করা জরুরি নয়; বরং জোহরের নামাজের উপর অগ্রবর্তী করাই যথেষ্ট। কেননা, উদ্দেশ্য হলো নামাজ, সময় নয়। এ কারণেই নামাজের পূর্বে ইহ্রাম বাঁধাই যথেষ্ট। সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা জরুরি নয়।

قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَالْقَوْمُ مَعَهُ عَقِيْبَ انْصِرَافِهِمْ مِنَ الصَّلٰوةِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ عَقِيْبَ الصَّلٰوةِ وَالْجَبَلُ يُسَمّٰى جَبَلَ الرَّحْمَةِ وَالْمَوْقِفُ الْمَوْقِفُ الْاَعْظَمُ قَالَ وَعَرَفَاتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَاتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ وَادِيْ مُحَسِّرٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর ইমাম উকূফের স্থানের অভিমুখী হবেন এবং পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করবেন। আর লোকেরাও সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর ইমামের সঙ্গে অবস্থান করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের পরে উকূফের স্থান অভিমুখে গমন করেছেন। উক্ত পাহাড়কে 'জাবালে রহমত' বলে। আর উকূফের এ স্থান হলো উকূফের প্রধান স্থান। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'বাতনে উরানা' ছাড়া সমগ্র আরাফা হলো উকূফের স্থান। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– অর্থ : সমগ্র আরাফা উকূফের স্থান। তবে 'বাতনে উরানা' থেকে দূরে থাকবে। অদ্রূপ সমগ্র মুযদালিফা উকূফের স্থান। তবে 'ওয়াদিয়ে মুহাসসার' থেকে দূরে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ الخ : মাসআলা : আরাফায় দুই নামাজ একত্রে আদায় করার পর ইমাম ও লোকসকল উকূফের স্থানের দিকে যাবেন এবং পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করবেন। এই পাহাড়ের নাম 'জাবালে রহমত'। আর উকূফের এ স্থানের নাম 'মাওকাফে আ'যম'। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَعَرَفَاتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ الخ : 'বাতনে উরানা' ছাড়া সমগ্র আরাফা হলো উকূফের স্থান। অর্থাৎ 'বাতনে উরানা' ছাড়া অবশিষ্ট সব জায়গায় অবস্থান করা যাবে। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাতনে উরানায় শয়তানকে দেখেছিলেন। এজন্য সেখানে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন। অদ্রূপ 'ওয়াদিয়ে মুহাসসার' ব্যতীত সমগ্র মুযদালিফা উকূফের স্থান।

قَالَ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عَلَى نَاقَتِهِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى قَدَمَيْهِ جَازَ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ لِمَا بَيَّنَّا وَيَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ كَذٰلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ الْمَوَاقِفِ مَا اسْتَقْبَلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ وَيَدْعُو وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَدْعُو يَوْمَ عَرَفَةَ مَادًّا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِمِ الْمِسْكِيْنِ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَإِنْ وَرَدَ الْآثَارُ بِبَعْضِ الدَّعْوَاتِ وَقَدْ أَوْرَدْنَا تَفْصِيْلَهَا فِيْ كِتَابِنَا الْمُتَرْجَمِ بِعُدَّةِ النَّاسِكِ فِيْ عِدَّةٍ مِنَ الْمَنَاسِكِ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমামের কর্তব্য হলো আরাফায় সওয়ারির উপর অবস্থান করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উষ্ট্রীর উপর অবস্থান করেছিলেন। তবে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে অবস্থান করলেও জায়েজ হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীসটির কারণে প্রথম সুরতটি উত্তম এবং কেবলামুখী হয়ে অবস্থান করা উচিত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই অবস্থান করেছিলেন এবং তিনি ﷺ বলেছেন– خَيْرُ الْمَوَاقِفِ مَا اسْتَقْبَلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ 'উত্তম উকূফ হলো যা কিবলামুখী হয়ে করা হয়।' আর ইমাম দোয়া করবেন ও লোকদেরকে হজের আহকাম শিক্ষা দেবেন। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফার দিবসে দু হাত প্রসারিত করে দোয়া করতেন–যেন মিসকিন আহার প্রার্থনা করছেন। আর ইচ্ছানুযায়ী দোয়া করবেন। যদিও কিছু কিছু দোয়া হাদীসে বর্ণিত আছে। সেগুলোর বিশদ বিবরণ আমি "عِدَّةُ النَّاسِكِ فِيْ عِدَّةٍ مِنَ الْمَنَاسِكِ" গ্রন্থে আল্লাহ প্রদত্ত তৌফিকবলে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَنْبَغِيْ لِلْإِمَامِ الخ **মাসআলা :** ইমামুল মুসলিমীনের জন্য সওয়ারির উপর আরোহণ করে অবস্থান করা উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত অনুরূপ। তবে স্বীয় পায়ের উপর দাঁড়িয়ে অবস্থান করলেও অসুবিধা নেই।

কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করা উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলও অনুরূপ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশও অনুরূপ। যেমন এক হাদীসে এসেছে– إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا وَإِنَّ شَرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ 'প্রত্যেক জিনিসেরই ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ রয়েছে। আর বৈঠকের ভদ্রতা হলো, কিবলামুখী হয়ে বসা।' অপর এক বর্ণনায় এসেছে– أَكْرَمُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ 'উত্তম বৈঠক হলো, যা কিবলামুখী হয়ে করা হয়।'

قَوْلُهُ وَيَدْعُوْ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الخ : যেসব দোয়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত দোয়াটি নিম্নরূপ–

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ أَكْثَرُ دُعَائِيْ وَدُعَاءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا . اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ . (عِنَايَة)

قَالَ وَيَنْبَغِى النَّاسَ اَنْ يَقِفُوْا بِقُرْبِ الْاِمَامِ لِاَنَّهُ يَدْعُوْ وَيُعَلِّمُ فَيَعُوْا وَيَسْتَمِعُوْا وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَقِفُوْا وَرَاءَ الْاِمَامِ لِيَكُوْنَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَهٰذَا بَيَانُ الْاَفْضَلِيَّةِ لِاَنَّ عَرَفَاتٍ كُلَّهَا مَوْقِفٌ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا قَالَ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَيَجْتَهِدَ فِىْ الدُّعَاءِ اَمَّا الْاِغْتِسَالُ فَهُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَوِ اكْتَفٰى بِالْوُضُوْءِ جَازَ كَمَا فِىْ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَعِنْدَ الْاِحْرَامِ وَاَمَّا الْاِجْتِهَادُ فَلِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِجْتَهَدَ فِى الدُّعَاءِ فِىْ هٰذَا الْمَوْقِفِ لِاُمَّتِهِ فَاسْتُجِيْبَ لَهُ اِلَّا فِى الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মানুষের কর্তব্য হলো ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করা। কেননা, তিনি দোয়া করবেন এবং শিক্ষাদান করবেন। ফলে লোকেরা তা শুনতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। আর তাদের উচিত হলো ইমামের পেছনে অবস্থান গ্রহণ করা যাতে তারা কিবলামুখী হতে পারে। আর এটি হলো উত্তম হওয়ার বিবরণ। কেননা, আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, সমগ্র আরাফা হলো উকূফের স্থান। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আরাফায় অবস্থানের পূর্বে গোসল করা এবং খুব মনোযোগ সহকারে দোয়া করা মোস্তাহাব। গোসল করা সুন্নত; ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ যদি শুধু অজু করে, তাহলেও জায়েজ হবে। যেমন– জুমা, দুই ঈদ ও ইহ্‌রামের সময়। আর খুব মনোযোগ দিয়ে দোয়া করা– এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে অবস্থান ক্ষেত্রে স্বীয় উম্মতের জন্য অতি মনোযোগ দিয়ে দোয়া করেছিলেন। আর খুন-খারাবি ও জুলুমের অপরাধ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তাঁর দোয়া কবুল করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَنْبَغِى النَّاسَ الخ : এ ইবারত দ্বারা দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১. হাজী আরাফার ময়দানে ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করবে, যাতে ইমামের বক্তব্য শুনতে পায়।

২. ইমামের পেছনে অবস্থান করবে, যাতে ইমামের মতো কিবলামুখী হতে পারে। তবে এ বিধান ওয়াজিব নয়; বরং এটা উত্তম।

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَغْتَسِلَ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, আরাফায় অবস্থানের পূর্বে গোসল করা ও খুব মনোযোগ সহকারে দোয়া করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ ওয়াজিব নয়। মোস্তাহাবের ব্যাখ্যায় হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আরাফায় অবস্থানের পূর্বে গোসল করা সুন্নত; ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ যদি শুধু অজু করে, তাহলেও জায়েজ হবে। যেমন– জুমা, দুই ঈদ ও ইহ্‌রামের সময় গোসল করা সুন্নত; কিন্তু কেউ যদি শুধুমাত্র অজু করে, তাহলেও জায়েজ আছে। আর মনোযোগ সহকারে দোয়া করা মোস্তাহাব এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থানে থেকে স্বীয় উম্মতের জন্য অতি মনোযোগ সহকারে দোয়া করেছিলেন। তবে অন্যায়ভাবে হত্যা ও জুলুমের অপরাধ যা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত; তা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তাঁর দোয়া কবুল করা হয়েছে।

وَيُلَبِّيْ فِيْ مَوْقِفِهٖ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ كَمَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ لِاَنَّ الْاِجَابَةَ بِاللِّسَانِ قَبْلَ الْاِشْتِغَالِ بِالْاَرْكَانِ وَلَنَا مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَازَالَ يُلَبِّيْ حَتّٰى اَتٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلِاَنَّ التَّلْبِيَةَ فِيْهِ كَالتَّكْبِيْرِ فِى الصَّلٰوةِ فَيَاْتِىْ بِهَا اِلٰى اٰخِرِ جُزْءٍ مِنَ الْاِحْرَامِ قَالَ وَاِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَفَاضَ الْاِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهٗ عَلٰى هِيْنَتِهِمْ حَتّٰى يَاْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفَعَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَلِاَنَّ فِيْهِ اِظْهَارَ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ فِى الطَّرِيْقِ عَلٰى هِيْنَتِهٖ.

অনুবাদ : আর উকূফের স্থানে ক্ষণে ক্ষণে তালবিয়া পড়বে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, আরাফায় উকূফের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। কেননা, মৌখিক সাড়া দানের সময় হলো রুকনসমূহে ব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর আমাদের দলিল হলো– এ মর্মে বর্ণিত হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত লাগাতার তালবিয়া পড়েছেন। তা ছাড়া হজের তালবিয়া হলো নামাজের তাকবীরের ন্যায়। সুতরাং ইহ্রামের শেষ ভাগ পর্যন্ত তা বলবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ইমাম ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য লোকেরা ধীরস্থির যাত্রা করে মুযদালিফায় আগমন করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হয়েছিলেন। তা ছাড়া এতে মুশরিকদের প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ করা হয়। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ পথে তাঁর সওয়ারিতে ধীরস্থিরভাবে চলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيُلَبِّىْ فِىْ مَوْقِفِهٖ الخ মাসআলা : হাজী আরাফার মাঠে স্বীয় অবস্থানের ক্ষেত্রে বারবার তালবিয়া পড়বে। জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্ত এ আমল বজায় রাখবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, আরাফায় উকূফের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে। তার দলিল হলো, তালবিয়া দ্বারা মৌখিক সাড়া দান করা হয়। আর মৌখিক সাড়া দানের সময় হলো হজের রুকনসমূহে ব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং যখনই হজের রুকন তথা উকূফে আরাফা শুরু হবে তখনই তালবিয়া বন্ধ করে দেবে।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ [জামরাতুল আকাবায়] পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত বারবার তালবিয়া পাঠ করেছেন। দ্বিতীয়ত দলিল হলো, হজের মধ্যে তালবিয়া পড়া, নামাজের তাকবীরের ন্যায়। আর নামাজের মধ্যে [নামাজের] শেষ পর্যন্ত তাকবীর রয়েছে। সুতরাং এর উপর কিয়াস করে তালবিয়াও ইহ্রামের শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। তবে প্রশ্ন হয়, কিয়াস অনুযায়ী তো পাথর নিক্ষেপের সময়ও তালবিয়া পড়া উচিত। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং জামরাতুল আকাবায় প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সময়ই তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হয়।

এর উত্তর হলো, কিয়াস অনুযায়ী এমনটি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ইজমা ও হাদীসের কারণে এ কিয়াসকে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ الخ মাসআলা : ৯ ই জিলহজ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরিব নামাজ আদায় না করেই ইমাম ও হাজী সকলে ধীরস্থিরভাবে যাত্রা করে মুযদালিফা আগমন করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দলিল হলো, এতে মুশরিকদের প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ করা হয়। কেননা, অন্ধকার যুগে মুশরিকরা আরাফা থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে রওয়ানা হতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফয়া যাওয়ার পথে তার সওয়ারি 'কাসওয়া' -এর উপর খুবই ধীরস্থিরভাবে চলতেন।

فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُجَاوِزْ حُدُوْدَ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُفِضْ مِنْ عَرَفَةَ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ فِيْ مَقَامِهِ كَيْلَا يَكُوْنَ آخِذًا فِي الْأَدَاءِ قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَوْ مَكَثَ قَلِيْلًا بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَإِفَاضَةِ الْإِمَامِ لِخَوْفِ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ (رض) بَعْدَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ دَعَتْ بِشَرَابٍ فَأَفْطَرَتْ ثُمَّ أَفَاضَتْ قَالَ وَإِذَا أَتَى مُزْدَلِفَةَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْمِيْقَدَةُ يُقَالُ لَهُ قُزَحُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عِنْدَ هٰذَا الْجَبَلِ وَكَذَا عُمَرُ (رض) وَيَتَحَرَّزُ فِي النُّزُوْلِ عَنِ الطَّرِيْقِ كَيْلَا يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ فَيَنْزِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ يَسَارِهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ وَرَاءَ الْإِمَامِ لِمَا بَيَّنَّا فِي الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ ـ

অনুবাদ : আর যদি ভিড়ের আশঙ্কায় [হাজী] ইমামের পূর্বে যাত্রা করে, কিন্তু আরাফার সীমানা অতিক্রম না করে, তাহলে তা তার জন্য জায়েজ হবে। কেননা, সে তো আরাফা ত্যাগ করেনি। তবে উত্তম হলো, নিজের স্থানেই সে অবস্থান করবে, যেন সে যথাসময়ের পূর্বে আদা শুরুকারী না হয়। আর যদি ভিড়ের আশঙ্কায় সূর্য অস্ত যাওয়ার পর এবং ইমামের যাত্রা করার পর সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তাহলে কোনো দোষ নেই। কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) ইমামের যাত্রা করার পর পানীয় চেয়ে পাঠালেন এবং ইফতার করলেন, এরপর রওয়ানা হলেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুযদালিফায় আসার পর মোস্তাহাব হলো ঐ পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করা, যার উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করা হতো। ঐ পাহাড়ের নাম[১] 'কুযাহ'। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পাহাড়ের নিকট অবস্থান করেছিলেন। তদ্রূপ হযরত ওমর (রা.)ও [অবস্থান করেছিলেন।] চলাচলের পথে অবস্থান করা পরিহার করবে যাতে পথচারীদের কষ্ট না হয়। সুতরাং পথের ডানে কিংবা বামে অবস্থান করবে। আর ইমামের পিছনে অবস্থান করা মোস্তাহাব, আরাফায় অবস্থান প্রসঙ্গে যে কথা আমরা বলেছি, সে কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ الخ : মাসআলা হলো, যদি হাজী ভিড়ের আশঙ্কায় ইমামের পূর্বে আরাফা থেকে রওয়ানা করে, কিন্তু আরাফার সীমানা অতিক্রম না করে তাহলে তা জায়েজ। কেননা, সে আরাফা ত্যাগ করেনি। তবে তা উত্তমতার পরিপন্থি। উত্তম হলো নিজের স্থানেই অবস্থান করা, যাতে সময়ের পূর্বে আরাফা থেকে যাত্রা করা পাওয়া না যায়।

উল্লিখিত ইবারত থেকে বুঝা যায় যে, যদি ইমাম যাত্রা করার পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানা অতিক্রম করে, তাহলে তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। তবে যদি সে সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফায় ফিরে আসে অতঃপর ইমামের সাথে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর যাত্রা করে, তাহলে কুরবানি দিতে হবে না। কিন্তু যদি সে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে ফিরে আসে, তাহলে তাকে কুরবানি দিতে হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, হাজী যদি ভিড়ের আশঙ্কায় সূর্যাস্ত যাওয়ার পরে ও ইমামের যাত্রার পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) আরাফা থেকে ইমাম যাত্রা করার পরে পানীয় চেয়ে ইফতার করেছেন, তারপর রওয়ানা হয়েছেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, পানীয় চাওয়া ও ইফতার করতে কিছু সময় বিলম্বিত হয়েছে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, ইমাম যাত্রা করার ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরাফায় কিছু সময় অপেক্ষা করতে কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ وَإِذَا أَتَى مُزْدَلِفَةَ الخ : 'জাবালে কুযাহ'-এর কাছাকাছি অবস্থান করা হাজীর জন্য মোস্তাহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করেছিলেন এবং হযরত ওমর (রা.)-ও এখানে অবস্থান করেছিলেন। হাজী চলাচলের পথে অবস্থান করবে না; বরং পথের ডানে কিংবা বামে অবস্থান করবে। কেননা, রাস্তায় অবস্থান করার দ্বারা পথচারীদের কষ্ট হয়। আর হাজীর জন্য মুযদালিফায় ও ইমামের পিছনে অবস্থান করা মোস্তাহাব। দলিল হলো তা-ই যা আমরা আরাফায় অবস্থান প্রসঙ্গে বলেছি।

১. قُزَحُ 'ক্বাফ' পেশযুক্ত ও 'যা' যবরযুক্ত। এ শব্দটি قَزَحَ [উঁচু হওয়া] থেকে গৃহীত। উঁচু হওয়ার কারণে এ পাহাড়ের নাম 'কুযাহ' রাখা হয়েছে। অন্ধকার যুগে এ পাহাড়ের উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করা হতো। বাদশাহ্ হারুনুর রশীদের সময়কালে এ পাহাড়ে মোমবাতি জ্বালানো হতো। আর তৎপরবর্তী সময়ে সেখানে বড় বড় বাতি জ্বালানো হতো।

قَالَ وَيُصَلِّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ اِعْتِبَارًا بِالْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَلَنَا رِوَايَةُ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَلِاَنَّ الْعِشَاءَ فِىْ وَقْتِهٖ فَلَا يُفْرَدُ بِالْاِقَامَةِ اِعْلَامًا بِخِلَافِ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ لِاَنَّهٗ مُقَدَّمٌ عَلٰى وَقْتِهٖ فَاُفْرِدَ بِهَا لِزِيَادَةِ الْاِعْلَامِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম লোকদের নিয়ে এক আজান ও এক ইকামতে মাগরিব ও 'ইশার নামাজ আদায় করবেন। ইমাম যুফার (র.) আরাফায় দুই নামাজ একত্র করার উপর কিয়াস করে এক আজান ও দুই ইকামতের কথা বলেছেন। আমাদের দলিল হলো– হযরত জাবির (রা.)-এর বর্ণনা– রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আজান ও এক ইকামতে উভয় নামাজ একত্রে আদায় করেছিলেন। তা ছাড়া এজন্য যে, 'ইশার নামাজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং অবহিত করার জন্য আলাদা ইকামতের প্রয়োজন নেই। আরাফায় আসরের নামাজের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেটাকে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং অতিরিক্ত ঘোষণার জন্য আলাদা ইকামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, ইমাম মুযদালিফায় 'ইশার সময়ে এক আজান ও এক ইকামতে মাগরিব ও 'ইশার নামাজ একত্রে আদায় করবেন। ইমাম যুফার (র.) -এর মাযহাব হলো, এক আজান ও দুই ইকামতের সাথে [এ নামাজদ্বয় একত্রে] আদায় করবে। তিনি মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার নামাজ একত্রে আদায় করাকে, আরাফায় জোহর ও আসর নামাজ একত্রে আদায় করার উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ আরাফার মাঠে যেমন জোহর ও আসর নামাজকে এক আজান ও দুই ইকামতের সাথে একত্রে আদায় করা হয়, তেমনিভাবে মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশাকে এক আজান ও দুই ইকামতের সাথে একত্রে আদায় করতে হবে।

আমাদের দলিল হলো, হযরত জাবির (রা.) -এর বর্ণিত হাদীস– রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার নামাজ এক আজান ও এক ইকামতের মাধ্যমে একত্রে আদায় করেছেন।

দ্বিতীয় দলিল হলো, 'ইশার নামাজ তার নিজ ওয়াক্তে আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং লোকদেরকে অবহিত করার জন্য আলাদা ইকামতের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আরাফার মাঠে আসরের নামাজকে তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করা হয়, তাই লোকদেরকে অতিরিক্ত সতর্ক করার জন্য সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ইকামত দেওয়া হয়।

وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا لِاَنَّهُ يُخِلُّ بِالْجَمْعِ وَلَوْ تَطَوَّعَ اَوْ تَشَاغَلَ بِشَيْءٍ اَعَادَ الْاِقَامَةَ لِوُقُوْعِ الْفَصْلِ وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُعِيْدَ الْاَذَانَ كَمَا فِى الْجَمْعِ الْاَوَّلِ اِلَّا اَنَّا اِكْتَفَيْنَا بِاِعَادَةِ الْاِقَامَةِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ تَعَشّٰى ثُمَّ اَفْرَدَ الْاِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ وَلَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ لِهٰذَا الْجَمْعِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ وَقْتِهَا بِخِلَافِ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ لِاَنَّ الْعَصْرَ مُقَدَّمٌ عَلٰى وَقْتِهِ ـ

অনুবাদ : আর উভয় নামাজের মাঝে নফল পড়বে না। কেননা, তা উভয় নামাজের একত্রিকরণে ত্রুটি সৃষ্টি করবে। আর যদি নফল পড়ে কিংবা অন্যকোনো কাজে ব্যস্ত হয়, তাহলে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কারণে পুনরায় ইকামত দেবে। আজানও পুনরায় দেওয়া উচিত ছিল। যেমন প্রথম একত্রিভূত নামাজের বেলায় [অর্থাৎ আরাফায়]। তবে আমরা শুধু ইকামত পুনরায় দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করেছি, এজন্য যে, বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিবের নামাজ পড়েছেন, এরপর রাতের খাবার খেয়েছেন, তারপর 'ইশার নামাজের জন্য [শুধু] আলাদা ইকামত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই একত্রীকরণের জন্য জামাতের শর্তের প্রয়োজন নেই। কেননা, মাগরিবকে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করা হয়েছে। তবে আরাফায় একত্রীকরণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সেখানে আদায়কে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا الخ মাসআলা : মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার নামাজের মাঝে হাজী অন্যকোনো নফল নামাজ পড়বে না। কেননা, এতে উভয় নামাজের একত্রিকরণে ত্রুটি সৃষ্টি হয়। যদি মাগরিব ও 'ইশার মাঝে কেউ নফল নামাজ পড়ে কিংবা অন্য কোনো কাজ করে, তাহলে উভয় নামাজের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির কারণে পুনরায় ইকামত দেবে। আজানও পুনরায় দেওয়া উচিত ছিল– যেমন আরাফায় জোহর ও আসর নামাজের মাঝে ব্যবধান হলে পুনরায় আজান দিতে হয়, কিন্তু আমরা শুধু ইকামত পুনরায় দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করেছি, এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিবের নামাজ পড়েছেন, এরপর রাতের খাবার খেয়েছেন। অতঃপর 'ইশার নামাজের জন্য আলাদা ইকামত দিয়েছেন, কিন্তু আজান পুনরায় দেননি।

قَوْلُهُ وَلَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার নামাজকে একত্রিকরণের জন্য জামাত শর্ত নয়। আর আরাফায় জোহর ও আসর একত্রিকরণের জন্য জামাত শর্ত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো– মাগরিবের নামাজ মুযদালিফায় স্বীয় ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে আদায় করা হয়। আর নামাজের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পরে নামাজ আদায় করা কিয়াসের মুয়াফিক। কেননা, সকল নামাজেই কাজার বিধান প্রচলিত আছে। সুতরাং কিয়াসের মুয়াফিক হওয়ার কারণে নস অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে আরাফায় আসরকে তার সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করা হয়। আর কোনো নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করা সম্পূর্ণরূপে কিয়াস পরিপন্থি। আর যা কিয়াস পরিপন্থি সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নসের উপর আমল করা হয়। আর জোহর ও আসর একত্রিকরণের বিষয়ে যেহেতু নসের মধ্যে জামাতের কথা এসেছে সেহেতু এ ক্ষেত্রে জামাত শর্ত।

وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِى الطَّرِيْقِ لَمْ تُجْزِهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يُجْزِيْهِ وَقَدْ اَسَاءَ وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا صَلّٰى بِعَرَفَاتٍ لِاَبِىْ يُوْسُفَ اَنَّهُ اَدَّاهَا فِىْ وَقْتِهَا فَلَايَجِبُ إِعَادَتُهَا كَمَا بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا اَنَّ التَّاخِيْرَ مِنَ السُّنَّةِ فَيَصِيْرُ مُسِيْئًا بِتَرْكِهِ وَلَهُمَا مَا رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِاُسَامَةَ فِىْ طَرِيْقِ الْمُزْدَلِفَةِ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ مَعْنَاهُ وَقْتُ الصَّلٰوةِ وَهٰذَا إِشَارَةٌ إِلَى اَنَّ التَّاخِيْرَ وَاجِبٌ وَإِنَّمَا وَجَبَ لِيُمْكِنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ لِيَصِيْرَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ فَسَقَطَتِ الْإِعَادَةُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ পথে আদায় করবে- ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ নামাজই তার জন্য যথেষ্ট হবে, তবে সে মন্দ কাজ করল। একই মতানৈক্য রয়েছে যদি মাগরিবের নামাজ আরাফায় পড়ে থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, সে তো উক্ত নামাজ তার ওয়াক্তেই আদায় করেছে, সুতরাং পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যেমন– ফজর উদিত হওয়ার পরে আদায় করা হয়। তবে যেহেতু বিলম্ব করা সুন্নত ছিল, সেহেতু তা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি হযরত উসামা (রা.)-কে মুযদালিফার পথে বলেছেন– اَلصَّلٰوةُ اَمَامَكَ [নামাজ তোমার সম্মুখে] এর অর্থ নামাজের ওয়াক্ত। এ কথা এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, বিলম্ব করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব হওয়ার কারণ যেন মুযদালিফায় দুই নামাজ একত্রে আদায় করা সম্ভব হয়। সুতরাং যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়, ততক্ষণ পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে, যাতে সে উভয় নামাজকে একত্রে আদায় করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে ফজর উদিত হয়ে যাওয়ার পর একত্রিত করা সম্ভব নয়। যেহেতু পুনরায় আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি হাজী মাগরিবের নামাজ মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বে পথে আদায় করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ নামাজ শুদ্ধ হবে না; বরং সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে এ নামাজ পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। ইমাম যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)ও এ মতের পক্ষে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, নামাজ হয়ে যাবে, তবে সুন্নতের বিপরীত হওয়ার কারণে সে গুনাহগার হবে। একই মতানৈক রয়েছে– যখন মাগরিবের নামাজ আরাফাতে আদায় করে। অর্থাৎ এ সুরতেও ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাগরিবের নামাজ শুদ্ধ হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.)-এর দলিল হলো, ঐ ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ তার ওয়াক্তেই আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি নামাজ তার ওয়াক্তে আদায় করে তার উপর পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যেমন– সূর্য উদিত হওয়ার পর আদায় করলে পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হয় না। তবে যেহেতু এ স্থানে মাগরিবের নামাজ বিলম্ব করা সুন্নত ছিল সেহেতু তা তরক করার কারণে সে গুনাহগার হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো : আরাফা থেকে মুযদালিফায় যাওয়ার পথে উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাগরিবের নামাজ পড়ে নিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন اَلصَّلٰوةُ اَمَامَكَ 'নামাজ তোমার সম্মুখে।' অর্থাৎ মুযদালিফায়। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মাগরিবের নামাজকে বিলম্ব করা ওয়াজিব। আর মাগরিবের নামাজকে বিলম্ব করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, যাতে মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার নামাজ একত্রে আদায় করা সম্ভব হয়। সুতরাং এ দুই নামাজ একত্রিকরণের কারণে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের নামাজকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব করা হয়েছে। তবে যখন ফজর উদিত হয়ে যায় তখন উভয় নামাজকে একত্রে আদায় করা আর সম্ভব নয় বলে পুনরায় আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

قَالَ وَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ لِرِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّاهَا يَوْمَئِذٍ بِغَلَسٍ وَلِاَنَّ فِى التَّغْلِيْسِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوْفِ فَيَجُوْزُ كَتَقْدِيْمِ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ وَقَفَ وَ وَقَفَ مَعَهُ النَّاسُ فَدَعَا لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ فِىْ هٰذَا الْمَوْضِعِ يَدْعُوْ حَتّٰى رُوِىَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فَاسْتُجِيْبَ لَهُ دُعَاؤُهُ لِاُمَّتِهِ حَتَّى الدِّمَاءُ وَالْمَظَالِمُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন ফজর উদিত হবে তখন ইমাম অন্ধকারেই লোকদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। কেননা, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন ফজর অন্ধকারে পড়েছিলেন। তা ছাড়া অন্ধকারে ফজর পড়ার মাঝে উকূফের [মুযদালিফায় অবস্থানের] প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়। সুতরাং তা জায়েজ হবে। যেমন– আরাফায় আসর অগ্রবর্তী করা হয়। অতঃপর ইমাম উকূফ করবেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে উকূফ করবে। তারপর তিনি দোয়া করবেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে উকূফ করে দোয়া করেছিলেন। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এখন উম্মতের জন্য তাঁর ﷺ দোয়া কবুল করা হয়। এমনকি হত্যা করা এবং জুলুম করার অপরাধের ব্যাপারেও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الخ **মাসআলা :** কুরবানির দিবসে ফজর উদিত হলে ইমাম লোকদেরকে নিয়ে অন্ধকারেই ফজরের নামাজ আদায় করবেন। দলিল হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েত– রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দিন ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়ত: মুযদালিফায় ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়া হয় মুযদালিফায় অবস্থানের প্রয়োজনের তাগিদেই। সুতরাং যখন আরাফায় অবস্থানের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আসরকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করা জায়েজ, তদ্রূপ মুযদালিফায় অবস্থানের কারণে ফজর নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময় তথা পূর্বাকাশ ফর্সা হওয়ার পূর্বে অগ্রবর্তী করা অবশ্যই জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ وَقَفَ وَوَقَفَ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুযদালিফায় পৌছে 'জাবালে কুযাহ'-তে অবস্থান করবে এবং লোকেরাও তার সঙ্গে সেখানে অবস্থান করবে। ইমাম ও লোকেরা এ স্থানে দোয়া করবে। কেননা, এখানে দোয়া কবুল করা হয়। এর কারণ হলো, এ স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছিলেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে তাঁর ﷺ সকল দোয়া কবুল করা হয়েছে। এমনকি অন্যায়ভাবে হত্যাকারী ও জুলুমকারীকেও ক্ষমা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা অন্যায়ভাবে নিহত ও মজলুমকে এত বেশি প্রতিদান দেবেন যে তা দেখে ঐ নিহত ও মজলুম স্বীয় অপরাধীকে ক্ষমা করে দেবেন। এ কারণে হত্যাকারী ও অত্যাচারী ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হবে।

বি. দ্র : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের হত্যাকারী ও অত্যাচারীদের জন্য আরাফায় অবস্থানকালে দোয়া করেছিলেন, কিন্তু সে সময় তা কবুল হয়নি; বরং মুযদালিফায় অবস্থানকালে তা কবুল হয়েছে। সুতরাং এ প্রশ্ন অবান্তর যে, উকূফে আরাফায় তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়া কবুল না হওয়ার কথা বলেছেন আবার এখানে কবুল হওয়ার কথা বলেছেন তা কিভাবে সঠিক?

ثُمَّ هٰذَا الْوُقُوْفُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِرُكْنٍ حَتّٰى لَوْ تَرَكَهٗ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ الدَّمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) اَنَّهٗ رُكْنٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَبِمِثْلِهٖ يَثْبُتُ الرُّكْنِيَّةُ وَلَنَا مَا رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَّمَ ضَعَفَةَ اَهْلِهٖ بِاللَّيْلِ وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لِمَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَالْمَذْكُوْرُ فِيْمَا تَلَا الذِّكْرُ وَهُوَ لَيْسَ بِرُكْنٍ بِالْاِجْمَاعِ وَاِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوْبَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هٰذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ اَفَاضَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهٗ عَلَّقَ بِهٖ تَمَامَ الْحَجِّ وَهٰذَا يَصْلُحُ اَمَارَةً لِلْوُجُوْبِ غَيْرَ اَنَّهٗ اِذَا تَرَكَهٗ بِعُذْرٍ بِاَنْ يَكُوْنَ بِهٖ ضُعْفٌ اَوْ عِلَّةٌ اَوْ كَانَتْ اِمْرَأَةً تَخَافُ الزِّحَامَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيْنَا قَالَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا وَادِىَ مُحَسِّرٍ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ قَالَ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ اَفَاضَ الْاِمَامُ وَالنَّاسُ حَتّٰى يَأْتُوْا مِنٰى قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ عَصَمَهُ اللّٰهُ هٰكَذَا وَقَعَ فِىْ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ وَهٰذَا غَلَطٌ وَالصَّحِيْحُ اِذَا اَسْفَرَ اَفَاضَ الْاِمَامُ وَالنَّاسُ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ـ

অনুবাদ : আমাদের মতে এই উকূফ হলো ওয়াজিব; রুকন নয়। তাই কোনো ওজর ছাড়া তা তরক করলে কুরবানি ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এটা রুকন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ - [মাশ'আরুল হারামের নিকট আল্লাহর স্মরণ করো]। এ ধরনের আদেশ দ্বারা রুকন সাব্যস্ত হয়। আমাদের দলিল হলো, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেভাগে রাত্রেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি তা রুকন হতো, তাহলে তিনি তা করতেন না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যে আয়াত উল্লেখ করেছেন তাতে 'জিকির' শব্দই রয়েছে এবং এ কথার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তা রুকন নয়। আর আমরা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি জেনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী থেকে– مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هٰذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ اَفَاضَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهٗ 'যে আমাদের সঙ্গে এ অবস্থান ক্ষেত্রে অবস্থান করল এবং সে ইতঃপূর্বে আরাফা থেকে উকূফ করে এসেছে, তার হজ পূর্ণ হয়ে গেল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ হজের পূর্ণতাকে উক্ত উকূফের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর এটি ওয়াজিবের আলামত হওয়ার যোগ্য। তবে যদি ওজর, যেমন দুর্বলতা বা অসুস্থতা বা স্ত্রীলোক ভিড়ের কারণে তরক করে, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হবে না। দলিল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'ওয়াদিয়ে মুহাসসার' ছাড়া সমগ্র মুযদালিফাই উকূফের স্থান। দলিল হলো ইতঃপূর্বে আমরা যে হাদীস উল্লেখ করেছি তা। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সূর্য উদিত হবে তখন ইমাম ও অন্যান্য লোকেরা যাত্রা করে মিনায় আগমন করবে। নগণ্য বান্দা [অর্থাৎ গ্রন্থকার স্বয়ং] বলেন, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন। 'মুতখতাসারুল কুদূরী'র বিভিন্ন নুসখায় এরূপই রয়েছে। কিন্তু এটা ভুল। সঠিক হলো যখন ইসফার তথা ফর্সা হয়ে যাবে, তখনই ইমাম ও অন্যান্য লোকেরা যাত্রা করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা হয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ هٰذَا الْوُقُوْفُ ال : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, আমাদের মতে মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব, রুকন নয়। সুতরাং কেউ যদি ওজর ছাড়া তা তরক করে, তাহলে তার উপর দম [কুরবানি] ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুযদালিফায় অবস্থান হজের রুকন। ইনায়া (عناية) গ্রন্থকার 'নিহায়া'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দিকে এ মতের সম্পৃক্তি লেখকের ভুলবশত হয়েছে। কেননা, শাফেয়ীদের কিতাবে মুযদালিফায় অবস্থানকে সুন্নত বলা হয়েছে। 'মাবসূত'-এ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর স্থলে লাইছ ইবনে সাদ -এর নাম বর্ণিত হয়েছে। আর 'কিতাবুল আসরার' -এ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পরিবর্তে আলক্বামার নাম এসেছে। আবার 'ফতোয়ায়ে কাজী খান' -এ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর স্থলে ইমাম মালিক (র.)-এর কথা এসেছে। যাহোক, হিদায়া গ্রন্থকারের এ মতকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দিকে সম্পৃক্ত করা যদিও ভুল তথাপি তিনি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পক্ষে দলিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ 'আর যখন তোমরা আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন কর তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট আল্লাহর স্মরণ করো।' আর মাশ'আরুল হারাম মুযদালিফায় অবস্থিত। সুতরাং মাশ'আরুল হারামে আল্লাহর জিকির তখনই সম্ভব হয় যখন হাজী মুযদালিফায় উপস্থিত হয়ে মাশ'আরুল হারামে অবস্থান করবে। এ আয়াত দ্বারা যিকরুল্লাহ [আল্লাহর স্মরণ] রুকন হওয়া সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেভাগে রাত্রেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মুযদালিফায় অবস্থান ছাড়াই মিনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ নির্দেশও দেন যে, তারা যেন জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ না করে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। যদি মুযদালিফায় অবস্থান করা রুকন হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটি করতেন না তথা দুর্বলদেরকে আগেভাগে পাঠাতেন না। কেননা, ওজরের কারণে রুকন ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উল্লিখিত দলিলের জবাব হলো, আয়াতে 'জিকির'-এর কথা উল্লেখ আছে। আর এ কথার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত যে, জিকির রুকন নয়। সুতরাং 'জিকির' যার উপর মওকূফ তথা মুযদালিফায় অবস্থানও রুকন হতে পারে না। তবে মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব হওয়া হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমাদের সঙ্গে মুযদালিফায় অবস্থান করল এবং ইতঃপূর্বে আরাফায় উকূফ করেছে, তার হজ পূর্ণ হয়ে গেছে। এ হাদীসে হজের পূর্ণতাকে মুযদালিফায় অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর সম্পৃক্ত করা হলো ওয়াজিব হওয়ার আলামত। সতরাং মুযদালিফায় অবস্থান করা হলো ওয়াজিব। তবে কেউ যদি ওজর বশত মুযদালিফায় অবস্থান না করে, তাহলে তার উপর দম কিংবা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। যেমন– قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ الخ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ওজর হলো– হাজী দুর্বল হওয়া, অসুস্থ হওয়া, কিংবা স্ত্রীলোক ভিড়ের আশঙ্কা করা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ قَالَ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, কুরবানির দিবসের সূর্য উদিত হওয়ার পর ইমাম ও লোকেরা মুযদালিফা থেকে যাত্রা করে মিনায় গমন করবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীর বিভিন্ন নুসখায় এরূপই রয়েছে যে, সূর্য উদিত হওয়ার পর মুযদালিফায় যাত্রা করবে। অথচ এটা লেখকের ভুল; বরং সঠিক হলো, সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে গেলে ইমাম ও অন্যান্য লোকেরা যাত্রা করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তবে আমাদের বক্তব্য হলো, ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্ত ইবারত সঠিক। কেননা, إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ -এর অর্থ– إِذَا قَرُبَتْ إِلَى الطُّلُوْعِ অর্থাৎ 'যখন সূর্য উদিত হওয়ার সময় হবে।' সুতরাং উভয় নুসখার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

قَالَ فَيَبْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا اَتٰى مِنٰى لَمْ يَعْرُجْ عَلٰى شَئٍ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ لاَ يُؤْذِىْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর 'জামরাতুল আকাবা' থেকে শুরু করবে। অর্থাৎ 'বাতনুল ওয়াদী'র দিক থেকে উক্ত জামরার প্রতি আঙ্গুলের মাথায় রেখে ছুঁড়ে মারার মতো ছোট ছোট সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিনায় আগমন করলেন, তখন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত কোথাও নামেননি এবং তিনি বলেছেন– عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ لاَ يُؤْذِىْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 'তোমরা আঙ্গুলের মাথায় রেখে ছুঁড়ে মারার মতো ছোট ছোট কঙ্কর নাও, যাতে তোমাদের একে অপরকে আঘাত না দেয়।'

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رَمْى [রমী] সম্পর্কিত ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– ১. সময় : ইয়াওমুন নাহর ও পরবর্তী তিন দিন। ২. স্থান : বাতনুল ওয়াদী। ৩. তিনটি জামরায় رَمْى করতে হয় : তা হলো– জামরাতুল আকাবা, মাসজিদুল খায়ফ ও জামরাতুল ওসতা। ৪. পাথরের সংখ্যা : প্রতিটি জামরায় ৭টি করে কঙ্কর। ৫. পাথর : আঙ্গুল পরিমাণ বড় হবে। ৬. রমীর পদ্ধতি : তা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ৭. রমীর পরিমাণ : তাও কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ৮. পাথর নিক্ষেপকারী : আরোহী কিংবা পায়ে হেঁটে রমী করবে। ৯. পাথর নিক্ষেপের পর তা পতিত হওয়ার স্থান ১০. যে স্থান থেকে পাথর সংগ্রহ করা হবে- এ দুটির বর্ণনা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। ১১. পাথরের ধরন : মাটি জাতীয় তথা মাটির যে কোনো অংশবিশেষ। ১২. প্রথম দিনে শুধু জামরাতুল আকাবায় رَمْى করবে আর বাকি দিনগুলোতে তিনটি জামরায় رَمْى করবে।

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, জামরাতুল আকাবা থেকে رَمْى শুরু হবে। বাতনুল ওয়াদীর দিক থেকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এসব কঙ্কর আঙ্গুল সমপরিমাণ বড় হবে– যা বৃদ্ধাঙ্গুলির পৃষ্ঠে স্থাপন করে শাহাদাত আঙ্গুলের সাহায্যে নিক্ষেপ করবে। দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিনায় আগমন করলেন তখন সেখানে আসলেন এবং জামরাতুল আকাবায় رَمْى করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা আবশ্যক। তবে তোমরা একে অপরকে কষ্ট দেবে না।

وَلَوْ رَمٰى بِاَكْبَرَ مِنْهُ جَازَ لِحُصُوْلِ الرَّمْيِ غَيْرَ اَنَّهُ لَا يَرْمِيْ بِالْكَبِيْرِ مِنَ الْاَحْجَارِ كَيْلَا يَتَاَذّٰى بِهٖ غَيْرُهٗ وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ اَجْزَاَهُ لِاَنَّ مَا حَوْلَهَا مَوْضَعُ النُّسُكِ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ لِمَا رَوَيْنَا وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَذَا رَوٰى ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عُمَرَ (رضـ) وَلَوْ سَبَّحَ مَكَانَ التَّكْبِيْرِ اَجْزَاَهُ لِحُصُوْلِ الذِّكْرِ وَهُوَ مِنْ اٰدَابِ الرَّمْيِ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ اَوَّلِ حَصَاةٍ لِمَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَ رَوٰى جَابِرٌ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ اَوَّلِ حَصَاةٍ رَمٰى بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ـ

অনুবাদ : আর যদি এর চেয়ে বড় পাথর নিক্ষেপ করে, তাহলেও জায়েজ হবে। কেননা, নিক্ষেপের উদ্দেশ্য তো হাসিল হয়ে যায়। তবে বড় পাথর নিক্ষেপ করবে না, যাতে অন্য কেউ তার দ্বারা কষ্ট না পায়। যদি আকাবার উপর দিক থেকে নিক্ষেপ করে, তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা, তার চতুষ্পার্শ্বই সংশ্লিষ্ট আমল আদায় করার স্থান। তবে উত্তম হলো 'বাতনুল ওয়াদী' থেকে নিক্ষেপ করা– আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.) এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর যদি তাকবীরের স্থলে তাসবীহ পড়ে তবুও যথেষ্ট হবে। কেননা, এতে জিকির হাসিল হয়ে যায়। আর জিকিরই হলো কঙ্কর নিক্ষেপের আদব। আর এ স্থলে বিলম্ব করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে বিলম্ব করেননি। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে। তার কারণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে আমরা বর্ণনা করেছি। আর হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবায় প্রথম কঙ্করটি নিক্ষেপের সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কঙ্করের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আঙ্গুলের ন্যায় মোটা ও লম্বা হবে। তবে এর চেয়ে বড় পাথর নিক্ষেপ করাও জায়েজ আছে। কেননা, নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য এতে হাসিল হয়। তবে সতর্কতাবশত বড় পাথর নিক্ষেপ করবে না যাতে কেউ কষ্ট না পায়।

উত্তম হলো 'বাতনে ওয়াদী' থেকে رَمْي করা। তবে আকাবার উপর থেকে رَمْي করলেও জায়েজ হবে। কেননা, জামরার চতুষ্পার্শ্বই সংশ্লিষ্ট আমল আদায় করার স্থান।

প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবে। যেমন– হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীস থেকে বুঝা যায়। তবে তাকবীরের স্থলে তাসবীহ্ পড়াও জায়েজ। কেননা, এতে জিকির হাসিল হয়ে যায়। আর জিকিরই হলো কঙ্কর নিক্ষেপের আদব।

হাজী জামরায়ে আকাবায় বিলম্ব করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে বিলম্ব করেননি। আর প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। কেননা, হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত জাবির (রা.) -এর হাদীসে এমনটি উল্লেখ রয়েছে।

ثُمَّ كَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ اَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ عَلٰى ظَهْرِ اِبْهَامِهِ الْيُمْنٰى وَيَسْتَعِيْنُ بِالْمُسَبِّحَةِ وَمِقْدَارُ الرَّمْيِ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الرَّمْيِ وَبَيْنَ مَوْضَعِ السُّقُوْطِ خَمْسَةُ اَذْرُعٍ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ يَكُوْنُ طَرْحًا وَلَوْ طَرَحَهَا طَرْحًا اَجْزَاهُ لِاَنَّهُ رَمٰى اِلٰى قَدَمَيْهِ اِلَّا اَنَّهُ مُسِيْءٌ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ وَلَوْ وَضَعَهَا لَمْ يُجْزِهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِرَمْيٍ وَلَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيْبًا مِنَ الْجَمْرَةِ يَكْفِيْهِ لِاَنَّ هٰذَا الْقَدْرَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَوْ وَقَعَتْ بَعِيْدًا مِنْهَا لَا يُجْزِيْهِ لِاَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ قُرْبَةً اِلَّا فِيْ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ وَلَوْ رَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً فَهٰذِهِ وَاحِدَةٌ لِاَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ تَفَرُّقُ الْاَفْعَالِ وَيَاْخُذُ الْحَصٰى مِنْ اَيِّ مَوْضَعٍ شَاءَ اِلَّا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ لِاَنَّ مَا عِنْدَهَا مِنَ الْحَصٰى مَرْدُوْدٌ هٰكَذَا جَاءَ فِى الْاَثَرِ فَيَتَشَاءَمُ بِهِ وَمَعَ هٰذَا لَوْ فَعَلَ اَجْزَاهُ لِوُجُوْدِ فِعْلِ الرَّمْيِ .

অনুবাদ : কঙ্কর নিক্ষেপের নিয়ম হলো, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পৃষ্ঠে কঙ্কর স্থাপন করবে এবং শাহাদাত আঙ্গুলির সাহায্যে নিক্ষেপ করবে। নিক্ষেপের দূরত্বের পরিমাণ হলো নিক্ষেপের স্থান এবং কঙ্কর পড়ার স্থানের মাঝে পাঁচ হাত দূরত্ব হবে। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। কেননা, এর কম পরিমাণে নিক্ষেপ হবে না, বরং ফেলে দেওয়া হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়, তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা, এটা পায়ের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। তবে সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে সে গুনাহগার হবে। আর যদি জামরার উপর কঙ্কর রেখে দেয়, তাহলে যথেষ্ট হবে না। কেননা, তা তো রমী হলো না। আর যদি কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং তা জামরার নিকটে গিয়ে পড়ে, তাহলেও জায়েজ হবে। কেননা, এ পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। যদি জামরাহ থেকে দূরে গিয়ে পড়ে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, কঙ্কর নিক্ষেপ নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া ইবাদতরূপে গণ্য নয়। যদি সাতটি কঙ্কর একত্রে নিক্ষেপ করে, তাহলে তা একবার বলে গণ্য হবে। কেননা, শরিয়তের স্পষ্ট নির্দেশ হলো কাজটি পৃথকভাবে করা। কঙ্কর যে স্থান থেকে ইচ্ছা সংগ্রহ করবে, তবে জামরার নিকট থেকে নয়। কেননা, তা মাকরূহ। কারণ, জামরার নিকটে পতিত কঙ্করগুলো হলো প্রত্যাখ্যাত। হাদীসে এরূপই এসেছে। সুতরাং এগুলো কুলক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। তা সত্ত্বেও যদি তা করে তবে যথেষ্ট হবে- رَمْى -এর কর্ম বিদ্যমান থাকার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ اَنْ يَضَعَ الخ : কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন, কঙ্কর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পৃষ্ঠে স্থাপন করে শাহাদাত আঙ্গুলির সাহায্যে নিক্ষেপ করবে। নিক্ষেপকারী ও কঙ্কর পড়ার স্থানের মাঝে কমপক্ষে পাঁচ হাত দূরত্ব হওয়া চাই। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

দলিল হলো, এর কম দূরত্বে নিক্ষেপকে নিক্ষেপ বলা হয় না; বরং তা হয় ফেলে দেওয়া। অথচ কঙ্কর নিক্ষেপ করা সুন্নত, ফেলে দেওয়া নয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি কঙ্কর নিক্ষেপের পরিবর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়, তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা, সে কঙ্কর পায়ের দিকে নিক্ষেপ করেছে। তবে সুন্নতের বিপরীত করার কারণে সে গুনাহগার হবে। আর যদি সে কঙ্কর রেখে দেয়, তাহলে যথেষ্ট হবে না। কেননা, তা কোনোভাবেই رَمْى হয় না।

قَوْلُهُ وَيَاْخُذُ الْحَصٰى مِنْ اَيِّ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জামরার আশপাশ ব্যতীত যেখান থেকে ইচ্ছা কঙ্কর সংগ্রহ করবে। জামরার আশপাশ থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করা মাকরূহ। কেননা, এখানকার পতিত কঙ্করগুলো প্রত্যাখ্যাত- হাদীসে এরূপই এসেছে। সুতরাং এ স্থান থেকে কঙ্কর সংগ্রহ কুলক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ যার হজ কবুল হয় না তার কঙ্কর প্রত্যাখ্যান করা হয়। মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি জামরার নিকট থেকে পাথর নিয়ে রমী করে, তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা, কঙ্কর নিক্ষেপের কর্ম পাওয়া গেছে। আর উদ্দেশ্যও তা-ই।

وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ اَجْزَاءِ الْاَرْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ فِعْلُ الرَّمْيِ وَ ذٰلِكَ يَحْصُلُ بِالطِّيْنِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحَجَرِ بِخِلَافِ مَا اِذَا رَمٰى بِالذَّهَبِ اَوْ الْفِضَّةِ لِاَنَّهُ يُسَمّٰى نَثْرًا لَا رَمْيًا قَالَ ثُمَّ يَذْبَحُ اِنْ اَحَبَّ ثُمَّ يَحْلِقُ اَوْ يُقَصِّرُ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نَرْمِيَ ثُمَّ نَذْبَحَ ثُمَّ نَحْلِقَ وَلِاَنَّ الْحَلْقَ مِنْ اَسْبَابِ التَّحَلُّلِ وَكَذَا الذَّبْحُ حَتّٰى يَتَحَلَّلَ بِهِ الْمُحْصَرُ فَيُقَدَّمُ الرَّمْيُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ الْحَلْقُ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الْاِحْرَامِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الذَّبْحُ وَاِنَّمَا عَلَّقَ الذَّبْحَ بِالْمَحَبَّةِ لِاَنَّ الدَّمَ الَّذِيْ يَأْتِيْ بِهِ الْمُفْرِدُ تَطَوُّعٌ وَالْكَلَامُ فِي الْمُفْرِدِ .

অনুবাদ : আমাদের মতে মাটির যে কোনো অংশবিশেষের দ্বারা رَمْى জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কেননা, রমী ক্রিয়াই হলো উদ্দেশ্য। আর তা মাটি দ্বারাও হাসিল হয়, যেমন পাথর দ্বারা হাসিল হয়। পক্ষান্তরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের টুকরা দ্বারা রমী করার হুকুম ভিন্ন। কেননা, একে ছিটানো বলা হয়, নিক্ষেপ নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর মনে চাইলে কুরবানি করবে। তারপর মাথা মুণ্ডাবে কিংবা ছাঁটাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন–'আমাদের আজকের দিনের প্রথম কাজ হলো রমী করা, তারপর কুরবানি করা, অতঃপর মাথা মুণ্ডানো।' তা ছাড়া মাথা মুণ্ডানো হলো হালাল হওয়ার অন্যতম উপায়। অদ্রূপ জবাই করাও একটি উপায়। তাইতো অবরুদ্ধ ব্যক্তি 'জবাই'-এর মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। সুতরাং কঙ্কর মারাকে উভয়ের উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর মাথা মুণ্ডানো হলো ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুরবানিকে তার উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর কুরবানিকে ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, হজ্জে ইফরাদকারী যে কুরবানি করে, তা হলো নফল। আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে ইফরাদকারী সম্পর্কে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ الخ : আমাদের মতে মাটির যে কোনো অংশবিশেষের দ্বারা رَمْى করা জায়েজ– চাই তা ঢিলা হোক, শুকনা মাটি হোক কিংবা পাথর হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট শুধুমাত্র পাথর দ্বারা رَمْى জায়েজ। তাঁর দলিল হলো, হাদীসে পাথরের বর্ণনা এসেছে।

আমাদের দলিল হলো, رَمْى ক্রিয়াই হলো এ স্থলে উদ্দেশ্য। আর তা যেমন পাথর দ্বারা হাসিল হয় তেমনি মাটি দ্বারাও হাসিল হয়। সুতরাং রমীর ক্ষেত্রে মাটি ও পাথর সমান। তবে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের টুকরা দ্বারা رَمْى করা জায়েজ নেই। কেননা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে ছিটানো বলা হয়, নিক্ষেপ বলা হয় না। অথচ উদ্দেশ্য হলো নিক্ষেপ করা।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَذْبَحُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর আগ্রহ থাকলে কুরবানি করবে। তারপর মাথা মুণ্ডাবে কিংবা চুল ছাঁটাবে। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আজকের দিনে তথা কুরবানির দিবসে আমাদের প্রথম কাজ হলো, কঙ্কর নিক্ষেপ করা, তারপর কুরবানি করা, তারপর মাথা মুণ্ডানো।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মাথা মুণ্ডানো ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার অন্যতম উপায়। আর কুরবানি করাও ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার একটি উপায়। তাইতো 'অবরুদ্ধ ব্যক্তি' কুরবানি করার মাধ্যমে ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং যখন মাথা মুণ্ডন ও কুরবানি করা উভয়টিই ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার উপায়, তখন কঙ্কর নিক্ষেপকে উভয়ের উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। আর মাথা মুণ্ডন যেহেতু ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু কুরবানি করাকে তার উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

আর কুরবানি করাকে তার আগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো হজ্জে ইফরাদকারী যে কুরবানি করে তা হচ্ছে নফল, ওয়াজিব নয়। আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে ইফরাদকারী সম্পর্কে।

وَالْحَلْقُ اَفْضَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالَهُ ثَلٰثًا اَلْحَدِيْثُ ظَاهِرٌ بِالرَّحْمِ عَلَيْهِمْ وَلِاَنَّ الْحَلْقَ اَكْمَلُ فِيْ قَضَاءِ التَّفَثِ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ وَفِى التَّقْصِيْرِ بَعْضُ التَّقْصِيْرِ فَاَشْبَهَ الْاِغْتِسَالَ مَعَ الْوُضُوْءِ وَيَكْتَفِىْ فِى الْحَلْقِ بِرُبُعِ الرَّأْسِ اِعْتِبَارًا بِالْمَسْحِ وَحَلْقُ الْكُلِّ اَوْلٰى اِقْتِدَاءً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالتَّقْصِيْرُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْ رُءُوْسِ شَعْرِهِ مِقْدَارَ الْاَنْمُلَةِ ـ

অনুবাদ : আর মাথা মুণ্ডানো উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বলেছেন- رحم الله المحلقين [আল্লাহ হলককারী / মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন]। হাদীসটিতে হলককারীদের প্রতি রহমের দোয়া করা হয়েছে। তা ছাড়া মাথা মুণ্ডন করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। আর এটাই হলো উদ্দেশ্য। তবে চুল ছাঁটার মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। অতএব তা অজুর তুলনায় গোসলের সদৃশ হয়ে গেছে। আর হলকের ক্ষেত্রে মাথার চার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট। 'মাথা মাসাহ্' -এর উপর কিয়াস করে একথা বলা হয়েছে। তবে পুরো মুণ্ডানোই উত্তম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণার্থে। চুল ছাঁটার নিয়ম হলো, চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ ছেঁটে ফেলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, মাথা মুণ্ডানো উত্তম। যদি কারো মাথায় চুলই না থাকে, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হলো স্বীয় মাথার উপর ক্ষুর ঘুরানো।

মাথা মুণ্ডন করা উত্তম হওয়ার দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ ـ

এ হাদীসে মাথা মুণ্ডনকারীর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার রহমতের দোয়া করেছেন। সুতরাং বারবার রহমতের দোয়া করা হলক উত্তম হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল।

দ্বিতীয় দলিল হলকের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। আর এ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডানো অধিকতর কার্যকর। এ কারণে মাথা মুণ্ডানো উত্তম। পক্ষান্তরে চুল ছাঁটার মধ্যে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। অর্থাৎ চুল ছাঁটার মধ্যে সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয় না। সুতরাং তা অজুর তুলনায় গোসলের ন্যায় হলো। অর্থাৎ যেভাবে গোসল করা অজুর তুলনায় উত্তম সেভাবে মাথা মুণ্ডানোও চুল ছাঁটার তুলনায় উত্তম।

ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য মাথার এক-চতুর্থাংশ চুল মুণ্ডানোই যথেষ্ট, যেমন অজুর মধ্যে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ্ করাই যথেষ্ট। তবে পুরো মাথা মুণ্ডানো উত্তম। কেননা, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ হয়। আর মাথার চুল ছাঁটার ক্ষেত্রে চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ ছেঁটে ফেলবে।

وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) وَإِلاَّ الطِّيْبَ أَيْضًا لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيْهِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ عِنْدَنَا خِلاَفًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لِأَنَّهُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ بِالنِّسَاءِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى تَمَامِ الْإِحْلاَلِ.

অনুবাদ : আর তার জন্য স্ত্রীসহবাস ছাড়া সবকিছু হালাল হয়ে গেছে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, তবে 'সুগন্ধি'ও ছাড়া। কেননা, তা সহবাসের প্রতি আকর্ষণকারী। আমাদের দলিল হলো, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ 'স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সবকিছু তার জন্য হালাল হয়ে গেছে।' আর হাদীস কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য। আমাদের মতে লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য কোনো ভাবে সহবাস করা তার জন্য হালাল নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আমাদের দলিল হলো, এটাও স্ত্রী দ্বারা জৈবিক চাহিদা পুরা করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পূর্ণ হালাল হওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটার পর ইহ্রামের কারণে নিষিদ্ধ সবকিছুই মুহরিমের জন্য হালাল হয়ে যায়- স্ত্রীসহবাস কিংবা সহবাসের প্রতি যা আকর্ষণ করে তা ব্যতীত। ইমাম মালিক (র.) বলেন, সহবাসের ন্যায় সুগন্ধি লাগানোও হালাল নয়। কেননা, সুগন্ধি ব্যবহার করাটা সহবাসের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে, যেমন স্ত্রীকে স্পর্শ করা কিংবা চুম্বন করা সহবাসের প্রতি আর্কষণ সৃষ্টি করে।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ 'স্ত্রীসহবাস ছাড়া [মুহরিমের জন্য মাথা মুণ্ডানোর পর] সবকিছু হালাল হয়ে গেছে।' এ হাদীস ইমাম মালিক (র.)-এর উপস্থাপিত কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য। আমাদের নিকট লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যভাবেও সহবাস করা হালাল নয়- যদিও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তা হালাল। আমাদের দলিল হলো, লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যভাবে স্ত্রীর সাথে সহবাস শাহ্ওয়াত [জৈবিক চাহিদা] পূরণ করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সেটাও পূর্ণ হালাল হওয়া তথা তওয়াফের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে।

ثُمَّ الرَّمْىُ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ التَّحَلُّلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) هُوَ يَقُوْلُ اِنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْحَلَقِ فَيَكُوْنُ بِمَنْزِلَتِهِ فِى التَّحْلِيْلِ وَلَنَا اَنَّ مَا يَكُوْنُ مُحَلِّلًا يَكُوْنُ جِنَايَةً فِىْ غَيْرِ اَوَانِهِ كَالْحَلَقِ وَالرَّمْيِ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ بِخِلَافِ الطَّوَافِ لِاَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْحَلَقِ السَّابِقِ لَا بِهِ.

অনুবাদ : আমাদের নিকট ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ কোনো উপায় নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মাথা মুণ্ডানোর ন্যায় এটাও কুরবানির দিনের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ইহ্‌রামমুক্ত করার ক্ষেত্রে এটা হলকের সমপর্যায়ের। আমাদের দলিল হলো– যা ইহ্‌রাম মুক্তকারী হবে তা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। যেমন– মাথা মুণ্ডানোর বিষয়টি। অথচ কঙ্কর নিক্ষেপ অপরাধ বলে বিবেচিত নয়। তওয়াফের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, পূর্বের মাথা মুণ্ডানোর দ্বারা ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে গেছে– তওয়াফ দ্বারা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের দ্বারা হাজী ইহ্‌রামমুক্ত হবে না। অর্থাৎ আমাদের নিকট জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের দ্বারা হাজী ইহ্‌রামমুক্ত হবে না যতক্ষণ না মাথা মুণ্ডন করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু কঙ্কর নিক্ষেপের দ্বারাই হাজী ইহ্‌রামমুক্ত হবে এবং তার জন্য স্ত্রীসহবাস ছাড়া সবকিছু হালাল হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো– জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা কুরবানির দিনের সাথে সম্পৃক্ত। আর কুরবানির দিনের সাথে যা সম্পৃক্ত তা ইহ্‌রামমুক্তকারী। যেমন– মাথা মুণ্ডানো কুরবানির দিনের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা দ্বারা ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়া যায়। সুতরাং সেভাবে কঙ্কর নিক্ষেপও ইহ্‌রামমুক্তকারী হিসেবে গণ্য হবে।

আমাদের দলিল হলো, যা ইহ্‌রামমুক্তকারী তা ইহ্‌রাম অবস্থায় অপরাধ বলে গণ্য। যেমন– মাথা মুণ্ডানো ইহ্‌রাম অবস্থায় অপরাধ বলে বিবেচ্য। আর কঙ্কর নিক্ষেপ অপরাধ নয়, এমনকি কেউ যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাহলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং এ মূলনীতির আলোকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা ইহ্‌রামমুক্তকারী হবে না।

بِخِلَافِ الطَّوَافِ الخ বলে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, বর্ণিত মূলনীতির আলোকে তওয়াফ ইহ্‌রাম অবস্থায় অপরাধ বলে বিবেচিত হওয়ার কথা। কেননা, তওয়াফে জিয়ারত দ্বারা স্ত্রীসহবাস হালাল হয়। সুতরাং তওয়াফে জিয়ারত ইহ্‌রামমুক্তকারী। আর আপনার বক্তব্য অনুসারে যা ইহ্‌রামমুক্তকারী তা ইহ্‌রাম অবস্থায় অপরাধ বলে বিবেচিত। সুতরাং তওয়াফও ইহ্‌রাম অবস্থায় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

এর জবাব হলো, তওয়াফে জিয়ারত ইহ্‌রামমুক্তকারী নয়। কেননা, ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হওয়া মাথা মুণ্ডানোর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যা পূর্বেই পাওয়া গিয়েছে; তওয়াফের দ্বারা ইহ্‌রামমুক্ত হয়নি। তবে লক্ষণীয় হলো, স্ত্রীসহবাসের পূর্বে তওয়াফ শেষ করে নেওয়া আবশ্যক।

قَالَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ مَكَّةَ اَوْ مِنَ الْغَدِ اَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِمَا رُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَلَقَ اَفَاضَ اِلٰى مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ اِلٰى مِنٰى وَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنٰى وَ وَقْتُهُ اَيَّامُ النَّحْرِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَطَفَ الطَّوَافَ عَلَى الذَّبْحِ قَالَ فَكُلُوْا مِنْهَا ثُمَّ قَالَ وَلْيَطَّوَّفُوْا فَكَانَ وَقْتُهُمَا وَاحِدًا وَاَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لِاَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَقْتُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ وَاَفْضَلُ هٰذِهِ الْاَيَّامِ اَوَّلُهَا كَمَا فِي التَّضْحِيَةِ وَفِي الْحَدِيْثِ اَفْضَلُهَا اَوَّلُهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর সেই দিন কিংবা তার পরের দিন কিংবা তার পরবর্তী দিন মক্কায় গমন করবে এবং সাত চক্কর বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফে জিয়ারত করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাথা মুণ্ডালেন, তখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লাহ তওয়াফ করলেন। অতঃপর মিনায় ফিরে এসে সেখানে জোহরের সালাত আদায় করলেন। আর তওয়াফে জিয়ারতের সময় হলো কুরবানির দিনগুলো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তওয়াফকে 'জবাই' -এর উপর عَطْف [সংযুক্ত] করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন– فَكُلُوْا مِنْهَا [অনন্তর তোমরা তা থেকে আহার করো]। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেছেন– وَلْيَطَّوَّفُوْا [আর তারা যেন তওয়াফ করে]। সুতরাং উভয়টির সময় একই হবে। আর তওয়াফের প্রথম সময় হলো কুরবানির দিনের ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে। কেননা, এর পূর্ব রাতের সময় হলো আরাফায় অবস্থানের সময়, আর তওয়াফ হলো তার পরবর্তী পর্যায়ে। আর এ দিনগুলোর মাঝে সর্বোত্তম হলো প্রথম দিন। যেমন– কুরবানির ক্ষেত্রে [প্রথম দিন সর্বোত্তম] এবং হাদীস শরীফে এসেছে– اَفْضَلُهَا اَوَّلُهَا [তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম দিনটি।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ يَوْمِهِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির দিবসে মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডানো এবং জবাই করার পরে সেদিন কিংবা ১১ কিংবা ১২ তারিখে মক্কা শরীফে গমন করবে। অতঃপর বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে। এ তওয়াফকে তওয়াফে জিয়ারত বলে। এটা হজের রুকনসমূহের মধ্যে অন্যতম।

দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মুণ্ডানোর পর মক্কা শরীফে এসে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেন। অতঃপর মিনায় গমন করেন এবং সেখানে জোহরের নামাজ আদায় করেন।

قَوْلُهُ وَوَقْتُهُ اَيَّامُ النَّحْرِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তওয়াফে জিয়ারতের সময় হলো কুরবানির দিনগুলো। অর্থাৎ ১০, ১১ ও ১২ ই জিলহজ। কেননা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ . উক্ত আয়াতে তওয়াফকে জবাইয়ের উপর عَطْف [সংযুক্ত] করা হয়েছে। আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف উভয়টির সময় একই হতে হয়, এ কারণে কুরবানি ও তাওয়াফে জিয়ারত উভয়ের সময় একই হবে, তবে পার্থক্য হলো এ দিনগুলোর পরে কুরবানি জায়েজ নেই, কিন্তু তওয়াফে জিয়ারত অপছন্দের সাথে জায়েজ। তওয়াফের প্রথম সময় ধরা হবে কুরবানির দিনের ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে। কেননা, ফজর উদিত হওয়ার পূর্বের সময়টি হলো আরাফায় অবস্থানের সময়। আর তওয়াফ উকূফে আরাফার পরবর্তী পর্যায়, অর্থাৎ আরাফায় অবস্থানের পরই পরই তওয়াফের সময়। আর তা আরাফায় অবস্থানের সময় কুরবানির দিবসের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত থাকে। সুতরাং ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে তওয়াফের সময় শুরু হবে। তবে এ দিনগুলোর মাঝে প্রথম দিন তওয়াফে জিয়ারতের জন্য উত্তম। যেমন এ দিনগুলোর মাঝে প্রথম দিন কুরবানির জন্য উত্তম এবং হাদীসে এরূপই এসেছে 'তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম দিনটি।

فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلْ فِي هٰذَا الطَّوَافِ وَلَا سَعْيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمِ السَّعْيَ رَمَلَ فِي هٰذَا الطَّوَافِ وَسَعَى بَعْدَهُ لِأَنَّ السَّعْيَ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا مَرَّةً وَالرَّمَلُ مَا شُرِعَ إِلَّا مَرَّةً فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هٰذَا الطَّوَافِ لِأَنَّ خَتْمَ كُلِّ طَوَافٍ بِرَكْعَتَيْنِ فَرْضًا كَانَ الطَّوَافُ أَوْ نَفْلًا لِمَا بَيَّنَّا قَالَ وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ لٰكِنْ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ إِذْ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَا بِالطَّوَافِ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ عَمَلَهُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ. قَالَ وَهٰذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ وَهُوَ رُكْنٌ فِيهِ إِذْ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَيُسَمّٰى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَطَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ وَيُكْرَهُ تَاخِيرُهُ عَنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ مُوَقَّتٌ بِهَا وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَسَنُبَيِّنُهُ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

অনুবাদ : যদি তওয়াফুল কুদূমের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করে থাকে, তাহলে এ তওয়াফে জিয়ারতে রমল করবে না এবং তার উপর সা'ঈও নেই। আর যদি পূর্বে সা'ঈ না করে থাকে, তাহলে এ তওয়াফে রমল করবে এবং তারপরে সা'ঈ করবে। কেননা, হজের মধ্যে সা'ঈ শুধু একবার ব্যতীত শরিয়তে প্রমাণিত নয়। আর রমল শুধু ঐ তওয়াফে একবার প্রমাণিত, যার পরে সা'ঈ রয়েছে। আর এ তওয়াফের পর দু রাকাত নামাজ আদায় করবে। কেননা আমরা যা বর্ণনা করেছি সে অনুযায়ী প্রতিটি তওয়াফের সমাপ্তি হবে দু রাকাত নামাজের দ্বারা– তওয়াফ ফরজ হোক বা নফল হোক। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এখন তার জন্য স্ত্রীসহবাস হালাল হয়ে গেল, তবে তা পূর্ববর্তী হলকের মাধ্যমে। কেননা, সেটাই হলো হালালকারী– তওয়াফের মাধ্যমে নয়, তবে হলকের কার্যকারিতাকে স্ত্রীসহবাসের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ তওয়াফই হজের ফরজ তওয়াফ এবং তা হজের রুকন। কেননা, আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে এ তওয়াফই নির্দেশিত– وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [তারা যেন প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে]। আর এটাকে طَوَافُ يَوْمِ النَّحْرِ ও طَوَافُ الْإِفَاضَةِ বলা হয়। আর তাওয়াফে জিয়ারতকে এ দিনগুলো থেকে বিলম্বিত করা মাকরূহ্। কেননা, আমরা বর্ণনা করেছি যে, এই তওয়াফ এ দিনগুলোর সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। যদি এ সময় থেকে বিলম্বিত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। জিনায়াত [হজের ত্রুটিবিষয়ক] অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ আমরা তা আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ سَعَى الخ : মাসআলা হলো, যদি হাজী তওয়াফে কুদূমের পরে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করে থাকে, তাহলে তওয়াফে জিয়ারতে রমল করবে না এবং তার উপর সা'ঈও ওয়াজিব নয়। আর যদি প্রথমে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ না করে থাকে, তাহলে এই তওয়াফের পরে রমল করবে এবং তারপর সা'ঈ করবে। কেননা, সা'ঈ একবারই শরিয়তে প্রমাণিত এবং রমলও একবার প্রমাণিত এমন তওয়াফের পরে যার পর সা'ঈ রয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ وَهٰذَا الطَّوَافُ الخ : হজের মধ্যে তওয়াফে জিয়ারত ফরজ ও রুকন। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ -এ তা-ই নির্দেশ করা হয়েছে। এ তওয়াফের অপর নাম طَوَافُ الْإِفَاضَةِ ও طَوَافُ يَوْمِ النَّحْرِ। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ তওয়াফকে কুরবানির দিনগুলো থেকে বিলম্বিত করা মাকরূহে তাহরীমী। এর দলিল তওয়াফে কুদূম-এর আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে যে, তওয়াফে জিয়ারত কুরবানির দিনগুলোর সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। তবে মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও যদি তওয়াফে জিয়ারতকে এ দিনগুলো থেকে বিলম্বিত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এর বিস্তারিত আলোচনা জিনায়াত অধ্যায়ে আসবে।

قَالَ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى مِنًى فَيُقِيْمُ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَعَ إِلَيْهَا كَمَا رَوَيْنَا وَلِاَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْىُ وَ مَوْضِعُهُ بِمِنًى فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِىْ مِنْ اَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ فَيَبْدَأُ بِالَّتِىْ تَلِىْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِى الَّتِىْ تَلِيْهَا مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِىْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذٰلِكَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا هٰكَذَا رَوٰى جَابِرٌ (رض) فِيْمَا نَقَلَ مِنْ نُسُكِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفَسَّرًا وَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ فِى الْمَقَامِ الَّذِىْ يَقِفُ فِيْهِ النَّاسُ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِىْ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَدْعُوْ لِحَاجَتِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর মিনায় ফিরে এসে সেখানেই অবস্থান করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় ফিরে এসেছিলেন, যেরূপ আমরা বর্ণনা করেছি। তা ছাড়া এজন্য যে, তার জিম্মায় رَمْى রয়ে গেছে, তার رَمْى -এর স্থান হলো মিনা। কুরবানির দিনগুলোর দ্বিতীয় দিনে যখন সূর্য হেলে পড়বে, তখন তিনটি জামরায় رَمْى করবে। মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী জামরা থেকে শুরু করবে। সেখানে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কঙ্করের সাথে তাকবীর বলবে এবং সেখানে একটু অবস্থান করবে। অতঃপর তার পরবর্তী জামরায় একইভাবে رَمْى করবে এবং সেখানেও একটু অবস্থান করবে। অতঃপর 'জামরাতুল আকাবায়' রমী করবে একইভাবে, কিন্তু সেখানে থামবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করার সময় হযরত জাবির (রা.) এভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং উভয় জামরার নিকটে লোকেরা যে স্থানে দাঁড়ায় সেখানে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা-স্তুতি জ্ঞাপন করবে, তাহলীন ও তাকবীর বলবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর উপর দরুদ পড়বে। আর নিজের যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য দোয়া করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, হাজী তওয়াফে জিয়ারতের পর মিনায় গিয়ে অবস্থান করবে। কেননা, পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফে জিয়ারতের পর মিনায় গমন করলেন এবং সেখানে জোহরের নামাজ পড়লেন।

দ্বিতীয় দলিল হলো, হাজীর জিম্মায় এখনো رَمْى রয়ে গেছে। আর রমীর স্থান হলো মিনা। এজন্য মিনায় ফিরে যাওয়া জরুরি। অতঃপর ১১ই জিলহজে যখন সূর্য হেলে পড়বে, তখন তিনটি জামরায় رَمْى করবে। মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী জামরা থেকে শুরু করবে। সে জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবে এবং সেখানে একটু থামবে। অতঃপর একইভাবে তৎসংশ্লিষ্ট জামরায় رَمْى করবে এবং এ দ্বিতীয় জামরাতেও একটু থামবে। এভাবে জামরায়ে আকাবায় رَمْى করবে, তবে সেখানে থামবে না। হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এভাবেই এসেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার নিকট ঐ স্থানে দাঁড়াবে যেখানে লোকেরা দাঁড়ায় এবং আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা করবে, তাকবীর ও তাহলীল বলবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে আর দোয়া করবে।

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُرْفَعُ الْاَيْدِيْ اِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَالْمُرَادُ رَفْعُ الْاَيْدِيْ بِالدُّعَاءِ وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ دُعَائِهِ فِيْ هٰذِهِ الْمَوَاقِفِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ ثُمَّ الْاَصْلُ اَنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ يَقِفُ بَعْدَهُ لِاَنَّهُ فِيْ وَسْطِ الْعِبَادَةِ فَيَأْتِيْ بِالدُّعَاءِ فِيْهِ وَكُلُّ رَمْيٍ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ لَا يَقِفُ لِاَنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ انْتَهَتْ وَلِهٰذَا لَا يَقِفُ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ اَيْضًا .

অনুবাদ : আর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا تُرْفَعُ الْاَيْدِيْ اِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ 'সাতস্থান ব্যতীত যেন হাত তোলা না হয়।' তন্মধ্যে দু জামরার নিকটের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আর হাত তোলা অর্থ– দোয়ার জন্য হাত তোলা। এই অবস্থানসমূহে ইমামের কর্তব্য হলো, দোয়ার সময় সকল মু'মিনের জন্য ক্ষমা চাওয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ 'হে আল্লাহ হাজীকে ক্ষমা করো এবং হাজী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকে ক্ষমা করো।' মূলনীতি হলো, যে রমীর পরে আরেকটি রমী আছে সে রমীর পরে থামবে। কেননা, এটা হলো ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়। সুতরাং এ সময় দোয়া করা সমীচীন। আর যে রমীর পরে রমী নেই তারপরে থামবে না। কেননা, ইবাদত শেষ হয়ে গেছে। এজন্য কুরবানির দিবসে জামরাতুল আকাবার পরও থামবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় অবস্থানকালে যখন দোয়া করবে তখন উভয় হাত উঠাবে, যেমন মশহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে দোয়ার সময় হাত উঠানোর কথা এসেছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এই অবস্থানসমূহে দোয়ার সময় সমস্ত মুসলমানের জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছেন– "হে আল্লাহ ! হাজীকে ক্ষমা করুন এবং হাজী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকেও ক্ষমা করুন।" এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হাজী অন্যদের জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করবে।

হিদায়া গ্রন্থকার একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, যে রমীর পরে আরেকটি رَمْيٌ রয়েছে, সে রমীর পরে থামবে। কেননা, সে ব্যক্তি এখনো ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থান করছে। এজন্য সে এ সময়ে দোয়া করবে। আর যে রমীর পরে আর কোনো رَمْيٌ নেই, তারপরে থামবে না। কেননা, এখন ইবাদতের সময় শেষ হয়ে গেছে। এজন্যই কুরবানির দিবসে জামরাতুল আকাবার পরে থামবে না।

قَالَ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذٰلِكَ وَإِنْ أَرَادَ يَتَعَجَّلُ النَّفْرَ نَفَرَ إِلٰى مَكَّةَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُّقِيْمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ فِى الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُّقِيْمَ لِمَا رُوِىَ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَبَرَ حَتّٰى رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ فِى الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَلَهُ أَنْ يَّنْفِرَ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَّنْفِرَ لِدُخُوْلِ وَقْتِ الرَّمْىِ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رح) ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এর পরদিন সূর্য হেলে পড়ার পর একইভাবে তিনটি رَمْى করবে। আর যদি জলদি চলে যেতে চায়, তাহলে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে। আর যদি অবস্থান করতে চায়, তাহলে চতুর্থ দিন সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি رَمْى করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى 'যে ব্যক্তি দু-দিনের মাথায় দ্রুত চলে যেতে চায়, তার কোনো গুনাহ নেই। আর যে বিলম্ব করতে চায় তারও কোনো গুনাহ নেই। এ বিধান তার জন্য যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে।' তবে উত্তম হলো অবস্থান করা। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চতুর্থ দিনও অপেক্ষা করেছেন তিনটি জামরার رَمْى করা পর্যন্ত। চতুর্থ দিনের ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য যাত্রা করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ফজর উদিত হওয়ার পর যাত্রা করার অবকাশ নেই। رَمْى করার সময় এসে যাওয়ার কারণে। তবে এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ الخ : মাসআলা হলো, কুরবানির দিনগুলোর তৃতীয় দিবস তথা ১২ ই জিলহজে সূর্য হেলে পড়ার পর হাজী পূর্ববর্ণিত তিনটি জামরায় রমী করবে। এখন যদি সে জলদি চলে যেতে চায়, তাহলে রমীর পরে ১২ তারিখেই সে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে। আর যদি অবস্থান করতে চায়, তাহলে চতুর্থ দিবসে তথা ১৩ ই জিলহজের সূর্য হেলে যাওয়ার পর বর্ণিত তিনটি জামরায় রমী করবে অতঃপর মক্কায় চলে যাবে। এ কারণেই ১২ ই জিলহজকে يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ও ১৩ ই জিলহজকে يَوْمُ النَّفْرِ الثَّانِىْ বলা হয়।

দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– (الاية) فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দু-দিনের মাথায় জলদি চলে যেতে চায়, তার কোনো গুনাহ নেই। আবার যে বিলম্ব করতে চায় তারও কোনো গুনাহ নেই।' তবে উত্তম হলো ১৩ ই জিলহজ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ চতুর্থ দিন পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করেছেন তথা ১৩ ই জিলহজেও তিনটি জামরাহতে রমী করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَّنْفِرَ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, ১৩ ই জিলহজ ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাজীর জন্য যাত্রা করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ১৩ ই জিলহজ ফজর উদিত হওয়ার পর তার জন্য যাত্রা করার অবকাশ নেই, যতক্ষণ না সে رَمْى করে। কেননা, ততক্ষণে রমীর সময় আরম্ভ হয়ে গেছে। তবে এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, ১২ ই জিলহজ সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই [মিনা ত্যাগ করে মক্কার উদ্দেশ্যে] যাত্রা করার অবকাশ শেষ হয়ে যাবে।

وَاِنْ قَدَّمَ الرَّمْىَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ يَعْنِى الْيَوْمَ الرَّابِعَ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) هٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَقَالَا لَا يَجُوْزُ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْاَيَّامِ وَاِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِىْ رُخْصَةِ النَّفَرِ فَاِذَا لَمْ يَتَرَخَّصْ اِلْتَحَقَ بِهَا وَمَذْهَبُهُ مَرْوِىٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) وَلِاَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ اَثَرُ التَّخْفِيْفِ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ فِىْ حَقِّ التَّرْكِ فَلَاَنْ يَظْهَرَ فِىْ جَوَازِهِ فِى الْاَوْقَاتِ كُلِّهَا اَوْلٰى بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَالثَّانِىْ حَيْثُ لَا يَجُوْزُ الرَّمْىُ فِيْهِمَا اِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ فِى الْمَشْهُوْرِ مِنَ الرِّوَايَةِ لِاَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَرْكُهُ فِيْهِمَا فَبَقِىَ عَلَى الْاَصْلِ الْمَرْوِىِّ ـ

অনুবাদ : আর যদি এ দিনে অর্থাৎ চতুর্থ দিনে ফজর উদিত হওয়ার পর সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে رَمْى করে ফেলে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে। এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। অন্যান্য দিনের উপর কিয়াস করে সাহেবাইন বলেন, তা জায়েজ হবে না। কেননা, অন্যান্য দিনের সাথে পার্থক্য ছিল শুধু [মক্কা অভিমুখে] যাত্রার অবকাশের ক্ষেত্রে। আর যখন সে অবকাশ গ্রহণ করল না, তখন এ দিনটিও অন্যান্য দিনের নিয়মের সাথে যুক্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তা ছাড়া এ জন্য যে, রমী না করার ক্ষেত্রেই যখন এ দিনটিতে শিথিলতার ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে, তখন যে কোনো সময় رَمْى করার বৈধতার ক্ষেত্রে শিথিলতার ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ঐ দু-দিনে সূর্য হেলে যাওয়ার পর ছাড়া رَمْى জায়েজ নয়। কেননা, দিন দুটিতে رَمْى ত্যাগ করা বৈধ নয়। সুতরাং তা বর্ণিত মূল অবস্থার উপর বহাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, ১৩ ই জিলহজ ফজর উদিত হওয়ার পরে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে رَمْى করা জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো জায়েজ এবং এটাই ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। সাহেবাইনের মতে জায়েজ নেই। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত।

সাহেবাইন (র.) রমীর ক্ষেত্রে ১৩ ই জিলহজকে অন্যান্য দিনের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেভাবে ১১ ও ১২ ই জিলহজ সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে رَمْى করা জায়েজ নেই, অনুরূপভাবে ১৩ ই জিলহজেও জায়েজ হবে না। তবে অন্যান্য দিনের সাথে ১৩ ই জিলহজের পার্থক্য হলো, এদিনে رَمْى ছাড়া যাত্রা করা জায়েজ, কিন্তু অন্যান্য দিনে رَمْى ছাড়া যাত্রা করার অবকাশ নেই। যাহোক, ১৩ তারিখ رَمْى ছাড়াই যাত্রা করার অবকাশ ছিল, কিন্তু যখন সে অবকাশ গ্রহণ করল না তখন এ দিনটিও অন্যান্য দিনের সাথে যুক্ত হবে। আর অন্যান্য দিনের ক্ষেত্রে বিধান হলো, সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে رَمْى করা জায়েজ নেই। এ বিধান ১৩ ই জিলহজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, প্রথমত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে যে, যখন ইয়াওমে নাফার তথা ১৩ ই জিলহজের সূর্য উদিত হবে, তখন رَمْى جِمَارْ জায়েজ।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ১৩ ই জিলহজে যখন رَمْى جِمَارْ না করার অবকাশ রয়েছে, তখন তো رَمْى جِمَارْ জায়েজ হওয়া আরো স্বাভাবিক যে, ১৩ তারিখ সারা দিনই رَمْى جِمَارْ করা যাবে। পক্ষান্তরে ১১ ও ১২ তারিখের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ঐ দু-দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর ছাড়া رَمْى جِمَارْ জায়েজ নয়। কেননা, দিন দুটিতে رَمْى جِمَارْ ত্যাগ করা বৈধ নয়। সুতরাং হুকুম বর্ণিত মূল অবস্থার উপর বহাল থাকবে তথা সূর্য হেলে যাওয়ার পর।

فَأَمَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَأَوَّلُ وَقْتِ الرَّمْيِ فِيْهِ مِنْ وَقْتِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَوَّلُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا لَيْلًا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا مُصْبِحِيْنَ وَيُرْوَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَثْبُتُ أَصْلُ الْوَقْتِ بِالْأَوَّلِ وَالْأَفْضَلِيَّةُ بِالثَّانِيْ وَتَأْوِيْلُ مَا رُوِيَ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَلِأَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَقْتُ الْوُقُوْفِ وَالرَّمْيُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُوْنُ وَقْتُهُ بَعْدَهُ ضَرُوْرَةً ثُمَّ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَمْتَدُّ هٰذَا الْوَقْتُ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ الرَّمْيُ جَعَلَ الْيَوْمَ وَقْتًا لَهُ وَ ذِهَابُهُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا .

অনুবাদ : কুরবানির দিন রমীর প্রথম ওয়াক্ত হলো ফজর উদিত হওয়ার সময় থেকে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রমীর প্রথম ওয়াক্ত হলো মধ্যরাতের পর থেকে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাখালদেরকে রাতে رَمْي করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا مُصْبِحِيْنَ وَيُرْوَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ 'তোমরা ভোরে উপনীত হওয়া ছাড়া জামরাতুল আকাবায় رمى করবে না।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে رَمْي করবে না। সুতরাং প্রথম বর্ণনা দ্বারা মূল ওয়াক্ত সাব্যস্ত হবে এবং দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা উত্তম হওয়া সাব্যস্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার ব্যাখ্যা হলো, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত। তা ছাড়া ইয়াওমুন নহরের রাত্র হলো মুযদালিফায় অবস্থানের রাত, আর رَمْي হলো উকূফের পরবর্তী পর্যায়ের। সুতরাং অনিবার্যভাবেই রমীর ওয়াক্ত উকূফের পরেই হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এ সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ الرَّمْيُ 'নিশ্চয় এ দিনে আমাদের প্রথম আমল হলো رَمْي' এখানে পূর্ণ দিবসকে রমীর সময় সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর দিবস শেষ হয় সূর্যাস্তের মাধ্যমে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূর্য হেলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত তা প্রলম্বিত হবে। আমাদের বর্ণিত হাদীসটি তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, ১০-ই জিলহজে জামরাতুল আকাবায় রমীর সময় ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ইয়াওমুন্ নহরে মধ্যরাতের পর থেকে রমীর প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয়। তাঁর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাখালদেরকে রাত্রে رَمْي করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদি ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে رَمْي জায়েজ না থাকতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে রাত্রে رَمْي করার অনুমতি দিয়েছিলেন ?

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ভোরে উপনীত হওয়া ছাড়া জামরাতুল আকাবায় রমী করবে না। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জামরাতুল আকাবায় রমীর ওয়াক্ত ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ অর্থাৎ 'সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে জামরাতুল আকাবায় রমী করবে না।' এ হাদীস থেকে বুঝা যায় সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকেই রমীর ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। গ্রন্থকার উভয় বর্ণনার সমন্বয় সাধন করেন এভাবে যে, প্রথম হাদীস إِلَّا مُصْبِحِيْنَ দ্বারা জামরাতুল আকাবায় রমীর মূল ওয়াক্ত সাব্যস্ত হয়। আর দ্বিতীয় হাদীস حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ দ্বারা উত্তম ওয়াক্ত সাব্যস্ত হয়।

মোদ্দাকথা হলো, ইয়াওমুন নাহরে ফজর উদিত হওয়ার পর জামরাতুল আকাবায় رَمْى করা জায়েজ আর সূর্য উদিত হওয়ার পর رَمْى করা উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত বর্ণনার উত্তর হলো, হাদীসে ১১ ও ১২ তারিখের রাত্র উদ্দেশ্য। যেমন- ১১ তারিখে رَمْى শুরু হওয়ার পর তা দিন শেষে শেষ রাত পর্যন্ত বহাল থাকে। মোটকথা, রমীর ক্ষেত্রে রাত্র পূর্ববর্তী দিনের অনুবর্তী হবে- পরবর্তী দিনের নয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজরের কারণে রাখালদেরকে ১১ ও ১২ তারিখের রমীকে রাতের বেলায় আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ইয়াওমুন নাহ্রের রাত্র হলো মুযদালিফায় অবস্থানের ওয়াক্ত, আর রমী হলো উকূফের পরবর্তী পর্যায়ের। এ কারণে রমীর ওয়াক্ত উকূফের পরেই হবে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, রমীর সময় রাত শেষে ফজর উদিত হওয়ার পর শুরু হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইয়াওমুন নাহরে জামরাতুল আকাবায় রমীর সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এ দিন তথা ইয়াওমুন নাহরে আমাদের প্রথম আমল হলো رَمْى"। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ দিবসকে রমীর সময় ধার্য করেছেন। আর দিবস বলতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বুঝায়। এজন্য রমীর সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে।

ইয়াওমুন নাহরে রমীর সময়ের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ হলো, ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে জায়েজ। আর সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত সময় সুন্নত। সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বিনা মাকরূহে জায়েজ। আর সূর্যাস্তের পর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত মাকরূহের সাথে জায়েজ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, ইয়াওমুন নাহরে রমীর সময় সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে رَمْى করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে আমাদের পূর্ব উল্লিখিত হাদীসটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ।

وَإِنْ أَخَّرَ إِلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ الرِّعَاءِ وَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْغَدِ رَمَاهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ جِنْسِ الرَّمْيِ وَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِتَاخِيْرِهِ عَنْ وَقْتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ قَالَ فَإِنْ رَمَاهَا رَاكِبًا أَجْزَأَهُ لِحُصُوْلِ فِعْلِ الرَّمْيِ وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيَهُ مَاشِيًا وَإِلَّا فَيَرْمِيْهِ رَاكِبًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وُقُوْفٌ وَدُعَاءٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَيَرْمِيْ مَاشِيًا لِيَكُوْنَ أَقْرَبَ إِلَى التَّضَرُّعِ وَبَيَانُ الْأَفْضَلِ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) ـ

অনুবাদ : যদি রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করে, তাহলে রাত্রেই رَمْى করবে। এজন্য তার উপর কিছুই লাজিম [দম] আসবে না। রাখালদের অনুমতি দান সংক্রান্ত হাদীসের কারণে। আর যদি আগামী দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করে, তাহলে আগামী দিনই رَمْى করবে। কেননা তা মৌলিকভাবে রমীর সময়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে– রমীকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করার কারণে। এমনটিই হলো তাঁর মাযহাব। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি আরোহী অবস্থায় رَمْى করে, তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা, কঙ্কর নিক্ষেপের আমল তো হাসিল হয়েছে। আর যে রমীর পরে আরেকটি رَمْى রয়েছে, সেক্ষেত্রে আরোহী অবস্থায় رَمْى করতে পারে। কেননা, আমাদের পূর্ব বর্ণনা মতে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রমীর পরে অবস্থান ও দোয়া রয়েছে। সুতরাং পায়ে হেঁটে رَمْى করবে, যাতে তা বিনয় প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী হয়। উত্তমতার বিষয়টি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَخَّرَ إِلَى اللَّيْلِ الخ মাসআলা : ইয়াওমুন্ নাহরে যদি জামরাতুল আকাবায় رَمْى না করে এমনকি রাত্র এসে যায়, তাহলে রাত্রেই رَمْى করবে। এ কারণে তার উপর দম কিংবা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। দলিল হলো, রাখালদেরকে অনুমতি দান সংক্রান্ত হাদীস। আর যদি হাজী রাত্রেও رَمْى না করে এমনকি ১১ তারিখ চলে আসে, তাহলে সেদিন رَمْى করবে। কেননা, ১১ তারিখও মৌলিকভাবে রমীর সময়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে সে ব্যক্তির উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, জামরাতুল আকাবায় রমীকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, হজের কার্যাবলিকে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهُ فَإِنْ رَمَاهَا رَاكِبًا الخ মাসআলা : যদি কেউ আরোহী হয়ে رَمْى করে, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, কঙ্কর নিক্ষেপের আমল পাওয়া গেছে। ইমাম কুদূরী (র.) একটি মূলনীতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যে رَمْى -এর পরে আরেকটি رَمْى রয়েছে সে ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে رَمْى করা উত্তম, অন্যথায় সওয়ার হয়ে رَمْى করা উত্তম। এ মূলনীতির আলোকে– ইয়াওমুন্ নাহরে জামরায়ে আকাবার رَمْى আরোহী হয়ে করা উত্তম। কেননা, এ দিনে রমীর পরে কোনো رَمْى নেই। আর অন্যান্য দিন জামরায়ে উলা ও জামরায়ে উসতার পরে যেহেতু رَمْى আছে, তাই তা পায়ে হেঁটে করবে। আর তৃতীয় জামরার পরে যেহেতু অন্য কোনো রমী নেই, তাই তা সওয়ার হয়ে করা উত্তম।

হিদায়া গ্রন্থকার দলিল বর্ণনার্থে বলেন, রমীর পরে رَمْى থাকলে সে ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে رَمْى করা উত্তম। এজন্য যে, প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার রমীর পরে অবস্থান ও দোয়া রয়েছে। সুতরাং পায়ে হেঁটে রমী করবে, যাতে তা বিনয় প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী হয়। এ উত্তমতার বিষয়টি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত।

وَيُكْرَهُ اَنْ لَا يَبِيْتَ بِمِنًى لَيَالِيَ الرَّمْيِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاتَ بِهَا وَعُمَرُ (رض) كَانَ يُؤَدِّبُ عَلٰى تَرْكِ الْمَقَامِ بِهَا وَلَوْ بَاتَ فِىْ غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْئٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لِاَنَّهُ وَجَبَ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِىْ اَيَّامِهٖ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ اَفْعَالِ الْحَجِّ فَتَرْكُهُ لَا يُوْجِبُ الْجَابِرَ .

অনুবাদ : কঙ্কর নিক্ষেপের রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান না করা মাকরূহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনাতেই রাত্রি যাপন করেছেন। আর হযরত ওমর (রা.) মিনাতে না থাকার কারণে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। যদি স্বেচ্ছায় অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, তাহলে আমাদের মতে তার উপর কোনো শাস্তি আসবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আমাদের যুক্তি হলো– রাত্রগুলোতে মিনায় অবস্থান সাব্যস্ত হয়েছে, যাতে দিনগুলোতে رَمْى করা সহজ হয়। সুতরাং তা হজের অর্ন্তভুক্ত আমল নয়। এজন্য তা তরক করার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, কঙ্কর নিক্ষেপের রাতগুলোতে হাজীর জন্য মিনায় অবস্থান না করা মাকরূহ। অর্থাৎ কঙ্কর নিক্ষেপের রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান করা আমাদের মতে সুন্নত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপের রাতগুলো মিনাতেই যাপন করেছেন। আর কোনো হাজী মিনায় রাত্রি যাপন না করলে হযরত ওমর (রা.) তাকে ধমক দিতেন।

আমাদের মতে কোনো হাজী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, তাহলে তার উপর 'দম' কিংবা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সে ব্যক্তির উপর 'দম' ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হলো, হাজীর জন্য মিনায় রাত্রি যাপন সাব্যস্ত হয়েছে, যাতে رَمْى করা তার জন্য সহজসাধ্য হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, মিনায় অবস্থান হজের অন্তর্ভুক্ত আমল নয় যে, তা তরক করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তার উপর ক্ষতিপূরণ দম কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না।

قَالَ وَيُكْرَهُ اَنْ يُقَدِّمَ الرَّجُلُ ثِقْلَهُ اِلَى مَكَّةَ وَيُقِيْمُ حَتّٰى يَرْمِىَ لِمَا رُوِىَ اَنَّ عُمَرَ (رض) كَانَ يَمْنَعُ مِنْهُ وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ وَلِاَنَّهُ يُوْجِبُ شُغْلَ قَلْبِهِ وَاِذَا نَفَرَ اِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْاَبْطَحُ وَهُوَ اِسْمُ مَوْضِعٍ قَدْ نَزَلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ نُزُوْلُهُ قَصْدًا هُوَ الْاَصَحُّ حَتّٰى يَكُوْنَ النُّزُوْلُ بِهِ سُنَّةً عَلٰى مَا رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِاَصْحَابِهِ اِنَّا نَازِلُوْنَ غَدًا عِنْدَ خَيْفِ خَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَ الْمُشْرِكُوْنَ فِيْهِ عَلٰى شِرْكِهِمْ يُشِيْرُ اِلٰى جُهْدِهِمْ عَلٰى هِجْرَانِ بَنِىْ هَاشِمٍ فَعَرَفْنَا اَنَّهُ نَزَلَ بِهِ اِرَاءَةً لِلْمُشْرِكِيْنَ لَطِيْفَ صُنْعِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِهِ فَصَارَ سُنَّةً كَالرَّمَلِ فِى الطَّوَافِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র) বলেন যে, স্বীয় মালপত্র আগেই পাঠিয়ে দেওয়া এবং মিনায় অবস্থান করে رمى করা মাকরূহ। কেননা, বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) এরূপ করতে নিষেধ করতেন এবং এজন্য শাস্তি দিতেন। আর এজন্য যে, তার মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। আর যখন মক্কায় রওয়ানা করবে তখন মুহাস্সাব অর্থাৎ আবতাহ্ নামক স্থানে অবতরণ করবে। এটা একটা জায়গার নাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবতরণ করেছিলেন। আর তাঁর অবতরণ ছিল ইচ্ছাকৃত। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। তাই এখানে অবস্থান করা সুন্নত হবে– এ ভিত্তিতে যে, বর্ণিত আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে বলেছিলেন, আগামীকাল আমরা খায়ফে বনী কানানাতে অবতরণ করব, যেখানে মুশরিকরা তাদের শিরকের উপর থাকার ব্যাপারে পরস্পর শপথ নিয়েছিল। এ কথা বলে তিনি ﷺ মুশরিকরা বনূ হাশিমকে বর্জনের ব্যাপারে তাদের চরম তৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি ﷺ তাঁর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ মুশরিকদের দেখানোর ইচ্ছা করেছিলেন। সুতরাং তওয়াফের ক্ষেত্রে رَمَلْ করার ন্যায় এটিও সুন্নত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا نَفَرَ اِلَى مَكَّةَ الخ : 'মুহাস্সাব' মক্কা ও মিনার মাঝামাঝি কঙ্করময় একটি স্থানের নাম। এ স্থানটি মক্কার তুলনায় মিনার নিকটবর্তী। এ স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন এবং মূর্তিপূজার অসারতার ঘোষণা দিলেন, তখন কুরাইশের সকল সম্প্রদায় এই খায়ফে মুহাস্সাবে একত্রিত হয়। তারা সকলেই শপথ গ্রহণ করে যে, নবুয়তের দাবিদার বংশ তথা বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করা হবে। তাদের সাথে বেচাকেনা করা যাবে না, পানাহারও করা যাবে না। পরিশেষে আবূ তালিব সমস্ত মুসলমান ও বনূ হাশিমকে নিয়ে পাহাড়ে চলে যান। মুশরিকরা অঙ্গীকারনামা লিখে কা'বা গৃহে টানিয়ে রাখে। তিন বছর এভাবে অতিবাহিত হয়। বনূ হাশিম চরম কষ্ট ভোগ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী মারফত লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, পোকা অঙ্গীকারনামা খেয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহর নাম ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। আবূ তালিব কাফিরদেরকে এ সংবাদ দিলে তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে, যদি এ সংবাদ সত্য হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাথে মিলে যাব। আর আবূ তালিবও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইঙ্গিতে বললেন, যদি তা সত্য না হয়, তাহলে আমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে তোমাদের কাছে সোপর্দ করব। অবশেষে কুরাইশ সর্দাররা একত্রিত হয়ে কা'বার দরজা খুলল এবং তারা অঙ্গীকারনামা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। মুশরিকরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ল। তারা তাদের চুক্তি পূরণ করে বনূ হাশিমের সাথে মিশে গেল।

উক্ত ঘটনার বহু দিন পরে মক্কা বিজিত হয় এবং হেজাজের মাটিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হজের সময়ে মিনায় স্বীয় সাহাবীদেরকে বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে মুহাস্সাবে অবতরণ করব। প্রোগ্রাম মতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ স্থানে স্বেচ্ছায় অবতরণ করেছিলেন। তাই এ স্থলে অবতরণ করা সুন্নত। এর উদ্দেশ্য ছিল– মুশরিকদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করানো যে, কাল পর্যন্ত তোমরা এখানে রাজত্ব করেছ; তোমরা আমাদের বিপরীত অনুশাসন চালিয়েছ। আর আজ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। যদিও আজ মুশরিকরা সেখানে নেই, তথাপি তাদের বিপক্ষে নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশকরণার্থে এ স্থানে অবশ্যই অবতরণ করবে যেমন তওয়াফের মধ্যে আজ পর্যন্ত رَمَلْ বহাল রয়েছে। মোটকথা, হাজী যখন মিনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে তখন খায়ফে মুহাস্সাবে অবতরণ করা সুন্নত।

قَالَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لَا يَرْمُلُ فِيْهَا وَهٰذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَيُسَمّٰى طَوَافَ الْوَدَاعِ وَطَوَافَ اٰخِرِ عَهْدٍ بِالْبَيْتِ لِاَنَّهُ يُوَدِّعُ الْبَيْتَ وَيَصْدُرُ بِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ وَرَخَّصَ النِّسَاءَ الْحُيَّضَ اِلَّا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ لِاَنَّهُمْ لَا يَصْدُرُوْنَ وَلَا يُوَدِّعُوْنَ وَلَا رَمَلَ فِيْهِ لِمَا بَيَّنَّا اَنَّهُ شُرِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَهُ لِمَا قَدَّمْنَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করবে এবং বায়তুল্লাহর সাত চক্কর তওয়াফ করবে, তাতে رَمَلْ করবে না। এটা হলো طَوَافُ الصَّدْرِ বা প্রত্যাবর্তনের তওয়াফ। এটাকে طَوَافُ الْوَدَاعِ বা বিদায়ী তওয়াফও বলা হয় এবং বায়তুল্লাহর সঙ্গে শেষ তওয়াফও বলা হয়। কেননা, এ তওয়াফের মাধ্যমে সে বায়তুল্লাহকে বিদায় জানাচ্ছে এবং বায়তুল্লাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করছে। আমাদের মতে এটি ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করবে, বায়তুল্লাহর সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ যেন হয় তওয়াফের মাধ্যমে।' ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে তিনি [এ তওয়াফ না করার] রুখসত দিয়েছেন। তবে মক্কাবাসীদের উপর এ তওয়াফ ওয়াজিব নয়। কেননা, তারাতো প্রত্যাবর্তন করছে না আবার বিদায়ও জানাচ্ছে না। এতে رَمَلْ নেই। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, رَمَلْ শুধু একবারই অনুমোদিত হয়েছে। এরপর তওয়াফের দু' রাকাত নামাজ আদায় করবে। এর কারণ পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মিনায় হজের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আদায় করার পর যখন হাজী মক্কা শরীফে গমন করবে, তখন বায়তুল্লাহর সাত চক্কর তওয়াফ করবে। এ তওয়াফে رَمَلْ করবে না। এ তওয়াফের নাম طَوَافُ الصَّدْرِ বা প্রত্যাবর্তনের তওয়াফ এবং طَوَافُ الْوَدَاعِ বা বিদায়ী তওয়াফ। আর হাজীর শেষ আমল হলো বায়তুল্লাহর তওয়াফ। এ তওয়াফকে طَوَافُ الْوَدَاعِ [বিদায়ী তওয়াফ] এজন্য বলা হয় যে, এ তওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহকে বিদায় জানানো হয়। আর طَوَافُ الصَّدْرِ [প্রত্যাবর্তনের তওয়াফ] বলা হয় এজন্য যে, হাজী এ তওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে।

طَوَافُ الصَّدْرِ [প্রত্যাবর্তনের তওয়াফ] আমাদের নিকট ওয়াজিব আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, তওয়াফে সদর–তওয়াফে কুদূমের ন্যায়। এ কারণেই তো এ দু তওয়াফ মক্কার বহিরাগত হাজীরা করে– মক্কাবাসীরা তা করে না। অথচ হজের ওয়াজিবসমূহের ক্ষেত্রে মক্কাবাসী ও বহিরাগত সকলেই সমান। সুতরাং এ দু তওয়াফ মক্কাবাসীরা না করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এ দু তওয়াফ ওয়াজিব নয়।

আমাদের দলিল হলো, এ হাদীস– যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করবে, তার সর্বশেষ আমল বাইতুল্লাহর তওয়াফ হওয়া চাই এবং ঋতুবতী স্ত্রীলোকদের তিনি এ তওয়াফ না করার রুখসত দিয়েছেন। অর্থাৎ ঋতুগ্রস্ত ও প্রসূতিকালীন স্ত্রীলোকদের জন্য উক্ত তওয়াফে সদর ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ। এ হাদীসে فَلْيَكُنْ নির্দেশজ্ঞাপক শব্দ। আর অন্যকোনো ইঙ্গিত না থাকলে 'আমর' ওয়াজিব হওয়াকে সাব্যস্ত করে। সুতরাং এ তওয়াফ ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋতুগ্রস্ত নারীদেরকে উক্ত তওয়াফে সদর না করেই প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়েছেন। এটাও ওয়াজিব হওয়ার দলিল। অন্যথায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতির উদ্দেশ্যই বা কি ?

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, মক্কাবাসীদের উপর তওয়াফে সদর ওয়াজিব নয়। কেননা, মক্কাবাসীরা প্রত্যাবর্তন করে না এবং বায়তুল্লাহকে বিদায়ও জানায় না। আর উক্ত তওয়াফে رَمَلْ না থাকার কারণ হলো, رَمَلْ একবারই অনুমোদিত হয়েছে। আর তা তওয়াফে কুদূম কিংবা তওয়াফে জিয়ারতের সময় করা হয়। এ কারণে দ্বিতীয়বার رَمَلْ করার কোনো আবশ্যকতা নেই। তবে অবশ্য তওয়াফে সদরের পরে তওয়াফের দু রাকাত নামাজ আদায় করবে। কেননা, এ অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে যে, প্রত্যেক তওয়াফ দু রাকাত নামাজের দ্বারা সম্পন্ন হবে– চাই সে তওয়াফ ফরজ হোক বা না হোক।

وَيَأْتِى زَمْزَمَ وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَقٰى دَلْوًا بِنَفْسِهٖ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اَفْرَغَ بَاقِىَ الدَّلْوِ فِى الْبِئْرِ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَأْتِىَ الْبَابَ وَيُقَبِّلُ الْعَتَبَةَ وَيَأْتِى الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ اِلَى الْبَابِ فَيَضَعُ صَدْرَهٗ وَوَجْهَهٗ عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّثُ بِالْاَسْتَارِ سَاعَةً ثُمَّ يَعُوْدُ اِلٰى اَهْلِهٖ هٰكَذَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ بِالْمُلْتَزَمِ ذٰلِكَ قَالُوْا وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَنْصَرِفَ وَهُوَ يَمْشِىْ وَرَاءَهٗ وَوَجْهُهٗ اِلَى الْبَيْتِ مُتَبَاكِيًا مُتَحَسِّرًا عَلٰى فِرَاقِ الْبَيْتِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فَهٰذَا بَيَانُ تَمَامِ الْحَجِّ ـ

অনুবাদ : অতঃপর [হাজী] জমজমের নিকট এসে জমজমের পানি পান করবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বালতি করে পানি তুলেছেন এবং পান করেছেন। অতঃপর বালতির অবশিষ্ট পানি কূপে ফেলে দিয়েছেন। আর মোস্তাহাব হলো বায়তুল্লাহ্র দরজায় আসবে এবং চৌকাঠে চুম্বন করবে। এরপর আসবে মুলতাযিমে। আর তা হলো দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান। সে স্থানে বুক ও চেহারা লাগাবে এবং কিছু সময় বায়তুল্লাহ্র গিলাফ জড়িয়ে ধরবে। অতঃপর স্বীয় পরিবারের নিকটে ফিরবে। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুলতাযিমের সঙ্গে এরূপ করেছেন। মাশায়েখে কেরাম বলেন, উচিত হলো বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে পিছনের দিকে হেঁটে ফিরবে– বায়তুল্লাহর বিচ্ছেদে ক্রন্দনরত শোকাভিভূত অবস্থায়। এভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফ থেকে বেরিয়ে আসবে। এ হলো হজের পূর্ণ বিবরণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَأْتِىَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, প্রত্যাবর্তনের সময় হাজীর জন্য মোস্তাহাব হলো, বায়তুল্লাহর দরজায় এসে চৌকাঠে চুম্বন করবে এবং মুলতাযিমে [যা হাজারে আসওয়াদ থেকে কা'বার দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত] স্বীয় বুক ও চেহারা লাগাবে, বায়তুল্লাহ্র গিলাফ জড়িয়ে ধরবে। অতঃপর স্বীয় ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা, এরূপই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ।

কোনো কোনো মাশায়েখ মনে করেন যে, বায়তুল্লাহ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে পিছনের দিকে হেঁটে ফিরবে এবং বায়তুল্লাহর বিচ্ছেদে ক্রন্দনরত অবস্থায় শোক প্রকাশ করবে। এভাবে মসজিদে হারাম থেকে বের হবে। এ পর্যন্ত হজের পরিপূর্ণ পদ্ধতি বর্ণিত হলো।

فَصْلٌ وَاِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ اِلَى عَرَفَاتٍ وَ وَقَفَ فِيْهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِاَنَّهُ شُرِعَ فِيْ اِبْتِدَاءِ الْحَجِّ عَلَى وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْاَفْعَالِ فَلَا يَكُوْنُ الْاِتْيَانُ بِهِ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ الْوَجْهِ سُنَّةً وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ لِاَنَّهُ سُنَّةٌ وَبِتَرْكِ السُّنَّةِ لَا يَجِبُ الْجَابِرُ وَمَنْ اَدْرَكَ الْوُقُوْفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهَا اِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ فَاَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوْفِ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَهٰذَا بَيَانُ اَوَّلِ الْوَقْتِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَهٰذَا بَيَانُ اٰخِرِ الْوَقْتِ وَ مَالِكٌ (رح) اِنْ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اَوْ بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَهُوَ مَحْجُوْجٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا .

অনুচ্ছেদ : বিচ্ছিন্ন কিছু মাসআলা মাসায়েল

অনুবাদ : যদি মুহরিম মক্কায় প্রবেশ না করে আরাফা অভিমুখে গমন করে এবং আমাদের পূর্ব বর্ণিত নিয়মানুসারে সেখানে অবস্থান করে, তাহলে তার থেকে তওয়াফে কুদূম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, তা হজের শুরুতে এমনভাবে শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে যে, তার উপর হজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম পরম্পরায় আবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ রূপ ছাড়া অন্য কোনোভাবে তা আদায় করা সুন্নত হবে না। আর এটা তরক করার কারণে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, এটা সুন্নত। আর সুন্নত তরক করার কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। যে ব্যক্তি আরাফার দিবসের [নয় তারিখ] সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে ইওয়ামুন নাহ্‌র [দশ তারিখ]-এর ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে কোনো সময়ে আরাফায় উকূফ করতে পারে, সে হজ পেয়ে গেল। সুতরাং আমাদের মতে উকূফের প্রথম ওয়াক্ত হলো [নয় তারিখের] সূর্য হেলে পড়ার পর। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলে পড়ার পর উকূফ করেছেন। আর এ হলো প্রথম ওয়াক্তের বর্ণনা। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ 'যে ব্যক্তি অন্তত রাত্রে আরাফায় অবস্থান করতে পারে সে হজ পেয়ে গেল। আর যে রাতেও অবস্থান করতে পারে না তার হজ ফউত হয়ে গেল।' এ হলো উকূফের শেষ সময়ের বিবরণ। ইমাম মালিক (র.) যদিও বলতেন যে, উকূফের প্রথম ওয়াক্ত হলো ফজর উদিত হওয়ার পর কিংবা সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে, কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীস তাঁর বিপক্ষে দলিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ الخ : এ অনুচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন কিছু মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম মাসআলা হলো, যদি মুহরিম মক্কায় প্রবেশ না করে আরাফার মাঠে চলে যায় এবং শরিয়তের বিধি মতো সেখানে অবস্থান করে, তাহলে তার জিম্মা থেকে তওয়াফে কুদূম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, তওয়াফে কুদূম হজের শুরুতে এভাবেই প্রবর্তিত হয়েছে যে, হজের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম তার উপর আবর্তিত। সুতরাং এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনোভাবে তওয়াফে কুদূম সুন্নত হবে না। আর তওয়াফে কুদূম তরক করার কারণে দম কিংবা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা সুন্নত। আর সুন্নত তরক করার কারণে দম কিংবা কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَدْرَكَ الْوُقُوْفَ الخ : উকূফে আরাফার ওয়াক্ত কখন থেকে শুরু হয় এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে, আরাফার দিবসের সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে আরাফায় অবস্থানের সময় আরম্ভ হয়। সুতরাং যদি হাজী আরাফার দিবসের সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে কুরবানির দিবসের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে কোনো সময় আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তার হজ আদায় হয়ে যাবে। দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলে পড়ার পর উকূফ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ আমল থেকে উকূফে আরাফার প্রথম ওয়াক্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্তত রাত্রে আরাফায় অবস্থান লাভ করতে পারে সে হজ পেয়ে গেল। আর যে রাতেও অবস্থান লাভ করতে পারে না তার হজ নষ্ট হয়ে গেল।' এ হাদীসে আরাফায় অবস্থানের শেষ সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত দু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, উকূফে আরাফার সময় হলো আরাফার দিবসের সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে কুরবানির দিবসের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়।

ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমত হলো, আরাফার দিবসের ফজর উদিত হওয়ার পর কিংবা সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে উকূফে আরাফার সময় আরম্ভ হয়। তাঁর দলিল এ হাদীস–

اَلْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, হজ আরাফায় অবস্থানের নাম। সুতরাং যে রাত কিংবা দিনের কিছু সময়ে আরাফায় অবস্থান করল তার হজ পূর্ণ হলো। এ হাদীসে نَهَارٌ শব্দ এসেছে, যা সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ হয়। এজন্য সূর্যোদয়ের পর থেকে উকূফে আরাফার সময় আরম্ভ হবে।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল ইমাম মালিক (র.) -এর বিপক্ষে দলিল। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলে পড়ার পর আরাফায় অবস্থান করেছিলেন। যদি সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে আরাফায় অবস্থানের সময় আরম্ভ হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্ণনা করতেন।

ثُمَّ إِذَا وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَأَفَاضَ مِنْ سَاعَتِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ بِكَلِمَةِ أَوْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّخْيِيرِ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَقِفَ فِي الْيَوْمِ وَجُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلٰكِنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَنِ اجْتَازَ بِعَرَفَةَ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ جَازَ عَنِ الْوُقُوفِ لِأَنَّ مَا هُوَ الرُّكْنُ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْوُقُوفُ وَلَا يَمْتَنِعُ ذٰلِكَ بِالْإِغْمَاءِ وَالنَّوْمِ كَرُكْنِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ لِأَنَّهَا لَا تَبْقٰى مَعَ الْإِغْمَاءِ وَالْجَهْلُ يُخِلُّ بِالنِّيَّةِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِكُلِّ رُكْنٍ .

অনুবাদ : অতঃপর যদি সূর্য হেলে পড়ার পর উকূফ করে এবং সেই মুহূর্তেই রওয়ানা দিয়ে দেয়, তাহলে আমাদের মতে যথেষ্ট হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ أَوْ অব্যয়-যোগে বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন- اَلْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ 'হজ হলো আরাফায় অবস্থান। সুতরাং যে ব্যক্তি রাতের কিংবা দিনের কিছু সময় আরাফায় অবস্থান করল, তার হজ পূর্ণ হয়ে গেল।' আর তা [أو অব্যয়টি] ইচ্ছা প্রদানমূলক অব্যয়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, দিনের সাথে রাতের কিছু অংশে উকূফ না করলে যথেষ্ট হবে না। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীস তাঁর বিপক্ষে দলিল। যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা বেহুঁশ অবস্থায় কিংবা যে আরাফা না জেনে আরাফা অতিক্রম করে, তবে তার উকূফ জায়েজ হয়ে যাবে। কেননা, যা হজের রুকন অর্থাৎ উকূফ, তা তো পাওয়া গেছে। অজ্ঞান কিংবা ঘুমের অবস্থার কারণে তো সেটা ব্যাহত হয় না, যেমন- রোজার রুকনের বেলায়। নামাজের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, অজ্ঞান অবস্থায় নামাজ অব্যাহত থাকতে পারে না। আর অজ্ঞান অবস্থায় আরাফা অতিক্রমের বেলায় উকূফের নিয়ত অনুপস্থিত। আর নিয়ত হজের প্রতিটি রুকনের জন্য শর্ত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ الخ : মাসআলা হলো, আরাফার দিবসে সূর্য হেলে পড়ার পর কিছু সময় আরাফায় অবস্থান করত রওয়ানা হওয়া আমাদের মতে জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, দিনের সাথে রাতের কিছু অংশ আরাফায় অবস্থান করা আবশ্যক। সুতরাং তাঁর মতে আরাফার দিবসে সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হওয়া জরুরি।

ইমাম মালিক (র.) -এর দলিল এ হাদীস- مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ এ হাদীসে হজের মূল ভিত্তি হিসেবে রাতে আরাফায় অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এজন্যই ইমাম মালিক (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রাতের কিছু অংশে উকূফ করা আবশ্যক।

আমাদের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্ন হাদীস- اَلْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ এখানে أو অব্যয়টি ইচ্ছা প্রদানমূলক অব্যয় হিসেবে এসেছে। অর্থাৎ উকূফ দিনে হোক আর রাতে হোক উভয় অবস্থায় হজ পূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, উকূফের জন্য দিন শর্ত নয় আবার রাতও শর্ত নয়। এ হাদীসই ইমাম মালিক (র.) -এর বিপক্ষে দলিল। ইমাম মালিক (র.)-এর বর্ণিত হাদীসে بِلَيْلٍ শব্দটির সংযোজন অপ্রসিদ্ধ [গায়রে মাশহুর]। মাশহুর বর্ণনা এরূপ- مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ সুতরাং বর্ণিত হাদীস ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَمَنِ اجْتَازَ بِعَرَفَةَ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কোনো হাজী আরাফার দিনে ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা বেহুঁশ অবস্থায় আরাফার মাঠ অতিক্রম করে যায়, কিংবা সে জানে না যে, এটাই আরাফা, তাহলে এ তিন অবস্থাতেই উকূফে আরাফা আদায় হয়ে যাবে। কেননা, হজের রুকন হলো উকূফ আর তা পাওয়া গেছে। তবে অজ্ঞান অবস্থা কিংবা ঘুমন্ত অবস্থা উকূফকে ব্যাহত করে না। যেমন, কেউ রোজার নিয়ত করার পর সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে কিংবা বেহুঁশ হয়ে থাকে, তাহলেও তার রোজা আদায় হয়ে যায়। তবে নামাজের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, নামাজ অজ্ঞান অবস্থায় অব্যাহত থাকতে পারে না।

আর না জেনে আরাফা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে 'নাজানা' নিয়তে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অর্থাৎ যে বিষয় অজ্ঞাত সে ক্ষেত্রে নিয়ত ধর্তব্য নয়। তবে হজের প্রতিটি রুকনের জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তাই উকূফের জন্যও নিয়ত শর্ত নয়। আর যখন উকূফের জন্য নিয়ত শর্ত নয়, তখন না জেনে আরাফা অতিক্রম করা উকূফ হিসেবে পরিগণিত হবে।

وَمَنْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ فَاَهَلَّ عَنْهُ رُفَقَاؤُهُ جَازَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يَجُوْزُ وَلَوْ اَمَرَ اِنْسَانًا بِاَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ اِذَا اُغْمِيَ عَلَيْهِ اَوْ نَامَ فَاَحْرَمَ الْمَامُوْرُ عَنْهُ صَحَّ بِالْاِجْمَاعِ حَتّٰى اِذَا اَفَاقَ اَوْ اِسْتَيْقَظَ وَاَتٰى بِاَفْعَالِ الْحَجِّ جَازَ لَهُمَا اَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ بِنَفْسِهِ وَلَا اَذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ وَهٰذَا لِاَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْاِذْنِ وَالدَّلَالَةُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَجَوَازُ الْاِذْنِ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ كَثِيْرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُّ بِخِلَافِ مَا اِذَا اَمَرَ غَيْرَهُ بِذٰلِكَ صَرِيْحًا وَلَهُ اَنَّهُ لَمَّا عَاقَدَهُمْ عَقْدَ الرُّفْقَةِ فَقَدْ اِسْتَعَانَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ وَالْاِحْرَامُ هُوَ الْمَقْصُوْدُ بِهٰذَا السَّفَرِ فَكَانَ الْاِذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَةً وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ نَظْرًا اِلَى الدَّلِيْلِ وَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : যদি কেউ অজ্ঞান হয়ে যায় আর তার সাথীরা তার পক্ষ থেকে তালবিয়া পড়ে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, তা জায়েজ হবে না। যদি কেউ অন্য কাউকে বলে রাখে যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়লে কিংবা ঘুমিয়ে গেলে সে যেন তার পক্ষ থেকে ইহ্রাম বেঁধে নেয় আর আদিষ্ট ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে ইহ্রাম বেঁধে নেয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা শুদ্ধ হবে। সুতরাং যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পায় কিংবা জাগ্রত হয় আর হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে, তাহলে জায়েজ হয়ে যাবে। সাহেবাইনের দলিল হলো– [প্রথমোক্ত সূরতে] সে নিজে ইহ্রাম বাঁধেনি আবার কাউকে ইহ্রাম বেঁধে দেওয়ার আদেশও করেনি। কেননা, সে তো স্পষ্টত অনুমতি প্রদান করেনি। আর লক্ষণগত অনুমতি নির্ভর করে বিষয়টি তার জানা থাকার উপর। তা ছাড়া ইহরামের অনুমতির বৈধতা অনেক ফকীহ্রই জানা নেই। সুতরাং সাধারণ মানুষ জানবে কিভাবে? অন্যকে স্পষ্টত আদেশ করার বিষয়টি ভিন্ন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল, যখন সে তাদের সফরসঙ্গী হওয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তখন সে এ সকল বিষয়ে তাদের প্রত্যেকের নিকট সাহায্যের আশা পোষণ করেছে, যা সে নিজে সম্পাদন করতে সক্ষম নয়। আর এ সফরের উদ্দেশ্যমূলক বিষয় হলো ইহ্রাম। সুতরাং লক্ষণগতভাবে ইহ্রাম বেঁধে দেওয়ার অনুমতি সাব্যস্ত হবে। আর প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাত রয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর হুকুমতো প্রমাণের উপরই নির্ভরশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, কোনো হাজী যদি অজ্ঞান হয়ে যায় আর তার সফরসঙ্গীরা তার পক্ষ থেকে ইহ্রাম বেঁধে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ। এভাবে যে, সফরসঙ্গীদের ইহ্রাম নিজের জন্য আসল [মূল] হিসেবে হবে আর অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষ থেকে নৈকট্যের ভিত্তিতে হবে। সাহেবাইন বলেন, এটা জায়েজ হবে না।

দ্বিতীয় সূরত হলো, এক ব্যক্তি তার সফরসঙ্গীকে বলে রেখেছে যে, যদি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি কিংবা ঘুমিয়ে যাই, তাহলে আমার পক্ষ থেকে ইহরাম বেঁধে নেবে। আর আদিষ্ট ব্যক্তি যদি এ অবস্থায় তার পক্ষ থেকে ইহ্রাম বেঁধে নেয়, তাহলে

আহনাফের সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়েজ। সুতরাং যখন হুকুম প্রদানকারী [ব্যক্তি] সংজ্ঞা ফিরে পায় কিংবা জাগ্রত হয় এবং হজের ক্রিয়াকর্মসমূহ পালন করে, তাহলে নতুন করে ইহরাম বাঁধা ছাড়াই তা জায়েজ। অন্যথায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় [অর্থাৎ প্রথমোক্ত সুরতে] সাহেবাইনের দলিল হলো– সে ব্যক্তি নিজেও ইহরাম বাঁধেনি আবার নৈকট্যের ভিত্তিতে অন্য সফরসঙ্গীকেও ইহ্‌রাম বেঁধে দেওয়ার আদেশ করেনি। নিজের ইহরাম যে বাঁধেনি তা তো সুস্পষ্ট। আর অন্যকেও অনুমতি প্রদান করেনি, কেননা অনুমতি প্রদান হয় তো স্পষ্টভাবে হবে কিংবা লক্ষণগতভাবে হবে। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো সুরত নেই। এখানে কোনো প্রকার অনুমতিই পাওয়া যায়নি, স্পষ্টত অনুমতি না পাওয়ার বিষয়টি তো প্রকাশ্য। কেননা, সে স্পষ্টভাবে কাউকে ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য প্রতিনিধি বানায়নি, আবার লক্ষণগত অনুমতিও পাওয়া যায় না। কেননা, লক্ষণগত অনুমতি নির্ভর করে বিষয়টি তার জানা থাকার উপরে। অর্থাৎ প্রথমত এ মাসআলা জানা থাকতে হবে যে, অন্য কাউকে অনুমতি দেওয়ার দ্বারাও ইহ্‌রাম বাঁধা যায় অথচ অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে ইহ্‌রাম বাঁধার বৈধতা তো অনেক ফকীহ্‌গণেরই জানা নেই। সুতরাং সাধারণ মানুষ তা কিভাবে জানবে? আর তাই অনুমতির বৈধতার জ্ঞান না থাকার কারণে লক্ষণগত অনুমতি পাওয়া যায় না। আর স্পষ্টত কিংবা লক্ষণগত কোনো অনুমতি না পাওয়ার কারণে অন্যকে ইহ্‌রাম বাঁধার অনুমতি দানও পাওয়া যায় না। ফলে অন্যের ইহ্‌রাম বাঁধার বৈধতা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

মোদ্দাকথা হলো, এ সুরতে ইহ্‌রাম বাঁধার বিষয়টি মৌলিকভাবে কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে না পাওয়ার কারণে সে ব্যক্তি মুহ্‌রিম হিসেবে গণ্য হবে না আর তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ ইহ্‌রাম বেঁধে দেওয়াও শরয়ীভাবে শুদ্ধ হবে না। কিন্তু অন্যকে ইহ্‌রাম বেঁধে দেওয়ার অনুমতির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এখানে অনুমতি বিদ্যমান থাকার কারণে তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধির ইহ্‌রাম বেঁধে দেওয়া জায়েজ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, যখন সে ব্যক্তি সফরসঙ্গীদের সাথে সফরসঙ্গী হওয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তখন সে ঐ সকল বিষয়ে তাদের নিকট সাহায্যের আশা পোষণ করেছে, যা সে নিজে সম্পাদন করতে সক্ষম নয়। আর এ সফরের উদ্দেশ্যমূলক বিষয় হলো– ইহ্‌রাম। আর যখন সে বেহুঁশ হয়ে যাওয়ায় ইহ্‌রাম বাঁধতে অক্ষম, তখন সে যেন লক্ষণগতভাবে তার সফরসঙ্গীদের থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে সাহায্য কামনা করছে। সুতরাং লক্ষণগত অনুমতির বিষয়টি সাব্যস্ত হলো। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, লক্ষণগত অনুমতি নির্ভর করে বিষয়টি তার জানা থাকার উপরে। [অথচ অনেক ফকীহ্‌-ই বিষয়টি অনবগত।] আমরা জবাবে বলে থাকি যে, দলিল জ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত। অর্থাৎ প্রতিটি কাজে সফরসঙ্গীর সাহায্য কামনা বৈধতার জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। যাহোক, প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত, আর হুকুম প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার কারণে লক্ষণগত অনুমতি সাব্যস্ত হয়।

قَالَ وَالْمَرْأَةُ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ لِاَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ كَالرِّجَالِ غَيْرَ اَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا لِاَنَّهُ عَوْرَةٌ وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِيْ وَجْهِهَا وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِهَا وَجَافَتْهُ عَنْهُ جَازَ هٰكَذَا رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ وَلِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْاِسْتِظْلَالِ بِالْمَحْمَلِ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَلَا تَرْمَلُ وَلَا تَسْعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ لِاَنَّهُ مُخِلٌّ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَلَا تَحْلِقُ وَلٰكِنْ تُقَصِّرُ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى النِّسَاءَ عَنِ الْحَلْقِ وَاَمَرَهُنَّ بِالتَّقْصِيْرِ وَلِاَنَّ حَلْقَ الشَّعْرِ فِيْ حَقِّهَا مُثْلَةٌ كَحَلْقِ اللِّحْيَةِ فِيْ حَقِّ الرِّجَالِ وَتَلْبَسُ مِنَ الْمَخِيْطِ مَا بَدَا لَهَا لِاَنَّ فِيْ لُبْسِ غَيْرِ الْمَخِيْطِ كَشْفَ الْعَوْرَةِ قَالُوْا وَلَا تَسْتَلِمُ الْحَجَرَ اِذَا كَانَ هُنَاكَ جَمْعٌ لِاَنَّهَا مَمْنُوْعَةٌ عَنْ مُمَاسَّةِ الرِّجَالِ اِلَّا اَنْ تَجِدَ الْمَوْضِعَ خَالِيًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের হুকুম পুরুষের অনুরূপ। কেননা, পুরুষদের মতোই তারাও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। তবে সে তার মাথা খুলে রাখবে না। কেননা, সেটা তার সতরের অন্তর্ভুক্ত। তবে চেহারা খোলা রাখবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্ত্রীলোকের ইহ্রাম হলো তার চেহারার মধ্যে। যদি মুখের উপর কিছু ঝুলিয়ে দেয় এবং তা চেহারা থেকে পৃথক রাখে, তাহলে জায়েজ হবে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এটা হলো হাওদার ছায়া গ্রহণের মতো। আর সে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়বে না। কেননা, এতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। সে রমল করবে না এবং সা'ঈ করার সময় উভয় চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াবে না। কেননা, তা সতর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আর সে মাথা মুণ্ডাবে না, বরং চুল ছাঁটাবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীলোকদের মাথা মুণ্ডানো থেকে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে চুল ছাঁটার আদেশ করেছেন। তা ছাড়া এজন্য যে, তাদের ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডানো বিকৃতি সাধনের হুকুম রাখে− পুরুষের ক্ষেত্রে দাড়ি মুণ্ডানোর ন্যায়। আর সে ইচ্ছামতো সেলাই করা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। [উত্তরসূরি] মাশায়েখে কেরাম বলেন, ভিড় থাকলে তারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে না। কেননা, পুরুষদের সংস্পর্শে যেতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ফাঁকা জায়গা পেয়ে যায়, তাহলে স্পর্শ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, হজের সকল ক্রিয়াকর্মে স্ত্রীলোকদের হুকুম পুরুষদের অনুরূপ। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী− وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ-এ নারী ও পুরুষ সকলকে হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং পুরুষরা যে সকল কার্য সম্পন্ন করবে স্ত্রীলোকেরাও তা-ই করবে। তবে নিম্নোক্ত কিছু বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে−

স্ত্রীলোকদের জন্য মাথা খুলে রাখা জায়েজ নেই। কেননা, তাদের মাথা সতরের অন্তর্ভুক্ত যা ওয়াজিব। তবে চেহারা খোলা রাখবে। কেননা হাদীসে এসেছে, স্ত্রীলোকের ইহ্রাম হলো তার চেহারার মধ্যে। হ্যাঁ স্ত্রীলোকেরা যদি মুখের উপর কাপড় কিংবা অন্য কিছু ঝুলিয়ে রাখে− যা চেহারা থেকে পৃথক থাকে, তাহলে তা জায়েজ। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে এ রূপই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দলিল হলো, মুখের উপর কাপড় কিংবা অন্যকিছু ঝুলানো হাওদার ছায়া গ্রহণের মতো। আর এরূপ ছায়া গ্রহণ করা বৈধ। এজন্য চেহারার উপর কাপড় বা অন্য কিছু ঝুলানো জায়েজ।

স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়বে না। কেননা, এতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। আর তওয়াফে রমল ও সা'ঈ কোনোটিই করবে না। কেননা, উভয়টিই সতর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং স্ত্রীলোকেরা মাথাও মুণ্ডাবে না; বরং চুল ছাঁটাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীলোকদেরকে মাথা মুণ্ডাতে নিষেধ করেছেন এবং চুল ছাঁটার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো− তাদের ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডানো আকৃতি বিকৃতি সাধনের পর্যায়ে পড়ে। যেমন− পুরুষদের ক্ষেত্রে দাড়ি মুণ্ডানো মুছলার [বিকৃতির সাধনের] হুকুম রাখে। স্ত্রীলোকেরা ইহ্রামকালে ইচ্ছামতো সেলাই করা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, সেলাইবিহীন কাপড় পরিধানে সতর খুলে যায়, যা শরিয়তে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকেরা ভিড় থাকলে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার চেষ্টা করবে না। কেননা, এতে পুরুষদের সাথে মাখামাখি হয়ে যায়, অথচ তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তবে ফাঁকা জায়গা পেলে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

قَالَ وَمَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا اَوْ نَذْرًا اَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ اَوْ شَيْئًا مِنَ الْاَشْيَاءِ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَدْ اَحْرَمَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ اَحْرَمَ وَلِاَنَّ سَوْقَ الْهَدْىِ فِىْ مَعْنَى التَّلْبِيَةِ فِىْ اِظْهَارِ الْاِجَابَةِ لِاَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ اِلَّا مَنْ يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ وَاِظْهَارُ الْاِجَابَةِ قَدْ يَكُوْنُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُوْنُ بِالْقَوْلِ فَيَصِيْرُ بِهِ مُحْرِمًا لِاتِّصَالِ النِّيَّةِ بِفِعْلٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْاِحْرَامِ وَصِفَةُ التَّقْلِيْدِ اَنْ يَرْبِطَ عَلٰى عُنُقِ بُدْنَتِهِ قِطْعَةَ نَعْلٍ اَوْ عُرْوَةَ مُزَادَةٍ اَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'জামে সগীরে' বলেন, যে ব্যক্তি উটনীকে কালাদা [কুরবানির পশুর চিহ্ন] পরাল– নফল কিংবা মানত কিংবা শিকারের ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এবং তা নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল, তার ইহ্রাম হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ اَحْرَمَ 'যে ব্যক্তি উটনীকে কালাদা পরাল, সে ইহ্রাম বাঁধল।' তা ছাড়া 'সাড়া দান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তালবিয়া পাঠের সমতুল্য।' কেননা, যে হজ কিংবা উমরা করে সে-ই এ কাজ করে। আর সাড়া দানের প্রকাশ কখনো কর্ম দ্বারাও হয়, যেমন কথা দ্বারা হয়। সুতরাং ইহ্রামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজের সঙ্গে নিয়তের দ্বারা সে মুহরিম হয়ে যাবে। কালাদা পরানোর সুরত হলো– ছেঁড়া জুতা, ডোলের রশি কিংবা গাছের ছাল উটনীর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি স্বীয় উটনীর গলায় কালাদা পরিয়ে দেয়– চাই তা নফল হোক কিংবা মান্নতের হোক কিংবা পূর্বে ইহ্রামের অবস্থায় শিকার করার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য অথবা হজ্জে তামাত্ত'র কুরবানির জন্য কিংবা অন্য কোনো কারণে হোক এবং সে হজের উদ্দেশ্যে স্বীয় উটনী নিয়ে মক্কা শরীফে রওয়ানা হয়ে যায়, তাহলে সে মুহ্রিম বলে গণ্য হবে। চাই সে তালবিয়া পড়ুক বা না পড়ুক। প্রথম দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ اَحْرَمَ 'যে ব্যক্তি উটনীকে কালাদা পরাল, সে ইহ্রাম বেঁধে ফেলল।' দ্বিতীয় দলিল হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর আহ্বানে সাড়া প্রদান করার ক্ষেত্রে কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তালবিয়া পাঠের সমতুল্য। কেননা, কুরবানির পশু সেই সঙ্গে নিয়ে যায় যে হজ বা উমরার ইচ্ছা করে। সাড়া প্রদানের বহিঃপ্রকাশ যেমন কথা অর্থাৎ তালবিয়া পাঠের দ্বারা হয় তেমনি কর্ম তথা পশু সঙ্গে নেওয়ার দ্বারাও হয়। এজন্য সে ব্যক্তি পশু সঙ্গে নেওয়ার কারণে মুহ্রিম হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, হজের নিয়ত এমন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট যা ইহ্রামের বৈশিষ্ট্যভুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কালাদা পরানোর সুরত হলো উটনীর গলায় ছেঁড়া জুতা, ডোলের রশি কিংবা গাছের ছাল ঝুলিয়ে দেওয়া।

فَإِنْ قَلَّدَهَا وَبَعَثَ بِهَا وَلَمْ يَسُقْهَا لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا فَإِنْ تَوَجَّهَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا حَتّٰى يَلْحَقَهَا لِأَنَّ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ هَدْيٌ يَسُوْقُهُ لَمْ يُوْجَدْ مِنْهُ إِلَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ وَبِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لَا يَصِيْرُ مُحْرِمًا فَإِذَا أَدْرَكَهَا وَسَاقَهَا أَوْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ اِقْتَرَنَتْ نِيَّتُهُ بِعَمَلٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ فَيَصِيْرُ مُحْرِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فِي الْاِبْتِدَاءِ قَالَ إِلَّا فِيْ بُدْنَةِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّهَ مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْرَامَ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَجْهُ الْقِيَاسِ فِيْهِ مَا ذَكَرْنَا وَ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ هٰذَا الْهَدْيَ مَشْرُوْعٌ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ نُسُكًا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَضْعًا لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِمَكَّةَ وَيَجِبُ شُكْرًا لِلْجَمْعِ بَيْنَ أَدَاءِ النُّسُكَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلٰى مَكَّةَ فَلِهٰذَا اكْتَفٰى فِيْهِ بِالتَّوَجُّهِ وَفِيْ غَيْرِهِ تَوَقَّفَ عَلٰى حَقِيْقَةِ الْفِعْلِ ـ

অনুবাদ : যদি পশুকে কালাদা পরিয়ে পাঠিয়ে দেয়, নিজে সঙ্গে না যায় তাহলে সে মুহ্‌রিম হবে না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানির পশুর 'কালাদা' পাকিয়ে দিয়েছিলাম। আর তিনি তা পাঠিয়ে দেন এবং হালাল অবস্থায় পরিবারের মধ্যে অবস্থান করেন। লোক মারফত প্রেরণের পর যদি রওয়ানা হয়, তাহলে উক্ত পশুর সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সে মুহ্‌রিম হবে না। কেননা, রওয়ানা হওয়ার সময় তার সঙ্গে যদি হাদী [কুরবানির পশু] না থাকে যা সে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, তাহলে তো তার পক্ষ থেকে নিয়ত ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। আর শুধু নিয়ত দ্বারা মুহ্‌রিম হয় না। আর যদি সে [প্রেরিত পশু পথিমধ্যে] পেয়ে যায় এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যায় কিংবা শুধু পেয়ে গেল, তাহলে তার নিয়ত যেহেতু এমন একটি আমলের সাথে যুক্ত হয়েছে, যা ইহ্‌রামের বৈশিষ্ট্যভুক্ত, সেহেতু সে মুহ্‌রিম হয়ে যাবে। যেমন– শুরু থেকে হাঁকিয়ে নিলে হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হজ্জে তামাত্তু-এর উটনী এর ব্যতিক্রম। কেননা, সে ক্ষেত্রে রওয়ানা দেওয়া মাত্র সে মুহ্‌রিম হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি সে ইহ্‌রামের নিয়ত করে থাকে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। আর ইতঃপূর্বে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা-ই এতে সাধারণ কিয়াস। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, তামাত্তু'র হাদী শরিয়তের পক্ষ থেকে শুরু থেকেই হজের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমলরূপে নির্ধারিত। কেননা, তা মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর দুই ইবাদত [হজ ও উমরা] একত্রে আদায়ের শোকর হিসেবে তা ওয়াজিব। আর অন্যান্য হাদী তো অপরাধজনিত কারণেও ওয়াজিব হতে পারে, যদিও তা মক্কা পর্যন্ত না পৌঁছে। এ কারণেই তামাত্তু'র হাদীর ক্ষেত্রে রওয়ানা হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আর অন্যান্য হাদীর ক্ষেত্রে প্রকৃত আমলের উপর নির্ভরশীল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, যদি কেউ কুরবানির পশুকে কালাদা পরিয়ে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে না যায়- তাহলে সে মুহ্‌রিম হবে না। দলিল হলো- হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীর কালাদা পাকিয়ে দিয়েছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীর পশুকে পাঠিয়ে দেন এবং হালাল অবস্থায় পরিবারে অবস্থান করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, শুধু হাদীর জানোয়ার পাঠিয়ে দেওয়াই মুহ্‌রিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং তাকেও সঙ্গে যাওয়া আবশ্যক। আর হাদীর পশু প্রেরণের পর যদি সে একাকী রওয়ানা হয়, তাহলেও সে মুহ্‌রিম হবে না; বরং মুহ্‌রিম হিসেবে পরিগণিত হবে তখনই যখন প্রেরিত হাদীর সাথে পথিমধ্যে মিলিত হবে। কেননা, রওয়ানা হওয়ার সময়ে তার সঙ্গে কোনো হাদী ছিল না যা সে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে শুধুমাত্র নিয়ত পাওয়া গেল। আর শুধু নিয়তের দ্বারা মুহ্‌রিম হওয়া যায় না- যতক্ষণ না তার সাথে হাদীর পশু থাকে। হ্যাঁ, যদি সে তার প্রেরিত হাদীর পশুর নাগাল পেয়ে যায় এবং তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় কিংবা শুধু নাগাল পেয়ে যায়, তাহলে তার নিয়ত ইহ্‌রামের বৈশিষ্ট্যভুক্ত আমলের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে সে মুহ্‌রিম হয়ে যাবে। যেমন শুরু থেকে যদি সে হাদী হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে সে মুহ্‌রিম হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) একটি ব্যতিক্রম সূরত বর্ণনার্থে বলেন, তামাত্তু'র উটনী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি হাদীর জানোয়ার পাঠিয়ে দেয় অতঃপর সে রওয়ানা করে, তাহলে এর দ্বারাই সে মুহ্‌রিম হবে না- যতক্ষণ না সে হাদীর সাথে মিলিত হবে। কিন্তু তামাত্তু'র হাদীর হুকুম হলো যদি সে প্রথমে হাদীকে পাঠিয়ে দেয় অতঃপর নিজে রওয়ানা হয়, তাহলেই সে মুহ্‌রিম হয়ে যাবে। তার মুহ্‌রিম হওয়া হাদীর নাগাল পাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, রওয়ানা হওয়া মাত্র সে মুহ্‌রিম তবে যখন সে ইহ্‌রামের নিয়ত করে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের হুকুম। আর সাধারণ কিয়াস তো তা-ই, যা আমরা অন্যান্য হাদীর পশুর ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছি।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, তামাত্তু'র হাদী শরিয়তের পক্ষ থেকে শুরু থেকেই হজের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল। হজের অন্তর্ভুক্ত আমল এ কারণে যে, এই হাদী মক্কার সাথে নির্দিষ্ট। আর হজ ও উমরা দুই ইবাদত একত্রে আদায়ের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তা ওয়াজিব। আর তামাত্তু'র হাদী ব্যতীত অন্যান্য হাদীতো অপরাধজনিত কারণেও ওয়াজিব হতে পারে। যদিও সে মক্কায় না পৌঁছে। অর্থাৎ অপরাধজনিত কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে যে হাদী ওয়াজিব তা মক্কার সাথে নির্দিষ্ট নয়। আর এ পার্থক্যের কারণে তামাত্তু'র হাদীর ক্ষেত্রে শুধু রওয়ানা হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আর অন্যান্য হাদীর ক্ষেত্রে প্রকৃত আমল তথা হাদী হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে।

فَإِنْ جَلَّلَ بَدَنَةً أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لِأَنَّ التَّجْلِيلَ لِدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالذِّبَّانِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ وَالْإِشْعَارُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) فَلَا يَكُونُ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ وَعِنْدَهُمَا إِنْ كَانَ حَسَنًا فَقَدْ يَفْعَلُ لِلْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ التَّقْلِيدِ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ وَتَقْلِيدُ الشَّاةِ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ أَيْضًا .

অনুবাদ : আর কেউ যদি উটনীকে চট পরিয়ে দেয় কিংবা কুঁজ আঁচড় কেটে দেয় কিংবা বকরির গলায় কালাদা ঝুলিয়ে দেয়, তাহলে সে মুহ্‌রিম হবে না। কেননা, চট পরানো গরম, শীত ও মাছি থেকে রক্ষার জন্যেও হতে পারে। সুতরাং তা হজের বৈশিষ্ট্য হলো না। কুঁজে আঁচড় কাটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাকরূহ। সুতরাং তা হজের আমলের মধ্যে গণ্য নয়। সাহেবাইনের মতে যদিও তা উত্তম, তবে তা কখনো চিকিৎসার জন্যও হয়ে থাকে। আর কালাদা ঝুলানোর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তা হাদীর সাথেই নির্ধারিত। আর বকরির গলায় কালাদা ঝুলানো প্রচলিত নয় এবং তা সুন্নতও নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ جَلَّلَ بَدَنَةً الخ : إِشْعَارٌ বলা হয় কুঁজে আঁচড় কেটে রক্ত বের করাকে। মাসআলা হলো, কেউ যদি উটনীকে চট পরিয়ে দেয় কিংবা কুঁজে আঁচড় কেটে রক্ত বের করে দেয় কিংবা বকরির গলায় কালাদা পরিয়ে দেয়, তাহলে সে মুহ্‌রিম হবে না– যদিও সে ইহ্‌রামের নিয়ত করে। কেননা, শীত, গরম মাছি থেকে রক্ষার জন্যও কখনো চট পরানো হয়। এজন্য এসব কর্ম হজের বৈশিষ্ট্যভুক্ত নয়। অথচ ইহ্‌রামের ক্ষেত্রে ঐ নিয়তই প্রযোজ্য হবে, যা হজের নির্দিষ্ট কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ وَالْإِشْعَارُ مَكْرُوهٌ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, إِشْعَارٌ [কুঁজে আঁচড় কাটা] -এর দ্বারা মুহ্‌রিম না হওয়ার কারণ হলো, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাকরূহ। আর যা মাকরূহ তা হজের কর্ম হতে পারে না। আর إِشْعَارٌ হজের কর্ম নয় বলে ইহ্‌রামের নিয়ত হজের কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। ফলে সে মুহ্‌রিম হবে না।

সাহেবাইনের মতে إِشْعَارٌ যদিও উত্তম তথা মাকরূহ নয়, তবে তা হজের বৈশিষ্ট্যভুক্ত নয়। কেননা, إِشْعَارٌ কখনো চিকিৎসার জন্যও হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের মতেও যখন তা হজের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তখন তাদের নিকটও সে মুহ্‌রিম বলে গণ্য হবে না। তবে কালাদা ঝুলানোর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তা হাদীর সাথে নির্দিষ্ট, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা করা হয় না। প্রশ্ন হয়, যদি কালাদা ঝুলানো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্ম হয়, তাহলে বকরির গলায় কালাদা ঝুলানোর দ্বারা তো মুহ্‌রিম হওয়ার কথা। অথচ এর দ্বারা মুহ্‌রিম বলে গণ্য হয় না? এর জবাব হলো, বকরির গলায় কালাদা পরানো প্রচলিত নয় এবং তা সুন্নতও সাব্যস্ত নয়; বরং কালাদা পরানোর বিষয়টি উটনীর সাথে নির্দিষ্ট। এজন্য বকরিকে কালাদা পরানোর দ্বারা মুহ্‌রিম হবে না।

قَالَ وَالْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) مِنَ الْإِبِلِ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ فَالْمُسْتَعْجِلُ مِنْهُمْ كَالْمُهْدِيْ بَدَنَةً وَالَّذِيْ يَلِيْهِ كَالْمُهْدِيْ بَقَرَةً فَصَّلَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا اَنَّ الْبُدْنَةَ تُنْبِئُ عَنِ الْبَدَانَةِ وَهِيَ الضَّخَامَةُ وَقَدِ اشْتَرَكَا فِي هٰذَا الْمَعْنٰى وَلِهٰذَا يُجْزِئُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ وَالصَّحِيْحُ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي الْحَدِيْثِ كَالْمُهْدِيْ جَزُوْرًا وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, 'বুদনা' অর্থ উট এবং গরু। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু উট। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার হাদীসে বলেছেন– فَالْمُسْتَعْجِلُ مِنْهُمْ كَالْمُهْدِيْ بَدَنَةً وَالَّذِيْ يَلِيْهِ كَالْمُهْدِيْ بَقَرَةً 'যে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয় সে যেন 'বাদানাহ্' [উটনী] কুরবানি করল আর যে তারপরে হাজির হলো, সে যেন গাভী কুরবানি করল।' এখানে তিনি উভয়ের [উটনী ও গাভী] মাঝে পার্থক্য করেছেন। আর আমাদের দলিল হলো– বুদনা শব্দটি 'বাদানাহ' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ– স্থূলদেহী। আর এই অর্থের দিক থেকে উটনী ও গাভী দুটিই সমতুল্য। এজন্য উভয়ের প্রতিটি সাতজনের জন্য [কুরবানি করা] যথেষ্ট হয়। আর হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনায় كَالْمُهْدِيْ جَزُوْرًا [গাভী প্রেরণকারী হাদী হিসেবে উট প্রেরণ করার ন্যায়] উল্লেখ রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহরই জানা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'মতন' বর্ণনাকারী তথা ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, 'বুদনা' শব্দটি উট ও গরু উভয়কে বুঝায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু উটকে বুঝায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল জুমার নামাজ সংক্রান্ত হাদীস। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জুমার নামাজে তাড়াতাড়ি গমনকারী ব্যক্তি প্রতিদান ও ছওয়াবের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে উটনীকে হাদী বানিয়ে মক্কায় রওয়ানা হয়। আর যে তারপরে আগমন করে সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে গাভীকে হাদী বানিয়ে প্রেরণ করে। এ হাদীসে বুদনা ও গাভীর মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, গাভী বুদনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস।

আমাদের দলিল হলো, 'বুদনা' -এর আভিধানিক অর্থ– 'বাদানাহ' অর্থাৎ স্থূলদেহী। স্থূলদেহী বড় শরীরবিশিষ্ট জানোয়ারকে বুদনা বলে। এ অর্থ উট ও গাভী উভয়ের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। সুতরাং বুদনা শব্দ উট ও গরু দুটিকেই বুঝাবে। আর এ কারণেই কুরবানিতে উট এবং গরু প্রতিটি সাতজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে পেশকৃত হাদীসের জবাব হলো, সহীহ্ বর্ণনায় كَالْمُهْدِيْ بَدَنَةً -এর স্থলে كَالْمُهْدِيْ جَزُوْرًا এসেছে। جَزُوْرٌ অর্থ–উট। অর্থাৎ যে প্রথম জামে মসজিদে যাবে, সে উট কুরবানি দেওয়ার সমপরিমাণ ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে তারপরে উপস্থিত হবে সে গাভী কুরবানি দেওয়ার সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উট ও গরুর মধ্যে পার্থক্য করেছেন, বুদনা ও গরুর মাঝে পার্থক্য এতে বর্ণিত হয়নি। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অবগত।

بَابُ الْقِرَانِ

اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْاِفْرَادِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْاِفْرَادُ اَفْضَلُ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) اَلتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْقِرَانِ لِاَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِى الْقُرْاٰنِ وَلَا ذِكْرَ لِلْقِرَانِ فِيْهِ وَلِلشَّافِعِيِّ (رحـ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْقِرَانُ رُخْصَةٌ وَلِاَنَّ فِى الْاِفْرَادِ زِيَادَةَ التَّلْبِيَةِ وَالسَّفَرِ وَالْحَلْقِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا اٰلَ مُحَمَّدٍ اَهِلُّوْا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَلِاَنَّ فِيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَاَشْبَهَ الصَّوْمَ مَعَ الْاِعْتِكَافِ وَالْحِرَاسَةَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَعَ صَلٰوةِ اللَّيْلِ وَالتَّلْبِيَةُ غَيْرُ مَحْصُوْرَةٍ وَالسَّفَرُ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ وَالْحَلْقُ خُرُوْجٌ عَنِ الْعِبَادَةِ فَلَا يَتَرَجَّحُ بِمَا ذَكَرَ وَالْمَقْصُوْدُ بِمَا رَوٰى نَفْىُ قَوْلِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ اِنَّ الْعُمْرَةَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ وَلِلْقِرَانِ ذِكْرٌ فِى الْقِرَانِ لِاَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ اَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ اَهْلِهٖ عَلٰى مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ ثُمَّ فِيْهِ تَعْجِيْلُ الْاِحْرَامِ وَاسْتِدَامَةُ اِحْرَامِهِمَا مِنَ الْمِيْقَاتِ اِلٰى اَنْ يَفْرُغَ مِنْهُمَا وَلَا كَذٰلِكَ التَّمَتُّعُ فَكَانَ الْقِرَانُ اَوْلٰى مِنْهُ وَقِيْلَ اَلْاِخْتِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ الْقَارِنَ عِنْدَنَا يَطُوْفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعٰى سَعْيَيْنِ وَعِنْدَهٗ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا ـ

পরিচ্ছেদ : কিরান

অনুবাদ : হজ্জে কিরান হজ্জে তামাত্তু‘ ও ইফরাদ থেকে উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হজ্জে ইফরাদ উত্তম। আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, হজ্জে তামাত্তু‘ কিরান থেকে উত্তম। কেননা, কুরআনে তামাত্তু‘ -এর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কিরানের উল্লেখ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَلْقِرَانُ رُخْصَةٌ 'কিরান হলো শরিয়ত প্রদত্ত একটি রুখসত তথা অবকাশ।' তা ছাড়া এজন্য যে, পৃথক পৃথক হজ ও উমরা পালনে অধিক তালবিয়া, দীর্ঘ সফর ও অধিক হলক রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– يَا اٰلَ مُحَمَّدٍ اَهِلُّوْا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا 'হে মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসারীবর্গ! হজ ও উমরার ইহ্‌রাম তোমরা একসাথে বাঁধো। তা ছাড়া এজন্য যে, এতে দুটি ইবাদতের একত্রীকরণ হয়। সুতরাং তা রোজা ও ই'তিকাফ এবং জিহাদে তাহাজ্জুদ নামাজসহ প্রহরাদার সদৃশ হলো। আর তালবিয়ার তো নির্ধারিত কোনো সংখ্যা নেই এবং সফর

উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত নয়। আর হলক তো ইবাদত থেকে বের হওয়ার প্রক্রিয়া। সুতরাং তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা হজ্জে ইফরাদ অগ্রগণ্য হবে না। আর তিনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার উদ্দেশ্য হলো জাহিলিয়া যুগের অধিবাসীদের এ মন্তব্য নাকচ করা যে, হজের মাসগুলোতে উমরা করা নিকৃষ্টতম পাপ। ইমাম মালিক (র.)-এর বক্তব্যের জবাব হলো, কুরআনে কিরানের উল্লেখ রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ করো।] এর অর্থ হলো- আপন পরিবার-পরিজন থেকে হজ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম বাঁধা। যেমন- আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। তা ছাড়া কিরানে [হজ ও উমরার] ইহ্‌রাম আগে থেকে বাঁধা হয় এবং উভয়ের ইহ্‌রাম মীকাত থেকে শুরু করে উভয় ইবাদত থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। হজ্জে তামাত্তু' এরূপ নয়। সুতরাং কিরান তা থেকে উত্তম হবে। কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের মধ্যে ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যে মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো, আমাদের মতে কিরান হজকারী দুটি তওয়াফ ও দুটি সা'ঈ করতে হয় আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে একটি তওয়াফ ও একটি সা'ঈ করতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَابُ الْقِرَانِ : গ্রন্থকার (র.) 'মুফরিদ'-এর আহকাম বর্ণনান্তে এখন মুরাক্কাব তথা কিরান ও তামাত্তু'র আহকাম সম্পর্কে আলোকপাত করছেন। তবে আমাদের হানাফীদের নিকট 'কিরান' উত্তম হওয়ার কারণে এর আহকাম আগে বর্ণনা করা হয়েছে, তারপর তামাত্তু'র আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুহ্‌রিম চার প্রকার। যথা- ১. মুফরিদ বিল হাজ্জ। প্রথম অনুচ্ছেদে এর বর্ণনা করা হয়েছে। ২. মুফরিদ বিল উমরাহ- যে শুধু অন্তরে উমরা পালনের নিয়ত করে لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ বলে। অতঃপর উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করে। ৩. কিরান। কারিন ঐ ব্যক্তি যে হজ ও উমরার নিয়তে উভয়ের ইহ্‌রাম একই সঙ্গে বেঁধে لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ বলে। প্রথমত উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করত ইহ্‌রাম না খুলেই হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে। ৪. তামাত্তু'। মুতামাত্তি' ঐ ব্যক্তি যে প্রথমত উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করত ইহ্‌রামমুক্ত হয় অতঃপর সে বছরই হজের সময়কালে হজের ইহ্‌রাম বেঁধে হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে।

قَوْلُهُ اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ الخ : মুহ্‌রিম তিন ভাগে বিভক্ত- ১. مُفْرِدٌ بِالْحَجِّ ২. قَارِنٌ ৩. مُتَمَتِّعٌ এ তিন প্রকারের উত্তমতার মধ্যে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, আমাদের হানাফীদের মতে কিরান হজ উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইফরাদ উত্তম। আর ইমাম মালিক (র.)-এর মতে হজ্জে তামাত্তু' উত্তম।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, কুরআন শরীফে তামাত্তু'র উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ আর কুরআনে 'কিরান' -এর উল্লেখ নেই। আর এ কথা স্বীকৃত যে, কুরআনে যা উল্লেখ রয়েছে তা যা উল্লেখ নেই তার তুলনায় উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস- اَلْقِرَانُ رُخْصَةٌ অর্থাৎ কিরান হলো শরিয়ত প্রদত্ত একটি রুখসত বা অবকাশ। আর ইফরাদ হলো আজীমত। উল্লেখ্য, রুখসতের তুলনায় আজীমত-কে গ্রহণ করা উত্তম। সুতরাং ইফরাদ উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, হজ্জে ইফরাদের মধ্যে তালবিয়া, সফর ও মাথামুণ্ডন- তিনটিই অধিক পাওয়া যায়। অপরদিকে হজ্জে কিরান আদায়কারী হজ ও উমরার জন্য একটি মাত্র সফর করে, তালবিয়া বলে একবার এবং মাথামুণ্ডনও করে একবার। আর ইফরাদ হজ আদায়কারী শুধুমাত্র হজের সফর করে, তালবিয়া পাঠ করে ও মাথামুণ্ডন করে। অর্থাৎ কিরানে বর্ণিত তিনটি বিষয় [সফর, তালবিয়া ও মাথা মুণ্ডন] হজ ও উমরা উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায় আর হজ্জে ইফরাদে তা হয় না বলে হজ্জে ইফরাদ উত্তম।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– হে মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুচরবর্গ! তোমরা হজ ও উমরার ইহ্‌রাম একসাথে বাঁধো। এ হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় অনুসারীবর্গকে হজ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম একসাথে বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। আর হজ ও উমরার ইহ্‌রাম একসাথে বাঁধাকেই কিরান বলা হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় অনুসারীবর্গকে কিরানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ কথা প্রকাশ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তম বিষয়েরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন, অনুত্তম কোনো কিছুর নির্দেশ দেন না। সুতরাং সাব্যস্ত হয় যে, কিরান হজ উত্তম।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, হজ্জে কিরানে দুটি ইবাদত তথা হজ ও উমরাকে একত্রে আদায় করা হয়। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, কোনো ব্যক্তি রোজা ও ই'তিকাফ উভয়টিকে একত্রে আদায় করে এবং জিহাদের মাঠে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের সৈনিকদেরকে প্রহরা দেয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিলের [যুক্তির] জবাবে বলা হয় যে, তালবিয়ার নির্ধারিত কোনো সংখ্যা নেই। সুতরাং হজ্জে কিরান আদায়কারী ইফরাদ আদায়কারীর তুলনায় অধিক তালবিয়া বলতে পারে। আর সফর উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত নয়। উদ্দেশ্য হলো হজ। আর তা আদায় করার মাধ্যম হলো সফর। এজন্য সফর অধিক হওয়ার কারণে ইফরাদকে প্রাধান্য দেওয়া সাব্যস্ত হবে না। অপরদিকে মাথা মুণ্ডানো ভিন্ন কোনো ইবাদত নয়; বরং তা ইবাদত থেকে বের হওয়ার প্রক্রিয়া। এজন্য হলকের কারণেও প্রাধান্য সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উল্লিখিত রেওয়ায়েতের জবাব হলো, اَلْقِرَانُ رُخْصَةٌ-এ কিরান রুখসত ও ইফরাদ আযীমত–এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহিলিয়া যুগের অধিবাসীদের একটি বাতিল মন্তব্যকে নাকচ করা উদ্দেশ্য। তাদের মন্তব্য ছিল, হজের মাসগুলোতে উমরা করা নিকৃষ্টতম পাপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ মন্তব্য ভুল; বরং কিরান হলো শরিয়ত প্রদত্ত রুখসত তথা অবকাশ যা আযীমত হিসেবে গণ্য। সুতরাং কিরানের অনুমতির পাশাপাশি হজের মাসগুলোতে উমরা করারও অনুমতি দেওয়া হলো।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেন, কুরআন মজীদে কিরানের উল্লেখ নেই কথাটি ভুল। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আপন পরিবার-পরিজন থেকে হজ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম একসাথে বাঁধা। আর হজ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম একসাথে বাঁধার নামই কিরান।

হিদায়া গ্রন্থকার অগ্রগণ্যের কারণ বর্ণনার্থে বলেন, কিরানে হজের ইহ্‌রাম তাড়াতাড়ি বাঁধা হয় আর এটা একটি প্রশংসিত গুণ। দ্বিতীয়ত কিরানে হজ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম মীকাত থেকে শুরু করে উভয়টির কার্যাবলি থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে হজ্জে তামাত্তু'-এর মধ্যে উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করার পর ইহ্‌রামমুক্ত হতে হয়। আর ইহ্‌রাম দীর্ঘস্থায়ী হওয়াও একটি প্রশংসিত বিষয়। এজন্য হজ্জে কিরান– তামাত্তু' থেকে উত্তম।

কেউ কেউ বলেন, আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যে মতপার্থক্যের [আহনাফের নিকট কিরান উত্তম। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট ইফরাদ উত্তম] ভিত্তি হলো, আহনাফের মতে কিরান হজকারী হজ ও উমরার জন্য দুটি তওয়াফ ও দুটি সা'ঈ করে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, তওয়াফ ও সা'ঈ পরস্পর একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হয়। কেননা, একটি তওয়াফ ও একটি সা'ঈ করতে হয়। সুতরাং হজ ও উমরা উভয়টিকে একত্রিকরণে তাঁর মতে এক ধরনের অসম্পূর্ণতা থেকে যায়, পৃথক পৃথকভাবে তা পালন করার তুলনায়। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট হজ্জে ইফরাদ উত্তম।

বি. দ্র. এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ধরনের হজ করেছেন? সেটি নির্ধারণ করা নিয়ে। হানাফীদের মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরান হজ করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, হজ্জে তামাত্তু' করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ইফরাদ হজের কথা বলেন। প্রত্যেকের দলিল-প্রমাণ হাদীসের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

قَالَ وَصِفَةُ الْقِرَانِ اَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَيَقُوْلُ عَقِيْبَ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ لِاَنَّ الْقِرَانَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ قَوْلِكَ قَرَنْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ اِذَا جُمِعَتْ بَيْنَهُمَا وَكَذَا اِذَا دَخَلَ حَجَّةً عَلٰى عُمْرَةٍ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ لَهَا اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ لِاَنَّ الْجَمْعَ قَدْ تَحَقَّقَ اِذِ الْاَكْثَرُ مِنْهَا قَائِمٌ وَمَتٰى عَزَمَ عَلٰى اَدَائِهِمَا يَسْئَلُ التَّيْسِيْرَ فِيْهِمَا وَقَدَّمَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ فِيْهِ وَكَذٰلِكَ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا لِاَنَّهُ يَبْدَأُ بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَذٰلِكَ يَبْدَأُ بِذِكْرِهَا وَاِنْ اَخَّرَ ذٰلِكَ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ لَا بَأْسَ بِهِ لِاَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ وَلَوْ نَوٰى بِقَلْبِهٖ وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا فِى التَّلْبِيَةِ اَجْزَاهُ اِعْتِبَارًا بِالصَّلٰوةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কিরানের বিবরণ হলো– মীকাত থেকে একসঙ্গে হজ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং [ইহ্‌রামের দু রাকাত] নামাজের পর বলবে– 'হে আল্লাহ! আমি হজ ও উমরার নিয়ত করেছি। সুতরাং এ দুটি তুমি আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করো।' কেননা, কিরান অর্থই হলো হজ ও উমরাকে একত্র করা। যেমন বলা হয়– قَرَنْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ [এই জিনিসটি ঐ জিনিসের সাথে যুক্ত করলাম] যখন দুটি জিনিসকে একত্র করা হয়। একইভাবে কিরান হয়ে যাবে যদি উমরার তওয়াফের চার চক্কর শেষ হওয়ার পূর্বে হজকে উমরার মাঝে দাখিল করে। যেহেতু উভয় ইবাদতকে একত্র করা বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা, তওয়াফের অধিকাংশ চক্কর এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আর যখন উভয়টি আদায় করার সংকল্প করল, তখন উভয়টিকে সহজ করে দেওয়ার জন্য [আল্লাহর নিকট] প্রার্থনা করবে। অনুরূপভাবে [তালবিয়ার ক্ষেত্রে] একসাথে বলবে– لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ কেননা, সেতো উমরার কাজ আগে করবে। সুতরাং তালবিয়াতেও উমরার কথা আগে উল্লেখ করবে। অবশ্য যদি দু'আ ও তালবিয়ায় উমরার কথা পরে উল্লেখ করে, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, وَاوْ অব্যয়টি নিছক যুক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত [অগ্র-পশ্চাৎ অর্থে নয়]। যদি শুধু অন্তরে নিয়ত করে এবং তালবিয়াতে হজ ও উমরার কথা উল্লেখ না করে, তাহলেও যথেষ্ট হবে। সালাতের উপর কিয়াস করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ আবুল হাসান (র.) বলেন, কিরানের পদ্ধতি হলো, মীকাত থেকে একসঙ্গে হজ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে ও তালবিয়া বলবে। ইহ্‌রামের নামাজের পর এ দোয়া পড়বে– 'হে আল্লাহ! আমি হজ ও উমরার নিয়ত করেছি। সুতরাং এ দুটি তুমি আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে এ দু'টি গ্রহণ করো।

দলিল হলো, قِرَانٌ অর্থ–হজ ও উমরাকে একত্রিত করা। যেমন– যখন দুটি জিনিসকে একত্র করা হয়, তখন বলা হয়– قَرَنْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ -এ জিনিসটি ঐ জিনিসের সাথে যুক্ত করলাম।

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে সাত চক্কর তওয়াফের মধ্যে চার চক্কর শেষ হওয়ার পূর্বে হজের নিয়ত করে, তাহলেও সে ব্যক্তি কিরান হজকারী হবে। কেননা, এখনো তওয়াফের অধিকাংশ চক্কর অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং অধিকাংশকে সম্পূর্ণের স্থলবর্তী করে বলা হবে যে, এখনো সে উমরার তওয়াফ করেনি। আর যখন উমরার তওয়াফ হয়নি, তখন হজ ও উমরা উভয়কে একত্র করা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর উভয়কে একত্র করার নামই কিরান। এজন্য এ সুরতেও কিরান পাওয়া যায়। আর যখন উভয়টি আদায় করার প্রতিজ্ঞা নিল তখন উভয়টিকে সহজ করে দেওয়ার জন্য দোয়া করবে। উমরার কার্যাবলি প্রথমত আদায় করবে, অতঃপর হজের কার্যাদি সম্পন্ন করবে। তালবিয়ার ক্ষেত্রে বলবে– لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا কেননা, কিরানের সুরতে উমরার কাজ আগে করা হয় বলে তালবিয়াতেও উমরার কথা আগে উল্লেখ করবে। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি দোয়া ও তালবিয়ায় উমরার কথা পরে উল্লেখ করে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ -এর মধ্যে وَاوْ অব্যয়টি নিছক যুক্ত করার অর্থে এসেছে। তবে উমরাকে অগ্রবর্তী করা উত্তম। কেননা, আল্লাহ তা'আলার স্বীয় বাণী– فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ -এর মধ্যে উমরাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি শুধু অন্তরে নিয়ত করে এবং তালবিয়াতে হজ ও উমরার কথা উল্লেখ না করে, তাহলেও যথেষ্ট হবে। যেমন, নামাজের ক্ষেত্রে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শর্ত নয় তেমনিভাবে এখানেও মুখে নিয়ত বলা শর্ত নয়।

فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ إِبْتَدَأَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمَلُ فِي الثَّلْثِ الْأَوَّلِ مِنْهَا وَيَسْعٰى بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهٰذَا أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَبْدَأُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَيَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَسَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَيَسْعٰى بَعْدَهُ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْمُفْرِدِ وَيُقَدِّمُ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَالْقِرَانُ فِيْ مَعْنَى الْمُتْعَةِ وَلَا يَحْلِقُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ لِأَنَّ ذٰلِكَ جِنَايَةٌ عَلٰى إِحْرَامِ الْحَجِّ وَإِنَّمَا يَحْلِقُ فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا يَحْلِقُ الْمُفْرِدُ .

অনুবাদ : মক্কায় প্রবেশ করার পর প্রথম কাজ হিসেবে বাইতুল্লাহর সাত চক্কর তওয়াফ করবে এবং সাতের প্রথম তিনটিতে رَمَلْ করবে। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করবে। এগুলো হলো উমরার কার্যক্রম। এরপর হজের আমল শুরু করবে। অর্থাৎ সাত চক্কর তাওয়াফুল কুদূম করবে তারপর সা'ঈ করবে। যেমন– হজ্জে ইফরাদকারীর ক্ষেত্রে আমরা বর্ণনা করেছি। আর উমরার কার্যসমূহকে অগ্রবর্তী করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ আর কিরানে তো তামাত্তু'রই মর্ম রয়েছে। হজ ও উমরার মাঝখানে মাথা মুণ্ডাবে না। কেননা, হজের ইহ্রামের প্রতি এটি অপরাধ। আর সে কুরবানির দিন মাথা মুণ্ডাবে। যেমন– ইফরাদকারী মাথা মুণ্ডায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, কিরান হজকারী মক্কা শরীফে প্রবেশ করার পর তওয়াফে কুদূম করবে না; বরং উমরার কাজ শুরু করবে। প্রথমত তওয়াফ করবে এবং তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে رَمَلْ করবে। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করবে। এগুলো হলো উমরার কার্যক্রম। অতঃপর হজের আমল শুরু করবে। অর্থাৎ হজ্জে ইফরাদ সম্পাদনকারীর ন্যায় প্রথমে তওয়াফে কুদূম করবে, তারপর সা'ঈ করবে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, কিরান হজকারী প্রথমে উমরার কার্যসমূহ সম্পন্ন করবে, অতঃপর হজের আমল আদায় করবে। এ ক্রমবিন্যাস কুরআন মাজীদ থেকে গৃহীত। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ -এর মধ্যে উমরাকে শুরুতে আর হজকে শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হজ্জে তামাত্তু'-এর ক্ষেত্রে। আর কিরানে তো কার্যত তামাত্তু'-এর মর্ম রয়েছে। কেননা, কিরান ও তামাত্তু' উভয়টিতে দুটি ইবাদত– উমরা ও হজ এক সফরে সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং তামাত্তু'-এর ক্ষেত্রে যে ক্রমবিন্যাস কিরানের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। তথা উমরার কার্যসমূহকে অগ্রবর্তী করা হবে আর হজের কার্যক্রম শেষে আদায় করা হবে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, কিরান হজকারী উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করার পর মাথা মুণ্ডাবে না কিংবা চুল ছাঁটাবে না। কেননা, সে উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করার দ্বারা ইহ্রামমুক্ত হয় না; বরং সে ইহ্রাম অবস্থায়ই থাকে। এজন্য যদি সে মাথা মুণ্ডন করে কিংবা চুল ছাঁটে, তাহলে হজের ইহ্রাম অবস্থায় অপরাধ করল। এটা নিষিদ্ধ। তবে সে কুরবানির দিন মাথা মুণ্ডাবে, যেমন ইফরাদকারী মাথা মুণ্ডায়।

وَيَتَحَلَّلُ بِالْحَلْقِ عِنْدَنَا لَا بِالذَّبْحِ كَمَا يَتَحَلَّلُ الْمُفْرِدُ ثُمَّ هٰذَا مَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَطُوْفُ طَوَافًا وَاحِدًا وَيَسْعٰى سَعْيًا وَاحِدًا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلِاَنَّ مَبْنَى الْقِرَانِ عَلَى التَّدَاخُلِ حَتّٰى اِكْتُفِىَ فِيْهِ بِتَلْبِيَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَفَرٍ وَاحِدٍ وَحَلْقٍ وَاحِدٍ فَكَذٰلِكَ فِى الْاَرْكَانِ وَلَنَا اَنَّهٗ لَمَّا طَافَ صُبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ طَوَافَيْنِ وَسَعٰى سَعْيَيْنِ قَالَ لَهٗ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَلِاَنَّ الْقِرَانَ ضَمُّ عِبَادَةٍ اِلٰى عِبَادَةٍ وَ ذٰلِكَ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِاَدَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكَمَالِ وَلِاَنَّهٗ لَا تَدَاخُلَ فِى الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُوْدَةِ وَالسَّفَرُ لِلتَّوَسُّلِ وَالتَّلْبِيَةُ لِلتَّحْرِيْمِ وَالْحَلْقُ لِلتَّحَلُّلِ فَلَيْسَتْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءُ بِمَقَاصِدَ بِخِلَافِ الْاَرْكَانِ اَلَا تَرٰى اَنَّ شُفْعَىِ التَّطَوُّعِ لَا يَتَدَاخَلَانِ وَبِتَحْرِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ يُؤَدَّيَانِ وَمَعْنٰى مَا رَوَاهُ دَخَلَ وَقْتُ الْعُمْرَةِ فِىْ وَقْتِ الْحَجِّ ـ

অনুবাদ : এবং আমাদের মতে মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে হালাল হবে, জবাই করার মাধ্যমে নয়, যেমন– হজ্জে ইফরাদকারী হালাল হয়। এ হলো আমাদের মাযহাব। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কিরান হজকারী একটি তওয়াফ ও একটি সা'ঈ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া হজ্জে কিরানের ভিত্তি হলো পরস্পর প্রবিষ্টতার উপর। এ কারণেই তো তাতে এক তালবিয়া ও এক সফর এবং এক হলক যথেষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং রুকনসমূহের ব্যাপারেও এরূপ হবে। আমাদের দলিল হলো, সুবাই ইবনে মা'বাদ যখন দুটি তওয়াফ ও দুটি সাঈ করেছিলেন, তখন হযরত ওমর (রা.) তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নতের দিকে পথপ্রাপ্ত হয়েছ। তা ছাড়া কিরান অর্থই হলো একটি ইবাদতকে অন্য একটি ইবাদতের সাথে যুক্ত করা। আর তা প্রতিটি ইবাদতের আমল আলাদাভাবে পূর্ণরূপে আদায় করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে। আর এজন্য যে, নির্দিষ্ট ইবাদতের মধ্যে প্রবিষ্টতা প্রয়োগ হয় না। আর সফর তো হলো ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম এবং তালবিয়া হলো ইহ্রাম বাঁধার জন্য আর মাথা মুণ্ডানো হলো ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য। সুতরাং এ সকল কাজ তো উদ্দেশ্যমূলক নয়। পক্ষান্তরে রুকনসমূহ হলো উদ্দিষ্ট। তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, নফল নামাজের দুই দুই রাকাত একত্রে আদায় করলে পরস্পর প্রবিষ্ট হয় না, অথচ এক তাহ্রিমা দ্বারাই তা আদায় করা যায়। তাঁর [ইমাম শাফেয়ীর] বর্ণিত রেওয়ায়েতের অর্থ হলো উমরার ওয়াক্ত হজের ওয়াক্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, আমাদের মতে কিরান হজকারী মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে ইহ্রাম থেকে মুক্ত হবে, জবাই-এর মাধ্যমে নয়। যেমন– হজ্জে ইফরাদকারী মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে হালাল হয়। ইহ্রাম থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে জবাই -এর কোনো দখল নেই। সুতরাং কিরানকারী যদি কুরবানির দিবসে জবাইয়ের পরে সুগন্ধি কিংবা অন্য কিছু ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর জরিমানা তথা দম আবশ্যক হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কিরানকারী হজ ও উমরা উভয়ের কার্যাবলি পৃথক পৃথকভাবে আদায় করবে। এ হলো আমাদের মাযহাব। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কিরানকারী হজ ও উমরা উভয়টির জন্য একটি তওয়াফ ও একটি সা'ঈ করবে। ইমাম মালিক (র.)-এর মাযহাবও এটিই। আর ইমাম আহমদ (র) থেকেও একটি বর্ণনা অনুরূপ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী– دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ 'কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে।' এ হাদীসের আলোকে হজের কার্যসমূহ উমরার জন্যও যথেষ্ট। অর্থাৎ হজের তওয়াফ ও সা'ঈ উমরার তওয়াফ ও সা'ঈর জন্য যথেষ্ট। উমরার জন্য আলাদা তওয়াফ ও সা'ঈ-এর প্রয়োজন নেই, অন্যথায় উমরা হজের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, কিরানের ভিত্তিই হচ্ছে পরস্পর প্রবিষ্টতার উপর। এ কারণেই তাতে হজ ও উমরা উভয়ের জন্য এক তালবিয়া ও এক সফর এবং হালাল হওয়ার জন্য এক হলক যথেষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এভাবে রুকনসমূহ তথা তওয়াফ ও সা'ঈ পরস্পর প্রবিষ্ট হবে– এমনকি উভয়ের জন্য এক তওয়াফ ও এক সা'ঈ যথেষ্ট।

আমাদের দলিল হলো, যখন সুবাই ইবনে মা'বাদ কিরান হজ আদায়কালে দুটি তওয়াফ ও দুটি সা'ঈ করেছিলেন তখন হযরত ওমর (রা.) তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নতের দিকে পথপ্রাপ্ত হয়েছ। এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত হলো, কিরানকারী দুটি তওয়াফ ও দুটি সা'ঈ করবে।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, কিরান অর্থই হচ্ছে একটি ইবাদতকে অন্য একটি ইবাদতের সঙ্গে যুক্ত করা। আর তা প্রতিটি ইবাদতের আমল আলাদাভাবে পূর্ণরূপে আদায় করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে।

আমাদের তৃতীয় দলিল ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর যুক্তির জবাব হলো, নির্দিষ্ট ইবাদতের মধ্যে প্রবিষ্টতা প্রয়োগ হয় না। যেমন– এক নামাজকে অন্য নামাজের স্থলবর্তী করে দুই নামাজে প্রবিষ্টতা প্রয়োগ হয় না। আর সফরতো হলো ইবাদত পর্যন্ত পৌছার মধ্যম। আর তালবিয়া হলো ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য, আর মাথা মুণ্ডানো হলো ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য। এ তিনটি কাজই মাধ্যম পর্যায়ের। পক্ষান্তরে রুকনসমূহ হলো উদ্দিষ্ট। সুতরাং ওগুলোর উপর রুকনসমূহের কিয়াস যথার্থ নয়। লক্ষণীয় যে, নফল নামাজে দুই দুই রাকাত একত্রে আদায় করলে পরস্পর প্রবিষ্ট হয় না। অর্থাৎ নফল নামাজ দুই দুই রাকাত একত্রে আদায় করলে চার রাকাত আদায় হয় না। অথচ দুই দুই চার রাকাত নফল নামাজ একত্রে আদায় করা যায়–এক তাহ্‌রীমায়। সুতরাং তাহ্‌রীমা যা নামাজ আদায়ের মাধ্যম, দুই দুই চার রাকাত নামাজের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু ইবাদতের রুকনসমূহ্ একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হবে না।

অন্যথায় দুই দুই রাকাত পরস্পর প্রবিষ্ট হয়ে শুধু দুই রাকাত আদায় হবে এমনকি হাজারো দুই দুই রাকাত নামাজ দুই রাকাত বলে পরিগণিত হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীস– 'কিয়ামাত পর্যন্ত উমরা হজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে'–এর মর্মার্থ হলো উমরার ওয়াক্ত হজের ওয়াক্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর দ্বারা জাহিলিয়া যুগের অধিবাসীদের মন্তব্য 'হজের মাসসমূহে উমরা করা নিকৃষ্টতর পাপ'-কে নাকচ করা উদ্দেশ্য।

قَالَ وَإِنْ طَافَ طَوَافَيْنِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ وَسَعٰى سَعْيَيْنِ يُجْزِيْهِ لِأَنَّهُ أَتٰى بِمَا هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَسَاءَ بِتَاخِيْرِ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَتَقْدِيْمِ طَوَافِ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ التَّقْدِيْمَ وَالتَّاخِيْرَ فِي الْمَنَاسِكِ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ طَوَافُ التَّحِيَّةِ سُنَّةٌ وَتَرْكُهُ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ فَتَقْدِيْمُهُ أَوْلٰى وَالسَّعْيُ بِتَاخِيْرِهِ بِالْاِشْتِغَالِ بِعَمَلٍ اٰخَرَ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ فَكَذَا بِالْاِشْتِغَالِ بِالطَّوَافِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কিরানকারী উমরা ও হজের জন্য প্রথমেই দুই তওয়াফ করে নেয় এবং এরপর দুই সা'ঈ করে, তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট। কেননা, তার উপর যা কর্তব্য ছিল, তা সে আদায় করেছে। তবে উমরার সা'ঈ বিলম্বিত করায় এবং তওয়াফে কুদূমকে উমরার সা'ঈর উপর অগ্রবর্তী করায় সে মন্দ কাজ করল। তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে এ হুকুম স্পষ্ট। কেননা, তাদের মতে উমরা ও হজের কোনো কাজ অগ্রবর্তী বা বিলম্বিত করার কারণে দম ওয়াজিব হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তওয়াফে কুদূম হলো সুন্নত। আর তা তরকের দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং সুন্নতকে অগ্রবর্তী করার দ্বারা দম ওয়াজিব না হওয়া আরো স্বাভাবিক। আর অন্য আমলে ব্যস্ত হওয়ার কারণে সা'ঈকে বিলম্বিত করার দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং তওয়াফ সম্পাদনে সা'ঈ বিলম্বিত হওয়ার কারণে দম ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, কিরানকারী যদি দুটি তওয়াফ করে অর্থাৎ উমরার জন্য সাত চক্করের এক তওয়াফ এবং হজের তওয়াফে কুদূম করে অতঃপর দুই সা'ঈ করে– একটি উমরার জন্য অপরটি হজের জন্য, তাহলে তা জায়েজ। কেননা, তার উপর অর্পিত কর্তব্য সে আদায় করেছে। তবে উমরার সা'ঈ তওয়াফে কুদূম থেকে বিলম্বিত করায় সে মন্দ কাজ করল। অথচ উমরার সা'ঈ তওয়াফে কুদূমের উপর অগ্রবর্তী করতে হয়। এখানে তওয়াফে কুদূম উমরার সা'ঈ থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে। অথচ তা বিলম্বিত করতে হয়। তবে এই অগ্রবর্তী কিংবা বিলম্বিত করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইনের নিকট দম ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো, তাদের মতে উমরা ও হজের কোনো কাজ অগ্রবর্তী বিলম্বিত করার কারণে দম ওয়াজিব হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তওয়াফে কুদূম সুন্নত। আর তা তরকের দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং সুন্নতকে অগ্রবর্তী করার দ্বারা দম ওয়াজিব না হওয়া আরো স্বাভাবিক। আর উমরার সা'ঈ তওয়াফে কুদূম থেকে বিলম্বিত করার দ্বারাও দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, তওয়াফ ব্যতীত অন্যকোনো আমলে ব্যস্ত হওয়ার কারণে সা'ঈকে বিলম্বিত করার দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। যেমন– উমরার তওয়াফের পর পানাহার কিংবা বিশ্রাম গ্রহণ করত উমরার সা'ঈ করলে তার উপর জরিমানাস্বরূপ কোনো কিছুই ওয়াজিব হয় না। মূলত এমনিভাবে হজের তওয়াফে কুদূমে ব্যস্ত থাকার কারণে যদি সা'ঈ বিলম্বিত হয়ে যায়, তাহলেও দম ওয়াজিব হবে না।

قَالَ وَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ سُبُعَ بَدَنَةٍ فَهٰذَا دَمُ الْقِرَانِ لِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْمُتْعَةِ وَالْهَدْىُ مَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ فِيْهَا وَالْهَدْىُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَلٰى مَا نَذْكُرُهُ فِيْ بَابِهٖ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَأَرَادَ بِالْبَدَنَةِ هُنَا الْبَعِيْرَ وَإِنْ كَانَ إِسْمُ الْبَدَنَةِ يَقَعُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَقَرِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَكَمَا يَجُوْزُ سُبُعُ الْبَعِيْرِ يَجُوْزُ سُبُعُ الْبَقَرَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির দিন যখন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে তখন একটি বকরি কিংবা একটি গরু কিংবা একটি উট অথবা উটের এক-সপ্তমাংশ কুরবানি দেবে। এ হলো কিরানের দম। কেননা, এতে তামাত্তু' -এর মর্ম রয়েছে। তামাত্তু'-এর ক্ষেত্রে হাদী ওয়াজিব হওয়া কুরআনের ভাষ্যে প্রমাণিত। আর হাদী উট, গরু কিংবা বকরি দ্বারা হয়ে থাকে। হাদী অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। ইমাম কুদূরী (র.) 'বাদানাহ' দ্বারা এখানে উট উদ্দেশ্য করেছেন, যদিও 'বাদানাহ' শব্দটি উট ও গরু উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন– ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি। উটের সাত ভাগের এক ভাগ যেমন জায়েজ তেমনি গরুর সাত ভাগের একভাগ জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কিরানকারী কুরবানির দিনে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর একটি বকরি, উট, গরু কিংবা উটের এক-সপ্তমাংশ কুরবানি দেবে। এর নাম কিরানের দম। এ কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো– কিরান হজ ও উমরাকে একত্রিকরণটি তামাত্তু'র অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তামাত্তু'র ক্ষেত্রে হাদী ওয়াজিব হওয়া কুরআনের ভাষ্যে প্রমাণিত। যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ সুতরাং হজ্জে তামাত্তু'র ক্ষেত্রে যেমন কুরবানি ওয়াজিব হয় তেমনি কিরানেও কুরবানি করা ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদী উট, গরু কিংবা বকরি দ্বারা হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত আলোচনা হাদী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। আর 'বাদানাহ' দ্বারা উট উদ্দেশ্য, যদিও শব্দটি উট ও গরু উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং উটের সাত ভাগের এক ভাগ যেমন জায়েজ তেমনি গরুর সাত ভাগের এক ভাগও জায়েজ।

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُذْبَحُ صَامَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فَالنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ فِي التَّمَتُّعِ فَالْقِرَانُ مِثْلُهُ لِأَنَّهُ مُرْتَفَقٌ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالْحَجِّ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ وَقْتُهُ لِأَنَّ نَفْسَهُ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَصُومَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ فَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ وَقْتِهِ رَجَاءَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْأَصْلِ ـ

অনুবাদ : যদি কিরানকারীর নিকট জবাই করার মতো কিছু না থাকে, তাহলে হজের দিনগুলোতে তিন দিন রোজা রাখবে, যার শেষদিন হবে আরাফার দিন। আর সাত দিন রোজা রাখবে আপন পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 'যে ব্যক্তি জবাই করার মতো কিছু না পায় সে হজের সময় তিনদিন রোজা রাখবে। আর সাতটি রোজা রাখবে যখন তোমরা ফিরে আসবে। এ পূর্ণ দশ হলো।' 'নস' যদিও তামাত্তু' সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, কিন্তু কিরানও তার সমতুল্য। কেননা, [এখানেও] সে দুটি ইবাদত আদায়ের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আর আয়াতে 'হজ' শব্দটি দ্বারা হজের সময় উদ্দেশ্য, আল্লাহই ভালো জানেন। কেননা, হজ স্বীয় পাত্র হতে পারে না। তবে সর্বোত্তম হলো ইয়াওমুত তারবিয়ার একদিন পূর্বে [অর্থাৎ সাত তারিখ থেকে], ইয়াওমুত তারবিয়াতে [আট তারিখে] এবং ইয়াওমে আরাফায় [নয় তারিখ] এ তিন দিন রোজা রাখা। কেননা, রোজা হলো হাদীর স্থলবর্তী। সুতরাং মূল জিনিস তথা হাদী সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার প্রত্যাশায় শেষ সময় পর্যন্ত রোজাকে বিলম্বিত করাই মোস্তাহাব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিরানকারী যদি কুরবানি করতে অক্ষম হয় যে, কুরবানি করা তার পক্ষে সম্ভব নয় কিংবা সম্ভব, তবে কুরবানির জন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার উপর দশটি রোজা রাখা ওয়াজিব। তিনটি রোজা রাখবে হজের দিনগুলোতে আর সাতটি রোজা রাখবে আপন পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

এ আয়াত যদিও তামাত্তু' সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, কিন্তু কিরানও তার সমতুল্য। কেননা, কিরানকারী ও তামাত্তু'কারী উভয়ে হজ ও উমরা দুটি ইবাদত আদায় করে। সুতরাং এ সাদৃশ্যের কারণে তামাত্তু'-এর ক্ষেত্রে যে হুকুম, কিরানের ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন– فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ আয়াতে 'হজ' দ্বারা হজের সময় উদ্দেশ্য। কেননা, হজ স্বয়ং পাত্র হতে পারে না। হজের সময় যেহেতু শাওয়াল থেকে শুরু হয়ে যায়, সেহেতু ইহ্‌রাম বাঁধার পর থেকে যখন ইচ্ছা তিনটি রোজা রাখবে। তবে সর্বোত্তম হলো সাত, আট ও নয়-ই জিলহজ রোজা রাখা। কেননা, রোজা হাদীর পরিবর্তে ওয়াজিব হয়েছে। এজন্য রোজাকে হাদী সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার প্রত্যাশায় শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করাই মোস্তাহাব। যেমন– যে ব্যক্তি পানি পায় না তার জন্য তাইয়াম্মুম করে নামাজ পড়াকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা মোস্তাহাব।

وَإِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ وَمَعْنَاهُ بَعْدَ مَضِيِّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِيْهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوْزُ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرُّجُوْعِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمَقَامَ فَحِيْنَئِذٍ يُجْزِيْهِ لِتَعَذُّرِ الرُّجُوْعِ وَلَنَا أَنَّ مَعْنَاهُ رَجَعْتُمْ عَنِ الْحَجِّ أَيْ فَرَغْتُمْ إِذِ الْفَرَاغُ سَبَبُ الرُّجُوْعِ إِلَى أَهْلِهِ فَكَانَ الْأَدَاءُ بَعْدَ السَّبَبِ فَيَجُوْزُ وَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتّٰى أَتٰى يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا الدَّمُ.

অনুবাদ : আর যদি হজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর মক্কায় থাকা অবস্থায় সাতটি রোজা রাখে, তাহলে তাও জায়েজ হবে। এর অর্থ হলো– আইয়ামে তাশরীক অতিক্রান্ত হওয়ার পর। কেননা, এ দিনগুলোতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা জায়েজ হবে না। কেননা, তা প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। তবে যদি মক্কায় থেকে যাওয়ার নিয়ত করে, তাহলে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রহিত হওয়ার কারণে মক্কাতে রোজা রাখা যথেষ্ট হবে। আমাদের দলিল হলো, [আয়াতে উল্লিখিত رَجَعْتُمْ] এর অর্থ হলো– যখন তোমরা হজ থেকে প্রত্যাবর্তন কর, অর্থাৎ হজ সম্পন্ন করে ফেল। কেননা, সম্পন্ন হওয়া পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের কারণ। কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পরই রোজা আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং তা জায়েজ হবে। আর যদি তার রোজা ফউত হয়ে যায় এবং ইয়াওমুন নহর এসে পড়ে, তাহলে দম ছাড়া আর কিছু যথেষ্ট হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ الخ : পূর্বোক্ত মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপন পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর সাতটি রোজা রাখবে। তবে কিরানকারী যদি হজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর মক্কায় থাকা অবস্থায় সাতটি রোজা রেখে নেয়, তাহলে তাও জায়েজ হবে। তবে শর্ত হলো তাশরীকের দিনগুলো অতিক্রান্ত হতে হবে। কেননা, এ দিনগুলোতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কিরানকারীর জন্য মক্কায় উক্ত সাতটি রোজা রাখা জায়েজ হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ -এর মধ্যে উক্ত সাতটি রোজাকে প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর প্রত্যাবর্তন তখনই সাব্যস্ত হবে যখন সে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের নিকট পৌঁছে যাবে। এজন্য মক্কায় ঐ সাতটি রোজা রাখা জায়েজ হবে না। তবে সে যদি মক্কায় থেকে যাওয়ার নিয়ত করে, তাহলে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রহিত হওয়ার কারণে মক্কাতে রোজা রাখা যথেষ্ট হবে।

আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– رَجَعْتُمْ অর্থ فَرَغْتُمْ অর্থাৎ যখন তোমরা হজ সম্পন্ন করে ফেল তখন রোজা রাখ। চাই তা মক্কায় হোক, পথিমধ্যে হোক কিংবা পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের পরে হোক।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হজ সম্পন্ন হওয়া পরিবার-পরিজনের নিকটে প্রত্যাবর্তনের কারণ। সুতরাং প্রকৃতার্থে কারণ হলো হজ সম্পন্ন হওয়া। তাই হজ সম্পন্ন হওয়ার পর সাতটি রোজা রাখার অর্থ কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পরই রোজা আদায় করা হচ্ছে। আর কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পর যা পাওয়া যায়, তা আদায় বলে পরিগণিত হবে। এজন্য হজ সম্পন্ন হওয়ার পর সাতটি রোজা রাখার দ্বারাও আদায় বলে সাব্যস্ত হবে, যদিও তা মক্কায় আদায় করা হয়।

قَوْلُهُ وَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ الخ : ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিরানকারী যদি পশু কুরবানি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে দশটি রোজা রাখবে। ইয়াওমুন নাহরের পূর্বে তিনটি রোজা ও হজ সম্পন্ন হওয়ার পর সাতটি রোজা রাখবে। তবে সে যদি ইয়াওমুন নাহরের পূর্বে তিনটি রোজা না রাখে, এমনকি ইয়াওমুন নহর এসে পড়ে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে– রোজা যথেষ্ট হবে না।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَصُوْمُ بَعْدَ هٰذِهِ الْأَيَّامِ لِأَنَّهُ صَوْمٌ مُوَقَّتٌ فَيُقْضٰى كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) يَصُوْمُ فِيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَهٰذَا وَقْتُهُ وَلَنَا النَّهْيُ الْمَشْهُوْرُ عَنِ الصَّوْمِ فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ النَّصُّ أَوْ يَدْخُلُهُ النَّقْصُ فَلَا يَتَأَدّٰى بِهِ مَا وَجَبَ كَامِلًا ـ

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এই [তাশরীকের] দিনগুলোর পরে রোজা রাখবে। কেননা, এগুলো নির্ধারিত সময়ের সিয়াম। সুতরাং রমজানের সওমের ন্যায় এগুলো কাজা করা হবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, আইয়ামে তাশরীকেই সিয়াম পালন করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ 'যে ব্যক্তি কিছু না পায় তার জন্য বিধান হলো হজের সময় তিনদিনের রোজা পালন।' আর এই দিনগুলো হজের সময়। আমাদের দলিল হলো, এই দিনগুলোতে রোজা রাখার নিষেধ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। সুতরাং 'নস' এই হাদীস দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। অথবা এজন্য যে, তা ত্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তা দ্বারা এ রোজা আদায় হবে না, যা পূর্ণ আকারে ওয়াজিব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ রোজা তাশরীকের দিনগুলোর পরে কাজা করবে। আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, তাশরীকের দিনগুলোতেই এ রোজা কাজা করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এ রোজাগুলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ আর যে রোজা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, তা সেই সময়ে আদায় করতে না পারলে কাজার বিধান রয়েছে। যেমন– রমজানের রোজা কেউ আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে কাজা করতে হয় তেমনি এ রোজাও ইয়াওমুন নাহ্‌রের পূর্বে আদায় করতে না পারলে তাশরীকের দিনগুলোর পরে তা কাজা করতে হবে।

ইমাম মালিক (র.) -এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– 'যে ব্যক্তি হাদী না পায়, তার জন্য বিধান হলো হজের সময় তিনদিনের সিয়াম পালন'। আর তাশরীকের দিনগুলোও হজের সময়। কেননা, এ সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়। সুতরাং তাশরীকের দিনগুলো হজের সময়ভুক্ত হওয়ার কারণে কুরআনের ভাষ্যানুসারে এই তিনরোজা এ সময়েই রাখাতে হবে।

আমাদের দলিল হলো, তাশরীকের দিনগুলোতে রোজা রাখার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে– لَا تَصُوْمُوْا فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ 'তোমরা এই দিনগুলোতে রোজা রেখ না।' এটি প্রসিদ্ধ হাদীস। আর প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহকে শর্তযুক্ত করা হয়। এজন্য ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ নসটি 'তাশরীকের দিনগুলো ব্যতীত' শর্তযুক্ত হবে। অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলো ব্যতীত ঐ তিনটি রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি এ নসটি বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা শর্তযুক্ত না হয়, তাহলে নিষেধাজ্ঞার কারণে এ সবদিনে রোজা রাখা ত্রুটিযুক্ত হবে। আর কিরানকারীর উপর দমের পরিবর্তে যে রোজা ওয়াজিব ছিল তা একটি পূর্ণ বিধান। আর নিয়ম হলো, পূর্ণ কোনো কিছুকে অসম্পূর্ণতার সাথে আদায় করা যায় না। যেমন– বিগত দিনের আসরের কাজা নামাজ আজকের সূর্যাস্তের সময় আদায় করা যায় না। মোদ্দাকথা, তাশরীকের দিনগুলোতে ঐ তিনটি রোজা আদায় করা যাবে না। আবার তাশরীকের দিনগুলোর পরেও তা আদায় করা যাবে না। কেননা, দমের পরিবর্তে রোজা ওয়াজিব হওয়ার বিধানটি কিয়াস পরিপন্থিভাবে সাব্যস্ত। আর কিয়াস পরিপন্থিভাবে যে বিষয়টি সাব্যস্ত হয় তা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর তা পালনের সময় ছিল হজের সময়। এজন্যই হজের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ রোজাগুলো কাজা করা সিদ্ধ হবে না; বরং বিধান মূল তথা হাদীর পশুর দিকে ফিরে যাবে। সুতরাং যখনই হাদীর পশু সহজসাধ্য হবে তখনই তার কুরবানি করা ওয়াজিব।

وَلَا يُؤَدِّي بَعْدَهَا لِاَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ وَالْاِبْدَالُ لَا تُنْصَبُ اِلَّا شَرْعًا وَالنَّصُّ خَصَّهُ بِوَقْتِ الْحَجِّ وَجَوَازُ الدَّمِ عَلَى الْاَصْلِ وَعَنْ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ اَمَرَ فِي مِثْلِهِ بِذَبْحِ الشَّاةِ فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْهَدْيِ تَحَلَّلَ وَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمُ التَّمَتُّعِ وَدَمُ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الْهَدْيِ فَاِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ اِلَى عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوْفِ لِاَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اَدَاؤُهَا لِاَنَّهُ يَصِيْرُ بَانِيًا اَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى اَفْعَالِ الْحَجِّ وَ ذٰلِكَ خِلَافُ الْمَشْرُوْعِ ـ

অনুবাদ : কিন্তু এর পরে আর কাজা করবে না। কেননা, রোজা হলো [হাদী জবাই করার] স্থলবর্তী। আর স্থলবর্তী শুধু শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। আর নস সেটাকে হজের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর 'দম' জায়েজ হওয়া হলো মৌলিক বিধান অনুসারে। আর হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এমন ক্ষেত্রে তিনি বকরি জবাই করার আদেশ দিয়েছেন। যদি কিরান হজকারী হাদী সংগ্রহ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে হালাল হয়ে যাবে আর তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো দুটি ইবাদত একত্র করার সুবিধা ভোগের দম আর দ্বিতীয়টি হলো হাদী জবাই করার পূর্বে হালাল হওয়ার দম। কিরান হজকারী যদি মক্কায় প্রবেশ না করে আরাফা অভিমুখে চলে যায়, তাহলে সে উকূফের মাধ্যমে উমরা তরককারী হয়ে গেল। কেননা, এখন তার পক্ষে উমরা আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে সে উমরার কার্যগুলোকে হজের কার্যগুলোর উপর ভিত্তিকারী হবে। কিন্তু এটা শরিয়তসম্মত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ يُؤَدِّيْ بَعْدَهَا الخ : উল্লিখিত ইবারত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতামতকে নাকচ করা হয়েছে। আইয়ামে তাশরীকের পরেও বর্ণিত তিনটি রোজার কাজা জায়েজ নেই। কেননা, রোজা হাদী জবাই করার স্থলবর্তী। আর স্থলবর্তী শুধু শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। আর 'নস' এটাকে হজের সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। সুতরাং যখন তা হজের সময়ের সাথে নির্দিষ্ট তখন তাশরীকের দিনগুলোর পরে আদায় করার অনুমতি থাকবে না। আর কুরবানি জায়েজ হওয়া রোজার স্থলবর্তী নয়; বরং তা ছিল মৌলিক বিধানানুসারে। আমাদের মতের স্বপক্ষে দলিল হলো, এক 'কিরান হজকারী' হাদী জবাই করেনি আবার হজের দিনগুলোতে রোজাও রাখেনি। ইয়াওমুন নাহরে হযরত ওমর (রা.) তাকে বকরি কুরবানির নির্দেশ দিলেন যা ছিল মৌলিক বিধান।

قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْهَدْيِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যে কিরান হজকারীর তিনটি রোজা ফউত হয়ে গেছে সে যদি হাদী সংগ্রহ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে হালাল হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইহ্‌রামমুক্ত হবে। এমতাবস্থায় তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো দমে কিরান অপরটি হলো হাদী জবাই করার পূর্বে হালাল হওয়ার দম।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, কিরান হজকারী যদি উমরার রুকনসমূহ আদায় না করে সরাসরি আরাফায় চলে যায়, তাহলে সে উকূফের মাধ্যমে উমরা তরককারী হয়ে যাবে। কেননা, এখন তার পক্ষে উমরা আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ, সে যদি হজের পরে উমরা করে, তাহলে উমরার কার্যগুলোকে হজের কার্যগুলোর উপর ভিত্তিকারী হবে। অথচ সেটা শরিয়তসম্মত নয়। শরিয়তসম্মত বিধান হলো কিরানকারী প্রথমত উমরা আদায় করবে অতঃপর হজ করবে।

وَلَا يَصِيرُ رَافِضًا بِمُجَرَّدِ التَّوَجُّهِ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) أَيْضًا وَالْفَرْقُ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُصَلِّي الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهَا أَنَّ الْأَمْرَ هُنَالِكَ بِالتَّوَجُّهِ مُتَوَجِّهٌ بَعْدَ أَدَاءِ الظُّهْرِ وَالتَّوَجُّهُ فِي الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ فَافْتَرَقَا قَالَ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ لِأَنَّهُ لَمَّا ارْتَفَضَتِ الْعُمْرَةُ لَمْ يَرْتَفِقْ لِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ عُمْرَتِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا فَأَشْبَهَ الْمُحْصَرَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : তবে শুধু আরাফা অভিমুখে যাত্রা করার দ্বারাই উমরা তরককারী হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাবের এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। তাঁর মতে এ ব্যক্তি এবং জুমার দিন জোহর আদায় করার পর জুমার জন্য যাত্রাকারী ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, জুমার ক্ষেত্রে জোহর আদায় করার পরেও জুমা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কুরআনী আদেশ তার উপর আরোপিত হয়। পক্ষান্তরে কিরান ও তামাত্তু'-এর ক্ষেত্রে উমরা আদায়ের পূর্বে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। সুতরাং উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর তার জিম্মা থেকে কিরানের দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, যখন উমরা বর্জিত হলো তখন দুই ইবাদত আদায়ের সুবিধা সে লাভ করেনি। তবে উমরা শুরু করে তা তরক করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে এবং উমরা কাজা করতে হবে। কেননা, উমরা শুরু করা বিশুদ্ধ ছিল। সুতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সদৃশ হলো। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَصِيرُ رَافِضًا الخ : মাসআলা হলো, কিরান হজকারী শুধুমাত্র আরাফা অভিমুখে যাত্রা করার দ্বারা উমরা পরিত্যাগকারী হিসেবে পরিগণিত হবে না। উমরা পরিত্যাগকারী তখনই গণ্য হবে যখন জিলহজ্জের ৯ তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর আরাফায় পৌঁছে উকূফ করে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সহীহ মাযহাব এটাই। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান-এর রেওয়ায়েত মতে আরাফা অভিমুখে যাত্রা করলেই উমরা পরিত্যাগকারী হয়ে যাবে। কিয়াস হলো যেভাবে জুমার দিন ঘরে জুমার নামাজ পড়ে জুমার দিকে যাত্রা করতেই জোহর নামাজ তরক হয়ে যায়, অনুরূপভাবে কিরানকারী আরাফার দিকে যাত্রা করতেই উমরা তরক হয়ে যাবে। তবে ইমাম সাহেবের মাযহাব অনুযায়ী পার্থক্যের কারণ এই যে, জুমার মাসআলায় জোহর পড়ে জুমার দিকে যাত্রা করতেই জুমায় যাওয়ার খেতাব পাওয়া গেছে। আর কিরান ও তামাত্তু'র মাসআলায় উমরা আদায় করার পূর্বে আরাফা অভিমুখে যাত্রা করাকে নিষেধ করা হয়েছে। এই দু মাসআলায় এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আরাফা অভিমুখে যাত্রাকে জুমা অভিমুখে যাত্রার উপর কিয়াস করা কিভাবে সঙ্গত হবে।

قَوْلُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الخ : মাসআলা হলো, কিরান হজকারী যদি উমরার কার্যাবলি আদায় না করেই সরাসরি আরাফায় চলে যায়, তাহলে তার জিম্মা থেকে কিরানের দম রহিত হয়ে যাবে। উমরা বর্জনের কারণে সে দুটি ইবাদত হজ ও উমরাকে একত্রকারী হবে না। সুতরাং যখন দুটি ইবাদত আদায়ের সুবিধা সে লাভ করেনি তখন তার উপর শুকরিয়ার দম তথা কিরানের দমও ওয়াজিব হবে না। তবে তার উপর উমরার কাজা ওয়াজিব হবে। উমরা বর্জন করার কারণে একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সে উমরা শুরু করার পর তা ছেড়ে দিয়েছে। আর কাজা ওয়াজিব হবে এজন্য যে, উমরা শুরু করা বিশুদ্ধ ছিল। আর মাসআলা হলো, যদি কেউ নফল শুরু করার পর তা বর্জন করে, তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। আর সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সদৃশ হলো। আর অবরুদ্ধ ব্যক্তি হলো যে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর শত্রু কিংবা অন্যকোনো কারণে হজ্জের কার্যাবলি সম্পাদন করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে ইহরামমুক্ত হবে। তবে তার উপর একটি কুরবানি ও কাজা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে উমরা বর্জনকারীর উপর দম ও কাজা ওয়াজিব হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

بَابُ التَّمَتُّعِ

اَلتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْاِفْرَادِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ الْاِفْرَادَ اَفْضَلُ لِاَنَّ الْمُتَمَتِّعَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِعُمْرَتِهٖ وَالْمُفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهٖ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اَنَّ فِى التَّمَتُّعِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَاَشْبَهَ الْقِرَانَ ثُمَّ فِيْهِ زِيَادَةُ نُسُكٍ وَهُوَ اِرَاقَةُ الدَّمِ وَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهٖ وَاِنْ تَخَلَّلَتِ الْعُمْرَةُ لِاَنَّهَا تَبَعٌ لِلْحَجِّ كَتَخَلُّلِ السُّنَّةِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْيِ اِلَيْهَا .

পরিচ্ছেদ : হজ্জে তামাত্তু'

অনুবাদ : হজ্জে তামাত্তু' হজ্জে ইফরাদ থেকে উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হজ্জে ইফরাদ উত্তম। কেননা, তামাত্তু' হজকারীর সফরতো হয় তার উমরার জন্য। আর ইফরাদকারীর সফর হয় হজের জন্য। যাহেরী রেওয়ায়েতের দলিল এই যে, তামাত্তু'-এর মধ্যে দুই ইবাদত একত্র করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং তা কিরানের সদৃশ হলো। তদুপরি তাতে অতিরিক্ত একটি আমল রয়েছে। আর তা হলো রক্ত প্রবাহিত করা। আর সফর মূলত হজের জন্যই করা হচ্ছে, যদিও মাঝখানে উমরা আদায় করা হয়। কেননা, এ উমরা হজের অনুবর্তী। যেমন– জুমা এবং জুমা অভিমুখে যাত্রার মাঝখানে সুন্নত নামাজ আদায় করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, হজ্জে তামাত্তু' হজ্জে ইফরাদ থেকে উত্তম। এটিই যাহেরী রেওয়ায়েত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অপ্রসিদ্ধ এক বর্ণনায় পাওয়া যায়– হজ্জে ইফরাদ উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমতও অনুরূপ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অপ্রসিদ্ধ বর্ণনার দলিল হলো– তামাত্তু'কারীর সফর তো হয় উমরার জন্য। কেননা, তামাত্তু'কারী মীকাত থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধে। অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করে উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করে। এরপর হজের ইহ্রাম বাঁধে। সুতরাং এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, তামাত্তু'কারীর সফর উমরার জন্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইফরাদ হজকারীর সফর হয় হজের জন্য। হজ ফরজ, আর উমরা সুন্নত। আর এতো পরিষ্কার কথা যে, ফরজ আদায় করার জন্য যে সফর তা সুন্নত আদায় করার সফরের তুলনায় উত্তম। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, ইফরাদ হজ উত্তম।

যাহেরী রেওয়ায়েতের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরান হজ পালন করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন তা অবশ্যই উত্তম। এজন্যই কিরান হজ উত্তম। আর তামাত্তু'র মধ্যে কিরানের মর্মার্থ রয়েছে। কেননা, কিরানের মধ্যে যেভাবে হজ ও উমরা দুটি ইবাদতকে একত্র করা হয় তেমনিভাবে তামাত্তু'র মধ্যেও উভয়কে একত্র করা হয়। পক্ষান্তরে ইফরাদে তা পাওয়া যায় না। সুতরাং যখন কিরান হজ উত্তম, তখন তার সাথে সাদৃশ্যের কারণে তামাত্তু'ও উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয়ত তামাত্তু'র মধ্যে অতিরিক্ত একটি আমল রয়েছে। আর তা হলো রক্ত প্রবাহিত করা, যা হজ্জে ইফরাদে নেই। এ থেকেও তামাত্তু' উত্তম হওয়া সাব্যস্ত হয়।

অপ্রসিদ্ধ বর্ণনার জবাবে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তামাত্তু'কারীর সফরও মূলত হজের জন্যই হয়, যদিও মাঝখানে উমরা আদায় করা হয়। কেননা, উমরা হজের অনুবর্তী। যেমন– জুমা ও জুমা অভিমুখে যাত্রার মাঝখানে সুন্নত নামাজ আদায় করার কারণে এ কথা বলা হয় না যে, এ সফর সুন্নতের জন্য ছিল। বরং বলা হয়, এ সফরযাত্রা জুমার উদ্দেশ্যে ছিল। এমনিভাবে তামাত্তু'কারীর সফর হজের জন্যই বিবেচিত হবে। যদিও সফর ও হজের মাঝখানে উমরা এসেছে।

وَالْمُتَمَتِّعُ عَلٰى وَجْهَيْنِ مُتَمَتِّعٌ يَسُوْقُ الْهَدْىَ وَمُتَمَتِّعٌ لَا يَسُوْقُ الْهَدْىَ وَمَعْنَى التَّمَتُّعِ التَّرَفُّقُ بِاَدَاءِ النُّسُكَيْنِ فِىْ سَفَرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُلِمَّ بِاَهْلِهِ بَيْنَهُمَا اِلْمَامًا صَحِيْحًا وَيَدْخُلُهُ اِخْتِلَافَاتٌ نُبَيِّنُهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَصِفَتُهُ اَنْ يَبْتَدِىَ مِنَ الْمِيْقَاتِ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ فَيُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوْفُ لَهَا وَيَسْعٰى لَهَا وَيَحْلِقُ اَوْ يُقَصِّرُ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَهٰذَا هُوَ تَفْسِيْرُ الْعُمْرَةِ وَكَذٰلِكَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُفْرِدَ بِالْعُمْرَةِ فَعَلَ مَا ذَكَرْنَا هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) لَا حَلْقَ عَلَيْهِ اِنَّمَا الْعُمْرَةُ الطَّوَافُ وَالسَّعْىُ وَحُجَّتُنَا عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وَقَوْلُهُ تَعَالٰى مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَلِاَنَّهَا لَمَّا كَانَ لَهَا تَحَرُّمٌ بِالتَّلْبِيَةِ كَانَ لَهَا تَحَلُّلٌ بِالْحَلْقِ كَالْحَجِّ .

অনুবাদ : তামাত্তু'কারী দু প্রকার। প্রথমত যে কুরবানির পশু সঙ্গে হাঁকিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ত যে কুরবানির পশু নেয় না। আর তামাত্তু'-এর অর্থ হলো, একই সফরে দুটি ইবাদত এমনভাবে আদায় করার সুবিধা গ্রহণ করা যে, এ দুটি ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়ে পুরোপুরি পরিবারের মধ্যে দিয়ে অবস্থান না করা। এ বিষয়ে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে যা আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্। তামাত্তু'-এর বিবরণ হলো–হজের মাসগুলোতে মীকাত থেকে কাজ শুরু করবে। প্রথমে সে উমরার ইহ্রাম বাঁধবে ও মক্কায় প্রবেশ করবে এবং উমরার জন্য তওয়াফ ও সা'ঈ করবে এবং মাথা মুণ্ডাবে কিংবা চুল ছাঁটাবে। তখন সে তার উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে। এ হলো উমরার বিবরণ। তদ্রূপ কেউ যদি পৃথকভাবে উমরা করতে চায়, তাহলে আমাদের উল্লিখিত নিয়মগুলো পালন করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরাতুল কাজা আদায় করার সময় এরূপই করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, তার উপর মাথা মুণ্ডানো নেই। উমরা শুধু তওয়াফ ও সা'ঈ। তার বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো, আমাদের উল্লিখিত হাদীস। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ [এমতাবস্থায় যে, তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডনকারী হবে] উমরাতুল কাজা প্রসঙ্গেই নাজিল হয়েছে। এছাড়া যেহেতু উমরাতে তালবিয়ার মাধ্যমে ইহ্রাম বেঁধেছে সেহেতু হলকের মাধ্যমে হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে হজের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُتَمَتِّعُ عَلٰى وَجْهَيْنِ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, তামাত্তু' হজকারী দু প্রকারে বিভক্ত। এক. যে কুরবানির পশু সঙ্গে হাঁকিয়ে নেয়। দুই. যে কুরবানির পশু সঙ্গে নেয় না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তামাত্তু'র অর্থ হলো, হজ ও উমরার মধ্যবর্তী সময়ে পুরোপুরিভাবে পরিবারের মধ্যে অবস্থান না করে একই সফরে ইবাদত আদায় করার সুবিধা গ্রহণ করা। اِلْمَامٌ-এর অর্থ হলো, ইহ্রামের অবস্থা ছাড়া পরিবারের মধ্যে অবস্থান করা। اِلْمَامٌ দু প্রকার। এক. اِلْمَام صَحِيْح দুই. اِلْمَام فَاسِد। اِلْمَام صَحِيْح হলো যখন তামাত্তু'কারী কুরবানির পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যায় না। আর যখন সে কুরবানির পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যায়- তখন তাকে اِلْمَام فَاسِدْ বলে। তামাত্তু'র সংজ্ঞায় বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ্ তা বর্ণনা করা হবে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اِذَا اَرَادَ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, উমরার যে পদ্ধতি তামাত্তু'র মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে সেই পদ্ধতিই শুধু উমরার মধ্যে প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উমরাতুল কাজা এভাবেই আদায় করেছেন। তবে ইমাম মালিক (র.) বলেন, উমরাকারীর উপরে হলক/মাথা মুণ্ডানো নেই। উমরা শুধু তওয়াফ ও সা'ঈ -এর নাম। কিন্তু ইমাম মালিক (র.) -এর বর্ণিত মতের বিপক্ষে দলিল হলো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল। কেননা, উমরাতুল কাজায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফ, সা'ঈ ও হলক-এ তিনটিই করেছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো– মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ . এ আয়াতটি উমরাতুল কাজা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে মাথা মুণ্ডানো ও চুল ছাঁটার কথা এসেছে। সুতরাং উমরার ক্ষেত্রেও মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটা আবশ্যক। তৃতীয় দলিল হলো, যেহেতু উমরাতে তালবিয়ার মাধ্যমে ইহ্রাম বাঁধা হয় যেমন হজের ক্ষেত্রে তালবিয়ার মাধ্যমে ইহ্রাম বাঁধা হয়– সেহেতু হলক কিংবা চুল ছাঁটার মাধ্যমে হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে, যেরূপ হজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) كَمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ وَتَتِمُّ بِهِ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِيْنَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَلِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ الطَّوَافُ فَيَقْطَعُهَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ وَلِهٰذَا يَقْطَعُهَا الْحَاجُّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الرَّمْيِ.

অনুবাদ : তওয়াফ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, বায়তুল্লাহর প্রতি নজর পড়া মাত্র তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। কেননা, উমরা অর্থ বায়তুল্লাহর জিয়ারত এবং তা দ্বারাই উমরা সম্পূর্ণ হয়। আর আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরাতুল কাজা আদায় করার সময় যখন হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেছিলেন তখন তালবিয়া বন্ধ করেছিলেন। এ ছাড়া এজন্য যে, আসল উদ্দেশ্য হলো তওয়াফ। সুতরাং তওয়াফ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। এ কারণেই হজ আদায়কারী رَمْي শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করে দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, উমরাকারী তওয়াফ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, বায়তুল্লাহর প্রতি নজর পড়ামাত্র তালবিয়া বন্ধ করে দেবে।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, বায়তুল্লাহ জিয়ারতের নামই উমরা। আর বায়তুল্লাহ্র জিয়ারত কা'বা শরীফের প্রতি নজর পড়ামাত্রই পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং বায়তুল্লাহ্র প্রতি যখনই নজর পড়বে তালবিয়া তখনই বন্ধ করে দেবে।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরাতুল কাজার সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বনকালে তালবিয়া বন্ধ করেছিলেন। এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, তওয়াফ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। বাইতুল্লাহ্র প্রতি নজর পড়া মাত্রই তালবিয়া বন্ধ করবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, উমরার উদ্দেশ্য হলো তওয়াফ। সুতরাং তওয়াফ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। আর এ কারণেই হজ আদায়কারী رَمْي শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করে দেয়।

قَالَ وَيُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَلَالاً لِاَنَّهُ حَلَّ مِنَ الْعُمْرَةِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالشَّرْطُ اَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْحَرَمِ اَمَّا الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ وَهٰذَا لِاَنَّهُ فِىْ مَعْنَى الْمَكِّيِّ وَمِيْقَاتُ الْمَكِّيِّ فِى الْحَجِّ الْحَرَمُ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمُفْرِدُ لِاَنَّهُ مُؤَدِّىْ لِلْحَجِّ اِلَّا اَنَّهُ يَرْمُلُ فِىْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيَسْعٰى بَعْدَهُ لِاَنَّ هٰذَا اَوَّلُ طَوَافٍ لَهُ فِى الْحَجِّ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ لِاَنَّهُ قَدْ سَعٰى مَرَّةً ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর সে মক্কায় হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে। কেননা, সে তো উমরা থেকে হালাল হয়ে গেছে। অতঃপর ইয়াওমুত তারবিয়ার [৮ ই জিলহজ] দিন মাসজিদুল হারাম থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। শর্ত হলো, হারাম থেকে ইহ্রাম বাঁধা; মসজিদ থেকে আবশ্যক নয়। এর কারণ হলো, সে মক্কাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মক্কাবাসীদের মীকাত হলো হারাম শরীফ। অতঃপর ইফরাদ হজকারী যা যা করে সেও তা করবে। কেননা, সে এখন হজ আদায়কারী। তবে তওয়াফে জিয়ারতের সময় সে رمل করবে, অতঃপর সা'ঈ করবে। কেননা, হজের ক্ষেত্রে এটা তার প্রথম তওয়াফ। পক্ষান্তরে ইফরাদ হজকারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, একবার সে সা'ঈ করে ফেলেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, তামাত্তু হজকারী উমরা থেকে ইহ্রামমুক্ত হওয়ার পর হালাল অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে। অতঃপর জিলহজের আট তারিখে হজের ইহ্রাম বাঁধবে। হারাম থেকে এই ইহ্রাম বাঁধা শর্ত। তবে মসজিদুল হারাম থেকে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম। এমনিভাবে আট-ই জিলহজের পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম।

দলিল হলো, সে মক্কাবাসীদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর হজের মধ্যে মক্কাবাসীদের মীকাত হলো হারাম। যেমন– মীকাত অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। এজন্য সে হারামের যে কোনো অংশ থেকে ইহ্রাম বাঁধতে পারবে। তবে মসজিদুল হারাম থেকে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, হজ্জে ইফরাদকারী যা যা করে তামাত্তু'কারীও তা করবে। কেননা, সে তো এখন হজ আদায় করছে। তবে পার্থক্য হলো এ ব্যক্তি তওয়াফে জিয়ারতে رَمَلْ করবে। এরপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করবে। কেননা, হজের ক্ষেত্রে এটা তার প্রথম তওয়াফ।

ইফরাদ হজকারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে তওয়াফে কুদূমের পর সা'ঈ করে ফেলেছে। আর সা'ঈ একবারই শরিয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত।

وَلَوْ كَانَ هٰذَا الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ مَا اَحْرَمَ بِالْحَجِّ طَافَ وَسَعٰى قَبْلَ اَنْ يَرُوْحَ اِلٰى مِنًى لَمْ يَرْمَلْ فِىْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلَا يَسْعٰى بَعْدَهٗ لِاَنَّهٗ قَدْ اَتٰى بِذٰلِكَ مَرَّةً وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ لِلنَّصِّ الَّذِىْ تَلَوْنَاهُ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ بَيَّنَّاهُ فِى الْقِرَانِ فَاِنْ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ ثُمَّ اعْتَمَرَ لَمْ يُجْزِهٖ عَنِ الثَّلٰثَةِ لِاَنَّ سَبَبَ وُجُوْبِ هٰذَا الصَّوْمِ التَّمَتُّعُ لِاَنَّهٗ بَدَلٌ عَنِ الدَّمِ وَهُوَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ مُتَمَتِّعٍ فَلَا يَجُوْزُ اَدَاءُهٗ قَبْلَ وُجُوْدِ سَبَبِهٖ وَاِنْ صَامَهَا بَعْدَ مَا اَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ جَازَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) لَهٗ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَلَنَا اَنَّهٗ اَدَّاهُ بَعْدَ اِنْعِقَادِ سَبَبِهٖ وَالْمُرَادُ بِالْحَجِّ الْمَذْكُوْرِ فِى النَّصِّ وَقْتُهٗ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَالْاَفْضَلُ تَاخِيْرُهَا اِلٰى اٰخِرِ وَقْتِهَا وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ لِمَا بَيَّنَّا فِى الْقِرَانِ ـ

অনুবাদ : যদি এই তামাত্তু'কারী হজের ইহ্‌রাম বাঁধার পর মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বেই তওয়াফ ও সা'ঈ করে থাকে, তাহলে তওয়াফে জিয়ারতের মাঝে رَمَلْ করবে না এবং তারপরে সা'ঈ করবে না। কেননা, সে একবার সা'ঈ করেছে। আমাদের উদ্ধৃত আয়াতের প্রেক্ষিতে তার উপর তামাত্তু'-এর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি হাদী না পায়, তাহলে হজের সময় তিন দিন রোজা রাখবে এবং প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোজা রাখবে– কিরান প্রসঙ্গে আমরা যা বর্ণনা করেছি সেভাবে। আর যদি সে শাওয়ালে তিনটি রোজা রাখে অতঃপর উমরা আদায় করে, তবে ঐ রোজা এই তিন রোজার জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা, এ রোজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো তামাত্তু'। আর তা দমের স্থলবর্তী। আর এমতাবস্থায় সেতো তামাত্তু'কারী নয়। সুতরাং কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে রোজা আদায় করা তার জন্য বৈধ হবে না। আর যদি উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর তওয়াফের পূর্বে রোজাগুলো আদায় করে, তবে জায়েজ হবে। এ হলো আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ 'হজের সময় তিন দিন রোজা পালন করবে।'
আর আমাদের দলিল হলো, সে রোজার কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পর তা আদায় করেছে। আর আয়াতে উল্লিখিত হজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হজের সময়। যেমন– ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তবে রোজাকে শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম। আর শেষ সময় হলো আরাফার দিন। আমরা কিরান হজ্জে এর কারণ বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তামাত্তু' হজকারী উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করার পর ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে হালাল অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে। আর জিলহজের ৮ তারিখে হজের ইহ্‌রাম বাঁধবে। এখন যদি এই তামাত্তু'কারী হজের ইহ্‌রাম বাঁধার পর মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বেই তাওয়াফ ও সা'ঈ করে থাকে, তাহলে তওয়াফে জিয়ারতের মাঝে رَمَلْ করবে না এবং তারপরে সা'ঈও করবে না। চাই সে তওয়াফে কুদূমে رَمَلْ করুক বা না করুক।

তওয়াফে জিয়ারতের পর সা'ঈ না করার কারণ হলো, তওয়াফে কুদূমের পর সা'ঈ একবার করা হয়েছে। আর সা'ঈ পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ শরিয়ত কর্তৃক একবারই তা প্রবর্তিত– বারবার নয়। এজন্যই যখন তওয়াফে কুদূমের পর একবার সা'ঈ করেছে, তখন তওয়াফে জিয়ারতের পর আর সা'ঈ করবে না।

তওয়াফে জিয়ারতের পর رَمَلْ না করার কারণ হলো, رَمَلْ এমন তওয়াফের পর প্রবর্তিত, যার পরে সা'ঈ রয়েছে। আর এখানে তওয়াফে জিয়ারতের পর সা'ঈ নেই। কেননা, সা'ঈ একবার পাওয়া গেছে। এজন্য তওয়াফে জিয়ারতের পর رَمَلْ করবে না।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, তামাত্তু'কারীর উপর তামাত্তু'র দম ওয়াজিব। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ আর যদি তামাত্তু'কারী হাদী না পায়, তাহলে কিরান হজকারীর মতো হজের সময় তিনটি রোজা রাখবে। আর হজ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট সাতটি রোজা রাখবে। এর বিস্তারিত বর্ণনা ও দলিল কিরান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি তামাত্তু' হজকারী শাওয়ালে তিনটি রোজা রাখে এরপর উমরার ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে এ তিনটি রোজা কুরবানির বিনিময়রূপে শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এ রোজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো তামাত্তু। আর এটা দমে তামাত্তু'র স্থলবর্তী। আর উমরার ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে সে তামাত্তু'কারী নয়। সুতরাং কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে ঐ সব রোজা রাখা হয়েছে। আর কারণ বিদ্যমান হওয়ার পূর্বে কোনো জিনিসের আদায় সাব্যস্ত হয় না। এজন্য ঐ সব রোজা তামাত্তু'র দমের স্থলবর্তী হবে না। আর যদি রোজাগুলো উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর তওয়াফ করার পূর্বে আদায় করে, তবে আমাদের মতে তা জায়েজ হবে– ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না। তাঁর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ- এ আয়াতে হজের অবস্থায় রোজা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ইহ্রাম বাঁধার পরই হজের অবস্থা শুরু হয়। এ কারণেই হজের ইহ্রাম বাঁধার পর এসব রোজা আদায় করা জায়েজ– এর পূর্বে নয়।

আমাদের দলিল হলো, সে রোজার কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পর তথা তামাত্তু' পাওয়া যাওয়ার পর রোজা রেখেছে। আর কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পর আদায় করা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর এসব রোজা আদায় করা জায়েজ হবে।

আর আয়াতে 'হজ' দ্বারা হজকার্য উদ্দেশ্য নয়; বরং হজের সময় উদ্দেশ্য। আর হজের সময় হলো শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহজের ১০ তারিখ পর্যন্ত। সুতরাং এখানে হজের সময়ের মধ্যে রোজা আদায় পাওয়া গেছে। তবে এসব রোজাকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম। অর্থাৎ সাত, আট ও নয় তারিখে রোজা রাখবে– শেষ রোজা হবে আরাফার দিবসে।

وَاِنْ اَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ اَنْ يَسُوْقَ الْهَدْىَ اَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ وَهٰذَا اَفْضَلُ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاقَ الْهَدَايَا مَعَ نَفْسِهِ وَلِاَنَّ فِيْهِ اِسْتِعْدَادٌ اَوْ مُسَارَعَةٌ فَاِنْ كَانَتْ بَدَنَةً قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ اَوْ نَعْلٍ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ (رض) عَلٰى مَا رَوَيْنَاهُ وَالتَّقْلِيْدُ اَوْلٰى مِنَ التَّجْلِيْلِ لِاَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِى الْكِتَابِ وَلِاَنَّهُ لِلْاِعْلَامِ وَالتَّجْلِيْلُ لِلزِّيْنَةِ وَيُلَبِّىْ ثُمَّ يُقَلِّدُ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ مُحْرِمًا بِتَقْلِيْدِ الْهَدْىِ وَالتَّوَجُّهِ مَعَهُ عَلٰى مَا سَبَقَ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَعْقِدَ الْاِحْرَامَ بِالتَّلْبِيَةِ وَيَسُوْقُ الْهَدْىَ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ اَنْ يَقُوْدَهَا لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَحْرَمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَهَدَايَاهُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِاَنَّهُ اَبْلَغُ فِى التَّشْهِيْرِ اِلَّا اَنْ لَا تَنْقَادَ فَحِيْنَئِذٍ يَقُوْدُهَا ـ

অনুবাদ : আর তামাত্তু'কারী যদি নিজের সাথে হাদী নিতে চায়, তাহলে [উমরার] ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং হাদী সাথে নিয়ে যাবে। এটা উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসমূহ নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া এতে [নেক কাজের প্রতি] প্রস্তুতি ও ত্বরান্বিত করার আগ্রহ প্রকাশ পায়। হাদী যদি উট বা গরু হয়, তাহলে চামড়ার টুকরা কিংবা ছেঁড়া জুতা তার গলায় ঝুলিয়ে দেবে। এর দলিল হলো, ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। কালাদা ঝুলিয়ে দেওয়া চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা থেকে উত্তম। কেননা, এর কথা কিতাবুল্লাহে উল্লেখ রয়েছে। তা ছাড়া কালাদা পরানো হয় ঘোষণার জন্য আর চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয় সাজ-সজ্জার জন্য। আগে তালবিয়া পড়বে তারপর কালাদা ঝুলাবে। কেননা, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীকে কালাদা পরানো এবং তা সঙ্গে করে রওয়ানা দেওয়ার মাধ্যমে ইহ্‌রাম শুরু হয়। আর তালবিয়ার মাধ্যমে ইহ্‌রাম বাঁধা হলো উত্তম। হাদীকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। এটা হাদীকে সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলাইফাতে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন আর তাঁর হাদীগুলোকে তাঁর সামনে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা ছাড়া এতে অধিক ঘোষণাও প্রচার হয়। তবে পশু অবাধ্য হলে সামনে থেকেই টেনে নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, তামাত্তু'কারী যদি হাদী সাথে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং হাদীকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, তামাত্তুকারীর জন্য হাদীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসমূহ নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস থেকে তা প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয় দলিল হলো, হাদীকে সঙ্গে নেওয়ার মধ্যে নেককাজের প্রস্তুতি এবং ওয়াজিব আদায় করার ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত করার আগ্রহ প্রকাশ পায়। আর এ উভয় কাজ প্রশংসনীয় বলে হাদীকে সাথে নিয়ে যাওয়া উত্তম।

এখন হাদী যদি উট বা গরু হয়, তাহলে চামড়ার টুকরা বা ছেঁড়া জুতা তার গলায় ঝুলিয়ে দেবে। যেমন– হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে তা প্রতিভাত হয়– كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাদীকে কালাদা ঝুলিয়ে দেওয়া চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা থেকে উত্তম। এ উত্তমতার দলিল হলো, কালাদা পরানোর কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْقَلَائِدَ -

দ্বিতীয়ত কালাদা পরানো হয় হাদীর জানোয়ার ঘোষণার জন্য, এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয় সাজ-সজ্জার জন্যই। আবার শীত ও গরম নিবারণের জন্যও তা করা হয়। সুতরাং কালাদা পরানো হয় অন্য কোনো কিছুর সম্ভাবনা ছাড়াই শুধু হাদীর চিহ্নরূপে।

পক্ষান্তরে চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা এককভাবে হাদীর চিহ্ন নয়। এজন্য কালাদা ঝুলিয়ে দেওয়া চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা থেকে উত্তম।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, প্রথমে তালবিয়া দ্বারা ইহ্রাম বাঁধবে তারপর কালাদা ঝুলাবে। কেননা, হাদীকে কালাদা পরানো এবং তা সঙ্গে করে রওয়ানা দেওয়ার মাধ্যমে ইহ্রাম শুরু হয়ে যায়। যেমন– ইতঃপূর্বে তা বর্ণিত হয়েছে। তবে তালবিয়ার মাধ্যমে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম। কেননা, এ ক্ষেত্রে তালবিয়া হলো মূল আর কালাদা ঝুলানো হলো তার স্থলবর্তী। আর সম্ভব পর্যায় পর্যন্ত মূলের উপর আমল করা উত্তম। এজন্য তালবিয়ার মাধ্যমে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাদীকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া উত্তম, সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলায়ফাতে ইহ্রাম বেঁধেছিলেন আর তাঁর ﷺ হাদীগুলোকে তাঁর সামনে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দ্বিতীয় দলিল হলো, হাদীকে কালাদা পরানোর উদ্দেশ্য হলো সর্বসাধারণের মাঝে হজের ঘোষণা ও প্রচার করা। আর হাদীকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে তা অধিক প্রকাশ পায়। এজন্যই তা উত্তম। তবে যদি পশু অবাধ্য হয়, তাহলে সামনে থেকেই টেনে নেবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

قَالَ وَاَشْعَرَ الْبَدَنَةَ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَلَا يُشْعِرُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَيُكْرَهُ وَالْإِشْعَارُ هُوَ الْإِدْمَاءُ بِالْجَرْحِ لُغَةً وَصِفَتُهُ اَنْ يَشُقَّ سَنَامَهَا بِاَنْ يَطْعَنَ فِيْ اَسْفَلِ السَّنَامِ مِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ قَالُوْا وَالْاَشْبَهُ هُوَ الْاَيْسَرُ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَعَنَ فِيْ جَانِبِ الْيَسَارِ مَقْصُوْدًا وَفِيْ جَانِبِ الْاَيْمَنِ اِتِّفَاقًا وَيُلَطِّخُ سَنَامَهَا بِالدَّمِ اِعْلَامًا وَهٰذَا الصُّنْعُ مَكْرُوْهٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا حَسَنٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) سُنَّةٌ لِاَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ (رضـ) وَلَهُمَا اَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ التَّقْلِيْدِ اَنْ لَا يُهَاجَ اِذَا وَرَدَ مَاءً اَوْ كَلَاءً اَوْ يُرَدَّ اِذَا ضَلَّ وَاَنَّهُ فِي الْاِشْعَارِ اَتَمُّ لِاَنَّهُ اَلْزَمُ فَمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ يَكُوْنُ سُنَّةً اِلَّا اَنَّهُ عَارَضَتْهُ جِهَةُ كَوْنِهِ مُثْلَةً فَقُلْنَا بِحُسْنِهِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ مُثْلَةٌ وَاَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلَوْ وَقَعَ التَّعَارُضُ فَالتَّرْجِيْحُ لِلْمُحَرِّمِ وَاِشْعَارُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصِيَانَةِ الْهَدْيِ لِاَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ لَا يَمْتَنِعُوْنَ عَنْ تَعَرُّضِهِ اِلَّا بِهِ وَقِيْلَ اِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ كَرِهَ اِشْعَارَ اَهْلِ زَمَانِهِ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِيْهِ عَلٰى وَجْهٍ يُخَافُ مِنْهُ السِّرَايَةُ وَقِيْلَ اِنَّمَا كَرِهَ اِيْثَارَهُ عَلَى التَّقْلِيْدِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে اِشْعَارْ করবে; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে اِشْعَارْ করবে না। اِشْعَارْ করা মাকরূহ। অভিধানে اِشْعَارْ -এর অর্থ– জখম করে রক্ত প্রবাহিত করা। আর তার বিবরণ এই যে, উটনীর কুঁজ চিরে দেবে। অর্থাৎ বর্শা দ্বারা কুঁজের ডানদিকে নীচের অংশে জখম করে দেবে। তবে উত্তরসূরি আলিমগণের মতে বামদিকে জখম করার বিষয়টি অধিক বিশুদ্ধ। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বামদিকে জখম করেছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে আর ডানদিকে জখম করেছিলেন ঘটনাক্রমে। আর অবহিত করার জন্য উটনীর কুঁজে রক্ত মেখে দেবে। এরূপ করা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাকরূহ। সাহেবাইনের মতে এরূপ করা ভালো। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এরূপ করা সুন্নত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে এরূপ বর্ণিত রয়েছে। সাহেবাইনের দলিল– কালাদা ঝুলানোর উদ্দেশ্য হলো পানি খেতে নামলে কিংবা ঘাস খেতে গেলে যেন তাকে উত্যক্ত না করা হয়। কিংবা পথ হারিয়ে ফেললে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর এটা اِشْعَارْ দ্বারা অধিক অর্জিত হয়, যেহেতু চিহ্নটি স্থায়ী থাকে। এদিক থেকে এটা সুন্নত হওয়ার কথা। কিন্তু বিকৃত ঘটনার দিকটি তার পরিপন্থি। তাই আমরা বলেছি যে, এটা ভালো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল, এ হলো বিকৃতি স্বরূপ। তা নিষিদ্ধ। আর যদি বিকৃতি সাধন ও সুন্নত হওয়ার মাঝে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে নিষেধাজ্ঞাই অগ্রাধিকার পায়। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ اِشْعَارْ করেছিলেন, হাদীর হেফাজতের জন্য। কেননা, মুশরিকরা এটা ছাড়া হাদীকে উত্যক্ত করা থেকে বিরত হতো না। কোনো কোনো মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সমকালীন

লোকদের إِشْعَارْ-কে মাকরূহ বলতেন। কেননা, তারা বেশি মাত্রায় জখম করে ফেলত; এভাবে যে, জখম ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা হতো। আর কোনো কোনো মতে কালাদা ঝুলানোর উপর إِشْعَارْ-এর অগ্রাধিকার প্রদানকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, হাদী যদি বকরি কিংবা ভেড়া হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে إِشْعَارْ করবে না। আর যদি বাদানাহ তথা উট কিংবা গরু হয়, তাহলে সাহেবাইনের মতে إِشْعَارْ করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট إِشْعَارْ করা মাকরূহ। إِشْعَارْ-এর আভিধানিক অর্থ–জখম করে রক্ত প্রবাহিত করা। এর পদ্ধতি হলো, বর্শা দ্বারা কুঁজের ডানদিকে নীচের অংশে জখম করে দেবে। উত্তরসূরি আলিমগণ বলেন, বামদিক থেকে জখম করার বিষয়টি অধিক বিশুদ্ধ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় দিক থেকেই إِشْعَارْ করেছিলেন। তবে বামদিকে জখম করেছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে আর ডানদিকে জখম করেছিলেন ঘটনাক্রমে। আর এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছাকৃতভাবে যা করেছেন তা-ই উম্মতের জন্য অনুসরণযোগ্য। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, লোকদেরকে অবহিত করার জন্য إِشْعَارْ করার সময় পশুর কুঁজে রক্ত মেখে দেবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমামগণের মাযহাব বর্ণনার্থে বলেন, কুঁজে জখম করা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাকরূহ। সাহেবাইনের মতে এরূপ করা ভালো অর্থাৎ 'কারাহাত' ছাড়াই জায়েজ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তা সুন্নত। ইমাম মালিক (র.), আহমদ (র.) ও জুমহুর ওলামার অভিমত এটিই।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, বর্শা দ্বারা কুঁজে জখম করার আমলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন– ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন। আর যে আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে বর্ণিত তা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয় থাকে না।

সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে– হাদীকে কালাদা ঝুলানোর উদ্দেশ্য হলো, পানি পান করতে নামলে কিংবা ঘাস খেতে গেলে যেন তাকে উত্যক্ত না করা হয়। কিংবা পথ হারিয়ে ফেললে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর এটা إِشْعَارْ দ্বারা পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। কেননা, এ ধরনের জখম তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয় না। প্রত্যেকেই এটি দেখে হাদীর পশুকে চিনে ফেলে। এদিক থেকে এটা সুন্নত হওয়ার কথা। إِشْعَارْ-এর মধ্যে বিকৃতি ঘটার দিকটিও পাওয়া যায়, যা শরিয়তে নিষিদ্ধ। এজন্যই আমরা বিকৃতি সাধন ও সুন্নত হওয়ার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে বলি إِشْعَارْ সুন্নত নয়, আবার মাকরূহও নয়; বরং তা ভালো তথা জায়েজ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, إِشْعَارْ বিকৃতি স্বরূপ। আর একাধিক হাদীস দ্বারা বিকৃতি সাধন নিষিদ্ধ। এ কারণেই তা কমপক্ষে মাকরূহ বলে পরিগণিত হবে।

তবে প্রশ্ন হতে পারে إِشْعَارْ হাদীস থেকে তো সুন্নত হওয়াও সাব্যস্ত হয়। এর জবাবে বলা হয় যে, এ ক্ষেত্রে দু ধরনের রেওয়ায়েতই বিদ্যমান। নিষিদ্ধ ও বৈধ হওয়া উভয় ধরনের। মূলনীতি হলো, নিষেধ ও বৈধের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধ দেখা দিলে নিষেধাজ্ঞাই অগ্রাধিকার পায়। সুতরাং নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাধিকার দিয়ে إِشْعَارْ-কে মাকরূহ বলে গণ্য করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ إِشْعَارْ করেছিলেন বলে ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাবে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ إِشْعَارْ করেছিলেন হাদীর হেফাজতের জন্য। কেননা, মুশরিকরা এটা ছাড়া হাদীকে জোরপূর্বক ধরে জবাই করা থেকে বিরত থাকত না। আর আমাদের সময়ে যেহেতু এটা নেই সেহেতু হাদীকে إِشْعَارْ করারও প্রয়োজন নেই।

ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) সমকালীন লোকদের إِشْعَارْ-কে মাকরূহ বলতেন। কেননা, সে সময়ের লোকেরা হাদীকে এত বেশি মাত্রায় জখম করে ফেলত যে, জখম ছড়িয়ে পড়ার কারণে হাদীর মৃত্যুর আশঙ্কা হতো। শুধু إِشْعَارْ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকটও মাকরূহ নয়। আর কেউ কেউ বলেন, إِشْعَارْ মাকরূহ নয়, তবে কালাদা ঝুলানোর উপর إِشْعَارْ-কে অগ্রাধিকার প্রদান করা মাকরূহ। অর্থাৎ কালাদা ঝুলানো উত্তম যদিও إِشْعَارْ সুন্নত।

قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعٰى وَهٰذَا لِلْعُمْرَةِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا فِىْ مُتَمَتِّعٍ لَا يَسُوْقُ الْهَدْىَ إِلَّا أَنَّهٗ لَا يَتَحَلَّلُ حَتّٰى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ مِنْهَا وَهٰذَا يَنْفِى التَّحَلُّلَ عِنْدَ سَوْقِ الْهَدْىِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন [তামাত্তু'কারী] মক্কায় প্রবেশ করবে তখন তওয়াফ ও সা'ঈ করবে। এটা হলো উমরার জন্য– যেমন আমরা ঐ তামাত্তু'কারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, যে হাদী সঙ্গে নেয় না। তবে সে হালাল হবে না; বরং তালবিয়া দিবসে [৮ তারিখে] হজের ইহ্রাম বেঁধে নেবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَوْ إِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ مِنْهَا অর্থাৎ 'আমি আমার বিষয় যা পরে অনুধাবন করেছি তা যদি আগে অনুধাবন করতাম, তাহলে হাদী সঙ্গে আনতাম না। আর এটাকে উমরা হিসেবে ধরে তা থেকে হালাল হয়ে যেতাম।' এ হাদীস হাদী সঙ্গে আনা অবস্থায় হালাল হওয়াকে নিষেধ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, যে তামাত্তু'কারী হাদী সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে সে উমরার জন্য তওয়াফ ও সা'ঈ করবে। এ তওয়াফ ও সা'ঈ উমরার জন্য এমন যা আমরা ঐ তামাত্তু'কারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছি যে হাদী সঙ্গে নেয় না। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, যে তামাত্তু'কারী হাদী সঙ্গে নিয়ে যায় সে তওয়াফ ও উমরার পরে হালাল হবে না। তবে সে তারবিয়া দিবসে অর্থাৎ ৮ ই জিলহজ্জে হজের ইহ্রাম বেঁধে নেবে।

মোদ্দাকথা হলো, যে তামাত্তু'কারী হাদী সঙ্গে নিয়ে যায় সে এবং কিরানকারী একই হুকুমের অন্তর্গত। অর্থাৎ কিরানকারী যেমন হজ্জ ও উমরার সঙ্গে হালাল হবে না, তেমনিভাবে এই তামাত্তু'কারীও হালাল হবে না। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কিরানকারী হজের ইহ্রাম পূর্বেই বেঁধেছে আর এই তামাত্তু'কারী হজের ইহ্রাম ৮ ই জিলহজ তারবিয়া দিবসে বাঁধবে। পক্ষান্তরে যে তামাত্তু'কারী হাদী সঙ্গে নেয় না সে উমরা সম্পন্ন করার পর হালাল হয়ে যাবে।

দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিদায় হজকালে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামকে হজের ইহ্রাম ভেঙ্গে উমরার ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তা-ই করলেন। তাঁরা নির্দেশমতো উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ হলক করে হালাল হয় কিনা? তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, যদি আমি পূর্বে অবগত হতাম যে, হাদী সঙ্গে আনা হালাল হওয়াকে বারণ করে, তাহলে হাদী সঙ্গে আনতাম না। কিন্তু যেহেতু আমি হাদী সঙ্গে এনেছি সেহেতু হালাল হবো না। এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, হাদী সঙ্গে আনলে তামাত্তু'কারী উমরার পরে হালাল হবে না।

وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ كَمَا يُحْرِمُ اَهْلُ مَكَّةَ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَاِنْ قَدَّمَ الْاِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ وَمَا عَجَّلَ الْمُتَمَتِّعُ مِنَ الْاِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُوَ اَفْضَلُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُسَارَعَةِ وَ زِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ وَهٰذِهِ الْاَفْضَلِيَّةُ فِىْ حَقِّ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَفِىْ حَقِّ مَنْ لَمْ يَسُقْ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ دَمُ التَّمَتُّعِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَاِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْاِحْرَامَيْنِ لِاَنَّ الْحَلْقَ مُحَلِّلٌ فِى الْحَجِّ كَالسَّلَامِ فِى الصَّلٰوةِ فَيَتَحَلَّلُ بِهٖ عَنْهُمَا .

অনুবাদ : আর তারবিয়ার দিবসে হজের ইহ্‌রাম বাঁধবে, যেভাবে মক্কাবাসীরা ইহ্‌রাম বাঁধে, যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আর যদি উক্ত সময়ের আগে ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে তা জায়েজ হবে। বরং তামাত্তু'কারী হজের ইহ্‌রাম যত তাড়াতাড়ি করবে ততই তা উত্তম। কেননা, এতে কাজের দিকে অগ্রগামিতা ও অতিরিক্ত কষ্ট রয়েছে। আর এই উত্তমতা যেমন ঐ ব্যক্তির জন্য যে হাদী সঙ্গে এনেছে, তেমনি ঐ ব্যক্তির জন্য যে হাদী সঙ্গে আনেনি। আর তার উপর একটি দম ওয়াজিব। তা হলো তামাত্তু'-এর দম, যেমন ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি। কুরবানির দিবসে যখন সে হলক করবে, তখন সে উভয় ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। যেমন– নামাজের ক্ষেত্রে সালাম তেমনি হজের ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডানো হলো হালালকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, তামাত্তু'কারী উমরার কার্যাবলি সমাপনান্তে ৮ ই জিলহজে হজের ইহ্‌রাম বাঁধবে। যেমন– মক্কাবাসীরা ইহ্‌রাম বাঁধে। কেননা, সেও মক্কাবাসীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সে যদি ৮ ই জিলহজের পূর্বে ইহরাম বাঁধে, তাহলেও তা জায়েজ হবে; বরং তা উত্তম। কেননা, তামাত্তু'কারী যত দ্রুত হজের ইহ্‌রাম বাঁধবে, ততই তা উত্তম। দলিল হলো, দ্রুত ইহ্‌রাম বাঁধার ক্ষেত্রে ভালোকাজের প্রতি অগ্রগামিতা ও অধিক কষ্ট রয়েছে। আর যে ইবাদতে যত বেশি কষ্ট, তা তত বেশি উত্তম। যেমন হাদীসে এসেছে– اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَزُهَا হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ উত্তমতার ক্ষেত্রে যে হাদী সঙ্গে এনেছে আর যে সঙ্গে আনেনি উভয় অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ উভয়ের জন্য দ্রুত ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, তামাত্তু' হজকারীর উপর তামাত্তু'র দম ওয়াজিব। যেমন– ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তামাত্তু'কারী যখন কুরবানির দিবসে মাথা মুণ্ড করবে; কিংবা চুল ছাঁটাবে তখন সে হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। কেননা, সালাতের ক্ষেত্রে সালাম যেমন হালালকারী তেমনি হজের ক্ষেত্রে হলক হালালকারী। সুতরাং হলকের দ্বারা হজ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে।

وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلِأَنَّ شَرْعَهُمَا لِلتَّرَفُّهِ بِإِسْقَاطِ إِحْدَى السَّفْرَتَيْنِ وَهٰذَا فِىْ حَقِّ الْاٰفَاقِىِّ وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيْتِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ لَهُ مُتْعَةٌ وَلَا قِرَانٌ بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُوْفَةِ وَقَرَنَ حَيْثُ يَصِحُّ لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَحَجَّتَهُ مِيْقَاتِيَّتَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْاٰفَاقِىِّ ـ

অনুবাদ : মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু' ও কিরান নেই। তাদের জন্য শুধু হজ্জে ইফরাদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর বিপক্ষে দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 'আর তা [তামাত্তু'] ঐ ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়।' তা ছাড়া তামাত্তু' ও কিরান অনুমোদিত হয়েছে। দুই সফরের একটিকে রহিত করে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য। আর তা বহিরাগতদের জন্যই প্রযোজ্য। আর যে ব্যক্তি মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তার হুকুম মক্কাবাসীদের মতো। ফলে তার ক্ষেত্রেও হজ্জে তামাত্তু' ও হজ্জে কিরান হবে না। পক্ষান্তরে মাক্কী যদি কূফায় গিয়ে হজ্জে কিরান করে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে। কেননা, তার উমরা ও হজ দুটিই মীকাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং সে বহিরাগদের ন্যায় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, আহ্নাফের মতে মাক্কী ও মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য তামাত্তু' ও কিরান হজ নেই; বরং তার জন্য শুধু হজ্জে ইফরাদ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও মাক্কী কিংবা মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী যদি হজ্জে তামাত্তু' কিংবা কিরান করে– তাহলে তা জায়েজ হবে বটে, কিন্তু সে গুনাহ্গার হবে। এ কারণে তার উপর অপরাধের দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মাক্কী ও মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য হজ্জে তামাত্তু' ও হজ্জে কিরান জায়েজ। তবে তার উপর তামাত্তু' কিংবা কিরানের দম ওয়াজিব হবে না। যেমন, বহিরাগতদের উপর ওয়াজিব। তাঁর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ আয়াতটি মুতলাক। বহিরাগত কিংবা মাক্কীর কথা এতে সবিস্তারিত কিছু বলা হয়নি, এজন্য হজ্জে তামাত্তু' ও কিরান বহিরাগত ও মক্কায় অবস্থানকারী সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে।

আমাদের দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ (الاية) অর্থাৎ এ 'হজ্জে তামাত্তু' ঐ ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়।' অর্থাৎ হজ্জে তামাত্তু' বহিরাগতদের জন্য। সুতরাং এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জে তামাত্তু' প্রযোজ্য নয়। আমাদের মতে এ আয়াতে ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ إِلَيْهِ [নির্দেশিত বস্তু] হলো হজ্জে তামাত্তু'। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হাদী ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ বা হুকুম।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, হজ্জে তামাত্তু' ও কিরান শরিয়তে অনুমোদিত হয়েছে হজ ও উমরার দুই সফরের একটিকে রহিত করে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য। আর এ সুবিধা যারা মীকাতের বাহিরে অবস্থান করে তাদের জন্য প্রযোজ্য।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, মীকাতের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী সকলেই মক্কাবাসীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মক্কাবাসীদের ন্যায় মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্যও হজ্জে তামাত্তু' ও কিরান প্রযোজ্য হবে না। তবে কেউ যদি হজের সময়ের পূর্বে কূফায় চলে যায় এবং সেখান থেকে কিরান হজ আদায় করে, তাহলে তা অপছন্দ ছাড়াই জায়েজ। কেননা, তার উমরা ও হজ উভয়টাই মীকাত সংশ্লিষ্ট। এজন্য সে বহিরাগতদের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর বহিরাগতরা যেহেতু কিরান হজ করে সেহেতু সেও কিরান হজ করতে পারবে। লক্ষণীয় যে, যদি কোনো মক্কাবাসী হজের মাস আরম্ভ হওয়ার পর কূফায় যায়, তাহলে তার জন্য কিরান হজ নিষিদ্ধ।

وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهٖ بَعْدَ فَرَاغِهٖ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ بَطَلَ تَمَتُّعُهٗ لِاَنَّهٗ اَلَمَّ بِاَهْلِهٖ فِيْمَا بَيْنَ نُسُكَيْنِ اِلْمَامًا صَحِيْحًا وَبِذٰلِكَ يَبْطُلُ التَّمَتُّعُ كَذَا رُوِىَ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَاِذَا سَاقَ الْهَدْىَ فَاِلْمَامُهٗ لَا يَكُوْنُ صَحِيْحًا وَلَا يَبْطُلُ تَمَتُّعُهٗ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) يَبْطُلُ لِاَنَّهٗ اَدَّاهُمَا بِسَفَرَتَيْنِ وَلَهُمَا اَنَّ الْعَوْدَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ مَادَامَ عَلٰى نِيَّةِ التَّمَتُّعِ لِاَنَّ السَّوْقَ يَمْنَعُهٗ مِنَ التَّحَلُّلِ فَلَا يَصِحُّ اِلْمَامُهٗ بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ اِذَا خَرَجَ اِلَى الْكُوْفَةِ وَاَحْرَمَ لِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْهَدْىَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لِاَنَّ الْعَوْدَ هُنَالِكَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ فَصَحَّ اِلْمَامُهٗ بِاَهْلِهٖ۔

অনুবাদ : আর তামাত্তু'কারী যদি উমরা থেকে ফারিগ হয়ে নিজ শহরে ফিরে যায় অথচ সে হাদী সঙ্গে নেয়নি, তখন তার তামাত্তু' বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সে দু ইবাদতের মাঝে তার পরিবারের কাছে বৈধভাবে ফিরে গেছে, আর তা দ্বারা তামাত্তু' বাতিল হয়ে যায়। কয়েকজন তাবেঈ থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আর যদি সে হাদী সঙ্গে এনে থাকে, তাহলে পরিবারের কাছে আসা বৈধ নয় এবং তার তামাত্তু' বাতিল হবে না ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তামাত্তু' বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সে দুই সফরে উমরা ও হজ আদায় করেছে। তাঁদের [শায়খাইনের] দলিল হলো, প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে ওয়াজিব, যতক্ষণ সে তামাত্তু'-এর নিয়তের উপর স্থির থাকে। কেননা, হাদী সঙ্গে আনা তার হালাল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং তার বাড়িতে ফিরে আসা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে মাক্কী যদি কূফায় গিয়ে উমরার ইহ্রাম করে এবং হাদী সঙ্গে আনে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না। কেননা, প্রত্যাবর্তন তার উপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং তার পরিবারে উপস্থিত হওয়া বৈধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ الخ : হজের মাসসমূহে যে বহিরাগত উমরাকারী উমরার কার্যাদি সম্পন্ন করত স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসে অতঃপর সে বছরই হজ করে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হিসেবে গণ্য হবে কিনা? এ ব্যাপারে দুটি সুরত রয়েছে। এক. সে হাদীর পশু সঙ্গে নিয়েছে। দুই. হাদীর পশু সঙ্গে নেয়নি। প্রথম সুরতের হুকুম পরবর্তী ইবারতে আসছে। আর দ্বিতীয় সুরতে আহনাফের সর্বসম্মতিতে সে তামাত্তু'কারী বলে বিবেচিত হবে না। দলিল হলো, হজ ও উমরার মাঝে সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে বৈধভাবে ফিরে গেছে। বৈধভাবে পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের ফলে তামাত্তু' বাতিল হয়ে যায় বিধায় তার তামাত্তু'ও বাতিল হয়েছে। তাবিঈগণের এক জামাত থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। যেমন– ইমাম ত্বাহাবী (র.) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আতা ইবনে আবী রাবাহ্, মুজাহিদ এবং ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ وَاِذَا سَاقَ الْهَدْىَ الخ : এ ইবারতের দ্বারা পূর্বোল্লিখিত প্রথম সুরতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সারকথা হলো, যে তামাত্তু'কারী হাদীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসে এবং উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করত স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যায়। এরপর সে বছরই হজ করে, তাহলে শায়খাইনের মতে– তার তামাত্তু' বাতিল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর দলিল হলো, সে হজ ও উমরাকে দুই সফরে আদায় করেছে, অথচ তামাত্তু'কারী উভয়টি এক সফরেই সম্পন্ন করতে হয়। এজন্য সে তামাত্তু'কারী হবে না।

শায়খাইনের দলিল হলো, যতক্ষণ সে তামাত্তু' -এর নিয়তের উপর স্থির থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করা তার উপর ওয়াজিব। কেননা, হাদী সঙ্গে আনা তার হালাল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং বাড়িতে ফিরে আসা তার জন্য বৈধ হবে না। তবে اِلْمَام فَاسِدْ -এর দ্বারা তামাত্তু' বাতিল হয় না বিধায় সে ব্যক্তির তামাত্তু' বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে মাক্কী যদি কূফায় গিয়ে উমরার ইহ্রাম করে এবং হাদী সঙ্গে আনে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না। কেননা, বাড়ি যেহেতু মক্কায়, তাই প্রত্যাবর্তন তার উপর ওয়াজিব নয়। প্রত্যাবর্তনের অর্থ হলো পরিবার-পরিজন থেকে মক্কায় চলে আসা। এ ব্যক্তি যেহেতু মাক্কী, তাই তার পক্ষে পরিবার-পরিজন থেকে মক্কায় ফিরে আসা অসম্ভব। মোটকথা, এখানে اِلْمَام صَحِيْح হয়েছে– যে অবস্থায় তামাত্তু' বাতিল বলে গণ্য হয়। কেননা, اِلْمَام صَحِيْح -এর দ্বারা তামাত্তু' বাতিল হয়ে যায়। اِلْمَامْ -এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ এ অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নিন।

وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَتَمَّمَهَا وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ عِنْدَنَا شَرْطٌ فَيَصِحُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ فِيهَا وَقَدْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ وَإِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّهُ أَدَّى الْأَكْثَرَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهٰذَا لِأَنَّهُ صَارَ بِحَالٍ لَا يَفْسُدُ نُسُكُهُ بِالْجِمَاعِ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَحَلَّلَ مِنْهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَمَالِكٌ (رحـ) يَعْتَبِرُ الْإِتْمَامَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ التَّرَفُّقَ بِأَدَاءِ الْأَفْعَالِ وَالْمُتَمَتِّعُ الْمُتَرَفِّقُ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি হজের মাসগুলোর পূর্বে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে এবং উমরার জন্য চার চক্করের কম তওয়াফ করে, এরপর হজের মাস শুরু হলে উমরার তওয়াফ পূর্ণ করে এবং হজের ইহ্‌রাম বাঁধে, সে তামাত্তু'কারীরূপে গণ্য হবে। কেননা আমাদের মতে ইহ্‌রাম হলো উমরার শর্ত। সুতরাং এটাকে হজের মাসগুলোর উপর অগ্রবর্তী করা যায়। শুধু উমরার আমলগুলো হজের মাসে আদায় করাটা হলো বিবেচ্য। আর তওয়াফের অধিকাংশ হজের মাসের মধ্যে পাওয়া গেছে। আর নিয়ম হলো, অধিকাংশের উপরই সমগ্রের হুকুম আরোপ করা হয়। আর যদি হজের মাস শুরু হওয়ার পূর্বে তওয়াফের চার চক্কর কিংবা তার বেশি করে ফেলে অতঃপর সেই বছরই হজ আদায় করে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না। কেননা, হজের মাসের পূর্বেই সে অধিকাংশ আদায় করে ফেলেছে। আর এ হুকুম এজন্য যে, উমরাকারী এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, স্ত্রীসহবাসের কারণেও তার উমরা বাতিল হবে না। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেল যে হজের মাসের পূর্বে উমরা থেকে হালাল হয়ে যায়। ইমাম মালিক (র.) হজের মাসে পূর্ণ হওয়াকে বিবেচনা করেন। তাঁর বিপক্ষে দলিল হলো যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া এজন্য যে, সুযোগ লাভ সাব্যস্ত হয় কর্মসমূহের আদায়ের মাধ্যমে; সুতরাং হজের মাসে এক সফরে দুই ইবাদতের কর্মসমূহ আদায় করার সুযোগ লাভকারীই তামাত্তু'কারী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কেউ হজের মাসসমূহের পূর্বে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হলো, যদি উমরার ইহ্‌রাম হজের মাসগুলোর পূর্বে বাঁধে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না– যদিও সে উমরার কার্যাবলি হজের মাসগুলোতে আদায় করে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, সে তামাত্তু'কারী বলে বিবেচিত হবে, যদিও সে উমরার কার্যাদি হজের মাসগুলোতে আদায় না করে। তবে শর্ত হলো হজের মাসগুলোতে উমরার ইহ্‌রাম থেকে হালাল হতে হবে। আমাদের মাযহাব হলো, যদি সে হজের মাসগুলোতে চার চক্কর তওয়াফ করে আর তিন চক্কর তওয়াফ পূর্বে করে ফেলে তাহলে সে তামাত্তু'কারীরূপে গণ্য হবে। আর যদি এর উল্টো হয়, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, হজ ও উমরা উভয় ইবাদতকে হজের মাসগুলোতে একত্র করা হজ্জে তামাত্তু'র জন্য আবশ্যক। এখানে তা পাওয়া যায়নি। কেননা, উমরার রুকন ইহ্‌রামকে হজের মাসগুলোর উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং হজের সময়ে হজ ও উমরা একত্রে না পাওয়ার কারণে তামাত্তু'কারী হবে না।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, এ মাসআলায় হজ ও উমরা উভয় ইবাদতকে একত্রে করা বিদ্যমান। কেননা, উমরার ইহ্রাম থেকে সে হজের মাসে হালাল হয়েছে আর এ সময়ে হজের ইহ্রাম থেকেও হালাল হয়েছে। অর্থাৎ হালাল হওয়ার বিবেচনায় উভয় ইবাদত হজের মাসগুলোতে পাওয়া গেছে। সুতরাং এ একত্রীকরণের ভিত্তিতে সে ব্যক্তিকে তামাত্তু'কারী বলে বিবেচনা করা হবে।

আমাদের দলিল হলো, আমাদের মতে ইহ্রাম হচ্ছে উমরার শর্ত। সুতরাং নামাজের সময়ের পূর্বে যেভাবে পবিত্রতা অর্জনকে অগ্রবর্তী করা জায়েজ তেমনিভাবে ইহ্রামকেও হজের মাসগুলোর উপর অগ্রবর্তী করা জায়েজ। তবে উমরার আমলগুলো হজের মাসে আদায় করাটা হলো বিবেচ্য। সুতরাং চার চক্কর যখন হজের মাসগুলোতে পাওয়া গেছে, তখন তওয়াফের অধিকাংশ হজের মাসের মধ্যে পাওয়া গেছে। আর অধিকাংশের উপর সমগ্রের হুকুম আরোপ করা হয়ে থাকে। এজন্য বলা হবে যে, উমরার পুরো তওয়াফই হজের মাসে পাওয়া গেছে। সুতরাং উমরা ও হজ উভয়টি হজের মাসে একত্রে পাওয়া গেছে বলে সে ব্যক্তি তামাত্তু'কারী বলে গণ্য হবে।

তবে হজের মাস শুরু হওয়ার পূর্বে যদি তওয়াফের চার চক্কর করে ফেলে অতঃপর সে বছরই হজ আদায় করে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না। কেননা, হজের মাসের পূর্বেই সে অধিকাংশ আদায় করে ফেলেছে। আর অধিকাংশের উপর সমগ্রের হুকুম আরোপ করা হয়ে থাকে বিধায় সে সম্পূর্ণ তওয়াফই হজের মাসের পূর্বে করেছে বলে গণ্য করা হবে। এ অবস্থায় সে ব্যক্তি তামাত্তু'কারী হবে না। কেননা, চার তওয়াফ আদায় করার মাধ্যমে উমরাকারী এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, স্ত্রীসহবাসের কারণেও তার উমরা বাতিল হবে না। সুতরাং মাস শুরু হওয়ার পূর্বে উমরার ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার দ্বারা কোনো ব্যক্তি তামাত্তু'কারী বলে বিবেচিত হয় না। এজন্য এ ব্যক্তিও তামাত্তু'কারী বলে গণ্য হবে না।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, সুযোগ লাভ সাব্যস্ত হয় কর্মসমূহের আদায়ের মাধ্যমে। আর তামাত্তু'কারীও হজের মাসে এক সফরে হজ ও উমরা দুই ইবাদতের কর্মসমূহ আদায় করার সুযোগ লাভ করে। সুতরাং তামাত্তু'কারী হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো হজের মাসে উমরার সমস্ত আমল কিংবা অধিকাংশ আমল পাওয়া যাওয়া।

قَالَ وَاَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُوالْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ كَذَا رُوِىَ عَنِ الْعَبَادِلَةِ الثَّلٰثَةِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) اَجْمَعِيْنَ وَلِاَنَّ الْحَجَّ يَفُوْتُ بِمَضِىِّ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ وَمَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ لَا كُلُّهٗ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হজের মাসগুলো হলো শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহজের দশদিন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) প্রমুখ থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এজন্য যে, জিলহজের দশ-তারিখ অতিক্রান্ত হলে হজ ফউত হয়ে যায়। অথচ সময় বাকি অবস্থায় ফউত হওয়া সাব্যস্ত হয় না। আর এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ [হজের সময় হলো নির্ধারিত কয়েক মাস] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুই মাস এবং তৃতীয় মাসের অংশবিশেষ– সমগ্র তৃতীয় মাস নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, হজের মাস হলো শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহজের দশ দিন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শাওয়াল, জিলকাদ ও সমগ্র জিলহজ মাস হলো হজের মাস। তাঁর দলিল হলো, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ 'হজের সময় হলো নির্ধারিত কয়েক মাস।' আয়াতে اَشْهُرٌ শব্দটি বহুবচন। আর বহুবচনের নিম্নতম সংখ্যা তিন। সুতরাং পূর্ণ তিন মাস হজের সময়।

আমাদের দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে যে, হজের মাস শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহজের দশ দিন। দ্বিতীয় দলিল হলো, জিলহজের দশ তারিখ অতিক্রান্ত হলে হজ ফউত হয়ে যায়। যেমন– কেউ আরাফায় অবস্থান করল না এমনকি কুরবানির দিবস এসে গেল, তাহলে তার হজ ফউত হয়ে যাবে। যদি জিলহজের শেষ পর্যন্ত হজের সময় হতো, তাহলে জিলহজের দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে হজ ফউত হতো না। কেননা, সময় থাকতে ফউত হওয়া সাব্যস্ত হয় না। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, আয়াতে اَشْهُرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য দুই মাস ও তৃতীয় মাসের অংশবিশেষ– সমগ্র তৃতীয় মাস নয়। কেননা, বহুবচনের প্রয়োগ একের অধিকের উপর হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا তে দুটি হৃদয় বুঝানো হয়েছে অথচ قُلُوْبُ শব্দটি বহুবচন।

فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجًّا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فَإِنَّ عِنْدَهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ رُكْنٌ عِنْدَهُ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَهَ الطَّهَارَةَ فِي جَوَازِ التَّقْدِيمِ عَلَى الْوَقْتِ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ تَحْرِيمُ أَشْيَاءٍ وَإِيجَابُ أَشْيَاءٍ وَ ذٰلِكَ يَصِحُّ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَصَارَ كَالتَّقْدِيمِ عَلَى الْمَكَانِ ـ

অনুবাদ : যদি হজের ইহ্রামকে হজের মাসগুলোর উপর অগ্রবর্তী করে, তাহলে তার ইহ্রাম জায়েজ হয়ে যাবে এবং হজের ইহ্রাম হিসেবে তা গৃহীত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে তা উমরার ইহ্রাম হবে। কেননা, তাঁর মতে ইহ্রাম হলো রুকন আর আমাদের মতে শর্ত। সুতরাং সময়ের উপর অগ্রবর্তী করার বৈধতার ক্ষেত্রে তা তাহারাতের সদৃশ হবে। তা ছাড়া এজন্য যে, ইহ্রাম অর্থ কিছু বিষয় [নিজের উপর] হারাম করা আর কিছু বিষয় নিজের উপর ওয়াজিব করা। আর তা সবসময় হতে পারে। সুতরাং সময়ের অগ্রবর্তী মীকাত থেকে ইহ্রাম বাঁধার অগ্রবর্তী হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, কেউ যদি শাওয়াল মাসের আগেই হজের ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে আমাদের নিকট তা জায়েজ। হজের জন্যই এ ইহ্রাম সাব্যস্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ ইহ্রাম উমরার জন্য গণ্য হবে– হজের জন্য গণ্য হবে না। তাঁর দলিল হলো, তাঁর মতে ইহ্রাম হজের রুকন। সুতরাং যেমন অন্যান্য রুকনকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করা জায়েজ নেই, তেমনিভাবে ইহ্রামকেও হজের মাসের পূর্বে অগ্রবর্তী করা জায়েজ নেই। তবে প্রশ্ন হতে পারে, যদি এই ইহ্রাম হজের জন্য গণ্য না হয়, তাহলে উমরার জন্য কিভাবে তা গণ্য হবে ? এর উত্তর হলো, এখানে ইহ্রাম পাওয়া গেছে। কিন্তু হজের সময়ের পূর্বে তা বাঁধার কারণে হজের ইহ্রাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং তার ইহ্রাম যেন নিরর্থক না হয় সে জন্য তা উমরার ইহ্রাম হিসেবে গণ্য হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি দিনের বেলায় কাজা রোজার নিয়ত করলে তা নফল রোজা হিসেবে গণ্য হয়। কেননা, কাজা রোজার নিয়ত সুবহে সাদেকের শুরুতে করতে হয়। এজন্য তার নিয়ত নিরর্থক হওয়া থেকে রক্ষার্থে তা নফল রোজার নিয়ত বলে গণ্য করা হবে।

আমাদের দলিল হলো, আমাদের মতে ইহ্রাম বাঁধা হজের শর্ত। সুতরাং যেভাবে পবিত্রতা অর্জনকে নামাজের সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করা জায়েজ, সেভাবে ইহ্রামকেও হজের সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করা জায়েজ।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ইহ্রাম দ্বারা কিছু জিনিস নিজের উপর হারাম করা হয়। যেমন– সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, শিকার করা ইত্যাদি। আবার কিছু জিনিস নিজের উপর ওয়াজিব করা হয়। যেমন– সা'ঈ করা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। এ সকল বিষয় সব সময় করা যেতে পারে, হজের সময়ের সাথে তা নির্দিষ্ট নয়। এ কারণে ইহ্রাম যে কোনো সময় বাঁধা জায়েজ।

তৃতীয় দলিল হলো ইহ্রামকে যেরূপ স্থান তথা মীকাতের উপর অগ্রবর্তী করা জায়েজ, সেরূপ সময় তথা হজের মাসগুলোর উপরও অগ্রবর্তী করা জায়েজ।

قَالَ وَإِذَا قَدِمَ الْكُوفِيُّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفَرَغَ مِنْهَا وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ثُمَّ اتَّخَذَ مَكَّةَ أَوِ الْبَصْرَةَ دَارًا أَوْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذٰلِكَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ تَرَفَّقَ بِنُسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَمَّا الثَّانِي فَقِيلَ هُوَ بِالْاِتِّفَاقِ وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيقَاتِيَّةً وَحَجَّتُهُ مَكِّيَّةً وَنُسُكَاهُ هٰذَانِ مِيقَاتِيَّانِ وَلَهُ أَنَّ السَّفْرَةَ الْأُولٰى قَائِمَةٌ مَا لَمْ يَعُدْ إِلٰى وَطَنِهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ لَهُ نُسُكَانِ فِيهِ فَوَجَبَ دَمُ التَّمَتُّعِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, কূফার অধিবাসী যদি হজের মাসগুলোতে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে আসে এবং তা থেকে ফারিগ হয়ে মাথা মুণ্ডায় কিংবা চুল ছাঁটে অতঃপর মক্কা কিংবা বসরা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সে বছরেই সে হজ করে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে। প্রথম সুরতের কারণ হলো, সে হজের মাসগুলোতে একই সফরে দুটি ইবাদতের সুযোগ লাভ করেছে। দ্বিতীয় সুরত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আবার কারো কারো মতে এটা শুধু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাঈনের মতে সে তামাত্তু'কারী হবে না। কেননা, তামাত্তু'কারী হলো সেই ব্যক্তি যার উমরার ইহ্‌রাম হবে মীকাত থেকে এবং হজের ইহ্‌রাম হবে মক্কা থেকে। অথচ তার উভয় ইবাদতের দুটি ইহ্‌রামই হচ্ছে মীকাত থেকে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, যতক্ষণ না সে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করবে, ততক্ষণ প্রথম সফরই অব্যাহত থাকবে। সুতরাং তার উভয় ইবাদতই প্রথম সফরে সংঘটিত। ফলে তামাত্তু'র দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, যদি কূফার কোনো অধিবাসী অর্থাৎ বহিরাগত হজের মাসগুলোতে উমরা আদায় করার জন্য আসে এবং উমরা থেকে ফারিগ হয়ে মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছেঁটে হালাল হয় এরপর মক্কা কিংবা বসরায় অবস্থানের নিয়ত করে এবং সে বছরই সে হজ করে, তাহলে সে উভয় সুরতেই তামাত্তু'কারী হবে। প্রথম সুরতে তামাত্তু'কারী বলে বিবেচিত হওয়ার কারণ এই যে, সে মক্কা শরীফ থেকে বাইরে যায়নি আবার স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকটও ফিরে আসেনি। সুতরাং সে হজের সময়ে এক সফরে উমরা ও হজ আদায় করার সুযোগ লাভ করেছে। আর এরূপ ব্যক্তিকে যেহেতু তামাত্তু'কারী বলা হয়; সুতরাং সে তামাত্তু'কারী বলে পরিগণিত হবে।

আর দ্বিতীয় সুরত তথা বসরায় অবস্থানকালে তাকে তামাত্তু'কারী বলা হবে কিনা? সে ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, সর্বসম্মতিক্রমে সে তামাত্তু'কারী হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে তামাত্তু'কারী হবে। আর সাহেবাইনের মতে সে তামাত্তু'কারী বলে বিবেচিত হবে না।

এ ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো, তামাত্তু'কারী উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে মীকাত থেকে এবং হজের ইহ্‌রাম বাঁধে মক্কা থেকে। অথচ এখানে তা হয়নি; বরং উমরা ও হজ উভয়ের ইহ্‌রাম মীকাত থেকে বাঁধা হয়েছে। কেননা, যখন কূফী উমরা করার উদ্দেশ্যে স্বীয় পরিবার-পরিজন থেকে বের হয়েছে, তখন সে উমরার ইহ্‌রাম মীকাত থেকে বেঁধেছে এবং উমরার কার্যাবলি সমাপনান্তে বসরায় অবস্থান করত সে হালাল হয়েছে। আর এ হালাল অবস্থায় সে মীকাত অতিক্রম করেছে। কেননা, বসরা মীকাতের বাইরের একটি শহর। সুতরাং যখন সে হজের জন্য আসবে তখন মীকাত থেকেই তার ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। উমরা ও হজ উভয়ের ইহ্‌রাম যখন সে মীকাত থেকেই বেঁধেছে, তখন তাকে আর তামাত্তু'কারী হিসেবে গণ্য করা হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কূফীর যে সফর কূফা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ছিল– তা বসরায় চলে যাওয়া সত্ত্বেও অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না সে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেল যে, এখনো মীকাত থেকে বের হয়নি এবং প্রত্যাবর্তন করে হজ আদায় করেছে। মোটকথা, তার উভয় ইবাদতই এক সফরে সংঘটিত হয়েছে। আর এক সফরে উভয় ইবাদত একত্রকারীকে তামাত্তু'কারী বলা হয়। সুতরাং সে তামাত্তু'কারী বিবেচিত হবে এবং তার উপর তামাত্তু'র দম ওয়াজিব হবে।

فَإِنْ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَأَفْسَدَهَا وَفَرَغَ مِنْهَا وَقَصَّرَ ثُمَّ اتَّخَذَ الْبَصْرَةَ دَارًا ثُمَّ اعْتَمَرَ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا هُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّهُ إِنْشَاءُ سَفَرٍ وَقَدْ تَرَفَّقَ بِنُسُكَيْنِ وَلَهُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلٰى سَفَرِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ إِلٰى وَطَنِهِ ـ

অনুবাদ : আর যদি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে আগমন করে এবং তা নষ্ট করে ফেলে, তারপর তা থেকে ফারিগ হয়ে চুল ছেঁটে নেয় এবং বসরায় বসবাস শুরু করে অতঃপর হজের মাসসমূহে উমরা করে এবং সে বছরেই হজ আদায় করে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন বলেন, সে তামাত্তু'কারী হবে। কেননা, সে [বসরা থেকে যাত্রার মাধ্যমে] নতুন সফর করল। আর এই সফরে সে দুটি ইবাদতের সুযোগ লাভ করেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তার পূর্ব সফর অব্যাহত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, যদি কেউ উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় আসে অতঃপর তা নষ্ট করে ফেলে। যেমন– উমরা শুরু করার পূর্বে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। তার এই উমরা নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে উমরার কার্যাদি সম্পন্ন করত চুল ছেঁটে হালাল হয়ে যায় এবং বসরায় সে অবস্থান গ্রহণ করে। অতঃপর হজের মাসে সে উমরার কাজা আদায় করত সে বছরেই হজ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে তামাত্তু'কারী হবে না, আর সাহেবাইনের মতে তামাত্তু'কারী হবে।

লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মধ্যকার মতপার্থক্য তখনই যখন সে ব্যক্তি হজের মাসে বসরায় প্রত্যাবর্তন করে। আর যদি হজের মাস শুরু হওয়ার আগেই সে বের হয় অতঃপর হজের মাসে উমরা করে এবং সে বছর হজ করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে তামাত্তু'কারী বলে বিবেচিত হবে।

মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলায় সাহেবাইনের দলিল হলো, তার বসরা থেকে মক্কায় গমন নতুন এক সফর। এ সফরে সে দুটি ইবাদত আদায় করেছে। এক. উমরা; দুই. হজ। আর হজের মাসে এক সফরে উমরা ও হজ আদায় করাকে তামাত্তু' বলা হয়। সুতরাং এ ব্যক্তিকেও তামাত্তু'কারী বলা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে তার পূর্ব সফরেই রয়ে গেছে। আর এ সফরে তার প্রথম উমরা নষ্ট হওয়ার কারণে দুটি ইবাদত বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায় না। অথচ তামাত্তু'কারী হলো সেই যে দুটি ইবাদত হজ ও উমরা এক সফরে বিশুদ্ধ পন্থায় আদায় করে।

فَإِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ اعْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا فِى قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لِأَنَّ هٰذَا إِنْشَاءُ سَفَرٍ لِانْتِهَاءِ السَّفَرِ الْأَوَّلِ وَقَدِ اجْتَمَعَ لَهُ نُسُكَانِ صَحِيْحَانِ فِيْهِ وَلَوْ بَقِىَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْبَصْرَةِ حَتَّى اعْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِالْاِتِّفَاقِ لِأَنَّ عُمْرَتَهُ مَكِّيَّةٌ وَالسَّفَرُ الْأَوَّلُ انْتَهَى بِالْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا تَمَتُّعَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمَنِ اعْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَأَيُّهُمَا أَفْسَدَ مَضَى فِيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ الْإِحْرَامِ إِلَّا بِالْأَفْعَالِ وَسَقَطَ دَمُ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَرَفَّقْ بِأَدَاءِ نُسُكَيْنِ صَحِيْحَيْنِ فِى سَفَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِذَا تَمَتَّعَتِ الْمَرْأَةُ فَضَحَّتْ بِشَاةٍ لَمْ يُجْزِهَا مِنْ دَمِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهَا أَتَتْ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ وَكَذَا الْجَوَابُ فِى الرَّجُلِ ـ

অনুবাদ : আর যদি সে আপন পরিবারের নিকট ফিরে যায় এবং হজের মাসে উমরা করে এবং সেই মাসেই হজ করে, তাহলে সকলের মতেই সে তামাত্তুকারী হবে। কেননা এটি হলো নতুন সফর– প্রথম সফর সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। আর নতুন সফরে দু'টি সহীহ্ ইবাদত সে সম্পন্ন করেছে। সে যদি বসরায় গমন না করে মক্কাতেই অবস্থান করে এবং হজের মাসে উমরা করে আর সে বছরই হজ করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা তার উমরার ইহ্রাম হয়েছে মক্কা থেকে এবং ফাসিদ উমরা দ্বারা তার প্রথম সফর সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর মক্কাবাসীদের জন্য কোনো তামাত্তু' নেই। যে ব্যক্তি হজের মাসে উমরা করে এবং সে বছর হজও করে, সে দু'টোর যে কোনোটি ফাসিদ করলে সেটির কর্মসমূহ পূর্ণ করবে। কেননা, যাবতীয় আমল সম্পন্ন করা ছাড়াতো ইহ্রামের দায় থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। তবে তামাত্তু'র দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, এক সফরে দুটি সহীহ্ ইবাদত আদায় করার সুযোগ সে লাভ করেনি। কোনো স্ত্রীলোক যদি তামাত্তু' করে এরপর বকরি কুরবানি দেয়, তাহলে তামাত্তু'র দমের জন্য তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, যা ওয়াজিব নয়, তা সে আদায় করেছে। পুরুষের ক্ষেত্রেও এ হুকুম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ الخ : যদি কেউ উমরা করার জন্য এসে উমরা নষ্ট করে অতঃপর উমরার রুকনসমূহ আদায় করত হালাল হয়ে যায়। তারপর স্বীয় পরিবারের নিকট যায় এবং হজের মাসে উমরা করে ও সেই বছরই হজ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে সে তামাত্তু'কারী হবে। কেননা, স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের কারণে তার প্রথম সফর শেষ হয়েছে। এখন এটি তার নতুন সফর। আর এ দ্বিতীয় সফরে দুটি সহীহ্ ইবাদত সে সম্পন্ন করেছে। আর হজের মাসগুলোতে এক সফরে দুই ইবাদতকে একত্র করাই হলো তামাত্তু'। সুতরাং এ ব্যক্তি তামাত্তু'কারী হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ بَقِىَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَخْرُجْ الخ মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি ফাসিদ উমরা থেকে ফারিগ হয়ে মক্কায় অবস্থান করে; কিন্তু বসরায়ও যায়নি আবার স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকটও যায়নি; আর হজের মাসেই উমরা করে এবং সে বছরই আবার হজ করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে তামাত্তু'কারী হবে না। কেননা, তার প্রথম সফর সমাপ্ত হয়েছে ফাসিদ উমরা দ্বারা। সুতরাং তার উমরার ইহ্রাম হয়েছে মক্কা থেকে। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জে তামাত্তু' বলতে কিছু নেই।

قَوْلُهُ وَمَنِ اعْتَمَرَ فِى الخ : মাসআলা হলো, যদি কেউ হজের মাসে উমরা করে এবং সে বছর হজও করে, তাহলে সে দুটোর কোনো একটি ফাসিদ করলে, তা পূর্ণ করা আবশ্যক। কেননা, যাবতীয় আমল সম্পন্ন করা ছাড়া ইহ্রাম থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে তামাত্তু'র দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, যে এক সফরে বিশুদ্ধরূপে দুটি ইবাদত [উমরা ও হজ] একত্রে করে, তার উপর তামাত্তুর দম ওয়াজিব। আর এখানে যেহেতু একটি ফাসিদ হয়েছে; বিধায় বিশুদ্ধরূপে দুটি ইবাদত একত্র না হওয়ার কারণে সে তামাত্তু'কারী হবে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا تَمَتَّعَتِ الْمَرْأَةُ الخ মাসআলা : কোনো স্ত্রীলোক তামাত্তু' করেছে এবং বকরি কুরবানি করেছে, তাহলে তা তামাত্তু'র দমের স্থলবর্তী হবে না। কেননা, সফরের কারণে ঈদুল আজহার কুরবানি তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং তার উপর তামাত্তু'র দম ওয়াজিব। সুতরাং যা ওয়াজিব নয়; তা ওয়াজিবের স্থলবর্তী হতে পারে না। পুরুষের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اِغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ (رضـ) حِيْنَ حَاضَتْ بِسَرِفَ وَلِأَنَّ الطَّوَافَ فِى الْمَسْجِدِ وَالْوُقُوْفَ فِىْ مَفَازَةٍ وَهٰذَا الْاِغْتِسَالُ لِلْإِحْرَامِ لَا لِلصَّلٰوةِ فَيَكُوْنُ مُفِيْدًا فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوْفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ اِنْصَرَفَتْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ لِطَوَافِ الصَّدْرِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِىْ تَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ ـ

অনুবাদ : যদি ইহ্‌রামের সময় স্ত্রীলোক ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে গোসল করে ইহ্‌রাম বেঁধে নেবে এবং হাজীর ন্যায় যাবতীয় কাজ করে যাবে। তবে পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে এসেছে– তিনি যখন সারিফ নামক স্থানে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া এজন্য যে, তওয়াফের স্থান হলো মসজিদ আর উকূফের স্থান হলো খোলা মাঠ। আর এ গোসল হলো ইহ্‌রামের জন্য, সালাতের জন্য নয়। সুতরাং গোসলের উদ্দেশ্য সফল হবে। আর যদি উকূফের পরে এবং তওয়াফে জিয়ারতের পরে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। বিদায়ী তওয়াফ না করার কারণে তার উপর কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋতুগ্রস্ত নারীদেরকে বিদায়ী তওয়াফ না করার অনুমতি দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইহ্‌রামের সময় যখন স্ত্রীলোক ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে গোসল করে ইহ্‌রাম বেঁধে নেবে এবং হজের যাবতীয় কর্ম আদায় করবে। তবে পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবে না। দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) সারিফ নামক স্থানে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে দেখলেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) কাঁদছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরে বললেন, সম্ভবত ঋতুগ্রস্ত হয়েছ! আয়েশা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটি প্রত্যেক নারীরই হয়ে থাকে। কেউ এ থেকে বাঁচতে পারে না। সুতরাং হাজীরা যেসব রুকন আদায় করে তুমিও তা-ই করবে। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, তওয়াফ করা হয় মস্‌জিদুল হারামে। আর ঋতুগ্রস্ত মহিলার জন্য মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে উকূফ করা হয় মাঠে। আর ঋতুগ্রস্ত মহিলার জন্য মাঠে যেতে কোনো বিধিনিষেধ নেই। এজন্য ঋতুগ্রস্ত মহিলার জন্য তওয়াফ করা নিষেধ। তওয়াফ ছাড়া অন্যান্য রুকন আদায় করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, ঋতুগ্রস্ত মহিলার জন্য গোসল করার উপকারিতা কি? এর জবাব হলো– এ গোসল ইহ্‌রামের জন্য পরিচ্ছন্নতা অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়, নামাজের জন্য নয়। আর পরিচ্ছন্নতা অর্জনের লক্ষ্যে এ গোসলের উপকারিত অনস্বীকার্য। উকূফে আরাফা এবং তওয়াফে জিয়ারতের পরে যদি মহিলা ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। আর বিদায়ী তওয়াফ না করার কারণে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঋতুগ্রস্ত নারীদের বিদায়ী তওয়াফ তরক করার অনুমতি দিয়েছেন।

وَمَنِ اتَّخَذَ مَكَّةَ دَارًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدْرِ لِاَنَّهُ عَلٰى مَنْ يَصْدُرُ اِلَّا اِذَا اتَّخَذَهَا دَارًا بَعْدَ مَا حَلَّ النَّفَرُ الْاَوَّلُ فِيْمَا يُرْوٰى عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَيَرْوِيْهِ الْبَعْضُ عَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) لِاَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِدُخُوْلِ وَقْتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মক্কাকে বাসস্থানরূপে গ্রহণ করে, তার উপর বিদায়ী তওয়াফ নেই। কেননা, বিদায়ী তওয়াফ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, কুরবানির তৃতীয় দিন এসে যাওয়ার পর যদি বাসস্থানরূপে গ্রহণ করার নিয়ত করে, তাহলে বিদায়ী তওয়াফ রহিত হবে না। কেউ কেউ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-থেকেও এমনটি বর্ণনা করেছেন। কেননা, বিদায়ী তওয়াফের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং এরপর অবস্থানের নিয়ত করার কারণে তা রহিত হবে না। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো বহিরাগত ব্যক্তি মক্কাকে বাসস্থানরূপে গ্রহণ করে, তাহলে তার উপর বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব নয়। কেননা, বিদায়ী তওয়াফ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে মক্কা থেকে স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। অথচ এ ব্যক্তি মক্কাকে বাসস্থানরূপে গ্রহণ করার কারণে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করে না বলে তার উপর বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব নয়। তবে ১২ ই জিলহজ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৩ ই জিলহজ সে যদি মক্কায় অবস্থান করার নিয়ত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণনানুসারে তার উপর বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব। কেউ কেউ এমনটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

দলিল হলো, ১৩ ই জিলহজে প্রত্যাবর্তনের সময় চলে আসার কারণে তার উপর বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব হয়ে গেছে। এখন এরপর অবস্থানের নিয়ত করার কারণে তার উপর ওয়াজিবকৃত তওয়াফ রহিত হবে না। যেমন– কোনো মুকীম ব্যক্তি রমজানের ভোরে সফর শুরু করলে তার জন্য রোজা ভাঙ্গা জায়েজ নেই। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

بَابُ الْجِنَايَاتِ

وَإِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ الرَّأْسِ وَالسَّاقِ وَالْفَخِذِ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْجِنَايَةَ تَتَكَامَلُ بِتَكَامُلِ الْاِرْتِفَاقِ وَ ذٰلِكَ فِى الْعُضْوِ الْكَامِلِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمُوْجِبِ ـ

পরিচ্ছেদ : অপরাধ ও ত্রুটি

অনুবাদ : যদি মুহ্‌রিম সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি পূর্ণ একটি অঙ্গে কিংবা তার অধিক স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। পূর্ণ অঙ্গ যেমন– মাথা, গোড়ালি, উরু কিংবা এ ধরনের কোনো অঙ্গ। কেননা, সুযোগ গ্রহণের পূর্ণতার মাধ্যমে অপরাধ পূর্ণ বলে গণ্য হয়। আর তা হয় পূর্ণ এক অঙ্গের মধ্যে ব্যবহারের ফলে। অতএব, এর উপরই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত [দম] ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْجِنَايَاتِ : উক্ত পরিচ্ছেদে মুহ্‌রিমের প্রকারভেদ এবং আহ্‌কাম বর্ণনান্তে ইহ্‌রাম সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, جِنَايَاتٌ শব্দটি جِنَايَةٌ-এর বহুবচন। جِنَايَةٌ ঐ সব কর্মকে বলা হয় যা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَإِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুহ্‌রিম যদি শরীরে কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। যেমন– বনফশা [বেগুনি], চামেলি, রায়হান, গোলাপ ও অন্যান্য আতর। দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ অর্থাৎ 'হাজী আলুথালু কেশ ও দুর্গন্ধময় হয়।' আর সুগন্ধি ব্যবহার করলে এ পরিচয় বিদূরিত হয়ে যায়। এজন্য খোশবু ব্যবহারকে অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ একটি অঙ্গ কিংবা অঙ্গের অধিক স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। আর পূর্ণ অঙ্গ হলো– মাথা, গোড়ালি, উরু কিংবা এ ধরনের কোনো অঙ্গ। যদি একটি পূর্ণ অঙ্গের কম স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে। এর দলিল হলো, অপরাধ পূর্ণ বলে গণ্য হয় সুযোগ গ্রহণের পূর্ণতার মাধ্যমে। আর পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহারে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ বিবেচিত হবে। ফলে পূর্ণ অঙ্গের উপর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত তথা দম ওয়াজিব হবে।

وَإِنْ تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنَ الدَّمِ إِعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ وَفِى الْمُنْتَقٰى أَنَّهُ إِذَا طَيَّبَ رُبُعَ الْعُضْوِ فَعَلَيْهِ دَمٌ إِعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ وَاجِبُ الدَّمِ يَتَأَدّٰى بِالشَّاةِ فِى جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا فِى مَوْضِعَيْنِ نَذْكُرُهُمَا فِى بَابِ الْهَدْيِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَكُلُّ صَدَقَةٍ فِى الْإِحْرَامِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ فَهِىَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ إِلَّا مَا يَجِبُ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ وَالْجَرَادَةِ هٰكَذَا رُوِىَ عَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) .

অনুবাদ : যদি এক অঙ্গ থেকে কম পরিমাণে খোশবু ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে– ত্রুটি কম হওয়ার কারণে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অংশকে সমগ্রের সাথে তুলনা করে অঙ্গের পরিমাণ অনুপাতে দম ওয়াজিব হবে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে রয়েছে, একটি অঙ্গের এক-চতুর্থাংশে সুগন্ধি ব্যবহার করলে তার উপর পূর্ণ দম ওয়াজিব হবে, মাথার এক-চতুর্থাংশের হলকের উপর কিয়াস করে। আমরা পরবর্তীতে উভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। আর দুটি ক্ষেত্র ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ওয়াজিব দম বকরি দ্বারা আদায় হবে। আমরা ক্ষেত্র দুটি হাদী অধ্যায়ে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। ইহ্‌রামের ক্ষেত্রে যে কোনো অনির্ধারিত সদকা হলো অর্ধ সা' গম। তবে উকুন কিংবা টিডিড জাতীয় কিছু হত্যা করলে–যা ওয়াজিব হয় [তা অর্ধ সা' নয়]। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَقَلَّ الخ : **মাসআলা :** কেউ যদি এক অঙ্গ থেকে কম পরিমাণে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। কেননা, তার ত্রুটি পরিমাণে কম। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অঙ্গের পরিমাণ অনুপাতে দম ওয়াজিব হবে। যেমন– যদি অর্ধেক অঙ্গের উপর সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে অর্ধেক দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এক-চতুর্থাংশের উপর সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে সে পরিমাণ দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) অংশকে সমগ্রের উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যখন পূর্ণ একটি অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে দম ওয়াজিব হয়, তখন অঙ্গের অংশবিশেষের ক্ষেত্রেও সে পরিমাণ দম ওয়াজিব হবে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে রয়েছে যে, একটি অঙ্গের এক-চতুর্থাংশে সুগন্ধি ব্যবহার করলে তার উপর পূর্ণ দম ওয়াজিব হবে, মাথার এক-চতুর্থাংশের হলকের উপর কিয়াস করে। অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ মাথা মুণ্ডন করা যেমন পূর্ণ মাথা মুণ্ডনের সমতুল্য সেরূপ এক অঙ্গের এক-চতুর্থাংশে খোশবু ব্যবহার করাও পূর্ণ অঙ্গে খোশবু ব্যবহারের সমতুল্য। তবে পরবর্তীতে আমরা উভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ ثُمَّ وَاجِبُ الدَّمِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাজীর উপর যদি ত্রুটির দম ওয়াজিব হয়, তাহলে বকরি জবাই করার দ্বারা তা আদায় হয়ে যাবে। তবে দুটি ক্ষেত্র ভিন্ন। এক. অপবিত্র অবস্থায় কিংবা হায়েয ও নিফাস অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত করলে। দুই. উকূফে আরাফার পরে সহবাস করলে। এ দুটি ক্ষেত্রে শুধু বকরি জবাই করার দ্বারা দম আদায় হবে না; বরং উট কিংবা গরু জবাই করা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَكُلُّ صَدَقَةٍ الخ : ইহ্‌রামের ত্রুটির ক্ষেত্রে যদি এমন সদকা ওয়াজিব হয়– যার পরিমাণ অনির্ধারিত, তাহলে সেক্ষেত্রে অর্ধ সা' গম ওয়াজিব হবে। তবে কেউ যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় উকুন কিংবা টিডিড হত্যা করে, তাহলে সে ইচ্ছামতো সাদকা করবে। এক্ষেত্রে কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন– اَلتَّمْرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْجَرَادَةِ 'টিডিড থেকে একটি খেজুর উত্তম।'

قَالَ فَإِنْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ طِيْبٌ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحِنَّاءُ طِيْبٌ وَإِنْ صَارَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِلتَّطَيُّبِ وَ دَمٌ لِلتَّغْطِيَةِ وَلَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِطِيْبٍ وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ إِذَا خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ لِأَجْلِ الْمُعَالَجَةِ مِنَ الصُّدَاعِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُغَلِّفُ رَأْسَهُ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ ثُمَّ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ وَاقْتَصَرَ عَلٰى ذِكْرِ الرَّأْسِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ دَلَّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْمُوْنٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ মেহেদি দ্বারা মাথার চুল রঞ্জিত করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা সুগন্ধি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلْحِنَّاءُ طِيْبٌ 'মেহেদি হলো সুগন্ধি।' আর যদি তাতে মাথা প্রলিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো সুগন্ধি ব্যবহার করার দম, অন্যটি হলো মাথা আবৃত করার দম। আর যদি 'ওয়াসমাহ' দ্বারা চুল রঞ্জিত করে, তাহলে তার উপর কোনো দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা সুগন্ধি নয়। ইমম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মুহরিম যদি মাথাব্যথার চিকিৎসার জন্য ওয়াসমার খেজাব লাগায়, তাহলে তার উপর প্রায়শ্চিত্ত [দম] ওয়াজিব– এ বিবেচনায় যে, তা মাথা আবৃত করে ফেলে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। মাবসূত কিতাবে এ প্রসঙ্গে মাথা ও দাড়ির কথা একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর জামেউস্-সগীর গ্রন্থে শুধু মাথার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো মুহ্‌রিম মাথায় মেহেদির খেজাব ব্যবহার করে, তাহলে এ ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তার উপর একটি কুরবানি ওয়াজিব হবে। কেননা, মেহেদি এক ধরনের সুগন্ধি। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْحِنَّاءُ طِيْبٌ 'মেহেদি হলো সুগন্ধি।' আর ইহরাম অবস্থায় মেহেদি ব্যবহার করা অপরাধ বলে তার উপর অপরাধের দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় মেহেদি এমনভাবে ব্যবহার করে যে, তা মাথায় প্রলিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো, তা একদিন কিংবা একরাত পূর্ণ মাথায় কিংবা মাথার এক-চতুর্থাংশে আবৃত থাকতে হবে। সুগন্ধি ব্যবহারের জন্য একটি দম আর মাথা আবৃত করার জন্য অপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি কোনো মুহ্‌রিম ওয়াসমাহ বৃক্ষের পাতা দ্বারা চুল রঞ্জিত করে, তাহলে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা সুগন্ধি নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি মাথাব্যথার চিকিৎসার জন্য ওয়াসমার খেজাব লাগায়, তাহলে তার উপর কাফ্‌ফারা [দম] ওয়াজিব হবে। তবে এ দম সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে ওয়াজিব হবে না; বরং ওয়াসমাহ দ্বারা মাথা আবৃত করার কারণে তা ওয়াজিব হবে। কেননা, ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা আবৃত করলে সর্বসম্মতিক্রমে দম ওয়াজিব হয়। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

হিদায়া গ্রন্থকার মাবসূত ও জামেউস্-সগীরের বর্ণনার মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করে বলেন, মাবসূত কিতাবে মাথা ও দাড়ির কথা একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে আর জামেউস্-সগীরে শুধু মাথার কথা বলা হয়েছে।

জামেউস্-সগীরের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, দম ওয়াজিব হওয়ার জন্য মাথা ও দাড়ি উভয়টিতে একসঙ্গে খেজাব লাগানো শর্ত নয়; বরং যে কোনো একটিতে খেজাব লাগালেই কুরবানি ওয়াজিব হবে।

فَإِنِ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) إِذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الشَّعْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِإِزَالَةِ الشَّعَثِ وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِيْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِهِ وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ إِلَّا أَنَّ فِيْهِ ارْتِفَاقًا بِمَعْنَى قَتْلِ الْهَوَامِّ وَإِزَالَةِ الشَّعَثِ فَكَانَتْ جِنَايَةً قَاصِرَةً وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ أَصْلُ الطِّيْبِ وَلَا يَخْلُوْ عَنْ نَوْعِ طِيْبٍ وَيَقْتُلُ الْهَوَامَّ وَيُلَيِّنُ الشَّعْرَ وَ يُزِيْلُ التَّفَثَ وَالشَّعَثَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ بِهٰذِهِ الْجُمْلَةِ فَيُوْجِبُ الدَّمَ وَكَوْنُهُ مَطْعُوْمًا لَا يُنَافِيْهِ كَالزَّعْفَرَانِ وَهٰذَا الْخِلَافُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْحَلِّ الْبَحْتِ أَمَّا الْمُطَيَّبُ مِنْهُ كَالْبَنَفْسَجِ وَالزَّنْبَقِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا يَجِبُ بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّمُ بِالْاِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ طِيْبٌ وَهٰذَا إِذَا اسْتَعْمَلَهُ عَلٰى وَجْهِ التَّطَيُّبِ وَلَوْ دَاوٰى بِهِ جُرْحَهُ أَوْ شُقُوْقَ رِجْلِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيْبٍ فِيْ نَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ أَصْلُ الطِّيْبِ أَوْ هُوَ طِيْبٌ مِنْ وَجْهٍ فَيُشْتَرَطُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلٰى وَجْهِ التَّطَيُّبِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَدَاوٰى بِالْمِسْكِ وَمَا أَشْبَهَهُ ـ

অনুবাদ : যদি কেউ জয়তুন ব্যবহার করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি চুলের মধ্যে ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে– উষ্কখুষ্কতা দূর করার কারণে। আর যদি চুল ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, এটি ভোগ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাতে কিছুটা উপকার রয়েছে। যেমন– কীট ধ্বংস করা, খুষ্কতা দূর করা। সুতরাং তা লঘু ক্রটির মধ্যে গণ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জয়তুন তৈল হলো খোশবুর মূল। আর তাতেও কিছু না কিছু ঘ্রাণ থাকে। তা ছাড়া কীট ধ্বংস করে, চুল নরম করে, ময়লা ও উষ্কখুষ্কতা দূর করে। সুতরাং এসব মিলে অপরাধের পূর্ণতা সাধিত হয়, কাজেই দম ওয়াজিব হবে। আর ভোগ্যদ্রব্য হওয়া খোশবু হওয়ার বিপরীত নয়। যেমন– জাফরান। আর এই মতভিন্নতা হলো অবিমিশ্র জয়তুনের তেল এবং অবিমিশ্র তিলের তেল সম্পর্কে। আর এর মধ্যে সুগন্ধি মিশ্রিত হলে তা ব্যবহারে সর্বসম্মতভাবেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যেমন– বনস্পতি, ইয়াসমিন ও অন্যান্য সুগন্ধি জাতীয় তেল। কেননা, তা সুগন্ধি। এই হুকুম তখন হবে, যখন খোশবু হিসেবে তা ব্যবহার করা হবে। আর যদি তা দ্বারা জখম কিংবা পায়ের কাটার চিকিৎসা করা হয়, তাহলে তার উপর কোনো কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, এটা স্বয়ং সুগন্ধি নয়; বরং সুগন্ধির মূল। কিংবা এক হিসেবে সুগন্ধি। সুতরাং সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা শর্ত হবে। পক্ষান্তরে মিশক ও এ জাতীয় জিনিস দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টি এর বিপরীত। [কেননা, তাতে সর্বাবস্থায় দম ওয়াজিব হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ الخ : মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি জয়তুনের তেল ব্যবহার করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর ক্ষতিপূরণের দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জয়তুনের তেল যদি চুলে ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। চুল ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করলে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইমাম মালিক (র.)-এর মাযহাবও অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, চুলে জয়তুন তেল ব্যবহার করার দ্বারা উষ্কখুষ্কতা দূর হয়ে যায়, অথচ হাজীর জন্য তা নিষিদ্ধ। যেমন হাদীসে এসেছে- اَلْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ - 'হাজী আলুথালু কেশ ও দুর্গন্ধময় হয়।' আর ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধকর্মে লিপ্ত হলে, দম ওয়াজিব হয়। এজন্য এ সুরতেও দম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে চুল ছাড়া অন্যত্র তেল ব্যবহারের ফলে উষ্কখুষ্কতা দূরীভূত হয় না। বিধায় সে ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন দলিল হলো, জয়তুনের তেল ভোগ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তা সুগন্ধি কিংবা বিলাসিতার দ্রব্য নয়। তবে তা উকুনকে ধ্বংস করে ও উষ্কখুষ্কতাও কিছুটা দূর করে বিধায় তা ব্যবহার করা মুহ্‌রিমের জন্য অপরাধ; কিন্তু অসম্পূর্ণ ত্রুটি হওয়ার কারণে সদকা ওয়াজিব হবে, দম নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জয়তুনের তেল সুগন্ধি নয় বটে, সুগন্ধির মূল। সুতরাং যেভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হয় তদ্রূপ সুগন্ধির আসল ও মূল ব্যবহারের দ্বারাও দম ওয়াজিব হবে।

তা ছাড়া জয়তুনের তেলে কিছু না কিছু সুঘ্রাণ থাকে। তা কীট ধ্বংস করে, চুল নরম করে, ময়লা ও উষ্কখুষ্কতা দূর করে। সুতরাং এসব মিলে অপরাধের পূর্ণতা সাধিত হয়। আর পূর্ণ অপরাধের কারণে দম ওয়াজিব হয়। তাই জয়তুনের তেল ব্যবহারের ফলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর প্রদত্ত দলিলের জবাব হলো, জয়তুনের তেল ভোগ্যদ্রব্য হওয়া উপরোল্লিখিত বিষয় [সুঘ্রাণ হওয়া, কীট ধ্বংস করা প্রভৃতি] গুলোর বিপরীত নয়। যেমন- জাফরান ভোগ্যদ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে তা খোশবুও।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার মতভিন্নতা হলো অবিমিশ্র জয়তুনের তেল এবং অবিমিশ্র তিলের তেল সম্পর্কে। আর যদি জয়তুনের তেল কিংবা তিলের তেলে বনস্পতি, ইয়াসমিন ও অন্যান্য সুগন্ধি মিশিয়ে ব্যবহার করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তখন তা সুগন্ধিতে রূপান্তরিত হয়। অতএব, যখন খোশবু হিসেবে কেউ ব্যবহার করবে, তখন এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ دَاوَى بِهِ جُرْحَهُ الخ - মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি জখম কিংবা পায়ের কাটার চিকিৎসার্থে জয়তুন তেল ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম কিংবা সদকা কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, জয়তুনের তেল স্বয়ং সুগন্ধি নয়; বরং সুগন্ধির মূল কিংবা কোনো এক দিকের প্রতি লক্ষ্য করে সুগন্ধি। আর দম ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা শর্ত। অতএব যদি চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না।

পক্ষান্তরে মিশক, আম্বর, কাফুর কিংবা এ জাতীয় সুগন্ধি চিকিৎসার্থে ব্যবহার করলেও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, এগুলো স্বয়ং সুগন্ধি। সুতরাং এগুলোর ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা শর্ত নয়।

وَاِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَخِيْطًا اَوْ غَطّٰى رَأْسَهٗ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهٗ اِذَا لَبِسَ اَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَوَّلًا وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) يَجِبُ الدَّمُ بِنَفْسِ اللُّبْسِ لِاَنَّ الْاِرْتِفَاقَ يَتَكَامَلُ بِالْاِشْتِمَالِ عَلٰى بَدَنِهٖ وَلَنَا اَنَّ مَعْنَى التَّرَفُّقِ مَقْصُوْدٌ مِنَ اللُّبْسِ فَلَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْمُدَّةِ لِيَتَحَصَّلَ عَلَى الْكَمَالِ وَيَجِبُ الدَّمُ فَقُدِّرَ بِالْيَوْمِ لِاَنَّهٗ يُلْبَسُ فِيْهِ ثُمَّ يُنْزَعُ عَادَةً وَتَتَقَاصَرُ فِيْمَا دُوْنَهُ الْجِنَايَةُ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ غَيْرَ اَنَّ اَبَا يُوْسُفَ (رح) اَقَامَ الْاَكْثَرَ مَقَامَ الْكُلِّ ـ

অনুবাদ : যদি পূর্ণ একদিন সেলাই করা কাপড় পরিধান করে কিংবা মাথা ঢেকে রাখে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এর চেয়ে কম সময় হয়, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি অর্ধদিনের বেশি সময় পরিধান করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এটি ছিল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু পরিধান করলেই দম ওয়াজিব হবে। কেননা, বস্ত্র শরীরের সাথে জড়িত হওয়া মাত্রই উপকারিতা পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের দলিল হলো– বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে উপকার লাভ। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময় বিবেচনা করতে হবে– যাতে তা পূর্ণমাত্রায় হাসিল হয় এবং তাতে দম ওয়াজিব হয়। অতএব সেই মেয়াদ একদিন দ্বারা ধার্য করা হয়েছে। কেননা, সাধারণত একদিনের জন্য বস্ত্র পরিধান করা হয়, এরপর খুলে ফেলে। পক্ষান্তরে একদিনের কম অপরাধ লঘু হয়, তাই সদকা ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অধিকাংশ সময়কে সমগ্রের স্থলবর্তী বিবেচনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, মুহ্‌রিম যদি একদিন কিংবা একরাত সেলাই করা কাপড় পরিধান করে কিংবা মাথা ঢেকে রাখে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি একদিন কিংবা এক রাতের কম সময় কাপড় পরিধান করে কিংবা মাথা ঢেকে রাখে, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুহ্‌রিম যদি অর্ধদিবস কিংবা অর্ধরাতের বেশি সময় কাপড় পরিধান করে কিংবা মাথা ঢেকে রাখে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমত এমনই ছিল। পরবর্তীতে এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেন, দম ওয়াজিব হবে ঐ সময় যখন পূর্ণ একদিন কিংবা একরাত পরিধান করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সেলাই করা কাপড় পরিধান করলেই দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, বস্ত্র পরিধান করা মাত্রই উপকারিতা পূর্ণ হয়। সুতরাং কাপড় পরিধান করা মাত্রই যখন উপকারিতা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন পূর্ণ অপরাধ সংঘটিত হওয়া পাওয়া যায়। আর নিয়ম আছে যে, এমন ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হয়। অতএব পাওয়া যাওয়া মাত্রই দম ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হলো, বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য হলো ঠাণ্ডা বা গরম দূর করার উপকার লাভ। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ এ আয়াতের অর্থের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে। সুতরাং ঠাণ্ডা কিংবা গরমের অর্থ পূর্ণ মাত্রায় হতে পারে আবার অসম্পূর্ণ মাত্রায়ও হতে পারে। আর এই পূর্ণমাত্রা ও অসম্পূর্ণ মাত্রার মধ্যকার সীমানা নির্ধারণ করা আবশ্যক, যাতে প্রায়শ্চিত্ত সেই অনুপাতে নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং একদিন কিংবা একরাতকে পার্থক্য নির্ধারণকারী সীমানারূপে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ একদিন কিংবা পূর্ণ একরাত সেলাই করা কাপড় পরিধান করা পূর্ণমাত্রার অপরাধ। এ কারণে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত দম ওয়াজিব হবে। আর তা থেকে কম সময়ে অপরাধ লঘু হয়ে যায়। এ কারণে লঘু প্রায়শ্চিত্ত সদকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অধিকাংশ সময়কে সমগ্রের স্থলবর্তী বিবেচনা করেছেন। এজন্য তাঁর মতে অর্ধ দিনের বেশি সময় পরিধান করার ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত তথা দম ওয়াজিব হবে।

وَلَوِ ارْتَدَى بِالْقَمِيْصِ أَوِ اتَّشَحَ بِهِ أَوِ اتَّزَرَ بِالسَّرَاوِيْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسْهُ لُبْسَ الْمَخِيْطِ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ مَنْكِبَيْهِ فِى الْقَبَاءِ وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِى الْكُمَّيْنِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) لِأَنَّهُ مَا لَبِسَهُ لُبْسَ الْقَبَاءِ وَلِهٰذَا يَتَكَلَّفُ فِى حِفْظِهِ وَالتَّقْدِيْرُ فِى تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ مَا بَيَّنَّاهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا غَطَّى جَمِيْعَ رَأْسِهِ يَوْمًا كَامِلًا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ لِأَنَّهُ مَمْنُوْعٌ عَنْهُ وَلَوْ غَطَّى بَعْضَ رَأْسِهِ فَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ اعْتَبَرَ الرُّبْعَ اعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ وَالْعَوْرَةِ وَهٰذَا لِأَنَّ سَتْرَ الْبَعْضِ اسْتِمْتَاعٌ مَقْصُوْدٌ يَعْتَادُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَعَنْ أَبِى يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ يَعْتَبِرُ أَكْثَرَ الرَّأْسِ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ.

অনুবাদ : [মুহ্‌রিম] যদি জামা চাদররূপে ব্যবহার করে কিংবা বগল তলায় দিয়ে অপর কাঁধের উপর ফেলে রাখে কিংবা পাজামাকে তহবন্দরূপে ব্যবহার করে, তাহলে কোনো দোষ নেই। কেননা, সে তা সেলাই করা কাপড়রূপে পরিধান করেনি। তদ্রূপ যদি দুই কাঁধ 'আবা-কাবা'-এর ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং উভয় হাত আস্তিনে প্রবেশ না করায় [তাহলে উক্ত হুকুমই প্রযোজ্য হবে।] ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলিল হলো, সে এটাকে 'আবা-কাবা'রূপে ব্যবহার করেনি। এ কারণেই এটা রক্ষা করতে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আর মাথা ঢাকার ব্যাপারেও সময়ের পরিমাণ তা-ই হবে, যা আমরা বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, যদি সম্পূর্ণ মাথা পূর্ণ একদিন ঢেকে রাখে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা নিষিদ্ধ। আর যদি মাথার অংশবিশেষ ঢেকে রাখে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক-চতুর্থাংশকে অপরাধ গণ্য করেছেন মাথা মুণ্ডন করা ও সতরের উপর কিয়াস করে। কেননা, আংশিক ঢেকে রাখা এমন উপকার ভোগ যা উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। কোনো কোনো মানুষ এরূপ করাতেই অভ্যস্ত হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আধিক্যের প্রকৃত অর্থ লক্ষ্য করে মাথার অধিকাংশ বিবেচনা করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِتِّشَاحٌ হলো ব্যক্তির স্বীয় কাপড়কে ডান বগলের তলায় দিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলে রাখা।

সূরতে মাসআলা হলো, মুহরিম যদি জামাকে চাদররূপে ব্যবহার করে কিংবা ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলে রাখে কিংবা পাজামাকে লুঙ্গিরূপে ব্যবহার করে পায়ে লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে নেয়, তাহলে তার উপর সদকা বা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে তা সেলাই করা কাপড়রূপে পরিধান করেনি। আর সেলাই করা কাপড়রূপে যখন পরিধান করেনি তখন তার উপর অপরাধের দমও ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ মুহরিম যদি 'আবা-কাবা'-এর মধ্যে দুই কাঁধ ঢুকিয়ে দেয় এবং উভয় হাত আস্তিনে প্রবেশ না করায়, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তার উপর প্রায়শ্চিত্ত ওয়াজিব।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, 'আবা-কাবা' সেলাই করা পোশাক। সুতরাং মুহ্‌রিম যখন তাতে দুই কাঁধ ঢুকিয়ে দেয়, তখন সে সেলাই করা কাপড় পরিধানকারী হয়ে যায়। কেননা, আবা সেভাবেই পরিধান করা হয়। আর মুহ্‌রিম সেলাই করা কাপড় পরিধান করলে তার উপর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হলো, 'আবা-কাবা' যেভাবে পরিধান করা হয় সেভাবে পরিধান করেনি। কেননা, সাধারণত 'আবা-কাবা' পরিধান করার নিয়ম হলো, উভয় কাঁধ ও উভয় হাত তাতে ঢুকিয়ে দেবে। এ কারণেই উভয় হাত আস্তিনে প্রবেশ না করানোর ক্ষেত্রে এটিকে রক্ষা করতে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কেননা, এ সুরতে আবা কাঁধে রাখা কষ্টকর। সুতরাং 'আবা-কাবা' নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিধান না করার কারণে তার উপর অপরাধের দম কিংবা অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাথা ঢাকার ব্যাপারেও পূর্ণ একদিন ধর্তব্য। সুতরাং মুহ্‌রিম যদি পূর্ণ একদিন মাথা ঢেকে রাখে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা আবৃত করা নিষিদ্ধ। আর যদি মাথার কিছু অংশ ঢেকে রাখে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মাথার এক-চতুর্থাংশকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ মাথার এক-চতুর্থাংশ আবৃত করলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তিনি এটাকে মাথা মুণ্ডানো ও সতর খুলে যাওয়ার উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেভাবে ইহ্‌রাম অবস্থায় এক-চতুর্থাংশ মাথা মুণ্ডানোর দ্বারা দম ওয়াজিব হয় এবং এ চতুর্থাংশ সতর খোলার কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় তদ্রূপ মাথার এক-চতুর্থাংশ আবৃত করার কারণে মুহ্‌রিমের উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা মাথার আংশিক আবৃত করা এমন উপকার ভোগ যা উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। আর কোনো কোনো মানুষ এরূপ করায় অভ্যস্ত যে মাথার একাংশ আবৃত করে আর অবশিষ্টাংশ খোলা রাখে। যেমন– তুর্কি ও ইরাকীরা এত ছোট টুপি পরিধান করে যে, মাথার চতুর্থাংশ ঢাকে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মাথার অধিকাংশের বিবেচনা করেন। অর্থাৎ মুহ্‌রিম যদি মাথার অধিকাংশ ঢেকে রাখে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে– অন্যথায় নয়। তিনি আধিক্যের প্রকৃত অর্থের বিবেচনা করেন। আর আধিক্যের প্রকৃত অর্থ হলো- এর বিপরীতে কম হবে। আর এটা হবে তখনই যখন মাথার অধিকাংশ ঢাকা পড়বে।

وَاِذَا حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ اَوْ رُبْعَ لِحْيَتِهٖ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ فَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) لَا يَجِبُ اِلَّا بِحَلْقِ الْكُلِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجِبُ بِحَلْقِ الْقَلِيْلِ اِعْتِبَارًا بِنَبَاتِ الْحَرَمِ وَلَنَا اَنَّ حَلْقَ بَعْضِ الرَّأْسِ اِرْتِفَاقٌ كَامِلٌ لِاَنَّهٗ مُعْتَادٌ فَتَتَكَامَلُ بِهِ الْجِنَايَةُ وَتَتَقَاصَرُ فِيْمَا دُوْنَهٗ بِخِلَافِ تَطْيِيْبِ رُبْعِ الْعُضْوِ لِاَنَّهٗ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَاَرْضِ الْعَرَبِ ـ

অনুবাদ : যদি মাথার এক-চতুর্থাংশ কিংবা দাড়ির এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশি হলক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, সবটুকু হলক না করলে দম ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সামান্য পরিমাণ হলক করলেও দম ওয়াজিব হবে। তিনি একে হারাম শরীফের ঘাস-বৃক্ষের উপর কিয়াস করেছেন। আমাদের দলিল এই যে, মাথার এক-চতুর্থাংশ হলক করা পূর্ণ উপকার লাভের শামিল। কেননা, এটি প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং এতে পূর্ণ অপরাধ গণ্য হবে। কিন্তু চতুর্থাংশের কম হলে অপরাধ লঘু হবে। পক্ষান্তরে অঙ্গের এক-চতুর্থাংশে সুগন্ধি ব্যবহারের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, [সচরাচর] তা উদ্দেশ্য হয় না। তদ্রূপ ইরাকে ও আরব দেশেও দাড়ির অংশবিশেষ হলক করার প্রচলন রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি মাথার এক–চতুর্থাংশ কিংবা দাড়ির এক–চতুর্থাংশ বা তার বেশি হলক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এক–চতুর্থাংশের কম হলক করে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.)–এর মতে, দম ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণ মাথা কিংবা সমগ্র দাড়ি মুণ্ডানো শর্ত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, তিনটি চুল হলক করার দ্বারাও দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) মুহ্‌রিমের চুলকে হারাম শরীফের ঘাসের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ দম ওয়াজিব হওয়ার জন্য হারাম শরীফের ঘাস কর্তনের ক্ষেত্রে কম ও বেশি বরাবর, তেমনি চুলের ক্ষেত্রেও কম ও বেশি বরাবর।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ [তোমরা মাথা মুণ্ডাবে না।] মাথা দ্বারা পূর্ণ মাথা বুঝায়। এজন্য পূর্ণ মাথা হলক করা নিষিদ্ধ। আংশিক মাথা হলক করা এ হুকুমের অর্ন্তভুক্ত নয়। সুতরাং পূর্ণ মাথা হলক করা নিষিদ্ধ বলে কেউ যদি পূর্ণ মাথা হলক করে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে– অন্যথায় নয়।

আমাদের দলিল হলো, মাথার এক-চতুর্থাংশ হলক করা পূর্ণ উপকার লাভের শামিল। কেননা, জনসাধারণের মধ্যে এটি প্রচলিত রয়েছে। যেমন– তুর্কিদের অভ্যাস হলো, দাড়ির মধ্যখান মুণ্ডানো। আর কোনো কোনো আলভীদের [হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর] অভ্যাস হলো কপালের উপরিভাগের চুল মুণ্ডানো। যাহোক, মাথার এক-চতুর্থাংশ হলক করা পূর্ণ উপকার বলে গণ্য হওয়ার কারণে অপরাধও পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। আর এক-চতুর্থাংশের কম হলে অপরাধ লঘু হবে। যেহেতু পূর্ণ অপরাধের ক্ষেত্রে দম এবং লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে সদকা ওয়াজিব হয়, সেহেতু মাথার এক-চতুর্থাংশ মুণ্ডানোর সুরতে দম ওয়াজিব হবে এবং তার চেয়ে কম মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে সদকা ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে কোনো অঙ্গের এক-চতুর্থাংশে সুগন্ধি লাগানোর ফলে দম ওয়াজিব না হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সুগন্ধি ব্যবহার সচরাচর উদ্দেশ্য হয় না। আর সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশের প্রচলন নেই। এজন্য সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ অঙ্গের হুকুম তা-ই যা হলকের মধ্যে এক-চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তদ্রূপ ইরাকে ও আরব দেশেও দাড়ির অংশবিশেষ হলক করার প্রচলন রয়েছে।

وَإِنْ حَلَقَ الرَّقَبَةَ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ عُضْوٌ مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ وَإِنْ حَلَقَ الْإِبْطَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ لِدَفْعِ الْأَذٰى وَنَيْلِ الرَّاحَةِ فَأَشْبَهَ الْعَانَةَ ذَكَرَ فِي الْإِبْطَيْنِ الْحَلْقَ هُنَا وَفِي الْأَصْلِ النَّتْفَ وَهُوَ السُّنَّةُ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٌ (رحـ) إِذَا حَلَقَ عُضْوًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَطَعَامٌ أَرَادَ بِهِ الصَّدْرَ وَالسَّاقَ وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِطَرِيْقِ التَّنُّوْرِ فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَيَتَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقِ بَعْضِهِ.

অনুবাদ : যদি সম্পূর্ণ ঘাড় মুণ্ডন করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটি আলাদা অঙ্গ, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হলক করা হয়। যদি উভয় বগল কিংবা একটি বগল হলক করা হয়, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, ময়লা দূর করা এবং স্বস্তি লাভের জন্য উভয়ের প্রত্যেকটি হলকের উদ্দেশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং তা নাভির নীচের চুলের হুকুমের অনুরূপ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এখানে [জামেউস-সগীরে] বগলদ্বয়ের ক্ষেত্রে মুণ্ডানোর কথা বলেছেন। কিন্তু মাবসূতের বর্ণনায় উপড়ানোর কথা রয়েছে আর সেটিই হলো সুন্নত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি পূর্ণ এক অঙ্গ হলক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম হলে খাদ্যসামগ্রী সদকা করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ণ অঙ্গ দ্বারা বুক, পায়ের নলা এবং তার সঙ্গে যা সামঞ্জস্য রাখে। কেননা, এ সকল অঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই লোমনাশক ব্যবহার করা হয়। সুতরাং পূর্ণ অঙ্গ হলক করলে অপরাধ পূর্ণ হবে, আর আংশিক হলক করলে অপরাধ লঘু হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুহ্‌রিম যদি সম্পূর্ণ ঘাড় হলক করে, তাহলে তার উপর অপরাধের দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটি এমন অঙ্গ, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হলক করা হয়। এমনকি অনেকে স্বস্তি লাভ ও সৌন্দর্যের জন্য হলক করে। যদিও তা মাকরূহ।

আর মুহ্‌রিম যদি উভয় বগল কিংবা একটি বগল হলক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, বগল হলক করা হয় ময়লা দূর করা ও স্বস্তি লাভের জন্য। সুতরাং তা নাভির নীচের চুলের হুকুমের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ নাভির নীচের চুল মুণ্ডানোর দ্বারা যেরূপ দম ওয়াজিব হয় তদ্রূপ যে কোনো বগলের চুল হলকের দ্বারাও দম ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন হয়, যদি উভয় বগলের প্রত্যেকটিই হলকের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দুটি বগল হলকের দ্বারা দুটি দম ওয়াজিব হওয়ার কথা। অথচ সেক্ষেত্রেও একটি দমই ওয়াজিব হয়।

এর জবাব হলো, মুহ্‌রিম যদি একই ধরনের দুটি অপরাধ করে, তাহলে একটিই জরিমানা ওয়াজিব হয়। যেমন– যদি কেউ লোমনাশক ব্যবহার করে শরীরের সম্পূর্ণ লোম পরিষ্কার করে, তাহলেও তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ উভয় বগল মুণ্ডানোর দ্বারাও একটি দম ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) জামেউস্-সগীর ও মাবসূতের রেওয়ায়েতের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনার্থে বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামেউস্-সগীরে বগলদ্বয়ের ক্ষেত্রে حَلْق [মুণ্ডানো] শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর মাবসূতের বর্ণনায় نَتْف [উপড়ানো] শব্দ উল্লেখ করেছেন। দম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের একই হুকুম। তবে نَتْف [উপড়ানো] সুন্নত।

সাহেবাইন (র.) বলেন, মুহ্‌রিম যদি পূর্ণ এক অঙ্গ হলক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম হলে, খাদ্যসামগ্রী সদকা করবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ণ অঙ্গ দ্বারা বুক, পায়ের নলা এবং তৎসদৃশ রান ইত্যাদি বুঝিয়েছেন। কেননা, এ সকল অঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে লোমনাশক ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ স্বস্তি লাভ ও সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে লোমনাশক ব্যবহার করে লোম পরিষ্কার করে। আর হলকের মাধ্যমেও লোম পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং যখন উভয়ের প্রত্যেকটিই হলকের উদ্দেশ্য হয়ে যায় তখন পূর্ণ অঙ্গ হলক করলে অপরাধ পূর্ণ হবে আর আংশিক করলে অপরাধ লঘু হবে। আর ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ণ অপরাধের ক্ষেত্রে দম এবং লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে সদকা ওয়াজিব হয়। এজন্য একটি অঙ্গ হলক করলে দম ওয়াজিব হবে আর এর চেয়ে কম হলে সদকা ওয়াজিব হবে।

وَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ فَعَلَيْهِ طَعَامُ حُكُوْمَةِ عَدْلٍ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْظَرُ أَنَّ هٰذَا الْمَأْخُوْذَ كَمْ يَكُوْنُ مِنْ رُبْعِ اللِّحْيَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ بِحَسْبِ ذٰلِكَ حَتّٰى لَوْ كَانَ مَثَلًا مِثْلَ رُبْعِ الرُّبْعِ يَلْزَمُهُ قِيْمَةُ رُبْعِ الشَّاةِ وَلَفْظَةُ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ تَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ هُوَ السُّنَّةُ فِيْهِ دُوْنَ الْحَلْقِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُصَّ حَتّٰى يُوَازِيَ الْإِطَارَ.

অনুবাদ : [মুহ্‌রিম] যদি মোচ ছাঁটে, তাহলে ন্যায় বিচারানুসারে খাদ্যশস্য সদকা করা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ লক্ষ্য করা হবে যে, দাড়ির চতুর্থাংশের তুলনায় ছাঁটা মোচ কি পরিমাণ হচ্ছে। সেই অনুপাতে খাদ্যশস্য ওয়াজিব হবে। এমনকি যদি ছাঁটা মোচ চতুর্থাংশের এক-চতুর্থাংশও হয়, তাহলে একটি বকরির চতুর্থাংশের মূল্য ওয়াজিব হবে। ছাঁটা শব্দটি প্রমাণ করে যে, মোচের ক্ষেত্রে এটাই সুন্নত– হলক সুন্নত নয়। বস্তুত উপরের ঠোঁটের সীমা বরাবর ছাঁটা সুন্নত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَطَار হলো ঠোঁটের চামড়া ও গোশতের মিলিত হওয়ার জায়গা। অর্থাৎ উপরের ঠোঁটের উপরি অংশ।

মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি মোচ ছাঁটে কিংবা মুণ্ডিয়ে ফেলে, তাহলে দু জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যা ফয়সালা করবেন সেভাবে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তিনি বিবেচনা করে দেখবেন যে, দাড়ির এক-চতুর্থাংশের তুলনায় ছাঁটা মোচ কি পরিমাণ? সেই অনুপাতে সদকা ওয়াজিব হবে। যেমন– ছাঁটা মোচ যদি চতুর্থাংশের এক-চতুর্থাংশ হয়, তাহলে একটি বকরির এক-চতুর্থাংশের মূল্য ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কুদূরীর ইবারত– أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ প্রমাণ করে যে, মোচ ছাঁটা সুন্নত, হলক করা সুন্নত নয়। কোনো কোনো মুতাআখ্‌খিরীন মাশায়েখের অভিমত এটিই। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– عَشْرَةٌ مِنْ فِطْرَتِيْ وَفِطْرَةِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا قَصَّ الشَّارِبِ এ হাদীসে মোচ ছাঁটাকে সহজাত স্বভাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে– মুণ্ডানোর কথা বলা হয়নি। এ কারণেই মোচ ছাঁটা সুন্নত, হলক করা সুন্নত নয়। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, উপরের ঠোঁটের সীমা বরাবর ছাঁটা সুন্নত।

قَالَ وَإِنْ حَلَقَ مَوْضَعَ الْمَحَاجِمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِاَنَّهُ اِنَّمَا يَحْلِقُ لِاَجْلِ الْحِجَامَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مِنَ الْمَحْظُوْرَاتِ فَكَذَا مَا يَكُوْنُ وَسِيْلَةً اِلَيْهَا اِلَّا اَنَّ فِيْهِ اِزَالَةَ شَيْءٍ مِنَ التَّفَثِ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ حَلْقَهُ مَقْصُوْدٌ لِاَنَّهُ لَا يُتَوَسَّلُ اِلَى الْمَقْصُوْدِ اِلَّا بِهٖ وَقَدْ وُجِدَ اِزَالَةُ التَّفَثِ عَنْ عُضْوٍ كَامِلٍ فَيَجِبُ الدَّمُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ শিঙ্গা লাগানোর স্থান হলক করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। কেননা, হলক করা হয় শিঙ্গা লাগানোর উদ্দেশ্যে। আর তা ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ নয়। সুতরাং শিঙ্গা লাগানোর সহায়কেরও একই হুকুম হবে। তবে যেহেতু এতে কিছুটা ময়লা দূর করা হয়, তাই সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এ স্থানের হলকও উদ্দিষ্ট। কেননা, তা ছাড়া মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব একটি পূর্ণ অঙ্গ থেকে ময়লা দূর করার বিষয় সংঘটিত হয়েছে, তাই দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি শিঙ্গা লাগানোর স্থান হলক করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইনের মতে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, শিঙ্গা লাগানোর স্থান হলক করা হয় শুধু শিঙ্গা লাগানোর উদ্দেশ্যেই। আর শিঙ্গা লাগানো ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহের অন্তর্গত নয়। এ কারণে শিঙ্গা লাগানোর জন্য যা সহায়ক, তার হুকুমও অনুরূপ হবে তথা সেটাও নিষিদ্ধ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, শিঙ্গা লাগানোর স্থান হলক করলে মুহ্‌রিমের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে যেহেতু এতে কিছুটা ময়লা দূর করা হয়, যদিও পুরোপুরিভাবে ময়লা দূর করা হয় না, তাই তা লঘু অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে সদকা ওয়াজিব হয়। এজন্য এ ক্ষেত্রেও সদকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, শিঙ্গা লাগানোর স্থানে হলক করাও উদ্দিষ্ট। কেননা, এছাড়া শিঙ্গা লাগানো সম্ভব হয় না। আর উদ্দিষ্টের সহায়কও উদ্দিষ্ট হয়। সুতরাং শিঙ্গা লাগানোর সহায়ক হলক করাও উদ্দিষ্ট বলে বিবেচিত হবে। আর এ স্থানটি শিঙ্গা লাগানোর ক্ষেত্রে পূর্ণ অঙ্গ। আর পূর্ণ অঙ্গ থেকে ময়লা দূর করার বিষয়টি পাওয়া গেছে যা দম ওয়াজিব করে। এ কারণেই এ ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হবে।

وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِاَمْرِهِ اَوْ بِغَيْرِ اَمْرِهِ فَعَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ وَعَلَى الْمَحْلُوْقِ دَمٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَجِبُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ اَمْرِهِ بِاَنْ كَانَ نَائِمًا لِاَنَّ مِنْ اَصْلِهِ اَنَّ الْإِكْرَاهَ يُخْرِجُ الْمُكْرَهَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ مُؤَاخَذًا بِحُكْمِ الْفِعْلِ وَالنَّوْمُ اَبْلَغُ مِنْهُ وَعِنْدَنَا بِسَبَبِ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهِ يَنْتَفِي الْمَأْثَمُ دُوْنَ الْحُكْمِ وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُهُ وَهُوَ مَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ حَتْمًا بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ حَيْثُ يَتَخَيَّرُ لِاَنَّ الْاٰفَةَ هُنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ وَهٰهُنَا مِنَ الْعِبَادِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ الْمَحْلُوْقُ رَأْسُهُ عَلَى الْحَالِقِ لِاَنَّ الدَّمَ اِنَّمَا لَزِمَهُ بِمَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ فَصَارَ كَالْمَغْرُوْرِ فِيْ حَقِّ الْعُقْرِ وَكَذَا اِذَا كَانَ الْحَالِقُ حَلَالًا لَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ فِي الْمَحْلُوْقِ رَأْسُهُ وَاَمَّا الْحَالِقُ تَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ فِيْ مَسْأَلَتِنَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ اِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلَالٍ لَهُ اَنَّ مَعْنَى الْاِرْتِفَاقِ لَا يَتَحَقَّقُ بِحَلْقِ شَعْرِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُوْجِبُ وَلَنَا اَنَّ اِزَالَةَ مَا يَنْمُوْ مِنْ بَدَنِ الْاِنْسَانِ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الْاِحْرَامِ لِاِسْتِحْقَاقِهِ الْاَمَانَ بِمَنْزِلَةِ نَبَاتِ الْحَرَمِ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ شَعْرِهِ وَشَعْرِ غَيْرِهِ اِلَّا اَنَّ كَمَالَ الْجِنَايَةِ فِيْ شَعْرِهِ .

অনুবাদ : যদি কোনো মুহরিমের মাথা সে তার আদেশে কিংবা বিনা আদেশে মুণ্ডিয়ে দেয়, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। আর যার মাথা মুণ্ডানো হলো তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি তার আদেশ ছাড়া হয়ে থাকে, যেমন– ঘুমন্ত অবস্থায়, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, তাঁর মূলনীতি হলো, বলপ্রয়োগ ঐ ব্যক্তিকে– যার উপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, উক্ত কাজের দায়দায়িত্বের পাকড়াও থেকে মুক্ত রাখে। আর ঘুম [অনিচ্ছার বিবেচনায়] বলপ্রয়োগের চেয়েও অধিক। আমাদের মতে ঘুম ও বলপ্রয়োগ গুনাহ্ রহিত করে, কিন্তু ফলাফল রহিত করে না। তা ছাড়া দম ওয়াজিব হওয়ার কারণতো সংঘটিত হয়েছে। আর তা হলো, আরাম ও সৌন্দর্য লাভ। সুতরাং তার উপর দম ওয়াজিব হওয়াই নির্ধারিত। পক্ষান্তরে অসহায় ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। এ ক্ষেত্রে সে ইচ্ছাধীন। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিপদ আসমানী। আর এখানে বলপ্রয়োগ হয়েছে বান্দার পক্ষ থেকে। আর যার মাথা মুণ্ডানো হয়েছে, সে মুণ্ডনকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা, দম তো ওয়াজিব হয়েছে– সে যে আরাম লাভ করেছে, সে কারণে। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সঙ্গমজনিত 'অর্থদণ্ড'-এর ক্ষেত্রে ধোঁকার সম্মুখীন হয়। তদ্রূপ মুণ্ডনকারী যদি হালাল অবস্থায় থাকে তবু যে মুহ্রিমের মাথা মুণ্ডানো হয়েছে, তার ক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন হবে না। পক্ষান্তরে আমাদের বর্ণিত মাসআলায় উভয় অবস্থায় মুণ্ডনকারীর উপর সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এরূপ মতভিন্নতা রয়েছে যখন মুহ্রিম কোনো হালাল ব্যক্তির মাথা মুণ্ডিয়ে থাকে। তাঁর দলিল হলো, অন্যের চুল মুণ্ডানো দ্বারা উপকার লাভ সাব্যস্ত হয় না। আর সেটাই হলো দম ওয়াজিবের কারণ। আমাদের দলিল হলো, মানুষের শরীরে যা কিছু বৃদ্ধি হয়, তা দূর করা ইহ্রামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশগুলো নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। যেমন– হারাম শরীফের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। সুতরাং তার ও অন্যের চুলের ব্যাপারে হুকুমের কোনো পার্থক্য হবে না। তবে নিজের চুলের ব্যাপারে অপরাধ হয় পূর্ণমাত্রায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো মুহ্‌রিম অপর কোনো মুহ্‌রিমের মাথা মুণ্ডিয়ে দেয়– তার আদেশে হোক আর বিনা আদেশে হোক, মুণ্ডনকারীর উপর সদকা ওয়াজিব হবে। আর যার মাথা মুণ্ডানো হলো তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি বিনা আদেশে মাথা মুণ্ডানো হয়, তাহলে যার মাথা মুণ্ডানো হলো– তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। বিনা আদেশে মাথা মুণ্ডানোর সুরত এই যে, সে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, কিংবা অজ্ঞান ছিল কিংবা তাকে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তার মাথা মুণ্ডানো হলে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে তার উপর দম কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে মাথা মুণ্ডনকারীর উপর সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত অনুরূপই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) একটি মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যাকে বলপ্রয়োগ করা হয়, যে কাজ করতে বলপ্রয়োগ করা হয় উক্ত কাজের দায়দায়িত্বের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে পাকড়াও করা হবে না। সুতরাং যে মুহ্‌রিমের মাথা বলপ্রয়োগ করে মুণ্ডানো হয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুনিয়াতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না আবার আখেরাতেও গুনাহ্‌গার হবে না; বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে সে দায়মুক্ত। আর ঘুম [অনিচ্ছার বিবেচনায়] বল প্রয়োগের চেয়েও অধিক। সুতরাং ঘুমন্ত ব্যক্তি পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকতর যোগ্য। তাই তার উপর দম ওয়াজিব হবে না।

আমাদের মতে ঘুম ও বলপ্রয়োগ আখেরাতের হুকুম তথা গুনাহ্ রহিত করে, কিন্তু দুনিয়াবি হুকুম রহিত করে না; বরং পার্থিব ক্ষেত্রে পাকড়াও করা হবে। সুতরাং ঘুমন্ত ব্যক্তি কিংবা বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি দুনিয়াবি দায়ভার থেকে মুক্ত নয় বলে, যার মাথা মুণ্ডানো হয়েছে তার উপর অবশ্যই দম ওয়াজিব হবে। তা ছাড়া দম ওয়াজিব হওয়ার কারণ এখানে বিদ্যমান। তা হলো, আরাম ও সৌন্দর্য লাভ।

পক্ষান্তরে যে মুহ্‌রিম অসুস্থতার ফলে মাথা মুণ্ডন করতে বাধ্য, তার বিষয়টি ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে মুহ্‌রিমের জন্য তিনটি হুকুম ইচ্ছাধীন। কুরবানি করবে কিংবা ছয়জন মিসকিনকে খাওয়াবে অথবা তিনটি রোজা রাখবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিপদ হলো আসমানী। আর মাথা মুণ্ডনকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা হয়েছে বান্দার পক্ষ থেকে।

আর যার মাথা বিনা আদেশে মুণ্ডানো হয়েছে, সে যে দম তথা কুরবানি করেছে তার ক্ষতিপূরণ মুণ্ডনকারীর থেকে নিতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে আমাদের হানাফী আলিমগণের অভিমত হলো, মুণ্ডনকৃত ব্যক্তি মুণ্ডনকারী থেকে কুরবানির কোনো ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা, তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়েছে– সে যে আরাম লাভ করেছে সে কারণে। সে যে আরাম লাভ করেছে তা যেন কুরবানির বদলারূপে গণ্য হলো।

সুতরাং কুরবানি যখন মাথা মুণ্ডনকৃত ব্যক্তির আরাম লাভের বদলা হিসেবে বিবেচিত হলো তখন তার ক্ষতিপূরণ মুণ্ডনকারীর থেকে নেওয়া সমীচীন নয়। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সঙ্গমজনিত 'অর্থদণ্ড'-এর ক্ষেত্রে ধোঁকার সম্মুখীন হয়। মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল। অতঃপর তার সাথে সঙ্গমের ফলে সন্তান লাভ করল, কিন্তু পরে ক্রেতা-বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় কোনো এক ব্যক্তি দাবি করল যে, এ দাসী আমার। বিক্রেতা আমার অনুমতি ছাড়াই তা বিক্রি করেছে। কাজি প্রমাণের ভিত্তিতে দাবিদারের পক্ষে রায় দিল, তাহলে ক্রেতা সেই দাবিদারের নিকট দাসী সোপর্দ করবে। এমতাবস্থায় তাকে সন্তানের মূল্য প্রদান করতে হবে এবং ভুল সঙ্গমের কারণে মোহর [অর্থদণ্ড] ওয়াজিব হবে। এখন বিক্রেতা যেহেতু ক্রেতার সাথে প্রতারণা করেছে তাই বিক্রেতার নিকট থেকে সন্তানের মূল্য ফেরত নেবে, কিন্তু মোহরের অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, সেটা তো ওয়াজিব হয়েছে সঙ্গম সুখের বিনিময়ে। তদ্রূপ কিতাবে বর্ণিত মাসআলা মাথা মুণ্ডনকৃত ব্যক্তি যেহেতু হলকের আরাম লাভ করেছে, যদিও তার অনুমতি ছাড়াই তা করা হয়েছে, তাই কুরবানির ক্ষতিপূরণের মূল্য মুণ্ডনকারী থেকে নিতে পারবে না।

মাথা মুণ্ডনকারী যদি মুহ্‌রিম না হয়, কিন্তু যার মাথা মুণ্ডন করা হয়েছে সে মুহ্‌রিম তথাপি মাথা মুণ্ডনকৃত ব্যক্তির উপরে দম ওয়াজিব হবে। তার অনুমতি নেওয়া হোক বা না হোক। আর যদি মাথা মুণ্ডনকারী মুহ্‌রিম হয়, তাহলে উভয় অবস্থায়ই তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে, চাই মুণ্ডনকৃত ব্যক্তির অনুমতি নেওয়া হোক বা না হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুণ্ডনকারীর উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার এরূপ মতভিন্নতা তখনই যখন মুহ্‌রিম কোনো হালাল ব্যক্তির মাথা মুণ্ডিয়ে থাকে। আমাদের মতে মাথা মুণ্ডনকারী মুহ্‌রিমের উপর সদকা ওয়াজিব হবে আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, অন্যের চুল মুণ্ডানোর দ্বারা উপকার লাভ সাব্যস্ত হয় না অর্থাৎ অন্যের চুল মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে মুণ্ডনকারী কোনো আরাম লাভ করে না। অথচ আরাম লাভই হলো জরিমানা ওয়াজিবের কারণ। আর জরিমানা ওয়াজিবের কারণ না পাওয়ার কারণে জরিমানা ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল হলো, মানুষের শরীরে যা কিছু বৃদ্ধি পায়, তা দূর করা ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশগুলো নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। যেমন– হারাম শরীফের উদ্ভিদ নিরাপত্তার যোগ্য। সুতরাং হারামের ঘাস উপড়ানোর দ্বারা যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত ওয়াজিব হয় তদ্রূপ অন্যের মাথা মুণ্ডানোর দ্বারাও প্রায়শ্চিত্ত তথা সদকা ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, তাহলে অন্যের চুল মুণ্ডানোর দ্বারা দম ওয়াজিব হওয়ার কথা। যেমন– নিজের চুল মুণ্ডানোর দ্বারা দম ওয়াজিব হয়। এর উত্তর হলো, নিজের চুল মুণ্ডানোর দ্বারা যেহেতু পূর্ণ অপরাধ সংঘটিত হয়, তাই এ ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত তথা দম ওয়াজিব হবে। আর অন্যের চুল মুণ্ডানোর সুরতে যেহেতু অপরাধ লঘু হয়, সেহেতু এ ক্ষেত্রে সদকা ওয়াজিব হবে।

فَإِنْ اَخَذَ مِنْ شَارِبِ حَلَالٍ اَوْ قَلَمَ اَظَافِيْرَهُ اَطْعَمَ مَا شَاءَ وَالْوَجْهُ فِيْهِ مَا بَيَّنَّا وَلَا يَعْرِىْ عَنْ نَوْعِ اِرْتِفَاقٍ لِاَنَّهُ يَتَاَذّٰى بِتَفَثِ غَيْرِهِ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنَ التَّاَذِّىْ بِتَفَثِ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ الطَّعَامُ وَاِنْ قَصَّ اَظَافِيْرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِاَنَّهُ مِنَ الْمَحْظُوْرَاتِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَضَاءِ التَّفَثِ وَاِزَالَةِ مَا يَنْمُوْ مِنَ الْبَدَنِ فَاِذَا قَلَمَهَا كُلَّهَا فَهُوَ اِرْتِفَاقٌ كَامِلٌ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَلَا يَزْدَادُ عَلٰى دَمٍ اِنْ حَصَلَ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لِاَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَاِنْ كَانَ فِىْ مَجَالِسَ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لِاَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّدَاخُلِ فَاَشْبَهَ كَفَّارَةَ الْفِطْرِ اِلَّا اِذَا تَخَلَّلَتِ الْكَفَّارَةُ لِاِرْتِفَاعِ الْاُوْلٰى بِالتَّكْفِيْرِ وَعَلٰى قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) يَجِبُ اَرْبَعَةُ دِمَاءٍ اِنْ قَلَمَ فِىْ كُلِّ مَجْلِسٍ يَدًا اَوْ رِجْلًا لِاَنَّ الْغَالِبَ فِيْهِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فَيَتَقَيَّدُ التَّدَاخُلُ بِاِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ كَمَا فِىْ اٰيِ السَّجْدَةِ ـ

অনুবাদ : [মুহরিম] যদি কোনো হালাল ব্যক্তির মোচ ছেঁটে দেয় কিংবা তার নখ কেটে দেয়, তাহলে যে পরিমাণ ইচ্ছা খাদ্যশস্য দান করে দেবে। কারণ ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর এটাও এক ধরনের উপকার লাভ থেকে মুক্ত নয়। কেননা, অন্যের ময়লা অবস্থা থেকেও মানুষ কষ্ট পায়, যদিও তা নিজের শরীরের ময়লা দ্বারা কষ্ট পাওয়ার তুলনায় কম। সুতরাং তাকে খাদ্যশস্য সদকা করতে হবে। যদি [মুহরিম] তার দু-হাত ও দু-পায়ের নখ কাটে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এতে ময়লা ও শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জিনিস দূর করা হচ্ছে। সুতরাং যদি সবগুলো নখ কাটে, তাহলে পূর্ণ উপকার লাভ সাব্যস্ত হয়। কাজেই দম ওয়াজিব হবে। যদি একই মজলিসে হয়, তাহলে একটি দমের অতিরিক্ত হবে না। কেননা, অপরাধটি একই ধরনের। যদি কয়েকটি মজলিসে হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা, এ অপরাধগুলোর ভিত্তি হলো একীভূত করার উপর। সুতরাং তা রোজা ভঙ্গের কাফফারার সদৃশ হলো। তবে যদি কাফফারা মাঝখানে আদায় করে দেয়। [তখন পরবর্তীটির জন্য আলাদা কাফফারা দিতে হবে]। কেননা, কাফফারা আদায়ে প্রথম অপরাধের নিরসন হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি প্রত্যেক মজলিসে একটি হাত বা একটি পায়ের নখ কেটে থাকে, তাহলে চারটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে ইবাদতের অর্থ প্রবল। সুতরাং একীভূত করার বিষয়টি অভিন্ন মজলিসের সাথে শর্তযুক্ত। যেমন, সিজদার আয়াতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ اَخَذَ مِنْ شَارِبِ الخ মাসআলা : যদি কোনো মুহরিম অন্য কোনো হালাল ব্যক্তির মোচ ছেঁটে দেয় কিংবা নখ কেটে দেয়, তাহলে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে যে পরিমাণ ইচ্ছা খাদ্যশস্য দান করে দেবে। এর দলিল ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের শরীরে যা কিছু বৃদ্ধি হয়, তা দূর করা ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর হালাল ব্যক্তির মোচ

ছেঁটে দেওয়া কিংবা নখ কেটে দেওয়া এক ধরনের উপকার লাভ। কেননা, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ময়লা অবস্থা ও মোচ বেড়ে যাওয়ার কারণে কষ্ট অনুভব করে, যদিও তা নিজের শরীরের ময়লা দ্বারা কষ্ট পাওয়ার তুলনায় কম। সুতরাং মুহ্রিম কোনো হালাল ব্যক্তির মোচ ছেঁটে দেওয়া কিংবা নখ কেটে দেওয়ার দ্বারা উপকার লাভ করে। আর ইহ্রাম অবস্থায় উপকার লাভ করা অপরাধ বলে গণ্য। তবে এটা লঘুতর অপরাধ হওয়ার কারণে যে পরিমাণ ইচ্ছা খাদ্যশস্য দান করবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيْرَ يَدَيْهِ الخ : মাসআলা : মুহ্রিম যদি হাত ও পায়ের সমস্ত নখ কেটে ফেলে, তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, নখ কর্তন করা ইহ্রামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে ময়লা দূর করা হয় ও শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জিনিস দূর করা হয়। সুতরাং যখন সবগুলো নখ কাটে তখন পূর্ণ উপকার সাব্যস্ত হয়। আর ইহ্রাম অবস্থায় পূর্ণ উপকার লাভ করা পূর্ণ অপরাধ বলে গণ্য। আর পূর্ণ অপরাধ সংঘটিত হলে দম ওয়াজিব হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি সবগুলো নখ একই মজলিসে কাটে তাহলে একটি দমের অতিরিক্ত হবে না। কেননা, অপরাধটি নামকরণ ও অর্থগত উভয় দিক থেকে একই ধরনের। আর যদি চার হাত-পায়ের নখ চার মজলিসে কাটে এভাবে যে, এক মজলিসে পাঁচটি নখ কাটে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এ অপরাধগুলোর ভিত্তি হলো একীভূত করার উপর। তবে শর্ত হলো একই ধরনের হবে। সুতরাং তা রোজা ভঙ্গের কাফ্ফারার সদৃশ্য হলো। অর্থাৎ যদি কেউ রমজান মাসে ইচ্ছা করে কয়েকটি রোজা ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে একই ধরনের অপরাধ হওয়ার কারণে রমজান শেষে তার উপর একটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও চার হাত-পায়ের নখ চার মজলিসে কর্তন একই জাতীয় অপরাধ হওয়ার কারণে তার উপর একটিই দম ওয়াজিব হবে। তবে কাফ্ফারা যদি মাঝখানে আদায় করে যেমন– এক হাত কিংবা এক পায়ের নখ কাটার কাফ্ফারা করার পরে দ্বিতীয় মজলিসে অন্য হাত কিংবা পায়ের নখ কাটলে- দ্বিতীয় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রথম কাফ্ফারা আদায়ের ফলে প্রথম অপরাধের নিরসন হয়েছে। আর দ্বিতীয় অপরাধ নিরসনে দ্বিতীয় কাফ্ফারা প্রযোজ্য হবে।

শায়খাইন (র.) বলেন, সে যদি চার মজলিসের প্রত্যেক মজলিসে একটি হাত ও একটি পায়ের নখ কাটে, তাহলে চারটি দম ওয়াজিব হবে। চাই সে প্রথম কাফ্ফারা আদায় করুক বা না করুক। কেননা, কুরবানির কাফ্ফারায় ইবাদতের অর্থ প্রবল। সুতরাং একীভূত করার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে এবং একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি মজলিস ভিন্ন হয়, তাহলে একীভূত হবে না। যেমন– সিজদার আয়াতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ একই মজলিসে যদি একটি সিজদার আয়াত বারবার তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে একটি মাত্র সিজদাই যথেষ্ট। আর যদি মজলিস ভিন্ন হয়, তাহলে প্রত্যেকবার তেলাওয়াতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিজদা ওয়াজিব হবে।

وَاِنْ قَصَّ يَدًا اَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ اِقَامَةً لِلرُّبُعِ مَقَامَ الْكُلِّ كَمَا فِى الْحَلْقِ وَاِنْ قَصَّ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَظَافِيْرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ مَعْنَاهُ يَجِبُ بِكُلِّ ظُفْرٍ صَدَقَةٌ وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَجِبُ الدَّمُ بِقَصِّ ثَلٰثَةٍ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَلْاَوَّلُ لِاَنَّ فِىْ اَظَافِيْرِ الْيَدِ الْوَاحِدِ دَمًا وَالثَّلٰثُ اَكْثَرُهَا وَجْهُ الْمَذْكُوْرِ فِى الْكِتَابِ اَنَّ اَظَافِيْرَ كَفٍّ وَاحِدٍ اَقَلُّ مَا يَجِبُ الدَّمُ بِقَلْمِهٖ وَقَدْ اَقَمْنَاهَا مَقَامَ الْكُلِّ فَلَا يُقَامُ اَكْثَرُهَا مَقَامَ كُلِّهَا لِاَنَّهٗ يُؤَدِّىْ اِلٰى مَا لَا يَتَنَاهٰى ـ

অনুবাদ : যদি [মুহ্‌রিম] এক হাত বা এক পায়ের নখ কেটে থাকে, তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। এ হুকুমের ভিত্তি হলো এক-চতুর্থাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করার উপর। যেমন– মাথা মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি পাঁচ আঙ্গুলের কম নখ কেটে থাকে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রতিটি নখের পরিবর্তে একটি করে সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তিনটি নখ কেটে থাকলেও একটি দম ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমত। কেননা, হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের জন্য একটি দম ওয়াজিব হয়। আর তিনটি তার অধিকাংশ। কিতাবে উল্লিখিত হুকুমের কারণ এই যে, এক হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের নখ কর্তন, যার উপর দম ওয়াজিব হয়–এর সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর সেটাকে আমরা সমগ্র নখের স্থলবর্তী করেছি। সুতরাং এক হাতের অধিকাংশকে আবার তার সমগ্রের স্থলবর্তী করা যাবে না। কেননা, তাহলে অনিঃশেষিতভাবে চলতে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ قَصَّ يَدًا اَوْ رِجْلًا الخ : মুহ্‌রিম যদি এক হাতের পাঁচটি নখ কিংবা এক পায়ের পাঁচটি নখ কর্তন করে, তাহলেও তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এক হাত কিংবা এক পা চার হাত–পায়ের এক-চতুর্থাংশ। আর দম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করা হয়। যেমন– এক-চতুর্থাংশ মাথা মুণ্ডানোকে সমগ্রের স্থলবর্তী করা হয়।

قَوْلُهٗ وَاِنْ قَصَّ اَقَلَّ مِنْ الخ : মাসআলা হলো, মুহ্‌রিম যদি পাঁচ আঙ্গুলের কম নখ কাটে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রতিটি নখের পরিবর্তে একটি করে সদকা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, তিনটি নখ কর্তনের দ্বারাই দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমত এটিই। কেননা, এক হাত কিংবা এক পায়ের পাঁচটি আঙ্গুলের তিনটি হলো তার অধিকাংশ। আর অধিকাংশ সমগ্রের স্থলবর্তী। সুতরাং এক হাত কিংবা এক পায়ের পাঁচটি আঙ্গুলের নখ কর্তনের ফলে যেরূপ দম ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ তিনটি নখ কর্তনের ফলেও দম ওয়াজিব হবে।

আর কিতাবে যে হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে– তার দলিল হলো, এক হাত কিংবা এক পায়ের পাঁচটি আঙ্গুলের নখ কর্তন দম ওয়াজিব হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর এই পাঁচটি আঙ্গুলের নখ সমগ্র নখের স্থলবর্তী; সুতরাং একবার তা করার কারণে পুনরায় এক হাতের অধিকাংশকে আবার তার সমগ্রের স্থলবর্তী করা যাবে না। কেননা, তাহলে এ ধারা অবিরাম চলতে থাকবে। যেমন– তিনটি আঙ্গুলের নখের ক্ষেত্রে যদি দম ওয়াজিব হয়, তাহলে দুটির ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তা তিনের অধিকাংশ। আবার দেড় -এর ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে– কেননা, তা দুইয়ের অধিকাংশ। এক -এর ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তা দেড় -এর অধিকাংশ। এমনিভাবে পৌনে এক -এর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে। কেননা, এটি এক-এর অধিকাংশ। আর অর্ধেক নখের ক্ষেত্রেও ওয়াজিব হবে। কেননা, এটি পৌনে একের অধিকাংশ। এ ধারা অনিঃশেষিতভাবে চলতে থাকবে– যা যুক্তির পরিপন্থি। এজন্যই আমরা এক হাত ও এক পায়ের আঙ্গুলের নখকে সমগ্রের স্থলবর্তী করেছি এবং এ ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছি। এর কমের ক্ষেত্রে তা করিনি।

وَإِنْ قَصَّ خَمْسَةَ اَظَافِيْرَ مُتَفَرِّقَةً مِنْ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) دَمٌ اِعْتِبَارًا بِمَا لَوْ قَصَّهَا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ وَبِمَا إِذَا حَلَقَ رُبْعَ الرَّأْسِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَهُمَا اَنَّ كَمَالَ الْجِنَايَةِ بِنَيْلِ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ وَبِالْقَلْمِ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ يَتَأَذّٰى وَيَشِيْنُهُ ذٰلِكَ بِخِلَافِ الْحَلْقِ لِاَنَّهُ مُعْتَادٌ عَلٰى مَا مَرَّ وَاِذَا تَقَاصَرَتِ الْجِنَايَةُ تَجِبُ فِيْهَا الصَّدَقَةُ فَيَجِبُ بِقَلْمِ كُلِّ ظُفْرٍ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَلَمَ اَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقًا اِلَّا اَنْ يَبْلُغَ ذٰلِكَ دَمًا فَحِيْنَئِذٍ يَنْقُصُ عَنْهُ مَا شَاءَ ـ

অনুবাদ : যদি হাত-পায়ের বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটি নখ কাটে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দম ওয়াজিব হবে; একথার উপর কিয়াস করে যে, যখন এক হাতের পাঁচটি নখ কাটবে কিংবা মাথার বিভিন্ন স্থান থেকে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল মুণ্ডন করবে। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, অপরাধের পূর্ণতা সাব্যস্ত হয় আরাম ও সৌন্দর্য লাভের মাধ্যমে। অথচ এভাবে কাটার দ্বারা অস্বস্তি ও অসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে মাথার বিভিন্ন স্থান থেকে হলক করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, এটি প্রচলিত বিষয় যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। আর অপরাধ যখন লঘু হয় তখন তাতে সদকা ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রতিটি নখের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে আহার করাবে। অনুরূপভাবে যদি বিক্ষিপ্তভাবে পাঁচটি নখের বেশি কাটে, তাহলে একই হুকুম হবে। তবে যদি সবকটি সদকা একটি দমের পরিমাণ হয়ে যায়, তখন যতটুকু ইচ্ছা সামান্য কম করে দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহরিম যদি হাত-পায়ের বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটি নখ কাটে, তাহলে শায়খাইন (র.)-এর মতে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রতিটি নখের পরিবর্তে সদকা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দম ওয়াজিব হবে। তাঁর দলিল হলো কিয়াস। অর্থাৎ এক হাত কিংবা এক পায়ের পাঁচটি আঙ্গুলের নখ যদি কাটে, তাহলে যেমন দম ওয়াজিব হয়– তদ্রূপ বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটি নখ কাটলেও দম ওয়াজিব হবে। মাথার বিভিন্ন স্থান থেকে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল মুণ্ডন করলে যেমন দম ওয়াজিব হয় তদ্রূপ এক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, অপরাধের পূর্ণতা সাব্যস্ত হয় আরাম ও সৌন্দর্য লাভের মাধ্যমে। অথচ বিচ্ছিন্নভাবে নখ কাটার দ্বারা অস্বস্তি ও অসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আরাম ও সৌন্দর্য লাভ না হওয়ায় অপরাধের পূর্ণতা সাব্যস্ত হয় না, ফলে দমও ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল মুণ্ডানোর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এটি মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। সুতরাং তা অস্বস্তির কারণ হয় না বলে পূর্ণ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। তাই এভাবে মাথা মুণ্ডানোর দ্বারা দম ওয়াজিব হবে। আর লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে যেহেতু সদকা ওয়াজিব হয়, তাই প্রত্যেকটি নখ কাটার দ্বারাও সদকা ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ যদি বিভিন্ন জায়গায় পাঁচটি আঙ্গুলেরও বেশি নখ কাটে, তাহলে প্রতিটি নখের পরিবর্তে সদকা ওয়াজিব হবে। তবে সবকটি সদকা যদি একটি দমের পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার মূল্য সামান্য কম করে দেবে। কেননা, দম ওয়াজিব হয় পূর্ণ অপরাধের কারণে। পূর্ণ অপরাধ সাব্যস্ত না হলে দম ওয়াজিব হয় না; বরং প্রতিটি নখের পরিবর্তে সদকা ওয়াজিব হবে। আর যখন সবকটি সদকা একটি দমের পরিমাণ হয়, তখন তা থেকে সামান্য কম করে দেবে যাতে দম দেওয়া লাযিম না আসে।

قَالَ وَإِنِ انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَتَعَلَّقَ فَأَخَذَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْمُو بَعْدَ الْإِنْكِسَارِ فَأَشْبَهَ الْيَابِسَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ مِنْ عُذْرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بِثَلٰثَةِ أَصْوُعٍ مِنَ الطَّعَامِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيْرِ وَقَدْ فَسَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا ذَكَرْنَا وَالْاٰيَةُ نَزَلَتْ فِي الْمَعْذُوْرِ ثُمَّ الصَّوْمُ يُجْزِيْهِ فِيْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَكَذٰلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيَّنَّا وَأَمَّا النُّسُكُ فَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ بِالْإِتِّفَاقِ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إِلَّا فِيْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ وَهٰذَا الدَّمُ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ فَتَعَيَّنَ إِخْتِصَاصُهُ بِالْمَكَانِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি মুহ্‌রিমের নখ ভেঙ্গে ঝুলে যায় আর সে তা কেটে ফেলে, তাহলে তার উপর কোনো দণ্ড আসবে না। কেননা, ভেঙ্গে যাওয়ার পর তা আর বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং তা হারামের শুষ্ক বৃক্ষের সদৃশ হলো। মুহ্‌রিম যদি কোনো ওজরের কারণে খোশবু ব্যবহার করে কিংবা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করে কিংবা মাথা মুণ্ডায়, তাহলে তার এখতিয়ার রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে একটি বকরি জবাই করবে কিংবা ইচ্ছা করলে ছয়জন মিসকিনকে তিন সা' গম দান করবে কিংবা ইচ্ছা করলে তিনদিন রোজা রাখবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 'তাহলে ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে রোজা দ্বারা কিংবা সদকা দ্বারা কিংবা জবাই দ্বারা।' [আয়াতে] أَوْ অব্যয়টি ইচ্ছা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটির ব্যাখ্যা এরূপই করেছেন– যা আমরা উল্লেখ করেছি। আয়াতটি ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রোজা যে কোনো স্থানেই আদায় করা যেতে পারে। কেননা, তা সর্বস্থানের ইবাদত। আমাদের মতে একই কারণে সদকারও একই হুকুম। কিন্তু জবাই করার বিষয়টি সকলের মতেই হারামের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা, রক্ত প্রবাহিত করাকে নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট স্থানেই শুধু ইবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। আর এই দম কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং স্থানের সাথে নির্দিষ্ট হওয়া অবধারিত হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنِ انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ الخ - মাসআলা : মুহ্‌রিমের নখ যদি এমনিতেই ভেঙ্গে ঝুলে যায় আর সে তা পৃথক করে ফেলে, তাহলে তার উপর সদকা কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, ভেঙ্গে যাওয়ার পর তা আর বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং তা হারামের শুষ্ক বৃক্ষের সদৃশ হলো। আর হারামের শুষ্ক বৃক্ষ যদি কেউ কাটে, তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হয় না। তদ্রূপ ভেঙ্গে যাওয়া থেকে পৃথক করার ফলে তার উপরও কিছুই ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ الخ - মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি কোনো ওজরের কারণে খোশবু ব্যবহার করে কিংবা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করে অথবা মাথা মুণ্ডায়, তাহলে তিনটি হুকুমের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে।

১. হয়তো সে একটি বকরি জবাই করবে।

২. কিংবা ছয়জন মিসকিনকে তিন সা' গম সদকা করবে।

৩. অথবা তিন দিন রোজা রাখবে।

উক্ত তিন পদ্ধতির দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ـ

অর্থাৎ 'আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কুরবানি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে কিংবা সদকা করবে অথবা কুরবানি করবে।' আয়াতে اَوْ অব্যয়টি বর্ণিত তিনটি বিষয়ে ইচ্ছা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতটি একজন ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপই করেছেন, আমরা যা উল্লেখ করেছি। হাদীসে রয়েছে, হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন উকুন আমার চেহারায় চলাফেরা করছিল। আমি পাতিলের নীচে আগুন জ্বালিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, মাথার কীড়া কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে ? আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়– فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ; আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রোজা কতটি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনটি রোজার কথা বললেন। হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাখ্যা না করতেন, তাহলে ছয়জন মিসকিনকে খাদ্যশস্য দানের উপর কিয়াস করে আমরা ছয়টি রোজা নির্ধারণ করতাম। এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এ আয়াতের তাফসীর করেছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম চতুষ্টয়ের সর্বসম্মতিক্রমে এ রোজা যে কোনো স্থানেই আদায় করা যেতে পারে। হারাম কিংবা অন্য কোনো স্থানের সাথে তা সম্পৃক্ত নয়। কেননা, রোজা হলো একটি ইবাদত। আর ইবাদত কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এজন্যই এ রোজাগুলো কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়। আমাদের মতে সদকা আদায়ের ক্ষেত্রেও কোনো স্থান নির্দিষ্ট নয়; বরং যে কোনো স্থানেই আদায় করা যাবে। দলিল হলো– তা সর্বস্থানের ইবাদত।

তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) হারামের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। কেননা, এ সদকার উদ্দেশ্য হলো হারাম এলাকার নিঃস্বদরিদ্রদের উপকার করা। আর এ উদ্দেশ্য হারামে সদকা করার দ্বারা সম্পন্ন হয়। সুতরাং সদকা হারামের সাথে নির্দিষ্ট।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয় যে, সদকা হলো সর্বস্থানের ইবাদত এবং হারাম ও অন্যস্থান সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এদিক থেকে তা রোজার সদৃশ, কিন্তু বকরি জবাই করার বিষয়টি হারামের সাথে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে যে বকরি ওয়াজিব হয়, তা হারামে জবাই করা আবশ্যক। হারাম ছাড়া অন্যস্থানে তা জবাই করা জায়েজ নেই।

এর দলিল হলো, পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করাকে নির্দিষ্ট সময়ে শুধু ইবাদতরূপে গণ্য করা প্রসিদ্ধ বিষয়। যেমন– ১০, ১১ ও ১২-ই জিলহজে কুরবানি করা ইবাদত। আর এ ইবাদত নির্দিষ্ট– স্থান ও সময়ের সাথে। যেরূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে যে পশু কুরবানি করা ওয়াজিব হয়, তা হারামের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَجَزَاۤءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ - এখানে كَعْبَة [কা'বা] দ্বারা হারাম বুঝানো হয়েছে। সুতরাং রক্ত প্রবাহিত করাকে নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট স্থানেই শুধু ইবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। আর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তরূপে যে দম ওয়াজিব, তা কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং তা স্থানের সাথে নির্দিষ্ট হওয়া অবধারিত হয়ে গেল। এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, হারামের মধ্যে জবাই করা নির্দিষ্ট, এর বাইরে জবাই করা জায়েজ নেই।

وَلَوِ اخْتَارَ الطَّعَامَ أَجْزَأَهُ فِيهِ التَّغْدِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) إِعْتِبَارًا بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تُنْبِئُ عَنِ التَّمْلِيكِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ ـ

অনুবাদ : যদি খাদ্য সদকা করার ইচ্ছা করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে দুপুর ও রাতে দু-বেলা খাওয়ানো যথেষ্ট হবে। তিনি এটাকে কসমের কাফ্ফারার উপর কিয়াস করেছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তা জায়েজ হবে না। কেননা, সদকা শব্দটি মালিকানার ইঙ্গিত বহন করে। আর আয়াতে সেটাই উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মাজুর মুহ্‌রিম সদকা দিতে ইচ্ছা করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে ছয়জন মিসকিনকে দুপুর ও রাতে দু-বেলা খাওয়ানো যথেষ্ট হবে। যেরূপ কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে দুপুর ও রাত্রে দু-বেলা খাওয়ানো যথেষ্ট হয়, সেরূপ এ ক্ষেত্রেও যথেষ্ট হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে খানা খাওয়ানো যথেষ্ট হবে না; বরং ছয়জন মিসকিনকে তিন সা' গমের মালিক করে দিতে হবে। কেননা, কুরআন মাজীদে أَوْ صَدَقَةٍ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। আর صَدَقَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ– বিনিময় ছাড়া কাউকে কোনো কিছুর মালিক বানিয়ে দেওয়া। এজন্য মিসকিনকে স্বত্বাধিকারী বানানো আবশ্যক। আর খানা খাওয়ানোর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা বৈধ করে দেয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে কসমের কাফ্ফারার উপর কিয়াস করেছেন, তা যথার্থ নয়। কেননা, কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদে إِطْعَامٌ শব্দ উল্লেখ হয়েছে। আর এ শব্দটি إِبَاحَتْ [বৈধতা] -কে বুঝায়, মালিকানার ইঙ্গিত বহন করে না। এজন্য সে ক্ষেত্রে খানা খাওয়ানো যথেষ্ট, কিন্তু সদকা দানের ক্ষেত্রে খানা খাওয়ানো যথেষ্ট নয়।

فَصْلٌ فَإِنْ نَظَرَ إِلٰى فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنٰى لَا شَئَ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجِمَاعُ وَلَمْ يُوْجَدْ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَفَكَّرَ فَأَمْنٰى وَاِنْ قَبَّلَ اَوْ لَمِسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يَقُوْلُ اِذَا مَسَّ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنٰى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا اِذَا اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ ذَكَرَهٗ فِى الْاَصْلِ وَكَذَا الْجَوَابُ فِى الْجِمَاعِ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اَنَّهٗ يَفْسُدُ اِحْرَامُهٗ فِىْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ اِذَا اَنْزَلَ وَاعْتَبَرَهٗ بِالصَّوْمِ وَلَنَا اَنَّ فَسَادَ الْحَجِّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ وَلِهٰذَا لَايَفْسُدُ بِسَائِرِ الْمَحْظُوْرَاتِ وَهٰذَا لَيْسَ بِجِمَاعٍ مَقْصُوْدٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ اِلَّا اَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْاِسْتِمْتَاعِ وَالْاِرْتِفَاقِ بِالْمَرْأَةِ وَ ذٰلِكَ مَحْظُوْرُ الْاِحْرَامِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِاَنَّ الْمُحَرَّمَ فِيْهِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَلَا يَحْصُلُ بِدُوْنِ الْاِنْزَالِ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ .

অনুচ্ছেদ : ইহ্‌রাম অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ

অনুবাদ : মুহ্‌রিম যদি স্বীয় স্ত্রীর যৌনাঙ্গের প্রতি কাম-দৃষ্টিতে তাকায় এবং বীর্যস্খলিত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, হারাম হলো সহবাস করা আর [এখানে] তা পাওয়া যায়নি। সুতরাং এটা কাম-চিন্তার কারণে বীর্যস্খলিত হওয়ার অনুরূপ হলো। আর যদি কামভাবে চুম্বন করে বা স্পর্শ করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। 'জামিউস সাগীরে' বলা হয়েছে, যদি কামভাবে স্পর্শ করে এবং বীর্যস্খলিত হয় [তবে দম ওয়াজিব হবে]। আর 'মাবসূত' কিতাবে রয়েছে, বীর্যস্খলিত হওয়া না হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর অনুরূপ হুকুম লজ্জাস্থানের বাইরে সঙ্গম করার ক্ষেত্রেও। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এ সকল অবস্থায় বীর্যস্খলিত হলে তার ইহ্‌রাম নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি এটাকে রোজার উপর কিয়াস করেছেন। আমাদের দলিল হলো, হজ নষ্ট হওয়ার সম্পর্ক সঙ্গমের সঙ্গে। এ কারণেই অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের কোনোটির কারণেই হজ নষ্ট হয় না। আর এগুলোতে উদ্দিষ্ট সঙ্গম নয়। সুতরাং যা মূল সঙ্গমের সাথে সম্পৃক্ত তা এগুলোর সাথে যুক্ত হবে না। তবে এগুলোতে স্ত্রী থেকে আনন্দ লাভ ও সঙ্গমের অর্থ বিদ্যমান। আর তা হজের নিষিদ্ধ বিষয়; এজন্য দম ওয়াজিব হবে। রোজার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, রোজার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয় হলো কামভাব পূর্ণ করা। আর লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যত্র সঙ্গমে বীর্যস্খলন ছাড়া তা পূর্ণ হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মুহ্‌রিম আপন স্ত্রী কিংবা অন্য কোনো মহিলার যৌনাঙ্গের প্রতি কাম-দৃষ্টিতে তাকায় আর বীর্যস্খলিত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর দম কিংবা অন্য কোনো কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, ইহ্‌রাম অবস্থায় হারাম হলো সহবাস করা। আর এখানে তা পাওয়া যায়নি বলে তার উপর কোনো কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। এটা কোনো সুন্দরী মহিলার কাম-চিন্তার

কারণে বীর্যস্খলিত হওয়ার অনুরূপ হলো। সুতরাং উক্ত কারণে যেমন কোনো কিছুই ওয়াজিব হয় না, তদ্রূপ যৌনাঙ্গের প্রতি কাম- দৃষ্টিতে তাকানোর ক্ষেত্রেও কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

সহবাস বলা হয়, পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্রে মিলনের দ্বারা صُوْرَةً ও مَعْنًى - কাম পূর্ণ করা। صُوْرَةً جِمَاعْ হলো পুরুষ স্বীয় পুরুষাঙ্গকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো, আর مَعْنًى جِمَاعْ হলো বীর্যস্খলিত হওয়া।

আর মুহ্‌রিম যদি কামভাবে স্ত্রীকে চুম্বন করে কিংবা স্পর্শ করে- বীর্যস্খলিত হোক বা না হোক তার উপর দম ওয়াজিব হবে। মাবসূতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। তবে জামেউস সগীরে বীর্যস্খলিত হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ কামভাবে স্পর্শ করলে এবং বীর্যস্খলিত হলে মুহ্‌রিমের উপর দম ওয়াজিব হবে। জামেউস সগীরের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, বীর্যস্খলিত না হলে মুহ্‌রিমের উপর দম ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, লজ্জাস্থানের বাইরে তথা রান কিংবা অন্যত্রে সঙ্গমের কারণেও মুহ্‌রিমের উপর দম ওয়াজিব হবে- বীর্যস্খলিত হোক বা না হোক। যেরূপ মাবসূতের বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সকল অবস্থায় অর্থাৎ কামভাবে চুম্বন করা, স্পর্শ করা, আর লজ্জাস্থানের বাইরে সঙ্গম করার ক্ষেত্রে বীর্যস্খলিত হলে তার ইহ্‌রাম নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি ইহ্‌রামকে রোজার উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ বর্ণিত অবস্থাগুলোর ক্ষেত্রে বীর্যস্খলিত হলে যেমন রোজা নষ্ট হয়ে যায় তদ্রূপ এক্ষেত্রেও ইহ্‌রাম নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল হলো, সঙ্গমের কারণে হজ নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের কোনোটির কারণেই হজ নষ্ট হয় না। যেমন- সেলাই করা কাপড় পরিধান করা কিংবা সুগন্ধি বা অন্যকিছু ব্যবহারের কারণে হজ নষ্ট হয় না। আর উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো তথা স্পর্শ করা, চুম্বন করা কিংবা লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যত্র সঙ্গম করা উদ্দিষ্ট সঙ্গম হয় না; বরং এগুলো এক ধরনের আনন্দ লাভ। সুতরাং এ বিষয়গুলো যখন সঙ্গম নয় তখন এগুলোর সাথে হজ নষ্ট হওয়াও সম্পৃক্ত হবে না- যেমন সঙ্গম হজ নষ্ট হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তবে এগুলোতে স্ত্রী থেকে আনন্দ লাভ ও সঙ্গমের অর্থ বিদ্যমান- যা হজের নিষিদ্ধ বিষয়, এজন্য তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে রোজার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে কাম পূর্ণ করা হারাম। আর লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যত্র সঙ্গমে বীর্যস্খলন ছাড়া তা পূর্ণ হয় না। এজন্য বীর্যস্খলিত হওয়া ছাড়া রোজা নষ্ট হয় না। অবশ্য বীর্যস্খলিত হলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

وَإِنْ جَامَعَ فِىْ أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهٗ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْضِىْ فِى الْحَجِّ كَمَا يَمْضِىْ مَنْ لَمْ يُفْسِدْهُ وَالْاَصْلُ فِيْهِ مَا رُوِىَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَمَّنْ وَاقَعَ إِمْرَأَتَهٗ وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ قَالَ يُرِيْقَانِ دَمًا وَيَمْضِيَانِ فِىْ حَجَّتِهِمَا وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَهٰكَذَا نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) تَجِبُ بَدَنَةٌ إِعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لَمَّا وَجَبَ وَلَا يَجِبُ إِلَّا لِإِسْتِدْرَاكِ الْمَصْلَحَةِ خَفَّ مَعْنَى الْجِنَايَةِ فَيَكْتَفِىْ بِالشَّاةِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْوُقُوْفِ لِأَنَّهٗ لَا قَضَاءَ ثُمَّ سَوّٰى بَيْنَ السَّبِيْلَيْنِ وَعَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ فِىْ غَيْرِ الْقُبُلِ مِنْهُمَا لَا يُفْسِدُهٗ لِتَقَاصُرِ مَعْنَى الْوَطْئِ فَكَانَ عَنْهُ رِوَايَتَانِ ـ

অনুবাদ : যদি মুহ্‌রিম আরাফায় অবস্থানের পূর্বে 'দুই পথের' কোনো একটিতে সঙ্গম করে, তাহলে তার হজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর তার উপর একটি বকরি জবাই করা ওয়াজিব। আর সে ঐ ব্যক্তির মতোই হজের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবে– যার হজ নষ্ট হয়নি। এ ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো, বর্ণিত হাদীস– রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উভয়ে ইহ্‌রামে থাকা অবস্থায় সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উভয়ে একটি দম দেবে এবং নিজেদের হজের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবে। আর আগামী বছর তার উপর হজ করা ওয়াজিব। সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর একটি উট ওয়াজিব হবে– ঐ ব্যক্তির উপর কিয়াস করে যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পর যদি সহবাস করে, তাহলে তার উপর বাদানাহ্ ওয়াজিব হবে। তাঁর বিপক্ষে দলিল হলো আমাদের বর্ণিত হাদীসের নিঃশর্ততা। তা ছাড়া এ কারণে যে, হজের কাজা যখন ওয়াজিব হয় তা কল্যাণ পুনরায় অর্জনের জন্যই ওয়াজিব হয়ে থাকে, অতএব অপরাধের দিকটি লঘু হয়ে গেল। সুতরাং বকরি জবাই করাই যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে উকূফের পরের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, তখন হজের কাজা করা ওয়াজিব হয় না। ইমাম কুদূরী (র.) উভয় পথের সঙ্গমকে অভিন্ন ধরেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সম্মুখ পথ ছাড়া হলে সঙ্গমের অপূর্ণতার কারণে হজ নষ্ট হবে না। সুতরাং তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে কিংবা পায়ুপথে সঙ্গম করে, তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের হজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর প্রত্যেকের উপর একটি বকরি কিংবা উট, গরুর একাংশ কুরবানি করা ওয়াজিব। আর সে ঐ ব্যক্তির মতোই হজের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবে যার হজ নষ্ট হয়নি। তবে আগামী বছর সে এ হজের কাজা করবে। এ মাসআলার ক্ষেত্রে মূল হলো এই হাদীস– এক ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে, অথচ

দু জনই ছিল মুহরিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কে দম তথা একটি বকরি কুরবানি করার নির্দেশ দিলেন এবং ইরশাদ করলেন– হজের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাও আর আগামী বছর এর কাজা আদায় করবে। সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ গুরু অপরাধের কারণে তার উপর বাদানাহ্ তথা উট কিংবা গরু কুরবানি করা ওয়াজিব হবে– বকরি জবাই যথেষ্ট হবে না। তিনি ঐ ব্যক্তির উপর কিয়াস করেছেন যে, যদি কেউ আরাফায় অবস্থানের পরে সঙ্গম করে, তাহলে তার উপর যেমন বাদানাহ্ ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সঙ্গম করলেও তার উপর বাদানাহ্ ওয়াজিব হবে।

তবে হাদীসে يُرِيقَانِ دَمًا নিঃশর্তভাবে এসেছে, যা বকরি ও বাদানাহ্ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং বিনা কারণে তা কোনো একটির সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, হজ ফাসেদ যাওয়ার কারণে যখন তার উপর কাজা করা ওয়াজিব হয়েছে তখন তার অপরাধ লঘু বলে বিবেচিত হবে। আর লঘু অপরাধে বকরি যথেষ্ট বলে এক্ষেত্রেও বকরি কুরবানি করাই যথেষ্ট হবে। আর হজের কাজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, যাতে তার আরম্ভ করা হজ শুদ্ধ হয়ে যায়। আর আরাফায় অবস্থানের পরে সঙ্গম করার ক্ষেত্রে যেহেতু হজ ফাসেদ হয় না, সেহেতু তার কাজাও ওয়াজিব হয় না। আর সঙ্গত কারণেই অপরাধ লঘু নয়; বরং গুরুতর অপরাধের ফলে বাদানাহ্ ওয়াজিব হয়। আর এজন্যই আরাফায় অবস্থানের পরে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে দম ওয়াজিব হয়, বকরি যথেষ্ট নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (রা.) যোনিপথ ও পায়ুপথ উভয়ের সঙ্গমকে অভিন্ন ধরেছেন। সাহেবাইনের মাযহাব এটিই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনা অনুরূপই। তাঁর থেকে ভিন্ন একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আরাফায় অবস্থানের পূর্বে যোনিপথে সঙ্গম করলে হজ ফাসেদ হয়ে যাবে, তবে পায়ুপথে সঙ্গম করলে হজ ফাসেদ হবে না। কেননা, যোনিপথেই সঙ্গমের পূর্ণতা হয়– পায়ুপথে সঙ্গমের পূর্ণতা হয় না; বরং অপূর্ণতার কারণে হজ ফাসেদ হবে না। তাহলে পায়ুপথে সঙ্গমের ক্ষেত্রে হজ নষ্ট হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দু ধরনের বর্ণনা পাওয়া গেল। প্রথম বর্ণনায় হজ ফাসেদ হবে আর দ্বিতীয় বর্ণনায় হজ ফাসেদ হবে না।

وَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ فِيْ قَضَاءِ مَا اَفْسَدَاهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ (رح) إِذَا خَرَجَا مِنْ بَيْتِهِمَا وَلِزُفَرَ (رح) إِذَا أَحْرَمَا وَلِلشَّافِعِيِّ (رح) إِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ جَامَعَهَا فِيْهِ لَهُمْ أَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ ذٰلِكَ فَيَقَعَانِ فِي الْمُوَاقَعَةِ فَيَفْتَرِقَانِ وَلَنَا أَنَّ الْجَامِعَ وَهُوَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ فَلَا مَعْنٰى لِلْاِفْتِرَاقِ قَبْلَ الْاِحْرَامِ لِإِبَاحَةِ الْوِقَاعِ وَلَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ مَا لَحِقَهُمَا مِنَ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيْدَةِ بِسَبَبِ لَذَّةٍ يَسِيْرَةٍ فَيَزْدَادَانِ نَدَمًا وَتَحَرُّزًا فَلَا مَعْنٰى لِلْاِفْتِرَاقِ ـ

অনুবাদ : আমাদের মতে তার নষ্টকৃত হজ কাজা করার সময় স্ত্রীকে দূরে রাখা তার জন্য জরুরি নয়। ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, তারা [স্বামী ও স্ত্রী] ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আলাদা হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, যখন উভয়ে ইহ্‌রাম বাঁধবে [তখন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে]। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যেখানে তারা সহবাস করেছিল যখন সেখানে পৌঁছবে [তখন বিচ্ছিন্ন হবে]। তাঁদের দলিল হলো, সেই স্থানে পৌঁছায় স্বামী-স্ত্রী বিগত হজের সহবাসের কথা স্মরণ করতে এবং সহবাসে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং উভয়ে বিচ্ছিন্ন থাকবে। আমাদের দলিল হলো, উভয়ের মাঝে সংযোগকারী গুণ তথা 'বিবাহ' বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ইহ্‌রামের পূর্বে তাদের বিচ্ছিন্ন থাকার কোনো অর্থ নেই। কেননা, তখন তো সহবাস করা জায়েজ আছে। ইহ্‌রামের পরেও একই কথা। কেননা. তারা পরস্পর আলোচনা করবে যে, ক্ষণিকের আনন্দের ফলে কি কঠিন কষ্ট ও ভোগান্তি তাদের হচ্ছে। ফলে স্বভাবতই তাদের লজ্জা ও অনুতাপ বৃদ্ধি পাবে এবং তা পরিহার করে চলবে। সুতরাং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, স্ত্রীর সাথে সহবাসের কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া হজ কিংবা উমরা কাজা করার সময় স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন থাকা আমাদের মতে ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তারা আলাদা হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিগত বছর যেখানে তারা সহবাস করেছিল সে স্থানে উপনীত হলে তারা বিচ্ছিন্ন হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর অভিমতও অনুরূপ।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) -এর বর্ণনানুসারে তাঁদের দলিল হলো, হজ কাজা করার সময় স্বামী-স্ত্রী যখন বিগত সহবাসের কথা স্মরণ করবে তখন সহবাসে লিপ্ত হতে পারে। এ কারণেই তারা ভিন্ন ভিন্ন সফর করবে।

'ইনায়া' গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ মাসআলার মূল ভিত্তি হলো, সাহাবায়ে কেরামের এ উক্তি- إِذَا رَجَعَا لِلْقَضَاءِ يَفْتَرِقَانِ অর্থাৎ 'তারা যখন কাজা করতে আসবে তখন ভিন্নপথ অবলম্বন করবে।' ইমাম মালিক (র.) উক্ত উক্তির বাহ্যিক অর্থ অবলম্বন করে বলেছেন, ঘর হতে বের হতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, ইহ্‌রামের সময় স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যখন তারা বিগত বছরের সহবাসের স্থানের নিকটবর্তী হবে, তখন আলাদা হয়ে যাবে। কেননা, এ স্থানে পৌঁছার ফলে গত বছরের সহবাসের কথা মনে হতে পারে এবং কামোদ্দীপনার কারণে সহবাসে লিপ্ত হতে পারে বলে এ স্থানে পৌঁছার পূর্বেই তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করবে।

আমাদের দলিল হলো, তাদের উভয়কে সংযোগকারী হচ্ছে বিবাহ, যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ইহ্‌রামের পূর্বে তাদের বিচ্ছিন্ন থাকার কোনো অর্থ নেই। ইহ্‌রামের পরেও একই কথা। ইহ্‌রামের পূর্বে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার কারণেই তো সে সময় সহবাস করা জায়েজ। আর ইহ্‌রামের পরে বিচ্ছিন্ন না থাকার কারণ হলো তারা স্বামী-স্ত্রী সারাক্ষণ স্মরণ করতে থাকবে যে ক্ষণিক আনন্দের মাশুল হিসেবে কি কঠিন কষ্ট আর ভোগান্তিইনা তাদের হচ্ছে। ফলে স্বভাবতই তাদের লজ্জা ও অনুতাপ বৃদ্ধি পাবে এবং তা পরিহার করে চলবে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত উক্তির জবাবে বলা হয় যে, যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করা মোস্তাহাব।

وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فِيْمَا إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الرَّمْيِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْبَدَنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَوْ لِأَنَّهُ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِرْتِفَاقِ فَيَتَغَلَّظُ مُوْجَبُهُ وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِبَقَاءِ إِحْرَامِهِ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ دُوْنَ لُبْسِ الْمَخِيْطِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَخَفَّتِ الْجِنَايَةُ فَاكْتُفِيَ بِالشَّاةِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি উকূফে আরাফার পর সহবাস করবে তার হজ ফাসিদ হবে না, তবে তার উপর উট কুরবানি ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, যদি রমীর পূর্বে সহবাস করে তাহলেও তার হজ নষ্ট হবে। আমাদের দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ 'যে ব্যক্তি আরাফায় উকূফ করল তার হজ পূর্ণ হয়ে গেল।' তবে উট ওয়াজিব হবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তির কারণে। কিংবা এই কারণে যে, সহবাস হলো উপকার লাভের সর্বোচ্চ পর্যায়। সুতরাং তার ওয়াজিব হবে গুরুতর। আর যদি হলকের পরে সহবাস করে, তাহলে তার উপর বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, স্ত্রীসহবাসের ক্ষেত্রে তার ইহ্রাম বহাল রয়েছে; তবে সেলাই করা কাপড় পরিধান করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য ব্যাপারে বহাল নেই। সুতরাং অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু হয়ে গেল। ফলে বকরিই যথেষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ الخ : মুহ্রিম ব্যক্তি যদি উকূফে আরাফার পর সহবাস করে, তাহলে তার হজ ফাসিদ হবে না, তবে তার উপর উট কুরবানি করা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের আগেই সহবাস করে, তাহলে তার হজ নষ্ট হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তাঁর দলিল হলো, رَمْى করার পূর্বে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুহ্রিম। আর মুহ্রিমের উপর যেসব বিষয় নিষিদ্ধ রমীর পূর্বে তার কোনোটিতেই লিপ্ত হওয়া তার জন্য বৈধ নয়। আর ইহ্রামের অবস্থায় সহবাস করার দ্বারা হজ নষ্ট হয়ে যায়, যেমন উকূফে আরাফার পূর্বে সহবাস করলে হজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে রমীর পরে সহবাস করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, রমীর পরে হালাল হওয়ার সময় এসে যায়। যেমন– মাথা মুণ্ডানো হালাল যা রমীর পূর্বে হারাম ছিল। সুতরাং রমী করার পর যেহেতু পরিপূর্ণ ইহ্রাম থাকে না সেহেতু এ সময় সহবাস করলে হজ ফাসিদ হবে না।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে উকূফে আরাফা করল তার হজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এখানে সর্বসম্মতিক্রমে [উকূফে আরাফার দ্বারা] হজের ক্রিয়াদি সম্পন্ন হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এখন হজের অন্যান্য কার্যাবলি যেমন তওয়াফে জিয়ারত সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হলো, উকূফে আরাফার পর হজ নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ হলো। তবে তার উপর উট ওয়াজিব হবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তির কারণে। তিনি বলেন–

إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ نُسُكُهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ فَحَجَّتُهُ تَامَّةٌ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি উকূফে আরাফার পূর্বে সহবাস করল, তার হজ নষ্ট হয়ে গেল এবং তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর যে উকূফে আরাফার পর সহবাস করল, তার হজ পূর্ণ হয়ে গেল, তবে তার উপর উট কুরবানি করা ওয়াজিব।'

দ্বিতীয় দলিল হলো, সহবাস উপকার লাভের সর্বোচ্চ পর্যায়। তাই এর ফলে বড় ধরনের প্রায়শ্চিত্ত ওয়াজিব হবে। আর তা হলো, উট। এ কারণেই তার উপর উট ওয়াজিব হবে। এমনও বর্ণিত আছে যে, হজের মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে উট কুরবানি করা ওয়াজিব। ১. উকূফে আরাফার পর সহবাস করলে। ২. অপবিত্র অবস্থায় তওয়াফে জিয়ারত করলে।

وَمَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوفَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ فَيَمْضِيْ فِيْهَا وَيَقْضِيْهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَاِذَا جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ اَوْ اَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَاتَفْسُدُ عُمْرَتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) تَفْسُدُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْحَجِّ اِذْ هِيَ فَرْضٌ عِنْدَهُ كَالْحَجِّ وَلَنَا اَنَّهَا سُنَّةٌ فَكَانَتْ اَحَطَّ رُتْبَةً مِنْهُ فَتَجِبُ الشَّاةُ فِيْهَا وَالْبَدَنَةُ فِي الْحَجِّ اِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ .

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি উমরার চার চক্কর তওয়াফ সম্পন্ন করার পূর্বে সহবাস করবে, তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে উমরার ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবে এবং তা কাজা করবে। আর তার উপর একটি বকরি ওয়াজিব। আর যদি চার বা তার বেশি চক্কর তওয়াফ করার পর সহবাস করে, তাহলে তার উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে; কিন্তু তার উমরা নষ্ট হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় অবস্থাতেই [উমরা] নষ্ট হয়ে যাবে এবং হজের উপর কিয়াস করে তার উপর একটি উট ওয়াজিব হবে। কেননা, তাঁর মতে হজের ন্যায় উমরাও ফরজ। আমাদের দলিল উমরা সুন্নত। সুতরাং এর মর্যাদা হজের চেয়ে নিম্নতর। অতএব, উভয়ের পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য উমরার ক্ষেত্রে বকরি ওয়াজিব হবে এবং হজের ক্ষেত্রে উট ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, যদি কেউ উমরার চার চক্কর তওয়াফ সম্পন্ন করার পূর্বে সহবাস করে, তাহলে তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে সে উমরার ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করবে এবং তা কাজা করবে। আর এ সহবাসের কারণে তার উপর একটি বকরি কুরবানি করা ওয়াজিব। আর যদি চার বা তার বেশি চক্কর তওয়াফ করার পর সহবাস করে, তাহলে তার উপর বকরি ওয়াজিব হবে, তবে তার উমরা নষ্ট হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় অবস্থাতেই উমরা নষ্ট হয়ে যাবে, আর তার উপর উট কুরবানি ওয়াজিব হবে। তিনি উমরাকে হজের উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, তাঁর মতে হজের ন্যায় উমরাও ফরজ এবং তাঁর মতে হজ ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে চার চক্কর তওয়াফ সম্পন্ন করার পূর্বে সহবাস করুক বা পরে করুক, উভয় অবস্থার হুকুম একই। তদ্রূপ উমরার ক্ষেত্রেও চার চক্কর সম্পন্ন করার পূর্বে সহবাস করা বা পরে সহবাস করার একই হুকুম।

আমাদের দলিল হলো, উমরা আমাদের মতে সুন্নত, আর হজ ফরজ। এজন্যই উমরা হজের তুলনায় নিম্নপর্যায়ের আমল। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য উমরার ক্ষেত্রে বকরি ওয়াজিব এবং হজের ক্ষেত্রে উট ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَانَ كَمَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) جِمَاعُ النَّاسِيْ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْحَجِّ وَكَذٰلِكَ الْخِلَافُ فِيْ جِمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ هُوَ يَقُوْلُ الْحَظْرُ يَنْعَدِمُ بِهٰذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَقَعِ الْفِعْلُ جِنَايَةً وَلَنَا اَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْاِرْتِفَاقِ فِي الْاِحْرَامِ اِرْتِفَاقًا مَخْصُوْصًا وَهٰذَا لَا يَنْعَدِمُ بِهٰذِهِ الْعَوَارِضِ وَالْحَجُّ لَيْسَ فِيْ مَعْنَى الصَّوْمِ لِاَنَّ حَالَاتِ الْاِحْرَامِ مُذَكِّرَةٌ بِمَنْزِلَةِ حَالَاتِ الصَّلٰوةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ভুলে সহবাস করে, তার হুকুম ঐ ব্যক্তির মতোই যে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ভুলক্রমে সহবাস করা হজকে নষ্ট করে না। একই রকম মতভিন্নতা রয়েছে ঘুমন্ত ও বলপ্রয়োগকৃত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাসের ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, এ সকল উপসর্গের কারণে নিষেধাজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং তার এ কর্মটি 'অপরাধ' বলে গণ্য নয়। আমাদের দলিল হলো, হজ নষ্ট হওয়ার কারণ ইহ্‌রাম অবস্থায় বিশেষ উপকার ভোগ করা, আর তা এ সকল উপসর্গের কারণে বিলুপ্ত হয় না। আর হজ রোজার সমপর্যায়ের নয়। কেননা, ইহ্‌রামের অবস্থাই হলো স্মরণ প্রদানকারী, যেমন সালাতের অবস্থা। পক্ষান্তরে রোজার বিষয়টি বিপরীত। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইচ্ছাকৃত সহবাস করার ফলে যেরূপ ইহ্‌রাম নষ্ট হয়ে যায় তদ্রূপ ভুলক্রমে সহবাস করলেও ইহ্‌রাম নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ভুলে গিয়ে সহবাস করা হজকে নষ্ট করে না– যেরূপ ভুলে সহবাস করলে রোজা ভঙ্গ হয় না। একই রকম মতভিন্নতা রয়েছে ঘুমন্ত ও বলপ্রয়োগকৃত স্ত্রীলোকের সাথে সহবাসের ক্ষেত্রে। আমাদের মতে ইহ্‌রামকারিণী মহিলার হজ নষ্ট হয়ে যাবে, তবে সে গুনাহ্‌গার হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ঐ মহিলার হজ নষ্ট হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল– ভুলে যাওয়া, ঘুমানো ও অন্যান্য উপসর্গের কারণে নিষেধাজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং তা হজের নিষিদ্ধ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে হজ নষ্ট হবে না। কেননা, নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে হজ নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল হলো, ইহ্‌রাম অবস্থায় বিশেষ উপকার ভোগ করার কারণে হজ নষ্ট হয়ে যায়। আর তা ভুলে যাওয়া, ঘুমন্ত হওয়া– এ সকল উপসর্গের কারণে বিলুপ্ত হয় না। যেমন– ভুলক্রমে কিংবা বল প্রয়োগ করে সহবাস করার ফলে গোসল ওয়াজিব হয় এবং এ কারণে حُرْمَتْ مُصَاهَرَةْ [শ্বশুর-আত্মীয়দের সাথে বিবাহ হারাম হওয়া]-ও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং হজ নষ্ট হওয়ার হুকুম মূল সহবাসের সাথে সম্পৃক্ত।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) রোজার উপর কিয়াস করেছেন। ভুলক্রমে কেউ [রোজা অবস্থায়] সহবাস করলে তার রোজা নষ্ট হয় না, তদ্রূপ হজও নষ্ট হবে না। এর জবাবে বলা হয় যে, হজকে রোজার উপর কিয়াস করা সিদ্ধ নয়। কেননা, ইহ্‌রামের অবস্থাই হলো স্মরণ প্রদানকারী যেমন নামাজের অবস্থা। এজন্যই ইহ্‌রাম এবং নামাজে ভুল করাকে ওজর হিসেবে গণ্য করা হয় না। কিন্তু রোজার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, রোজার অবস্থা স্মরণ প্রদানকারী নয় বলে এ ক্ষেত্রে ভুলকে ওজর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

فَصْلٌ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلطَّوَافُ صَلٰوةٌ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبَاحَ فِيْهِ الْمَنْطِقَ فَتَكُوْنُ الطَّهَارَةُ مِنْ شَرْطِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الطَّهَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ فَرْضًا ثُمَّ قِيْلَ هِيَ سُنَّةٌ وَالْاَصَحُّ اَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِاَنَّهُ يَجِبُ بِتَرْكِهَا الْجَابِرُ وَلِاَنَّ الْخَبَرَ يُوْجِبُ الْعَمَلَ فَيَثْبُتُ بِهِ الْوُجُوْبُ فَاِذَا شَرَعَ فِيْ هٰذَا الطَّوَافِ وَهُوَ سُنَّةٌ يَصِيْرُ وَاجِبًا بِالشُّرُوْعِ وَيَدْخُلُهُ نَقْصٌ بِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فَيُجْبَرُ بِالصَّدَقَةِ اِظْهَارًا لِدُنُوِّ رُتْبَتِهِ عَنِ الْوَاجِبِ بِاِيْجَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ طَوَافٍ هُوَ تَطَوُّعٌ وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِاَنَّهُ اَدْخَلَ النَّقْصَ فِي الرُّكْنِ فَكَانَ اَفْحَشَ مِنَ الْاَوَّلِ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ وَاِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ كَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) وَلِاَنَّ الْجَنَابَةَ اَغْلَظُ مِنَ الْحَدَثِ فَيَجِبُ جَبْرُ نُقْصَانِهَا بِالْبَدَنَةِ اِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ وَكَذَا اِذَا طَافَ اَكْثَرَهُ جُنُبًا اَوْ مُحْدِثًا لِاَنَّ اَكْثَرَ الشَّيْءِ لَهُ حُكْمُ كُلِّهِ ـ

অনুচ্ছেদ : অপবিত্র অবস্থায় তওয়াফ করা

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় তওয়াফে কুদূম করে, তার উপর সদকা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উক্ত তওয়াফ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلطَّوَافُ صَلٰوةٌ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبَاحَ فِيْهِ الْمَنْطِقَ 'তওয়াফ হলো নামাজ, তবে [পার্থক্য হলো] আল্লাহ তা'আলা তাতে কথা বলা বৈধ করেছেন।' সুতরাং পবিত্রতা তওয়াফের শর্ত। আর আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ 'তোমরা প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করো'। এখানে তাহারাতের [পবিত্রতার] শর্ত আরোপ করা হয়নি। সুতরাং তা ফরজ হবে না। তবে কেউ কেউ তাহারাতকে সুন্নত বলেছেন। বিশুদ্ধতম মত হলো তা ওয়াজিব। কেননা তা ছেড়ে দিলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। তা ছাড়া এ কারণে যে, খবরে ওয়াহিদ আমল ওয়াজিব করে। সুতরাং এর দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হবে। আর যখন তওয়াফে কুদূম শুরু করবে, তখন সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও শুরু করার কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তাহারাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাতে ত্রুটি আসবে। সুতরাং সদকা দ্বারা তা পূরণ করতে হবে– আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা ওয়াজিবকৃত [অর্থাৎ তওয়াফে জিয়ারত] তার চেয়ে এর মর্যাদার নিম্নতা প্রকাশ করার জন্য। অনুরূপ হুকুম, যে কোনো নফল তওয়াফের ক্ষেত্রেও। আর অজু ছাড়া যদি তওয়াফে জিয়ারত করে, তাহলে তার উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, সে রুকনের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করেছে। সুতরাং তা প্রথমটির চেয়ে গুরুতর হবে। আর তাই দম দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে। আর যদি সে জুনুবী [অপবিত্র] অবস্থায় তওয়াফ

করে, তাহলে তার উপর উট ওয়াজিব হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। তা ছাড়া এ কারণে যে, জানাবাত হলো হদসের চেয়ে গুরুতর। সুতরাং পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য এ ক্ষেত্রে উট দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। অনুরূপ হুকুম যদি তওয়াফের অধিকাংশ চক্কর জানাবাত অবস্থায় কিংবা হদসের অবস্থায় করে। কেননা, কোনো কিছুর অধিকাংশ তার সম্পূর্ণের হুকুম ধারণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الخ – মাসআলা : 'হদস' অবস্থায় তওয়াফে কুদূম আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য, তবে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর দলিল হলো এ হাদীস– اَلطَّوَافُ صَلٰوةٌ [তাওয়াফ হলো নামাজ]। রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফকে নামাজের সাথে তুলনা করেছেন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, তওয়াফ ও নামাজের মধ্যে ذَاتٌ বা সত্তাগতভাবে কোনো মিল নেই। কেননা, সত্তাগতভাবে তওয়াফ হলো চক্কর দেওয়া আর নামাজ তার বিপরীত। এ থেকে বুঝা যায় যে, তওয়াফের হুকুম নামাজের হুকুমের মতো। অর্থাৎ যেভাবে নামাজ তাহারাত ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়, তদ্রূপ তওয়াফও তাহারাত ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ এখানে আল্লাহ তা'আলা প্রাচীন গৃহ তথা কা'বা শরীফের তওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন– তাহারাত বা অন্য কিছুর শর্ত আরোপ করেননি। এজন্য আয়াত থেকে 'তাহারাত' ফরজ হওয়া সাব্যস্ত হবে না। আর খবরে ওয়াহেদের দ্বারা কিতাবুল্লাহর কোনো হুকুমের সাথে সংযোজন করাও জায়েজ নেই। মোদ্দাকথা, তওয়াফের জন্য তাহারাত ফরজ নয়। তবে কেউ কেউ তাহারাতকে সুন্নত বলেছেন। যেমন– ইবনে শুজা'(র.)-এর অভিমত অনুরূপ। আর বিশুদ্ধতম অভিমত হলো তা ওয়াজিব। যেমন– আবূ বকর রাযী (র.)-এর অভিমত অনুরূপ। তওয়াফে কুদূম ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো, এতে তাহারাত ছেড়ে দিলে ক্ষতিপূরণ তথা সদকা ওয়াজিব হয়। আর যে জিনিস পরিত্যাগ করার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়; তা স্বয়ং ওয়াজিব বলে পরিগণিত। এজন্যই তাহারাত ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত : اَلطَّوَافُ صَلٰوةٌ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ যা আমলকে ওয়াজিব করে। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা তাহারাত ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হবে তওয়াফে কুদূমের ক্ষেত্রে তাহারাত তরক করার কারণে সদকা ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো, নাপাক ব্যক্তি যখন তওয়াফে কুদূম শুরু করে তখন তা সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও শুরু করার কারণে ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তাহারাত তরক করার কারণে তাতে ত্রুটি আসবে। সুতরাং সদকা দ্বারা তা পূরণ করতে হবে।

তবে কথা হলো, এ ত্রুটির ক্ষতিপূরণ সদকা কেন হলো? অথচ তওয়াফে জিয়ারতের ক্ষেত্রে কেউ যদি 'হদস' অবস্থায় তওয়াফ করে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দম দিতে হয়। এর জবাব হলো, তওয়াফে জিয়ারতের চেয়ে তওয়াফে কুদূমের মর্যাদার নিম্নতা প্রকাশকরণার্থে এমনটি করা হয়েছে। এ হুকুম যে কোনো নফল তওয়াফের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ নফল তওয়াফ অজু ছাড়া করলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الخ – মাসআলা: মুহ্রিম যদি তওয়াফে জিয়ারত অজু ছাড়া করে, তাহলে তার উপর বকরি কুরবানি ওয়াজিব হবে। কেননা, সে রুকনের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করেছে। আর রুকনের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করা, ওয়াজিবের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করার চেয়ে গুরুতর। তাই এর ক্ষতিপূরণও বড় বস্তু তথা বকরি দিয়ে করতে হবে এবং ওয়াজিব তথা তওয়াফে কুদূমের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টির কারণে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছোট কিছু তথা সদকা দিতে হবে।

আর যদি জানাবাত অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত করে, তাহলে তার উপর বাদানাহ্ তথা উট কিংবা গরু কুরবানি ওয়াজিব হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় দলিল হলো, জানাবাত হদসের তুলনায় গুরুতর। সুতরাং জানাবাত এবং হদসের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য জানাবাতের কারণে সৃষ্ট ত্রুটির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাদনাহ্ কুরবানি দিতে হবে আর হদসের কারণে সৃষ্ট ত্রুটির ক্ষতিপূরণ বকরি দিয়ে দিতে হবে। এমনিভাবে তওয়াফে জিয়ারতের অধিকাংশ চক্কর হদসের অবস্থায় করলে বকরি ওয়াজিব হবে এবং জানাবাতের অবস্থায় করলে বাদানাহ্ ওয়াজিব হবে। কেননা, কোনো কিছুর অধিকাংশ তার সম্পূর্ণের হুকুম ধারণ করে। যেমন, [ফিকহশাস্ত্রের] সুপ্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো– لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيْدَ الطَّوَافَ مَادَامَ بِمَكَّةَ وَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيْدَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْحَدَثِ اِسْتِحْبَابًا وَفِي الْجَنَابَةِ اِيْجَابًا لِفُحْشِ النُّقْصَانِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَقُصُوْرِهٖ بِسَبَبِ الْحَدَثِ ثُمَّ إِذَا اَعَادَهُ وَقَدْ طَافَهُ مُحْدِثًا لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَاِنْ اَعَادَهُ بَعْدَ اَيَّامِ النَّحْرِ لِاَنَّ بَعْدَ الْإِعَادَةِ لَا تَبْقٰى اِلَّا شُبْهَةُ النُّقْصَانِ وَاِنْ اَعَادَهُ وَقَدْ طَافَهُ جُنُبًا فِيْ اَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ اَعَادَهُ فِيْ وَقْتِهٖ وَاِنْ اَعَادَهُ بَعْدَ اَيَّامِ النَّحْرِ لَزِمَهُ الدَّمُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) بِالتَّاخِيْرِ عَلٰى مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهٖ ـ

অনুবাদ : তবে যতক্ষণ মক্কায় থাকে ততক্ষণ তওয়াফ পুনরায় করে নেওয়াই উত্তম। তখন তার উপর দম ওয়াজিব নয়। কোনো কোনো অনুলিপিতে রয়েছে যে, পুনরায় তওয়াফ করা তার উপর ওয়াজিব। তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, হদসের ক্ষেত্রে মোস্তাহাব পর্যায়ে তাকে পুনরায় তওয়াফ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। আর জানাবাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব পর্যায়ে আদেশ করা হবে। কেননা, জানাবাতের কারণে সৃষ্ট ক্রটি গুরুতর এবং হদসের কারণে সৃষ্ট ক্রটি লঘু। আর যদি পূর্বে হদস অবস্থায় তওয়াফ করার পর পুনরায় তওয়াফ করে, তাহলে তার উপর জবাই করা ওয়াজিব হবে না। যদিও সে কুরবানির দিনগুলোর পর পুনরায় তওয়াফ করে থাকে। কেননা, পুনরায় সম্পন্ন করার পর ক্রটির সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান থাকে না। আর যদি জানাবাতের অবস্থায় তওয়াফ করার পর কুরবানির দিনগুলোতে পুনরায় তওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, নির্ধারিত সময়ের ভিতরে সে পুনরায় তওয়াফ করেছে। যদি কুরবানির দিনগুলোর পর সে পুনরায় তওয়াফ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী বিলম্বের কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি মুহরিম হদস কিংবা জানাবাত অবস্থায় তওয়াফে জিয়ারত করে, তাহলে পুনরায় তওয়াফ করে নেওয়া উত্তম– যতক্ষণ সে মক্কায় থাকে। এ ক্ষেত্রে তার উপর বকরি কিংবা বাদানাহ্ কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। কুদূরীর কোনো কোনো অনুলিপিতে عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ বাক্য রয়েছে, যা দ্বারা পুনরায় তওয়াফ করা ওয়াজিব হওয়াকে নির্দেশ করে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিশুদ্ধতম অভিমত এই যে, তওয়াফে জিয়ারত হদস অবস্থায় করলে পুনরায় তওয়াফ করা মোস্তাহাব। আর যদি জানাবাতের অবস্থায় তওয়াফ করে, তাহলে পুনরায় তাওয়াফ করা ওয়াজিব। পার্থক্যের কারণ হলো, জানাবাতের কারণে ক্রটি গুরুতর হওয়ার ফলে এ ক্ষেত্রে পুনঃ তওয়াফ ওয়াজিব। আর হদসের কারণে ক্রটি লঘু হওয়ার ফলে এ ক্ষেত্রে পুনঃ তওয়াফ মোস্তাহাব।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) কিছুটা বিস্তারিত করতে গিয়ে বলেন, যদি তওয়াফে জিয়ারত হদস অবস্থায় করার পর পুনরায় তওয়াফ করে, তাহলে তার উপর দম কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। এই পুনঃ তওয়াফ কুরবানির দিনগুলোর পরে করুক কিংবা আগে করুক। কেননা, পুনঃ তওয়াফ সম্পন্ন করার পর ক্রটির সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান থাকে না। আর ক্রটির সন্দেহ কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করে না। এ কারণে এ ক্ষেত্রে কুরবানি কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না।

আর যদি জানাবাতের অবস্থায় তওয়াফ করার পর কুরবানির দিনগুলোতে পুনরায় তওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে নির্ধারিত সময়ের ভিতরেই পুনঃ তওয়াফ করেছে। আর যদি কুরবানির দিনগুলোর পর সে পুনঃ তওয়াফ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বাদানাহ্ ওয়াজিব হবে না বটে, তবে তার উপর বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, পুনঃ আদায়ের ফলে সর্বসম্মতিক্রমে বাদনাহ্ কুরবানি করা রহিত হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব হলো হজের কোনো কর্ম যদি নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হয়ে যায়। যেহেতু এখানেও তওয়াফে জিয়ারত নির্ধারিত সময় তথা কুরবানির দিনগুলোর পরে সম্পন্ন করা হয়েছে, তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী বিলম্বের কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

وَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ طَافَهُ جُنُبًا عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ لِأَنَّ النَّقْصَ كَثِيرٌ فَيُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ اسْتِدْرَاكًا لَهُ وَيَعُودُ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ وَبَعَثَ بَدَنَةً أَجْزَاهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ جَابِرٌ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْعَوْدُ وَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ طَافَهُ مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَطَافَ جَازَ وَإِنْ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ خَفَّ مَعْنَى النُّقْصَانِ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَصْلًا حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ بِذَٰلِكَ الْإِحْرَامِ لِانْعِدَامِ التَّحَلُّلِ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنِ النِّسَاءِ أَبَدًا حَتَّى يَطُوفَ .

অনুবাদ : যদি কেউ জানাবাত অবস্থায় তওয়াফ করার পর বাড়িতে ফিরে যায়, তাহলে তার ফিরে আসা আবশ্যক। কেননা, ক্রটি অনেক বেশি। সুতরাং এর ক্ষতিপূরণের জন্য তাকে ফিরে আসার আদেশ করা হবে এবং নতুন ইহ্রাম বেঁধে ফিরবে। আর যদি ফিরে না গিয়ে উট পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা, আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা উক্ত তওয়াফের জন্য ক্ষতিপূরণকারী। তবে ফিরে এসে তওয়াফ করাই উত্তম। হদসের অবস্থায় তওয়াফের পর বাড়িতে ফিরে এলে আবার গিয়ে পুনরায় তওয়াফ করে নিলে জায়েজ হবে। আর যদি বকরি প্রেরণ করে, তাহলে তা উত্তম। কেননা, ক্রটির দিকটি লঘু। আর বকরি প্রেরণে ফকিরদের উপকার রয়েছে। যদি তওয়াফে জিয়ারত না করেই বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তাকে ঐ ইহ্রাম নিয়েই [মক্কায়] ফিরে যেতে হবে। কেননা, পূর্ব ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়া পাওয়া যায়নি। সুতরাং তওয়াফ না করা পর্যন্ত স্ত্রীসহবাস থেকে সে মুহ্রিম অবস্থায়ই থেকে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো মুহরিম জানাবাত অবস্থায় তওয়াফে জিয়ারত করার পর বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তার মক্কায় ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বার তওয়াফে জিয়ারত করা আবশ্যক। কেননা, জানাবাতের কারণে ক্রটি অনেক বেশি হয়েছে। সুতরাং এর ক্ষতিপূরণের জন্য তাকে ফিরে আসার আদেশ করা হবে। তবে লক্ষণীয় হলো, মীকাত অতিক্রম করলে নতুন ইহ্রাম বেঁধে ফিরবে অন্যথায় নতুন ইহ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি মক্কায় ফিরে না গিয়ে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উট পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়েজ। কেননা, বাদানাহ্ তথা উটও ক্ষতিপূরণকারী। তবে ফিরে এসে তাওয়াফ করাই উত্তম, যাতে ক্ষতিপূরণও যেন তওয়াফ দ্বারাই হয়। অর্থাৎ মক্কায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে তওয়াফের ক্ষতিপূরণ তওয়াফই হয়ে থাকে।

আর যদি মুহ্রিম 'হদস' অবস্থায় তওয়াফে জিয়ারত করার পর বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে সে ফিরে গিয়ে পুনঃ তওয়াফ করে নিলে জায়েজ হয়ে যাবে। তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বকরি প্রেরণ করা উত্তম। কেননা, হদসের কারণে ক্রটির দিকটি লঘু এবং বকরি প্রেরণে ফকিরদের উপকার রয়েছে।

আর যদি মুহ্রিম তওয়াফে জিয়ারত মোটেই না করে বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে ঐ ইহ্রাম নিয়েই মক্কায় ফিরে এসে তাওয়াফ করা আবশ্যক। কেননা, তওয়াফে জিয়ারত না করার কারণে সে ইহ্রাম থেকে হালাল হয়নি; বরং তওয়াফ করা পর্যন্ত স্ত্রীসহবাস থেকে সে মুহ্রিম অবস্থায়ই থেকে যাবে।

وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِاَنَّ دُوْنَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَاِنْ كَانَ وَاجِبًا فَلَابُدَّ مِنْ اِظْهَارِ التَّفَاوُتِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ تَجِبُ شَاةٌ اِلَّا اَنَّ الْاَوَّلَ اَصَحُّ وَلَوْ طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِاَنَّهُ نَقْصٌ كَثِيْرٌ ثُمَّ هُوَ دُوْنَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَكْتَفِىْ بِالشَّاةِ وَمَنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثَلٰثَةَ اَشْوَاطٍ فَمَا دُوْنَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِاَنَّ النُّقْصَانَ بِتَرْكِ الْاَقَلِّ يَسِيْرٌ فَاَشْبَهَ النُّقْصَانَ بِسَبَبِ الْحَدَثِ فَيَلْزَمُهُ شَاةٌ فَلَوْ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ اَجْزَاهُ اَنْ لَا يَعُوْدَ وَيَبْعَثُ شَاةً لِمَا بَيَّنَّا وَمَنْ تَرَكَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ بَقِىَ مُحْرِمًا اَبَدًا حَتّٰى يَطُوْفَهَا لِاَنَّ الْمَتْرُوْكَ اَكْثَرُ فَصَارَ كَاَنَّهُ لَمْ يَطُفْ اَصْلًا ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি হদস অবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ করে, তার উপর সদকা ওয়াজিব। কেননা, এ তওয়াফ ওয়াজিব হলেও তার স্থান তওয়াফে জিয়ারতের নিম্নে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা জরুরি। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরেক মতে বর্ণিত রয়েছে যে, বকরি ওয়াজিব হবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিক বিশুদ্ধ। আর যদি জানাবাত অবস্থায় বিদায়ী তাওয়াফ করে, তাহলে তার উপর বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, এটি গুরুতর ত্রুটি। তবে বিদায়ী তওয়াফ তওয়াফে জিয়ারতের চাইতে নিম্নতর। তাই বকরিই যথেষ্ট হবে। যে ব্যক্তি তওয়াফে জিয়ারতের তিন চক্কর বা এর চেয়ে কম চক্কর ছেড়ে দেয় তার উপর বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, কম পরিমাণ ছেড়ে দেওয়ার ত্রুটি সামান্য। সুতরাং তা হদসের কারণে সৃষ্ট ত্রুটির সদৃশ হবে। অতএব তার উপর বকরি ওয়াজিব হবে। আর সে যদি বাড়িতে ফিরে আসে এবং আবার না গিয়ে বকরি প্রেরণ করে, তাহলে তার জন্য যথেষ্ট হবে। পূর্বে আমরা এর কারণ বর্ণনা করে এসেছি। আর যদি সে তওয়াফের চার চক্কর ছেড়ে দেয়, তাহলে সে মুহ্‌রিম অবস্থায় থেকে যাবে, যতক্ষণ না সে পুনরায় তওয়াফ করবে। কেননা, অধিকাংশই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সে যেন তওয়াফই করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ الخ : মাসআলা : যদি মুহ্‌রিম হদস অবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ করে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। কেননা, এ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব হলেও তার স্থান তওয়াফে জিয়ারতের নিম্নে। সুতরাং উভয়ের মাঝে পার্থক্য করার জন্য বলা হয়েছে যে, হদস অবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ করলে সদকা ওয়াজিব হবে আর তওয়াফে জিয়ারত করলে বকরি ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরেকটি অভিমত বর্ণিত রয়েছে যে, হদস অবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ করলে বকরি ওয়াজিব হবে। তবে প্রথমোক্ত মত [সদকা ওয়াজিব হবে] অধিক বিশুদ্ধ।

আর যদি জানাবাত অবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ করে, তাহলে তার উপর বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, এটি গুরুতর ত্রুটি। তবে এই বিদায়ী তওয়াফ তওয়াফে জিয়ারতের চেয়ে নিম্নতর হওয়ার কারণে এ ক্ষেত্রে জানাবাত অবস্থায় বকরি ওয়াজিব হবে, আর তওয়াফে জিয়ারতের ক্ষেত্রে উট ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ تَرَكَ طَوَافَ الخ : মুহ্‌রিম যদি তওয়াফে জিয়ারতের তিন চক্কর কিংবা তার চেয়ে কম চক্কর ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপর বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, সাতের মধ্যে তিন চক্কর ছেড়ে দেওয়ার ত্রুটি সামান্য হওয়ার কারণে তা হদসের কারণে সৃষ্ট ত্রুটি সদৃশ হয়ে যায়। আর হদসের কারণে সৃষ্ট ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হলো বকরি কুরবানি করা। এ কারণেই এ ক্ষেত্রেও বকরি কুরবানি করা আবশ্যক। আর যদি এ ব্যক্তি যে তওয়াফে জিয়ারতের তিন চক্কর কিংবা তার চেয়ে কম চক্কর ছেড়ে দেয়– সে যদি বাড়ি ফিরে আসে, তাহলে আবার মক্কায় ফিরে না গিয়ে বকরি প্রেরণ করা তার জন্য যথেষ্ট হবে। এর দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তওয়াফে জিয়ারতের চার চক্কর ছেড়ে দেয় সে মুহ্‌রিম অবস্থায় থেকে যাবে, যতক্ষণ না সে পুনরায় তওয়াফ করবে। কেননা, অধিকাংশই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর অধিকাংশ সম্পূর্ণের হুকুম রাখে। কাজেই সে যেন তওয়াফই করেনি। আর তওয়াফে জিয়ারত না করা অবস্থায় সে মুহ্‌রিমই থেকে যায়, যতক্ষণ না সে তা সম্পন্ন করে।

وَمَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ أَوِ الْأَكْثَرَ مِنْهُ وَمَادَامَ بِمَكَّةَ يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ فِيْ وَقْتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ثَلْثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْوَاجِبِ فِيْ جَوْفِ الْحِجْرِ فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَعَادَهُ لِأَنَّ الطَّوَافَ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ وَاجِبٌ عَلٰى مَا قَدَّمْنَاهُ وَالطَّوَافُ فِيْ جَوْفِ الْحِجْرِ أَنْ يَدُوْرَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَيَدْخُلَ الْفُرْجَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَطِيْمِ فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَدْخَلَ نَقْصًا فِيْ طَوَافِهِ فَمَادَامَ بِمَكَّةَ أَعَادَهُ كُلَّهُ لِيَكُوْنَ مُؤَدِّيًا لِلطَّوَافِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوْعِ ـ

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি বিদায়ী তওয়াফ ছেড়ে দেয় কিংবা তার বিদায়ী তওয়াফ চার চক্কর পরিত্যাগ করে, তাহলে তার উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, সে ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে কিংবা ওয়াজিবের অধিকাংশ ছেড়ে দিয়েছে। আর যতক্ষণ সে মক্কায় থাকবে ততক্ষণ সে পুনরায় তওয়াফ করার জন্য আদিষ্ট হবে। যাতে ওয়াজিব যথাসময়ে আদায় হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি বিদায়ী তওয়াফের তিন চক্কর ছেড়ে দেয় তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি হাতিমের ভেতর দিয়ে ওয়াজিব তওয়াফ আদায় করল, সে যদি মক্কায় অবস্থানরত থাকে, তাহলে পুনর্বার তওয়াফ করে নেবে। কেননা, হাতীমের বাহির দিয়ে তওয়াফ করা ওয়াজিব যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। হাতীমের ভিতর দিয়ে তওয়াফ করার অর্থ হলো কা'বা শরীফের পার্শ্ব দিয়ে তওয়াফ করার সময় কা'বা শরীফ ও হাতীমের মধ্যবর্তী উভয় করিডোর দিয়ে প্রবেশ করা। আর এরূপ করলে সে তার তওয়াফে ক্রটি সৃষ্টি করল। সুতরাং যতক্ষণ সে মক্কায় থাকবে, ততক্ষণ সম্পূর্ণ তওয়াফ পুনরায় করে নেবে– যাতে তার তওয়াফ শরিয়তসম্মতভাবে আদায় হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে ব্যক্তি বিদায়ী তওয়াফ ছেড়ে দিল কিংবা তার চার চক্কর পরিত্যাগ করল, তার উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, সে ওয়াজিব কিংবা ওয়াজিবের অধিকাংশ ছেড়ে দিয়েছে। আর ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে কুরবানি দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়। এজন্য উভয় অবস্থায় কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর যতক্ষণ মক্কায় থাকবে ততক্ষণ সে পুনরায় তওয়াফ করার জন্য আদিষ্ট হবে, যাতে ওয়াজিব সময়মতো আদায় করা হয়ে যায়। আর বিদায়ী তওয়াফের সময় হলো মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে।

আর যদি বিদায়ী তওয়াফের তিন চক্কর ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রতি চক্করের বিনিময়ে অর্ধ সা' গম দিয়ে দেবে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুহ্‌রিম যদি হাতীমের ভিতর দিয়ে ওয়াজিব তওয়াফ আদায় করে, তাহলে মক্কায় থাকাবস্থায় সে পুনঃ তওয়াফ করে নেবে। কেননা, হাতীমের বাহির দিয়ে তওয়াফ করা ওয়াজিব আর সে হাতীমের বাহির দিয়ে তওয়াফ করেনি বলে তওয়াফ শরিয়তসম্মতভাবে আদায় হয়নি। সুতরাং শরিয়তসম্মতভাবে আদায় করার জন্য পুনঃ তওয়াফ করবে। আর হাতীমের ভিতর তওয়াফের অর্থ হলো, কা'বা শরীফের পার্শ্ব দিয়ে তওয়াফ করার সময় কা'বা শরীফ ও হাতীমের মধ্যবর্তী উভয় করিডোর দিয়ে প্রবেশ করা।

وَاِنْ اَعَادَ عَلَى الْحِجْرِ خَاصَّةً اَجْزَاَهُ لِاَنَّهُ تَلَافٰى مَا هُوَ الْمَتْرُوْكُ وَهُوَ اَنْ يَاْخُذَ عَنْ يَمِيْنِهٖ خَارِجَ الْحِجْرِ حَتّٰى يَنْتَهِيَ اِلٰى اٰخِرِهٖ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحِجْرَ مِنَ الْفُرْجَةِ وَيَخْرُجُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ هٰكَذَا يَفْعَلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنْ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَلَمْ يُعِدْهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِاَنَّهُ تَمَكَّنَ نُقْصَانٌ فِيْ طَوَافِهٖ بِتَرْكِ مَا هُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الرُّبْعِ فَلَا تُجْزِيْهِ الصَّدَقَةُ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَطَوَافَ الصَّدْرِ فِيْ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ طَاهِرًا فَعَلَيْهِ دَمٌ فَاِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ لِاَنَّ فِي الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لَمْ يَنْقُلْ طَوَافُ الصَّدْرِ اِلٰى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِاَنَّهُ وَاجِبٌ وَاِعَادَةُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ غَيْرُ وَاجِبٍ وَاِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ فَلَا يَنْقُلُ اِلَيْهِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِيْ يَنْقُلُ طَوَافُ الصَّدْرِ اِلٰى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِاَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الْاِعَادَةِ فَيَصِيْرُ تَارِكًا لِطَوَافِ الصَّدْرِ مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ اَيَّامِ النَّحْرِ فَيَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِ الصَّدْرِ بِالْاِتِّفَاقِ وَبِتَاخِيْرِ الْاٰخَرِ عَلَى الْخِلَافِ اِلَّا اَنَّهُ يُؤْمَرُ بِاِعَادَةِ طَوَافِ الصَّدْرِ مَادَامَ بِمَكَّةَ وَلَا يُؤْمَرُ بَعْدَ الرُّجُوْعِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : যদি শুধু হাতীমের অংশটিতে পুনরায় তওয়াফ করে, তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা, সে ছেড়ে দেওয়া অংশটি আদায় করে ফেলেছে। আর তা হলো, হাতীমের বাইরে ডান থেকে আরম্ভ করে হাতীমের শেষ মাথায় যাবে। অতঃপর করিডোর দিয়ে হাতীমের ভিতরে প্রবেশ করবে, অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। এভাবে সাতবার করবে। যদি পুনরায় তওয়াফ না করে বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রায় চতুর্থাংশ আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার তওয়াফ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং সদকা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। যে ব্যক্তি অজু ছাড়া তওয়াফে জিয়ারত করল এবং তাশরীকের দিনগুলোর শেষ দিকে তাহারাতের অবস্থায় বিদায়ী তাওয়াফ করল, তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি জানাবাত অবস্থায় তওয়াফে জিয়ারত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রথম সুরতে তার বিদায়ী তাওয়াফ তওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তরিত হয়নি। কারণ, বিদায়ী তওয়াফ হলো ওয়াজিব। আর হদসের কারণে তওয়াফে জিয়ারত পুনরায় করা ওয়াজিব নয়; বরং তা মোস্তাহাব। সুতরাং বিদায়ী তওয়াফকে তওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তরিত করা হবে না। আর দ্বিতীয় সুরতে বিদায়ী তওয়াফকে তওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তরিত করা হবে। কেননা, এ অবস্থায় পুনরায় তওয়াফে জিয়ারত করা ওয়াজিব। অতএব, সে বিদায়ী তওয়াফ ছেড়ে দিল এবং তওয়াফে জিয়ারতকে কুরবানির দিনগুলো থেকে বিলম্ব করল। এমতাবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ ছেড়ে দেওয়ার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে দম ওয়াজিব হবে। তার তওয়াফে জিয়ারত বিলম্ব করার কারণে দম ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে যতদিন মক্কায় অবস্থান করবে, ততদিন পুনরায় তার উপর বিদায়ী তওয়াফ করার হুকুম রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর সে হুকুম আর থাকবে না। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَعَادَ عَلَى الْحِجْرِ الخ মাসআলা : যে ব্যক্তি হাতীম ও কা'বার মধ্যবর্তী করিডোর তওয়াফ না করে শুধু হাতীমের অংশটিতে পুনরায় তওয়াফ করে, তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা, বর্ণিত অংশটি সে আদায় করে ফেলেছে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাতীমে পুনরায় তওয়াফের সুরত হলো হাতীমের বাইরে ডান থেকে আরম্ভ করে হাতীমের শেষ মাথায় যাবে। অতঃপর করিডোর দিয়ে হাতীমের ভিতরে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। এটা এক চক্কর। এভাবে সাতবার করবে। আর যদি সে ব্যক্তি বাড়িতে ফিরে যায় এবং হাতীমে পুনরায় তওয়াফ না করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব। কেননা, প্রায় এক-চতুর্থাংশ আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার তওয়াফে ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে গেছে। এজন্য এ ক্ষতিপূরণে সদকা যথেষ্ট হবে না; বরং দম ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الخ : এ ইবারতে দুটি মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। এক. কোনো ব্যক্তি অজু ছাড়া তওয়াফে জিয়ারত করল এবং তাশরীকের দিনগুলোর শেষ দিকে অজু অবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ করল, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। দুই. জানাবাত অবস্থায় তওয়াফে জিয়ারত করল এবং তাশরীকের দিনগুলোর শেষে তাহারাত অবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ করল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইনের মতে একটি দম ওয়াজিব হবে।

উক্ত দুই মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো–

প্রথম সুরতে বিদায়ী তাওয়াফ তওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তরিত হয়নি। কেননা, বিদায়ী তওয়াফ হলো ওয়াজিব। আর হদসের কারণে তওয়াফে জিয়ারত পুনরায় করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। এজন্য বিদায়ী তওয়াফকে তওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তরিত করার কোনো আবশ্যকতা নেই; বরং বিদায়ী তওয়াফ ও তওয়াফে জিয়ারত স্বীয় অবস্থানে থাকবে। তবে অজু ছাড়া তওয়াফে জিয়ারত করার কারণে একটি দম ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় সুরতে যখন তওয়াফে জিয়ারত জানাবাত অবস্থায় করল, তখন বিদায়ী তওয়াফকে তওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তরিত করা হবে। কেননা, জানাবাত অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত অনস্তিত্বের পর্যায়ে। এজন্য তা পুনরায় করা ওয়াজিব। সুতরাং জানাবাত অবস্থায় তওয়াফে জিয়ারত যখন অনস্তিত্বের পর্যায়ে তখন তাশরীকের দিনগুলোর শেষে যে বিদায়ী তাওয়াফ করা হয়েছে তাকে তওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তরিত করে বলা হবে যে, এটা পুনঃ তওয়াফে জিয়ারত। সুতরাং এ ব্যক্তি যেন বিদায়ী তওয়াফ ছেড়ে দিল এবং তওয়াফে জিয়ারতকে কুরবানির দিন থেকে বিলম্ব করল। আর বিদায়ী তওয়াফ ছেড়ে দেওয়ার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর তওয়াফে জিয়ারত বিলম্ব করার কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট দ্বিতীয় একটি দম ওয়াজিব হবে।

সাহেবাইনের মতে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হবে না। এজন্যই এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট দুটি দম ওয়াজিব আর সাহেবাইনের মতে একটি দম ওয়াজিব। তবে লক্ষণীয় হলো দ্বিতীয় সুরতে সে ব্যক্তি যতদিন মক্কায় অবস্থান করবে, ততদিন পুনরায় তার উপর বিদায়ী তওয়াফ করার হুকুম রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর সে হুকুম আর থাকবে না।

وَمَنْ طَافَ لِعُمْرَتِهٖ وَسَعٰى عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَحَلَّ فَمَادَامَ بِمَكَّةَ يُعِيْدُهُمَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَمَّا إِعَادَةُ الطَّوَافِ فَلِتَمَكُّنِ النَّقْصِ فِيْهِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ وَأَمَّا السَّعْيُ فَلِأَنَّهٗ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ وَإِذَا أَعَادَهُمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ النُّقْصَانِ وَإِنْ رَجَعَ إِلٰى أَهْلِهٖ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوْعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ الرُّكْنِ إِذِ النُّقْصَانُ يَسِيْرٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي السَّعْيِ شَيْءٌ لِأَنَّهٗ أَتٰى بِهٖ عَلٰى إِثْرِ طَوَافٍ مُعْتَدٍّ بِهٖ وَكَذَا إِذَا أَعَادَ الطَّوَافَ وَلَمْ يُعِدِ السَّعْيَ فِي الصَّحِيْحِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি অজু ছাড়া উমরার তওয়াফ ও সা'ঈ করল এবং ইহ্রামমুক্ত হয়ে গেল, সে মক্কায় অবস্থানকালে উভয়টি পুনরায় আদায় করে নেবে। আর তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। তওয়াফ পুনরায় করার কারণ হলো হদসের ফলে তাতে ত্রুটি এসেছে। আর সা'ঈ পুনরায় করার কারণ হলো– তা তওয়াফের অনুগামী। যখন উভয়টি পুনরায় আদায় করবে তখন ত্রুটি রহিত হওয়ার কারণে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি পুনরায় আদায় করার আগে বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তাহারাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর তাকে ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হবে না। কেননা, তার হালাল হওয়া সংঘটিত হয়েছে উমরার রুকন আদায়ের পর। আর যে ত্রুটি হয়েছে, তা সামান্য। আর সা'ঈর ক্ষেত্রেও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে একটি গ্রহণযোগ্য তওয়াফের পর সা'ঈ করেছে। তদ্রূপ যদি তওয়াফ পুনরায় করে, কিন্তু সা'ঈ পুনরায় না করে। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ অজু ছাড়া উমরার তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সা'ঈ করে অতঃপর ইহ্রামমুক্ত হয়ে যায়, তাহলে মক্কায় অবস্থানকালে উভয়টি পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। দম কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। তওয়াফ পুনরায় করার কারণ হলো, হদসের কারণে তাতে ত্রুটি এসেছে। আর এই ত্রুটি বিদূরিত করার জন্য পুনরায় তওয়াফ করবে। যদিও সা'ঈ করার জন্য তাহারাতের প্রয়োজন নেই তবুও পুনরায় সা'ঈ করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, সা'ঈ তওয়াফের অনুগামী। সুতরাং পুনরায় তওয়াফের পরে সা'ঈও করবে। আর যখন উভয়টি পুনরায় আদায় করবে তখন ত্রুটি রহিত হওয়ার কারণে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, পুনরায় আদায় করার দ্বারা সৃষ্ট ত্রুটি রহিত হয়ে গেছে।

আর যদি সে ব্যক্তি পুনরায় তওয়াফ আদায় করার আগে বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সে তাহারাত ছেড়ে দিয়েছে, যা তওয়াফের ক্ষেত্রে ওয়াজিব। সুতরাং এ ক্ষতিপূরণের জন্য দম ওয়াজিব হবে এবং তাকে বাড়ি থেকে মক্কায় ফিরে আসার আদেশ করা হবে না। কেননা, উমরার রুকন তথা তওয়াফ ও সা'ঈ আদায়ের ফলে সে ইহ্রামমুক্ত হয়েছে। আর যে ত্রুটি হয়েছে তা সামান্য। এজন্য মক্কায় ফিরে আসা আবশ্যক নয়। আর সা'ঈর ক্ষেত্রেও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে একটি গ্রহণযোগ্য তওয়াফের পর সা'ঈ করেছে। অনুরূপ কোনো দণ্ড আসবে না যদি কোনো ব্যক্তি তওয়াফ পুনরায় করে, কিন্তু সা'ঈ না করে। আর এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত–যদিও কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন।

وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَحَجَّتُهُ تَامٌّ لِاَنَّ السَّعْيَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُهُ بِتَرْكِهِ الدَّمُ دُوْنَ الْفَسَادِ وَمَنْ اَفَاضَ قَبْلَ الْاِمَامِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِاَنَّ الرُّكْنَ اَصْلُ الْوُقُوْفِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَرْكِ الْاِطَالَةِ شَيْئٌ وَلَنَا اَنَّ الْاِسْتِدَامَةَ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَادْفَعُوْا بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَيَجِبُ بِتَرْكِهِ الدَّمُ بِخِلَافِ مَا اِذَا وَقَفَ لَيْلًا لِاَنَّ اِسْتِدَامَةَ الْوُقُوْفِ عَلٰى مَنْ وَقَفَ نَهَارًا لَا لَيْلًا فَاِنْ عَادَ اِلٰى عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِاَنَّ الْمَتْرُوْكَ لَا يَصِيْرُ مُسْتَدْرَكًا وَاخْتَلَفُوْا فِيْمَا اِذَا عَادَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ পরিত্যাগ করে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু তার হজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, আমাদের মতে সা'ঈ ওয়াজিব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটা পরিত্যাগ করার কারণে দম ওয়াজিব হবে, কিন্তু হজ নষ্ট হবে না। যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে আরাফা থেকে ফিরে আসে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, রুকন হলো আরাফার মূল অবস্থান। সুতরাং অবস্থান দীর্ঘায়িত না করার কারণে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর আমাদের দলিল হলো, সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান অব্যাহত রাখা ওয়াজিব। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সূর্যাস্তের পর রওনা হবে। অতএব তা পরিত্যাগ করার কারণে দম ওয়াজিব হবে। তবে রাতে অবস্থান করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, উকূফ অব্যাহত রাখা তার জন্য ওয়াজিব– যে দিনে অবস্থান করে, রাত্রে নয়। যদি সূর্যাস্তের পর আরাফায় ফিরে আসে, তাহলে তার উপর থেকে দম রহিত হবে না যাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী। কেননা, যা ছুটে গেছে, তা পুনঃপ্রাপ্তি হবে না। আর যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে আসে, তাহলে এতে মতভিন্নতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَفَاضَ قَبْلَ الْاِمَامِ الخ – **মাসআলা :** যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আরাফা থেকে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকেও একটি মত এরূপ রয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় অভিমত হলো, সে ব্যক্তির উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, হজের রুকন হলো আরাফায় অবস্থান। যেমন– مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ تَمَّ حَجُّهُ হাদীস থেকে প্রতিভাত হয়। আর অবস্থান দীর্ঘায়িত করা হজের রুকন নয়। এজন্য উকূফে আরাফাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত না করার কারণে তার উপর দম কিংবা অন্যকিছু ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল হলো, সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান অব্যাহত রাখা ওয়াজিব। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–
فَادْفَعُوْا بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ অর্থাৎ 'তোমরা সূর্যাস্তের পর রওনা হবে।'

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবায় বলেছেন–

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ هٰذَا الْمَوْضَعِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ فِيْ وُجُوْهِهَا وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ أَنْ تَغِيْبَ .

অর্থাৎ 'পুরুষদের মুখাবয়বের উপর পাগড়ির ন্যায় যখন সূর্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তখন মুশরিকরা এ স্থান [আরাফা] থেকে রওয়ানা হতো, আর আমরা সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হবো।'

উক্ত দুই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আরাফায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান অব্যাহত রাখা ওয়াজিব। আর এ ব্যক্তি যেহেতু সূর্যাস্তের পূর্বেই রওয়ানা হয়েছে, তাই ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

بِخِلَافِ إِذَا مَا وَقَفَ الخ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যদি কেউ ৯ ই জিলহজ্জের রাতের কিছু অংশে আরাফায় উকূফ করে, তাহলে সে উকূফে আরাফাকে ৯ ই জিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করল না। এর ফলে তার উপর দম ওয়াজিব হওয়ার কথা, অথচ এ ব্যক্তির উপর দম ওয়াজিব হয় না?

উত্তর হলো সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফ অব্যাহত রাখা ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব, যে দিনে অবস্থান করে। আর যে রাতে অবস্থান করে তার উপর তা ওয়াজিব নয়। সুতরাং এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়াজিব পালন না করার অভিযোগ আসবে না বিধায় তার উপর দমও ওয়াজিব হবে না।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে ব্যক্তি পূর্বে রওয়ানা হয়ে আবার সূর্যাস্তের পর আরাফায় ফিরে আসে এবং ইমামের সাথে রওয়ানা হয়, যাহেরী রেওয়ায়াত অনুযায়ী তার উপর থেকে দম রহিত হবে না। কেননা, সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা হওয়ার কারণে যে সময় ছুটে গেছে তা পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। এজন্যই তার উপর যে দম ওয়াজিব হয়েছে তা রহিত হবে না।

আর যদি এ ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফায় ফিরে আসে এবং সূর্যাস্তের পর ইমামের সাথে রওয়ানা হয়ে যায়, তাহলে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তার উপর থেকেও কুরবানি রহিত হবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মতে কুরবানি রহিত হয়ে যাবে।

وَمَنْ تَرَكَ الْوُقُوْفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِاَنَّهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَمَنْ تَرَكَ رَمْىَ الْجِمَارِ فِى الْاَيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَحَقُّقِ تَرْكِ الْوَاجِبِ وَيَكْفِيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ لِاَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ كَمَا فِى الْحَلْقِ وَالتَّرْكُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ اٰخِرِ اَيَّامِ الرَّمْيِ لِاَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ قُرْبَةً اِلَّا فِيْهَا وَمَا دَامَتِ الْاَيَّامُ بَاقِيَةً فَالْاِعَادَةُ مُمْكِنَةٌ فَيَرْمِيْهَا عَلَى التَّالِيْفِ ثُمَّ بِتَاخِيْرِهَا يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) خِلَافًا لَهُمَا .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মুযদালিফায় অবস্থান ছেড়ে দেবে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তা ওয়াজিব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি সবগুলো দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা ওয়াজিব পরিত্যাগ করা পাওয়া গেছে। তবে একটি দমই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, চুল মুণ্ডানোর ন্যায় সবক'টি দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ একই শ্রেণীভুক্ত। কঙ্কর নিক্ষেপ না করা সাব্যস্ত হবে শেষদিন সূর্যাস্ত দ্বারা। কেননা, শুধু ঐ দিনগুলোতেই কঙ্কর নিক্ষেপ ইবাদত হিসেবে গৃহীত। সুতরাং উক্ত দিনগুলো যতদিন অবশিষ্ট রয়েছে, ততদিন رَمِىْ পুনরায় করা সম্ভব। সুতরাং সে ধারাবাহিকভাবে কঙ্কর পুনঃনিক্ষেপ করে নেবে। তবে বিলম্বের কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো ৪ দিন– ১০, ১১, ১২ ও ১৩-ই জিলহজ। মাসআলা হলো, যদি কোনো মুহ্‌রিম ঐ সকল দিনে কঙ্কর নিক্ষেপ না করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হয়। এজন্য এ ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে। তবে এ দিনগুলোর সবক'টিতে কঙ্কর নিক্ষেপ না করার কারণে একটি দমই তার জন্য যথেষ্ট হবে। সর্বমোট ৭০ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়।

দলিল হলো, সবক'টি কঙ্কর নিক্ষেপ সত্তাগত ও স্থানের দিক দিয়ে একই শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং সবগুলোকে একটি رَمِىْ গণ্য করে একটি দম ওয়াজিব হবে। যেমন– কোনো মুহ্‌রিম যদি সমস্ত শরীরের চুল মুণ্ডায়, তাহলে তার উপর একটি দমই ওয়াজিব হয়– যদিও সম্পূর্ণ মাথা কিংবা মাথার চতুর্থাংশ মুণ্ডানোর কারণেও দম ওয়াজিব হয়ে থাকে। অতএব এ ক্ষেত্রেও একটি দম ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কঙ্কর নিক্ষেপ না করা সাব্যস্ত হবে রমীর শেষদিন তথা ১৩ ই জিলহজের সূর্যাস্তের দ্বারা। কেননা, শুধু ঐ দিনগুলোতেই কঙ্কর নিক্ষেপ ইবাদত হিসেবে গৃহীত। সুতরাং উক্ত দিনগুলো যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ رَمِىْ পুনরায় করা সম্ভব। যেমন– ১৩ ই জিলহজে সে যদি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে চায়, তাহলে সবকটি দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ পুনরায় ধারাবাহিকভাবে করবে। এ অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ বিলম্বিত হওয়ার কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে, আর সাহেবাইনের নিকট দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াজিবকে বিলম্বিত করার কারণে দম ওয়াজিব হয়, কিন্তু সাহেবাইনের নিকট ওয়াজিবকে বিলম্বিত করার কারণে দম ওয়াজিব হয় না।

وَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نُسُكٌ تَامٌّ وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ إِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلٰثِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِأَنَّ الْكُلَّ فِي هٰذَا الْيَوْمِ نُسُكٌ وَاحِدٌ فَكَانَ الْمَتْرُوْكُ اَقَلَّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْمَتْرُوْكُ اَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحِيْنَئِذٍ يَلْزَمُهُ الدَّمُ لِوُجُوْدِ تَرْكِ الْاَكْثَرِ وَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ تَرَكَ كُلَّ وَظِيْفَةِ هٰذَا الْيَوْمِ رَمْيًا وَكَذَا إِذَا تَرَكَ الْاَكْثَرَ مِنْهَا وَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَصَاةً اَوْ حَصَاتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا تَصَدَّقَ لِكُلِّ حَصَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ دَمًا فَيَنْقُصُ مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمَتْرُوْكَ هُوَ الْاَقَلُّ فَتَكْفِيْهِ الصَّدَقَةُ ـ

অনুবাদ : যদি একদিনের কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তা হজের একটি পূর্ণ আমল। আর যে ব্যক্তি তিন জামরার কোনো এক رَمِيْ ছেড়ে দেয় সে ব্যক্তির উপর সদকা ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রতিদিনের সবক'টি মিলে হলো হজের একটি পূর্ণ আমল। সুতরাং যা ছেড়ে দিয়েছে তা হলো এক আমল থেকে কম। তবে অর্ধেকের বেশি ছেড়ে দিলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে- যেহেতু অধিকাংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর যদি কুরবানির দিনের জামরাতুল আকাবায় رَمِيْ ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা ,রমীর ক্ষেত্রে সে এই দিনের পূর্ণ আমল ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য যদি সে উক্ত রমীর অধিকাংশ ছেড়ে দেয়। আর যদি একটি, দুটি কিংবা তিনটি কঙ্কর ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রতিটি কঙ্করের জন্য অর্ধ সা' গম সদকা করবে। তবে যদি একটি দমের পরিমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে নিজ বিবেচনায় কিছু কম করে দেবে। কেননা, ছেড়ে দেওয়া অংশ কম, তাই সদকাই যথেষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি একদিনের رَمِيْ ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা হজের পূর্ণ একটি আমল। আর পূর্ণ একটি আমল কিংবা একটি আমলের অধিকাংশ ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হয়। এজন্য এ ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে। আর সবক'টি দিনের رَمِيْ ছেড়ে দেওয়ার কারণে একটিই কুরবানি ওয়াজিব হবে। কেননা, এগুলো একই শ্রেণীভুক্ত যা একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

আর মুহ্‌রিম যদি কোনো দিন তিনটি জামরার মধ্য হতে একটি জামরার رَمِيْ ছেড়ে দেয়, অবশিষ্ট দুটি رَمِيْ করে, তাহলেও তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কঙ্করের পরিবর্তে অর্ধ সা' গম আদায় করবে। কেননা, একদিনে তিন জামরার সবক'টি رَمِيْ মিলে হবে হজের একটি পূর্ণ আমল। আর এক জামরার رَمِيْ অর্ধেক আমল থেকে কম। আর একটি আমলের অর্ধেকের কম ছেড়ে দেওয়ার কারণে সদকা ওয়াজিব হয়। এজন্য একটি জামরার رَمِيْ ছেড়ে দিলে সদকা ওয়াজিব হবে। তবে সে যদি রমীর অধিকাংশ ছেড়ে দেয়, যেমন- তিনটি জামরায় ২১ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়- সে ১০ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করল, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছেড়ে দেওয়া পাওয়া গেছে। আর অধিকাংশ সম্পূর্ণের হুকুম রাখে। আর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যখন দম ওয়াজিব হয়, তখন অধিকাংশ কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিলেও দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি কুরবানির দিনের জামরাতুল আকাবায় رَمِيْ ছেড়ে দেয় এমনকি ১৩ ই জিলহজের সূর্যাস্ত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, কুরবানির দিনের পূর্ণ একটি আমল হলো রমী করা। কাজেই সে যেন এ দিনের পূর্ণ একটি আমল ছেড়ে দিয়েছে। আর পূর্ণ একটি আমল ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হয়। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি ইয়াওমুন নাহরে জামরায়ে আকাবার رَمِيْ -এর অধিকাংশ ছেড়ে দেয়- যেমন চারটি কঙ্কর ছেড়ে দিল, তাহলেও দম ওয়াজিব হবে। কেননা, অধিকাংশ সম্পূর্ণের হুকুম রাখে।

আর যদি কোনো মুহ্‌রিম কোনো এক জামরার একটি, দুটি কিংবা তিনটি কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয় তথা চারটির কম কঙ্কর ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রতিটি কঙ্করের জন্য অর্ধ সা' গম সদকা করবে। তবে সব মিলে যদি একটি দমের মূল্য পরিমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে নিজ বিবেচনায় কিছু কম করে দেবে। কেননা, ছেড়ে দেওয়া অংশ হলো কম। আর অর্ধেকের কমে দম ওয়াজিব হয় না; বরং সদকা ওয়াজিব হয়। আর সদকার মূল্য যখন দমের পরিমাণে পৌঁছে যায় তখন কিছু কম করবে, যাতে দমের সমপরিমাণ ওয়াজিব না হয়।

وَمَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رض) وَكَذَا إِذَا أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي تَاخِيْرِ الرَّمْيِ وَفِي تَقْدِيْمِ نُسُكٍ عَلَى نُسُكٍ كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَنَحْرِ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ لَهُمَا أَنَّ مَا فَاتَ مُسْتَدْرَكٌ بِالْقَضَاءِ وَلَا يَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ شَيْءٌ أَخَرُ وَلَهُ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَلِأَنَّ التَّاخِيْرَ عَنِ الْمَكَانِ يُوْجِبُ الدَّمَ فِيْمَا هُوَ مُوَقَّتٌ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاخِيْرُ عَنِ الزَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوَقَّتٌ بِالزَّمَانِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মাথা মুণ্ডানো বিলম্বিত করল, এমনকি কুরবানির দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেল ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। একই হুকুম হবে যদি তাওয়াফে জিয়ারত বিলম্বিত করে। সাহেবাইন (র.) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে رَمِىْ বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে এবং একটি আমলকে আরেকটি আমলের উপর অগ্রবর্তী করার ব্যাপারে। যেমন– رَمِىْ -এর পূর্বে হলক করা, হজ্জে কিরানকারী রমীর পূর্বে কুরবানি করা এবং জবাই করার পূর্বে হলক করার ক্ষেত্রেও। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, যা ছুটে গেছে তা কাজা করার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। আর কাজার সাথে অন্য কোনো দণ্ড ওয়াজিব হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর হাদীস। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি হজের কোনো একটি আমলের উপর অন্য একটি আমলকে অগ্রবর্তী করবে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তা ছাড়া এ কারণে যে, যেসব আমল স্থানের সাথে নির্দিষ্ট– যেমন ইহ্রাম, তা উক্ত স্থান থেকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয়। তেমনি সময়ের সাথে যেসব আমল নির্ধারিত, তা উক্ত সময় থেকে বিলম্বিত করলেও অনুরূপ হুকুম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলাসমূহের ভিত্তি হলো, এ মূলনীতির উপর যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হজের কোনো আমলকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব হয় না। যেমন– ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুহ্রিম যদি ১০, ১১ ও ১২ ই জিলহজ কুরবানির দিনগুলো থেকে মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটতে বিলম্ব করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর একটি কুরবানি করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে সে যদি তওয়াফে জিয়ারত বিলম্বিত করে, তাহলেও তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে বর্ণিত উভয় ক্ষেত্রেই তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের মধ্যে অনুরূপ মতভিন্নতা রয়েছে জামরায়ে আকাবায় رَمِىْ কুরবানির দিবস তথা ১০ ই জিলহজ থেকে ১১ ই জিলহজে বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে এবং ১১ তারিখের رَمِىْ ১২ তারিখে, ১২ তারিখের رَمِىْ ১৩ তারিখে, ১৩ তারিখের رَمِىْ বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তার উপর দম ওয়াজিব হবে আর সাহেবাইনের নিকট দম ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি হজের একটি আমলের উপর আরেকটি আমল অগ্রবর্তী করে, যেমন– রমীর পূর্বে হলক করা, হজ্জে কিরানকারী কিংবা তামাত্তুকারী রমীর পূর্বে কুরবানি করা কিংবা মুহ্রিম জবাই করার পূর্বে মাথা মুণ্ডানো, তাহলে এসব ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দম ওয়াজিব হবে আর সাহেবাইনের মতে দম ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, যা স্বীয় সময়ে ফউত হয়ে যায়, তা কাজা করার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর কাজার সাথে অন্য কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না। শরিয়তের আহকাম থেকে গবেষণা করে এ কথা জানা যায়। যেমন– উদাহরণ স্বরূপ নামাজের কাজার সাথে অন্য কোনো কাফ্ফারা বা দণ্ড ওয়াজিব হয় না। অনুরূপভাবে হজের ক্ষেত্রেও যখন কোনো আমল কাজা হয়ে যায়, তখন বিলম্বিত হওয়ার কারণে কাজা ছাড়া অন্য কিছুই ওয়াজিব হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস। আর কোনো কোনো অনুলিপিতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি হলো, যে ব্যক্তি হজের একটি আমলের উপর অন্য আমলকে অগ্রবর্তী করবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যে আমল কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট, তা উক্ত স্থান থেকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয়। যেমন– হাজী যদি ইহ্রাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে অতঃপর ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যে আমল কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট. তা উক্ত সময় হতে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হবে।

فَإِنْ حَلَقَ فِيْ أَيَّامِ النَّحْرِ فِيْ غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنِ اعْتَمَرَ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ وَقَصَّرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ قَوْلَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فِي الْمُعْتَمِرِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْحَاجِّ وَقِيْلَ هُوَ بِالْإِتِّفَاقِ لِأَنَّ السُّنَّةَ جَرَتْ فِي الْحَجِّ بِالْحَلْقِ بِمِنًى وَهُوَ مِنَ الْحَرَمِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ هُوَ يَقُوْلُ الْحَلْقُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْحَرَمِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ أُحْصِرُوْا بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَحَلَقُوْا فِيْ غَيْرِ الْحَرَمِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَلْقَ لَمَّا جُعِلَ مُحَلِّلًا صَارَ كَالسَّلَامِ فِيْ أٰخِرِ الصَّلٰوةِ فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِهَا وَإِنْ كَانَ مُحَلِّلًا فَإِذَا صَارَ نُسُكًا إِخْتَصَّ بِالْحَرَمِ كَالذَّبْحِ وَبَعْضُ الْحُدَيْبِيَّةِ مِنَ الْحَرَمِ فَلَعَلَّهُمْ حَلَقُوْا فِيْهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَلْقَ يَتَوَقَّتُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يَتَوَقَّتُ بِهِمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَتَوَقَّتُ بِالْمَكَانِ دُوْنَ الزَّمَانِ وَعِنْدَ زُفَرَ (رحـ) يَتَوَقَّتُ بِالزَّمَانِ دُوْنَ الْمَكَانِ وَهٰذَا الْخِلَافُ فِي التَّوْقِيْتِ فِيْ حَقِّ التَّضْمِيْنِ بِالدَّمِ أَمَّا لَا يَتَوَقَّتُ فِيْ حَقِّ التَّحَلُّلِ بِالْإِتِّفَاقِ ـ

অনুবাদ : যদি কুরবানির দিনগুলোতে হারামের বাইরে মাথা মুণ্ডায়, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি উমরা করে হারাম থেকে বের হয়ে গেল এবং চুল ছাঁটল, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। গ্রন্থকার বলেন, জামেউস সগীর কিতাবে [ইমাম মুহাম্মদ (র.)] উমরাকারীর ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত উল্লেখ করেছেন এবং হজ আদায়কারী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি, বরং বলেছেন তা [দম ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি] সর্বসম্মত। কেননা, হজের ক্ষেত্রে মিনায় হলক করার সুন্নত ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আর মিনা হলো হারামের অন্তর্ভুক্ত। তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, এতে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, হলক করার হুকুম হারামের সাথে খাস নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হুদায়বিয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং হারামের বাইরেই হলক করেন। তরফাইন [ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)]-এর দলিল হলো, হলককে যখন [ইহরাম থেকে] হালালকারীরূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন তা নামাজের শেষে সালামের ন্যায় হয়ে গেল। কেননা, সালাম [নামাজ থেকে] হালালকারী হওয়া সত্ত্বেও নামাজের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হলক যখন হজের আমলরূপে সাব্যস্ত হলো তখন জবাইয়ের মতো তা হরমের সাথেই নির্দিষ্ট হবে। আর হুদায়বিয়ার কিছু অংশ হারামে অবস্থিত; সুতরাং তারা হয়তো হারামভুক্ত অংশে হলক করেছেন। মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হলক, কাল ও স্থানের সাথে নির্দিষ্ট। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা কোনোটির সাথেই নির্দিষ্ট নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ, কিন্তু কালের সাথে নয়। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে কালের সাথে সীমাবদ্ধ, স্থানের সাথে নয়। সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এ মতভিন্নতা দম দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তা স্থান বা কাল কোনোটির সাথেই নির্দিষ্ট নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে দুটি মাসআলার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলা হলো, হাজী কুরবানির দিনগুলোতে হারামের বাইরে হলক করেছে। দ্বিতীয় মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি উমরা তথা তওয়াফ ও সা'ঈ করত হারাম থেকে বের হয়ে চুল ছেঁটেছে; উভয় ক্ষেত্রেই তরফাইন (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামি'উস সগীর কিতাবে উমরাকারীর ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতো لَا شَيْءَ عَلَيْهِ উল্লেখ করেছেন, হজকারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উমরাকারী যদি হারামের বাইরে গিয়ে মাথার চুল ছেঁটে ফেলে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না; কিন্তু যদি হজকারী হারামের বাইরে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করে তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামি'উস সগীর কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দিকে সম্পর্কিত করে, দম ওয়াজিব হবে কিংবা হবে না এমন কোনো কিছুই উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ বলেন, হজকারী হারামের বাইরে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করলে সর্বসম্মতভাবে দম ওয়াজিব হবে। তরফাইন ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সকলেরই অভিমত এটি। কেননা, হজের ক্ষেত্রে মিনায় হলক করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও পরবর্তী মুসলমানদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আর মিনা হারামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ ধারাবাহিকতা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, হারামের মধ্যে হলক করা ওয়াজিব। আর যখন হারামের মধ্যে হলক করা ওয়াজিব, তখন হরমের বাহিরে মাথা মুণ্ডন করলে দম ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, উমরাকারী হারামের বাইরে মাথা মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে যেরূপ তরফাইন ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে, তদ্রূপ হজকারী যদি হারামের বাইরে গিয়ে মাথা মুণ্ডায়-সে ক্ষেত্রেও মতভিন্নতা রয়েছে। তরফাইনের মতে দম ওয়াজিব হবে আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, হলক করার হুকুম হারামের সাথে খাস নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম যখন হুদায়বিয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হন তখন তাঁরা সকলেই সেখানে মাথা মুণ্ডন করেন। আর হুদায়বিয়া হারামের বাইরে অবস্থিত। কাজেই তাঁরা যেন হারামের বাইরে হলক করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম যখন হারামের বাইরে হলক করেছেন তখন এ থেকে বুঝা যায় যে, হলক করা হারামের সাথে নির্দিষ্ট নয়। আর হলক করা হারামের সাথে নির্দিষ্ট নয় বলেই এ ক্ষেত্রে কোনো ওয়াজিব পরিত্যাগ করা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং দম ওয়াজিব হবে না।

তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো নামাজের মধ্যে সালাম যেরূপ নামাজের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত তদ্রূপ হলক করাও হজের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত– যদিও তা ইহ্‌রাম থেকে হালালকারী। সুতরাং হলক হজের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তা হজের আমলরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হজের যাবতীয় আমল হারামের সাথে নির্দিষ্ট, যেমন জবাই করা ও অন্যান্য আমলসমূহ। তাহলে হলকও হারামের সাথে নির্দিষ্ট হবে। আর তাই হারামের মধ্যে হলক করা ওয়াজিব হবে। সুতরাং হজকারী হারামের বাইরে মাথা মুণ্ডন করলে সে ওয়াজিব পরিত্যাগকারীরূপে গণ্য হবে। আর ওয়াজিব পরিত্যাগকারীর উপর দম ওয়াজিব হয়, এজন্য এ ব্যক্তির উপরও দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এ কথা বলা যে, আল্লাহর নবী ও সাহাবীগণ হুদাইবিয়ায় হলক করেছেন, আর হুদাইবিয়া হারামের বাইরে ছিল এ কথা ভুল। কারণ, হুদাইবিয়ার কিছু অংশ হারামের অন্তর্ভুক্ত। হতে পারে তারা ঐ অংশেই হলক করেছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মোদ্দকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট হজের ক্ষেত্রে 'হলক' কাল তথা কুরবানির দিনসমূহ এবং স্থান তথা হারামের সাথে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ কুরবানির দিনগুলোতে হারামে হলক করা জরুরি। সুতরাং কুরবানির দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর যদি কেউ হারামে হলক করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আবার কুরবানির দিনগুলোতে যদি হারামের বাইরে কেউ হলক করে, তাহলেও তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে 'হলক' কাল ও স্থান কোনোটির সাথেই নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং কেউ যদি কুরবানির দিনগুলোর পরে কিংবা হারাম ছাড়া অন্যত্র হলক করে, তাহলে তাঁর মতে দম ওয়াজিব হবে না।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে 'হলক' স্থান তথা হারামের সাথে নির্দিষ্ট; কিন্তু কাল তথা কুরবানির দিনগুলোর সাথে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং কেউ যদি হারামের বাহিরে হলক করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি কুরবানির দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর হলক করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর মতে 'হলক' কালের সাথে নির্দিষ্ট, স্থানের সাথে নয়। সুতরাং কেউ যদি কুরবানির দিনগুলোর পরে হলক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে– কিন্তু যদি হারামের বাইরে হলক করে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্থান বা কালের সাথে নির্দিষ্ট হওয়া সম্পর্কে উক্ত মতভিন্নতা দম [দ্বারা ক্ষতিপূরণ] ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ হলক যার সাথে নির্দিষ্ট, তা ব্যতীত যদি অন্যত্র হলক করে, তাহলে যারা হলককে কোনো কিছুর [স্থান ও কালের] সাথে নির্দিষ্ট করেন, তাদের নিকট দম ওয়াজিব হবে, আর যারা নির্দিষ্ট করেন না তাদের নিকট দম ওয়াজিব হবে না। ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তা স্থান বা কাল কোনোটির সাথেই নির্দিষ্ট নয়। যে কোনো স্থানেই হলক করুক না কেন সে ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে যাবে। তবে যারা হলককে হারাম কিংবা কালের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন, তাদের নিকট এর ব্যতিক্রম করলেই দম ওয়াজিব হবে। আর যারা নির্দিষ্ট করেননি, তাদের নিকট সে ইহ্‌রামমুক্ত হবে এবং তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলাই সঠিক বিষয় অবগত।

وَالتَّقْصِيْرُ وَالْحَلْقُ فِى الْعُمْرَةِ غَيْرُ مُوَقَّتٍ بِالزَّمَانِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ اَصْلَ الْعُمْرَةِ لَا يَتَوَقَّتُ بِهِ بِخِلَافِ الْمَكَانِ لِاَنَّهُ مُوَقَّتٌ بِهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ يُقَصِّرْ حَتّٰى رَجَعَ وَقَصَّرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِىْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا مَعْنَاهُ اِذَا خَرَجَ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ عَادَ لِاَنَّهُ اَتٰى بِهِ فِىْ مَكَانِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ .

অনুবাদ : উমরার ক্ষেত্রে চুল ছাঁটা কিংবা মাথা মুণ্ডানো সর্বসম্মতিক্রমে সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। কেননা, মূল উমরাই তো কোনো সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে স্থানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, উমরা নির্ধারিত স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উমরাকারী যদি চুল না ছেঁটে চলে যায় অতঃপর ফিরে আসে এবং ছাঁটে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ উমরাকারী যদি হারামের বাইরে চলে যায় অতঃপর ফিরে আসে। কেননা, সে ছাঁটা কিংবা মাথা মুণ্ডানোর কাজটি যথাস্থানেই সম্পন্ন করেছে। সুতরাং তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالتَّقْصِيْرُ وَالْحَلْقُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, উমরার ক্ষেত্রে চুল ছাঁটা কিংবা মাথা মুণ্ডানো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং যে কোনো সময়ই সর্বসম্মতিক্রমে উমরা করা জায়েজ। কেননা, মূল উমরাই তো কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং যখন ইচ্ছা তখনই উমরা করা যায়। কেননা, তওয়াফ ও সা'ঈ করার নামই হলো উমরা। আর তওয়াফ ও সা'ঈ কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। অতএব উমরাও কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হবে না। তবে কুরবানির দিনগুলোতে উমরা করা মাকরূহ। এর কারণ এটা নয় যে, উমরা কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট; বরং এর কারণ হলো, এ দিনগুলোতে লোকেরা হজের ক্রিয়াকর্মে ব্যস্ত থাকে, ফলে এসব দিনে উমরা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। তবে লক্ষণীয় হলো, উমরা স্থান তথা হারামের সাথে খাস। সুতরাং তরফাইনের মতে মাথার চুল ছাঁটা কিংবা মাথা মুণ্ডানো হারামের সাথে নির্দিষ্ট হবে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা হারামের সাথে নির্দিষ্ট হবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ لَمْ يُقَصِّرْ حَتّٰى رَجَعَ الخ - **মাসআলা :** যদি উমরা আদায়কারী উমরার রুকন আদায় করে হারাম থেকে বের হয়ে পড়ে, অতঃপর চুল না ছেঁটে কিংবা না মুণ্ডিয়ে পুনরায় হারামে প্রবেশ করত চুল ছাঁটে কিংবা মাথা মুণ্ডায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। দলিল হলো, সে মাথা মুণ্ডানো কিংবা ছাঁটার কাজটি যথাস্থানে তথা হারামে সম্পন্ন করেছে। এজন্য তার উপর কোনো দণ্ড আরোপিত হবে না।

فَاِنْ حَلَقَ الْقَارِنُ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) دَمٌ بِالْحَلْقِ فِىْ غَيْرِ اَوَانِهٖ لِاَنَّ اَوَانَهٗ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ دَمٌ بِتَاخِيْرِ الذَّبْحِ عَنِ الْحَلْقِ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْاَوَّلُ وَلَا يَجِبُ بِسَبَبِ التَّاخِيْرِ شَيْءٌ عَلٰى مَا قُلْنَا .

অনুবাদ : হজ্জে কিরানকারী যদি জবাই করার পূর্বে হলক করে, তাহলে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। একটি দম হলো অসময়ে হলক করার কারণে। কেননা, হলকের যথাসময় হলো 'জবাই'-এর পরে। আরেকটি দম হলো জবাইকে হলক থেকে বিলম্বিত করার কারণে। সাহেবাইনের মতে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। তা হলো প্রথমটি। আর বিলম্বের কারণে কিছুই ওয়াজিব হবে না। এর কারণ ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, হজ্জে কিরানকারী যদি কুরবানির পশু জবাই করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি দম হলো, যেহেতু সে অসময়ে হলক করেছে সে কারণে। কেননা, হলকের সময় হলো 'জবাই'-এর পরে। অথচ সে 'জবাই' করার পূর্বে হলক করেছে। দ্বিতীয় দম জবাইকে হলক থেকে বিলম্বিত করার কারণে ওয়াজিব হবে। কিরানের দম ভিন্নভাবে দিতে হবে। কাজেই যেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে তিনটি দম ওয়াজিব। একটি হলো কিরানের দম আর অপর দুটি ত্রুটির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ।

সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর তা হলো প্রথমটি। বিলম্বিত করার কারণে তাঁদের মতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত- وَهُوَ الْاَوَّلُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসময়ে হলকের কারণে যে দম ওয়াজিব হয়েছে তা। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন নয়। কেননা, অগ্রবর্তী করা কিংবা বিলম্বিত করার কারণে সাহেবাইন (র.)-এর মতে কিছুই ওয়াজিব হয় না; বরং প্রথমটি বলতে এখানে কিরানের দম বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভুল হয়েছে। কেননা, অগ্রবর্তী ও বিলম্বিত করার কারণে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, কিরানের দম। সুতরাং ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্তি- فَعَلَيْهِ دَمَانِ দ্বারা একটি কিরানের দম এবং অপরটি মাথা মুণ্ডানো ও জবাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্র-পশ্চাতের কারণে যে দম ওয়াজিব হয়েছে- তাই উদ্দেশ্য।

فَصْلٌ اِعْلَمْ اَنَّ صَيْدَ الْبَرِّ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ وَصَيْدُ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَصَيْدُ الْبَرِّ مَا يَكُوْنُ تَوَالُدُهٗ وَمَثْوَاهُ فِى الْبَرِّ وَصَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُوْنُ تَوَالُدُهٗ وَمَثْوَاهُ فِى الْمَاءِ وَالصَّيْدُ هُوَ الْمُمْتَنِعُ الْمُتَوَحِّشُ فِىْ اَصْلِ الْخِلْقَةِ وَاسْتَثْنٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْسَ الْفَوَاسِقَ وَهِىَ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالذِّئْبُ وَالْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ فَاِنَّهَا مُبْتَدِيَاتٌ بِالْاَذٰى وَالْمُرَادُ بِهِ الْغُرَابُ الَّذِىْ يَاْكُلُ الْجِيَفَ هُوَ الْمَرْوِىُّ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) -

অনুচ্ছেদ : শিকার করা

অনুবাদ : লক্ষণীয় যে, স্থলের শিকার মুহরিমের জন্য হারাম এবং সমুদ্রের [পানির] শিকার হালাল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ الخ 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার [তা ভক্ষণ] হালাল করা হয়েছে। আয়াতের শেষ পর্যন্ত।' স্থলের শিকার হলো ঐ সব প্রাণী যেগুলোর জন্ম ও বাস-স্থলে হয়। আর সমুদ্রের শিকার হলো ঐ সব প্রাণী যেগুলোর জন্ম ও বাস পানিতে হয়। আর শিকার অর্থ– আত্মরক্ষাকারী ও জন্মগতভাবে বন্যপ্রাণী। পাঁচটি দুষ্ট প্রাণীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। সেগুলো হলো দংশনকারী কুকুর, নেকড়ে, চিল, কাক ও সাপ এবং বিচ্ছু। কেননা, এগুলো নিজে থেকেই প্রথমে আক্রমণ করে। আর কাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে কাক মৃতদেহ খায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্থলের শিকার মুহরিমের জন্য হারাম-তার মালিকানাধীন হোক বা বৈধ হোক, তার গোশত খাওয়া জায়েজ হোক বা না হোক। আর সমুদ্র তথা পানির শিকার তার জন্য হালাল।

দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তা ভক্ষণ করাও হালাল করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তা তোমাদের ভোগের জন্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, স্থলের শিকার হলো ঐ সব প্রাণী যেগুলোর জন্ম ও বাস স্থলে হয়, আর সমুদ্রের শিকার হলো– যেসব প্রাণীর জন্ম ও বাস পানিতে হয়। আর শিকার হলো ঐ সব জন্তু যেগুলো আত্মরক্ষাকারী ও জন্মগতভাবে বন্যপ্রাণী।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, স্থলের কোনো জন্তুকে হত্যা করা মুহরিমের জন্য হারাম। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি ঔদ্ধত প্রকৃতির প্রাণীকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন। সেগুলো হলো– ১. দংশনকারী কুকুর ২. নেকড়ে ৩. চিল ৪. কাক ৫. বিচ্ছু।

হাদীসে فَوَاسِقُ শব্দ এসেছে। এটি فَاسِقَةٌ-এর বহুবচন। যেহেতু এ প্রাণীগুলো দুষ্ট ও ঔদ্ধত্য প্রকৃতির, তাই এগুলোর নাম فَاسِقٌ রাখা হয়েছে। হাদীসে পাঁচটির কথা এসেছে। হিদায়া গ্রন্থকার ছয়টি গণনা করেছেন। এর জবাবে বলা হয় যে, হাদীসে নেকড়েকে দংশনকারী কুকুরের সাথে একত্রে বলা হয়েছে। সুতরাং পাঁচটির গণনা যথার্থ। দ্বিতীয়ত হাদীসে কোনো সংখ্যা উল্লেখ করা এ কথার বিপরীত নয় যে, তদপেক্ষা বেশি হবে না। যেমন– কোনো কোনো হাদীসে ইঁদুর ও বাঘ হত্যা করার অনুমতিও রয়েছে। যাহোক, এসব জন্তুকে হত্যা করার অনুমতি দেওয়ার কারণ হলো, এগুলো নিজে থেকেই প্রথমে আক্রমণ করে।

হাদীসে কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্য, যা নাপাকী ও মৃতদেহ খায়। যে কাক খাদ্যশস্য খায় তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এ কথাই বর্ণিত রয়েছে।

قَالَ وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ أَمَّا الْقَتْلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ اَلْاٰيَةَ نَصٌّ عَلٰى إِيْجَابِ الْجَزَاءِ وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَفِيْهَا خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح) هُوَ يَقُوْلُ الْجَزَاءُ تَعَلَّقَ بِالْقَتْلِ وَالدَّلَالَةُ لَيْسَتْ بِقَتْلٍ فَاَشْبَهَ دَلَالَةَ الْحَلَالِ حَلَالًا وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ قَتَادَةَ (رض) وَقَالَ عَطَاءٌ (رح) أَجْمَعَ النَّاسُ عَلٰى أَنَّ عَلَى الدَّالِّ الْجَزَاءَ وَلِأَنَّ الدَّلَالَةَ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ وَلِأَنَّهُ تَفْوِيْتُ الْأَمْنِ عَلَى الصَّيْدِ إِذْ هُوَ آمِنٌ بِتَوَحُّشِهِ وَتَوَارِيْهِ فَصَارَ كَالْإِتْلَافِ وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ بِإِحْرَامِهِ الْتَزَمَ الْإِمْتِنَاعَ عَنِ التَّعَرُّضِ فَيَضْمَنُ بِتَرْكِ مَا الْتَزَمَهُ كَالْمُوْدَعِ بِخِلَافِ الْحَلَالِ لِأَنَّهُ لَا اِلْتِزَامَ مِنْ جِهَتِهِ عَلٰى أَنَّ فِيْهِ الْجَزَاءَ عَلٰى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ وَ زُفَرَ (رح) وَالدَّلَالَةُ الْمُوْجِبَةُ لِلْجَزَاءِ أَنْ لَا يَكُوْنَ الْمَدْلُوْلُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْدِ وَأَنْ يُصَدِّقَهُ فِي الدَّلَالَةِ حَتّٰى لَوْ كَذَّبَهُ وَصَدَّقَ غَيْرَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَذِّبِ وَلَوْ كَانَ الدَّالُّ حَلَالًا فِي الْحَرَمِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুহ্‌রিম যদি কোনো শিকার হত্যা করে কিংবা যে হত্যা করবে তাকে নির্দেশনা দেয়, তাহলে তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে। হত্যা করার ক্ষেত্রে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ اَلْاٰيَةَ 'তোমরা শিকার হত্যা করো না। আর তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করল, তার উপর দণ্ড ওয়াজিব।' এ আয়াতে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। শিকারের দিকে নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, দণ্ডের সম্পর্ক হত্যার সাথে। আর শিকারের দিকে নির্দেশনা দেওয়া হত্যা করা নয়। সুতরাং তা হালাল ব্যক্তি হালাল ব্যক্তিকে শিকার দেখিয়ে দেওয়ার সদৃশ হলো। আমাদের দলিল হলো, হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর আতা (র.) বলেন, এ বিষয়ে লোকদের ইজমা রয়েছে যে, শিকার যে দেখিয়ে দেবে তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে। তা ছাড়া এজন্য যে, শিকারের নির্দেশনা দেওয়া ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এতে শিকারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কারণ, সে তার বন্যতা ও আত্মগোপনের দ্বারা নিরাপদ ছিল। সুতরাং দেখিয়ে দেওয়া হত্যা করার মতোই হলো। তা ছাড়া মুহ্‌রিম তার ইহ্‌রামের মাধ্যমে শিকারের সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকা নিজের উপর অনিবার্য করে নিয়েছে। সুতরাং অনিবার্যকৃত দায়িত্ব বর্জন করার কারণে ক্ষতিপূরণ দেবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে হালাল ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার পক্ষ থেকে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। অধিকন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হালাল ব্যক্তির উপরও দণ্ড ওয়াজিব হবে। বাতলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার শর্ত এই যে, যাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো সে শিকারের অবস্থান সম্পর্কে অনবহিত ছিল। আর দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাকে সে বিশ্বাস করেছে। সুতরাং যদি সে তাকে মিথ্যা মনে করে এবং অন্যাকে বিশ্বাস করে, তাহলে যাকে মিথ্যা মনে করা হলো তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর যদি নির্দেশনাকারী হালাল ব্যক্তি হারামেরও হয়, তবুও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ হলো আমরা যা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহরিম যদি শিকার হত্যা করে কিংবা হত্যাকারীকে বলে দেয় যেমন– মুহরিম বলে দিল, অমুক স্থানে শিকার রয়েছে আর নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্দেশনা মতো হত্যা করল, তাহলে এ দু ক্ষেত্রেই মুহরিমের উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে। হত্যা করার ক্ষেত্রে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ .

'তোমরা শিকার হত্যা করো না। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করল, তার উপর নিহত শিকারের অনুরূপ চতুষ্পদ প্রাণীর দণ্ড ওয়াজিব।'

শিকার বাতলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চারটি সুরত পাওয়া যায়। যেমন–

১. নির্দেশনাকারী ও নির্দেশনাপ্রাপ্ত উভয়ে হালাল হবে।

২. কিংবা উভয়ে মুহ্‌রিম হবে।

৩. নির্দেশনাকারী হালাল, কিন্তু নির্দেশনাপ্রাপ্ত মুহ্‌রিম।

৪. নির্দেশনাকারী মুহ্‌রিম, কিন্তু নির্দেশনাপ্রাপ্ত হালাল।

প্রথম সুরতটি আমাদের আলোচনা বহির্ভূত। দ্বিতীয় সুরতে তাদের প্রত্যেকের উপর পূর্ণ দণ্ড ওয়াজিব হবে। তৃতীয় সুরতে নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে– নির্দেশনাকারীর উপর নয়। আর চতুর্থ সুরতে নির্দেশনাকারীর উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে, নির্দেশনাপ্রাপ্তের উপর নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নির্দেশনাকারীর উপর কখনোই দণ্ড আসবে না। ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ থেকে বুঝা যায় যে, দণ্ডের সম্পর্ক হত্যার সাথে। আর শিকারের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হত্যা করা নয়। এজন্যই নির্দেশনা দেওয়ার কারণে নির্দেশনাকারীর উপর কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না। সুতরাং এটা হালাল ব্যক্তি হালাল ব্যক্তিকে শিকার দেখিয়ে দেওয়ার সদৃশ হলো। আর নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিকারকে হত্যা করল– এর দ্বারা যে দেখিয়ে দিল তার উপর কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না; বরং হারামের মধ্যে শিকার হত্যা করার কারণে নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে নির্দেশনাকারী যদি মুহ্‌রিম হয়, তাহলে তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল হলো, হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর হাদীস, যা ইহ্‌রাম অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। বুঝার সহজার্থে হাদীসটি পুনঃ উল্লেখ করা হলো–

إِنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ حَلَالٌ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ دَلَلْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ فَقَالُوا لَا فَقَالَ إِذًا فَكُلُوا -

হাদীসের অনুবাদ ও বিশ্লেষণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নিন।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিজ্ঞ শাগরিদ হযরত 'আতা ইবনে রাবাহ বলেন, লোকদের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, হারামের শিকার যে দেখিয়ে দেবে, তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে। ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, কোনো সাহাবী থেকে এর বিপরীত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, যে দেখিয়ে দেয় তার উপর দণ্ড ওয়াজিব।

তবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত– لَيْسَ عَلَى الدَّالِّ الْجَزَاءُ অর্থাৎ 'নির্দেশনাকারীর উপর কোনো দণ্ড নেই।' এর জবাব হলো– এ দ্বারা তা সাব্যস্ত হয় না। আর যদি মেনেও নেই, তাহলে এর ব্যাখ্যায় বলা হবে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার মর্মার্থ হলো নির্দেশনাকারী বলে দেওয়া সত্ত্বেও যদি নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিকারকে হত্যা না করে, তাহলে

নির্দেশনাকারীর উপর কোনো দণ্ড আসবে না। আমরাও তো এ কথা বলে থাকি। নির্দেশনাকারীর উপর দণ্ড সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব হবে তখনই যখন সেই নির্দেশনা মতো নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ প্রাণীকে হত্যা করবে।

তৃতীয় দলিল হলো, শিকার দেখিয়ে দেওয়া ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ নিষিদ্ধ কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যকভাবে দণ্ড ওয়াজিব করবে।

চতুর্থ দলিল হলো, শিকার দেখিয়ে দেওয়ার দ্বারা শিকারের নিরাপত্তা দূর হয়ে যায়। কেননা, সে তার বন্যতা ও মানুষের থেকে আত্মগোপনের মাধ্যমে নিরাপদ ছিল– দেখিয়ে দেওয়ার দ্বারা তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। কাজেই তা হত্যা করার মতোই হলো। আর হত্যা করার দ্বারা যেহেতু দণ্ড ওয়াজিব হয়, তাই দেখিয়ে দেওয়ার দ্বারাও দণ্ড ওয়াজিব হবে।

পঞ্চম দলিল হলো, মুহ্‌রিম তার ইহ্‌রামের মাধ্যমে শিকারের সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকা নিজের উপর অনিবার্য করে নিয়েছে। কিন্তু শিকারকে দেখিয়ে দেওয়ার কারণে তার অনিবার্যকৃত দায়িত্ব সে বর্জন করল বিধায় তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে– ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার নিকটে অন্যের সম্পদ আমানত রাখা হয়েছে। আর সে এ সম্পদের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের উপর অনিবার্য করে নিয়েছে। এখন সে যদি সংরক্ষণ না করে আর সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে এ সম্পদের জরিমানা দেবে।

তবে হালাল ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তার পক্ষ থেকে তো কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এ কারণে শিকার দেখিয়ে দেওয়ার দ্বারা তার উপর কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না। তদুপরি ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি হারামের শিকার দেখিয়ে দেয়, তাহলে তার উপরও দণ্ড ওয়াজিব হবে। এ বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হালাল ব্যক্তির উপর কিয়াস করেছেন, তা শুদ্ধ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বলে দেওয়ার ক্ষেত্রে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো, যাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সে শিকারের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। যদি সে শিকারের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, তাহলে নির্দেশনাকারীর উপর কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয় শর্ত হলো, যাকে শিকার দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সে নির্দেশনাকারীকে বিশ্বাস করেছে। যদি সে তাকে অবিশ্বাস করে এবং অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে অবিশ্বাস করা হলো তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তি যদি মুহ্‌রিম হয়, তাহলে তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে। নির্দেশনাকারী ব্যক্তি যদি হারামের মধ্যে হালাল অবস্থায় থাকে, তাহলে তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে না। এর দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার পক্ষ থেকে কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

وَسَوَاءٌ فِى ذٰلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِى لِاَنَّهُ ضِمَانٌ يَعْتَمِدُ وُجُوبُهُ الْاِتْلَافَ فَاَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْاَمْوَالِ وَالْمُبْتَدِئُ وَالْعَائِدُ سَوَاءٌ لِاَنَّ الْمُوجِبَ لَا يَخْتَلِفُ وَالْجَزَاءُ عِنْدَ اَبِى حَنِيفَةَ (رح) وَاَبِى يُوسُفَ (رح) اَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ فِى الْمَكَانِ الَّذِى قُتِلَ فِيهِ اَوْ فِى اَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ اِذَا كَانَ فِى بَرٍّ فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ فِى الْفِدَاءِ اِنْ شَاءَ اِبْتَاعَ بِهَا هَدْيًا وَ ذَبَحَهُ اِنْ بَلَغَتْ هَدْيًا وَاِنْ شَاءَ اِشْتَرٰى بِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ عَلٰى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيرٍ وَاِنْ شَاءَ صَامَ عَلٰى مَا نَذْكُرُ .

অনুবাদ : দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখিয়ে দেওয়া আর ভুলে দেখিয়ে দেওয়া সমান। কেননা, এ ক্ষতিপূরণের ভিত্তি হলো প্রাণনাশ করা; সুতরাং এটা ধন-সম্পদ নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ সদৃশ হলো। আর প্রথমবার অন্যায়কারী ও পুনর্বার অন্যায়কারীর হুকুম অভিন্ন। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার কারণ অভিন্ন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, যে স্থানে শিকার হত্যা করা হয়েছে সে স্থানে কিংবা তার নিকটতম স্থানে শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং দু-জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণ করবেন। অতঃপর ফিদ্ইয়া আদায় করার ব্যাপারটি শিকারির উপর ন্যস্ত। যদি উক্ত প্রাণীর মূল্য একটি হাদী ক্রয় করার সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে ইচ্ছা করলে উক্ত মূল্য দ্বারা একটি হাদী ক্রয় করে জবাই করবে কিংবা ইচ্ছা করলে উক্ত মূল্য দ্বারা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যব সদকা করবে। আর চাইলে রোজা রাখবে– সামনে আমরা যা বর্ণনা করব তার ভিত্তিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِى ذٰلِكَ الْعَامِدُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী ও অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী, অনুরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে যে শিকার দেখিয়ে দেয় কিংবা ভুলে দেখিয়ে দেয়– সকলেই দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। অর্থাৎ যেভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করার কারণে কিংবা ইচ্ছা করে শিকার দেখিয়ে দেওয়ার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ ভুলকারীর উপরও দণ্ড ওয়াজিব হবে। কেননা, এটি এমন ক্ষতিপূরণ, যার ভিত্তি হলো প্রাণনাশ করা। অর্থাৎ হত্যা করার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হয়। আর এটা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় ক্ষেত্রে পাওয়া যায় বলে উভয় ক্ষেত্রেই দণ্ড ওয়াজিব হবে। অতএব এটা মাল নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ সদৃশ হলো। অর্থাৎ যদি কারো মাল ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে নষ্ট করা হয়, তাহলে উভয় অবস্থায়ই ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব তার সদৃশ হয়েছে। প্রথমবার শিকার বধকারী আর দ্বিতীয়বার শিকার বধকারীর হুকুম অভিন্ন। অর্থাৎ উভয়ের উপরই দণ্ড ওয়াজিব হবে। কেননা, উভয় অবস্থাতেই দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কারণ অভিন্ন।

قَوْلُهُ وَالْجَزَاءُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শিকারের দণ্ড হলো, যদি জঙ্গলে শিকার করা হয়, তাহলে সেখানে দু জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করবেন। যদি সেখানে শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য না পাওয়া যায়, তাহলে তার নিকটতম স্থানে গিয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হবে। মূল্য নির্ধারিত হয়ে গেলে শিকারি ইচ্ছা করলে উক্ত মূল্য দ্বারা একটি হাদী ক্রয় করে জবাই করবে এবং হারামের মিসকিনদের মধ্যে এর গোশত বণ্টন করে দেবে– যখন উক্ত প্রাণীর মূল্য একটি হাদী ক্রয় করার সমপরিমাণ হয়ে যায়। কিংবা ইচ্ছা করলে উক্ত মূল্য দ্বারা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিনকে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ সদকা করবে। অর্থাৎ গম হলে প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা' গম কিংবা খেজুর বা যব হলে এক সা' করে সদকা করবে। আবার ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মিসকিনকে খাওয়ানোর পরিবর্তে রোজাও রাখতে পারে। পরবর্তীতে এর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হবে।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) تَجِبُ فِي الصَّيْدِ النَّظِيْرُ فِيْمَا لَهُ نَظِيْرٌ فَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَفِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَفِي الْاَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي الْيَرْبُوْعِ جَفْرَةٌ وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِيْ حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَمِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ مَا يَشْبَهُ الْمَقْتُوْلَ صُوْرَةً لِاَنَّ الْقِيْمَةَ لَا تَكُوْنُ نَعَمًا وَالصَّحَابَةُ اَوْجَبُوا النَّظِيْرَ مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةِ وَالْمَنْظَرِ وَفِي النَّعَامَةِ وَالظَّبْيِ وَحِمَارِ الْوَحْشِ وَالْاَرْنَبِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيْهِ الشَّاةُ وَمَا لَيْسَ لَهُ نَظِيْرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) تَجِبُ الْقِيْمَةُ مِثْلُ الْعُصْفُوْرِ وَالْحَمَامِ وَاَشْبَاهُهُمَا وَاِذَا وَجَبَتِ الْقِيْمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمَا وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يُوْجِبُ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَيُثْبِتُ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعِبُّ وَيَهْدُرُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও শাফেয়ী (র.) বলেন, শিকারকৃত জন্তুর গঠনের সমতুল্য জন্তু দণ্ডরূপে ওয়াজিব হবে– সমতুল্য গঠনের জন্তু পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে। সুতরাং হরিণের ক্ষেত্রে বকরি, হায়েনার ক্ষেত্রে বকরি, খরগোশের ক্ষেত্রে এক বছরের মেষ শাবক, বন্য ইঁদুরের ক্ষেত্রে চার মাসের মেষ শাবক, উটপাখির ক্ষেত্রে উট এবং বন্যগাধার ক্ষেত্রে গাভী ওয়াজিব হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ 'যে প্রাণী হত্যা করা হয়েছে, তার সমতুল্য প্রাণী দণ্ডরূপে ওয়াজিব হবে।' আর শিকারের অনুরূপ প্রাণী বলে বিবেচিত হবে তা-ই, যা দৃশ্যত হত্যাকৃত প্রাণীর সদৃশ। কেননা, মূল্য نَعَمٌ [চতুষ্পদ প্রাণী] নয়। আর সাহাবায়ে কেরাম সৃষ্টিগত দিক থেকে সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন। আর উটপাখি, হরিণ, বন্যগাধা ও খরগোশের সদৃশ প্রাণী সেগুলো যেগুলো আমরা বর্ণনা করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হায়েনা একটি শিকার এবং তার ক্ষেত্রে বকরি ওয়াজিব হবে। আর যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল্য ওয়াজিব হবে। যেমন– চড়ুইপাখি, কবুতর ইত্যাদি। আর যখন মূল্য ওয়াজিব হবে তখন তাঁর অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) কবুতরের ক্ষেত্রে বকরি ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেন। আর উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য প্রমাণ করেন এভাবে যে, উভয়ের প্রতিটি লম্বা চুমুকে পানি পান করে এবং প্রায় অভিন্ন রকম শব্দ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে শিকারকৃত জন্তুর দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– তাঁরা বলেন, যে-সকল প্রাণীর সমতুল্য গঠনের জন্তু রয়েছে, সেক্ষেত্রে সমতুল্য জন্তু দণ্ডরূপে ওয়াজিব হবে। সুতরাং হরিণের ক্ষেত্রে বকরি ওয়াজিব হবে। হায়েনার ক্ষেত্রেও বকরি ওয়াজিব হবে। খরগোশের ক্ষেত্রে এক বছর বয়স্ক মেষ শাবক, বন্য ইঁদুরের ক্ষেত্রে চারমাস বয়স্ক মেষ শাবক, উটপাখির ক্ষেত্রে উট এবং বন্যগাধার ক্ষেত্রে গাভী ওয়াজিব হবে। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ অর্থাৎ 'যে প্রাণী হত্যা করা হয়েছে, তার সমতুল্য প্রাণী দণ্ডরূপে ওয়াজিব হবে।' আর শিকারকৃত জন্তুর সমতুল্য প্রাণী সেটাই হবে যেটা আকৃতিগতভাবে হত্যাকৃত প্রাণীর সদৃশ। কেননা, মূল্যকে তো আর نَعَمٌ [চতুষ্পদ প্রাণী] বলা যায় না। এজন্যই মূল্য ওয়াজিব হবে না; বরং হত্যাকৃত শিকারের সমতুল্য প্রাণী ওয়াজিব হবে। আর হযরত ওমর (রা.), আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকেও উটপাখি, হরিণ, বন্যগাধা ও খরগোশের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত আকৃতিগত সমতুল্য প্রাণী দণ্ডরূপে ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হায়েনা একটি শিকার এবং তার ক্ষেত্রে বকরি ওয়াজিব হবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি শিকারকৃত জন্তুর মূল্যই উদ্দেশ্য হতো যেমনটি শায়খাইনের মাযহাব, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সমতুল্য প্রাণী ওয়াজিব করতেন না। উক্ত উভয় দলিল থেকে স্পষ্ট হয় যে, শিকারকৃত জন্তুর দণ্ড মূল্য নয়; বরং তার দণ্ড হলো আকৃতিগত দিক থেকে সমতুল্য প্রাণী।

তবে যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল্য ওয়াজিব হবে। যেমন– চড়ুইপাখি, কবুতর এবং অনুরূপ প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই। আর এসব প্রাণীর ক্ষেত্রে যখন মূল্য ওয়াজিব হবে, তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) কবুতরের ক্ষেত্রে বকরি ওয়াজিব হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আর উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য প্রমাণ করেন এ দিক থেকে যে, উভয়ের প্রত্যেকটি সাধারণ প্রাণীর বিপরীত লম্বা চুমুকে পানি পান করে এবং প্রায় অভিন্ন রকম শব্দ করে।

وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّ الْمِثْلَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْمِثْلُ صُوْرَةً وَمَعْنًى وَلَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمِثْلِ مَعْنًى لِكَوْنِهِ مَعْهُوْدًا فِي الشَّرْعِ كَمَا فِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ أَوْ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعْمِيْمِ وَفِيْ ضِدِّهِ التَّخْصِيْصُ وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءٌ قِيْمَةِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الْوَحْشِ وَاسْمُ النَّعَمِ يُطْلَقُ عَلَى الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ كَذَا قَالَهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ وَالْأَصْمَعِيُّ وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ التَّقْدِيْرُ بِهِ دُوْنَ إِيْجَابِ الْمُعَيَّنِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, নিঃশর্ত সমতুল্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আকৃতিগতভাবে এবং গুণগতভাবে সমতুল্য হওয়া। আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু আকৃতিগত সমতুল্য পাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু সমতুল্যই গ্রহণ করা হবে। কেননা, শরিয়তে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যেমন– বান্দার হকের ক্ষেত্রে। কিংবা এ কারণে যে, সর্বসম্মতভাবে গুণগত সমতুল্যতার অর্থ উদ্দেশ্য। কিংবা এ কারণে যে, গুণগত সমতুল্যতার মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে। আর বিপরীত ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা রয়েছে। আর নসের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, দণ্ড হলো যে বন্যপ্রাণী হত্যা করা হয়েছে তার মূল্য। আল্লাহই অধিক অবগত। আর نَعَمْ শব্দটি বন্য ও গৃহপালিত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আবূ উবায়দ ও আসমাঈ এরূপই বলেছেন। আর বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য মূল্য নিরূপণ করা, নির্দিষ্ট প্রাণী সাব্যস্ত করা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খাইনের দলিল হলো– فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এখানে مِثْل শব্দটি হলো مُطْلَقْ আর مُطْلَقْ নিঃশর্ত সমতুল্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য আকৃতিগতভাবে ও গুণগতভাবে সমতুল্য হওয়া। কিন্তু আয়াতে আকৃতিগত সমতুল্য উদ্দেশ্য নয়। কেননা, চড়ুই ও কবুতরের মতো যেসব প্রাণীর আকৃতিগত সমতুল্য পাওয়া যায় না, তা আয়াতের হুকুমের অন্তর্গত হবে না। অথচ আয়াতটি সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং আয়াতে مِثْل শব্দটি দ্বারা গুণগত সমতুল্য অর্থ উদ্দেশ্য। আর গুণগত সমতুল্য হলো জন্তুটির মূল্য। নিম্নোক্ত কারণে এ অর্থ প্রযোজ্য। প্রথমত শরিয়তে গুণগত সমতুল্যতার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যেমন– হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে, কেউ কারো কাপড় নষ্ট করে ফেলল, তখন নষ্টকারীর উপর কাপড়ের মূল্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সর্বসম্মতিক্রমে গুণগত সমতুল্যতার অর্থ উদ্দেশ্য। এমনকি ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রেও মূল্য ওয়াজিব বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সুতরাং যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই সেক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গুণগত সমতুল্য তথা মূল্য ওয়াজিব হবে। এখন যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী আছে– সেক্ষেত্রে যদি আকৃতিগত সমতুল্য ওয়াজিব হয়, তাহলে عُمُوْم مُشْتَرَكْ কিংবা প্রকৃত ও রূপকার্থকে একত্র করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, مِثْل-এর প্রকৃত অর্থ যদি আকৃতিগত ও গুণগত সমতুল্য হয়, তাহলে عُمُوْم مُشْتَرَكْ লাযেম আসে। আর যদি مِثْل-এর প্রকৃত অর্থ আকৃতিগত সমতুল্য এবং রূপক অর্থ গুণগত সমতুল্য হয়, তাহলে مَجَازْ ও حَقِيْقَة -কে একত্র করা লাযেম আসে। অথচ جَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ ও عُمُوْم مُشْتَرَكْ উভয়টিই অগ্রহণযোগ্য। এজন্য বর্ণিত আয়াতে مِثْل দ্বারা শুধু গুণগত সমতুল্য তথা মূল্য উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত গুণগত সমতুল্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা রয়েছে। কেননা, এ ক্ষেত্রে যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী আছে আর যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই– এ উভয় ধরনের প্রাণীকে আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে আকৃতিগত সমতুল্যতার ক্ষেত্রে শুধু ঐ সকল প্রাণী আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়– যেগুলোর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী আছে। আর যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই সেগুলো আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং ব্যাপকতার উপর আমল করা উত্তম। কেননা, এ ক্ষেত্রে আয়াতের উপকারিতা ব্যাপক বলে গণ্য হয়।

وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের মোদ্দাকথা হলো, نَعَمْ শব্দটি বন্য ও গৃহপালিত উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনটি অভিধান বিশারদ আবূ উবায়দা ও আসমাঈ বলেছেন, বর্ণিত আয়াতে مِثْل দ্বারা মূল্য উদ্দেশ্য এবং তা مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ -এর ব্যাখ্যা। আর نَعَمْ দ্বারা বন্যপ্রাণী উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের যথার্থ অনুবাদ হবে– শিকারের দণ্ড হলো হত্যাকৃত বন্যপ্রাণীর মূল্য। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَلضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيْهِ شَاةٌ -এর উদ্দেশ্য হলো, হায়েনার মূল্য নির্ধারিত হবে বকরির মূল্য অনুযায়ী। হায়েনা হত্যা করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে বকরি ওয়াজিব হওয়া বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। আর সাহাবায়ে কেরাম আকৃতিগত দিক থেকে যে সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন– তার জবাবও এটিই। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নির্দিষ্ট করে উটপাখির ক্ষেত্রে তার সমতুল্য ওয়াজিব করেননি; বরং তাদের কথার মর্মার্থ হলো–তার সমতুল্য প্রাণী দেখে মূল্য নির্ধারণ করে নেওয়া।

ثُمَّ الْخِيَارُ إِلَى الْقَاتِلِ فِيْ أَنْ يَجْعَلَهُ هَدْيًا أَوْ طَعَامًا أَوْ صَوْمًا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْخِيَارُ إِلَى الْحَكَمَيْنِ فِيْ ذٰلِكَ فَإِنْ حَكَمَا بِالْهَدْيِ يَجِبُ النَّظِيْرُ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ حَكَمَا بِالطَّعَامِ أَوْ بِالصِّيَامِ فَعَلٰى مَا قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَأَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَهُمَا أَنَّ التَّخْيِيْرَ شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُوْنُ الْخِيَارُ إِلَيْهِ كَمَا فِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَلِمُحَمَّدٍ (رحـ) وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) قَوْلُهُ تَعَالٰى يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا (اَلْاٰيَةُ) ذُكِرَ الْهَدْيُ مَنْصُوْبًا لِأَنَّهُ تَفْسِيْرٌ لِقَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ أَوْ مَفْعُوْلٌ لِحُكْمِ الْحَكَمِ ثُمَّ ذُكِرَ الطَّعَامُ وَالصِّيَامُ بِكَلِمَةِ أَوْ فَيَكُوْنُ الْخِيَارُ إِلَيْهِمَا قُلْنَا اَلْكَفَّارَةُ عُطِفَتْ عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى الْهَدْيِ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ مَرْفُوْعٌ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالٰى أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا مَرْفُوْعٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا دَلَالَةُ اِخْتِيَارِ الْحَكَمَيْنِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا فِيْ تَقْوِيْمِ الْمُتْلَفِ ثُمَّ الْإِخْتِيَارُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلٰى مَنْ عَلَيْهِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মূল্যকে হাদী কিংবা খাদ্য সামগ্রী অথবা রোজা হিসেবে সাব্যস্ত করার এখতিয়ার হলো হত্যাকারীর। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ বিষয়ে এখতিয়ার হলো ন্যায়পরায়ণ বিচারকদ্বয়ের। যদি তারা হাদী-এর ফয়সালা করেন, তাহলে আকৃতিগত সমতুল্য প্রাণী ওয়াজিব হবে। যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর যদি তাঁরা খাদ্যসামগ্রী বা রোজার ফয়সালা করেন, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) যেমন বলেছেন। শায়খাইনের দলিল হলো– এখতিয়ার প্রদানের বিষয়টি শরিয়তে অনুমোদিত হয়েছে দায়গ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহজতার জন্য। সুতরাং তার হাতেই এখতিয়ার থাকা উচিত। যেমন– কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে হয়। আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا الخ অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্য হতে দু জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ফয়সালা করবে।' [এ আয়াতে] هَدْيًا শব্দটিকে مَنْصُوْب রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, তা আয়াতের يَحْكُمُ بِهِ -এর ব্যাখ্যারূপে কিংবা বিচারকের বিচার ক্রিয়ার مَفْعُوْل রূপে এসেছে। অতঃপর أَوْ অব্যয় দ্বারা খাদ্য সদকা কিংবা রোজা পালনের বিষয় দুটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এখতিয়ারের বিষয়টি বিচারকদ্বয়ের হাতেই থাকবে। আমরা বলি, كَفَّارَة শব্দটিকে عَطْف করা হয়েছে جَزَاء -এর উপর, هَدْي -এর উপর নয়। দলিল হলো, جَزَاء শব্দটি مَرْفُوْع হয়েছে। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا -এর عَدْل শব্দটি مَرْفُوْع হয়েছে। সুতরাং এ দুটিতে বিচারকদ্বয়ের এখতিয়ারের কোনো প্রমাণ নেই; বরং বিচারকদ্বয়ের শরণাপন্ন হতে হবে শুধু হত্যাকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণের জন্য। অতঃপর এখতিয়ার থাকবে ঐ ব্যক্তির হাতে, যার উপর জাযা ওয়াজিব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, দু জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যখন হত্যাকৃত শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন, তখন ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শিকারি ইচ্ছা করলে এ মূল্য দিয়ে কোনো হাদী ক্রয় করত জবাই করে হারামের মিসকিনের মাঝে বণ্টন করবে কিংবা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিনকে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ দেবে অথবা একটি সদকায়ে ফিতর পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে একটি করে রোজা রাখবে। অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী ২০ টি সদকার পরিমাণ হলে ২০ টি রোজা রাখবে। ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.) বলেন, এ বিষয়ে এখতিয়ার হলো ন্যায়পরায়ণ বিচারকদ্বয়ের, যারা হত্যাকৃত শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা যদি হাদী-এর ফয়সালা করেন, তাহলে শিকারীর উপর আকৃতিগত সমতুল্য প্রাণী ওয়াজিব হবে। যেমন– উটপাখির ক্ষেত্রে উট, হরিণের ক্ষেত্রে বকরি জবাই করবে। আর যদি তারা খাদ্যসামগ্রী কিংবা রোজার ফয়সালা করেন, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) যেমন বলেছেন– অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী খরিদ করত প্রত্যেক মিসকিনকে এক সদকা পরিমাণ দান করবে; আর রোজার ক্ষেত্রে একটি সদকায়ে ফিতর পরিমাণ খাদ্যশস্যের পরিবর্তে একটি করে রোজা রাখবে। তবে লক্ষণীয় হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হত্যাকৃত শিকারের মূল্য ধর্তব্য। আর ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে আকৃতিগত সমতুল্য প্রাণীর মূল্য ধর্তব্য।

যাহোক, শায়খাইনের দলিল হলো– খাদ্য সামগ্রী, হাদী কিংবা রোজা– এ তিনটির কোনো একটির এখতিয়ার প্রদানের বিষয়টি দায়গ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহজতার জন্য অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং শিকারির হাতেই এই এখতিয়ার থাকবে। যেমন– কসমের কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে যে কসম করে, তার এখতিয়ার থাকে– খানা খাওয়ানো কিংবা কাপড় পরিধান করানো কিংবা গোলাম [ক্রীতদাস] মুক্ত করার ক্ষেত্রে। অদ্রূপ এখানেও শিকারির হাতে এখতিয়ার থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ.

অর্থাৎ 'যে প্রাণী হত্যা করা হয়েছে, তার সমতুল্য প্রাণী জাযারূপে ওয়াজিব হবে। তোমাদের মধ্য হতে দু জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তা ফয়সালা করবে– হাদী যা কা'বা পর্যন্ত উপনীত হবে কিংবা মিসকিনদের খাদ্যরূপে কাফ্‌ফারা কিংবা সেই পরিমাণ রোজা, যাতে সে তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে।' এ আয়াতে هَدْيًا শব্দটিকে مَنْصُوْب রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, তা يَحْكُمُ بِهِ-এর ضَمِيْر مَجْرُوْر-এর ব্যাখ্যা কিংবা يَحْكُمُ ক্রিয়ার مَفْعُوْل। প্রথম অবস্থায় আয়াতের অনুবাদ হবে– দু জন ন্যায়পরায়ণ বিচারক হাদীর ফয়সালা করবে। দ্বিতীয় অবস্থায় আয়াতের অনুবাদ হবে– দু জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হাদীর ফয়সালা করবে। এ দুটি ক্ষেত্রেই হাদী নির্ধারিত করার এখতিয়ারের বিষয়টি বিচারকদ্বয়ের হাতেই থাকবে।

আর أَوْ অব্যয় দ্বারা كَفَّارَة ও عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا هَدْيًا শব্দদ্বয়কে عَطْف করা হয়েছে। আর [আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের] মূলনীতি হলো مَعْطُوْف عَلَيْه-এর যে হুকুম مَعْطُوْف-এরও সেই হুকুম। সুতরাং যখন হাদী নির্ধারণ করার এখতিয়ার দু জন ন্যায়পরায়ণ বিচারকের হাতে, তখন খাদ্যসামগ্রীর কাফফারা কিংবা রোজা রাখার বিষয়টিও তাঁদের হাতেই অর্পিত হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয় যে, বর্ণিত দলিলের ভিত্তি হলো, أَوْ كَفَّارَةٌ ও أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ-এর عَطْف হয়েছে هَدْيًا-এর উপর– বিষয়টি এমন নয়। কেনন, هَدْيًا হলো مَنْصُوْب পক্ষান্তরে أَوْ كَفَّارَةٌ ও أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ হলো مَرْفُوْع, আর إِعْرَاب-এর ভিন্নতার কারণে عَطْف সহীহ হবে না; বরং كَفَّارَةٌ ও عَدْلُ ذٰلِكَ শব্দদ্বয় جَزَاءٌ-এর উপর عَطْف হয়েছে। কেননা, এ ক্ষেত্রে إِعْرَابْ-এর অভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং খাদ্যসামগ্রী সদকা করা কিংবা রোজা রাখার ক্ষেত্রে দু জন ন্যায়পরায়ণ বিচারকের কোনো এখতিয়ার থাকবে না। আর যখন বিষয়টি এরূপই তখন হাদীর ক্ষেত্রেও তাদের কোনো এখতিয়ার থাকবে না। কেননা, কেউই এ কথা বলেন না যে, হাদী নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারকদ্বয়ের এখতিয়ার থাকবে আর খাদ্যসামগ্রী সদকা কিংবা রোজা পালনের ক্ষেত্রে শিকারির এখতিয়ার থাকবে। আর তাই হত্যাকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণের জন্য দু জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে। আর এখতিয়ার থাকবে ঐ ব্যক্তির হাতে, যার উপর শিকারের দণ্ড ওয়াজিব হয়েছে।

وَيُقَوِّمَانِ فِى الْمَكَانِ الَّذِىْ اَصَابَهُ لِاِخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاِخْتِلَافِ الْاَمَاكِنِ فَاِنْ كَانَ الْمَوْضَعُ بَرًّا لَا يُبَاعُ فِيْهِ الصَّيْدُ يُعْتَبَرُ اَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ اِلَيْهِ مِمَّا يُبَاعُ فِيْهِ وَيُشْتَرٰى قَالُوْا وَالْوَاحِدُ يَكْفِىْ وَالْمُثَنّٰى اَوْلٰى لِاَنَّهُ اَحْوَطُ وَاَبْعَدُ عَنِ الْغَلَطِ كَمَا فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَقِيْلَ يُعْتَبَرُ الْمُثَنّٰى هٰهُنَا بِالنَّصِّ وَالْهَدْىُ لَا يُذْبَحُ اِلَّا بِمَكَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَيَجُوْزُ الْاِطْعَامُ فِىْ غَيْرِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رح) هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْهَدْيِ وَالْجَامِعُ التَّوْسِعَةُ عَلٰى سُكَّانِ الْحَرَمِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ الْهَدْىُ قُرْبَةٌ غَيْرُ مَعْقُوْلَةٍ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ وَ زَمَانٍ اَمَّا الصَّدَقَةُ قُرْبَةٌ مَعْقُوْلَةٌ فِىْ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ -

অনুবাদ : যে স্থানে মুহরিম শিকার হত্যা করেছে সেখানে বিচারকদ্বয় মূল্য নির্ধারণ করবেন। কেননা স্থানের ভিন্নতার কারণে মূল্যের পার্থক্য হয়ে থাকে। যদি স্থানটি মরুপ্রান্তর হয়– যেখানে শিকার বেচাকেনা হয় না, তাহলে তার নিকটতম এমন স্থান বিবেচনায় আনা হবে- যেখানে শিকার বেচাকেনা হয়। মাশায়েখে কেরাম বলেন, [মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে] একজন যথেষ্ট, তবে দু'জন হওয়া উত্তম। কেননা তা অধিক সতর্কতাপূর্ণ এবং ভুল হওয়া থেকে অধিক নিরাপদ। যেমন- হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে। আর কেউ কেউ বলেছেন, উপরোল্লিখিত আয়াতের প্রেক্ষিতে এখানে দু'জন হওয়া আবশ্যকরূপে বিবেচিত হবে। 'হাদী' মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও জবাই করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'হাদী যা কা'বায় উপনীত হবে।' আর মিসকিনকে খাদ্য প্রদান মক্কা ছাড়া অন্যত্র জায়েজ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এটাকেও হাদীর উপর কিয়াস করেন। উভয়ের মাঝে এ ব্যাপারে সমন্বয় হলো হারামের অধিবাসীদের জন্য স্বচ্ছলতা বিধান। আর আমরা বলি, হাদী এমন একটি বিশেষ ইবাদত যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং তা স্থান ও কালের সাথে নির্দিষ্ট হবে। আর সদকা হলো সর্ব সময়ে ও সর্বস্থানে বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি ইবাদত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْهَدْىُ لَا يُذْبَحُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শিকারের দণ্ডরূপে যদি 'হাদী' এখতিয়ার করা হয়, তাহলে তা মক্কা ছাড়া অন্যত্র জবাই করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী– هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ আয়াতে কা'বা দ্বারা হুবহু কা'বা নয়; বরং 'হারাম' উদ্দেশ্য। আর যদি শিকারের দণ্ডরূপে মিসকিনকে খাদ্য প্রদান এখতিয়ার করা হয়, তাহলে তা হারাম ও অন্যত্র জায়েজ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও মক্কার গরিব-মিসকিন ছাড়া অন্যত্র দেওয়া জায়েজ নেই। তিনি এটাকেও হাদীর উপর কিয়াস করেছেন। যেভাবে 'হাদী' মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও জবাই করা যাবে না, তদ্রূপ হারাম ছাড়া অন্য ফকির-মিসকিনকেও খাদ্য প্রদান জায়েজ নেই। হাদী ও খাদ্য প্রদানের মাঝে সমন্বয় হলো হারামের অধিবাসীদের জন্য প্রশস্ততা বিধান।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয় যে, হাদী জবাই করা এমন একটি ইবাদত যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং তা কোনো স্থান কিংবা কালের সাথে নির্দিষ্ট হবে। আর সদকা সর্বসময়ে ও সর্বস্থানে বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি ইবাদত। সুতরাং বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো বিষয়কে বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন বিষয়ের উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না।

وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِيْ غَيْرِ مَكَّةَ لِاَنَّهُ قُرْبَةٌ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ فَإِنْ ذَبَحَ بِالْكُوْفَةِ أَجْزَاهُ عَنِ الطَّعَامِ مَعْنَاهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَفِيْهِ وَفَاءٌ بِقِيْمَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَنُوْبُ عَنْهُ وَإِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الْهَدْيِ يَهْدِيْ مَا يُجْزِيْهِ فِي الْأُضْحِيَةِ لِأَنَّ مُطْلَقَ إِسْمِ الْهَدْيِ مُنْصَرِفٌ إِلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يُجْزِئُ صِغَارُ النَّعَمِ فِيْهَا لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَوْجَبُوْا عَنَاقًا وَجَفْرَةً وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) يَجُوْزُ الصِّغَارُ عَلَى وَجْهِ الْإِطْعَامِ يَعْنِيْ إِذَا تَصَدَّقَ .

অনুবাদ : আর রোজা মক্কা ছাড়া অন্যত্রও আদায় করা জায়েজ। কেননা, তা সর্বস্থানেই ইবাদতরূপে অনুমোদিত। যদি [শিকার বধকারী] কূফায় [মক্কা ছাড়া অন্যত্র] জবাই করে, তাহলে তা খাদ্যসামগ্রী প্রদানের বিকল্প হিসেবে জায়েজ হবে। অর্থাৎ যখন এ পরিমাণ গোশত সদকা করে আর তা ওয়াজিব খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের সমপরিমাণ হয়। কেননা, 'জবাই করা' খাদ্যসামগ্রী সদকা করার স্থলবর্তী হয় না। যদি শিকারি হাদী জবাই করা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে কুরবানিরূপে যা যথেষ্ট তা হাদীরূপে জবাই করবে। কেননা, নিঃশর্তভাবে হাদী শব্দটি কুরবানির পশুকেই বুঝায়। ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ছোট পশুও জায়েজ হবে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এক বছরের মেষ শাবক ও চার মাস বয়সের মেষ শাবক ওয়াজিব করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খাদ্যসামগ্রী প্রদান হিসেবে ছোট পশু জায়েজ হবে– যদি তা সদকা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ ذَبَحَ بِالْكُوْفَةِ الخ – মাসআলা : শিকারি যদি হারাম ছাড়া অন্যত্র হাদী জবাই করে, তাহলে আদায় হবে না; বরং তা খাদ্যসামগ্রী প্রদানের বিকল্পরূপে যথেষ্ট হবে। যেন সে শিকারের মূল্য দিয়ে খাদ্যসামগ্রী সদকা করে দিল। এর মর্মার্থ হলো, এ হাদী খাদ্যসামগ্রীর বিকল্পরূপে তখনই জায়েজ হবে যখন এর গোশত মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক মিসকিনের নিকট অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' যব-এর মূল্য পরিমাণ পৌঁছবে। কেননা, 'হাদী' জবাই করার জন্য 'হারাম' শর্ত ছিল।

قَوْلُهُ وَإِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ الخ – মাসআলা হলো, শিকারি যদি দণ্ডের ক্ষতিপূরণ হিসেবে 'হাদী' জবাই করতে চায়, তাহলে যে পশু দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ, তা 'হাদী'রূপে যথেষ্ট হবে। যেমন– পাঁচ বছরের উট, দুই বছরের গরু, এক বছরের বকরি। কেননা, আয়াতে 'হাদী' শব্দটিকে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর নিঃশর্তভাবে 'হাদী' শব্দটি কুরবানির পশুকে বুঝায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, 'হাদী'-এর কুরবানির ক্ষেত্রে ছোট পশুও জবাই করা জায়েজ হবে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এক বছরের বকরির বাচ্চা ও চার মাসের মেষ-শাবক হাদীর কুরবানি রূপে ওয়াজিব করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীর ক্ষেত্রে ছোট পশুও জবাই করা জায়েজ।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খাদ্যসামগ্রী প্রদান হিসেবে ছোট পশু জবাই করা জায়েজ। অর্থাৎ জবাই করত তার গোশত মিসকিনদের মাঝে এমনভাবে বণ্টন করে দেবে, যাতে প্রত্যেকে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' যবের মূল্যের সমপরিমাণ গোশত পায়।

وَاِذَا وَقَعَ الْاِخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ يُقَوَّمُ الْمُتْلَفُ بِالطَّعَامِ عِنْدَنَا لِاَنَّهُ هُوَ الْمَضْمُوْنُ فَيُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ وَاِذَا اشْتَرٰى بِالْقِيْمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلٰى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُطْعِمَ لِمِسْكِيْنٍ اَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ لِاَنَّ الطَّعَامَ الْمَذْكُوْرَ يَنْصَرِفُ اِلٰى مَا هُوَ الْمَعْهُوْدُ فِى الشَّرْعِ .

অনুবাদ : আর যদি শিকারি খাদ্যসামগ্রী সদকা করাকে গ্রহণ করে, তাহলে আমাদের মতে খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে হত্যাকৃত পশুটির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। কেননা, হত্যাকৃত পশুরই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব। সুতরাং তার মূল্যই বিবেচনা করা হবে। আর যখন মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যসামগ্রী খরিদ করবে, তখন প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ-সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যব সদকা করবে। কোনো মিসকিনকে অর্ধ সা'-এর কম খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা জায়েজ নেই। কেননা, আয়াতে উল্লিখিত طَعَامٌ দ্বারা শরিয়তের নির্ধারিত পরিমাণই উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিকারি যদি দণ্ডের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মিসকিনদেরকে খাদ্যসামগ্রী দিতে চায়, তাহলে আমাদের মতে শিকারকৃত পশুটির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। কেননা, হত্যাকৃত পশুরই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব। সুতরাং যার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব তার মূল্যই বিবেচনা করা হবে। আর যখন এ হত্যাকৃত পশুটির মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যসামগ্রী খরিদ করবে, তখন প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যব সদকা করবে। কোনো মিসকিনকে অর্ধ-সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যবের কম সদকা করা জায়েজ নেই। কেননা, আয়াতে উল্লিখিত طَعَامٌ দ্বারা শরিয়তের নির্ধারিত পরিমাণই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' কিংবা যবের ক্ষেত্রে এক সা'। যেমন সদকায়ে ফিতর ও কসমের কাফ্ফারায় এ পরিমাণ নির্দিষ্ট।

وَإِنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ يُقَوِّمُ الْمَقْتُوْلُ طَعَامًا ثُمَّ يَصُوْمُ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ يَوْمًا لِأَنَّ تَقْدِيْرَ الصِّيَامِ بِالْمَقْتُوْلِ غَيْرُ مُمْكِنٍ إِذْ لَا قِيْمَةَ لِلصِّيَامِ فَقَدَّرْنَاهُ بِالطَّعَامِ وَالتَّقْدِيْرُ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ مَعْهُوْدٌ فِى الشَّرْعِ كَمَا فِىْ بَابِ الْفِدْيَةِ فَإِنْ فَضُلَ مِنَ الطَّعَامِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهٖ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا لِأَنَّ الصَّوْمَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ وَكَذٰلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُوْنَ طَعَامِ مِسْكِيْنٍ يُطْعِمُ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَوْ يَصُوْمُ يَوْمًا كَامِلًا لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : আর যদি শিকারি রোজা রাখাকে গ্রহণ করে, তাহলে হত্যাকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণ করবে খাদ্যের মাধ্যমে। অতঃপর প্রত্যেক অর্ধ-সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যবের পরিবর্তে একদিন রোজা রাখবে। কেননা, রোজা দ্বারা হত্যাকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কারণ রোজার কোনো অর্থমূল্য নেই। তাই আমরা খাদ্যসামগ্রীর দ্বারা তার মূল্য নির্ধারণ করেছি। আর এভাবে মূল্য নির্ধারণ করা শরিয়তে প্রচলিত আছে। যেমন– রোজার ফিদইয়ার ক্ষেত্রে যদি অর্ধ সা'-এর কম খাদ্যসামগ্রী অতিরিক্ত হয়, তাহলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে তা সদকা করবে কিংবা তার পরিবর্তে একদিনের রোজা রাখবে। কেননা, একদিনের কম সময়ের রোজা শরিয়তে প্রচলিত নয়। অনুরূপভাবে যদি খাদ্যসামগ্রী একজন মিসকিনের খাদ্য পরিমাণ থেকে কম হয়, তাহলে ওয়াজিব পরিমাণই দান করবে অথবা পূর্ণ একদিন রোজা রাখবে। উপরে আমরা যা বর্ণনা করেছি সে কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : শিকারি যদি দণ্ডের ক্ষতিপূরণ হিসেবে রোজা রাখতে চায়, তাহলে খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে হত্যাকৃত জন্তুটির মূল্য নির্ধারণ করবে। এর একটি সুরত হলো, হত্যাকৃত জন্তুটির মূল্য ধরা যাক এক মণ গম। যদি এরূপ সম্ভব না হয়, তাহলে অনুমান করা হবে– এ শিকারের অর্থ–মূল্য কত হবে ? যেমন এর অর্থ–মূল্য একশ টাকা নির্ধারণ করা হলো। তাহলে এই একশ টাকায় যে পরিমাণ গম, খেজুর কিংবা যব পাওয়া যাবে তার প্রত্যেক অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যবের পরিবর্তে একদিন রোজা রাখবে। কেননা, রোজার কোনো অর্থ-মূল্য নেই। তাই রোজার দ্বারা হত্যাকৃত শিকারের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা খাদ্যসামগ্রীর দ্বারা তার মূল্য নির্ধারণ করেছি। আর এভাবে মূল্য নির্ধারণ করা শরিয়তে প্রচলিত আছে। যেমন– রোজার ফিদ্ইয়ার ক্ষেত্রে অচল বৃদ্ধ প্রত্যেকে রোজার পরিবর্তে অর্ধ সা' গম ফিদ্ইয়া করবে।

আর শেষে যদি অর্ধ সা'-এর কম খাদ্যসামগ্রী বেঁচে যায়, তাহলে সে ইচ্ছা করলে তা সদকা করে দেবে কিংবা চাইলে তার পরিবর্তে একদিনের রোজা রাখবে। কেননা, একদিনের কম সময়ের রোজা শরিয়তসম্মত নয়। অনুরূপভাবে যদি হত্যাকৃত শিকারের মূল্য অর্ধ সা' গমের পরিমাণ থেকে কম হয়, তাহলে সে চাইলে সেটুকুই সদকা করবে, কিংবা চাইলে পূর্ণ একদিন রোজা রাখবে। এর দলিল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিনের কমে রোজা শরিয়তসম্মত নয়।

وَلَوْ جَرَحَ صَيْدًا اَوْ نَتَفَ شَعْرَهُ اَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ اِعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ كَمَا فِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَلَوْ نَتَفَ رِيْشَ طَائِرٍ اَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْاِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيْمَةٌ كَامِلَةٌ لِاَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْاَمْنَ بِتَفْوِيْتِ اٰلَةِ الْاِمْتِنَاعِ فَيَغْرَمُ جَزَاءَهُ ـ

অনুবাদ : মুহরিম যদি কোনো শিকারকে আহত করে কিংবা তার পশম উপড়ে ফেলে কিংবা তার কোনো অঙ্গ কেটে ফেলে, তাহলে এ কারণে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অংশবিশেষকে সমগ্রের উপর কিয়াস করে এ হুকুম আরোপ করা হয়েছে। যেমন– হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়। আর যদি কোনো পাখির পালক উপড়ে ফেলে কিংবা শিকারের হাত-পা কেটে ফেলে যার ফলে সে আত্মরক্ষার অবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর তার পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, সে আত্মরক্ষার উপায় নষ্ট করে দেওয়ার মাধ্যমে সে শিকারের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং তার পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহরিম যদি কোনো শিকারকে আহত করে কিংবা তার পশম উপড়ে ফেলে কিংবা তার কোনো অঙ্গ কেটে ফেলে, তাহলে এ কারণে আর্থিকভাবে তার যে ক্ষতি সাধন হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেমন– শিকারের মূল্য দশ টাকা–কোনো অঙ্গ কেটে ফেলার কারণে এর মূল্য দাঁড়িয়েছে পাঁচ টাকা, তাহলে এ মুহ্‌রিম পাঁচ টাকার ক্ষতিপূরণ দেবে। এখানে অংশবিশেষকে সমগ্রের উপর কিয়াস করা হয়েছে। যেমন হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়। কেউ যদি কারো পূর্ণ ক্ষতি করে, তাহলে তার উপর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনো অংশবিশেষ ক্ষতি করে তাহলে তার উপর সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

আর মুহ্‌রিম যদি কোনো পাখির পালক উপড়ে ফেলে কিংবা কোনো শিকারের হাত-পা কেটে ফেলে এমনকি ঐ পাখি কিংবা শিকার এর ফলে মানুষ থেকে আত্মরক্ষা করতে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে তার উপর তার পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, মুহ্‌রিম তার আত্মরক্ষার উপায় নষ্ট করে দেওয়ার কারণে তার নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। নিরাপত্তা বিনষ্ট করার ফলে যেন তাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। আর কোনো পশু কিংবা পাখিকে বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে হত্যাকৃত জন্তুর পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হয়। এ কারণে তার উপর পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَهٰذَا مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) وَلِأَنَّهُ اَصْلُ الصَّيْدِ وَلَهُ عَرْضِيَّةٌ اَنْ يَصِيْرَ صَيْدًا فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الصَّيْدِ اِحْتِيَاطًا مَا لَمْ يَفْسُدْ فَاِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرْخٌ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَغْرَمَ سِوَى الْبَيْضَةِ لِاَنَّ حَيٰوةَ الْفَرْخِ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ الْبَيْضَ مُعَدٌّ لِيَخْرُجَ مِنْهُ الْفَرْخُ الْحَيُّ وَالْكَسْرُ قَبْلَ اَوَانِهِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ اِحْتِيَاطًا وَعَلٰى هٰذَا اِذَا ضَرَبَ بَطْنَ ظَبْيَةٍ فَاَلْقَتْ جَنِيْنًا مَيِّتًا وَمَاتَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি উটপাখির ডিম ভেঙ্গে ফেলল, তার উপর তার মূল্য ওয়াজিব হবে। হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এ কারণে যে, এ হলো শিকারের মূল আর এতে শিকারে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং যদি তা নষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে সতর্কতা হিসেবে সেটিকে শিকারের স্থলবর্তী করা হবে। আর যদি ডিম থেকে মৃত ছানা বের হয়, তাহলে তাকে উক্ত ছানার মূল্য দিতে হবে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। সাধারণ কিয়াসের দাবি হলো, শুধু ডিমের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কেননা, ছানাটির প্রাণ অজ্ঞাত। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো ডিমকে তৈরি করা হয়েছে তা থেকে জীবিত ছানা বের হয়ে আসার জন্য। আর সময়ের পূর্বে ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে তার মৃত্যুর কারণ। সুতরাং সতর্কতা হিসেবে মৃত্যুকে ডিম ভাঙ্গার সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে। আর এ নীতির ভিত্তিতে কেউ যদি হরিণের পেটে আঘাত করে, ফলে হরিণ মৃত বাচ্চা প্রসব করে এবং নিজেও মারা যায়, তাহলে তার উপর উভয়ের মূল্য ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি উটপাখির ডিম ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তার উপর ডিমের মূল্য ওয়াজিব হবে। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দলিল হলো, ডিম হচ্ছে শিকারের মূল। আর এতে শিকারে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতাও রয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তা নষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে সতর্কতাবশত শিকারের স্থলবর্তী করা হবে। আর শিকার হত্যা করার কারণে যেরূপ দণ্ড ওয়াজিব হয়ে থাকে তদ্রূপ শিকারের মূল ডিমও বিনষ্ট করার কারণে তার উপর জরিমানা আসবে।

আর ভেঙ্গে ফেলা ডিম থেকে যদি মৃত ছানা বের হয়, তাহলে মুহ্‌রিমের উপর উক্ত ছানার মূল্য ওয়াজিব হবে। এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। আর সাধারণ কিয়াস হলো, শুধু ডিমের জরিমানা ওয়াজিব হবে। কিয়াসের কারণ এই যে, ছানাটির প্রাণ অজ্ঞাত। হতে পারে ডিম ভেঙ্গে ফেলার পূর্বেই এ ছানাটি মৃত ছিল, ডিম ভেঙ্গে ফেলার কারণে তা মরেনি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শুধু ডিম ভাঙ্গার অপরাধ পাওয়া যায়, ছানা মেরে ফেলার অপরাধ পাওয়া যায় না। আর সে কারণেই মুহ্‌রিমের উপর জরিমানা হিসেবে ছানার মূল্য ওয়াজিব হবে না। তবে ডিমের জরিমানা আসবে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, ডিমকে প্রস্তুত করা হয়েছে [কুদরতের পক্ষ থেকে] তা থেকে জীবিত ছানা বের হয়ে আসার জন্য। সুতরাং মুহ্‌রিম সময়ের পূর্বে ডিম ভেঙ্গে ফেলায় মৃত্যুর কারণ হয়েছে। আর যখন ডিম ভেঙ্গে ফেলা ছানাটির মৃত্যুর কারণ, তখন সে যেন ছানাটিকে হত্যা করল। আর তাই তার উপর ছানাটির জরিমানা ওয়াজিব হবে। এই নীতির ভিত্তিতেই বলা হয় যে, মুহ্‌রিম যদি গর্ভবতী হরিণের পেটে আঘাত করে, ফলে হরিণ মৃত বাচ্চা প্রসব করে এবং নিজেও মারা যায়, তাহলে তার উপর উভয়ের মূল্য ওয়াজিব হবে।

وَلَيْسَ فِىْ قَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالذِّئْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ جَزَاءٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحِدَأَةُ وَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَارَةَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحَيَّةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُوْرَ وَقَدْ ذُكِرَ الذِّئْبُ فِىْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ بِالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ الذِّئْبُ اَوْ يُقَالُ اِنَّ الذِّئْبَ فِىْ مَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالْغُرَابِ الَّذِىْ يَاْكُلُ الْجِيْفَ وَيَخْلِطُ لِاَنَّهُ يَبْتَدِئُ بِالْاَذٰى اَمَّا الْعَقْعَقُ غَيْرُ مُسْتَثْنًى لِاَنَّهُ لَا يُسَمّٰى غُرَابًا وَلَا يَبْتَدِئُ بِالْاَذٰى ـ

অনুবাদ : আর কাক, চিল, নেকড়ে, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করার কারণে কোনো জাযা আসবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুষ্ট প্রকৃতির পাঁচটি প্রাণীকে হিল [হারামের বাইরে] ও হারাম সর্বত্র হত্যা করা হবে। এগুলো হলো চিল, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য হাদীসে বলেছেন, মুহ্‌রিম ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করতে পারবে। কোনো কোনো বর্ণনায় নেকড়ের কথাও উল্লেখ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দংশনকারী কুকুর দ্বারা নেকড়ে উদ্দেশ্য। কিংবা বলা হয়, নেকড়ে দংশনকারী কুকুরের সমপর্যায়ভুক্ত। কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্য, যে মৃত খায় আবার শস্যদানাও খায়। কেননা, এ কাক প্রারম্ভেই কষ্ট দেয়। আর 'আক্ব'আক্ব নামক পাখি– এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এটাকে কাক বলা হয় না। আবার তা প্রারম্ভেই কষ্ট দেয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, মুহ্‌রিম যদি কাক, চিল, নেকড়ে, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর কিংবা দংশনকারী কুকুর হত্যা করে, তাহলে তার উপর কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুষ্ট প্রকৃতির পাঁচটি প্রাণীকে হিল [হারামের বাইরে] ও হারামে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন। সেগুলো হলো– চিল, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর। অন্য এক হাদীসে এসেছে– মুহ্‌রিম ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করতে পারবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহ্‌রিমকে পাঁচটি জন্তু হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন, অথচ অন্য হাদীসে ছয়টি প্রাণীর উল্লেখ করেছেন। এর উত্তর পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

وَقَدْ ذُكِرَ الذِّئْبُ দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে নেকড়ের উল্লেখ নেই, তাহলে ইমাম কুদূরী (র.) কি নিজ থেকে এটি বৃদ্ধি করেছেন? এর উত্তরে বলা হয় যে, বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় নেকড়ের কথা উল্লেখ হয়েছে। **দ্বিতীয়ত** বুখারী ও মুসলিম শরীফে যে দংশনকারী কুকুরের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা নেকড়ে উদ্দেশ্য। কিংবা বলা হয় যে, নেকড়ে দংশনকারী কুকুরের সমপর্যায়ভুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাদীসে কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্য যে কখনো মৃত খায়; কখনো শস্যদানাও খায়। কেননা, নাপাকই তার প্রধান খাবার। তাই সেটা নাপাক ভক্ষণকারীর মতোই। আর যে কাক কালো ও সাদা রং মিশ্রিত; 'আক্ব'আক্ব শব্দ করে তা হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এটাকে কাক বলা হয় না। সুতরাং তা হত্যা করলে দণ্ড ওয়াজিব হবে। আর এই 'আক্ব'আক্ব পাখির মূল খাবার নাপাক নয়; বরং তার প্রধান খাবার শস্যদানা।

وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُوْرَ وَغَيْرَ الْعَقُوْرِ وَالْمُسْتَانِسَ وَالْمُتَوَحِّشَ مِنْهُمَا سَوَاءٌ لِاَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِىْ ذٰلِكَ الْجِنْسُ وَكَذَا الْفَارَةُ الْاَهْلِيَّةُ وَالْوَحْشِيَّةُ سَوَاءٌ وَالضَّبُّ وَالْيَرْبُوْعُ لَيْسَا مِنَ الْخَمْسِ الْمُسْتَثْنَاةِ لِاَنَّهُمَا لَايَبْتَدِيَانِ بِالْاَذٰى وَلَيْسَ فِىْ قَتْلِ الْبَعُوْضِ وَالنَّمْلِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَالْقِرَادِ شَئٌ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِصُيُوْدٍ وَلَيْسَتْ بِمُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الْبَدَنِ ثُمَّ هِىَ مُؤْذِيَةٌ بِطِبَاعِهَا وَالْمُرَادُ بِالنَّمْلِ السَّوْدَاءُ وَالصَّفْرَاءُ الَّذِىْ تُؤْذِىْ وَمَا لَا يُؤْذِىْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهَا وَلٰكِنْ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ لِلْعِلَّةِ الْاُوْلٰى وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ مِثْلَ كَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ لِاَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنَ التَّفَثِ الَّذِىْ عَلَى الْبَدَنِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দংশনকারী কুকুর ও সাধারণ কুকুর, গৃহপালিত ও বন্য কুকুর সবই অভিন্ন। কেননা, শ্রেণীটাই মূলত [এখানে] উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে গৃহে বাসকারী ইঁদুর ও বন্য ইঁদুর অভিন্ন। গুঁইসাপ ও কাঠবিড়ালী ব্যতিক্রমী পাঁচটি প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলো প্রারম্ভে কষ্ট দেয় না। মশা, পিঁপড়া, বোলতা ও আঁঠালি হত্যার ক্ষেত্রে কোনো দণ্ড আসবে না। কেননা, এগুলো শিকার নয় এবং এগুলো শরীর থেকে সৃষ্ট নয়। তা ছাড়া এগুলো স্বভাবগতভাবে কষ্ট দেয়। পিঁপড়া দ্বারা কালো ও লাল পিঁপড়া উদ্দেশ্য যেগুলো কষ্ট দেয়। আর যে সমস্ত পিঁপড়া কামড়ায় না, সেগুলোকে হত্যা করা জায়েজ হবে না। তবে প্রথমোক্ত কারণে কোনো জাযা ওয়াজিব হবে না। যে ব্যক্তি উকুন হত্যা করল সে এক মুঠো খাদ্যসামগ্রীর মতো যৎসামান্য যা ইচ্ছা সদকা করে দেবে। কেননা, তা শরীরের ময়লা থেকে সৃষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, দংশনকারী কুকুর ও সাধারণ কুকুর, অদ্রূপ গৃহপালিত কুকুর ও বন্য কুকুর সবই দণ্ড ওয়াজিব না হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। কেননা, এখানে মূলত কুকুর শ্রেণীটাই উদ্দেশ্য। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবই অভিন্ন। তদ্রূপ গৃহে বাসকারী ইঁদুর ও বন্য ইঁদুর অভিন্ন। গুঁইসাপ ও কাঠবিড়ালী ব্যতিক্রমী পাঁচটি প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলো নিজে প্রারম্ভে কষ্ট দেয় না

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِىْ قَتْلِ الْبَعُوْضِ الخ মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি মশা, পিঁপড়া, বোলতা কিংবা আঁঠালি হত্যা করে, তাহলে তার উপর কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না। কেননা, এ প্রাণীগুলো বন্য না হওয়ার কারণে শিকার বলে বিবেচ্য হবে না। এগুলো মানুষ থেকে পলায়ন করে না; বরং মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর এগুলো মানুষের শরীর থেকে সৃষ্ট নয়। তা ছাড়া এগুলো মানুষকে স্বভাবগতভাবে কষ্ট দেয়। যদি এ প্রাণীগুলো বন্য হতো তাহলে শিকার হত্যা করার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হতো। আর যদি মানুষের শরীর থেকে সৃষ্ট হতো, তাহলে শরীরের ময়লা ও উষ্কখুষ্কতা দূরীভূত করার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হতো। সুতরাং দু'টির কোনোটি না হওয়ার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, পিঁপড়া দ্বারা কালো ও হলুদ পিঁপড়া উদ্দেশ্য, যেগুলো মানুষকে কামড়ায়। এগুলোকে মারা জায়েজ আছে এবং এর ফলে কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না। আর যে পিঁপড়া কামড়ায় না সেগুলোকে মারা জায়েজ নেই। তবে কেউ যদি এ জাতীয় পিঁপড়া মেরে ফেলে, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা, এগুলো শিকার নয় আবার মানুষের শরীর থেকে সৃষ্টও নয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَةً تَصَدَّقَ الخ মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি মাথা কিংবা শরীরের কোনো অংশ থেকে উকুন ধরে মেরে ফেলে কিংবা মাটিতে ফেলে দেয়, তাহলে এক মুঠো সামগ্রীর মতো যৎসামান্য যা ইচ্ছা সদকা করে দেবে। কেউ কেউ বলেন, দুই কিংবা তিনটি উকুন মারলে এক মুষ্টি গম সদকা করবে আর ততোধিকের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' গম সদকা করবে। দলিল হলো, উকুন মানুষের শরীরের ময়লা থেকে সৃষ্টি হয়। আর শরীরের ময়লা পরিষ্কার করলে যেরূপ সদকা ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ উকুন মারলে কিংবা মাটিতে ফেলে দিলেও যৎসামান্য খাদ্যসামগ্রী সদকা করা ওয়াজিব হবে।

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اَطْعَمَ شَيْئًا وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ يُجْزِيْهِ اَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيْنًا شَيْئًا يَسِيْرًا عَلٰى سَبِيْلِ الْاِبَاحَةِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْبِعًا وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ لِاَنَّ الْجَرَادَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ فَاِنَّ الصَّيْدَ مَا لَا يُمْكِنُ اَخْذُهُ اِلَّا بِحِيْلَةٍ وَيَقْصِدُهُ الْاٰخِذُ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ لِقَوْلِ عُمَرَ (رض) تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَلَا شَئَ عَلَيْهِ فِىْ ذَبْحِ السُّلَحْفَاةِ لِاَنَّهُ مِنَ الْهَوَامِّ وَالْحَشَرَاتِ فَاَشْبَهَ الْخَنَافِسَ وَ الْوَزْغَاتِ وَيُمْكِنُ اَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيْلَةٍ وَكَذَا لَايُقْصَدُ بِالْاَخْذِ فَلَمْ يَكُنْ صَيْدًا وَمَنْ حَلَبَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لِاَنَّ اللَّبَنَ مِنْ اَجْزَاءِ الصَّيْدِ فَاَشْبَهَ كُلَّهُ ـ

অনুবাদ : জামেউস সাগীরে রয়েছে– 'কিছু খাদ্য দান করবে' এটা প্রমাণ করে মিসকিনকে যৎসামান্য খাওয়ানো যথেষ্ট হবে– যদিও তা উদরপূর্তির পরিমাণ না হয়। আর যে ব্যক্তি টিড্ডি হত্যা করল, সে ইচ্ছামতো কিছু সদকা দেবে। কেননা, টিড্ডি হলো স্থলের শিকার। আর শিকার হলো এমন প্রাণী, যাকে কৌশল ছাড়া ধরা যায় না। আর শিকারী ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ধরতে চায়। আর একটি খেজুর একটি টিড্ডি থেকে উত্তম। কেননা, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, একটি খেজুর একটি টিড্ডি থেকে উত্তম। কচ্ছপ হত্যা করলে মুহ্‌রিমের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা কীটপতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা গাঁদি পোকা ও কাকলাসের সদৃশ। এগুলোকে কৌশল ছাড়া ধরা সম্ভব এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এগুলোকে ধরে না। সুতরাং এগুলো শিকার নয়। যে ব্যক্তি হারামের শিকার দোহন করল, তার উপর দুধের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, দুধ শিকারের অংশ। সুতরাং তা পূর্ণ শিকারের সমতুল্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : জামিউস সগীরে রয়েছে– اَطْعَمَ شَيْئًا অর্থাৎ কিছু খাদ্য দান করবে– এ কথা প্রমাণ করে যে, বৈধতার ভিত্তিতে মিসকিনকে যৎসামান্য যথেষ্ট, যদিও তা উদরপূর্তির পরিমাণ না হয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةً الخ – মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি টিড্ডি হত্যা করে, তাহলে ইচ্ছামাফিক কিছু সদকা করে দেবে। দলিল হলো, টিড্ডি স্থলচর শিকার। কেননা, শিকার হলো ঐ প্রাণী যাকে কৌশল ছাড়া ধরা যায় না। আর শিকারিও ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ধরতে চায়।

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, একটি খেজুর একটি টিড্ডি থেকে উত্তম। মূলত এটি হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তি। ঘটনার বিবরণ এই যে, হিমসের অধিবাসীরা ইহ্‌রাম অবস্থায় বেশি বেশি টিড্ডি হত্যা করত এবং প্রত্যেক টিড্ডির বিনিময়ে এক দিরহাম সদকা করত। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে হিমসের অধিবাসীগণ! তোমাদের তো অনেক দিরহাম। [তোমরা তো সম্পদশালী]। জেনে রাখো ! একটি খেজুর একটি টিড্ডি থেকে উত্তম। অর্থাৎ একটি টিড্ডির পরিবর্তে একটি খেজুর সদকা করাই যথেষ্ট। সুতরাং তোমরা একটি টিড্ডির পরিবর্তে একটি খেজুর সদকা করবে। এটাই যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ وَلَاشَئَ عَلَيْهِ فِىْ ذَبْحِ الخ – মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি কচ্ছপ হত্যা করে, তাহলে তার উপর কোনো জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কেননা, এটা মাটির কীটপতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা গাঁদি পোকা ও কাকলাসের সমতুল্য। আর কীটপতঙ্গ হত্যা করলে জরিমানা আসে না। এ জন্য কচ্ছপ হত্যা করলে জরিমানা আসবে না। দ্বিতীয়ত কৌশল ছাড়াই কচ্ছপ ধরা যায়। আর কেউ এটাকে ধরতেও চায় না। সুতরাং তা শিকারের প্রাণী নয়। অথচ শিকার হত্যা করলেইতো দণ্ড ওয়াজিব হয়। এ কারণে এক্ষেত্রে দণ্ড ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ حَلَبَ صَيْدَ الْحَرَمِ الخ – মাসআলা : কেউ যদি হারামের শিকার ধরে দুধ দোহন করে, তাহলে জরিমানা স্বরূপ তার উপর দুধের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, দুধ শিকারের অংশ। সুতরাং তা মূল শিকারের সদৃশ হলো। আর শিকারের ক্ষেত্রে যেহেতু দণ্ড ওয়াজিব হয়, সেহেতু এক্ষেত্রেও দণ্ড ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ قَتَلَ مَا لاَ يُؤكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الصَّيْدِ كَالسِّبَاعِ وَنَحْوِهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ اِلاَّ مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُوَ مَا عَدَدْنَاهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لاَ يَجِبُ الْجَزَاءُ لِاَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَى الْاِيْذَاءِ فَدَخَلَتْ فِى الْفَوَاسِقِ الْمُسْتَثْنَاةِ وَكَذَا اِسْمُ الْكَلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِاَسْرِهَا لُغَةً وَلَنَا اَنَّ السَّبُعَ صَيْدٌ لِتَوَحُّشِهِ وَكَوْنُهُ مَقْصُوْدًا بِالْاَخْذِ اِمَّا لِجِلْدِهِ اَوْ لِيَصْطَادَ بِهِ اَوْ لِدَفْعِ اَذَاهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْفَوَاسِقِ مُمْتَنِعٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِبْطَالِ الْعَدَدِ وَاسْمُ الْكَلْبِ لاَ يَقَعُ عَلَى السَّبُعِ عُرْفًا وَالْعُرْفُ اَمْلَكُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি এমন শিকার হত্যা করল, যার গোশত খাওয়া যায় না। যেমন– হিংস্র প্রাণী ও অনুরূপ অন্যান্য প্রাণী, তাহলে তার উপর 'জাযা' ওয়াজিব হবে। তবে যেগুলোকে শরিয়ত ব্যতিক্রমী সাব্যস্ত করেছে সেগুলো ছাড়া। আমরা এগুলোর সংখ্যা বর্ণনা করেছি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, 'দণ্ড' ওয়াজিব হবে না। কেননা, স্বভাবগতভাবে এগুলো কষ্টদায়ক। সুতরাং এগুলো ব্যতিক্রমধর্মী দুষ্ট প্রাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। তদ্রূপ আভিধানিক দিক থেকে كَلْب শব্দটি যাবতীয় হিংস্র প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমাদের দলিল হলো, হিংস্র প্রাণী তার বন্য স্বভাবের কারণে শিকাররূপে গণ্য। তা ছাড়া এগুলোকে চামড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিংবা এগুলোর দ্বারা অন্য শিকার ধরার উদ্দেশ্যে কিংবা এগুলোর জ্বালাতন রোধ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা হয়। আর দুষ্ট প্রাণীসমূহের উপর কিয়াস করা সম্ভব নয়। কেননা, তাতে হাদীসে বর্ণিত সংখ্যা অকার্যকর করা হয়। আর প্রচলিত ব্যবহারে كَلْب শব্দটি হিংস্র প্রাণীর উপর প্রযোজ্য হয় না। আর প্রচলিত ব্যবহারই অধিক কার্যকর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি এমন শিকার হত্যা করে– যার গোশত খাওয়া যায় না, যেমন– সিংহ, বাঘ ও নেকড়ে জাতীয় প্রাণী, তাহলে তার উপর 'দণ্ড' ওয়াজিব হবে। তবে শরিয়ত যেসব প্রাণীকে ব্যতিক্রমী সাব্যস্ত করেছে সেগুলোকে হত্যা করলে দণ্ড ওয়াজিব হবে না। এ রকম দুষ্ট প্রাণীর সংখ্যা পাঁচটি, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় না এমন প্রাণীকে হত্যা করলে দণ্ড ওয়াজিব হবে না। তাঁর দলিল হলো– এসব প্রাণী স্বভাবগতভাবে কষ্টদায়ক। সুতরাং শরিয়তে যেসব প্রাণীকে ব্যতিক্রমী সাব্যস্ত করেছে এগুলোও সে সবের অন্তর্ভুক্ত হবে। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ দংশনকারী কুকুরকে পৃথক করেছেন। আর অভিধানে كَلْب শব্দটি যাবতীয় হিংস্র প্রাণীকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং কুকুরকে ব্যতিক্রমী সাব্যস্ত করার অর্থই হলো সমস্ত হিংস্র প্রাণীকে ব্যতিক্রমী বলে গণ্য করা।

আমাদের দলিল হলো– হিংস্র প্রাণীগুলো বন্য স্বভাবের কারণে লোকালয় থেকে দূরে থাকে। আর মানুষও এগুলোকে ধরার জন্য চেষ্টা করে– এগুলোর চামড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। যেমন– বাঘের ক্ষেত্রে; কিংবা এগুলো দ্বারা অন্য শিকার ধরার উদ্দেশ্যে যেমন– চিতা বাঘের ক্ষেত্রে; কিংবা এগুলোর জ্বালাতন রোধ করার উদ্দেশ্যে। যেমন– জংলী কুকুরের ক্ষেত্রে। আর যেসব প্রাণীর ক্ষেত্রে এ গুণগুলো পাওয়া যায়, তা শিকার বলে গণ্য। এজন্যই হিংস্র প্রাণীকে শিকার বলা হবে। আর শিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হলো لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ অর্থাৎ 'তোমরা মুহ্‌রিম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না।' সুতরাং হিংস্র প্রাণীকে হত্যা করার দ্বারা জাযা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) যে কিয়াস করেছেন, তার উত্তরে বলা হয়– হিংস্র প্রাণীকে [হাদীসে বর্ণিত] দুষ্ট প্রকৃতির পাঁচটি প্রাণীর উপর কিয়াস করা সম্ভব নয়। কেননা, তাতে হাদীসে বর্ণিত 'পাঁচটি' সংখ্যা অকার্যকর করা হয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যে كَلْب শব্দটিকে যাবতীয় হিংস্র প্রাণীর উপর প্রয়োগ করেছেন তাও যথার্থ নয়। কেননা, كَلْب শব্দটি প্রচলিত ব্যবহারে হিংস্র প্রাণীসমূহের উপর প্রযোজ্য হয় না। আর প্রচলিত ব্যবহারই অধিক কার্যকর। এজন্যই হিংস্র প্রাণীকে كَلْب -এর অন্তর্ভুক্ত করে দণ্ড রহিত করা হবে না; বরং হিংস্র প্রাণীকেও হত্যা করলে 'দণ্ড' ওয়াজিব হবে।

وَلَا يُجَاوِزُ بِقِيْمَتِهٖ شَاةً وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) يَجِبُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ اِعْتِبَارًا بِمَأْكُوْلِ اللَّحْمِ وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيْهِ الشَّاةُ وَلِاَنَّ اِعْتِبَارَ قِيْمَتِهٖ لِمَكَانِ الْاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهٖ لَا لِاَنَّهٗ مُحَارِبٌ مُؤْذِىْ وَمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لَا يَزْدَادُ عَلٰى قِيْمَةِ الشَّاةِ ظَاهِرًا ـ

অনুবাদ : আর এর মূল্য বকরির মূল্যকে অতিক্রম করবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর উপর কিয়াস করে [এখানেও] মূল্য যে পরিমাণে পৌঁছে তা-ই পুরোপুরি ওয়াজিব। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَلضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيْهِ الشَّاةُ 'হায়েনাও শিকার এবং এতে একটি বকরি ওয়াজিব।' তা ছাড়া এ কারণে যে, এগুলোর মূল্য বিবেচনা করা হয় মূলত চামড়া থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাব্যতার কারণে; এ কারণে নয় যে, তা হামলা করে এবং কষ্ট দেয়। এদিক থেকে বাহ্যত তার মূল্য বকরির মূল্যের চেয়ে অধিক হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, মুহ্‌রিম যদি এমন শিকার হত্যা করে যার গোশত খাওয়া যায় না, তাহলে তার উপর এ পরিমাণ 'জাযা' ওয়াজিব হবে যে, তার মূল্য একটি বকরির মূল্যকে অতিক্রম করবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, হত্যাকৃত প্রাণীর মূল্যই ওয়াজিব হবে– যে পরিমাণই পৌঁছাক। তিনি অভক্ষণযোগ্য প্রাণীকে ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَلضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيْهِ الشَّاةُ 'হায়েনাও শিকারভুক্ত এবং এতে এক বকরি ওয়াজিব।

দ্বিতীয় দলিল হলো, অভক্ষণযোগ্য প্রাণীর মূল্য বিবেচনা করা হয় মূলত চামড়া থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাব্যতার কারণে। কেননা, এগুলোর গোশত খাওয়া যায় না। এ ছাড়া তা হামলা করে কিংবা কষ্ট দেওয়ার কারণে এগুলোর মূল্য বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং চামড়া থেকে উপকৃত হওয়ার বিবেচনায় যেহেতু এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হয়, আর বাহ্যত তার মূল্য বকরির মূল্যের চেয়ে অধিক হয় না, তাই আমরা হিংস্র প্রাণীর জরিমানা নির্ধারণ করেছি বকরির মূল্য থেকে যেন তা অতিক্রম না করে।

وَإِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) يَجِبُ اِعْتِبَارًا بِالْجَمَلِ الصَّائِلِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ (رضـ) أَنَّهُ قَتَلَ سَبُعًا وَأَهْدَى كَبْشًا وَقَالَ إِنَّا ابْتَدَأْنَاهُ وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعَرُّضِ لَا عَنْ دَفْعِ الْأَذَى وَلِهٰذَا كَانَ مَأْذُوْنًا فِي دَفْعِ الْمُتَوَهَّمِ مِنَ الْأَذَى كَمَا فِي الْفَوَاسِقِ فَلَأَنْ يَكُوْنَ مَأْذُوْنًا فِي دَفْعِ الْمُتَحَقَّقِ أَوْلَى وَمَعَ وُجُوْدِ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا لَهُ بِخِلَافِ الْجَمَلِ الصَّائِلِ لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَبْدُ .

অনুবাদ : কোনো হিংস্র প্রাণী যদি মুহ্রিমের উপর হামলা করে আর সে তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র.) হামলাকারী উটের উপর কিয়াস করে বলেন, ওয়াজিব হবে। আমাদের দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস– তিনি একটি হিংস্র প্রাণী হত্যা করে একটি মেষ হাদীরূপে জবাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা আগে বেড়ে তাকে হত্যা করেছি। আর তা ছাড়া এ কারণে যে, মুহ্রিমকে শিকারের পিছনে লাগতে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু তার অত্যাচার রোধ করতে নিষেধ করা হয়নি। আর এ কারণেই যেগুলো থেকে অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোকে রোধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন– দুষ্ট প্রকৃতির প্রাণীসমূহের বেলায়। সুতরাং যে প্রাণীর অত্যাচার বাস্তবরূপ লাভ করেছে, তাকে রোধ করার বেলায় অনুমতি হওয়া আরও যুক্তিযুক্ত। আর শরিয়তের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকা অবস্থায় শরিয়তের অধিকার হিসেবে জাযা ওয়াজিব হবে না। হামলাকারী উটের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, অধিকার যার অর্থাৎ মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো হিংস্র প্রাণী যদি মুহ্রিমের উপর হামলা করে আর সে তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার উপর কোনো 'জাযা' ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। তাঁর দলিল হলো– কিয়াস। অর্থাৎ কেউ যদি হামলাকারী উট হত্যা করে, তাহলে তার উপর জরিমানাস্বরূপ উটের মূল্য ওয়াজিব হবে– যদিও সে নিজের থেকে প্রতিরোধকল্পে সে উটকে মেরে ফেলে। তদ্রূপ হিংস্র প্রাণীকে হত্যা করলেও হত্যাকারীর উপর 'জাযা' ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি একটি হিংস্র প্রাণী হত্যা করে একটি মেষ হাদীরূপে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা আগে বেড়ে তাকে হত্যা করেছি। অর্থাৎ যদি আমরা আগে বেড়ে তাকে হত্যা না করতাম বরং সেটা আমাদের দিকে তেড়ে আসত, তাহলে [হত্যা করার দ্বারা] আমাদের উপর মেষ ওয়াজিব হতো না।

দ্বিতীয়ত, মুহ্রিমকে শিকারের পিছনে লাগতে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু নিজের উপর থেকে অত্যাচার রোধ করতে নিষেধ করা হয়নি। এ কারণেই তো দুষ্ট প্রকৃতির প্রাণীসমূহের বেলায় অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সেগুলোকে রোধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে প্রাণীর অত্যাচার বাস্তবরূপ লাভ করেছে, তাকে রোধকল্পে অনুমতি হওয়া আরও যুক্তিযুক্ত। যেহেতু শরিয়তের পক্ষ থেকে হিংস্র প্রাণীর অত্যাচার রোধ করার অনুমতি রয়েছে, সেহেতু তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে শরিয়তের অধিকার হিসেবে 'জাযা' ওয়াজিব হবে না।

পক্ষান্তরে হামলাকারী উটের বিষয়টি ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর উটের মূল্য ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, উটের মালিকের পক্ষ থেকে সেটাকে হত্যা করার কোনো অনুমতি নেই। আর তাই মালিকের অধিকার রহিত হবে না।

وَاِنِ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ اِلٰى قَتْلِ صَيْدٍ فَقَتَلَهٗ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِاَنَّ الْاِذْنَ مُقَيَّدٌ بِالْكَفَّارَةِ بِالنَّصِّ عَلٰى مَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ اَنْ يَذْبَحَ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيْرَ وَالدَّجَاجَةَ وَالْبَطَّ الْاَهْلِىَّ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِصُيُوْدٍ لِعَدَمِ التَّوَحُّشِ وَالْمُرَادُ بِالْبَطِّ الَّذِىْ يَكُوْنُ فِى الْمَسَاكِنِ وَالْحِيَاضِ لِاَنَّهٗ اَلُوْفٌ بِاَصْلِ الْخِلْقَةِ وَلَوْ ذَبَحَ حَمَامًا مُسَرْوَلًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ خِلَافًا لِمَالِكٍ (رح) لَهٗ اَنَّهٗ اَلُوْفٌ مُسْتَاْنِسٌ وَلَا يَمْتَنِعُ بِجَنَاحَيْهِ لِبُطْءِ نُهُوْضِهٖ وَنَحْنُ نَقُوْلُ الْحَمَامُ مُتَوَحِّشٌ بِاَصْلِ الْخِلْقَةِ مُمْتَنِعٌ بِطَيَرَانِهٖ وَاِنْ كَانَ بَطِىْءَ النُّهُوْضِ وَالْاِسْتِيْنَاسُ عَارِضٌ فَلَمْ يُعْتَبَرْ ـ

অনুবাদ : মুহ্‌রিম যদি কোনো শিকার হত্যা করতে বাধ্য হয়, আর সে হত্যা করে, তাহলে তার উপর 'জাযা' ওয়াজিব হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে নস [স্পষ্ট বাণী] দ্বারা অনুমতির বিষয়টি কাফ্‌ফারার সাথে নির্দিষ্ট। যেমন– ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি। মুহ্‌রিমের গৃহপালিত বকরি, গরু, উট, মুরগি বা হাঁস জবাই করায় কোনো দোষ নেই। কেননা, বন্যতার বৈশিষ্ট্য না থাকায় এ প্রাণীগুলো শিকারভুক্ত নয়। আর হাঁস দ্বারা ঐ হাঁস উদ্দেশ্য, যা বাড়িতে কিংবা জলাশয়ে থাকে। কেননা, জন্মগতভাবেই তা প্রতিপালিত। যদি কেউ পায়ে লোমবিশিষ্ট কবুতর হত্যা করে, তাহলে তার উপর 'জাযা' ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল হলো, তা পালিত, মানুষের সঙ্গলাভে আশ্বস্ত এবং আপন ডানা দ্বারা আত্মরক্ষায় সমর্থ নয়– ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে। আমরা বলি, কবুতর সৃষ্টিগতভাবেই বন্য স্বভাবের এবং উড্ডয়ন দ্বারা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম যদিও তা ধীরগতিসম্পন্ন। আর মানুষের সঙ্গলাভে অভ্যস্ত হওয়াটা অস্থায়ী। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنِ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ الخ : মাসআলা হলো, মুহ্‌রিম যদি প্রচণ্ড ক্ষুধায় কিংবা অন্য কোনো কারণে শিকার হত্যা করতে বাধ্য হয় এবং শিকার হত্যা করে, তাহলে তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে। কেননা, ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহের মধ্যে কোনো একটিতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতির বিষয়টি শরিয়ত কাফ্‌ফারার সাথে আবদ্ধ করেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রয়োজনের সময় আল্লাহ তা'আলা মাথা মুণ্ডানোর অনুমতি দিয়েছেন। তবে কাফ্‌ফারার ফিদইয়া ওয়াজিব। তদ্রূপ যে ব্যক্তি শিকার হত্যা করতে নিরুপায়, তার জন্য কাফ্‌ফারার শর্তে শিকার জবাই করা জায়েজ। আর শিকারের কাফ্‌ফারা হলো এর দণ্ড বা জাযা, যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلَوْ ذَبَحَ حَمَامًا الخ : مُسَرْوَلٌ ঐ কবুতর যার পায়ে ঘন পশম থাকে, যা পাজামা পরিধান করার মতো দেখায়। মাসআলা হলো, যদি কোনো মুহ্‌রিম পায়ে ঘন লোমবিশিষ্ট কবুতর জবাই করে, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে না। তাঁর দলিল হলো, এ ধরনের কবুতর পালিত, মানুষের সঙ্গলাভে আশ্বস্ত এবং উড্ডয়নে ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে আপন ডানা দ্বারা পরিপূর্ণভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ নয়। এ গুণসম্পন্ন প্রাণী শিকার হওয়ার যোগ্য নয় বলে তা হত্যা করলে জাযা ওয়াজিব হবে না।

আমরা বলি, কবুতর সৃষ্টিগতভাবেই বন্য স্বভাবের। উড্ডয়নের দ্বারা আত্মরক্ষাও করতে পারে– যদিও তা ধীরগতিসম্পন্ন। আর মানুষের সঙ্গলাভে অভ্যস্ত হওয়া অস্থায়ী। আর মূলনীতি হলো, মূল অর্থই ধর্তব্য– অস্থায়ী গুণ ধর্তব্য নয়। এ কারণেই সঙ্গলাভে অভ্যস্ত হওয়ার মতো অস্থায়ী গুণ বিবেচ্য নয়। সুতরাং তা শিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর শিকার হত্যা করলে 'জাযা' ওয়াজিব হয় বলে, এ জাতীয় কবুতর হত্যা করলেও জাযা ওয়াজিব হবে।

وَكَذَا إِذَا قَتَلَ ظَبْيًا مُسْتَأْنِسًا لِأَنَّهُ صَيْدٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُبْطِلُهُ الْإِسْتِينَاسُ كَالْبَعِيرِ إِذَا نَدَّ لَا يَأْخُذُ حُكْمَ الصَّيْدِ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَإِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَحِلُّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ فَانْتَقَلَ فِعْلُهُ إِلَيْهِ وَلَنَا أَنَّ الذَّكُوةَ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ وَهٰذَا فِعْلٌ حَرَامٌ فَلَا يَكُونُ ذَكَاةً كَذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِّ وَهٰذَا لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ وَهُوَ الَّذِي قَامَ مَقَامَ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الدَّمِ وَاللَّحْمِ تَيْسِيرًا فَيَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِهِ .

অনুবাদ : অনুরূপভাবে [দণ্ড ওয়াজিব হবে] গৃহপালিত হরিণ হত্যা করলে। কেননা, তা মূলত শিকার। সুতরাং সঙ্গলাভের অভ্যস্ততা তার শিকার গুণ রহিত করবে না। যেমন– উট পালিয়ে গিয়ে বন্য হয়ে পড়লে মুহ্‌রিমের জন্য হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে শিকারভুক্ত হবে না। মুহ্‌রিম যদি কোনো শিকার জবাই করে, তাহলে তার জবাইকৃত পশু মৃত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তা খাওয়া হালাল হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুহ্‌রিম যদি অন্য কারো জন্য জবাই করে, তাহলে তা হালাল হবে। কেননা, সে [এ ক্ষেত্রে] হলো অপর ব্যক্তির পক্ষ থেকে কার্য সম্পাদনকারী। সুতরাং তার কর্ম উক্ত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। আমাদের দলিল হলো, জবাই শরিয়তসম্মত একটি কর্ম। আর [মুহ্‌রিমের জন্য] তা হারাম কর্ম। সুতরাং তা জবাইরূপে বিবেচিত হবে না– অগ্নিপূজকের জবাইকৃত জন্তুর ন্যায়। আর এটি [মুহ্‌রিমের জন্য হারাম হওয়া] এজন্য যে, গোশ্‌ত ও রক্তের মাঝে বিধানরূপে শরিয়তসম্মত জবাইকে পৃথককারী স্থলবর্তী গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং শরিয়তসম্মত জবাই না হলে পৃথককারীও থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَتَلَ ظَبْيًا الخ : মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি কোনো গৃহপালিত হরিণকে হত্যা করে, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা, হরিণ মূলত সৃষ্টিগতভাবেই শিকার। তাই সঙ্গলাভের সাময়িক অভ্যস্ততার ফলে তার শিকার গুণ রহিত হবে না। যেমন– উট একটি গৃহপালিত পশু। তবে তা যদি লোকালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে বন্য হয়ে পড়ে, তাহলে তা গৃহপালিত হওয়া থেকে বের হবে না এবং মুহ্‌রিমের জন্য হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে শিকারভুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا الخ : মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি কোনো শিকার জবাই করে, তাহলে তার জবাইকৃত পশু মৃত হিসেবে ধরা হবে এবং তা খাওয়া কারো জন্য হালাল হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুহ্‌রিম যদি অন্য কোনো গায়রে মুহ্‌রিমের জন্য জবাই করে, তাহলে তার জবাইকৃত পশু ঐ গায়রে মুহ্‌রিমের জন্য হালাল হবে। কেননা, মুহ্‌রিম এ কাজটি গায়রে মুহ্‌রিমের জন্য সম্পাদন করেছে। তাই মুহ্‌রিমের এ কর্মটি উক্ত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। কাজেই তা যেন গায়রে মুহ্‌রিম জবাই করেছে। আর গায়রে মুহ্‌রিমের জবাইকৃত পশু হালাল বলে [এ ক্ষেত্রেও] মুহ্‌রিমের জবাইকৃত পশু গায়রে মুহ্‌রিমের জন্য হালাল হবে।

আমাদের দলিল হলো, জবাই একটি শরিয়তসম্মত কর্ম। আর মুহ্‌রিমের জবাই করা শরিয়তসম্মত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না]। এ আয়াতে মুহ্‌রিমের জবাইকে 'হত্যা' বলা হয়েছে। এ কারণে মুহ্‌রিম কর্তৃক জবাইকে জবাই বলে গণ্য করা হবে না। যেমন– অগ্নিপূজকের জবাইকৃত পশুকে জবাই বলা হয় না।

আর মুহ্‌রিমের জবাই হারাম হওয়ার কারণ হলো, পশুর শরীরের রক্ত নাপাক। গোশত খাওয়ার উপযোগী করার জন্য এই নাপাককে পৃথক করা আবশ্যক। আর গোশত ও রক্তের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা দুষ্কর। এজন্য সহজতার লক্ষ্যে বিধানরূপে শরিয়তসম্মত জবাইকেই গোশত ও রক্তের মাঝে পার্থক্যকারীর স্থলবর্তী করা হয়েছে এবং বলা হয় যে, শরিয়তসম্মত জবাই হলে বুঝতে হবে রক্ত গোশত থেকে পৃথক হয়েছে এবং এই গোশত খাওয়া হালাল। আর শরিয়তসম্মত জবাই না হলে বুঝতে হবে গোশত থেকে রক্ত পৃথক হয়নি এবং এই গোশত খাওয়া হারাম। সুতরাং শরিয়তসম্মতভাবে জবাই না হলে জবাইকৃত পশুর গোশত হালাল হবে না।

মোটকথা হলো, মুহ্‌রিমের জবাই শরিয়তসম্মত না হওয়ার কারণে তার জবাইকৃত পশু হারাম ও মৃত। আর মৃত খাওয়া কারো জন্য জায়েজ নেই। এজন্য মুহ্‌রিম ও গায়রে মুহ্‌রিম সকলের জন্যই তা খাওয়া হারাম।

وَاِنْ اَكَلَ الْمُحْرِمُ الذَّابِحُ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ قِيْمَةُ مَا اَكَلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا اَكَلَ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ مُحْرِمٌ اٰخَرُ فَلَا شَئَ عَلَيْهِ فِىْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لَهُمَا اَنَّ هٰذِهٖ مَيْتَةٌ فَلَا يَلْزَمُهٗ بِاَكْلِهَا اِلَّا الْاِسْتِغْفَارُ وَصَارَ كَمَا اِذَا اَكَلَهٗ مُحْرِمٌ غَيْرُهٗ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ حُرْمَتَهٗ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهٖ مَيْتَةً كَمَا ذَكَرْنَا وَبِاعْتِبَارِ اَنَّهٗ مَحْظُوْرُ اِحْرَامِهٖ لِاَنَّ اِحْرَامَهٗ هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الصَّيْدَ عَنِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالذَّابِحَ عَنِ الْاَهْلِيَّةِ فِىْ حَقِّ الذَّكَاةِ فَصَارَتْ حُرْمَةُ التَّنَاوُلِ بِهٰذِهِ الْوَسَائِطِ مُضَافَةً اِلٰى اِحْرَامِهٖ بِخِلَافِ مُحْرِمٍ اٰخَرَ لِاَنَّ تَنَاوُلَهٗ لَيْسَ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ اِحْرَامِهٖ .

অনুবাদ : জবাইকারী মুহ্‌রিম যদি তা থেকে কিছু খায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ভক্ষিত অংশের মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, যা খেয়েছে তার জাযা দিতে হবে না। অন্য কোনো মুহ্‌রিম যদি তা থেকে খায়, তাহলে সকলের মতেই তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, এটা তো মৃত। সুতরাং তা খাওয়ার কারণে তওবা ছাড়া অন্য কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। অন্য কোনো মুহ্‌রিম খেলে যে হুকুম হয়, এটিরও সে হুকুম হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মুহ্‌রিমের জবাইকৃত পশু হারাম হওয়ার কারণ হলো তা মৃত–যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি এবং এ কারণে জবাই করাটা তার ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তার ইহ্‌রামই শিকারকে জবাই -এর পাত্র হওয়া থেকে এবং জবাইকারীকে জবাই -এর যোগ্যতা থেকে বের করে দিয়েছে। সুতরাং ভক্ষণ হারাম হওয়ার বিষয়টি এ সকল মাধ্যম বিদ্যমান থাকার কারণে ইহ্‌রামের সঙ্গে যুক্ত হবে। অন্য মুহ্‌রিমের বেলায় এ হুকুম বিপরীত। কেননা, তার ভক্ষণ করাটা ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, জবাইকারী মুহ্‌রিম যদি স্বীয় জবাইকৃত পশুর কোনো কিছু ভক্ষণ করে, অথচ ঐ মৃত থেকে খাওয়া হারাম, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ভক্ষিত অংশের মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। স্মর্তব্য যে, এ মূল্য শিকারের দণ্ড থেকে ভিন্ন। হ্যাঁ, শিকারের দণ্ড আদায় করার পর সে যদি গোশ্‌ত ভক্ষণ করে, তাহলে ভক্ষিত গোশতের মূল্য আলাদাভাবে ওয়াজিব হবে। আর যদি শিকারের দণ্ড আদায় করার পূর্বে গোশত ভক্ষণ করে, তাহলে ভক্ষিত গোশতের মূল্য শিকারের দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে– ভিন্নভাবে আদায় করা আবশ্যক নয়।

সাহেবাইন (র.) বলেন, তওবা ছাড়া মূল্য কিংবা অন্য কোনো কিছুই তার উপর ওয়াজিব হবে না। আর এই জবাইকৃত পশু থেকে অন্য কোনো মুহ্‌রিম ভক্ষণ করলে সকলের মতেই তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, মুহ্‌রিমের জবাইকৃত পশু মৃত– তা ভক্ষণ করার কারণে তওবা ছাড়া কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। এটা এরূপ হলো যেমন জবাইকারী ব্যতীত অন্য কোনো মুহ্‌রিম তা থেকে ভক্ষণ করলে, তার উপর কোনো জরিমানা ওয়াজিব হয় না। তদ্রূপ জবাইকারী মুহ্‌রিমও ভক্ষণ করলে, তার উপর জরিমানা আসবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মুহ্‌রিমের জবাইকৃত পশু দু কারণে হারাম বলে বিবেচ্য– ১. মুহ্‌রিমের জবাইকৃত পশু মৃত। যেমন আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। ২. এ জবাই করাটা ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তার ইহ্‌রাম শিকারকে জবাই -এর পাত্র হওয়া থেকে এবং জবাইকারীকে জবাইয়ের যোগ্যতা থেকে বের করে দিয়েছে। সুতরাং ভক্ষণ হারাম হওয়ার বিষয়টি এ সকল মাধ্যম বিদ্যমান থাকার কারণে তার ইহ্‌রামের সঙ্গে যুক্ত হবে। এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, মুহ্‌রিমের জন্য স্বীয় জবাইকৃত পশু থেকে ভক্ষণ করা ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের কোনো একটিতে লিপ্ত হলে 'জাযা' ওয়াজিব হয়। এজন্যই ভক্ষিত অংশের মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। অন্য মুহ্‌রিমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার ভক্ষণ করাটা তার ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার উপর 'জাযা' ওয়াজিব হবে না।

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ اِصْطَادَهُ حَلَالٌ وَ ذَبَحَهُ اِذَا لَمْ يَدُلَّ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ وَلَا اَمَرَهُ بِصَيْدِهِ خِلَافًا لِمَالِكٍ (رح) فِيْمَا اِذَا اصْطَادَهُ لِاَجْلِ الْمُحْرِمِ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَأْسَ بِاَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدٍ مَا لَمْ يَصِدْهُ اَوْ يُصَادُ لَهُ وَلَنَا مَا رُوِيَ اَنَّ الصَّحَابَةَ (رض) تَذَاكَرُوْا لَحْمَ الصَّيْدِ فِيْ حَقِّ الْمُحْرِمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَأْسَ بِهِ وَاللَّامُ فِيْمَا رُوِيَ لَامُ تَمْلِيْكٍ فَيُحْمَلُ عَلٰى اَنْ يُهْدٰى اِلَيْهِ الصَّيْدُ دُوْنَ اللَّحْمِ اَوْ مَعْنَاهُ اَنْ يُصَادَ بِاَمْرِهِ ثُمَّ شَرَطَ عَدَمَ الدَّلَالَةِ وَهٰذَا تَنْصِيْصٌ عَلٰى اَنَّ الدَّلَالَةَ مُحَرَّمَةٌ قَالُوْا فِيْهِ رِوَايَتَانِ وَجْهُ الْحُرْمَةِ حَدِيْثُ اَبِيْ قَتَادَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ـ

অনুবাদ : কোনো হালাল ব্যক্তি যে শিকার ধরেছে এবং জবাই করেছে, তা খেতে মুহরিমের কোনো অসুবিধা নেই। যদি মুহরিম দেখিয়ে না দেয় এবং শিকার করার আদেশ দিয়ে না থাকে। ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন– যদি তা মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে। তাঁর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– لَا بَأْسَ بِاَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدٍ مَا لَمْ يَصِدْهُ اَوْ يُصَادُ لَهُ 'মুহরিম কোনো শিকারের গোশত খেলে আপত্তি নেই, যদি সে নিজে শিকার না করে থাকে, কিংবা তার জন্য না হয়ে থাকে।' আমাদের দলিল হলো, সাহাবায়ে কেরাম মুহরিমের ব্যাপারে শিকারের গোশতের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর ইমাম মালিক (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে لَامْ অব্যয়টি মালিকানাজ্ঞাপক। সুতরাং অর্থ হবে– শিকারটি তাকে দান করা, গোশত দান করা নয়। কিংবা অর্থ হলো– তার আদেশে শিকার করা হয়েছে। আর ইমাম কুদূরী (র.) শিকার না দেখিয়ে দেওয়ার শর্তারোপ করেছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, শিকারের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হারাম। কিন্তু মাশায়েখে কেরাম বলেন, এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা রয়েছে। হারাম হওয়ার দলিল হলো, হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর হাদীস। আর তা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, কোনো হালাল ব্যক্তি যদি শিকার ধরে জবাই করে আর মুহ্‌রিম শিকারটি দেখিয়ে না দিয়ে থাকে এবং শিকার করতেও নির্দেশ না দিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মতে মুহ্‌রিম এ ধরনের শিকারের গোশত খেলে তার উপর কোনো জরিমানা আসবে না। আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, হালাল ব্যক্তি যদি মুহ্‌রিমকে শিকারের গোশত খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে শিকার করে। আর মুহ্‌রিম সেই শিকারের গোশত খায়, তাহলে ভক্ষিত অংশের মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে– চাই সে শিকারের আদেশ করুক বা না করুক।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীস– 'মুহ্‌রিম কোনো শিকারের গোশত খেলে আপত্তি নেই, যদি সে নিজে শিকার না করে থাকে কিংবা তার জন্য শিকার করা না হয়ে থাকে'। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যদি মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করা হয়, তাহলে তা খাওয়াও জায়েজ নেই।

আমাদের দলিল হলো, একবার সাহাবায়ে কেরাম আলোচনা করছিলেন– মুহ্‌রিমের জন্য অন্য কোনো হালাল ব্যক্তির শিকারের গোশত খাওয়ার বিধান সম্পর্কে। এ আলোচনায় শোরগোল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ কক্ষে শোয়া অবস্থা থেকে উঠে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি নিয়ে শোরগোল হচ্ছে? সাহাবায়ে কেরাম পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম মালিক (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার জবাবে বলা হয় যে, أَوْ يُصَادُ لَهُ-এর لَامْ অব্যয়টি মালিকানাজ্ঞাপক। সুতরাং তার জন্য শিকার করার অর্থ হবে– মুহ্‌রিমের জন্য এমন শিকারের গোশত খেতে আপত্তি নেই, যা সে নিজে শিকার করেনি কিংবা তার জন্য শিকার করে জীবন্ত শিকারটি তাকে দান করা হয়নি। অর্থাৎ কোনো হালাল ব্যক্তি শিকার করে জীবন্ত শিকারটি মুহ্‌রিমকে দান করে তাহলেও মুহ্‌রিমের জন্য তা খাওয়া জায়েজ নেই। তবে মুহ্‌রিমকে গোশত দান করলে তা খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিংবা হাদীসের মর্মার্থ হলো– শিকার যদি মুহ্‌রিমের নির্দেশে না করা হয়, তাহলে তা খেতে কোনো আপত্তি নেই। কেননা, মুহ্‌রিমের নির্দেশে শিকার করলেও তা খাওয়া তার জন্য জায়েজ হবে না। এ দু ব্যাখ্যার আলোকে উক্ত হাদীসটি ইমাম মালিক (র.) -এর স্বপক্ষে দলিল বলে বিবেচ্য নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) শিকার না দেখিয়ে দেওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহ্‌রিম যদি হালাল ব্যক্তিকে শিকার দেখিয়ে দেয়, তাহলে মুহ্‌রিমের জন্য এ শিকারের গোশত ভক্ষণ করা হারাম। তবে পরবর্তী যুগের মাশায়েখে কেরাম বলেন, মুহ্‌রিম শিকার দেখিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনায় রয়েছে মুহ্‌রিমের জন্য তা ভক্ষণ করা হারাম। ইমাম ত্বাহাবী (র.) থেকে এটি বর্ণিত। এর কারণ হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা.) -এর হাদীস : هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ دَلَلْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ ইহ্‌রাম অধ্যায়ে সবিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। অপর বর্ণনায় রয়েছে– মুহ্‌রিমের জন্য তা ভক্ষণ করা হরাম নয়। আবূ আব্দুল্লাহ্ জুরজানী (র.) থেকে এটি বর্ণিত।

وَفِى صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا ذَبَحَهُ الْحَلَالُ تَجِبُ قِيْمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّ الصَّيْدَ اِسْتَحَقَّ الْأَمْنَ بِسَبَبِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ حَدِيْثٍ فِيْهِ طُوْلٌ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُجْزِيْهِ الصَّوْمُ لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ وَلَيْسَتْ بِكَفَّارَةٍ فَاَشْبَهَ ضَمَانَ الْأَمْوَالِ وَهٰذَا لِأَنَّهُ يَجِبُ بِتَفْوِيْتِ وَصْفٍ فِى الْمَحَلِّ وَهُوَ الْأَمْنُ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِطَرِيْقِ الْكَفَّارَةِ جَزَاءٌ عَلٰى فِعْلِهِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى فِيْهِ وَهُوَ اِحْرَامُهُ وَالصَّوْمُ يَصْلُحُ جَزَاءَ الْأَفْعَالِ لَا ضَمَانَ الْمَحَالِّ وَقَالَ زُفَرُ (رح) يُجْزِيْهِ الصَّوْمُ اِعْتِبَارًا بِمَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْفَرْقُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ وَهَلْ يُجْزِيْهِ الْهَدْىُ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ .

অনুবাদ : যখন কোনো হালাল ব্যক্তি হারাম এলাকার শিকার জাবাই করে, তখন তার উপর মূল্য ওয়াজিব হবে, যা সে দরিদ্রদের মাঝে সদকা করে দেবে। কেননা, হারাম এলাকার কারণে শিকার নিরাপত্তার অধিকারী। দীর্ঘ এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا 'হারামের শিকারকে তাড়া করা যাবে না।' আর রোজা রাখা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা, এটা অর্থদণ্ড- কাফ্ফারা নয়। সুতরাং তা সম্পদের ক্ষতিপূরণের সদৃশ হলো। এর কারণ হলো, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়েছে পাত্রের মাঝে একটি গুণ নষ্ট করার কারণে। আর তা নিরাপত্তার অধিকারী। অপরদিকে কাফ্ফারারূপে মুহ্‌রিমের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, তা তার কর্মের শাস্তি। কেননা, তার মাঝে একটি বিদ্যমান গুণের কারণে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা হলো তার ইহ্‌রাম। আর রোজা কর্মের সাজা হওয়ার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, রোজা রাখা তার জন্য যথেষ্ট হবে- মুহ্‌রিমের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে তার উপর কিয়াস করে। উভয়ের পার্থক্য আমরা উল্লেখ করে এসেছি। এ ক্ষেত্রে হাদী যথেষ্ট হবে কিনা, এ সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো হালাল ব্যক্তি যদি হারাম এলাকার শিকার জবাই করে, তাহলে তার উপর ঐ শিকারের মূল্য ওয়াজিব হবে। এ মূল্য হারাম এলাকার দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। কেননা, হারামের সম্মানার্থে শিকার এ এলাকার হওয়ার কারণে প্রত্যেকে নিরাপত্তার অধিকারী। যেমন, এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- হারামের ঘাস কর্তন করা যাবে না এবং এর শিকারকে তাড়া করা যাবে না। লক্ষণীয় বিষয় হলো, হারাম এলাকা থেকে যখন শিকারকে তাড়ানো নিষেধ, তখন হত্যা করার অনুমতির তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এ নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে যদি কোনো হালাল ব্যক্তি শিকার জবাই করে, তাহলে হারামের সম্মানার্থে ঐ শিকারের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, শিকার হারাম এলাকার হওয়ার কারণে যেমন নিরাপত্তার অধিকারী তেমনি ইহ্‌রামের কারণেও নিরাপত্তার অধিকারী। সুতরাং মুহ্‌রিম যদি হারাম এলাকায় শিকার হত্যা করে, তাহলে তার উপর দুটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা। একটি হলো হারাম এলাকার হওয়ার কারণে। অন্যটি ইহ্‌রামের কারণে। অথচ মুহ্‌রিমের উপর একটি কাফ্ফারাই ওয়াজিব হয়।

এর উত্তরে বলা হয় যে, ইহ্‌রামের হুরমত [হারাম হওয়া] অধিকতর শক্তিশালী। আর তাই মুহ্‌রিমের জন্য হারাম ও হিল [হারামের বাইরের এলাকা] উভয় স্থানেই শিকার করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। আর হারাম এলাকায় হুরমত [হারাম হওয়া] তুলনামূলকভাবে নিম্নতর বলে তা ইহ্‌রামের হুরমতের অনুবর্তী হবে এবং সে কারণেই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, হালাল ব্যক্তি হারাম এলাকায় শিকার হত্যা করার কারণে তার উপর যে মূল্য ওয়াজিব হয়েছে এর পরিবর্তে রোজা রাখা তার জন্য জায়েজ নেই। যেমন– মুহ্‌রিমের জন্য শিকার হত্যা করার ক্ষেত্রে রোজা রাখা জায়েজ। দলিল এই যে, শিকারের মূল্য হলো অর্থদণ্ড– কাফ্‌ফারা নয়। সুতরাং তা মালের ক্ষতিপূরণের সদৃশ হলো। আর মালের ক্ষতিপূরণ রোজা দ্বারা আদায় করা যায় না, তা শধু মাল দিয়েই আদায় করা যায়– অন্য কিছু দিয়ে আদায় করা যায় না।

মুহ্‌রিম শিকার হত্যা করলে রোজা দ্বারা ক্ষতিপূরণ জায়েজ হবে, অথচ হালাল ব্যক্তি হরমের শিকার হত্যা করলে রোজা ক্ষতিপূরণ হিসেবে জায়েজ নেই। এই পার্থক্যের কারণ হলো, মুহ্‌রিমের উপর তার কর্মের শাস্তি ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর হালাল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় পাত্র তথা শিকারের মাঝে বিদ্যমান একটি গুণ নষ্ট করার কারণে। আর রোজা কর্মের সাজা হতে পারে, কিন্তু কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। এজন্য মুহ্‌রিমের ক্ষেত্রে শিকার হত্যা করলে রোজা রাখা জায়েজ আর হালাল ব্যক্তির ক্ষেত্রে রোজা রাখা যথেষ্ট হবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, হারামের শিকার হত্যা করার ক্ষেত্রেও রোজা রাখা জায়েজ, যেমন মুহ্‌রিমের ক্ষেত্রে হারামের শিকার হত্যা করলে রোজা রাখা জায়েজ। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত এটিই। পার্থক্যের কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

তবে হালাল ব্যক্তি হারামের শিকার হত্যা করার ক্ষেত্রে যদি হাদী জবাই করে, তাহলে যথেষ্ট হবে কিনা, এ সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে জায়েজ, অন্য বর্ণনা মতে জায়েজ হবে না।

وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ فَعَلَيْهِ اَنْ يُرْسِلَهُ فِيْهِ إِذَا كَانَ فِيْ يَدِهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَإِنَّهُ يَقُوْلُ حَقُّ الشَّرْعِ لَا يَظْهَرُ فِىْ مَمْلُوْكِ الْعَبْدِ لِحَاجَةِ الْعَبْدِ وَلَنَا اَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِى الْحَرَمِ وَجَبَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ اَوْ صَارَ هُوَ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ فَاسْتَحَقَّ الْاَمْنَ لِمَا رَوَيْنَا فَاِنْ بَاعَهُ رَدَّ الْبَيْعَ فِيْهِ اِنْ كَانَ قَائِمًا لِاَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزْ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ وَ ذٰلِكَ حَرَامٌ وَاِنْ كَانَ فَائِتًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِاَنَّهُ تَعَرَّضَ لِلصَّيْدِ بِتَفْوِيْتِ الْاَمْنِ الَّذِىْ اِسْتَحَقَّهُ وَكَذٰلِكَ بَيْعُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ مِنْ مُحْرِمٍ اَوْ حَلَالٍ لِمَا قُلْنَا ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি হারামের মধ্যে কোনো শিকার নিয়ে প্রবেশ করল, তার কর্তব্য হবে হারামে তা ছেড়ে দেওয়া, যদি তা তার হাতে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বান্দার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বান্দার মালিকানাধীন জিনিসে শরিয়তের হক [অধিকার] প্রকাশ পায় না। আমাদের দলিল হলো, যখন এ শিকার হারামে এসে গেছে, তখন হারামের সম্মান রক্ষার্থে পাকড়াও পরিহার করা তার উপর ওয়াজিব। কেননা, তা হারামের শিকার হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি, সে কারণে তা নিরাপত্তার যোগ্য হয়ে গেছে। যদি সে শিকার বিক্রি করে, তাহলে তা থাকা অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ, বিক্রি জায়েজ হয়নি। কেননা, এতে শিকারের প্রতি পাকড়াও করার বিষয় রয়েছে আর তা হারাম। আর যদি শিকার হারিয়ে যায়, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা, শিকার যে নিরাপত্তার অধিকারী হয়েছিল, তা হরণ করার মাধ্যমে তার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। অনুরূপ মুহরিম মুহরিমের নিকট কিংবা হালাল ব্যক্তির নিকট শিকার বিক্রির ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কারণ আমরা যা পূর্বে বলেছি তা-ই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ الخ : মাসআলা হলো, মুহরিম কিংবা হালাল যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শিকার নিয়ে হারাম এলাকায় প্রবেশ করে, তাহলে তা হারামের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া তার কর্তব্য, যদি তা তার হাতে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা ছেড়ে দেওয়া তার কর্তব্য নয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর দলিল হলো, ব্যক্তির হাতে যে শিকার রয়েছে, সে তার মালিক। আর শরিয়তের হক হলো, তা ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু বান্দার মালিকানাধীন জিনিসে শরিয়তের হক প্রকাশ পায় না। কেননা, সে প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। তবে বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের হক প্রকাশ পায়। সুতরাং বান্দার মালিকানাধীন জিনিসের ক্ষেত্রে যখন শরিয়তের হক প্রকাশ পায় না, তখন এ কারণে শিকারকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

আমাদের দলিল হলো, যখন এই শিকার হারাম এলাকায় এসে গেছে তখন হারামের সম্মান রক্ষার্থে শিকার পাকড়াও করা জায়েজ নেই। কেননা, তা হারামের শিকার হয়ে গেছে। আর হারামের শিকার হওয়ার কারণে তা নিরাপত্তার অধিকারী হয়ে গেছে। যেমন- لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا হাদীস এর দলিল। সুতরাং নিরাপত্তার অধিকারী হওয়ার কারণে তাকে ছেড়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়েছে, যাতে তার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকে।

قَوْلُهُ فَاِنْ بَاعَهُ رَدَّ الْبَيْعَ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি হারাম অঞ্চলে শিকার সঙ্গে করে প্রবেশ করত তা বিক্রি করে, তাহলে শিকার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ, এ বিক্রিই নাজায়েজ। কেননা, এতে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা পাওয়া গেছে। আর হারাম অঞ্চলে তা নিষিদ্ধ। সুতরাং বিক্রি নাজায়েজ হওয়ার কারণে তা প্রত্যাহার করা ওয়াজিব।

আর যদি শিকার পাওয়া না যায়, তাহলে বিক্রেতার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা, শিকার যে নিরাপত্তার অধিকারী হয়েছিল, তা নষ্ট করার মাধ্যমে তার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো মুহ্‌রিম যদি অন্য কোনো মুহ্‌রিমের নিকট কিংবা হালাল ব্যক্তির নিকট শিকার বিক্রি করে, তাহলে শিকার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিক্রি প্রত্যাহার করতে হবে। আর যদি শিকার পাওয়া না যায়, তাহলে তার মূল্য ওয়াজিব হবে। ইতঃপূর্বে এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে।

وَمَنْ اَحْرَمَ وَفِىْ بَيْتِهٖ اَوْ فِىْ قَفَصٍ مَعَهٗ صَيْدٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُرْسِلَهٗ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) عَلَيْهِ اَنْ يُرْسِلَهٗ لِاَنَّهٗ مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ بِاِمْسَاكِهٖ فِىْ مِلْكِهٖ فَصَارَ كَمَا اِذَا كَانَ فِىْ يَدِهٖ وَلَنَا اَنَّ الصَّحَابَةَ (رضـ) كَانُوْا يُحْرِمُوْنَ وَفِىْ بُيُوْتِهِمْ صُيُوْدٌ وَ دَوَاجِنُ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ اِرْسَالُهَا وَبِذٰلِكَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاشِيَةُ وَهِىَ مِنْ اِحْدَى الْحُجَجِ وَلِاَنَّ الْوَاجِبَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ وَهُوَ لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِنْ جِهَتِهٖ لِاَنَّهٗ مَحْفُوْظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفَصِ لَا بِهٖ غَيْرَ اَنَّهٗ فِىْ مِلْكِهٖ وَلَوْ اَرْسَلَهٗ فِىْ مَفَازَةٍ فَهُوَ عَلٰى مِلْكِهٖ فَلَا مُعْتَبَرَ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَقِيْلَ اِذَا كَانَ الْقَفَصُ فِىْ يَدِهٖ لَزِمَهٗ اِرْسَالُهٗ لٰكِنْ عَلٰى وَجْهٍ لَا يَضِيْعُ ـ

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় ইহ্‌রাম বেঁধেছে যে, তার বাড়িতে কিংবা তাঁর সঙ্গের খাঁচায় কোনো শিকার আটক রয়েছে, তার জন্য উক্ত শিকার ছেড়ে দেওয়া জরুরি নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা ছেড়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব। কেননা, সে তার মালিকানায় আটক রাখার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে। সুতরাং এটা এমন হয়ে গেল যেন তার হাতে শিকার রয়েছে। আর আমাদের দলিল হলো, সাহাবায়ে কেরাম ইহ্‌রাম বাঁধতেন- এমতাবস্থায় যে, তাঁদের বাড়ি-ঘরে শিকার ও গৃহপালিত পশু আটক থাকত এবং তাঁদের থেকে সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার কোনো ঘটনা বর্ণিত নেই। আর ছেড়ে না দেওয়াই ব্যাপক রীতি হিসেবে চলে আসছে। আর তা শরিয়তের একটি দলিলরূপে বিবেচিত। তা ছাড়া এ কারণে যে, ওয়াজিব হলো শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ না করা। অথচ তার পক্ষ থেকে [এ ক্ষেত্রে] কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। কেননা, তা বাড়ির এবং খাঁচার হেফাজতে রয়েছে, তার হেফাজতে নেই। অধিকন্তু তা তার মালিকানায় রয়েছে। সুতরাং মালিকানায় থাকার বিষয়টি ধর্তব্য নেই। কেউ কেউ বলেন, খাঁচা যদি তার হাতে থাকে, তাহলে তা ছেড়ে দেওয়া তার কর্তব্য হবে, তবে এমনভাবে যাতে তা নষ্ট না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি এমন অবস্থায় ইহ্‌রাম বাঁধে যে, তার বাড়িতে কিংবা তার সঙ্গের খাঁচায় কোনো শিকার আটক রয়েছে, তাহলে তার জন্য উক্ত শিকার ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা ছেড়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব। ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মুহ্‌রিম শিকারকে নিজের মালিকানায় আটকে রাখার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে, আর মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হারাম। এজন্যই তা ছেড়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব। সুতরাং এটা এরূপ হলো যেমন মুহ্‌রিমের হাতে শিকার রয়েছে। অর্থাৎ মুহ্‌রিমের হাতে শিকার থাকলে যেরূপ তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব, তদ্রূপ বাড়িতে কিংবা খাঁচায় থাকলেও তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব।

আমাদের দলিল হলো, সাহাবায়ে কেরাম এমন অবস্থায় ইহ্‌রাম বাঁধতেন যে, তাদের বাড়ি-ঘরে শিকার ও গৃহপালিত পশুসমূহ আটক থাকত। صُيُوْد শব্দটি صَيْد-এর বহুবচন। অর্থ– বন্যপাখি যা পোষ মেনেছে। دَوَاجِنْ শব্দটি دَاجِن-এর বহুবচন। অর্থ– হরিণ ও এ জাতীয় প্রাণী যা বকরির ন্যায় গৃহপালিত। মোদ্দাকথা হলো, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ইহ্‌রাম বাঁধতেন আর তাঁদের গৃহে শিকারের পশু আটক থাকত। আর তাঁদের থেকে সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা বর্ণিত নেই; বরং তা ছেড়ে না দেওয়াই ব্যাপক রীতি হিসেবে চলে এসেছে। আর তা দলিল হিসেবে বিবেচ্য। এজন্য আমরা সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব বলি না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ না করা মুহ্‌রিমের জন্য ওয়াজিব। অথচ এ ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। কেননা, শিকারের পশু বাড়িতে কিংবা খাঁচায় হেফাজতে রয়েছে, মুহ্‌রিমের হাতে নেই। অবশ্য তার মালিকানায় রয়েছে। আর মুহ্‌রিম যদি সেটাকে খোলা প্রান্তরে ছেড়েও দেয়, তবুও তা তার মালিকানায় থেকে যায়। এ থেকে বুঝা যায়, মালিকানায় থাকার বিষয়টি বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ না করার ক্ষেত্রে মালিকানা রহিত করা ধর্তব্য নয়; বরং হস্তক্ষেপ না করাই যথেষ্ট। কেউ কেউ বলেন, খাঁচা যদি মুহ্‌রিমের হাতে থাকে, তাহলে ছেড়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব। তবে এমনভাবে ছেড়ে দেবে যাতে তা নষ্ট না হয়। কেননা, মাল-সম্পদ নষ্ট করা হারাম। তাই যে কোনো স্থানে তা ছেড়ে দেবে না।

قَالَ فَإِنْ أَصَابَ حَلَالٌ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ الْمُرْسِلَ آمِرٌ بِالْمَعْرُوْفِ نَاهٍ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَلَهُ أَنَّهُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِالْأَخْذِ مِلْكًا مُحْتَرَمًا فَلَا يَبْطُلُ اِحْتِرَامُهُ بِإِحْرَامِهِ وَقَدْ أَتْلَفَهُ الْمُرْسِلُ فَيَضْمَنُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخَذَهُ فِيْ حَالَةِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّعَرُّضِ وَيُمْكِنُهُ ذٰلِكَ بِأَنْ يُخَلِّيَهُ فِيْ بَيْتِهِ فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَنْهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا وَنَظِيْرُهُ الْاِخْتِلَافُ فِيْ كَسْرِ الْمَعَازِفِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো হালাল ব্যক্তি শিকার ধরে অতঃপর ইহ্রাম বাঁধে আর অন্য কেউ তার হাত থেকে শিকারটি ছেড়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, যে ছেড়ে দিয়েছে সে তো সৎকাজের আদেশকারী আর অসৎকাজের নিষেধকারী। আর সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সে ব্যক্তি শিকার ধরার মাধ্যমে সংরক্ষণযোগ্য মালিকানা অর্জন করেছে। সুতরাং তার ইহ্রামের কারণে ঐ মালিকানার সংরক্ষণাধিকার রহিত হবে না। আর যে ছেড়ে দিয়েছে, সে তা বিনষ্ট করেছে। ফলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে ইহ্রাম অবস্থায় শিকার ধরার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, [এ ক্ষেত্রে] সে শিকারের মালিক হয়নি। সুতরাং হস্তক্ষেপ না করা তার উপর ওয়াজিব। আর তা এরূপ হতে পারে যে, সে নিজের শিকারকে তার বাড়িতে ছেড়ে দেবে। সুতরাং অন্য ব্যক্তি যখন তার মালিকানা নষ্ট করে দিল, তখন সে সীমালঙ্ঘনকারী হলো। এর দৃষ্টান্ত হলো গান-বাজনার উপকরণ ভেঙ্গে ফেলা সংক্রান্ত ব্যাপারের মতবিরোধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো হালাল ব্যক্তি যদি শিকার ধরে অতঃপর ইহ্রাম বাঁধে আর অন্য কেউ এই মুহ্রিমের হাত থেকে শিকারটি ছেড়ে দেয়, তাহলে যে ছেড়ে দিল সে মালিককে শিকারটির ক্ষতিপূরণ দেবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দলিল হলো, যে ছেড়ে দিল সে তো 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ'-এর পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে। সক্ষম হওয়া অবস্থায় শরিয়ত ব্যক্তির উপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাকে ওয়াজিব করেছে। আর মুহ্রিম যখন ইহ্রাম অবস্থায় শিকার হাতে রাখে, তা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নিষিদ্ধ কর্ম। এ অবস্থায় অপর কেউ তার থেকে শিকারটি ছেড়ে দিয়ে সৎকর্ম সম্পাদনের দ্বারা তাকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দিল। সুতরাং যে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে জরিমানা দিতে হবে না। কেননা, সে সৎকর্মশীল। আর তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন– وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ [সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।] অর্থাৎ যারা সৎকর্ম করে, তারা জবাবদিহিতার মুখাপেক্ষী হবে না। সুতরাং দুনিয়াতে তারা দণ্ডপ্রাপ্ত হবে না আবার আখিরাতেও শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সে ব্যক্তি হালাল অবস্থায় শিকার ধরার মাধ্যমে এমন মালিকানা অর্জন করেছে, যা সংরক্ষণশীল। সুতরাং তার ইহ্রামের কারণে উক্ত মালিকানার সংরক্ষণাধিকার রহিত হবে না। কেননা, সর্বসম্মতভাবে এখনো

তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু তা ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার সংরক্ষণীয় মালিকানা বিনষ্ট করে দিয়েছে। আর কারো মালিকানাধীন কোনো কিছু বিনষ্ট করলে, বিনষ্টকারীকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এ কারণেই যে ছেড়ে দিয়েছে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে।

কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার ধরার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, মুহ্‌রিম শিকার ধরার মাধ্যমে শিকারের মালিক হয় না। আর তাই এ ক্ষেত্রে যে ছেড়ে দিয়েছে তার উপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা, সে মুহ্‌রিমের মালিকানাধীন কোনো কিছু বিনষ্ট করেনি।

وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّعَرُّضِ : দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, হালাল অবস্থায় যে ব্যক্তি শিকার ধরার মাধ্যমে মালিকানা অর্জন করেছে আমরা এ কথা মেনে নিলাম; কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধার পর শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ পরিহার করার লক্ষ্যে তা নিজ মালিকানা থেকে মুক্ত করা আবশ্যক ছিল অথচ সে তা করেনি; বরং অন্য কেউ তা ছেড়ে দিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করেছে। সুতরাং যে ছেড়ে দিয়েছে তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যথার্থ নয়। কেননা, মুহ্‌রিমের জন্য যে কাজ করা আবশ্যক ছিল তা-ই সে সম্পাদন করেছে।

এর উত্তরে বলা হয় যে, মুহ্‌রিমের উপর ওয়াজিব ছিল শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপকরণ পরিহার করা, স্বীয় মালিকানা থেকে তা মুক্ত করা ওয়াজিব ছিল না। আর মালিকানাধীন থাকা সত্ত্বেও হস্তক্ষেপ না করা সম্ভব ছিল এভাবে যে, সে নিজের শিকারকে তার আবাসে ছেড়ে দেবে। এ অবস্থায় শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপও করা হয় না আবার মালিকানাও অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তি যখন মুহ্‌রিমের মালিকানা নষ্ট করে দেয়, তখন সে সীমালঙ্ঘনকারীরূপে বিবেচ্য হয়। আর সীমালঙ্ঘনকারীর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব, তাই ঐ ব্যক্তির উপরও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ অন্য কোনো ব্যক্তির গান-বাজনার উপকরণ ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে সাহেবাইনের মতে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে খারাপ কাজ প্রতিহত করেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে বাদ্যযন্ত্রের হিসেবে ক্ষতিপূরণ আসবে না; বরং কাটছাঁট করা কাঠের অনুপাতে ক্ষতিপূরণ হবে।

وَإِذَا اَصَابَ مُحْرِمٌ صَيْدًا فَارْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْاَخْذِ فَاِنَّ الصَّيْدَ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ فِيْ حَقِّ الْمُحْرِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا فَصَارَ كَمَا اِذَا اشْتَرَى الْخَمْرَ فَاِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ اٰخَرُ فِيْ يَدِهِ فَعَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ لِاَنَّ الْاٰخِذَ مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ بِاِزَالَتِهِ الْاَمْنَ وَالْقَاتِلُ مُقَرِّرٌ لِذٰلِكَ وَالتَّقْرِيْرُ كَالْاِبْتِدَاءِ فِيْ حَقِّ التَّضْمِيْنِ كَشُهُوْدِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ اِذَا رَجَعُوْا وَيَرْجِعُ الْاٰخِذُ عَلَى الْقَاتِلِ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَا يَرْجِعُ لِاَنَّ الْاٰخِذَ مُؤَاخَذٌ بِصُنْعِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلٰى غَيْرِهِ وَلَنَا اَنَّ الْاٰخِذَ اِنَّمَا يَصِيْرُ سَبَبًا لِلضَّمَانِ عِنْدَ اِتِّصَالِ الْهَلَاكِ بِهِ فَهُوَ بِالْقَتْلِ جُعِلَ فِعْلُ الْاٰخِذِ عِلَّةً فَيَكُوْنُ فِيْ مَعْنٰى مُبَاشَرَةِ عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيُحَالُ بِالضَّمَانِ عَلَيْهِ.

অনুবাদ : কোনো মুহ্‌রিম যদি শিকার ধরে আর অন্য কেউ তার হাত থেকে ছেড়ে দেয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা, এ ধরার মাধ্যমে সে শিকারের মালিক হয়নি। কেননা, মুহ্‌রিমের ক্ষেত্রে শিকার মালিকানা অর্জনের পাত্র থাকে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا 'স্থলের প্রাণী তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, যতক্ষণ তোমরা মুহ্‌রিম থাকবে।' সুতরাং তা এরূপ হলো যেমন কেউ মদ খরিদ করল। মুহ্‌রিমের হাতের শিকার যদি অন্য কোনো মুহ্‌রিম হত্যা করে ফেলে, তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা, যে শিকার ধরেছে সে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে। আর হত্যাকারী এর স্থায়িত্ব দান করেছে। আর ক্ষতিপূরণ প্রয়োগ করার ব্যাপারে দান করা প্রথম অপরাধের সমতুল্য। যেমন– স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে তালাক প্রদানের সাক্ষীরা জামিন হয়, যখন তারা সাক্ষী প্রত্যাহার করে নেয়। আর যে শিকার ধরেছে, সে হত্যাকারী থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে না। কেননা, শিকার পাকড়াওকারী তার কৃতকর্মের জন্য নিজেই অপরাধী। সুতরাং অন্যের থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। আর আমাদের দলিল হলো, শিকার ধরাটা ক্ষতিপূরণের কারণরূপে সাব্যস্ত হবে– তার সঙ্গে বিনষ্ট হওয়া যুক্ত হলে। সুতরাং হত্যাকারী হত্যা করার মাধ্যমে পাকড়াওকারীর কর্মটিকে কারণে পরিণত করেছে। অতএব, সে কারণের কারণ সম্পাদনকারীর সমপর্যায়ের হলো। এজন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়টি তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুহ্‌রিম যদি শিকার ধরে আর অন্য কেউ তার হাত থেকে ছেড়ে দেয়, তাহলে যে ছেড়ে দিয়েছে– সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা, মুহ্‌রিম শিকার ধরার মাধ্যমে তার মালিক হয়নি। কারণ, কোনো শিকারের প্রতি মুহ্‌রিমের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

حُرُمًا 'মুহ্রিম থাকাকালে স্থলের প্রাণী তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।' সুতরাং তা এরূপ হলো যেমন কোনো মুসলমান মদ ক্রয় করল, সে এর মালিক হবে না। আর তাই কেউ যদি এ মদ নষ্ট করে ফেলে, তাহলে তার উপর কোনো জরিমানা আসবে না। কেননা, মদ স্বভাবগতভাবেই হারাম। অনুরূপভাবে ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করাও স্বভাবগতভাবে হারাম।

قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ الخ মাসআলা : শিকার পাকড়াওকারী মুহ্রিমের হাতের শিকারকে অন্য কোনো মুহ্রিম হত্যা করলে, উভয়ের প্রত্যেকের উপর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এর দলিল হলো, শিকার পাকড়াওকারী মুহ্রিম শিকারের নিরাপত্তা বিলোপ করার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে। আর শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা ইহ্রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহের অন্তর্গত, যেগুলো বিঘ্নিত হলে জাযা ওয়াজিব হয়। এ কারণে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপের ফলে মুহ্রিমের উপর জাযা ওয়াজিব হবে।

আর শিকার হত্যাকারী মুহ্রিম এ হস্তক্ষেপকে স্থায়িত্ব দান করেছে। কেননা, সে যদি হত্যা না করত, তাহলে তা ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এতে হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি রহিত হয়ে যেত। কিন্তু অন্য মুহ্রিম তা হত্যা করার ফলে এ সম্ভাবনা মিটে যায় এবং হস্তক্ষেপের বিষয়টি স্থায়িত্ব লাভ করে। আর ক্ষতিপূরণ প্রয়োগ করার ব্যাপারে স্থায়িত্ব দান করা প্রথম অপরাধের সমতুল্য। অর্থাৎ শিকারের হত্যাকারী হস্তক্ষেপকারীর মতো হয়ে গেল। আর শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করলে যেহেতু ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়, তাই হত্যা করার ফলে হত্যাকারীর উপরও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

এর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, হিন্দা নাম্নী এক মহিলা নিজ স্বামীর সাথে মিলনের পর তালাক সংঘটিত হওয়ার কারণে পূর্ণ মাহার দাবি করেছে। আর হিন্দার স্বামী সহবাসের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে দু জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করে। এমন অবস্থায় হিন্দা পূর্ণ মাহার পাবে না। এরপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাবর্তন করলে তাদের সাক্ষ্য দানের ফলে হিন্দার যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তার জরিমানা ঐ স্বাক্ষীদ্বয়ের উপর বর্তাবে। যদিও তাদের এ অপরাধটা হিন্দার স্বামীর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পরে হয়েছে, তথাপি জরিমানার ক্ষেত্রে এটাও প্রথম অপরাধের সমতুল্য। অনুরূপভাবে হত্যাকারী মুহ্রিমও প্রথম অপরাধী হিসেবে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, শিকার পাকড়াওকারী মুহ্রিম যে ক্ষতিপূরণ দেবে, তা হত্যাকারী মুহ্রিম থেকে ফেরত নেবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। এটিই সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, শিকার পাকড়াওকারী তার কর্মের কারণে নিজেই অপরাধী। এজন্য সে অন্যের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না।

আমাদের দলিল মুহ্রিমের শিকার পাকড়াও করা ক্ষতিপূরণের কারণরূপে সাব্যস্ত হবে তখনই, যখন তার সঙ্গে 'বিনষ্ট হওয়া' সংযুক্ত হবে। অর্থাৎ পাকড়াও করার সাথে শিকার বিনষ্টও হতে হবে। কিন্তু সে শিকারকে বিনষ্ট করেনি; বরং হত্যাকারী অন্য মুহ্রিম। অতএব হত্যাকারী হত্যা করার মাধ্যমে পাকড়াওকারীর কর্মটিকে বিনষ্ট করার কারণ হয়েছে এবং সে তা নিজেই করেছে। কাজেই যেন হত্যাকারী কারণের কারণ সম্পাদনকারী হয়ে গেল। কেননা, সে হত্যা করার ফলেই শিকার পাকড়াও ক্ষতিপূরণের কারণ হলো। যদি সে হত্যা না করত, তাহলে পাকড়াও করা ক্ষতিপূরণের কারণ হতো না। এ কারণে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি হত্যাকারীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ শিকার পাকড়াওকারী মুহ্রিম যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে তা হত্যাকারী মুহ্রিমের উপর প্রত্যাবর্তিত হবে।

فَإِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَةً لَيْسَتْ بِمَمْلُوْكَةٍ وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ اِلَّا فِيْمَا جَفَّ مِنْهُ لِاَنَّ حُرْمَتَهُمَا تَثْبُتُ بِسَبَبِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا يَكُوْنُ لِلصَّوْمِ فِىْ هٰذِهِ الْقِيْمَةِ مَدْخَلٌ لِاَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْاِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِّ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَيَتَصَدَّقُ بِقِيْمَتِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَاِذَا اَدَّاهَا مَلَكَهُ كَمَا فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ .

অনুবাদ : যদি কেউ হারামের ঘাস বা মালিকানাবিহীন বৃক্ষ কেটে ফেলে অর্থাৎ যে বৃক্ষ সাধারণত মানুষ লাগায় না, তাহলে তার উপর মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে। তবে এগুলো শুকিয়ে গেলে ওয়াজিব হবে না। কেননা, হারামের কারণে উক্ত ঘাস বা বৃক্ষের কর্তন হারাম [নিষিদ্ধ] হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا 'হারামের ঘাস উপড়ানো যাবে না, কাঁটাওয়ালা গাছও কাটা যাবে না।' এ মূল্যের ক্ষেত্রে রোজার কোনো ভূমিকা নেই। কেননা, ঘাস কর্তনের হুরমত হারামের মর্যাদার কারণে, ইহ্রামের কারণে নয়। সুতরাং এটি স্থান হিসেবে ক্ষতিপূরণ যা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। আর তার মূল্য দরিদ্রদের মাঝে সদকা করবে। আর যখন তা আদায় করবে, তখন সে তার [ঘাস/ বৃক্ষের] মালিক হয়ে যাবে। যেমন– হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ হারামের ঘাস কেটে ফেলে কিংবা মালিকানাবিহীন বৃক্ষ কেটে ফেলে অর্থাৎ যে বৃক্ষ সাধারণত মানুষ রোপণ করে না; বরং নিজে থেকেই গজায়, তাহলে উক্ত ঘাস কিংবা বৃক্ষের মূল্য প্রদান তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে ঐ ঘাস কিংবা বৃক্ষ শুকিয়ে গেলে মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে না।

দলিল হলো, ঘাস কিংবা বৃক্ষ কর্তন হারাম [নিষিদ্ধ] হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে হারামের কারণে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হারামের ঘাস কাটা যাবে না এবং এর কাঁটাও উপড়ে ফেলা যাবে না। اَلْخَلَا তরতাজা ঘাসকে বলা হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হারামের ঘাস কিংবা বৃক্ষ কর্তনের ক্ষতিপূরণ রোজার দ্বারা যথেষ্ট হবে না; বরং উক্ত ঘাস কিংবা বৃক্ষের মূল্য প্রদান ওয়াজিব। কেননা, হারামের ঘাস কিংবা বৃক্ষ কর্তন হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে হারামের কারণে, ইহ্রামের কারণে নয়। সুতরাং এ মূল্য স্থান হিসেবে ক্ষতিপূরণ, মুহ্রিমের কৃতকর্মের শাস্তি নয়। ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রোজা কর্মের ক্ষতিপূরণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু পাত্র তথা স্থানের ক্ষতিপূরণ তা দ্বারা আদায় করা যায় না।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ মূল্য দরিদ্রদের মাঝে সদকা করে দেবে। আর যখন সে এ মূল্য আদায় করবে, তখন উক্ত ঘাস বা বৃক্ষের মালিক হয়ে যাবে। যেমন– হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যায়েদ ওমরের কোনো কিছু আত্মসাৎ করে ফেলল। বিচারক যায়েদকে তার মূল্য প্রদান করতে নির্দেশ দিল। আর সে নির্দেশ মতো মূল্য প্রদান করলে উক্ত আত্মসাৎকৃত জিনিসের মালিক হয়ে যাবে।

وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ لِاَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مَحْظُوْرٍ شَرْعًا فَلَوْ اَطْلَقَ لَهُ فِيْ بَيْعِهِ لِتَطَرُّقَ النَّاسُ اِلٰى مِثْلِهِ اِلَّا اَنَّهُ يَجُوْزُ الْبَيْعُ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِخِلَافِ الصَّيْدِ وَالْفَرْقُ مَا نَذْكُرُهُ وَالَّذِيْ يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً عَرَفْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ لِلْاَمْنِ بِالْاِجْمَاعِ وَلِاَنَّ الْمُحَرَّمَ الْمَنْسُوْبَ اِلَى الْحَرَمِ وَالنِّسْبَةُ اِلَيْهِ عَلَى الْكَمَالِ عِنْدَ عَدَمِ النِّسْبَةِ اِلٰى غَيْرِهِ بِالْاِنْبَاتِ وَمَا لَا يُنْبِتُ عَادَةً اِذَا اَنْبَتَهُ اِنْسَانٌ اِلْتَحَقَ بِمَا يُنْبِتُ عَادَةً.

অনুবাদ : আর তা কর্তনের পর বিক্রি করা মাকরূহ। কেননা, সে শরিয়তের নিষিদ্ধ উপায়ে তার মালিক হয়েছে, এখন যদি তাকে বিক্রির সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ এ ধরনের কাজে উৎসাহিত হবে। তবে মাকরূহ হলেও এ ধরনের বিক্রি জায়েজ। তবে শিকারের বিষয়টি ভিন্ন। উভয়ের মাঝে পার্থক্য সামনে বর্ণনা করব। মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা [ঘাস কিংবা বৃক্ষ] রোপণ করে থাকে তা নিরাপত্তার অধিকারী নয়– এ কথা আমরা 'ইজমা-এর মাধ্যমে জেনেছি। আর এজন্য যে, নিষিদ্ধ হলো ঐ সমস্ত বৃক্ষ যা হারামের সাথে সম্পৃক্ত। [আর হারামের সাথে] পূর্ণরূপে সম্পৃক্তি সাব্যস্ত হবে– রোপণের মাধ্যমে অন্যের দিকে সম্পৃক্তি সাব্যস্ত না হলে। যেগুলো সাধারণত রোপণ করা হয় না সেগুলো কেউ রোপণ করলে, সেটাও ঐ সকল উদ্ভিদের সাথে যুক্ত, যেগুলো সাধারণত রোপণ করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ الخ – মাসআলা : হারামের ঘাস কিংবা বৃক্ষ কেটে বিক্রি করা মাকরূহ। কেননা, সে শরিয়তের নিষিদ্ধ উপায়ে এ ঘাস কিংবা বৃক্ষের মালিক হয়েছে। এখন যদি বিক্রির অবাধ অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ খুঁজবে। আর হারামের কোনো বৃক্ষও অবশিষ্ট থাকবে না। তবে বিক্রি করলে মাকরূহ হলেও তা বৈধ হবে। শিকারের বিষয়টি ভিন্ন। শিকার বিক্রি করা মাকরূহ হওয়ার সাথেও জায়েজ নেই। উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ সামনে বর্ণনা করা হবে। فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

قَوْلُهُ وَالَّذِيْ يُنْبِتُهُ النَّاسُ الخ : যে ঘাস কিংবা বৃক্ষ স্বাভাবিকভাবে রোপণ করা হয় তা নিরাপত্তা লাভের অধিকারী নয়। এর উপর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি লোকেরা হারাম এলাকায় ফসল ফলায় এবং তা কর্তন করে। কেউ এ ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেনি। এ থেকে বুঝা যায়, মানুষ সাধারণত যেসব উদ্ভিদ রোপণ করে, তা নিরাপত্তা লাভের অধিকারী নয়।

দ্বিতীয়ত যেসব বৃক্ষ ও ঘাস হারামের সাথে সম্পৃক্ত, তা কর্তন করা হারাম। আর হারামের সাথে পরিপূর্ণরূপে সম্পৃক্তি সাব্যস্ত হবে তখনি যখন রোপণের সম্পৃক্তি অন্যের দিকে করা হবে না।

আর যেসব উদ্ভিদ সাধারণত রোপণ করা হয় না– তা যদি কেউ রোপণ করে, তাহলে তাও ঐ উদ্ভিদের সাথে যুক্ত হবে যেগুলো সাধারণত রোপণ করা হয়।

وَلَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهٖ فِيْ مِلْكِ رَجُلٍ فَعَلٰى قَاطِعِهٖ قِيْمَةٌ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ حَقًّا لِلشَّرْعِ وَقِيْمَةٌ أُخْرٰى ضَمَانًا لِمَالِكِهٖ كَالصَّيْدِ الْمَمْلُوْكِ فِي الْحَرَمِ وَمَا جَفَّ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَا ضَمَانَ فِيْهِ لِأَنَّهٗ لَيْسَ بِنَامٍ وَلَا يُرْعٰى حَشِيْشُ الْحَرَمِ وَلَا يُقْطَعُ إِلَّا الْإِذْخِرُ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِيْهِ لِأَنَّ فِيْهِ ضَرُوْرَةً فَإِنَّ مَنْعَ الدَّوَابِّ عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَالْقَطْعُ بِالْمَشَافِرِ كَالْقَطْعِ بِالْمَنَاجِلِ وَحَمْلُ الْحَشِيْشِ مِنَ الْحِلِّ مُمْكِنٌ فَلَا ضَرُوْرَةَ بِخِلَافِ الْإِذْخِرِ لِأَنَّهٗ اِسْتَثْنَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فَيَجُوْزُ قَطْعُهٗ وَرَعْيُهٗ وَبِخِلَافِ الْكَمْاَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جُمْلَةِ النَّبَاتِ ـ

অনুবাদ : [যে উদ্ভিদ সাধারণত রোপণ করা হয় না] যদি তা কারো মালিকানাধীন জমিতে নিজে নিজেই অঙ্কুরিত হয়, তাহলে হারামের সম্মান রক্ষার্থে শরিয়তের হক হিসেবে কর্তনকারীর উপর তার মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে। মালিকের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরেকটি মূল্য ওয়াজিব হবে, যেমন হারামে মালিকানাধীন শিকার হত্যা করলে হয়ে থাকে। আর হারামের যে বৃক্ষ শুকিয়ে যায়, তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা, তা বর্ধনশীল নয়। হারামের ঘাসে পশু চরানো যাবে না। 'ইযখির' নামক গাছ ছাড়া কোনো কিছু কাটাও যাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, [হারামের] ঘাসে পশু চরানোতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এর প্রয়োজন রয়েছে। আর তা থেকে পশুকে ফিরানো দুষ্কর। আমাদের দলিল হলো তা-ই, যা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আর পশুর দাঁত দিয়ে কাটা কাস্তে দিয়ে কাটার সমতুল্য। আর 'হিল' থেকে ঘাস বহন করে আনা সম্ভব বলে হারামের ঘাসে পশু চরানোর প্রয়োজন নেই। 'ইযখির' নামক ঘাসের হুকুম ভিন্ন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষিদ্ধ ঘাস থেকে এটিকে ভিন্ন করেছেন। সুতরাং তা কর্তন করা এবং তাতে পশু চরানো জায়েজ। 'ছত্রাক'-এর হুকুম ভিন্ন। কেননা তা মূলত উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যেসব উদ্ভিদ সাধারণত রোপণ করা হয় না, তা যদি হারাম অঞ্চলে কারো মালিকানাধীন জমিতে অঙ্কুরিত হয়, তাহলে তা কর্তনকারীর উপর দু'টি মূল্য ওয়াজিব হবে। একটি হলো শরিয়তের হক হিসেবে হারামের সম্মান রক্ষার্থে। আরেকটি মূল্য ওয়াজিব হবে মালিকের ক্ষতিপূরণ হিসেবে। যেমন– হারামের মধ্যে কারো মালিকানাধীন শিকার হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর দু'টি মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হয়। একটি হারামের সম্মান রক্ষার্থে, দ্বিতীয়টি মালিকের ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, হারামের যে ঘাস কিংবা বৃক্ষ শুকিয়ে গেছে, তা কাটলে জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কেননা তা বর্ধনশীল নয়। অথচ বর্ধনশীল বৃক্ষকে কাটার ফলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهٗ وَلَا يُرْعٰى حَشِيْشُ الْحَرَمِ الخ : মাসআলা হলো, হারামের ঘাস কাটা কিংবা ঘাসে পশু চরানো জায়েজ নেই। তবে 'ইযখির' নামক বৃক্ষ হারাম অঞ্চলে কর্তন করা জায়েজ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, হারামের ঘাসে পশু চরানোতে কোনো আপত্তি নেই। অর্থাৎ হারামের ঘাসে পশু চরানোর অনুমতি রয়েছে, তবে ঘাস কাটার অনুমতি নেই। কেননা, পশু চরানোর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত যখন হজ কিংবা উমরার জন্য লোকজন সওয়ারির পশু সহ হারামে প্রবেশ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পশুদেরকে ঘাস থেকে বিরত রাখা দুষ্কর। এজন্য চরানোর প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলিল হলো, ইতঃপূর্বে বর্ণিত হাদীস। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا 'হারামের ঘাস উপড়ানো যাবে না।' আর 'হিল' [হেরেমের বাহির এলাকা] থেকে ঘাস কেটে এনে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

وَالْقَطْعُ بِالْمَشَافِرِ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো হাদীসে হারামের ঘাস কর্তনের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে, ঘাসে পশু চরানো নিষেধ করা হয়নি। সুতরাং পশু চরানো জায়েজ হওয়া উচিত। এর উত্তরে বলা হয় যে, দাঁত যখন নিষিদ্ধ, তখন দাঁত দিয়ে কাটা তথা চরানোও নিষিদ্ধ হবে। 'ইযখির' ঘাসের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষিদ্ধ ঘাস থেকে এটিকে আলাদা করেছেন। যেমন– বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– "হারামের ঘাস উপড়ানো যাবে না এবং এর কাঁটাবিশিষ্ট উদ্ভিদও কাটা যাবে না।" তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! ইযখির ছাড়া। কেননা, তা কবরে ও ঘরে সুগন্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে বললেন, হ্যাঁ, ইযখির ছাড়া।" তবে 'ছত্রাক' -এর হুকুম ভিন্ন। তা সাধারণত বর্ষার সময় দেখা যায়। হারামের মধ্যে তা কর্তন করা জায়েজ। কেননা, মূলত এটা উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكَرْنَا اَنَّ فِيْهِ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِحَجَّتِهِ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) دَمٌ وَاحِدٌ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهُ مُحْرِمٌ بِاِحْرَامٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا بِاِحْرَامَيْنِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ قَالَ اِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيْقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِالْعُمْرَةِ اَوِ الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) لِمَا اَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيْقَاتِ اِحْرَامٌ وَاحِدٌ وَبِتَاخِيْرِ وَاجِبٍ وَاحِدٍ لَا يَجِبُ اِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ـ

অনুবাদ : আমরা যা [অপরাধ] উল্লেখ করেছি, কিরান হজকারী যদি এগুলোর কোনো একটি করে, এতে ইফরাদকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে, সে ক্ষেত্রে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো হজের কারণে, অন্যটি উমরার কারণে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, একটা দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তাঁর মতে কিরানকারী একটি ইহ্‌রাম দ্বারা মুহ্‌রিম। আর আমাদের মতে সে দুটি ইহ্‌রাম দ্বারা মুহ্‌রিম। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কিত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে সে যদি উমরার কিংবা হজের ইহ্‌রাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। [আমাদের দলিল হলো,] মীকাতের সময় তার কর্তব্য ছিল একটি ইহ্‌রাম বাঁধা। আর একটি ওয়াজিব বিলম্বিত হওয়ার কারণে একটি মাত্র 'জাযা' ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : পূর্বে উল্লিখিত অপরাধগুলো থেকে কোনো একটিতে লিপ্ত হলে ইফরাদ হজকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে আর কিরান হজকারীর উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি দম ওয়াজিব হবে হজের কারণে, অন্যটি ওয়াজিব হবে উমরার কারণে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কিরানকারীর উপরও একটি দম ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ।

এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো, তাঁর মতে কিরানকারী একটি ইহ্‌রাম দ্বারা মুহ্‌রিম। পক্ষান্তরে আমাদের মতে সে দুটি ইহ্‌রাম দ্বারা মুহ্‌রিম। কিরান অধ্যায়ে এর দলিলসমূহ অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং তাঁর মতে কিরানকারীর ইহ্‌রাম একটি হওয়ার কারণে অপরাধের দমও একটি ওয়াজিব হবে। আর আমাদের নিকট দুটি হওয়ার কারণে দুটি দম ওয়াজিব হবে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে আমাদের মতেও কিরানকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। তা হলো কিরানের ইচ্ছুক ব্যক্তি ইহ্‌রাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। যদিও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও দুটি দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, কিরানকারী হজ ও উমরা উভয়টির ইহ্‌রাম মীকাত থেকে বিলম্বিত করেছে। প্রত্যেক ইহ্‌রামের জন্য একটি করে দম ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল, মীকাতের সময় হজ ও উমরা উভয়ের জন্য একটি ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। আর একটি ওয়াজিব বিলম্বিত হওয়ার কারণে একটি মাত্র 'জাযা' ওয়াজিব হতে পারে; দুটি নয়। এজন্য এ ক্ষেত্রে একটি দম ওয়াজিব হবে।

وَإِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِيْ قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشَّرِكَةِ يَصِيْرُ جَانِيًا جِنَايَةً تَفُوْقُ الدَّلَالَةَ فَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِيْ قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ لِاَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ عَنِ الْمَحَلِّ لَاجَزَاءُ عَنِ الْجِنَايَةِ فَيَتَّحِدُ بِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ كَرَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً يَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَعَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ ـ

অনুবাদ : দু জন মুহরিম যদি একটি শিকার হত্যায় শরিক হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর পূর্ণ 'জাযা' ওয়াজিব হবে। কেননা, তাদের প্রত্যেকে হত্যাকর্মে শরিক হওয়ায় এমন অপরাধী হলো, যা শিকার দেখিয়ে দেওয়ার চেয়ে গুরুতর। সুতরাং অপরাধ একাধিক হওয়ার কারণে 'জাযা'ও একাধিক হবে। যদি দুজন হালাল ব্যক্তি হারামের কোনো শিকার হত্যায় শরিক হয়, তাহলে উভয়ের উপর একটি 'জাযা' ওয়াজিব হবে। কেননা, ক্ষতিপূরণ পাত্রের [শিকার] স্থলবর্তী, অপরাধের শাস্তি নয়। সুতরাং পাত্র [শিকার] এক হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণও এক হবে। যেমন– দুজন লোক ভুলক্রমে একজনকে হত্যা করলে উভয়ের উপর একটি দিয়ত ওয়াজিব হবে; কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় তাদের প্রত্যেকের উপর আলাদাভাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ الخ – মাসআলা : যদি দুজন হালাল ব্যক্তি একত্রে হারামের কোনো শিকার হত্যা করে, তাহলে উভয়ের উপর একটিই 'জাযা' ওয়াজিব হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণটি পাত্র তথা শিকারের স্থলবর্তী; অপরাধ কর্মের শাস্তি নয়। আর পাত্র [শিকার] যেহেতু একটি, তাই ক্ষতিপূরণও একটি ওয়াজিব হবে। যেমন– দুজন লোক মিলে যদি ভুলক্রমে কোনো একজনকে হত্যা করে, তাহলে তাদের উভয়ের উপর একটি দিয়ত ওয়াজিব হবে, আর কাফফারা উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, দিয়ত হলো পাত্রের ক্ষতিপূরণ আর কাফ্ফারা কর্মের ক্ষতিপূরণ। আর পাত্র তথা নিহত যেহেতু একজন, সেহেতু দিয়তও একটি ওয়াজিব হবে। আর কর্ম দুটি হওয়ার কারণে প্রত্যেকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

وَاِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ اَوْ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِاَنَّ بَيْعَهُ حَيًّا تَعَرُّضٌ لِلصَّيْدِ بِتَفْوِيْتِ الْاَمْنِ وَبَيْعَهُ بَعْدَ مَا قَتَلَهُ بَيْعُ مَيْتَةٍ وَمَنْ اَخْرَجَ ظَبْيَةً مِنَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ اَوْلَادًا فَمَاتَتْ هِيَ وَاَوْلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ لِاَنَّ الصَّيْدَ بَعْدَ الْاِخْرَاجِ مِنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًّا لِلْاَمْنِ شَرْعًا وَلِهٰذَا وَجَبَ رَدُّهُ اِلَى مَاْمَنِهِ وَهٰذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسْرِيْ اِلَى الْوَلَدِ فَاِنْ اَدّٰى جَزَاءَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلَدِ لِاَنَّ بَعْدَ اَدَاءِ الْجَزَاءِ لَمْ تَبْقَ اٰمِنَةً لِاَنَّ وُصُوْلَ الْخَلْفِ كَوُصُوْلِ الْاَصْلِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : মুহ্‌রিম যদি শিকার বিক্রি করে কিংবা ক্রয় করে, তাহলে বেচাকেনা বাতিল হবে। কেননা, শিকার জীবিতের ক্ষেত্রে মুহ্‌রিমের বিক্রির অর্থ হলো, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মাধ্যমে সেটার প্রতি হস্তক্ষেপ করা। আর হত্যার পর বিক্রি করার অর্থ–মৃত বিক্রি করা। যে ব্যক্তি হারাম থেকে হরিণী ধরে নিয়ে গেল এবং তা কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করল, অতঃপর সে তার বাচ্চাসহ মারা গেল, তাহলে সবক'টির মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, হারাম থেকে বের করার পরও শরিয়তের দৃষ্টিতে শিকারটি নিরাপত্তার যোগ্য। এজন্যই তাকে নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। এটি একটি শরিয়ত অনুমোদিত গুণ। সুতরাং তা শিকারের বাচ্চার মাঝেও সম্প্রসারিত হবে। আর যদি 'জাযা' আদায় করার পর বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে বাচ্চার 'জাযা' আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, 'জাযা' আদায় করার পর তা আর নিরাপদ থাকে না। কারণ, স্থলবর্তী পৌছে যাওয়া মূল পৌছে যাওয়ার নামান্তর। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الخ - মাসআলা : মুহ্‌রিমের জন্য শিকার ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েজ। কেননা, মুহ্‌রিম হয়তো জীবন্ত শিকার বিক্রি করবে কিংবা শিকার জবাই করে বিক্রি করবে। জীবন্ত শিকার বিক্রির ক্ষেত্রে শিকারের নিরাপত্তা নষ্ট করার মাধ্যমে সেটার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়, আর তা নিষিদ্ধ। আর জবাই করার পর বিক্রির অর্থ হলো মৃত বিক্রি করা। আর মৃতের বেচাকেনা নিষিদ্ধ। এজন্যই আমরা উভয় অবস্থায় মুহ্‌রিমের বেচাকেনাকে বাতিল বলেছি। আর মুহ্‌রিমের ক্ষেত্রে শিকার স্বভাবগতভাবে হারাম (حَرَامٌ لِعَيْنِهِ)। এজন্যই তা মূল্যযোগ্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে না। আর যা মূল্যযোগ্য সম্পদ নয় তার বেচাকেনা বাতিল বলে পরিগণিত হয়। সুতরাং মুহ্‌রিমের শিকার বিক্রি করাও জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَخْرَجَ ظَبْيَةً مِنَ الْحَرَمِ الخ - মাসআলা : হারাম অঞ্চল থেকে হরিণীকে মুহ্‌রিম কিংবা হালাল ব্যক্তি ধরে নিয়ে গেল, অতঃপর হরিণীটি কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করল, এরপর বাচ্চাসহ হরিণীটি মারা গেল, তাহলে সে ব্যক্তির উপর সবক'টির মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, হারাম অঞ্চল থেকে শিকার ধরে নিয়ে যাওয়ার পরও তা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। এ কারণেই তাকে তার নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। আর নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হওয়ার শরিয়ত অনুমোদিত গুণটি শিকারের বাচ্চার মাঝেও সম্প্রসারিত হবে। তবে যদি হরিণের জাযা ওয়াজিব হওয়ার পর বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে বাচ্চার 'জাযা' তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, 'জাযা' আদায় করার পর তা আর নিরাপদ থাকে না। কেননা, এর স্থলবর্তী তথা মূল্য দরিদ্রের নিকট পৌছে যাওয়া মূল শিকার হরিণ হারামে পৌছে যাওয়ার সমতুল্য। সঠিক বিষয় আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

بَابُ مُجَاوَزَةِ الْوَقْتِ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ

وَاِذَا اَتَى الْكُوْفِيُّ بُسْتَانَ بَنِىْ عَامِرٍ فَاَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَاِنْ رَجَعَ اِلٰى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَبّٰى بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ وَاِنْ رَجَعَ اِلَيْهِ وَلَمْ يُلَبِّ حَتّٰى دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ لِعُمْرَتِهٖ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالاَ اِنْ رَجَعَ اِلَيْهِ مُحْرِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَبّٰى اَوْ لَمْ يُلَبِّ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لاَ يَسْقُطُ لَبّٰى اَوْ لَمْ يُلَبِّ لِاَنَّ جِنَايَتَهُ لَمْ تَرْتَفِعْ بِالْعَوْدِ وَصَارَ كَمَا اِذَا اَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوْبِ وَلَنَا اَنَّهُ تَدَارَكَ الْمَتْرُوْكَ فِىْ اَوَانِهٖ وَ ذٰلِكَ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِى الْاَفْعَالِ فَيَسْقُطُ الدَّمُ بِخِلَافِ الْاِفَاضَةِ لِاَنَّهُ لَمْ يَتَدَارَكِ الْمَتْرُوْكَ عَلٰى مَا مَرَّ ـ

পরিচ্ছেদ : ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা

অনুবাদ : কূফার অধিবাসী কোনো লোক যদি বনূ 'আমির'-এর বাগানে এসে যায় আর উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে অতঃপর 'যাতে ইরক'-এ ফিরে যায় এবং তালবিয়া পড়ে, তাহলে তার থেকে মীকাত অতিক্রম করার দম রহিত হয়ে যাবে। আর যদি ফিরে এসে তালবিয়া না পড়ে এবং মক্কায় প্রবেশ করে উমরার তওয়াফ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলে তালবিয়া পাঠ করুক বা না করুক তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, দম রহিত হবে না– তালবিয়া পাঠ করুক বা না করুক। কেননা, ফিরে আসার কারণে তার অপরাধ [মীকাত থেকে ইহ্‌রাম না করা] রহিত হবে না। এটা এরূপ হলো যেমন, আরাফা থেকে [ইমামের পূর্বে] বের হয়ে সূর্যাস্তের পর আবার ফিরে আসা। আমাদের দলিল হলো, সে পরিত্যক্ত আমলটি যথাসময়ে পূরণ করে নিয়েছে। আর তা হলো হজের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং দম রহিত হয়ে যাবে। তবে আরাফা থেকে বের হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, পরিত্যক্ত আমলটি সে পূরণ করেনি। যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অপরাধ ও তার বিভিন্ন ধরনের আলোচনা শেষ করে ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। কেননা, এটাও অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহ্‌রামের পূর্বে এ অপরাধ সংঘটিত হয়।

আলোচ্য ইবারতে কূফার অধিবাসী বলতে মীকাতের বহিরাগত উদ্দেশ্য। আর বনূ 'আমির-এর বাগান দ্বারা মক্কার নিকটস্থ মীকাতের ভিতরে, কিন্তু হারামের বাইরে অবস্থিত স্থান উদ্দেশ্য।

'যাতে ইরক' কূফার অধিবাসীদের মীকাত :

সূরতে মাসআলা এই যে, কোনো বহিরাগত ব্যক্তি যদি ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে এবং উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে লক্ষ্য করতে হবে– ইহ্‌রাম বাঁধার পর সে উমরার কর্ম শুরু করেছে কিনা। যদি উমরার কার্যাদি শুরু করার পূর্বে মীকাতে ফিরে গিয়ে তালবিয়া পড়ে, তাহলে ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করার কারণে যে দম ওয়াজিব হয়েছিল; তা রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি সে মীকাতে ফিরে এসে তালবিয়া না পড়ে এবং মক্কায় প্রবেশ করে উমরার তওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। মীকাতে ফিরে এসে তালবিয়া পাঠ করা আবশ্যক। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

সাহেবাইন (র.) বলেন, সে যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় মীকাতে ফিরে আসে, তাহলে তালবিয়া পাঠ করুক বা না করুক, তার উপর কোনো দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তালবিয়া পাঠ করুক বা না করুক দম রহিত হবে না। এটিই ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, মীকাতে ফিরে আসার কারণে ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করার অপরাধ রহিত হবে না। আর অপরাধ রহিত না হওয়ার কারণে দমও রহিত হবে না। এটি এরূপ হলো, যেমন কোনো হাজী ইমামের পূর্বে আরাফার মাঠ থেকে বের হয়ে সূর্যাস্তের পর আবার আরাফায় ফিরে এসেছে এবং ইমামের সাথে বের হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইমামের পূর্বে আরাফা থেকে বের হওয়ার কারণে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়েছিল, তা পুনর্বার ফিরে আসার কারণে রহিত হবে না। তদ্রূপ ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করার ক্ষেত্রেও যে দম ওয়াজিব হয়েছে, তা মীকাতে পুনরায় ফিরে আসার দ্বারা রহিত হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের যৌথ দলিল হলো, সে পরিত্যক্ত আমল তথা ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করার কাজটি যথাসময়ে পূরণ করে নিয়েছে। আর যথাসময় হলো হজের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত। আর যথাসময়ে পূরণ করা কার্যকর হওয়ায় তার উপর যে দম ওয়াজিব হয়েছিল, তা রহিত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ইমামের পূর্বে আরাফা থেকে বের হয়ে আসার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে সে ছেড়ে দেওয়া আমলটি পূরণ করেনি। কেননা, সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে আরাফায় অবস্থান করেনি। সূর্যাস্তের পর ফিরে আসলে ছেড়ে দেওয়া আমলটি পূরণ করা কিভাবে সম্ভব? মোদ্দাকথা, এ ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া আমলটি পূরণ করা হয়নি বলে সূর্যাস্তের পূর্বে ইমামের আগে আরাফা থেকে বের হওয়ার ফলে তার উপর যে দম ওয়াজিব হয়েছিল, তা রহিত হবে না।

غَيْرَ أَنَّ التَّدَارُكَ عِنْدَهُمَا بِعَوْدِهِ مُحْرِمًا لِأَنَّهُ أَظْهَرَ حَقَّ الْمِيقَاتِ كَمَا إِذَا مَرَّ بِهِ مُحْرِمًا سَاكِتًا وَعِنْدَهُ بِعَوْدِهِ مُحْرِمًا مُلَبِّيًا لِأَنَّ الْعَزِيمَةَ فِي حَقِّ الْإِحْرَامِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا تَرَخَّصَ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى الْمِيقَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ حَقِّهِ بِإِنْشَاءِ التَّلْبِيَةِ وَكَانَ التَّلَافِي بِعَوْدِهِ مُلَبِّيًا وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ مَكَانَ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ عَادَ بَعْدَ مَا ابْتَدَأَ الطَّوَافَ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِالْاِتِّفَاقِ وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ يَسْقُطُ بِالْاِتِّفَاقِ وَهٰذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إِذَا كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ .

অনুবাদ : কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্ষতিপূরণ হলো মুহ্রিম অবস্থায় ফিরে আসা। কেননা, সে মীকাতের হক প্রকাশ করেছে। যেমন– যদি সে ইহ্রাম অবস্থায় নীরবে মীকাত অতিক্রম করে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইহ্রাম অবস্থায় তালবিয়া পাঠসহ ফিরে আসার মাধ্যমে [ক্ষতিপূরণ হবে]। কেননা, ইহ্রামের ক্ষেত্রে আযীমত হলো নিজ গৃহ থেকে ইহ্রাম বাঁধা। যখন সে মীকাত পর্যন্ত ইহ্রামকে বিলম্বিত করার মাধ্যমে রুখসত গ্রহণ করল তখন তার অবশ্য কর্তব্য হবে, তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে মীকাতের হক আদায় করা। একই রকম মতভিন্নতা রয়েছে যদি মীকাত অতিক্রম করার পর উমরার স্থলে হজের ইহ্রাম বাঁধে। আর উপরোল্লিখিত মতভিন্নতা সকল ক্ষেত্রে। আর যদি [মীকাতের দিকে] ফিরে এসে তাওয়াফ শুরু করে এবং হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার থেকে দম রহিত হবে না। আর যদি ইহ্রামের পূর্বে ফিরে আসে [মীকাতে], তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে দম রহিত হয়ে যাবে। আমরা যা উল্লেখ করলাম তা প্রযোজ্য হবে তখনই–যখন সে হজ বা উমরার ইচ্ছা করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর দলিল একই ছিল তবে غَيْرَ أَنَّ التَّدَارُكَ থেকে উভয়ের দলিলের ভিন্নতা বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহেবাইন (র.)-এর মতে মুহ্রিম অবস্থায় ফিরে আসার দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়, তালবিয়া পাঠের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা, সে মীকাতের হক– ইহ্রাম প্রকাশ করেছে। এটি এরূপ হলো যেমন, যদি কেউ ইহ্রাম বেঁধে নীরব অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করে, তালবিয়া পাঠ না করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়েজ। তদ্রূপ এখানেও তালবিয়া পড়ে ফিরে আসা জরুরি নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ক্ষতিপূরণ হবে ইহ্রাম অবস্থায় তালবিয়া পাঠসহ ফিরে আসার মাধ্যমে। কেননা, ইহ্রামের ক্ষেত্রে আযীমত হলো আপন গৃহ থেকে ইহ্রাম বাঁধা, আর রুখসত হলো মীকাত থেকে ইহ্রাম বাঁধা। সুতরাং যখন সে ইহ্রামকে মীকাত পর্যন্ত বিলম্বিত করার মাধ্যমে রুখসত গ্রহণ করল, তখন তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে ইহ্রাম পূর্ণ করা তার উপর অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং ইহ্রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রাম করার ক্ষতিপূরণ হবে তালবিয়া পাঠ অবস্থায় ফিরে আসার মাধ্যমে; তালবিয়া পাঠ ছাড়া শুধু ফিরে আসার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ হবে না। উপরোল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে একই রকম মতভিন্নতা রয়েছে, যখন কেউ মীকাত অতিক্রম করার পরে উমরার স্থলে হজের ইহ্রাম বাঁধে। ইহ্রামের পর উমরার কাজ শুরু করার পূর্বে মীকাতে ফিরে গেলে বর্ণিত আলোচনা প্রযোজ্য হবে।

তবে হাজী যদি তওয়াফ শুরু ও হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার পর মীকাতের দিকে ফিরে আসে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর থেকে দম রহিত হবে না। আর যদি সে ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে মীকাতে ফিরে আসে, তাহলে সকলের মতেই দম রহিত হয়ে যাবে। ইহ্রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে দম ওয়াজিব হবে বলে আমরা যা উল্লেখ করলাম, তা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন সে হজ্জ কিংবা উমরার নিয়ত করে।

فَإِنْ دَخَلَ الْبُسْتَانَ لِحَاجَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ وَقْتُهُ الْبُسْتَانُ وَهُوَ وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّعْظِيْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِقَصْدِهِ وَإِذَا دَخَلَهُ الْتَحَقَ بِأَهْلِهِ وَلِلْبُسْتَانِيِّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِلْحَاجَةِ فَكَذٰلِكَ لَهُ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَ وَقْتُهُ الْبُسْتَانُ جَمِيْعُ الْحِلِّ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَكَذَا وَقْتُ الدَّاخِلِ الْمُلْحَقِ بِهِ فَإِنْ أَحْرَمَا مِنَ الْحِلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ يُرِيْدُ بِهِ الْبُسْتَانِيَّ وَالدَّاخِلَ فِيْهِ لِأَنَّهُمَا أَحْرَمَا مِنْ مِيْقَاتِهِمَا .

অনুবাদ : সুতরাং সে যদি নিজস্ব প্রয়োজনে বনূ 'আমিরের বাগানে প্রবেশ করে, তাহলে সে ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারে এবং [সেক্ষেত্রে] তার মীকাত হবে উক্ত বাগান। আর সে এবং উক্ত স্থানের অধিবাসী সমপর্যায়ের। কেননা, উক্ত বাগানের তাজীম ওয়াজিব নয়। এজন্য এ স্থানের উদ্দেশ্যে আগমনের কারণে তার উপর ইহ্‌রাম আবশ্যক নয়। আর যখন সে এ স্থানে প্রবেশ করল, তখন এর অধিবাসীদের মতোই হয়ে গেল। আর স্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনে ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের অনুমতি রয়েছে, তাই তার জন্যও অনুমতি থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য وَ وَقْتُهُ الْبُسْتَانُ-এর অর্থ– মীকাত ও হারামের মধ্যবর্তী সকল হালাল অঞ্চল। ইতঃপূর্বে তা গেছে। সুতরাং যে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করে স্থানীয়দের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে, তার মীকাত হবে এটি। অতঃপর তারা উভয়ে যদি 'হিল' থেকে ইহ্‌রাম বাঁধে এবং আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তাদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। 'উভয়'-এর দ্বারা স্থানীয় বাসিন্দা ও সেখানে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তারা উভয়ে তাদের মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, যদি হারামের বহিরাগত কোনো লোক ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে ইহ্‌রাম ছাড়াই বনূ আমিরের বাগান তথা হারামের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তার উপর কিছুই আসবে না। এখন সে বনূ আমিরের বাগান থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। এর অর্থ হলো, মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা তার জন্য আবশ্যক নয়; বরং সে স্থান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। এর মর্মার্থ এই নয় যে, ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েজ। কেননা, আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) লিখেছেন যে, সমস্ত কিতাব থেকে জানা যায়, মক্কায় প্রবেশ করতে হলে ইহ্‌রাম বাঁধা আবশ্যক। চাই সে হজ কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে আসুক আর ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসুক।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, উক্ত এলাকার অধিবাসীদের ন্যায় সে ব্যক্তির মীকাত হবে উক্ত বাগান। অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে উক্ত বাগান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা– মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ক্ষেত্রে বনূ 'আমিরের বাগানে প্রবেশকারী ব্যক্তিও উক্ত স্থানের অধিবাসী সমপর্যায়ের। এ স্থানই তাদের মীকাত। এই বহিরাগতকে তার মীকাত থেকে-ইহ্‌রাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। কেননা, উক্ত বাগান তথা মীকাতের অভ্যন্তরস্থ এলাকার তাজীম ওয়াজিব নয়। এজন্য উক্ত বাগানের উদ্দেশ্যে আগমনের কারণে তার উপর ইহ্‌রাম ওয়াজিব হবে না। কেননা, এ বহিরাগত বিনা ইহ্‌রামে বনূ 'আমিরের বাগানে প্রবেশ করে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের মতোই হয়ে গেল। আর তাদের জন্য যেহেতু প্রয়োজনে বিনা ইহ্‌রামে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি রয়েছে, সেহেতু তার জন্যও প্রয়োজন সাপেক্ষে ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েজ। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.)-এর বক্তব্যের মর্মার্থ হলো– স্থানীয় বাসিন্দারা মীকাত ছাড়াই ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করবে। তবে যাদের জন্য উক্ত স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধর হুকুম রয়েছে, তাদের সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা আবশ্যক। কেননা, ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্তি 'তার মীকাত হলো বাগান' -এর মর্মার্থ হলো, মীকাত ও হারামের মধ্যবর্তী 'হিল' অঞ্চল– শুধু সে বাগান উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বনূ আমিরের বাগানে প্রবেশ করে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের সাথে যুক্ত হয়ে গেল, তার মীকাত হলো 'হিল'-এর সম্পূর্ণ এলাকা যা মীকাত ও হারামের মধ্যে অবস্থিত– বাগানের সাথে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং উক্ত এলাকায় প্রবেশকারী এবং উক্ত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা 'হিল' থেকে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা, তারা উভয়ে মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছে। আর তাদের মীকাত হলো 'হিল'।

وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عَامِهِ ذٰلِكَ اِلَى الْوَقْتِ وَاَحْرَمَ بِحَجَّةٍ عَلَيْهِ اَجْزَاهُ ذٰلِكَ مِنْ دُخُوْلِهِ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَا يُجْزِيْهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ اِعْتِبَارًا بِمَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ النَّذْرِ فَصَارَ كَمَا اِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ وَلَنَا اَنَّهُ تَلَافَى الْمَتْرُوْكَ فِيْ وَقْتِهِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَعْظِيْمُ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ بِالْاِحْرَامِ كَمَا اِذَا اَتَاهُ مُحْرِمًا بِحَجَّةِ الْاِسْلَامِ فِي الْاِبْتِدَاءِ بِخِلَافِ مَا اِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ لِاَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِيْ ذِمَّتِهِ فَلَا يَتَاَدّٰى اِلَّا بِالْاِحْرَامِ مَقْصُوْدٌ كَمَا فِي الْاِعْتِكَافِ الْمَنْذُوْرِ فَاِنَّهُ يَتَاَدّٰى بِصَوْمِ رَمَضَانَ مِنْ هٰذِهِ السَّنَةِ دُوْنَ الْعَامِ الثَّانِيْ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মক্কায় বিনা ইহ্রামে প্রবেশ করল অতঃপর সে বছরই মীকাতের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং ফরজ হজের ইহ্রাম বাঁধল, তার এই ইহ্রাম বিনা ইহ্রামে মক্কায় প্রবেশের জন্য [প্রতিকাররূপে] যথেষ্ট হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, যথেষ্ট হবে না, এটিই কিয়াসের দাবি। মান্নতের কারণে ওয়াজিব হওয়া হজের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে এটা বলা হয়েছে। সুতরাং এটা পরবর্তী বছরের হজ করার মতো হলো। আমাদের দলিল হলো, সে সময় মতো পরিত্যক্ত আমলটি আদায় করে নিয়েছে। কেননা, তার উপর ওয়াজিব ছিল ইহ্রামের মাধ্যমে এ পবিত্র ভূমির সম্মান প্রদর্শন করা। যেমন শুরুতে যদি ফরজ হজের ইহ্রাম বেঁধে আসত। তবে পরের বছরে হজ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এটা তার জিম্মায় অনাদায়ীরূপে রয়ে গেছে। সুতরাং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কৃত স্বতন্ত্র ইহ্রাম ছাড়া তা আদায় হবে না। যেমন মান্নতের ই'তিকাফের ক্ষেত্রে। কেননা, উক্ত ই'তিকাফ বর্তমান বছরের রমজানের রোজার সাথে আদায় হতে পারে, দ্বিতীয় বছরের রোজার সাথে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি বিনা ইহ্রামে মক্কায় প্রবেশ করে, তাহলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তার উপর হজ কিংবা উমরা করা আবশ্যক হয়ে যাবে। অতঃপর সে বছরেই ঐ মীকাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে ফরজ হজ কিংবা নফল হজ অথবা উমরার ইহ্রাম বেঁধে ফেলে, তাহলে বিনা ইহ্রামে মক্কায় প্রবেশের কারণে তার উপর যে হজ কিংবা উমরা আবশ্যক ছিল তা এই হজ কিংবা উমরার দ্বারা প্রতিকাররূপে যথেষ্ট হবে। ভিন্নভাবে আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, এটা যথেষ্ট হবে না। এটাই কিয়াসের দাবি। কিয়াস হলো, কারো উপর মান্নতের কারণে হজ করা ওয়াজিব ছিল। সে ফরজ হজ আদায় করলে মান্নতের কারণে ওয়াজিব হওয়া হজ তার থেকে রহিত হবে না; বরং ভিন্নভাবে তা আদায় করতে হবে। তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও ফরজ হজ আদায় করার ফলে ঐ হজ তার থেকে রহিত হবে না, যা বিনা ইহ্রামে মক্কায় প্রবেশের কারণে তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল। এটা পরবর্তী বছরের হজ করার মতো হলো। অর্থাৎ যদি কেউ বিনা ইহ্রামে মক্কায় প্রবেশ করে অতঃপর পরবর্তী বছর ফরজ হজ আদায় করে, তাহলে এই ফরজ হজ পূর্ববর্তী হজের স্থলবর্তী হবে না, যা ইহ্রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের কারণে তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল।

আমাদের দলিল হলো, সে ছেড়ে দেওয়া আমলটি তথা বিনা ইহ্রামে মক্কায় প্রবেশের কারণে তার উপর যে হজ কিংবা উমরা ওয়াজিব হয়েছিল, তা যথাসময়ে আদায় করেছে– এভাবে যে, সে বছরেই ফরজ হজ আদায় করার মাধ্যমে সে তার উপর ওয়াজিবকৃত হজ কিংবা উমরা আদায় করেছে। কেননা, তার অবশ্য কর্তব্য ছিল ইহ্রামের মাধ্যমে পবিত্র ভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা– যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন। আর তা পাওয়া গেছে। এজন্য আলাদাভাবে আরেকটি হজ বা উমরা করার প্রয়োজন থাকে না। যেমন– শুরুতেই যদি ফরজ হজের ইহ্রাম বেঁধে সে আসত, তাহলে তার ফরজ হজ যেটির সে নিয়ত করেছে তা এবং বিনা ইহ্রামে মক্কায় প্রবেশের কারণে তার উপর যে হজ কিংবা উমরা ওয়াজিব হয়েছে- উভয়টির জন্যই যথেষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে বছরান্তে হজ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, মক্কায় প্রবেশের ফলে যে হজ ওয়াজিব ছিল– তা তার জিম্মায় অনাদায়ীরূপে রয়ে গেছে। কেননা, উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কৃত স্বতন্ত্র ইহ্রামের দ্বারা তা আদায় হয়। যেমন– মান্নতের ই'তিকাফের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কেউ বর্তমান বছরে রমজানের ই'তিকাফের মান্নত করল, আর ই'তিকাফের ক্ষেত্রে রোজা রাখা আবশ্যক, তাহলে বর্তমান বছরেই রমজানের রোজার সাথে ই'তিকাফ আদায় করতে হবে। পরের বছরের রোজার সঙ্গে ই'তিকাফ আদায় হবে না; বরং সেক্ষেত্রে রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পৃথক রোজার মাধ্যমে ই'তিকাফের কাজা আদায় করতে হবে।

وَمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ فَاَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَفْسَدَهَا مَضٰى فِيْهَا وَقَضَاهَا لِاَنَّ الْاِحْرَامَ يَقَعُ لَازِمًا فَصَارَ كَمَا اِذَا اَفْسَدَ الْحَجَّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الْوَقْتِ وَعَلٰى قِيَاسِ قَوْلِ زُفَرَ (رح) لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَهُوَ نَظِيْرُ الْاِخْتِلَافِ فِيْ فَائِتِ الْحَجِّ اِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ وَفِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ وَاَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ اَفْسَدَ حَجَّتَهُ هُوَ يَعْتَبِرُ الْمُجَاوَزَةَ هٰذِهِ بِغَيْرِهَا مِنَ الْمَحْظُوْرَاتِ وَلَنَا اَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا حَقَّ الْمِيْقَاتِ بِالْاِحْرَامِ مِنْهُ فِى الْقَضَاءِ وَهُوَ يَحْكِى الْفَائِتَ وَلَا يَنْعَدِمُ بِهٖ غَيْرُهُ مِنَ الْمَحْظُوْرَاتِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মীকাত অতিক্রম করার পর উমরার ইহ্রাম বাঁধল এবং তা নষ্ট করে ফেলল, সে উমরার কার্যাবলি সম্পন্ন করবে এবং তা কাজা করবে। কেননা, ইহ্রাম অবশ্য পালনীয়রূপে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা হজ নষ্ট করার মতোই হলো। আর মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র.) -এর মতের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে তার থেকে দম রহিত হবে না। এ মতপার্থক্য ইহ্রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রমের পর হজ ফউত হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতভিন্নতার মতোই এবং বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রমের পর হজের ইহ্রাম বেঁধে হজ নষ্ট করে দেওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতপার্থক্যের মতো। ইমাম যুফার (র.) মীকাত অতিক্রমকে এ ছাড়া অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের সাথে তুলনা করেছেন। আর আমাদের দলিল হলো, কাজা করার সময় সে মীকাত থেকে ইহ্রাম বাঁধার মাধ্যমে ইহ্রামের হক আদায় করেছে। আর কাজার মাধ্যমে ফউত হওয়া আমলটিই অনুরূপ আদায় করেছে। এর কারণে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ অস্তিত্বহীন হয়ে যাচ্ছে না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করে উমরার ইহ্রাম বাঁধে অতঃপর তা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তিনটি বিধান রয়েছে। একটি হলো, উমরার কার্যাদি সম্পন্ন করবে। দ্বিতীয়টি হলো, মীকাত থেকে ইহ্রাম বেঁধে তার কাজা করবে। তৃতীয়টি হলো, বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর যে দম ওয়াজিব হয়েছিল তা রহিত হয়ে যাবে।

প্রথমটির দলিল হলো, ইহ্রাম একটি অবশ্যপালনীয় চুক্তি। ব্যক্তি তা বাঁধার পর হজ কিংবা উমরার কার্যাদি সম্পন্ন করা ছাড়া তা থেকে মুক্ত হতে পারে না। এজন্য উমরার কার্যাদি সম্পন্ন করবে।

দ্বিতীয়টির দলিল হলো, বিশুদ্ধ পন্থায় উমরা পালন সে আবশ্যক করে নিয়েছিল। কিন্তু সেভাবে আদায় হয়নি বলে তার কাজা করা ওয়াজিব হবে।

আর তৃতীয়টি তথা তার উপর থেকে দম রহিত হওয়ার দলিল হলো, মীকাত থেকে ইহ্রাম বেঁধে উমরা কাজা করার দ্বারা সে ক্ষতিপূরণ করেছে, যা বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে হয়েছিল। সুতরাং ক্ষতিপূরণের ফলে দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দম ওয়াজিব হয়েছিল। যেমন– কেউ নামাজে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে নামাজ ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় কাজা করে নিল, তাহলে তার উপর যে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছিল, তা রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উমরা কাজা করা সত্ত্বেও তার উপর থেকে দম রহিত হবে না। একই মতভিন্নতা রয়েছে যখন কেউ বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার পর হজের ইহ্রাম বাঁধে, কিন্তু হজ পায় না; বরং তা ফউত হয়ে যায়। অতঃপর পরবর্তী বছরে এ হজের কাজা করে নেয়, তাহলে বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর যে দম ওয়াজিব হয়েছিল তা রহিত হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে রহিত হবে না।

অনুরূপভাবে একই মতভিন্নতা রয়েছে এ ক্ষেত্রেও– যখন কেউ বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার পর হজের ইহ্রাম বাঁধে অতঃপর আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীসহবাসের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনোভাবে হজ নষ্ট করে ফেলে এবং তার কাজা করে, তাহলে আমাদের মতে বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর যে দম ওয়াজিব হয়েছিল তা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.)-এর মতে রহিত হবে না।

ইমাম যুফার (র.) বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করাকে ইহ্রামের অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যদি কেউ ইহ্রাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করে কিংবা সেলাই করা কাপড় পরিধান করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হয়। হজ ফউত হয়ে গেলে কাজা করার কারণে এই দম রহিত হবে না। তদ্রূপ বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর যে দম ওয়াজিব হয়েছে, হজ ফউত হওয়ার কারণে তাও রহিত হবে না।

আমাদের দলিল হলো, কাজা করার সময় মীকাত থেকে ইহ্রাম বাঁধার মাধ্যমে সে ইহ্রামের হজ আদায় করে দিয়েছে। আর কাজাও তো ফউত হয়ে যাওয়া হজের অনুরূপ। যেন কাজা ফউত হয়ে যাওয়া হজের স্থলবর্তী। সুতরাং সে যেন বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করেনি। আর বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম না করলে দমও ওয়াজিব হবে না। কেননা, দম তো এরই কারণেই ওয়াজিব হয়েছিল।

আর ইহ্রামের অন্যান্য নিষিদ্ধ কর্ম তথা সুগন্ধি ব্যবহার, সেলাই করা কাপড় পরিধান প্রভৃতি হজ ফউত হওয়ার কারণে এবং তা কাজা করার দ্বারা অস্তিত্বহীন হয়ে যায় না; বরং তা অবশিষ্ট থেকে যায়। আর ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজ অবশিষ্ট থাকলে, দমও অবশিষ্ট থাকবে-রহিত হবে না। সুতরাং বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করা আর ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

وَإِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ يُرِيْدُ الْحَجَّ فَأَحْرَمَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْحَرَمِ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِأَنَّ وَقْتَهُ الْحَرَمُ وَقَدْ جَاوَزَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَإِنْ عَادَ إِلَى الْحَرَمِ وَلَبَّى أَوْ لَمْ يُلَبِّ فَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَفَاقِيْ وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَأَحْرَمَ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ وَإِحْرَامُ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ لِمَا ذَكَرْنَا فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ بِتَأْخِيْرِهِ عَنْهُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْحَرَمِ وَأَهَلَّ فِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ فِي الْأَفَاقِيْ ـ

অনুবাদ : মাক্কী যদি হজের উদ্দেশ্যে 'হিল' থেকে বের হয় আর ইহ্‌রাম বাঁধে এবং হারামে ফিরে না এসে আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তার উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে। কেননা, মাক্কীদের মীকাত হলো হারাম। আর সে তা বিনা ইহ্‌রামে অতিক্রম করেছে। এরপর যদি সে হারামে ফিরে আসে, তাহলে তালবিয়া পাঠ করুক বা না করুক বহিরাগত সম্পর্কে আমরা যে মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছি, এখানেও সেই মতপার্থক্য প্রযোজ্য হবে। তামাত্তু'কারী যখন তার উমরা থেকে ফারিগ হয় এবং হারাম থেকে বের হয়ে হজের ইহ্‌রাম বাঁধে ও আরাফায় অবস্থান করে, তখন তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সে যখন মক্কায় প্রবেশ করে উমরার যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করল তখন সে মাক্কীর সমপর্যায়ে হয়ে গেল। আর মাক্কীর ইহ্‌রাম হারাম থেকে হয়। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং হারামের বাহিরে ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে দম ওয়াজিব হবে। সে যদি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে হারামে ফিরে এসে সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। বহিরাগতের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানেও তা বিদ্যমান থাকবে।

بَابُ إِضَافَةِ الْإِحْرَامِ

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) إِذَا أَحْرَمَ الْمَكِّيُّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ لَهَا شَوْطًا ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يَرْفُضُ الْحَجَّ وَعَلَيْهِ لِرَفْضِهِ دَمٌ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) رَفْضُ الْعُمْرَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَقَضَاهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ رَفْضِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِيْ حَقِّ الْمَكِّيِّ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ وَالْعُمْرَةُ أَوْلٰى بِالرَّفْضِ لِأَنَّهَا أَدْنٰى حَالًا وَ أَقَلُّ أَعْمَالًا وَأَيْسَرُ قَضَاءً لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُوَقَّتَةٍ ـ

পরিচ্ছেদ : ইহ্‌রামের সম্পর্ক সম্বন্ধে

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মাক্কী যদি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে এক চক্কর তওয়াফ করার পর হজের ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে সে হজ ছেড়ে দেবে। আর হজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং তার উপর একটি হজ ও একটি উমরা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমাদের নিকট উমরা বর্জন করা উত্তম। পরে উমরা কাজা করবে এবং তা বর্জন করার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, দুটির কোনো একটি বর্জন করা জরুরি। কেননা, মাক্কীর ক্ষেত্রে হজ ও উমরা উভয়কে একত্র করা শরিয়তসম্মত নয়। আর তাই উমরা বর্জন করাই উত্তম। কারণ, তা মর্যাদার দিক থেকে নিম্নতর এবং কর্মের দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। আর কাজা করার ব্যাপারেও তা সহজতর– নির্ধারিত সময়ের সাথে আবদ্ধ না হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাক্কীর ক্ষেত্রে হজ ও উমরা একত্র করা জায়েজ নেই; বরং তাদের ক্ষেত্রে তা অপরাধ বলে বিবেচ্য। তদ্রূপ বহিরাগতদের ক্ষেত্রে উমরার ইহ্‌রামকে হজের ইহ্‌রামের সাথে একত্র করা অপরাধ হিসেবে গণ্য। তবে তাদের ক্ষেত্রে হজের ইহ্‌রামকে উমরার ইহ্‌রামের সাথে একত্র করা অপরাধ নয়। যেহেতু তা মক্কাবাসীদের ক্ষেত্রে অপরাধ, তাই 'অপরাধ ও ত্রুটি' অধ্যায়ের পর তা উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলা : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মাক্কী যদি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে এক চক্কর তওয়াফ করে ফেলে অতঃপর হজের ইহ্‌রাম বাঁধে তথা হজের নিয়ত করে, তাহলে হজ ছেড়ে দেবে। আর হজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার উপর একটি কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর কাজা হিসেবে একটি হজ ও একটি উমরা ওয়াজিব হবে। লক্ষণীয় হলো, এ উমরা কাজা নয়; বরং প্রত্যেক কাজা হজের সাথে উমরাও করতে হয়।

সাহেবাইন (র.) বলেন, পছন্দনীয় কথা হচ্ছে– উমরা বর্জন করে পরবর্তীতে কাজা করে নেবে। তবে উমরা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। তাঁদের দলিল হলো, হজ ও উমরার মধ্য থেকে যে কোনো একটি বর্জন করা তো অনিবার্য। কেননা, মাক্কীর ক্ষেত্রে হজ ও উমরা উভয়কে একত্র করা শরিয়ত সম্মত নয়। সুতরাং যা শরিয়ত সম্মত নয় তা থেকে বাঁচার জন্য যে কোনো একটিকে পরিহার করা আবশ্যক। আর হজের তুলনায় উমরা বর্জন করাই উত্তম। কেননা, উমরা মর্যাদার দিক থেকে নিম্নতর এবং ক্রিয়াকর্মের দিক থেকেও স্বল্প। কারণ, উমরার ক্ষেত্রে মাত্র দুটি আমল রয়েছে। একটি হলো তওয়াফ আর অন্যটি হলো সা'ঈ। আর হজের আমল তার থেকে বেশি। আবার কাজা করার ব্যাপারেও তা সহজতর। কেননা, উমরার নির্ধারিত কোনো সময় নেই; বরং দুই ঈদ ও তাশরীকের দিনগুলো ব্যতীত বছরের যে কোনো সময়ে উমরা করা জায়েজ।

وَكَذَا إِذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَ الْحَجَّ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَتَعَذَّرَ رَفْضُهَا كَمَا إِذَا فَرَغَ مِنْهَا وَكَذٰلِكَ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَلَهُ أَنَّ إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ قَدْ تَأَكَّدَ بِأَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهَا وَإِحْرَامُ الْحَجِّ لَمْ يَتَأَكَّدْ وَرَفْضُ غَيْرِ الْمُتَأَكِّدِ أَيْسَرُ وَلِأَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ وَالْحَالَةُ هٰذِهِ إِبْطَالَ الْعَمَلِ وَفِي رَفْضِ الْحَجِّ امْتِنَاعٌ عَنْهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ بِالرَّفْضِ أَيُّهُمَا رَفَضَهُ لِأَنَّهُ تَحَلَّلَ قَبْلَ أَوَانِهِ لِتَعَذُّرِ الْمُضِيِّ فِيهِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمُحْصَرِ إِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرَ وَفِي رَفْضِ الْحَجِّ قَضَاءَهُ وَعُمْرَةً لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ .

অনুবাদ : অনুরূপভাবে একই হুকুম হবে যদি উমরার কোনো কর্ম শুরু না করে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর হজের ইহ্‌রাম বাঁধে, আমরা পূর্বে যা বলে এসেছি সে কারণে। যদি উমরার চার চক্কর তওয়াফ করে অতঃপর হজের ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে দ্বিমত ছাড়াই সে হজ বর্জন করবে। কেননা, অধিকাংশের ক্ষেত্রে সমগ্রের হুকুম প্রযোজ্য। সুতরাং তা বর্জন করা দুষ্কর। যেমন– সে যদি উমরা থেকে ফারিগ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে একই হুকুম হবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি উমরার জন্য এর চেয়ে কম চক্কর তওয়াফ করে। তাঁর দলিল হলো, কিছু আমল আদায় করার মাধ্যমে উমরার ইহ্‌রাম জোরদার হয়েছে; পক্ষান্তরে হজের ইহ্‌রাম জোরদার হয়নি। আর যা জোরদার নয় তা বর্জন করা সহজ। অধিকন্তু এ অবস্থায় উমরা বর্জন করার অর্থ আমল নষ্ট করা, আর হজ বর্জন করার অর্থ তা থেকে বিরত থাকা। আর যেটাই বর্জন করুক সে কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে সময়ের পূর্বে সে হালাল হয়ে গেছে। সুতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির মতো হলো। তবে উমরা বর্জন করার ক্ষেত্রে শুধু উমরার কাজা করতে হবে। পক্ষান্তরে হজ বর্জন করার ক্ষেত্রে হজ কাজা করতে হবে এবং একটি উমরাও আদায় করতে হবে। কেননা, সে হজ ফউতকারীর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, এমনিভাবে কেউ যদি প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে এবং পরে হজের ইহ্‌রাম বাঁধে, কিন্তু এখনো উমরার কোনো ক্রিয়াকর্ম শুরু করেনি; তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উমরা বর্জন করবে– পূর্ববর্তী দলিলের কারণে যে, উমরা হজ থেকে মর্যাদার দিক থেকে নিম্নতর ......।

আর যদি উমরার চার চক্কর তওয়াফ করে ফেলে অতঃপর হজের ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে হজ বর্জন করবে। কেননা, অধিকাংশের জন্য সমগ্রের হুকুম প্রযোজ্য। আর তাই সে যেন সমগ্র তওয়াফই সম্পন্ন করে ফেলেছে। আর তওয়াফ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে তা বর্জন করা কঠিন। কেননা, কা'বা শরীফ তওয়াফই তো উমরা। সুতরাং তা এমন হয়ে গেল যে, সে উমরা থেকে ফারিগ হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে উমরা থেকে ফারিগ হয়ে উমরা বর্জন করা সম্ভব নয় এমনিভাবে যদি উমরার জন্য

চার চক্করের কম তওয়াফ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট উমরা বর্জন করা কঠিন। আর সাহেবাইন (র.)-এর নিকট তা বর্জন করা কঠিন কিছু নয়। তাঁদের দলিল পূর্বোক্ত মাসআলায় لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ رَفْضِ أَحَدِهِمَا الخ -এর অধীনে অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মাক্কীর উমরার এক চক্কর তওয়াফ কিংবা চার চক্করের চেয়ে কম তওয়াফ করার ফলে উমরার কিছু আমল আদায় করার মাধ্যমে উমরার ইহ্‌রাম জোরদার হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে হজের ইহ্‌রাম জোরদার হয়নি। আর যা জোরদার নয়, তা বর্জন করা সহজ। এজন্য হজ বর্জন করবে।

দ্বিতীয়ত উমরা শুরু করার পর তা বর্জন করলে আমল বিনষ্ট করা লাযেম আসে। আর হজ বর্জন করার ক্ষেত্রে হজ থেকে বিরত থাকা লাযেম আসে। আর কোনো আমল বিনষ্ট করার তুলনায় তা থেকে বিরত থাকা সহজ। এ কারণেও হজ বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

অবশ্য যেটাই বর্জন করবে, সেটা বর্জন করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সে সময়ের পূর্বেই হালাল হয়েছে। অর্থাৎ আমলসমূহ আদায় করার পূর্বেই সে হালাল হয়ে গেছে। কেননা, পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তার কারণ হলো, মক্কাবাসীদের জন্য হজ ও উমরা উভয়টিকে একত্র করা জায়েজ নেই। সুতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সমপর্যায়ের হলো। আর অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর একটি কুরবানি ওয়াজিব হয় বলে এ ক্ষেত্রেও তার উপর একটি কুরবানি ওয়াজিব হবে।

مُحْصَرٌ [অবরুদ্ধ ব্যক্তি] যে ব্যক্তি শত্রু কিংবা অন্য কোনো কারণে হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

তবে উমরা বর্জন করার ক্ষেত্রে যেমন সাহেবাইন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, শুধু উমরার কাজা করতে হবে। অর্থাৎ কাজা হিসেবে শুধু উমরা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত অনুসারে হজ বর্জন করলে, তার উপর হজের কাজা ওয়াজিব হবে এবং হজের সাথে একটি উমরাও আদায় করতে হবে। কেননা, হজের কাজার ক্ষেত্রে হজের সাথে উমরাও ওয়াজিব হয়। কেননা, সে হজ ফউতকারীর সমপর্যায়ে হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় গেল, কিন্তু হজ পেল না– তার উপর হজের সঙ্গে উমরাও লাযেম হয়।

وَاِنْ مَضٰى عَلَيْهِمَا اَجْزَاهُ لِاَنَّهٗ اَدّٰى اَفْعَالَهُمَا كَمَا الْتَزَمَهُمَا غَيْرَ اَنَّهٗ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا وَالنَّهْىُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْفِعْلِ عَلٰى مَا عُرِفَ مِنْ اَصْلِنَا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِجَمْعِهٖ بَيْنَهُمَا لِاَنَّهٗ تَمَكَّنَ النُّقْصَانُ فِىْ عَمَلِهٖ لِاِرْتِكَابِهِ الْمَنْهِىَّ عَنْهُ وَهٰذَا فِىْ حَقِّ الْمَكِّىِّ دَمُ جَبْرٍ وَفِىْ حَقِّ الْاٰفَاقِىْ دَمُ شُكْرٍ وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ اَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِحَجَّةٍ اُخْرٰى فَاِنْ حَلَقَ فِى الْاُوْلٰى لَزِمَتْهُ الْاُخْرٰى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَحْلِقْ فِى الْاُوْلٰى لَزِمَتْهُ الْاُخْرٰى وَعَلَيْهِ دَمٌ قَصَّرَ اَوْ لَمْ يُقَصِّرْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا اِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اِحْرَامَىِ الْحَجِّ اَوْ اِحْرَامَىِ الْعُمْرَةِ بِدْعَةٌ فَاِذَا حَلَقَ فَهُوَ اِنْ كَانَ نُسُكًا فِى الْاِحْرَامِ الْاَوَّلِ فَهُوَ جِنَايَةٌ عَلَى الثَّانِىْ لِاَنَّهٗ فِىْ غَيْرِ اَوَانِهٖ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ بِالْاِجْمَاعِ وَاِنْ لَمْ يَحْلِقْ حَتّٰى حَجَّ فِى الْعَامِ الْقَابِلِ فَقَدْ اَخَّرَ الْحَلْقَ عَنْ وَقْتِهٖ فِى الْاِحْرَامِ الْاَوَّلِ وَ ذٰلِكَ يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا فَلِهٰذَا سَوّٰى بَيْنَ التَّقْصِيْرِ وَعَدَمِهٖ عِنْدَهٗ وَشَرَطَ التَّقْصِيْرَ عِنْدَهُمَا .

অনুবাদ : আর যদি সে উভয়টি [হজ ও উমরা] আদায় করে, তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, সে উভয়টির আমল যেভাবে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে, সেভাবে তা আদায় করেছে। তবে উভয়টি একত্র করা নিষিদ্ধ। আর আমাদের মূলনীতি থেকে জানা যায় যে, 'নিষেধ' কর্মের অস্তিত্বকে রোধ করে না। তবে উভয় আমল একত্র করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার আমলের মধ্যে ত্রুটি এসে গেছে। মাক্কীর ক্ষেত্রে এটা ক্ষতিপূরণের দম আর বহিরাগতের ক্ষেত্রে এটা শুকরিয়ার দম। যে ব্যক্তি হজের ইহ্‌রাম বাঁধল অতঃপর জিলহজের দশ তারিখে আরেকটি হজের ইহ্‌রাম বাঁধল, আর যদি সে প্রথমটির হলক করে, তাহলে দ্বিতীয় হজও তার জন্য ওয়াজিব হবে। তার উপর কোনো কিছুই আসবে না। আর যদি সে প্রথম হজের হলক না করে, তাহলেও অপর হজটি তার উপর ওয়াজিব হবে, এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সে চুল ছাটুক বা না ছাটুক তার উপর দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, যদি চুল না ছাঁটে তাহলে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, হজের দুটি ইহ্‌রাম কিংবা উমরার দুটি ইহ্‌রাম একত্র করা বিদ'আত। সুতরাং যখন সে হলক করবে, তা যদিও প্রথম ইহ্‌রামের জন্য একটি আমল, কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য তা অপরাধ। কেননা, তা অসময়ে হয়েছে। সুতরাং সর্বসম্মতভাবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি আগামী বছর হজ করার পূর্বে হলক না করে, তাহলে প্রথম ইহ্‌রামের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় থেকে ইহ্‌রামকে বিলম্বিত করল। আর তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব করে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। যেমন– ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এ কারণেই তাঁর নিকট চুল ছাঁটা না ছাঁটাকে তিনি অভিন্ন সাব্যস্ত করেছেন আর সাহেবাইন (র.) চুল ছাঁটার শর্তারোপ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا -মাসআলা : মাক্কী যদি হজ কিংবা উমরার কোনো একটিকে বর্জন না করে; বরং উভয়টিই আদায় করে, তাহলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে। কেননা, উভয় আমল যেভাবে সে নিজের জন্য নির্ধারণ করেছে, সেভাবে আদায় করেছে। যদিও মাক্কীর ক্ষেত্রে হজ ও উমরা উভয়টি একসঙ্গে আদায় করা নিষিদ্ধ। কিন্তু 'নিষেধ' কর্মের অস্তিত্বকে রোধ করে না যেমন ফিক্‌হের মূলনীতিতে রয়েছে। তবে ঐ মাক্কীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে হজ ও উমরাকে একত্র করার কারণে। কেননা, তার আমলে ত্রুটি এসে গেছে। কারণ, সে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে।

মাক্কীর ক্ষেত্রে এটি হলো ক্ষতিপূরণের দম। তাই এ থেকে সে খেতে পারবে না। এটা দরিদ্রদের হক। পক্ষান্তরে বহিরাগতদের ক্ষেত্রে তা শুকরিয়ার দম। আর তাই তা থেকে সে খেতে পারবে। এটা একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, মাক্কীদের ক্ষেত্রে হজ ও উমরা একত্রে আদায় করা অপরাধ বলে বিবেচ্য আর বহিরাগতদের ক্ষেত্রে উভয়কে একত্রে আদায় করা নিয়ামতরূপে গণ্য। কুরবানি উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। মাক্কীর ক্ষেত্রে তা ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর বহিরাগতদের ক্ষেত্রে তা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। 'আল্লাহ ! আল্লাহ' একই বিষয় কারো ক্ষেত্রে গুনাহর কাজ আবার কারো ক্ষেত্রে নিয়ামতরূপে বিবেচ্য।

وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ الخ - মাসআলা : যদি কেউ হজের ইহ্‌রাম বাঁধে অতঃপর দশই জিলহজে আগামী বছরের জন্য আরেক হজের ইহ্‌রাম বাঁধে তাহলে দুটি সুরত হবে।

১. দ্বিতীয় হজের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে প্রথম হজ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে মাথা মুণ্ডন করেছে।

২. মাথা মুণ্ডন করেনি।

যদি প্রথম হজ থেকে ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডন করে অতঃপর আগামী বছরের জন্য জিলহজের দশ তারিখে ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে তার উপর দ্বিতীয় হজ ওয়াজিব হবে। আর এ দ্বিতীয় হজটি আগামী বছর সম্পন্ন করবে, সে সময় পর্যন্ত সে মুহ্‌রিম হিসেবে থাকবে এবং তার উপর দম কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে দুটি ইহ্‌রাম একত্র করেনি; বরং মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে প্রথম ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে, অথচ দুটি ইহ্‌রাম একত্র করা হলো বিদ'আত। সুতরাং সে যখন বিদ'আতে লিপ্ত হয়নি, তখন তার উপর অপরাধের দমও ওয়াজিব হবে না।

আর যদি প্রথম হজ থেকে ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডন না করে, তাহলেও দ্বিতীয় হজটি তার উপর ওয়াজিব হবে। আর দ্বিতীয় ইহ্‌রামের পর তার উপর দম ওয়াজিব হবে চুল ছাঁটুক বা না ছাঁটুক। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে দ্বিতীয় হজের ইহ্‌রাম বাঁধার পর যদি চুল না ছাঁটে, তাহলে তার উপর কোনো দম ওয়াজিব হবে না। তাঁদের দলিল হলো, হজের দুই ইহ্‌রাম একত্র করা কিংবা উমরার দুই ইহ্‌রাম একত্র করা সর্বসম্মতিক্রমে বিদ'আত। সুতরাং যখন দ্বিতীয় হজের ইহ্‌রাম বাঁধার পর সে হলক করবে, তখন সেই 'হলক' যদিও প্রথম ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হজের একটি আমল, কিন্তু দ্বিতীয় ইহ্‌রামের জন্য তা অপরাধ। কেননা, এ 'হলক' দ্বিতীয় হজের আমল সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে অসময়ে হয়েছে। আর এতো স্বতঃসিদ্ধ যে, অসময়ে মাথা মুণ্ডন করলে দম ওয়াজিব হয়। এজন্য এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) সকলের মতেই দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি আগামী বছর হজ করার পূর্বে হলক না করে, তাহলে প্রথম হজের হলককে যথাসময় থেকে অনেক বিলম্বিত করে ফেলল। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, কোনো আমলকে তার যথাসময় থেকে বিলম্বিত করলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব হয়। আর সাহেবাইনের মতে দম ওয়াজিব হয় না। এ মূলনীতির ভিত্তিতে বলা হয় যে, দ্বিতীয় হজের ইহ্‌রামের পর চুল ছাঁটুক বা না ছাঁটুক উভয় ক্ষেত্রেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইন চুল ছাঁটার শর্তারোপ করেছেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় ইহ্‌রামের পর চুল ছাঁটলে দম ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়।

وَمَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلاَّ التَّقْصِيْرَ فَأَحْرَمَ بِأُخْرٰى فَعَلَيْهِ دَمٌ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ إِحْرَامَيِ الْعُمْرَةِ وَهٰذَا مَكْرُوْهٌ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَهُوَ دَمُ جَبْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوْعٌ فِيْ حَقِّ الْآفَاقِيِّ وَالْمَسْأَلَةُ فِيْهِ فَيَصِيْرُ بِذٰلِكَ قَارِنًا لٰكِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ فَيَصِيْرُ مُسِيْئًا فَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَلَمْ يَأْتِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَهُوَ رَافِضٌ لِعُمْرَتِهِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا إِذْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحَجِّ غَيْرُ مَشْرُوْعَةٍ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَافِضًا حَتّٰى يَقِفَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি চুল ছাঁটা ছাড়া উমরা থেকে ফারিগ হয়েছে অতঃপর অন্য উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে সময়ের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে। কেননা, সে উমরার দুটি ইহ্‌রাম একত্র করেছে, আর তা মাকরূহ। সুতরাং তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর এটা ক্ষতিপূরণ ও কাফ্‌ফারার দম। যে ব্যক্তি হজের ইহ্‌রাম বাঁধল অতঃপর উমরার ইহ্‌রাম বাঁধল, তার উপর দুটোই ওয়াজিব। কেননা, বহিরাগতদের ক্ষেত্রে হজ ও উমরা উভয়কে একত্র করার বিধান প্রচলিত আছে। আর মাসআলাটি তার সম্পর্কেই। সুতরাং এর মাধ্যমে সে কিরান হজকারী হলো। তবে সে সুন্নতের বিপরীত করার কারণে গুনাহ্‌গার হবে। উমরার আমলগুলো না করে সে যদি আরাফায় উকূফ করে ফেলে, তাহলে সে উমরা বর্জনকারী হলো। কেননা, [এখন] তার জন্য তা আদায় করা কঠিন। কেননা, তা হজের উপর ভিত্তিকৃত হচ্ছে, যা শরিয়তে অনুমোদিত নয়। আর যদি এ ব্যক্তি আরাফা অভিমুখে রওনা হয়, তাহলে আরাফায় অবস্থান করার পূর্ব পর্যন্ত উমরা বর্জনকারী হবে না। পূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ الخ : বহিরাগত কোনো ব্যক্তি যদি হজের ইহ্‌রাম বাঁধার পর হজের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্বে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে তার উপর দু টোই আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা, বহিরাগতদের জন্য হজ ও উমরা উভয়কে একত্র করার বিধান শরিয়তে অনুমোদিত। আর এ মাসআলাটি বহিরাগতদের সম্পর্কেই। এ কারণেই সে কিরান হজকারীরূপে বিবেচ্য হবে। তবে সুন্নত পরিপন্থি হওয়ার কারণে গুণাহগার হবে। কেননা সুন্নত হলো, হজের আমলসমূহকে উমরার আমলের উপর দাখিল করা এর উল্টোটি নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الخ এ আয়াতে উমরার কার্যাবলিকে প্রথমে, হজের ক্রিয়াকর্মকে পরে আদায়ের কথা বলা হয়েছে, এটিই সুন্নত।

যদি ঐ বহিরাগত ব্যক্তি উমরার আমলগুলো সম্পন্ন না করে আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে সে উমরা বর্জনকারী হলো। কেননা, আরাফায় অবস্থানের পর উমরা করা তার জন্য সম্ভব নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে উমরার ভিত্তি হজের উপর করা হয়ে থাকে। অথচ উমরার ভিত্তি হজের উপর হওয়া শরিয়তে অনুমোদিত নয়।

আর যদি ঐ বহিরাগত আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হয়, তাহলে আরাফায় অবস্থানের পূর্ব পর্যন্ত সে উমরা বর্জনকারীরূপে গণ্য হবে না। 'কিরান' অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বর্ণনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

فَإِنْ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَمَضَى عَلَيْهِمَا لَزِمَاهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ عَلَى مَا مَرَّ فَصَحَّ الْإِحْرَامُ بِهِمَا وَالْمُرَادُ بِهٰذَا الطَّوَافِ طَوَافُ التَّحِيَّةِ وَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ رُكْنٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَلِهٰذَا لَوْ مَضَى عَلَيْهِمَا جَازَ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ دَمُ كَفَّارَةٍ وَجَبْرٍ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ بَانَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ وَجْهٍ.

অনুবাদ : আর সে যদি হজের জন্য তওয়াফ করে, অতঃপর উমরার ইহ্রাম বেঁধে উভয়টির ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যায়, তাহলে দুটোই তার উপর ওয়াজিব হবে এবং উভয়কে একত্রিত করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, উভয়কে একত্র করা শরিয়ত অনুমোদিত। ইতঃপূর্বে তা বলা হয়েছে। সুতরাং উভয়ের ইহ্রাম বাঁধাও শুদ্ধ হবে। এখানে 'তওয়াফ' দ্বারা 'তওয়াফে কুদূম' উদ্দেশ্য। আর তা সুন্নত; রুকন নয়। এমনকি তা ছেড়ে দিলে কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে কোনো রুকন আদায় করেনি তখন তার পক্ষে প্রথমে উমরার কার্যসমূহ, অতঃপর হজের কার্যসমূহ সম্পাদন করা সম্ভব। এ কারণেই সে যদি উভয়টি চালিয়ে যায়, তাহলেও জায়েজ হবে। তবে উভয়টিকে একত্র করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। বিশুদ্ধ মতে তা কাফ্ফারা ও ক্ষতিপূরণের দম। কেননা, এক হিসেবে সে উমরার কার্যসমূহকে হজের কার্যসমূহের উপর ভিত্তি করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো বহিরাগত হজের তওয়াফে কুদূম সম্পন্ন করার পর উমরার ইহ্রাম বাঁধে অতঃপর উভয়টির ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যায়, তাহলে দু-টোই তার উপর ওয়াজিব। আর উভয়টিকে একত্র করার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, বহিরাগতদের ক্ষেত্রে হজ ও উমরা উভয়কে একত্র করা শরিয়তে অনুমোদিত। এজন্য উভয়টির ইহ্রাম শুদ্ধ হবে।

মূল ইবারতে 'তওয়াফ' দ্বারা তওয়াফে কুদূম উদ্দেশ্য। আর তা সুন্নত; রুকন নয়। এমনকি কেউ যদি তা ছেড়ে দেয়, তাহলেও তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। যাহোক, এখন পর্যন্ত যখন সে হজের কোনো রুকন আদায় করেনি, অতএব তার পক্ষে প্রথমে উমরার কার্যসমূহ সম্পন্ন করে হজের কার্যসমূহ সম্পাদন করা সম্ভব। এ কারণেই সে যদি উভয়টি সম্পাদন করতে থাকে, তাহলেও জায়েজ। তবে উভয়টি একত্র করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এটি কাফ্ফারা ও ক্ষতিপূরণের দম; শুকরিয়ার দম নয়। কেননা, এ ব্যক্তি একদিক থেকে উমরার কার্যসমূহকে হজের কার্যসমূহের উপর ভিত্তি করেছে। কারণ, তওয়াফে কুদূম সুন্নত হলেও তা হজের একটি আমল। সুতরাং এ দিক থেকে তওয়াফে কুদূমের পর উমরার ক্রিয়াকর্ম আদায় করা মাকরূহ হবে। আর এই মাকরূহের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দম ওয়াজিব হবে।

وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَرْفُضَ عُمْرَتَهُ لِاَنَّ اِحْرَامَ الْحَجِّ قَدْ تَاَكَّدَ بِشَيْئٍ مِنْ اَعْمَالِهِ بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ يَطُفْ لِلْحَجِّ وَاِذَا رَفَضَ عُمْرَتَهُ يَقْضِيْهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ فِيْهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا وَمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ اَوْ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَزِمَتْهُ لِمَا قُلْنَا وَيَرْفُضُهَا اَىْ يَلْزَمُهُ الرَّفْضُ لِاَنَّهُ قَدْ اَدّٰى رُكْنَ الْحَجِّ فَيَصِيْرُ بَانِيًا اَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلٰى اَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَقَدْ كُرِهَتِ الْعُمْرَةُ فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ اَيْضًا عَلٰى مَا نَذْكُرُ فَلِهٰذَا يَلْزَمُهُ رَفْضُهَا .

অনুবাদ : আর স্বীয় উমরাকে ছেড়ে দেওয়া মোস্তাহাব। কেননা, হজের একটি আমল আদায় করার কারণে হজের ইহ্‌রাম জোরদার হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে হজের তওয়াফ না করার বিষয়টি ভিন্ন। আর উমরা ছেড়ে দিলে তা কাজা করে নেবে। কেননা, তার শুরু করা শুদ্ধ ছিল। আর উমরা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি কুরবানির দিনে কিংবা তাশরীকের দিনগুলোতে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধল, তার উপর তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা বলে এসেছি। তবে তা ছেড়ে দেবে অর্থাৎ বর্জন করা আবশ্যক। কেননা, সে হজের রুকন আদায় করেছে। সুতরাং সবদিক থেকে সে হজের কার্যসমূহের উপর উমরার কার্যসমূহের ভিত্তিকারী হয়ে যাবে। অধিকন্তু এদিনগুলোতে উমরা করা মাকরূহ। আমরা এর কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করব। এ কারণে তা বর্জন করা আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ الخ : যে ব্যক্তি কুরবানির দিনে কিংবা তাশরীকের দিনগুলোতে মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে কিংবা তওয়াফে জিয়ারতের পূর্বে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তার উপর উমরা করা ওয়াজিব হয়। কেননা, উমরা শুরু করা শুদ্ধ ছিল। তবে তা ছেড়ে দেওয়া জরুরি। কেননা, সে হজের রুকন তথা আরাফায় অবস্থান সম্পন্ন করে ফেলেছে। এখন সে যদি উমরার ক্রিয়াকর্ম শুরু করে দেয়, তাহলে হজের কার্যসমূহের উপর উমরার কার্যসমূহের ভিত্তিকারী হয়ে যাবে। আর তা সুন্নত পরিপন্থি। অধিকন্তু এ দিনগুলোতে উমরা করা মাকরূহ। পরবর্তীতে আমরা তার কারণ বর্ণনা করব। এ কারণে উক্ত উমরা বর্জন করা তার উপর ওয়াজিব।

فَإِنْ رَفَضَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهَا وَهُوَ كَوْنُهُ مَشْغُولًا فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ بِأَدَاءِ بَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فَيَجِبُ تَخْلِيصُ الْوَقْتِ لَهُ تَعْظِيمًا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا أَمَّا فِي الْإِحْرَامِ أَوْ فِي الْأَعْمَالِ الْبَاقِيَةِ قَالُوا وَهٰذَا دَمُ كَفَّارَةٍ أَيْضًا وَقِيلَ إِذَا حَلَقَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ لَا يَرْفُضُهَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ وَقِيلَ يَرْفُضُهَا اِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَمَشَائِخُنَا عَلَى هٰذَا ـ

অনুবাদ : সুতরাং যদি সে উমরা বর্জন করে, তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং তদস্থলে একটি উমরা করা ওয়াজিব হবে। এর কারণ আমরা আগেই বর্ণনা করে এসেছি। অবশ্য সে যদি উমরা চালিয়ে যায়, তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, কারাহাত হয়েছে উমরার হাকীকতের বাহিরের কারণে। তা হলো, এ দিনগুলোতে হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে ব্যস্ত থাকা। সুতরাং হজের তাজীম রক্ষার্থে সময়টাকে হজের জন্য মুক্ত রাখা ওয়াজিব। ইহ্‌রামের মধ্যে কিংবা পরবর্তী কর্মসমূহের মধ্যে উভয়কে একত্র করার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। মাশায়েখে কেরাম বলেন, এটিও কাফ্‌ফারার দম। মাবসূতে যা বলা হয়েছে, বাহ্যত সে আলোকে কেউ কেউ বলেছেন, যদি হজের মাথা মুণ্ডানোর পরে ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে উমরা বর্জন করবে না। আর কেউ কেউ বলেন, এ দিনগুলোতে উমরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পরিহার করার জন্য তা বর্জন করবে। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র.) বলেছেন, আমাদে মাশায়েখে কেরাম এ অভিমতই পোষণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে ব্যক্তি কুরবানির দিনে কিংবা তাশরীকের দিনগুলোতে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল, যদি উমরা বর্জন করে, তাহলে বর্জন করার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং তদস্থলে একটি উমরা করা ওয়াজিব হবে। এর কারণ হলো, বহিরাগতদের ক্ষেত্রে হজ ও উমরা উভয়টি একত্র করা শরিয়তে অনুমোদন রয়েছে। অবশ্য সে যদি উমরার কাজ চালিয়ে যায়, তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, সত্তাগতভাবে উমরার মধ্যে কোনো কারাহাত নেই, বরং উমরার হাকীকতের বাহিরের কারণে কারাহাত হয়েছে। আর তা হলো সেই দিনগুলোতে হজের অবশিষ্ট ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে ব্যস্ত থাকা। অর্থাৎ এ দিনগুলোতে যেহেতু হজের অবশিষ্ট ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই হজের তাজীম রক্ষার্থে সময়টাকে হজের জন্য মুক্ত রাখা ওয়াজিব। এ কারণেই এ সময় উমরা করা মাকরূহে তাহ্‌রীমী। অবশ্য ইহ্‌রামের মধ্যে কিংবা পরবর্তী কর্মসমূহের মধ্যে হজ ও উমরাকে একত্র করার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

ইহ্‌রামের মধ্যে হজ ও উমরাকে একত্র করা হয়– যখন হলকের দ্বারা হজের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা হয়। আর যদি মাথা মুণ্ডানোর পর উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে অবশিষ্ট ক্রিয়াকর্মের মধ্যে হজ ও উমরাকে একত্র করা হয়।

মাশায়েখে কেরাম বলেন, এটিও কাফ্‌ফারার দম, শুকরিয়ার দম নয়। কেউ কেউ মাবসূতে যা বলা হয়েছে– সে আলোকে বলেন, যদি হজের হলকের পর ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে উমরা বর্জন করবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, এ দিনগুলোতে উমরা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পরিহার করার জন্য উমরা বর্জন করবে। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র.) বলেন, আমাদের মাশায়েখে কেরাম এ অভিমতই পোষণ করেন।

فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ فَإِنَّهُ يَرْفُضُهَا لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَلِبَ إِحْرَامُهُ إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ عَلَى مَا يَأْتِيكَ فِي بَابِ الْفَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَيَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْأَفْعَالِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ إِحْرَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا وَدَمٌ لِرَفْضِهَا بِالتَّحَلُّلِ قَبْلَ أَوَانِهِ -

---

অনুবাদ : যদি তার হজ ফউত হয়ে যায় অতঃপর উমরা কিংবা হজের ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে তা বর্জন করবে। কেননা, যার হজ ফউত হয়ে গেছে, সে উমরার ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে হালাল হয়েছে। তবে তার ইহ্রাম উমরার ইহ্রামে পরিবর্তিত হয় না। হজ ফউত হওয়ার অধ্যায়ে এ আলোচনা আসবে ইনশা-আল্লাহ। সুতরাং সে কার্যসমূহের ক্ষেত্রে দুই উমরা একত্রকারী হয়ে যাবে। তাই তার কর্তব্য হলো দ্বিতীয়টি বর্জন করা। যেমন– যদি দুই উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধে। আর যদি হজের ইহ্রাম বেঁধে থাকে, তাহলে সে ইহ্রামের দিক থেকে দুই হজ একত্রকারী হলো। সুতরাং দ্বিতীয়টি বর্জন করা তার উপর ওয়াজিব। যেমন– দুই হজের ইহ্রাম বাঁধলে তাকে একটি বর্জন করতে হবে। তবে তা শুরু করা বৈধ হওয়ার কারণে কাজা করা তার উপর ওয়াজিব। আবার সময়ের পূর্বে হালাল হওয়ার কারণে তা বর্জন করায় দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ثُمَّ الخ : কারো যদি হজের ইহ্রাম ফউত হয়ে যায় অতঃপর উমরা কিংবা হজের ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে সে দ্বিতীয়টি বর্জন করবে– চাই তা উমরা হোক কিংবা হজ হোক। কেননা, যার হজ ফউত হয়ে গেছে, সে উমরার ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে হালাল হয়েছে, তার ইহ্রাম উমরার ইহ্রামে পরিবর্তিত হওয়া ব্যতীতই। কাজেই এ ব্যক্তি কার্যসমূহের হিসেবে দুই উমরা একত্রকারী হয়ে গেল, আর তা জায়েজ নেই। এ কারণে উমরা বর্জন করবে। যেমন– যদি দুই উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধে।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ الخ : কেউ যদি হজ ফউত হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় হজের ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ইহ্রামের দিক থেকে সে দুই হজ একত্রকারী হয়ে গেল। এটা জায়েজ নেই এজন্য দ্বিতীয় হজটি বর্জন করা তার উপর ওয়াজিব। যেমন– কেউ যদি দুই হজের ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে একটিকে বর্জন করা আবশ্যক। অবশ্য তা শুরু করা বৈধ হওয়ার কারণে তার উপর তা কাজা করা ওয়াজিব এবং তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সে সময়ের পূর্বে হালাল হয়ে তা বর্জন করেছে।

بَابُ الْاِحْصَارِ

وَاِذَا اُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ اَوْ اَصَابَهُ مَرَضٌ فَمَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَكُوْنُ الْاِحْصَارُ اِلَّا بِالْعَدُوِّ لِاَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدْيِ شُرِعَ فِيْ حَقِّ الْمُحْصَرِ لِتَحْصِيْلِ النَّجَاةِ وَبِالْاِحْلَالِ يَنْجُوْ مِنَ الْعَدُوِّ لَا مِنَ الْمَرَضِ وَلَنَا اَنَّ اٰيَةَ الْاِحْصَارِ وَرَدَتْ فِي الْاِحْصَارِ بِالْمَرَضِ بِاِجْمَاعِ اَهْلِ اللُّغَةِ فَاِنَّهُمْ قَالُوْا اَلْاِحْصَارُ بِالْمَرَضِ وَالْحَصْرُ بِالْعَدُوِّ وَالتَّحَلُّلُ قَبْلَ اَوَانِهِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ الْاٰتِيْ مِنْ قِبَلِ اِمْتِدَادِ الْاِحْرَامِ وَالْحَرَجُ فِي الْاِصْطِبَارِ عَلَيْهِ مَعَ الْمَرَضِ اَعْظَمُ ـ

পরিচ্ছেদ : অবরুদ্ধ হওয়া

অনুবাদ : মুহরিম যদি শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে হজের কাজ চালিয়ে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার জন্য ইহ্রামমুক্ত হওয়া জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া 'অবরুদ্ধ হওয়া' সাব্যস্ত হয় না। কেননা, হাদী প্রেরণের মাধ্যমে ইহ্রামমুক্ত হওয়ার বিধান অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য অনুমোদনের উদ্দেশ্য হলো রেহাই লাভ করা। আর ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার মাধ্যমে শত্রু থেকে রেহাই পাওয়া যায়, অসুস্থতা থেকে নয়। আর আমাদের দলিল হলো, ভাষাবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে اِحْصَارٌ সংক্রান্ত আয়াতটি অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তারা বলেন, اَلْاِحْصَارُ শব্দটি অসুস্থতা অর্থে আর اَلْحَصْرُ শব্দটি শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সময়ের পূর্বে ইহ্রামমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো ইহ্রাম বিলম্বিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট কষ্ট দূর করা। আর অসুস্থতা অবস্থায় ধৈর্যের সাথে ইহ্রাম ধরে রাখার কষ্ট আরো অধিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَابُ الْاِحْصَارِ : اِحْصَارٌ অর্থ–বাধা দেওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় মুহ্রিম কোনো ভয়-ভীতি, শত্রু কিংবা অসুস্থতার কারণে হজ কিংবা উমরার কার্যসমূহ সম্পন্ন করতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে اِحْصَارٌ বলা হয়। অবরুদ্ধ হওয়া যেহেতু মুহ্রিমের ক্ষেত্রে অপরাধ, তাই 'অপরাধ ও ত্রুটি' অধ্যায়ের পর ভিন্নভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলা : মুহ্রিম যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে হজ ও উমরার কার্যসমূহ পরিচালনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিংবা অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে হজ ও উমরার কার্যসমূহ সম্পন্ন না করেই হালাল হওয়া জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কেবল শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেই اِحْصَارٌ সাব্যস্ত হবে, অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো কারণে اِحْصَارٌ সাব্যস্ত হয় না। ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমতও অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [যদি তোমরা অবরুদ্ধ হয়ে যাও, তাহলে যে হাদী তোমাদের জন্য সহজ, তা-ই কর।] উক্ত আয়াত اِحْصَارٌ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম যখন হুদায়বিয়ায় শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এর মোদ্দাকথা হলো, অবরুদ্ধ হলে হাদী জবাই করে হালাল হয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এমনটিই করেছিলেন। আয়াতের এ প্রেক্ষাপট থেকে বুঝা যায় যে, কেবল শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেই إِحْصَارْ সাব্যস্ত হবে– অসুস্থতা কিংবা অন্যকোনো কারণে إِحْصَارْ সাব্যস্ত হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, হাদী জবাই করার মাধ্যমে হালাল হওয়ার বিধান অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য অনুমোদনের উদ্দেশ্য হলো রেহাই লাভ করা। আর হালাল হওয়ার মাধ্যমে শত্রু থেকে রেহাই পাওয়া যায়, অসুস্থতা থেকে নয়। কেননা, অসুস্থতার কারণে হালাল হওয়ার দ্বারা অসুস্থতা বিদূরিত হয় না। এ থেকেও বুঝা যায় যে, কেবল শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত।

আমাদের দলিল হলো, إِحْصَارْ সংক্রান্ত আয়াত অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে–এ ব্যাপারে ভাষাবিদগণ একমত হয়েছেন। যেমন তাঁরা বলেন– إِحْصَارْ শব্দটি অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর حَصْر শব্দটি ব্যবহৃত হয় শত্রু কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থে। সুতরাং অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি আয়াত থেকেই সাব্যস্ত হয়। আর শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি হুদায়বিয়ার ঘটনা সংবলিত হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কথামতো إِحْصَارْ কেবল শত্রুর সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং শত্রু ও অসুস্থতা উভয় কারণে إِحْصَارْ সাব্যস্ত হয়।

وَالتَّحَلُّلُ قَبْلَ أَوَانِهِ الخ থেকে আমাদের দ্বিতীয় দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। এর মোদ্দাকথা হলো, আমরা মেনে নিলাম যে, إِحْصَارْ সংক্রান্ত আয়াতটি শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অসুস্থতার বিষয়টি শত্রুর সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে সময়ের পূর্বে হালাল হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ইহরাম প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত কষ্ট দূর করার জন্য। আর অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্যের সাথে ইহরাম ধরে রাখার কষ্ট শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার তুলনায় অধিক। কেননা, অসুস্থতার ক্ষেত্রে ঔষধপত্রের দীর্ঘসূত্রিতা ও হাত-পা থেকে অক্ষমতা প্রকাশ পায়। আর তাই অপেক্ষাকৃত লঘু কষ্ট দূরকরণার্থে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়াকে যখন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে, তখন তুলনামূলক তদপেক্ষা বড় কষ্ট দূরকরণার্থে অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ হওয়াকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

وَإِذَا جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ يُقَالُ لَهُ إِبْعَثْ شَاةً تُذْبَحُ فِى الْحَرَمِ وَ وَاعِدْ مَنْ تَبْعَثُهُ بِيَوْمٍ بِعَيْنِهِ يُذْبَحُ فِيْهِ ثُمَّ تَحَلَّلَ وَإِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى الْحَرَمِ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ قُرْبَةٌ وَالْإِرَاقَةُ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إِلَّا فِى زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ عَلَى مَا مَرَّ فَلَا يَقَعُ قُرْبَةٌ دُوْنَهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَإِنَّ الْهَدْىَ اِسْمٌ لِمَا يُهْدٰى إِلَى الْحَرَمِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) لَا يَتَوَقَّتُ بِهِ لِأَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً وَالتَّوْقِيْتُ يُبْطِلُ التَّخْفِيْفَ قُلْنَا الْمُرَاعٰى أَصْلُ التَّخْفِيْفِ لَا نِهَايَتُهُ وَيَجُوْزُ الشَّاةُ لِأَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ الْهَدْىُ وَالشَّاةُ أَدْنَاهُ وَتَجْزِيْهِ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ كَمَا فِى الضَّحَايَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرْنَا بَعْثُ الشَّاةِ بِعَيْنِهَا لِأَنَّ ذٰلِكَ قَدْ يَتَعَذَّرُ بَلْ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ بِالْقِيْمَةِ حَتّٰى تَشْتَرِىَ الشَّاةَ هُنَالِكَ وَتُذْبَحَ عَنْهُ.

অনুবাদ : আর যখন তার জন্য হালাল হওয়া জায়েজ হলো, তখন তাকে বলা হবে যে, একটি বকরি পাঠিয়ে দাও, যা হারামে জবাই করা হবে এবং যাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে তার থেকে একটি নির্ধারিত দিনে জবাই করার প্রতিশ্রুতি নাও। এরপর হালাল হয়ে যাবে। আর হারামে এজন্য পাঠানো হবে, যেহেতু إِحْصَارٌ-এর দম হলো একটি ইবাদত। আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নির্ধারিত স্থান কিংবা সময় ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করা ইবাদতরূপে বিবেচিত নয়। সুতরাং হারাম ছাড়া এটা ইবাদত হবে না এবং এর দ্বারা হালালও হওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী এদিকেই ইঙ্গিত করেছে- وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ [হাদী তার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডাবে না]। কেননা, হাদী ঐ পশুকে বলা হয় যাকে হারামে প্রেরণ করা হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হারামের সাথে তা নির্দিষ্ট হবে না। কেননা, তা অনুমোদিত হয়েছে রুখসতরূপে। আর নির্দিষ্টকরণ সহজতাকে রহিত করে। আমরা বলি, মূল সহজতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে, চূড়ান্ত সহজতার বিষয়টি নয়। আর [হাদী হিসেবে] বকরি জায়েজ। কেননা হাদীর ব্যাপারে স্পষ্ট 'নস' এসেছে। আর সর্বনিম্ন হাদী হলো বকরি। গরু ও উটও যথেষ্ট হবে। যেমন কুরবানির ক্ষেত্রে হয়। আমাদের উল্লিখিত বক্তব্যের উদ্দেশ্য অবশ্য বকরি পশুটিই পাঠানো নয়। কেননা, কখনো তা কষ্টকর হতে পারে। অতএব মূল্য পাঠিয়ে দিতে হবে যাতে সেখানে বকরি ক্রয় করে তার পক্ষ থেকে জবাই করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য যখন হালাল হয়ে যাওয়া জায়েজ হলো, তখন তাকে বলা হবে যে, একটি বকরি পাঠিয়ে দাও-যা হারামে জবাই করা হবে এবং যার হাতে হাদী দেবে তার থেকে নির্ধারিত একটি দিনে তা জবাই করার ওয়াদা গ্রহণ করবে, অতঃপর হালাল হয়ে যাবে।

লক্ষণীয় হলো, হাদী জবাই করার জন্য দিন নির্দিষ্ট করা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কেননা, তাঁর মতে অবরুদ্ধ হওয়ার দমের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোনো দিন নেই। সুতরাং তাঁর নিকট দিন নির্দিষ্ট করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কারণ হলো অবরুদ্ধ ব্যক্তি যেন হালাল হওয়ার সময় জ্ঞাত হতে পারে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে অবরুদ্ধ হওয়ার দম কুরবানির দিনে জবাই করতে হয়, বিধায় তাঁদের নিকট এজন্য দিন নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে উমরার ক্ষেত্রে তাঁদের মতেও দিন নির্ধারণের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

অবরুদ্ধ ব্যক্তি যখন দম পাঠিয়ে দেবে, তখন সে ইচ্ছা করলে সেখানে অবস্থান করতে পারে আবার চাইলে নিজ বাড়িতেও ফিরে যেতে পারে। অতঃপর যখন নির্ধারিত দিন এসে যাবে এবং হাদী জবাই হওয়ার উপর বিশ্বাস এসে যায়, তাহলে হালাল ব্যক্তি যা করে, তার সবকিছুই করার সে অনুমতি পাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাদী হারামে প্রেরণ করা হবে। কেননা, অবরুদ্ধ হওয়ার দম হলো ইবাদত। আর রক্ত প্রবাহিত করা ইবাদতরূপে বিবেচিত হবে তখনই যখন তা কোনো সময় বা স্থানের সাথে নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং নির্ধারিত স্থান বা সময় ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করা ইবাদতরূপে বিবেচিত হবে না। আর যখন হারাম ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করা ইবাদতরূপে বিবেচিত নয়, তখন তা দ্বারা হালালও হওয়া যাবে না।

স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ 'হাদী তার নির্ধারিত স্থানে পৌছা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডাবে না।' অতঃপর স্থানের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এভাবে– ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -এখানে কা'বা ঘর উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য। এখন অর্থ হবে হাদী হারামে পৌছা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডাবে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদী হারামে জবাই করা আবশ্যক। অধিকন্তু কুরআন মাজীদে 'হাদী' শব্দ এসেছে। আর 'হাদী' ঐ পশুকে বলা হয়, যাকে হারামে প্রেরণ করা হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হাদীকে হারামের সাথে নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। কেননা, হাদীর পশু পাঠিয়ে দিয়ে হালাল হওয়ার বিধান শরিয়ত অনুমোদন করেছে– অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য রুখসতরূপে। আর হারামের সাথে নির্ধারিত করার ফলে এই সহজ সাধ্যতাকে রহিত করে দেয়। এজন্য হাদী হারামের সাথে নির্দিষ্ট হবে না; বরং 'হিল' ও 'হারাম' সব জায়গায় তা জবাই করা যাবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয় যে, মূল সহজসাধ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে, চূড়ান্ত সহজসাধ্যতার বিষয়টি নয়। অর্থাৎ মূল বিষয় সহজ করে দেওয়া হয়েছে যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তি হাদী প্রেরণ করত হালাল হয়ে যাবে; কিন্তু এর পরের সহজসাধ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাদী হিসেবে বকরি জায়েজ। কেননা, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ الخ আয়াতে হাদীর কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর সর্বনিম্ন হাদী হলো বকরি। এজন্য বকরি পাঠানো জায়েজ। আবার পূর্ণ একটি গরু বা উটও জায়েজ হবে এবং এর এক-সপ্তমাংশও জায়েজ হবে। যেমন– কুরবানির ঈদের ক্ষেত্রে পূর্ণ একটি গরু কিংবা উট অথবা এর এক-সপ্তমাংশ কুরবানি করা জায়েজ।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হুবহু বকরি পশুটিই পাঠানো জরুরি নয়; বরং তার মূল্য পাঠিয়ে দিতে পারে, আর সে মূল্য দিয়ে বকরি ক্রয় করে তার পক্ষ থেকে হারামে জবাই করে দিলেও জায়েজ হবে। কেননা, হুবহু বকরি প্রেরণ করা কখনো কষ্টকরও হতে পারে।

وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَحَلَّلَ اِشَارَةٌ اِلَى اَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ اَوِ التَّقْصِيْرُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) عَلَيْهِ ذٰلِكَ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَا شَئَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَلَقَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْصَرًا بِهَا وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ وَلَهُمَا اَنَّ الْحَلْقَ اِنَّمَا عُرِفَ قُرْبَةً مُرَتَّبًا عَلَى اَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَا يَكُوْنُ نُسُكًا قَبْلَهَا وَفِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابِهِ لِيُعْرَفَ اِسْتِحْكَامُ عَزِيْمَتِهِمْ عَلَى الْاِنْصِرَامِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্তি ثُمَّ تَحَلَّلَ [অতঃপর হালাল হয়ে যাবে] এদিকে ইঙ্গিত করে যে, মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটা তার জন্য ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও এটি। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার জন্য মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটা আবশ্যক। তবে যদি তা না করে, তাহলে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর সেখানে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় হলক করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে হলকের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তাঁদের [ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর] দলিল হলো, হজের কার্যসমূহের পরে মাথা মুণ্ডানো ইবাদত হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং তা আগে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। আর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছার দৃঢ়তা প্রকাশকরণার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম তা করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য ثُمَّ تَحَلَّلَ এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তির হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটা জরুরি নয়। এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। তবে যদি তা না করে, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। যদিও ওয়াজিব বর্জন করা গুনাহের কাজ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ অবরুদ্ধ অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও মাথা মুণ্ডন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, হালাল হওয়ার জন্য শুধু হাদী জবাই করাই যথেষ্ট নয়; বরং জবাই-এর পরে মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটাও জরুরি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মাথা মুণ্ডানো এমন একটি ইবাদত যা হজের ক্রিয়াকর্মের পর সম্পন্ন হয়। হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের পূর্বে মাথা মুণ্ডানো হজের আমলরূপে গণ্য নয়। আর অবরুদ্ধ ব্যক্তি যেহেতু হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করতে পারেনি সেহেতু মাথা মুণ্ডানো তার ক্ষেত্রে হজের কোনো আমল হিসেবে ওয়াজিব হবে না।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম যে 'হলক' করেছিলেন তার কারণ হলো, 'হুদায়বিয়ার বছর মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল যে, মুসলমানরা এ বছর উমরা না করেই ফিরে যাবে।' আর মুসলমানরা তা মেনেও নিয়েছিল। এজন্য মুসলমানরা ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছার দৃঢ়তা প্রকাশ করণার্থে কাফিরদেরকে দেখানোর জন্য স্বীয় মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। আর তা এজন্য করেছিলেন যে, যাতে কাফিররা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে এবং মুসলমানদের সাথে কোনো ধোঁকার আচরণ না করে। মোদ্দাকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উদ্দেশ্যেই 'হলক' করেছিলেন, ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য নয়। সুতরাং অবরুদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটা আবশ্যক নয়।

قَالَ وَإِنْ كَانَ قَارِنًا بَعَثَ بِدَمَيْنِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّحَلُّلِ عَنْ إِحْرَامَيْنِ فَإِنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ وَاحِدٍ لِيَتَحَلَّلَ عَنِ الْحَجِّ وَيَبْقَى فِيْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَتَحَلَّلْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْهُمَا شُرِعَ فِيْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجُوْزُ ذَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ وَيَجُوْزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يَجُوْزُ الذَّبْحُ لِلْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إِلَّا فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَجُوْزُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ مَتٰى شَاءَ اعْتِبَارًا بِهَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَ رُبَمَا يَعْتَبِرُانِهِ بِالْحَلْقِ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ دَمُ كَفَّارَةٍ حَتّٰى لَا يَجُوْزُ الْأَكْلُ مِنْهُ فَيَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ دُوْنَ الزَّمَانِ كَسَائِرِ دِمَاءِ الْكَفَّارَاتِ بِخِلَافِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَبِخِلَافِ الْحَلْقِ لِأَنَّهُ فِيْ أَوَانِهِ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَهُوَ الْوُقُوْفُ يَنْتَهِيْ بِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি কিরানকারী হয়, তাহলে দুটি দম পাঠাবে। কেননা, তার দুটি ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়া প্রয়োজন। যদি হজ থেকে হালাল হওয়ার জন্য একটি হাদী প্রেরণ করে আর উমরার ইহ্রাম বহাল রাখে, তাহলে দুটি ইহ্রামের কোনোটি থেকেই হালাল হবে না। কেননা, একই সাথে উভয় ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়া শরিয়ত অনুমোদিত। إِحْصَارٌ-এর দম হারাম ছাড়া অন্য কোথাও জবাই করা জায়েজ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কুরবানির দিনের পূর্বে জবাই করা জায়েজ। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, হজের অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য কুরবানির দিন ছাড়া অন্য সময় জবাই করা জায়েজ নয়। আর উমরার অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তি যখন ইচ্ছা জবাই করতে পারে। অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে এ বিধান দেওয়া হয়েছে তামাত্তু' ও কিরানের হাদীর উপর কিয়াস করে। সাহেবাইন অবরুদ্ধ ব্যক্তির জবাইকে সম্ভবত 'হলক'-এর উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, উভয়ের প্রত্যেকটি ইহ্রাম থেকে হালালকারী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এটা কাফ্ফারার দম। এজন্যই তা থেকে খাওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং এটা স্থানের সাথে নির্দিষ্ট হবে, সময়ের সাথে নয়। অন্যান্য কাফ্ফারার দমের মতো। পক্ষান্তরে তামাত্তু' ও কিরানের দমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা ইবাদতের দম। তবে মাথা মুণ্ডানোর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা যথাসময়ে হয়েছে। কারণ, হজের প্রধান কাজ উকূফ– এর মাধ্যমেই শেষ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ ذَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ الخ : মাসআলা : إِحْصَارٌ-এর দম শুধু হারামে জবাই করা জায়েজ। হারাম ছাড়া অন্যকোথাও জবাই করা জায়েজ নেই। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কুরবানির দিবসের পূর্বে অবরুদ্ধ হওয়ার দম জবাই করা জায়েজ। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, হজের ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য শুধু কুরবানির দিবসেই জবাই করা

জায়েজ। এর পূর্বে জবাই করা জায়েজ নয়। মোদ্দাকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে إِحْصَارْ-এর দম হারামের সাথে নির্দিষ্ট, কিন্তু কুরবানির দিনের সাথে তা নির্ধারিত নয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে, হারাম ও কুরবানির দিবস উভয়টির সাথে নির্দিষ্ট।

আর উমরার ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে যখন ইচ্ছা জবাই করতে পারে– কোনো সময়ের সাথে তা নির্দিষ্ট নেই। হজের ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য কুরবানির দিন ছাড়া অন্য সময় إِحْصَارْ-এর দম জবাই করা জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, তাঁরা إِحْصَارْ-এর দমকে তামাত্তু' ও কিরানের দমের উপর কিয়াস করেছেন। সুতরাং তামাত্তু' ও কিরানের দম যেভাবে হারাম ও কুরবানির দিবসের সাথে নির্দিষ্ট, তদ্রূপ إِحْصَارْ-এর দমও হারাম ও কুরবানির দিবসের সাথে নির্দিষ্ট হবে। সাহেবাইন (র.) إِحْصَارْ-এর দম-এর জবাইকে হলকের উপর কিয়াস করেছেন। সুতরাং মাথা মুণ্ডানো যেভাবে কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট, তদ্রূপ অবরুদ্ধ ব্যক্তির জবাইও কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট হবে। কিয়াসের কারণ হলো, উভয়ের প্রত্যেকটিই ইহ্‌রাম থেকে হালালকারী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, إِحْصَارْ-এর দম হলো কাফ্‌ফারা ও ত্রুটির দম। এজন্যই তা থেকে খাওয়া জায়েজ নেই; বরং তা দরিদ্রদের হক। আর সবধরনের কাফ্‌ফারার দম সর্বসম্মতভাবে স্থান তথা হারামের সাথে নির্দিষ্ট, সময় তথা কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এজন্য এ দম -এর জবাইও হারামের সাথে নির্দিষ্ট হবে, কিন্তু কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট হবে না।

তামাত্তু' ও কিরানের দমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ দুটো ইবাদতের ও শোকরের দম। আর ইবাদতের দম কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট হয়। এ কারণে তামাত্তু ও কিরানের দমও কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট হবে।

হলকের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, তা যথাসময়ে হয়েছে। এ কারণে হজের প্রধান কাজ আরাফায় অবস্থান করা এ হলকের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হয়।

মোদ্দাকথা হলো, হালাল হওয়া যায় দুভাবে।

১. যথাসময়ে।

২. সময়ের পূর্বে।

হলকের মাধ্যমে যথাসময়ে হালাল হওয়া যায়। আর إِحْصَارْ-এর দম জবাই করার মাধ্যমে সময়ের পূর্বে হালাল হওয়া যায়। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে إِحْصَارْ-এর দমকে হলকের উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়।

قَالَ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ هٰكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) وَابْنِ عُمَرَ (رضـ) وَلِأَنَّ الْحَجَّةَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ وَالْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِيْ مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ وَالْإِحْصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) لَا يَتَحَقَّقُ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّتُ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ أُحْصِرُوْا بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَكَانُوْا عُمَّارًا وَ لِأَنَّ شَرْعَ التَّحَلُّلِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَهٰذَا مَوْجُوْدٌ فِيْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَإِذَا تَحَقَّقَ الْإِحْصَارُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا تَحَلَّلَ كَمَا فِي الْحَجِّ وَعَلَى الْقَارِنِ حَجٌّ وَعُمْرَتَانِ أَمَّا الْحَجُّ وَإِحْدَاهُمَا فَلِمَا بَيَّنَّا وَالثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ صِحَّةِ الشُّرُوْعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হজ অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তি যখন হালাল হয়ে যাবে, তখন তার উপর [পরবর্তী বছর] একটি হজ ও একটি উমরা করা ওয়াজিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এজন্য যে, হজ শুরু করা সহীহ্ ছিল বলে তার কাজা করা ওয়াজিব হবে, আর উমরা হজ ফউতকারী ব্যক্তির সমপর্যায়ের। আর উমরার ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর উমরা কাজা করা ওয়াজিব। আমাদের মতে উমরার ক্ষেত্রেও অবরুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হয়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, উমরার ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা, তা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাস নয়। আর আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ উমরা অবস্থায় হুদায়বিয়াতে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। তা ছাড়া এ কারণে যে, অসুবিধা দূর করার জন্যই হালাল হওয়ার বিধান অনুমোদিত হয়েছে। আর তা উমরার ইহ্রামেও বিদ্যমান। আর যখন অবরুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, তখন তার উপর কাজা করা ওয়াজিব। যেহেতু সে হালাল হয়ে গেছে। যেমন– হজের ক্ষেত্রে [অবরুদ্ধ]। কিরানকারীর উপর একটি হজ ও দুটি উমরা ওয়াজিব হবে। একটি হজ ও একটি উমরা ওয়াজিব হওয়ার কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর দ্বিতীয় উমরা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, শুরু করা শুদ্ধ হওয়ার পর তা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ الخ – মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি হজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হাদী প্রেরণ করে হালাল হয়ে যায়, তাহলে তাকে পরবর্তীতে হজ ও উমরা উভয়টিই করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

'যার রাত্রে উকূফে আরাফা ফউত হয়ে গেল, তার হজ ফউত হয়ে গেল। সুতরাং সে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে তার উপর হজ করা ফরজ।' এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হজ ফউতকারীর উপর হজ ও উমরা দুটিই ওয়াজিব। আর অবরুদ্ধ ব্যক্তিও যেহেতু হজ ফউতকারী ব্যক্তির সমপর্যায়ের, তাই তার উপরও উভয়টি কাজা করা ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর হজ কাজা করাতো ওয়াজিব হবে এ কারণে যে, তা শুরু করা সহীহ্ ছিল। আর কোনো আমল শুরু করার পর তা ভেঙ্গে দিলে, তা কাজা করা ওয়াজিব। তাই তার উপর হজ কাজা করা ওয়াজিব হবে। আর উমরা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, এই অবরুদ্ধ ব্যক্তি হজ ফউতকারী ব্যক্তির সমপর্যায়ের। আর যে ব্যক্তির হজ ফউত হয়ে যায়, তার উপর উমরা করাও ওয়াজিব হয়। এজন্য অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্যও উমরা করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি উমরা করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে পরবর্তীতে তার উপরও উমরার কাজা করা ওয়াজিব।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমাদের মতে উমরার ক্ষেত্রেও অবরোধ সাব্যস্ত হয়, আর ইমাম মালিক (র.)-এর মতে সাব্যস্ত হয় না। তাঁর দলিল হলো, উমরা নির্ধারিত কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয় যে, তা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে উমরা ফউত হওয়া লাযেম আসে। সুতরাং উমরা ফউত হওয়ার আশঙ্কা না থাকার কারণে অবরোধও সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম উমরা অবস্থায় হুদায়বিয়ায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরবর্তী বছর তা কাজা করেছিলেন। এ কারণেই এর নাম হয়েছে উমরাতুল কাযা। এ থেকে বুঝা যায় যে, উমরার ক্ষেত্রেও অবরোধ সাব্যস্ত হয়।

[আমাদের] দ্বিতীয় দলিল হলো, অসুবিধা দূর করার জন্যই হালাল হওয়ার বিধান অনুমোদিত হয়েছে। উমরার ইহ্রামের ক্ষেত্রেও এটা বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য উমরা অবস্থায় অবরোধ হতে পারে। আর যখন অবরোধ সাব্যস্ত হলো, তখন হালাল হওয়ার পর তা কাজা করা ওয়াজিব হবে, যেমন হজের ক্ষেত্রে কাজা করা ওয়াজিব হয়।

فَإِنْ بَعَثَ الْقَارِنُ هَدْيًا وَ وَاعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوْهُ فِيْ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ فَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ بَلْ يَصْبِرُ حَتّٰى يَتَحَلَّلَ بِنَحْرِ الْهَدْيِ لِفَوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ وَإِنْ تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لَهُ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ فَائِتُ الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ لِزَوَالِ الْعَجْزِ قَبْلَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِالْخَلَفِ.

অনুবাদ : কিরানকারী যদি হাদী পাঠিয়ে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেয় যে, একটি নির্ধারিত দিনে তারা তা জবাই করবে, এরপর অবরোধ উঠে যায়। আর যদি সে হজ ও হাদীকে গিয়ে ধরতে না পারে, তাহলে সেদিকে [মক্কা অভিমুখে] গমন করা তার জন্য জরুরি হবে না; বরং হাদী জবাই করে হালাল হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে সেদিকে গমনের [প্রধান] উদ্দেশ্য– হজের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার সময় ফউত হওয়ার কারণে। আর যদি সে উমরার মাধ্যমে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করে, তাহলে তার ইচ্ছাধীন। কেননা, সে হজ ফউতকারী। যদি হজ ও হাদীকে গিয়ে ধরতে পারার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার জন্য [মক্কায়] যাওয়া জরুরি– স্থলবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বে অক্ষমতা দূর হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ بَعَثَ الْقَارِنُ الخ : **মাসআলা :** অবরুদ্ধ কিরানকারী যদি হাদী পাঠিয়ে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের থেকে একটি নির্ধারিত দিনে হাদী জবাই করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে, তাহলে হাদী রওয়ানা হওয়ার পর তার অবরোধ উঠে যাবে। এ মাসআলার যুক্তিসঙ্গত চারটি সুরত রয়েছে– ১. সময় এত কম যে, সে হজ ও হাদী গিয়ে ধরতে পারবে না। ২. প্রচুর সময় হাতে রয়েছে যে, হজ ও হাদী গিয়ে ধরতে পারবে। ৩. হাদীর নাগাল পাবে বটে, কিন্তু হজ ধরতে পারবে না। ৪. হজ ধরতে পারবে বটে, কিন্তু হাদীর নাগাল পাবে না। বর্ণিত চারটি সুরত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– প্রথম সুরতের ক্ষেত্রে মক্কা অভিমুখে গমন করা তার জন্য জরুরি নয়; বরং হাদী জবাই করে হালাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কেননা, মক্কা অভিমুখে যাওয়ার উদ্দেশ্য তথা হজের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার সময় ফউত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন গিয়ে কোনো লাভ হবে না। আর যদি সে উমরার কার্যসমূহ সম্পন্ন করার মাধ্যমে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কায় যায়, তাহলে সে তাও করতে পারে। কেননা, সে তো হজ ফউতকারী। আর হজ ফউতকারীর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে উমরার মাধ্যমে হালাল হয়। এজন্য উমরার উদ্দেশ্যে সে মক্কায় যায়।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ الخ : দ্বিতীয় সুরতে মক্কা অভিমুখে গমন করা তার জন্য আবশ্যক হবে। কেননা, স্থলবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বেই অক্ষমতা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং স্থলবর্তী তথা উল্লিখিত হাদী এ ক্ষেত্রে অকার্যকর। যেমন– কেউ ওজরের কারণে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ল। নামাজ শেষ হওয়ার পূর্বে তার ওজর দূর হলো এবং পানি পাওয়া গেল। তাই এ ক্ষেত্রে তার জন্য অজু করা ওয়াজিব। তখন তায়াম্মুম অকার্যকর বলে বিবেচ্য হবে।

وَإِذَا أَدْرَكَ هَدْيَهُ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَقَدْ كَانَ عَيَّنَهُ لِمَقْصُودٍ إِسْتَغْنَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْهَدْيَ دُونَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ لِعَجْزِهِ عَنِ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ دُونَ الْهَدْيِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ إِسْتِحْسَانًا وَهٰذَا التَّقْسِيمُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلٰى قَوْلِهِمَا فِي الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَمَنْ يُدْرِكُ الْحَجَّ يُدْرِكُ الْهَدْيَ وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلٰى قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَفِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ يَسْتَقِيمُ بِالْإِتِّفَاقِ لِعَدَمِ تَوَقُّتِ الدَّمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَجْهُ الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) أَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْحَجُّ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ وَهُوَ الْهَدْيُ وَ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجُّهَ أَضَاعَ مَالَهُ لِأَنَّ الْمَبْعُوثَ عَلٰى يَدَيْهِ الْهَدْيُ لِيَذْبَحَهُ وَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ وَحُرْمَةُ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ وَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ صَبَرَ فِي ذٰلِكَ الْمَكَانِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لِيُذْبَحَ عَنْهُ فَيَتَحَلَّلُ وَإِنْ شَاءَ تَوَجَّهَ لِيُؤَدِّيَ النُّسُكَ الَّذِيْ إِلْتَزَمَهُ بِالْإِحْرَامِ وَهُوَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْوَفَاءِ بِمَا وَعَدَ ـ

অনুবাদ : আর যদি সে হাদী পেয়ে যায়, তাহলে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে। কেননা, সে তার মালিক। আর সে তা এমন একটা উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট করেছিল যা থেকে এখন সে মুক্ত হয়ে গেছে। আর যদি হাদীর নাগাল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু হজের নয়; তাহলে মূল বিষয় লাভে অপারগ হওয়ার কারণে হালাল হয়ে যাবে। আর যদি সে হজ পাবে, কিন্তু হাদী নয় এমন সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার জন্য সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে হালাল হওয়া জায়েজ। এ প্রকারটি হজের ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাদের মতে অবরোধ-এর দম কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট। সুতরাং যে হজ পাবে, সে হাদীও পাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ প্রকারটি প্রযোজ্য হবে। আর উমরার ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে সর্বসম্মতভাবে সঠিক হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে জবাই করার বিষয়টি কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট নয়। কিয়াসের কারণ হলো– আর এটিই ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত সে স্থলবর্তী তথা হাদী দ্বারা উদ্দেশ্য লাভের পূর্বে মূল তথা হজের উপর সক্ষম। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো যদি আমরা মক্কা অভিমুখে গমনকে তার জন্য আবশ্যক করি, তাহলে তার সম্পদ নষ্ট হবে। কেননা, সে জবাই করার জন্য আগেই হাদী পাঠিয়েছে অথচ তার উদ্দেশ্য লাভ হচ্ছে না। আর ধন-সম্পদের সম্মান তো জানের সম্মানের মতোই। আর সে ইচ্ছা করলে সেখানে কিংবা অন্য কোথাও অপেক্ষা করবে, তা তার ইচ্ছাধীন, যাতে তার পক্ষ থেকে জবাই করা হয়, আর সে হালাল হতে পারে। আর ইচ্ছা করলে ইহ্‌রামের মাধ্যমে মক্কায় যেতে পারে-যে ইবাদত আদায় নিজের জন্য অবধারিত করে নিয়েছে, তা সম্পন্ন করার জন্য। আর এটাই উত্তম। কেননা, এটা কৃত ওয়াদা পূর্ণ করার অধিক নিকটবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا اَدْرَكَ هَدْيَهُ الخ : ইবারতে পূর্বের সুরতটির উপসংহার বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন সে হাদীর নাগাল পেয়ে যায়, তখন সেটাকে বিক্রি কিংবা সদকা যা ইচ্ছা করতে পারবে। কেননা, সে এ হাদীর মালিক। আর সে এটাকে এমন একটি উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট করেছিল যার আবশ্যকতা এখন ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ অবরুদ্ধ ব্যক্তি তা জবাই করার পূর্বে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু অবরোধ যখন উঠে গেল এবং হজ পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা আদায় করার জন্য সে মক্কায়ও চলে এসেছে তখন ঐ হাদী প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল তা নিঃশেষ হয়েছে। আর তাই সে হাদীকে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ يُدْرِكُ الخ : এই তৃতীয় সুরতে হাদী জবাই হলে সে হালাল হয়ে যাবে। কেননা, সে মূল তথা হজ লাভে অপারগ হয়েছে। সুতরাং হাদী জবাই করার মাধ্যমে হালাল হওয়ার উপকারিতা লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ الخ : চতুর্থ সুরত অর্থাৎ হজ অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি হজ পায়, কিন্তু হাদী না পায়, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে তার জন্য হালাল হওয়া জায়েজ। তবে মক্কায় গিয়ে হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করাই উত্তম।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হজ অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.)-এর মত অনুযায়ী এ প্রকারটি প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাঁদের মতে অবরোধের দম কুরবানির দিনের সাথে আবদ্ধ। সুতরাং যে হজ পাবে সে হাদীও পাবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা প্রযোজ্য হবে। কেননা, তাঁর মতে হাদী কুরবানির দিনের সাথে আবদ্ধ নয়; বরং কুরবানির দিনের পূর্বেও জবাই করা যায়। এজন্য এমন হতে পারে যে, কেউ হজ পেল কিন্তু হাদী পেল না। আর উমরার অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির সর্বসম্মতিক্রমে তা সঠিক। কেননা, উমরার হাদী কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং এমন হতে পারে যে, উমরার অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তি উমরা পেল, কিন্তু হাদী পেল না।

কিয়াসের কারণ হলো, [যেটি ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত অবরুদ্ধ ব্যক্তি স্থলবর্তী] তথা হাদী দ্বারা উদ্দেশ্য লাভের পূর্বে মূল তথা হজ আদায় করতে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে স্থলবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য লাভ হয় না; বরং মূলই আদায় করতে হয়। এজন্য সে হজের রুকনগুলো আদায় করবে এবং হাদী জবাই করে হালাল হবে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, আমরা যদি মক্কায় গমনকে অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য আবশ্যকীয় বলে সাব্যস্ত করি, তাহলে তার মাল তথা হাদী নষ্ট হবে। অর্থাৎ তার জন্য কোনো ক্ষেত্র থাকবে না। আর ব্যক্তির উপর যেমন নিজের জানের হেফাজত জরুরি, তদ্রূপ মালের হেফাজতও জরুরি। আর তার এখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে সেখানে অবস্থান করতে পারবে কিংবা অন্য কোনো স্থানেও অবস্থান করতে পারবে, যাতে তার পক্ষ থেকে হাদী জবাই করা হয় এবং সে হালাল হয়ে যেতে পারে। আর চাইলে মক্কায় গমন করতে পারে, যাতে ইহ্‌রামের মাধ্যমে যে হজ কিংবা উমরা আদায়ের বাধ্যবাধকতা সে গ্রহণ করেছে তা আদায় করতে পারে। এটিই উত্তম। কেননা, সে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূর্ণ করার অধিক নিকটবর্তী।

وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ اُحْصِرَ لَا يَكُوْنُ مُحْصَرًا لِوُقُوْعِ الْاَمْنِ عَنِ الْفَوَاتِ وَمَنْ اُحْصِرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوْعٌ عَنِ الطَّوَافِ وَالْوُقُوْفِ فَهُوَ مُحْصَرٌ لِاَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْاِتْمَامُ فَصَارَ كَمَا اِذْ اُحْصِرَ فِى الْحِلِّ وَاِنْ قَدَرَ عَلٰى اَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ اَمَّا عَلَى الطَّوَافِ فَلِاَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهٖ وَالدَّمُ بَدْلٌ عَنْهُ فِى التَّحَلُّلِ وَاَمَّا عَلَى الْوُقُوْفِ فَلِمَا بَيَّنَّا وَقَدْ قِيْلَ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَالصَّحِيْحُ مَا اَعْلَمْتُكَ مِنَ التَّفْصِيْلِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করল অতঃপর অবরুদ্ধ হয়ে গেল, তাহলে হজ ফউত হওয়া থেকে নিরাপদ হওয়ার কারণে সে অবরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে না। আর যে ব্যক্তি মক্কায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাকে তওয়াফ ও উকূফ থেকে বাধা প্রদান করা হয়েছে, সে অবরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। কেননা, তার জন্য তা পূর্ণ করা কঠিন। সুতরাং তা হারামের বাহিরে অবরুদ্ধ হওয়ার মতোই হলো। যদি তাওয়াফ ও উকূফ এ দুটির কোনো একটি করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে না। তওয়াফের ক্ষেত্রে কারণ হলো, হজ ফউতকারী ব্যক্তি এর দ্বারাই হালাল হয়ে থাকে। আর হালাল হওয়ার জন্য দম প্রেরণ করা হয় তার বদলা স্বরূপ– তওয়াফের স্থলবর্তী হিসেবে। আর উকূফের ক্ষেত্রে কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কেউ কেউ বলেন, এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে আমি যে বিস্তারিত বিবরণ তোমাকে অবহিত করেছি তা-ই শুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করার পর অন্যান্য রুকন আদায় করতে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে না। কেননা, আরাফায় অবস্থানের ফলে অবরুদ্ধ হওয়ার কারণ তথা হজ ফউত হয়ে যাওয়া থেকে সে নিরাপদ হয়ে গেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ 'যে আরাফায় অবস্থান করল, তার হজ পূর্ণ হয়ে গেল।' সুতরাং অবরুদ্ধ হওয়ার কারণ বিদ্যমান না থাকার কারণে অবরোধও অবশিষ্ট থাকবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ ব্যক্তির উপর চারটি দম ওয়াজিব হবে– ১. মুযদালিফায় অবস্থান বর্জন করার কারণে, ২. কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়ার কারণে, ৩. তওয়াফে জিয়ারত বিলম্বিত করার কারণে, ৪. 'হলক'-কে বিলম্বিত করার কারণে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তওয়াফে জিয়ারত ও 'হলক'কে বিলম্বিত করার কারণে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

যে ব্যক্তি হারামে এমনভাবে অবরুদ্ধ হয়েছে যে, সে তওয়াফ ও উকূফে আরাফা করতে পারেনি, তাহলে সে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে। কেননা, তার জন্য হজ পূর্ণ করা দুঃসাধ্য হয়ে গেছে। সুতরাং তা হারামের বাহিরে অবরুদ্ধ হওয়ার মতোই হলো। আর যদি সে তওয়াফ ও উকূফ এ দুটির যে কোনো একটি করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে না– সে হাদী প্রেরণ করে হালাল হয়ে যাবে।

সে যদি তওয়াফ করতে সক্ষম হয়, কিন্তু আরাফায় অবস্থান করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে হজ ফউতকারী হয়ে গেল। আর হজ ফউতকারী ব্যক্তি তওয়াফ দ্বারাই হালাল হয়ে থাকে। আর হাদী প্রেরণ করে হালাল হওয়া তওয়াফের স্থলবর্তী। সুতরাং যখন মূলের উপর সক্ষম হয়ে গেছে, তখন স্থলবর্তী কার্যহীন হয়ে পড়েছে।

আর আরাফায় অবস্থান করতে সক্ষম হওয়া ব্যক্তি অবরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে না। কারণ হলো, আরাফায় অবস্থানের ফলে তার হজ হয়ে গেছে; হজ ফউত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কেননা, তওয়াফ যখন ইচ্ছা তখন করে নেবে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তা করতে পারবে।

কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মক্কায় তাওয়াফ ও উকূফে আরাফা থেকে বাধাগ্রস্ত হয় সে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'অবরুদ্ধ' বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে 'অবরুদ্ধ' বলে গণ্য হবে। তবে শুদ্ধ হলো– যে বিশদ বিবরণ রয়েছে, তা সকলের অভিমত। অর্থাৎ উকূফে আরাফা এবং তওয়াফ উভয়টি থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে অবরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। আর এ দুটোর কোনো একটি করতে সক্ষম হলে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে না।

بَابُ الْفَوَاتِ

وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَفَاتَهُ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ وَقْتَ الْوُقُوْفِ يَمْتَدُّ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ اَنْ يَطُوْفَ وَيَسْعٰى وَيَتَحَلَّلَ وَيَقْضِى الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتْ اِلَّا الطَّوَافُ وَالسَّعْىُ وَلِاَنَّ الْاِحْرَامَ بَعْدَ مَا انْعَقَدَ صَحِيْحًا لَا طَرِيْقَ لِلْخُرُوْجِ عَنْهُ اِلَّا بِاَدَاءِ اَحَدِ النُّسُكَيْنِ كَمَا فِى الْاِحْرَامِ الْمُبْهَمِ وَهٰهُنَا عَجَزَ عَنِ الْحَجِّ فَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِاَنَّ التَّحَلُّلَ وَقَعَ بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَانَتْ فِىْ حَقِّ فَائِتِ الْحَجِّ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ فِىْ حَقِّ الْمُحْصَرِ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

পরিচ্ছেদ : হজ ফউত হওয়া

অনুবাদ : যে ব্যক্তি হজের ইহ্‌রাম বাঁধল, কিন্তু আরাফার অবস্থান ফউত হয়ে গেল– এমনকি কুরবানির দিনের ফজর উদিত হয়ে গেল, তাহলে তার হজ ফউত হয়ে গেছে। কেননা, আমরা উল্লেখ করেছি যে, উকূফের সময় দশ তারিখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত। আর তার কর্তব্য হলো তওয়াফ ও সাঈ করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর হজ কাজা করবে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ 'যে ব্যক্তি রাত্রেও আরাফার উকূফ ফউত করল, তার হজ ফউত হয়ে গেল। সুতরাং সে যেন উমরার মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। আর তার উপর পরবর্তী বছর হজ করা ওয়াজিব।' আর উমরা তো তওয়াফ ছাড়া আর কিছু নয়। তা ছাড়া ইহ্‌রাম শুদ্ধরূপে সংঘটিত হওয়ার পর দুই ইবাদতের যে কোনো একটি আদায় করা ছাড়া তা থেকে বের হওয়ার কোনো পন্থা নেই। যেমন– অনির্ধারিত ইহ্‌রামের ক্ষেত্রে। তবে এখানে যেহেতু সে হজ করতে অক্ষম হয়েছে, সেহেতু তার জন্য উমরা নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, উমরার আমল দ্বারাই হালাল হওয়া সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং হজ ফউতকারীর ক্ষেত্রে উক্ত উমরা, অবরুদ্ধ ব্যক্তির জবাই-এর পর্যায়ে গণ্য। সুতরাং উভয়টিকে একত্র করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَابُ الْفَوَاتِ : اِحْصَارٌ [অবরুদ্ধ হওয়া] এককের পর্যায়ভুক্ত, আর فَوَاتٌ [ফউত হওয়া] যৌগিকের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, রুকন আদায় করা ছাড়া ইহ্‌রাম হলো اِحْصَارٌ আর فَوَاتٌ হলো ইহ্‌রাম ও রুকন কোনোটিই আদায় না করা।

মাসআলা : এক ব্যক্তি হজের ইহ্‌রাম বাঁধল, কিন্তু তার আরাফায় উকূফ ফউত হয়ে গেল, এমনকি দশ তারিখের ফজর উদিত হয়ে গেল, তাহলে তার হজ ফউত হয়ে গিয়েছে। কেননা, আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, উকূফে আরাফার সময় কুরবানির দিনের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত থাকে। এরপর আর থাকে না। এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যার উকূফে আরাফা ফউত হয়ে গেল, তার হজ ফউত হয়ে গেল। এখন তার কর্তব্য হলো উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর এই হজের কাজা করবে। তার উপর কাফ্‌ফারার দম ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রেও আরাফার উকূফ ফউত করল, তার হজ ফউত হয়ে গেল। সুতরাং সে যেন উমরার মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। আর তার উপর পরবর্তী বছর হজ করা ওয়াজিব। আর উমরাতো তওয়াফ ও সাঈ ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ইহ্‌রাম তো বিশুদ্ধরূপে সংঘটিত হয়েছে। এখন হজ কিংবা উমরা আদায় করা ছাড়া ইহ্‌রাম থেকে বের হওয়ার কোনো পন্থা নেই। যেমন– কেউ অনির্ধারিতভাবে ইহ্‌রাম বাঁধল অর্থাৎ ইহ্‌রাম বেঁধেছে বটে, হজ কিংবা উমরার নিয়ত করেনি। তাহলে সে ক্ষেত্রে তার উপর যে-কোনো একটি আদায় করা আবশ্যক। তদ্রূপ এখানেও যে কোনো একটি আদায় করা আবশ্যক হবে। কিন্তু হজ ফউত হওয়ার কারণে সে হজ করতে অক্ষম। সুতরাং উমরা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আমাদের মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দম ওয়াজিব। তিনি হজ ফউত হওয়াকে অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর কিয়াস করেছেন। অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর যেমন দম ওয়াজিব, তদ্রূপ হজ ফউত হওয়ার ক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হলো, হজ ফউতকারী উমরার ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। সুতরাং হজ ফউতকারীর ক্ষেত্রে উমরা আদায় করা, অবরুদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হওয়ার পর্যায়ে গণ্য। সুতরাং উভয়টিকে একত্র করা হবে না। অর্থাৎ হালাল হওয়ার জন্য মূল হলো উমরা করা। কিন্তু অবরুদ্ধ ব্যক্তি যেহেতু উমরা করতে সক্ষম নয়, তাই তার পরিবর্তে হাদী ওয়াজিব হবে। সুতরাং অবরুদ্ধ ব্যক্তি উমরা আদায় করতে অক্ষম, পক্ষান্তরে হজ ফউতকারী উমরা আদায় করতে সক্ষম। উভয়ের মাঝে বৈপরীত্যের সম্পর্ক। তাই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

وَالْعُمْرَةُ لَا تَفُوْتُ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ جَمِيْعِ السَّنَةِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ يُكْرَهُ فِيْهَا فِعْلُهَا وَهِيَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ الْعُمْرَةَ فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْخَمْسَةِ وَلِأَنَّ هٰذِهِ أَيَّامُ الْحَجِّ فَكَانَتْ مُتَعَيِّنَةً لَهُ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ لِأَنَّ دُخُوْلَ وَقْتِ رُكْنِ الْحَجِّ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ وَالْأَظْهَرُ مِنَ الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلٰكِنْ مَعَ هٰذَا لَوْ أَدَّاهَا فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ صَحَّ وَيَبْقٰى مُحْرِمًا بِهَا فِيْهَا لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِغَيْرِهَا وَهُوَ تَعْظِيْمُ أَمْرِ الْحَجِّ وَتَخْلِيْصُ وَقْتِهِ لَهُ فَيَصِحُّ الشُّرُوْعُ .

অনুবাদ : উমরা কখনো ফউত হয় না। [নির্দিষ্ট] পাঁচদিন ছাড়া সারা বছর তা জায়েজ। ঐ পাঁচদিন উমরা করা মাকরূহ। দিনগুলো হলো, আরাফার দিন, কুরবানির দিন ও তাশরীকের তিনদিন। কেননা, হযরত 'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই পাঁচদিন তিনি উমরা করা মাকরূহ বলতেন। তা ছাড়া এ দিনগুলো হলো হজের দিন। সুতরাং হজের জন্যই তা নির্ধারিত থাকবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আরাফার দিন সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে তা মাকরূহ হবে না। কেননা, সূর্য হেলে যাওয়ার পরে হজের রুকন আরম্ভ হয়, পূর্বে নয়। তবে আমরা প্রকাশ্য মাযহাব উল্লেখ করেছি। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি এ দিনগুলোতে উমরা আদায় করে, তাহলে শুদ্ধ হবে এবং ঐদিনগুলোতে সে উমরার কারণে মুহ্‌রিম থাকবে। কেননা, উমরা বহির্ভূত কারণে মাকরূহ হয়েছে। আর তা হলো হজের বিষয়টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং হজের সময়কে হজের জন্য খালেস করে রাখা। সুতরাং উমরা শুরু করা শুদ্ধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উমরা যেহেতু কোনো সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়, তাই তা ফউত হবে না; বরং সারা বছরই তা জায়েজ। অবশ্য পাঁচদিন উমরা করা মাকরূহ। আর তা হলো– আরাফার দিন, কুরবানির দিন এবং তাশরীকের তিনদিন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ পাঁচদিনেও উমরা করা মাকরূহ নয়।

আমাদের দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। দ্বিতীয় দলিল হলো, এ পাঁচদিন হজের দিন। তাই এদিনগুলো হজের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আরাফার দিন সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে উমরা করা জায়েজ, মাকরূহ হবে না। কেননা, হজের রুকন তথা উকূফে আরাফার সময় সূর্য হেলে পড়ার পর শুরু হয়, এর পূর্বে নয়। এজন্য সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে উমরা করার ক্ষেত্রে কারাহাত হবে না। তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা-ই হলো প্রকাশ্য মাযহাব। অর্থাৎ আরাফার দিন সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে ও পরে উমরা করা মাকরূহ।

অবশ্য মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও এ দিনগুলোতে কেউ উমরা আদায় করলে শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ঐ দিনগুলোতে সে মুহ্‌রিম থাকবে। কেননা, সত্তাগতভাবে উমরার মধ্যে কোনো কারাহাত নেই; বরং মাকরূহ হয়েছে উমরার বহির্ভূত কারণে। আর তা হলো হজের বিষয়টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং হজের সময়কে হজের জন্য খালেস করে দেওয়া। সুতরাং উমরার মধ্যে যখন মূলগত কোনো কারাহাত নেই; বরং বহির্ভূত কারণে কারাহাত এসেছে, তখন উমরা শুরু করা শুদ্ধ হবে। অতএব ইহ্‌রাম থাকবে। আর আদায় করে ফেললে তা আবশ্যকতা মাফিক আদায় হয়ে যাবে, যদিও তা মাকরূহ। যেমন– মাকরূহ সময়ে আসর নামাজ আদায় করলে কিংবা নফল শুরু করলে শেষ করে ফেলবে।

ফায়দা : রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি উমরা করেছেন। চারটিই ছিল হিজরতের পরে এবং চারটিই জিলকাদ মাসে আদায় করেছেন। ১. উমরায়ে হুদায়বিয়া– ৬ষ্ঠ হিজরি। ২. উমরাতুল কাযা ৭ম হিজরি। ৩. বিদায় হজের সময়কালে– ১০ম হিজরি। ৪. উমরায়ে জি'ইররানা।

وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) فَرِيْضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةِ الْحَجِّ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ وَلِأَنَّهَا غَيْرُ مُوَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ وَتَتَأَدّٰى بِنِيَّةِ غَيْرِهَا كَمَا فِىْ فَائِتِ الْحَجِّ وَهٰذِهِ اَمَارَةُ النَّفْلِيَّةِ وَتَاوِيْلُ مَا رَوَاهُ اَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِاَعْمَالٍ كَالْحَجِّ اِذْ لَا تَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ مَعَ التَّعَارُضِ فِى الْاٰثَارِ قَالَ وَهِىَ الطَّوَافُ وَالسَّعْىُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِىْ بَابِ التَّمَتُّعِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : আর উমরা হলো সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফরজ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَلْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةِ الْحَجِّ 'হজের ফরজের মতো উমরাও একটি ফরজ।' আর আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- اَلْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ 'হজ হলো ফরজ আর উমরা নফল।' তা ছাড়া উমরা কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। অধিকন্তু অন্য নিয়ত দ্বারাও আদায় হয়ে যায়। যেমন- হজ ফউতকারীর ক্ষেত্রে। এটাই হলো নফলের আলামত। আর তিনি [ইমাম শাফেয়ী (র.)] যা বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাখ্যা হলো, উমরা হজের ন্যায় কতিপয় আমলের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা, পরস্পর বিপরীত হাদীস দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হয় না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উমরা হলো তওয়াফ ও সা'ঈ। তামাত্তু' অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলা সঠিক বিষয় সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে উমরা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা ফরজ। ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো এই হাদীস- اَلْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةِ الْحَجِّ 'হজের ফরজের মতো উমরাও একটি ফরজ।'

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- اَلْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ 'হজ হলো ফরজ, আর উমরা হলো নফল।' দ্বিতীয় দলিল, উমরার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই; বরং সারা বছরের যে কোনো সময়ে যখন মন চাইবে তখনই উমরা করা যায়। আর উমরা অন্য নিয়ত দ্বারাও আদায় হয়ে যায়। যেমন- হজ ফউতকারী হজের নিয়ত করে বটে, কিন্তু পালন করে উমরা। আর কোনো আমল সময়ের সাথে নির্ধারিত না হওয়া, অন্য নিয়ত দ্বারা আদায় হওয়া নফল হওয়ার আলামত। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, উমরা হলো নফল।

ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল হিসেবে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তার জবাব হলো- اَلْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ -এর মমার্থ হচ্ছে- হজের ক্ষেত্রে যেমন আমল নির্ধারিত, তেমনি উমরাও কতিপয় আমলের সাথে নির্দিষ্ট। অধিকন্তু উমরা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিপরীত হাদীস এসেছে। আর পরস্পর বিপরীত হাদীস দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হয় না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উমরা হলো তওয়াফ ও সাঈ-এর নাম। তামাত্তু' অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সঠিক বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

اَلْاَصْلُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ اَنَّ الْاِنْسَانَ لَهٗ اَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهٖ لِغَيْرِهٖ صَلٰوةً اَوْ صَوْمًا اَوْ صَدَقَةً اَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهٖ وَالْاٰخَرُ عَنْ اُمَّتِهٖ مِمَّنْ اَقَرَّ بِوَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَشَهِدَ لَهٗ بِالْبَلَاغِ جَعَلَ تَضْحِيَةَ اِحْدَى الشَّاتَيْنِ لِاُمَّتِهٖ ـ

পরিচ্ছেদ : অপরের পক্ষে হজ করা

অনুবাদ : এ বিষয়ে মূলনীতি হলো মানুষের অধিকার রয়েছে নিজের আমলের ছওয়াব অন্যের জন্য নির্ধারণ করার। চাই তা নামাজ হোক কিংবা রোজা, সদকা বা অন্য কোনো আমল। এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের দুটি মেষ কুরবানি দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি নিজের পক্ষ থেকে এবং অন্যটি তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকার করে এবং তিনি যে আল্লাহর বার্তা পৌছিয়ে দিয়েছেন, তার সাক্ষ্য দেয় তাদের পক্ষ থেকে। এখানে দুটি বকরির একটিকে তাঁর উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَابُ الْحَجِّ الخ : গ্রন্থকার (র.) হজের মূল ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের আলোচনা সমাপনান্তে এ অধ্যায়ে প্রতিনিধিত্বের পন্থায় অন্যের পক্ষ থেকে হজ করার বিধান নিয়ে আলোকপাত করবেন।

قَوْلُهٗ اَلْاَصْلُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ الخ : মানুষ তার নামাজ, রোজা প্রভৃতি আমলের ছওয়াব অন্যের জন্য নির্ধারণ করলে, তা তার জন্য হবে কিনা এ ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হলো, এটা জায়েজ। কেউ যদি নিজের আমলের ছওয়াব অন্যের জন্য নির্ধারণ করতে চায়, তাহলে সেটা তার জন্য হয়ে যাবে। মু'তাযিলাদের অভিমত হলো, জায়েজ নেই। তাদের মতে নিজের ছওয়াব অন্যের জন্য পৌছবে না। এ ক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى 'মানুষ যা চেষ্টা করে, কেবল সেটাই তার কাজে আসে।' মূলত এই আমল অন্যের প্রচেষ্টার ফসল নয়। এজন্য এর ছওয়াব অন্যের নিকট পৌছবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ছওয়াব জান্নাতের অপর নাম। আর জান্নাতকে অন্যের মালিকানায় দেওয়ার অধিকার তার নেই। কেননা, সে নিজেই তার মালিক নয়। এ থেকেও বুঝা যায় যে, মানুষ তার আমলের ছওয়াব অন্যের জন্য পৌছাতে পারে না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দলিল হলো- এই হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের দুটি মেষ জবাই করেছিলেন। একটি ছিল তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আর অন্যটি ছিল তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে, যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের স্বীকার করে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি বকরির একটির ছওয়াব স্বীয় উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এ হাদীস থেকে অন্যের জন্য ছওয়াব পৌছানোর বিষয়টি সাব্যস্ত হয়।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা মৃতব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সদকা করি, হজ করি, তাদের জন্য দোয়া করি। এসব আমলের ছওয়াব কি তাঁদের নিকট পৌঁছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এসব আমলের ছওয়াব তাদের নিকট পৌঁছে যায় এবং মৃতব্যক্তিরা এরূপ খুশি হয়, যেমন তোমাদের কেউ একগাদা উপহার পেলে খুশি হও। এ থেকেও একজনের আমলের ছওয়াব অন্যের জন্য পৌঁছানোর বিষয়টি সাব্যস্ত হয়।

আবার ফেরেশ্তারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে– এ বিষয়টি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا -

উক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা তার উপকারে আসে।

মু'তাযিলাদের দলিলের জবাবে বলা হয় যে, أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى -এর মর্মার্থ হলো, যখন কেউ অন্যের জন্য নিজের প্রচেষ্টা চালায়, তখন তার এই প্রচেষ্টা সেই ব্যক্তির প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হয় এবং নিজের প্রচেষ্টা অন্যের জন্য করার অধিকারও তার রয়েছে, আর নিজের জান্নাতের প্রাপ্য অংশকে অন্যের জন্য দেওয়ার অধিকারও তার রয়েছে। অধিকন্তু এ আয়াত মু'তাযিলাদের দলিল হতে পারে না।

দ্বিতীয় জবাব হলো, আয়াতে প্রচেষ্টা দ্বারা ঈমানী প্রচেষ্টা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একজনের ঈমান অন্যের কাজে আসবে না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট যখন একজনের আমলের ছওয়াব অন্যের জন্য নির্ধারণ করা জায়েজ, তখন তা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হজের ছওয়াব আদেশদাতার জন্যই নির্ধারিত হবে, শর্ত হলো– আদিষ্ট ব্যক্তি এ ছওয়াবকে আদেশদাতার জন্য পৌঁছাবে।

وَالْعِبَادَاتُ اَنْوَاعٌ مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالزَّكٰوةِ وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالصَّلٰوةِ وَمُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا كَالْحَجِّ وَالنِّيَابَةُ تَجْرِىْ فِى النَّوْعِ الْاَوَّلِ فِىْ حَالَتَيِ الْاِخْتِيَارِ وَالضَّرُوْرَةِ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِفِعْلِ النَّائِبِ وَلَا تَجْرِىْ فِى النَّوْعِ الثَّانِىْ بِحَالٍ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ وَهُوَ اِتْعَابُ النَّفْسِ لَا يَحْصُلُ بِهٖ وَتَجْرِىْ فِى النَّوْعِ الثَّالِثِ عِنْدَ الْعَجْزِ لِلْمَعْنَى الثَّانِىْ وَهُوَ الْمَشَقَّةُ بِتَنْقِيْصِ الْمَالِ وَلَا تَجْرِىْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِعَدَمِ اِتْعَابِ النَّفْسِ وَالشَّرْطُ الْعَجْزُ الدَّائِمُ اِلٰى وَقْتِ الْمَوْتِ لِاَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ الْعُمُرِ وَفِى الْحَجِّ النَّفْلِ تَجُوْزُ الْاِنَابَةُ حَالَةَ الْقُدْرَةِ لِاَنَّ بَابَ النَّفْلِ اَوْسَعُ ثُمَّ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْمَحْجُوْجِ عَنْهُ وَبِذٰلِكَ تَشْهَدُ الْاَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِى الْبَابِ كَحَدِيْثِ الْخَثْعَمِيَّةِ فَاِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيْهِ حُجِّىْ عَنْ اَبِيْكِ وَاعْتَمِرِىْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْحَاجِّ وَلِلْاٰمِرِ ثَوَابُ النَّفَقَةِ لِاَنَّهٗ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَعِنْدَ الْعَجْزِ اُقِيْمَ الْاِنْفَاقُ مَقَامَهٗ كَالْفِدْيَةِ فِىْ بَابِ الصَّوْمِ ـ

অনুবাদ : আর ইবাদত কয়েক প্রকার। শুধু আর্থিক, যেমন– যাকাত; শুধু দৈহিক। যেমন– নামাজ; উভয়টির সমন্বয়ে একত্রিত, যেমন– হজ। প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে সামর্থ্য থাকা ও অক্ষমতা উভয় অবস্থায় স্থলবর্তিতা প্রয়োগ হয়। কেননা, স্থলাভিষিক্তের কার্য দ্বারাই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই স্থলবর্তিতা প্রয়োগ হয় না। কেননা, এর উদ্দেশ্য নফসের সাধনা যা স্থলাভিষিক্তের দ্বারা অর্জিত হয় না। আর তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে অক্ষমতার অবস্থায় স্থলবর্তিতা কার্যকর হয়। কেননা, এতে প্রথম বিষয়টি মাল খরচের মাধ্যমে কষ্ট লাভ অর্জিত হয়। কিন্তু সক্ষমতার অবস্থায় তা কার্যকর হবে না– নফসের সাধনা অর্জিত না হওয়ার কারণে। শর্ত হলো, [হজের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা জায়েজ হওয়ার জন্য] মৃত্যুর সময় পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতা। কেননা, হজ হলো সারা জীবনের ফরজ। আর নফল হজের ক্ষেত্রে সক্ষম অবস্থায়ও স্থলবর্তিতা জায়েজ। কেননা, নফলের বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। প্রকাশ্য মাযহাব এই যে, যার পক্ষ থেকে হজ করা হচ্ছে, তার থেকেই হজটি সংঘটিত হবে। আলোচ্য বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। যেমন– খাছ্'আম গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক সম্পর্কিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ করো এবং উমরা করো। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, হজকারীর পক্ষ থেকেই হজ সংঘটিত হবে, আর নির্দেশকারী খরচের ছওয়াব পাবে। কেননা, হজ একটি দৈহিক ইবাদত। অক্ষমতার ক্ষেত্রে অর্থব্যয়কে হজের স্থলবর্তী করা হয়। যেমন– রোজার ক্ষেত্রে ফিদ্‌ইয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হজ্জ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে নাকি আদেশদাতার পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে-এ মাসআলাকে সুস্পষ্ট করতে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইবাদত মোট তিন প্রকার– ১. কেবল মাত্র আর্থিক, যেমন– যাকাত। ২. কেবল দৈহিক, যেমন– নামাজ। ৩. আর্থিক ও দৈহিক উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত, যেমন– হজ্জ। এতে দৈহিক কষ্টের সাথে সাথে মাল ব্যয় হয়।

উক্ত তিন প্রকার ইবাদতের মধ্যে প্রথম প্রকার তথা আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে সক্ষমতা ও অক্ষমতা [অসুস্থতা প্রভৃতি] উভয় অবস্থায় স্থলবর্তিতা কার্যকর হয়। কেননা, জাকাতের উদ্দেশ্যই হলো, দরিদ্রদের নিকট মাল পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং স্থলাভিষিক্ত কোনো ব্যক্তি দ্বারা দরিদ্রের নিকট মাল পৌঁছে দিলে এ ইবাদতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার তথা কেবল দৈহিক ইবাদতের ক্ষেত্রে সক্ষম হওয়া বা অক্ষম হওয়া কোনো অবস্থাতেই স্থলবর্তিতা কার্যকর হয় না। কেননা, দৈহিক ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো, নফসের সাধনা ও কষ্টদান। প্রকাশ থাকে যে, ইবাদতের এ উদ্দেশ্য স্থলাভিষিক্ত দ্বারা অর্জিত হয় না। কেননা, এ ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা নিয়োগ করলে স্থলাভিষিক্ত নফসের সাধনা ও কষ্টের শিকার হবে, যে স্থলবর্তী নিয়োগ করেছে সে নয়। তখন স্থলাভিষিক্তের পক্ষ থেকেই ইবাদত আদায় হয়ে যাবে, যে স্থলবর্তী নিয়োগ করেছে তার পক্ষ থেকে তা আদায় হবে না।

তৃতীয় প্রকার তথা হজ্জের মধ্যে যেহেতু দৈহিক ও আর্থিক দু ধরনের ইবাদতের সমন্বয় ঘটেছে, সেহেতু উভয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা বলি, অক্ষমতার অবস্থায় স্থলবর্তিতা কার্যকর হয়– প্রথম বিষয়টি তথা আর্থিক ইবাদত হওয়ার কারণে। কেননা, হজ্জের মধ্যে মাল খরচের মাধ্যমে কষ্ট লাভের বিষয়টি অর্জিত হয়। আর দৈহিক ইবাদতের দিক থেকে হজ্জের ক্ষেত্রে সক্ষমতার অবস্থায় স্থলবর্তিতা কার্যকর হবে না। কেননা, স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে আদেশদাতা নিজে কষ্টের শিকার হয় না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হজ্জের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা জায়েজ হওয়ার জন্য মৃত্যুর সময় পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতা শর্ত। কেননা, হজ্জ হলো সারা জীবনের ফরজ। অর্থাৎ হজ্জের জন্য কোনো বছর নির্ধারিত নেই; বরং যে কোনো বছর হজ্জ করলেই তা আদায় হয়ে যাবে।

নফল হজ্জের ক্ষেত্রে সক্ষম অবস্থায়ও স্থলবর্তিতা জায়েজ আছে। কেননা, নফলের বিষয়ে অধিকতর প্রশস্ততা আছে। যেমন– নফল নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে আদায় করা জায়েজ।

হজ্জ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে, নাকি আদেশদাতার পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে, এ সম্পর্কিত আলোচনায় গ্রন্থকার বলেন, প্রকাশ্য মাযহাব মতে, যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে, তার পক্ষ থেকেই হজ্জটি সংঘটিত হবে। অর্থাৎ আদেশদাতার পক্ষ থেকে, আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয়। এর দলিল হলো– খাছ্'আম গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক সম্পর্কিত হাদীস। জনৈকা স্ত্রীলোক যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন, আমার আব্বা বৃদ্ধ। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো এবং উমরা করো।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হজ্জ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে; তবে আদেশদাতা খরচের ছওয়াব পাবে। কেননা, বিশুদ্ধমত অনুযায়ী হজ্জ হলো একটি দৈহিক ইবাদত। যেমন এ অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে। আর এ ইবাদতের আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো মাল। আর অক্ষমতার ক্ষেত্রে এ অর্থ ব্যয়কে হজ্জের স্থলবর্তী করা হয়। যেমন– রোজার ক্ষেত্রে ফিদ্‌ইয়া। যে ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম, তার ক্ষেত্রে রোজার পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া স্থলবর্তী হবে। আর ফিদ্‌ইয়ার ছওয়াব সে পাবে, রোজার নয়। তদ্রূপ আদেশদাতা খরচের ছওয়াব পাবে, কিন্তু তার থেকে হজ্জ আদায় হবে না।

قَالَ وَمَنْ أَمَرَهُ رَجُلَانِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَّةً فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْهُمَا فَهِيَ عَنِ الْحَاجِّ وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ لِأَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْآمِرِ حَتّٰى لَا يَخْرُجَ الْحَاجُّ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ أَنْ يُخْلِصَ الْحَجَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِشْتِرَاكٍ وَلَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُوْرِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذٰلِكَ بِخِلَافِ مَا إِذَا حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِجَعْلِ ثَوَابِ عَمَلِهِ لِأَحَدِهِمَا أَوْلَهُمَا فَيَبْقٰى عَلٰى خِيَارِهِ بَعْدَ وُقُوْعِهِ سَبَبًا لِثَوَابِهِ وَهُنَا يَفْعَلُ بِحُكْمِ الْآمِرِ وَقَدْ خَالَفَ أَمْرَهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যাকে দুজন ব্যক্তি আদেশ করল তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি হজ পালন করতে, আর সে উভয়ের পক্ষ থেকে হজের ইহ্‌রাম বাঁধল, তাহলে তা হজকারীর পক্ষ থেকেই হবে এবং সে খরচের ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা, হজ আদেশদাতার পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়। এমনকি হজকারী ইসলামের ফরজ হজ থেকে মুক্ত হতে পারে না। আর [এ স্থলে] তাদের প্রত্যেকে তাকে আদেশ করে অথচ অগ্রাধিকারের কোনো সম্ভাবনা না থাকার কারণে হজকে দুজনের কোনো একজনের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই তা সংঘটিত হবে। আর তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়ার পরে দুজনের কোনো একজনের মাঝে নির্ধারণ করার সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে নিজের পিতামাতার পক্ষ থেকে হজ আদায় করার হুকুম ভিন্ন। সেক্ষেত্রে সে দুজনের একজনের জন্য হজটিকে নির্ধারণ করতে পারে। কেননা, সে নিজের আমলের ছওয়াব দুজনের একজনের জন্য কিংবা উভয়ের জন্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় দানকারী হচ্ছে। সুতরাং হজটি তার ছওয়াবের কারণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পর তার ইচ্ছাধীনে থাকবে। কিন্তু এ স্থলে সে আদেশদাতার আদেশের ভিত্তিতে আমলটি করছে অথচ উভয়ের আদেশকেই সে লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং হজটি তার নিজের পক্ষ থেকে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : দুজন ব্যক্তি কোনো একজনকে তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে হজ করার জন্য স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করল। আর সে তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে হজের ইহ্‌রাম বাঁধল। অর্থাৎ নির্দিষ্ট না করেই উভয়ের পক্ষ থেকে হজের ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করল, তাহলে এ হজটি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই গণ্য হবে এবং আদেশকারী দুজন যে খরচ বহন করেছিল– তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলাটির যে দলিল উল্লেখ করেছেন, বাহ্যত তা ও আলোচ্য মাসআলার মাঝে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। কেননা মাসআলা হলো, হজ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই গণ্য হবে, আর তাকে খরচের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর দলিলে বলা হয়েছে, হজ আদেশদাতার পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ দুয়ের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই।

'নিহায়া' গ্রন্থকার (র.) বলেন, হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত দলিলটি ঐ হুকুমের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যা কিতাবে উল্লিখিত হয়নি। উহ্য বক্তব্য এরূপ যে, হজকারী উভয় আদেশকারীর খরচের ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা, সে উভয়ের আদেশকেই লঙ্ঘন করেছে। যদি সে আদেশদাতার কথা মতো করে, তাহলে সে খরচের ক্ষতিপূরণ দেবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে হজ আদেশদাতার পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়। এমনকি আদিষ্ট ব্যক্তি ইসলামের ফরজ হজ থেকে মুক্ত হবে না। আর এখানে সে আদেশদাতার আদেশ লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং আদেশদাতার পক্ষ থেকে তা গণ্য হবে না; বরং হজকারীর পক্ষ থেকেই গণ্য হবে।

'ইনায়া' গ্রন্থকার (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলা ও দলিলের মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে এভাবে যে, একদিক থেকে হজটি হজকারীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে, আবার অন্যদিক থেকে উভয় আদেশদাতার পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে।

হজকারীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়ার দলিল হলো, উভয় আদেশদাতার প্রত্যেকে তাকে আদেশ করেছে, যেন সে হজটিকে অন্য কারো শরিকানা ছাড়া তার একার জন্য আদায় করে। সুতরাং আদিষ্ট ব্যক্তি যখন উভয়ের পক্ষ থেকে নিয়ত করে, তখন সে প্রত্যেকের আদেশ লঙ্ঘন করার কারণে এ আমলটি তার পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে, আদেশদাতাদের পক্ষ থেকে গণ্য হবে না। আর এ কারণেই তাদের উভয়ের খরচের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যেহেতু তাদের দুজনের কোনো একজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এ হজকেও দুজনের কোনো একজনের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। অন্যথায় উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া লাযেম আসে। এ কারণেই এ হজটি আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই গণ্য হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, হজ তো আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই গণ্য হবে। কিন্তু পরবর্তীতে উভয়ের কোনো একজনের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেবে। যেমন– পিতামাতার পক্ষ থেকে কেউ যদি হজ করে, অতঃপর তাদের কোনো একজনের জন্য তা নির্ধারিত করা জায়েজ। তদ্রূপ এখানেও হবে।

এর উত্তরে বলা হয় যে, যেহেতু তাকে পিতামাতা হজ করতে আদেশ করেনি, আবার খরচও দেয়নি; বরং সে স্বেচ্ছায় দানকারী। আর স্বেচ্ছায় দানকারীর ক্ষেত্রে নিজের আমলের ছওয়াব দুজনের একজনের জন্য কিংবা উভয়ের জন্য নির্ধারিত করার এখতিয়ার থাকে। সুতরাং হজটি তার ছওয়াবের কারণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পর তার এখতিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি তো আদেশদাতার আদেশের ভিত্তিতে আমলটি করেছে আর সে উভয়ের আদেশকেই লঙ্ঘন করেছে, সুতরাং হজটি তার নিজের পক্ষ থেকে হবে– আদেশদাতার পক্ষ থেকে নয়।

আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ হজ আদেশদাতার পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে– এর দলিল হলো, আদিষ্ট ব্যক্তি তার এই হজের দ্বারা যদি তার জিম্মার ফরজ হজ আদায়ের নিয়ত করে, তাহলে সে ইসলামের ফরজ হজ থেকে মুক্ত হবে না। এ থেকে বুঝা যায়, এ হজটি আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে না; বরং আদেশদাতার পক্ষ থেকেই হবে।

وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِمَا لِأَنَّهُ صَرَفَ نَفَقَةَ الْآمِرِ إِلَى حَجِّ نَفْسِهِ وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ بِأَنْ نَوَى عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنٍ فَإِنْ مَضَى عَلَى ذٰلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْمُضِيِّ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ مَأْمُوْرٌ بِالتَّعْيِيْنِ وَالْإِبْهَامُ يُخَالِفُهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ هُنَالِكَ مَجْهُوْلٌ وَهٰهُنَا الْمَجْهُوْلُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شُرِعَ وَسِيْلَةً إِلَى الْأَفْعَالِ لَا مَقْصُوْدًا بِنَفْسِهِ وَالْمُبْهَمُ يَصْلُحُ وَسِيْلَةً بِوَاسِطَةِ التَّعْيِيْنِ فَاكْتُفِيَ بِهِ شَرْطًا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدَّى الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ لِأَنَّ الْمُؤَدّٰى لَا يَحْتَمِلُ التَّعْيِيْنَ فَصَارَ مُخَالِفًا .

অনুবাদ : আর সে খরচের ক্ষতিপূরণ দেবে যদি তাদের মাল থেকে ব্যয় করে। কেননা, নিজের হজে সে আদেশদাতার খরচের টাকা ব্যয় করেছে। আর যদি সে [আদিষ্ট ব্যক্তি] ইহ্রামকে অনির্দিষ্ট রাখে যে, অনির্ধারিতভাবে দুজনের একজনের নিয়ত করে এবং এভাবে হজ চালিয়ে যায়, তাহলে অগ্রাধিকার না থাকার কারণে সে অমান্যকারী হয়ে গেল। আর যদি হজের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্বে দুজনের একজনকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। এটিই কিয়াসের বিধান। কেননা, সে নির্ধারণ করতে আদিষ্ট ছিল। আর অনির্ধারিত রাখার অর্থ তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা। সুতরাং তা নিজের পক্ষ থেকে হবে। পক্ষান্তরে হজ বা উমরা নির্ধারণ না করার বিষয়টি ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে তার অধিকার রয়েছে– তার ইচ্ছামতো নির্ধারণ করার। কেননা, সেখানে দায়িত্ব গ্রহণকারী অজ্ঞাত। আর এখানে ইহ্রামের হকদার অজ্ঞাত। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, ইহ্রাম নিজস্ব সত্তায় উদ্দেশ্যরূপে নয়; বরং আমলের মাধ্যমরূপে শরিয়তে প্রবর্তিত হয়েছে। আর অনির্ধারিত ইহ্রাম পরবর্তীতে নির্ধারণের মাধ্যমে উপায় হিসেবে গণ্য হতে পারে। সুতরাং শর্তরূপে তা যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে স্বয়ং ক্রিয়াকর্মগুলোই যদি অনির্ধারিতভাবে আদায় করে, তাহলে তা ভিন্ন হবে। কেননা, যা আদায় করা হয়েছে, সেটাকে নির্ধারণ করার উপায় নেই। সুতরাং সে আদেশদাতার অমান্যকারী হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ الخ – মাসআলা : আদিষ্ট ব্যক্তি যদি ইহ্রামকে অস্পষ্ট রাখে। যেমন– অনির্দিষ্টভাবে দুজন আদেশদাতার মধ্য থেকে একজনের নিয়ত করে এবং এভাবেই হজের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যায়, তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদাতার কথার বিরুদ্ধাচরণ করল। কেননা, হজ সম্পন্ন হওয়ার পর কোনো একটিকে নির্ধারণ করতে পারে না। অন্যথায় সঙ্গত কারণ ছাড়াই দুটির মধ্যে একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া লাযেম আসে। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও এ হজটি আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে গণ্য হবে, আদেশদাতাদের পক্ষ থেকে গণ্য হবে না।

আর যদি হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করার পূর্বে কোনো একজনকে নির্ধারণ করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। অর্থাৎ হজ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে গণ্য হবে, আদেশদাতাদের থেকে নয়। কিয়াসের দাবিও এটাই। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াস মতে নির্ধারণ করা শুদ্ধ। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত।

কিয়াসের কারণ হলো, আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদাতাদের থেকে হজ নির্ধারণের জন্য আদিষ্ট ছিল। কিন্তু সে শুরুতেই অস্পষ্ট রেখেছে, যা নির্ধারণের বিপরীত কাজ। কাজেই আদিষ্ট ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর আদেশকারীর বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় সাব্যস্ত হয় বলে এ হজও তার থেকে আদায় হবে। যেমন– দু ব্যক্তি গোলাম খরিদ করার জন্য একজনকে উকিল নিযুক্ত করল। উকিল অনির্ধারিতভাবে তাদের দু-জনের একজনের জন্য গোলাম ক্রয় করল, তাহলে এই ক্রয়কৃত গোলাম উকিলের হবে। এখন যদি সে একজনের জন্য নির্দিষ্ট করতে চায়, তাহলে তা সহীহ হবে না। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রেও ইহ্‌রাম অস্পষ্ট রাখার পর যে কোনো একজনের জন্য নির্ধারিত করা সহীহ হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, কেউ যদি হজ কিংবা উমরার নিয়ত না করে তালবিয়া পাঠ করে তথা ইহ্‌রাম বাঁধে, অতঃপর ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্বে হজ বা উমরা নির্দিষ্ট করে নেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে। তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও আদিষ্ট ব্যক্তি যে কোনো একজনকে নির্ধারণ করতে পারবে।

এর উত্তর হলো, এ স্থলে সে আদেশদাতাদের নির্ধারণের জন্য আদিষ্ট ছিল। উভয়ের প্রত্যেকে তাকে আদেশ করেছে, যেন সে হজটিকে তার একার জন্য আদায় করে। কিন্তু সে তা করেনি, বরং আদেশদাতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তাই এখন আর কোনো একজনের জন্য নির্ধারণ করা জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে হজ বা উমরার নিয়ত না করে অনির্ধারিতভাবে ইহ্‌রাম বাঁধার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, হজ বা উমরা অনির্ধারিত রাখার ক্ষেত্রে যে বিষয় তার উপর আবশ্যক, তা অজ্ঞাত। সুতরাং বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট করা জায়েজ। যেমন– যায়েদ স্বীকার করল যে, বকর তার কাছে অনির্দিষ্ট কিছু মাল-সম্পদ পাবে। [শরিয়তের দৃষ্টিতে] এ ধরনের স্বীকারোক্তি সহীহ বলে গণ্য। আর মাল-সম্পদের পরিমাণ বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেবে। আর আদিষ্ট ব্যক্তির ইহ্‌রাম অনির্ধারিত রাখার ক্ষেত্রে, ইহ্‌রামের হকদার অজ্ঞাত। যেমন– যায়েদ স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করল যে, অজ্ঞাত এক হাজার দিরহাম পাওনাদার। শরিয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের স্বীকারোক্তি সহীহ্ নয়। কেননা, এখানে হকদার অজ্ঞাত। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে উল্লিখিত প্রশ্নের কিয়াস যথার্থ নয়।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি হলো, ইহ্‌রাম নিজস্ব সত্তায় উদ্দেশ্য নয়; বরং তা আমলের মাধ্যম। আর অস্পষ্ট কিছু পরবর্তীতে নির্ধারণের মাধ্যমে অসিলা বা উপায় হতে পারে। সুতরাং শর্তরূপে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, শর্ত যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, তা যথেষ্টরূপে গণ্য হয়। যেমন নামাজের জন্য শর্ত হলো অজু করা। কিন্তু কেউ যদি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য অজু করে অতঃপর সেই অজু দিয়ে নামাজ পড়ে, তাহলেও নামাজ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে আদিষ্ট ব্যক্তি যখন অনির্ধারিতভাবে হজের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে, তখন তা আর নির্ধারণের সুযোগ থাকে না, এ বিষয়টি ভিন্ন। কেননা যা আদায় করা হয়েছে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য এখনো যা আদায় করা হয়নি, তা নির্ধারণ করা সম্ভব। আর আদিষ্ট ব্যক্তি অনির্ধারিত অবস্থায় ক্রিয়াকর্মগুলো আদায় করে আদেশদাতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর আদেশদাতার বিরুদ্ধাচরণ করলে আমল আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় হয়।

قَالَ فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ أَنْ يَقْرِنَ عَنْهُ فَالدَّمُ عَلٰى مَنْ أَحْرَمَ لِأَنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وَفَّقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ وَالْمَأْمُوْرُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهٰذِهِ النِّعْمَةِ لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمَرْوِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْمَأْمُوْرِ وَكَذٰلِكَ إِنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَالْآخَرُ بِأَنْ يَعْتَمِرَ عَنْهُ وَأَذِنَا لَهُ بِالْقِرَانِ فَالدَّمُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ অন্য কাউকে তার পক্ষ থেকে কিরান করার নির্দেশ দেয়, তাহলে ইহরামকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুটি ইবাদত একত্রে করার তৌফিক দেওয়ায় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এটা ওয়াজিব হয়েছে। আর আদিষ্ট ব্যক্তি এ নিয়ামতের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা, প্রকৃত কাজ তো তার পক্ষ থেকেই হচ্ছে। এ মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত 'হজ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়' মতামতের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে। একই হুকুম হবে, যদি কেউ তাকে তার পক্ষ থেকে হজ করতে আদেশ করে, আর অন্য কেউ তাকে উমরা করতে আদেশ করে এবং উভয়ে তাকে কিরানের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে দম তার উপরই ওয়াজিব হবে– এর কারণ আমরা বলেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ الخ : **মাসআলা :** যদি কেউ অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিরান হজ করতে নির্দেশ দেয়, তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কিরানের দম ওয়াজিব হবে; আদেশদাতার মাল থেকে নয়। এর দলিল হলো, কিরানের দম আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শোকর যে, তিনি তাকে হজ ও উমরা দুটি ইবাদত একত্রে আদায় করার তৌফিক দান করেছেন। আর এই নিয়ামতের সাথে আদিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট। কেননা, কিরানের প্রকৃত আমল তো তার পক্ষ থেকেই হচ্ছে। এ কারণে তার উপরই কিরানের দম ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলাটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, হজ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয় যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

وَ دَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْآمِرِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) عَلَى الْحَاجِّ لِاَنَّهُ وَجَبَ لِلتَّحَلُّلِ دَفْعًا لِضَرَرِ اِمْتِدَادِ الْاِحْرَامِ وَهٰذَا الضَّرَرُ رَاجِعٌ اِلَيْهِ فَيَكُوْنُ الدَّمُ عَلَيْهِ وَلَهُمَا اَنَّ الْاٰمِرَ هُوَ الَّذِىْ اَدْخَلَهُ فِىْ هٰذِهِ الْعُهْدَةِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অবরোধ-এর দম আদেশদাতার উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, হজকারীর উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, তা ওয়াজিব হয়েছে ইহ্‌রাম প্রলম্বিত হওয়ার কষ্ট দূর করার জন্য হালাল হওয়ার কারণে। আর এ কষ্ট তার সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং তার উপরেই দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, আদেশদাতাই তাকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করেছে। সুতরাং তাকে মুক্ত করা তারই উপর ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَدَمُ الْإِحْصَارِ الخ : মাসআলা : আদিষ্ট ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হলে অবরোধ-এর দমের মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে আদেশদাতার উপর এ দম ওয়াজিব হবে, আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, إِحْصَارْ-এর দম হালাল হওয়ার জন্য ওয়াজিব হয়, যাতে ইহ্‌রাম প্রলম্বিত হওয়ার কষ্ট বিদূরিত হয়। আর এই কষ্ট আদিষ্ট ব্যক্তির সাথেই সম্পৃক্ত। তাই إِحْصَارْ-এর দম তার উপরই ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, আদেশদাতাই তো তাকে এই দায়িত্বে নিয়োগ করেছে। সুতরাং যে এই দায়িত্ব দিয়েছে তারই কর্তব্য হবে তাকে মুক্ত করা।

قَالَ فَإِنْ اَمَرَهُ غَيْرُهُ اَنْ يَقْرِنَ عَنْهُ فَالدَّمُ عَلٰى مَنْ اَحْرَمَ لِاَنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وَفَّقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ وَالْمَامُوْرُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهٰذِهِ النِّعْمَةِ لِاَنَّ حَقِيْقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ وَهٰذِهِ الْمَسْاَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمَرْوِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْمَامُوْرِ وَكَذٰلِكَ اِنْ اَمَرَهُ وَاحِدٌ بِاَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَالْاٰخَرُ بِاَنْ يَعْتَمِرَ عَنْهُ وَاَذِنَا لَهُ بِالْقِرَانِ فَالدَّمُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ অন্য কাউকে তার পক্ষ থেকে কিরান করার নির্দেশ দেয়, তাহলে ইহরামকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুটি ইবাদত একত্রে করার তৌফিক দেওয়ায় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এটা ওয়াজিব হয়েছে। আর আদিষ্ট ব্যক্তি এ নিয়ামতের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা, প্রকৃত কাজ তো তার পক্ষ থেকেই হচ্ছে। এ মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত 'হজ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়' মতামতের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে। একই হুকুম হবে, যদি কেউ তাকে তার পক্ষ থেকে হজ করতে আদেশ করে, আর অন্য কেউ তাকে উমরা করতে আদেশ করে এবং উভয়ে তাকে কিরানের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে দম তার উপরই ওয়াজিব হবে– এর কারণ আমরা বলেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ اَمَرَهُ غَيْرُهُ الخ : মাসআলা : যদি কেউ অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিরান হজ করতে নির্দেশ দেয়, তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কিরানের দম ওয়াজিব হবে; আদেশদাতার মাল থেকে নয়। এর দলিল হলো, কিরানের দম আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শোকর যে, তিনি তাকে হজ ও উমরা দুটি ইবাদত একত্রে আদায় করার তৌফিক দান করেছেন। আর এই নিয়ামতের সাথে আদিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট। কেননা, কিরানের প্রকৃত আমল তো তার পক্ষ থেকেই হচ্ছে। এ কারণে তার উপরই কিরানের দম ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলাটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, হজ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয় যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

وَمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَأَحَجُّوا عَنْهُ رَجُلًا فَلَمَّا بَلَغَ الْكُوفَةَ مَاتَ أَوْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ وَقَدْ أَنْفَقَ النِّصْفَ يُحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَنْزِلِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَقَالَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْأَوَّلُ فَالْكَلَامُ هٰهُنَا فِي إِعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَفِي مَكَانِ الْحَجِّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمَذْكُورُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يُحَجُّ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ وَإِلَّا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ إِعْتِبَارًا بِتَعْيِينِ الْمُوْصِي إِذْ تَعْيِينُ الْوَصِيِّ كَتَعْيِينِهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) يُحَجُّ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَحَلُّ لِنِفَاذِ الْوَصِيَّةِ .

অনুবাদ : যদি কেউ অসিয়ত করে যে, তার পক্ষ থেকে যেন হজ করা হয়। অতঃপর ওয়ারিসগণ তার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে হজে পাঠাল। সে যখন কুফায় পৌছল তখন মারা গেল কিংবা তার খরচের অর্থ চুরি হয়ে গেল, অথচ সে অর্ধেক অর্থ ব্যয় করেছে, তাহলে মৃতের পক্ষে তার বাড়ি থেকে তার অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে হজ করানো হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, যেখানে প্রথম স্থলাভিষিক্ত মারা গেছে, সেখান থেকে হজ করাতে হবে। তাহলে এখানে আলোচনা হলো সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ বিবেচনা করা আর হজের স্থান বিবেচনা করা। প্রথমটি সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো যে মাল থেকে দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা দ্বারা তার পক্ষ হতে হজ করানো হবে। অন্যথায় অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। অসিয়তকারীর নিজের নির্ধারণ করার উপর কিয়াস করে। কেননা তত্ত্বাবধানকারীর নির্ধারণ করা নিজের নির্ধারণ করার মতোই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথম তৃতীয়াংশের অবশিষ্ট থেকে তার পক্ষ হতে হজ করানো হবে। কেননা তা-ই অসিয়ত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ أَوْصٰى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে হজ করানোর অসিয়ত করল আর তার ওয়ারিসগণ তার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে সফরের খরচ দিয়ে হজে পাঠাল, কিন্তু সে রাস্তায় মারা গেল কিংবা তার খরচের অর্থ চুরি হয়ে গেল অথচ ইতোমধ্যে সে অর্ধেক অর্থ ব্যয় করে ফেলেছে, তাহলে এখানে দুটি বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। ১. অন্য কোনো প্রতিনিধির কিংবা প্রথম প্রতিনিধির অবশিষ্ট সফরের খরচ মৃতের কোনো সম্পদ থেকে ব্যয় করা হবে। ২. দ্বিতীয় সফর কোথা থেকে শুরু হবে।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মৃতব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অবশিষ্ট সফরের খরচ বহন করা হবে। যেমন– হজের অসিয়তকারীর [তার মৃত্যুর পর] নিকট চার লক্ষ টাকা আছে। তন্মধ্যে হজের ব্যয়ভার এক লক্ষ টাকা। তত্ত্বাবধানকারী এই চার লক্ষ টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে কাউকে হজে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর পথিমধ্যে

فَإِنْ كَانَ يَحُجُّ عَنْ مَيِّتٍ فَأُحْصِرَ فَالدَّمُ فِيْ مَالِ الْمَيِّتِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) ثُمَّ قِيْلَ هُوَ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ صِلَةٌ كَالزَّكٰوةِ وَغَيْرِهَا وَقِيْلَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ لِأَنَّهُ وَجَبَ حَقًّا لِلْمَامُوْرِ فَصَارَ دَيْنًا وَ دَمُ الْجِمَاعِ عَلَى الْحَاجِّ لِأَنَّهُ دَمُ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْجَانِيْ عَنْ إِخْتِيَارٍ وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ مَعْنَاهُ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ حَتّٰى فَسَدَ حَجُّهُ لِأَنَّ الصَّحِيْحَ هُوَ الْمَامُوْرُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ لِأَنَّهُ مَا فَاتَهُ بِإِخْتِيَارِهِ أَمَّا إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ وَلَا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ لِحُصُوْلِ مَقْصُوْدِ الْأَمْرِ وَعَلَيْهِ الدَّمُ فِيْ مَالِهِ لِمَا بَيَّنَّا وَكَذٰلِكَ سَائِرُ دِمَاءِ الْكَفَّارَاتِ عَلَى الْحَاجِّ لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : যদি কোনো মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে সে হজ করে থাকে আর বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে মৃতব্যক্তির মাল থেকে দম ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, মৃতব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা যাকাত ও অন্যান্য কিছুর মতো দান। কেউ কেউ বলেন, সমগ্র মাল থেকে দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তা আদেশ দাতার জন্য হকস্বরূপ ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং তা ঋণ হয়ে গেল। স্ত্রী সহবাসজনিত দম হজকারীর উপর ওয়াজিব হবে। কেননা তা অপরাধের দম। আর সে স্বেচ্ছায় অপরাধী হয়েছে। আর সে খরচের ক্ষতিপূরণ দেবে। অর্থাৎ যখন উকূফের পূর্বে সহবাসের কারণে তার হজ নষ্ট হয়ে যায়। কেননা সে শুদ্ধ হজ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। পক্ষান্তরে হজ ফউত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। হজকারীকে তখন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা সে তা স্বেচ্ছায় ফউত করেনি। আর যদি সে [আরাফায়] উকূফ করার পরে সহবাস করে, তাহলে তার হজ নষ্ট হবে না এবং আদেশ দাতার উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার কারণে খরচের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। আদিষ্ট ব্যক্তির মাল থেকে [অপরাধের] দম ওয়াজিব হবে, আমরা যা বর্ণনা করেছি সে কারণে। তদ্রূপ কাফ্ফারার যাবতীয় দমও হজকারীর উপর ওয়াজিব হবে–আমরা যা বর্ণনা করেছি সে কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ يَحُجُّ الخ : যদি কেউ মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করে আর সে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল থেকে إِحْصَارٌ-এর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। কোনো কোনো মাশায়েখে কেরাম বলেন, মৃতব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে এ দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা দান। যেমন– যাকাত ও অন্যান্য কাফ্ফারা দান। আর দান হলো তা-ই, যা অর্থের বিনিময়ে হয় না। সুতরাং যেমন মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে যাকাত দেওয়া হবে- যা তার জীবদ্দশায় অনাদায় ছিল, তদ্রূপ إِحْصَارٌ -এর দমও দান হওয়ার কারণে মৃতব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা আদায় করা হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, মৃতব্যক্তির সমগ্র মাল থেকে দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এ দম আদেশদাতার জন্য হক হিসেবে ওয়াজিব হয়েছে- যেন সে মৃতব্যক্তির ঋণের পর্যায়ে। আর ঋণ যেহেতু মৃতের সমগ্র সম্পদ থেকে আদায় করা হয় সেহেতু إِحْصَارٌ-এর দমও তার পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পদ থেকে আদায় করা হবে।

وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ قِسْمَةَ الْوَصِيِّ وَعَزْلَهُ الْمَالَ لَا يَصِحُّ اِلَّا بِالتَّسْلِيْمِ اِلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ سَمَّاهُ الْمُوْصِىْ لِاَنَّهُ لَا خَصْمَ لَهُ لِيَقْبِضَ وَلَمْ يُوْجَدْ فَصَارَ كَمَا اِذَا هَلَكَ قَبْلَ الْاِفْرَازِ وَالْعَزْلِ فَيُحَجُّ بِثُلُثِ مَا بَقِىَ وَاَمَّا الثَّانِىْ فَوَجْهُ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ الْقِيَاسُ اَنَّ الْقَدْرَ الْمَوْجُوْدَ مِنَ السَّفَرِ قَدْ بَطَلَ فِىْ حَقِّ اَحْكَامِ الدُّنْيَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلٰثٍ اَلْحَدِيْثُ وَتَنْفِيْذُ الْوَصِيَّةِ مِنْ اَحْكَامِ الدُّنْيَا فَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ وَطَنِهِ كَاَنْ لَمْ يُوْجَدِ الْخُرُوْجُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ الْاِسْتِحْسَانُ اَنَّ سَفَرَهُ لَمْ يَبْطُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ اَلْاٰيَةُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِ الْحَجِّ كُتِبَ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ وَاِذَا لَمْ يَبْطُلْ سَفَرُهُ اُعْتُبِرَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ وَاَصْلُ الْاِخْتِلَافِ فِى الَّذِىْ يَحُجُّ بِنَفْسِهِ وَيَبْتَنِىْ عَلٰى ذٰلِكَ الْمَامُوْرُ بِالْحَجِّ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, অসিয়তকারী মাল যেভাবে নির্ধারণ করেছে সেভাবে অর্পণ করা ছাড়া তত্ত্বাবধায়কের মাল বণ্টন করা কিংবা মাল পৃথক করা সহীহ্ হবে না। কেননা মাল কব্জা করার জন্য তার কোনো দাবিদার নেই। আর এখানে [সম্পদ] অর্পণ করা পাওয়া যায়নি। সুতরাং এটি অসিয়তের মাল আলাদা করার পূর্বে মারা যাওয়ার মতো হলো। অতএব অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে হজ করানো হবে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের দলিল হলো– আর কিয়াসের দাবিও তা-ই সফরের যে পরিমাণ অংশ বিদ্যমান তা দুনিয়ার কার্যকর বিধানের দিক থেকে বাতিল হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلٰثٍ الخ 'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তার আমল নিঃশেষ হয়ে যায়।' আর অসিয়তের কার্যকারিতা হলো দুনিয়ার আহকামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অসিয়তকারীর বাসস্থল থেকেই তা বহাল থাকবে, যেন [সফরে] বের হওয়ার অস্তিত্বই ঘটেনি। সাহেবাইনের দলিল হলো– আর তা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবিও বটে– তার সফর বাতিল হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ 'যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পথে বের হয়, অতঃপর সে মারা যায়, তার ছওয়াব আল্লাহ্‌র জিম্মায় থাকবে।' আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– مَنْ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِ الْحَجِّ كُتِبَ لَهٗ حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ 'যে ব্যক্তি হজের পথে মারা যায়, তার জন্য প্রতি বছর একটি কবুল হজ লেখা হবে।' যখন তার সফর বাতিল হলো না, তখন সেই স্থান থেকেই অসিয়ত বিবেচনা করা হবে। মূল পার্থক্য হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নিজেই হজ করতে রওনা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি হবে হজ করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি।

তার খরচের অর্থ চুরি হয়ে গেছে কিংবা সে মারা গেছে, আর কিছু অর্থ খরচ হয়ে গেছে– আর কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে দ্বিতীয় সফরের ব্যয়ভার বহন করা হবে। আর এ ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ হলো এক লক্ষ টাকা। কেননা, তার সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল চার লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে এক লক্ষ টাকা প্রথম সফরের জন্য দেওয়া হয়েছিল যা পথিমধ্যে চুরি হয়ে গেছে। এখন অসিয়তকারীর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই তিন লক্ষের এক-তৃতীয়াংশ এক লক্ষ টাকা দ্বিতীয় সফরের জন্য ব্যয় করা হবে। আর সেটাও যদি চুরি হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্ট সম্পদ দুই লক্ষ টাকার এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে হজের ব্যয়ভার বহন করা হবে, যদি তা দিয়ে সম্ভব হয়। এভাবে চলতে থাকবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে [চুরি হওয়ার পর কিংবা মৃত্যুর পর] অবশিষ্ট যা আছে, তা থেকেই দ্বিতীয় হজ করানো হবে–যদি তা দিয়ে হজ করা সম্ভব হয়। যেমন– অসিয়তকারীর মোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল চার লক্ষ টাকা। এর এক-তৃতীয়াংশ এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশ তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা। হজের ব্যয়ভার ছিল এক লক্ষ টাকা যা দিয়ে তত্ত্বাবধানকারী কোনো এক ব্যক্তিকে হজের সফরে পাঠিয়েছে। কিন্তু পথিমধ্যে এ টাকা চুরি হয়ে গেছে। তাহলে এখন প্রথম তৃতীয়াংশ থেকে যে তেত্রিশ হাজার তিনশ তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে দ্বিতীয় হজ করানো হবে– যদি সম্ভব হয়। আর যদি এ টাকা দিয়ে হজ করানো সম্ভব না হয়, তাহলে অসিয়তকারীর অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, প্রতিনিধিকে যে মাল দেওয়া হয়েছিল, তার কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা দ্বারাই হজ করানো হবে। যেমন– প্রথমে তাকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে [চুরি হওয়ার পর কিংবা সে মারা যাওয়ার পর] পঞ্চাশ হাজার টাকা অবশিষ্ট আছে, তাহলে এ টাকা দিয়ে দ্বিতীয় হজ করানো হবে। আর যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, বরং সবই চুরি হয়ে গেছে, কিংবা যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়ে হজ করানো সম্ভব নয়, তাহলে অসিয়তকারীর অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হজের দ্বিতীয় সফর মৃতব্যক্তির বাড়ি থেকে শুরু হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, যেখানে প্রথম ব্যক্তি মারা গেছে, সেখান থেকে এই দ্বিতীয় সফর শুরু হবে।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো কিয়াস। তিনি তত্ত্বাবধানকারীর নির্ধারণকে অসিয়তকারীর নির্ধারণের উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ অসিয়তকারী [মৃতব্যক্তি] যদি [হজ করার জন্য] নিজেই সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়। যেমন–'আমার সম্পদ থেকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে আমার পক্ষ থেকে হজ করাবে' বলে, অতঃপর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি পথিমধ্যে মারা যায় কিংবা সব অর্থই চুরি হয়ে যায়, তাহলে তার অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এক লক্ষ টাকা থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা দ্বারাই দ্বিতীয় হজ করানো হবে, যদি সম্ভব হয়। আর সম্ভব না হলে তার অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। তদ্রূপ তত্ত্বাবধানকারীও হজ করানোর জন্য মাল নির্ধারণ করতে পারবে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধানকারী যে পরিমাণ মাল স্থলাভিষিক্তের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, আর সে ব্যক্তি থেকে সব অর্থই চুরি হয়ে গেছে কিংবা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তাহলে প্রথম সুরতে [সব অর্থই চুরি হয়ে গেলে কিংবা নষ্ট হলে] অসিয়তকারীর অসিয়ত বাতিল হওয়া অনিবার্য। আর দ্বিতীয় সুরতে [কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকলে] অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে যদি দ্বিতীয় হজ করানো সম্ভব হয় তাহলে দ্বিতীয়বার হজ করাবে, অন্যথায় এ ক্ষেত্রেও অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত কার্যকর করা হয়। সুতরাং তা থেকে চুরি হয়ে যাওয়ার পর কিংবা খরচ হওয়ার পর যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে, আর তা দিয়ে দ্বিতীয়বার হজের খরচ বহন করা সম্ভব হয়, তাহলে তা-ই করবে। কেননা, ঐ তৃতীয়াংশই হলো অসিয়ত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র। সুতরাং এ অংশ থেকেই প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার হজের ব্যয়ভার বহন করা হবে।

قَالَ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ اَبَوَيْهِ يُجْزِيْهِ اَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ اَحَدِهِمَا لِاَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَاِنَّمَا يَجْعَلُ ثَوَابَ حَجِّهِ لَهُ وَ ذٰلِكَ بَعْدَ اَدَاءِ الْحَجِّ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ اَدَائِهِ وَصَحَّ جَعْلُهُ ثَوَابَهُ لِاَحَدِهِمَا بَعْدَ الْاَدَاءِ بِخِلَافِ الْمَاْمُوْرِ عَلٰى مَا فَرَّقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি তার বাবা-মার পক্ষ থেকে হজের ইহরাম বাঁধল, দুজনের যে কোনো একজনের জন্য নির্ধারণ করে নেওয়া তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে অনুমতি ছাড়া হজ করল, তখন সে মূলত হজের ছওয়াব তাকে প্রদান করল। আর তা হজ আদায়ের পর হয়ে থাকে। সুতরাং আদায়ের পূর্বে তার নিয়ত মূল্যহীন হলো। আর হজ আদায়ের পর তার ছওয়াব দুজনের যে কোনো একজনের জন্য নির্ধারণ করা বৈধ। তবে আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। ইতঃপূর্বে উভয়ের পার্থক্য আমরা বর্ণনা করে এসেছি। সঠিক বিষয় আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

بَابُ الْهَدْيِ

اَلْهَدْيُ اَدْنَاهُ شَاةٌ لِمَا رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ اَدْنَاهُ شَاةٌ قَالَ وَهُوَ مِنْ ثَلٰثَةِ اَنْوَاعِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَعَلَ الشَّاةَ اَدْنٰى لَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَعْلٰى وَهُوَ الْبَقَرُ وَالْجَزُوْرُ وَلِاَنَّ الْهَدْىَ مَا يُهْدٰى اِلَى الْحَرَمِ لِيُتَقَرَّبَ بِهٖ فِيْهِ وَالْاَصْنَافُ الثَّلٰثَةُ سَوَاءٌ فِيْ هٰذَا الْمَعْنٰى وَلَا يَجُوْزُ فِى الْهَدَايَا اِلَّا مَا جَازَ فِى الضَّحَايَا لِاَنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِاِرَاقَةِ الدَّمِ كَالْاُضْحِيَّةِ فَيَتَخَصَّصَانِ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا فِيْ مَوْضَعَيْنِ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ فَاِنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِيْهِمَا اِلَّا بَدَنَةٌ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنٰى فِيْمَا سَبَقَ ۔

পরিচ্ছেদ : হাদী সম্পর্কীয় আলোচনা

অনুবাদ : সর্বনিম্ন হাদী হলো বকরি। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, এর সর্বনিম্ন হলো বকরি। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাদী তিন প্রকার– উট, গরু ও বকরি। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বকরিকে সর্বনিম্ন সাব্যস্ত করেছেন, তখন তার উচ্চ পর্যায় থাকা জরুরি। আর তা হলো গরু ও উট। তা ছাড়া এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনার্থে যা হারামের দিকে প্রেরণ করা হয় তা-ই হাদী। আর এ অর্থের দিক দিয়ে এ তিন প্রকার সমান। কুরবানিতে যা জবাই করা জায়েজ, তা-ই হাদীরূপে জায়েজ। কেননা, এটা এমন একটি ইবাদত যার সম্পর্ক রক্ত প্রবাহিত করার সাথে, কুরবানির ন্যায়। সুতরাং একই রকম পাত্রের [পশুর] সঙ্গে উভয়টি সম্পৃক্ত হবে। দুটি ক্ষেত্র ব্যতীত [হজের] সকল ব্যাপারে বকরিই যথেষ্ট। ১. যে ব্যক্তি জানাবাত অবস্থায় তওয়াফ করে। ২. যে [আরাফায়] অবস্থানের পরে স্ত্রীসহবাস করে। কেননা, এ দুটি ক্ষেত্রে বাদানাহ্ [উট বা গরু] ছাড়া জায়েজ হবে না। এর কারণ পিছনে [জিনায়াত অধ্যায়ে] আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ ثَلٰثَةِ اَنْوَاعِ الخ : তিন প্রকার প্রাণী হাদীরূপে গণ্য– উট, গরু ও বকরি। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বকরিকে সর্বনিম্ন হাদী সাব্যস্ত করেছেন। আর সর্বনিম্নের জন্য উচ্চ পর্যায় পরিমাণ থাকা জরুরি। আর এ ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায় হলো– উট ও গরু। দ্বিতীয় দলিল, হাদী হলো ঐ প্রাণী যা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে হারাম শরীফের দিকে প্রেরিত হয়। এ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বর্ণিত তিনটিই সমান। তাই তিনটিকেই হাদী হিসেবে গণ্য করা হবে।

وَيَجُوزُ الْاَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ لِاَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَجُوزُ الْاَكْلُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْاُضْحِيَةِ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَكَلَ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ وَحَسَا مِنَ الْمَرَقَةِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يَاْكُلَ مِنْهَا لِمَا رَوَيْنَا وَكَذَا يُسْتَحَبُّ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عُرِفَ فِي الضَّحَايَا وَلَا يَجُوزُ الْاَكْلُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا لِاَنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا اُحْصِرَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَبَعَثَ الْهَدَايَا عَلَى يَدِي نَاجِيَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ لَهُ لَا تَاْكُلْ اَنْتَ وَرُفْقَتُكَ مِنْهَا شَيْئًا .

অনুবাদ : নফল, তামাত্তু' ও কিরানের হাদী থেকে খাওয়া জায়েজ। কেননা, এটা ইবাদতের দম। সুতরাং কুরবানির ন্যায় তা খাওয়া জায়েজ। আর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাদীর গোশত খেয়েছেন এবং তার ঝোলও পান করেছেন। হাদীর গোশত খাওয়া তার জন্য মোস্তাহাব, যে হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি সে কারণে। তদ্রূপ হাদীর গোশত সদকা করা মোস্তাহাব–যেভাবে কুরবানিতে বলা হয়েছে। অন্যান্য হাদীর গোশত খাওয়া জায়েজ নেই। কেননা, সেগুলো কাফ্ফারার দম। আর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হুদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং নাজিয়া আল-আসলামী (রা.) -এর হাতে হাদী প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি এবং তোমার সাথীরা তা থেকে কিছু খাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يَاْكُلَ الخ : মাসআলা : নফল, তামাত্তু' ও কিরানের হাদী থেকে খাওয়া মোস্তাহাব। যেমন– হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীর গোশত খেয়েছেন এবং তার ঝোলও পান করেছেন। কুরবানিতে যে পদ্ধতি বলা হয়েছে, সেভাবে হাদীর গোশত সদকা করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ সদকা করবে, এক-তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেবে আর এক-তৃতীয়াংশ নিজে খাবে ও জমা রাখতে পারবে। বর্ণিত হাদীগুলো ছাড়া অন্যান্য হাদীর গোশত খাওয়া জায়েজ নেই। সেগুলো হারামের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। কেননা, এগুলো হলো কাফ্ফারার দম। আর সহীহ্ বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হুদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং হযরত নাজিয়া আল-আসলামী (রা.)-এর হাতে হাদী প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি এবং তোমার সাথীরা তা থেকে কিছু খাবে না। তাঁদের খেতে নিষেধ করার কারণ ছিল– যেহেতু তারা সকলেই ধনী ছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, অবরুদ্ধ হওয়ার দম কিংবা অন্যান্য দম যা কাফ্ফারার দম হিসেবে গণ্য, সেগুলো দরিদ্রের হক। সেগুলোর গোশত যেমন নিজে খেতে পারবে না, তদ্রূপ কোনো ধনী ব্যক্তিকেও খাওয়ানো জায়েজ নেই।

وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ وَفِي الْأَصْلِ يَجُوزُ ذَبْحُ دَمِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ ذَبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْضَلُ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي التَّطَوُّعَاتِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا هَدَايَا وَ ذٰلِكَ يَتَحَقَّقُ بِتَبْلِيْغِهَا إِلَى الْحَرَمِ فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ جَازَ ذَبْحُهَا فِيْ غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَفِيْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيْ إِرَاقَةِ الدَّمِ فِيْهَا أَظْهَرُ أَمَّا دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَقَضَاءُ التَّفَثِ يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَلِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْأُضْحِيَةِ وَيَجُوزُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِيْ أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَجُوزُ إِلَّا فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ اعْتِبَارًا بِدَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَهُ وَلَنَا أَنَّ هٰذِهِ دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ لِأَنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ كَانَ التَّعْجِيْلُ بِهَا أَوْلٰى لِارْتِفَاعِ النُّقْصَانِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيْرٍ بِخِلَافِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ ـ

অনুবাদ : নফল, তামাত্তু' ও কিরানের হাদী কুরবানির দিন ছাড়া জবাই করা জায়েজ নেই। গ্রন্থকার বলেন, মাবসূত কিতাবে রয়েছে যে, নফল হাদী কুরবানির দিনের পূর্বে জবাই করা জায়েজ। তবে কুরবানির দিনে জবাই করা উত্তম। এটিই সহীহ্ মত। কেননা, নফলরূপে জবাই করার ক্ষেত্রে ইবাদত হলো এ হিসেবে যে, সেগুলো হাদী। আর তা সাব্যস্ত হয় হারামে পৌছার মাধ্যমে। আর যখন তা পাওয়া গেল, তখন কুরবানির দিন ব্যতীত জবাই করা জায়েজ হবে। তবে কুরবানির দিনগুলোতেই জবাই করা উত্তম। কেননা, ঐ দিনগুলোতে রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে নৈকট্যতার অর্থ অধিক প্রকাশ পায়। তামাত্তু' ও কিরানের দমের ক্ষেত্রে কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ 'অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুস্থ-দরিদ্রদের আহার করাও। অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে।' আর অপরিচ্ছন্নতা দূর করার বিষয়টি কুরবানির দিনের সাথে সম্পৃক্ত। তা ছাড়া এটা হলো ইবাদতের দম। সুতরাং তা কুরবানির ন্যায় দশ তারিখের সাথে নির্দিষ্ট হবে। অন্যান্য হাদী যে কোনো সময় ইচ্ছা জবাই করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) তামাত্তু' ও কিরানের দমের উপর কিয়াস করে বলেন, কুরবানির দিন ছাড়া জবাই করা জায়েজ নেই। কেননা, তাঁর মতে প্রতিটিই হলো ক্ষতিপূরণের দম। আমাদের দলিল হলো, এগুলো কাফ্ফারার দম। সুতরাং কুরবানির দিনের সাথে তা নির্দিষ্ট থাকবে না। কেননা যখন তা ক্ষতিপূরণের জন্য ওয়াজিব হয়েছে, তখন বিলম্ব ছাড়া তা দ্বারা ত্রুটি দূর করার জন্য তাড়াতাড়ি করাই উত্তম হবে। কিন্তু তামাত্তু' ও কিরানের দম ভিন্ন। কেননা, এগুলো হলো ইবাদতের দম।

قَالَ وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا اِلَّا فِى الْحَرَمِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فِىْ جَزَاءِ الصَّيْدِ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فَصَارَ اَصْلًا فِىْ كُلِّ دَمٍ هُوَ كَفَّارَةٌ وَلِاَنَّ الْهَدْىَ اِسْمٌ لِمَا يُهْدٰى اِلٰى مَكَانٍ وَمَكَانُهُ الْحَرَمُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنٰى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَيَجُوزُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلٰى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) لِاَنَّ الصَّدَقَةَ قُرْبَةٌ مَعْقُوْلَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلٰى كُلِّ فَقِيْرٍ قُرْبَةٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হারাম ছাড়া অন্যত্র হাদী জবাই করা জায়েজ হবে না। কেননা, শিকারের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'এমন হাদী যা কা'বায় উপনীত হবে।' সুতরাং কাফ্ফারা জাতীয় প্রতিটি দমের ক্ষেত্রে তা মূলনীতি হয়ে গেল। তা ছাড়া এ কারণে যে, হাদী বলা হয় এমন পশুকে যাকে কোনো স্থানে [হাদিয়াস্বরূপ] পাঠানো হয়। আর তার স্থান হলো হারাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– مِنٰى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَكَّةَ مَنْحَرٌ 'সমগ্র মিনা হলো জবাই স্থল আর মক্কার সমগ্র পথ হলো জবাই স্থল।' আর হাদীর গোশত হারাম এবং অন্যান্য স্থানের মিসকিনদের মাঝে সদকা করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। [আমাদের দলিল] কেননা, সদকা একটি বোধগম্য ইবাদত। অতএব যে কোনো দরিদ্রকে সদকা করাই হলো ইবাদত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : নফল ও অন্যান্য হাদী কেবল হারামেই জবাই করা জায়েজ। হারাম ছাড়া 'হিল' এলাকায় হাদী জবাই করা জায়েজ নেই। দলিল হলো, শিকারের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ "এমন হাদী যা কা'বায় উপনীত হবে।" এ আয়াতে কা'বা দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য। সুতরাং এ নির্দেশ কাফ্ফারা জাতীয় প্রতিটি দমের ক্ষেত্রে মূলনীতি বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ কাফ্ফারা স্বরূপ যে দম ওয়াজিব হয়, তা হারামে পৌঁছানো জরুরি।

اِحْصَارٌ-এর দম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ আবার সাধারণ হাদী সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ –এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদী জবাইয়ের স্থল হলো হারাম।

যুক্তির নিরিখে বলা যায়, অভিধানে হাদী বলা হয় যা কোনো স্থানে হাদিয়াস্বরূপ পাঠানো হয়। আর সে স্থানটি হলো হারাম। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'সমগ্র মিনা হলো জবাইয়ের স্থল এবং মক্কার সমগ্র পথ হলো জবাইয়ের স্থল।' এ স্থান দুটিই হারামের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, হাদী জবাই করার স্থান হলো হারাম।

আমাদের মতে, হাদীর গোশত হারাম এবং অন্যান্য স্থানের অসহায়-দরিদ্রদের মাঝে সদকা করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু হারামের মিসকিনদের মাঝেই সদকা করা জায়েজ। তিনি সদকাকে জবাই-এর উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ হাদী জবাই করা যেরূপ হারামের সাথে নির্দিষ্ট, তদ্রূপ এর গোশত সদকা করাও হারামের মিসকিনদের সাথে নির্দিষ্ট।

আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এ কিয়াসটি যথার্থ নয়। কেননা, হাদী জবাই করা একটি বোধগম্যহীন ইবাদত; কিন্তু সদকা একটি বোধগম্য সম্পন্ন ইবাদত। আর যে কোনো দরিদ্রকেই সদকা করা হলো ইবাদত, চাই সে হারামের হোক কিংবা অন্য কোনো অঞ্চলের হোক। সুতরাং বোধগম্য একটি বিষয়কে বোধগম্যহীন বিষয়ের উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়।

قَالَ وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيْفُ بِالْهَدَايَا لِاَنَّ الْهَدْىَ يُنْبِئُ عَنِ النَّقْلِ اِلٰى مَكَانٍ لِيُتَقَرَّبَ بِاِرَاقَةِ دَمٍ فِيْهِ لَا عَنِ التَّعْرِيْفِ فَلَا يَجِبُ فَاِنْ عَرَّفَ بِهَدْيِ الْمُتْعَةِ فَحَسَنٌ لِاَنَّهُ يَتَوَقَّفُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَعَسٰى لَا يَجِدُ مَنْ يُمْسِكُهُ فَيَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُعَرِّفَ بِهٖ وَلِاَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَكُوْنُ مَبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَّارَاتِ لِاَنَّهُ يَجُوْزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَسَبَبُهُ الْجِنَايَةُ فَيَلِيْقُ بِهِ السَّتْرُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাদীসমূহকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া বা চিহ্নিত করা জরুরি নয়। কেননা, হাদী শব্দটি বিশেষ স্থানে গিয়ে, সেখানে জবাই করার মাধ্যমে নৈকট্য অর্জনের অর্থ নির্দেশ করে। আরাফায় নিয়ে যাওয়া কিংবা চিহ্নিত করার অর্থ জ্ঞাপন করে না। সুতরাং তা ওয়াজিব হবে না। যদি তামাত্তু'র হাদী আরাফায় নিয়ে যায়, তবে তা উত্তম। কেননা, তা কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট। আর হয়তো সে তা রাখার জন্য কাউকে নাও পেতে পারে, তখন সঙ্গে করে আরাফায় নিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তা ছাড়া এটা হলো ইবাদতের দম। সুতরাং এর ভিত্তি হবে ঘোষণার উপর। পক্ষান্তরে কাফ্ফারার দমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা কুরবানির দিনের পূর্বে জবাই করা জায়েজ। যেমন– ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর তার কারণ হলো অপরাধ। সুতরাং তা গোপন রাখাই সমীচীন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَعْرِيْف -এর দুটি অর্থ। ১. আরাফায় নিয়ে যাওয়া। ২. ঘোষণার্থে পশুর গলায় হার ঝুলিয়ে দিয়ে চিহ্নিত করা। উক্ত দুই অর্থে হাদীকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া কিংবা চিহ্নিত করা জরুরি নয়। কেননা, হাদী বলা হয়– পশুকে হারামে নিয়ে সেখানে জবাই করার মাধ্যমে ছওয়াব অর্জন করা। আরাফায় নিয়ে যাওয়া কিংবা চিহ্নিত করার নাম হাদী নয়। এজন্য তা ওয়াজিব নয়।

মোদ্দাকথা হলো, تَعْرِيْف সাব্যস্ত হয় দুভাবে। ১. স্পষ্ট কোনো নস দ্বারা। ২. হাদী শব্দটি থেকে এ অর্থ উদ্ধার করার মাধ্যমে। এখানে কোনোটিই পাওয়া যায় না বিধায় تَعْرِيْف ওয়াজিব নয়।

তবে তামাত্তু' কিংবা কিরানের হাদীকে কেউ تَعْرِيْف করলে তা উত্তম বলে গণ্য হবে। কেননা, تَعْرِيْف যদি আরাফায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তা উত্তম হওয়ার কারণ হলো, হাদী জবাই করা কুরবানির দিনের সাথে নির্দিষ্ট। সুতরাং সে এমন কাউকে নাও পেতে পারে যে হাদীটিকে কুরবানির দিন পর্যন্ত তার নিকটে রাখবে ও দেখাশুনা করবে। অতএব সঙ্গে করে আরাফায় নিয়ে যাওয়াই হলো উত্তম।

আর যদি تَعْرِيْف -এর অর্থ হয় ঘোষণা দেওয়া, তাহলে তা উত্তম হওয়ার কারণ হলো, তামাত্তু'র হাদী ইবাদতের দমরূপে গণ্য। সুতরাং এর ভিত্তি হবে ঘোষণার উপর, যাতে লোকজন ঘোষণার দ্বারা ইবাদত করতে সমর্থ হয়।

পক্ষান্তরে কাফ্ফারার দমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে বর্ণিত দুটি কারণের কোনোটিই পাওয়া যায় না। কেননা, কাফ্ফারার দম কুরবানির পূর্বে জবাই করা জায়েজ। সুতরাং হাদী রক্ষণাবেক্ষণের কাউকে না পেলে, তা জবাই করে দেবে– আরাফায় নেওয়া জরুরি নয়। আর যেহেতু কাফ্ফারার দম ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো অপরাধ, তাই তা গোপন রাখাই সমীচীন হবে। সুতরাং কাফ্ফারার দমের ক্ষেত্রে কোনো অর্থেই تَعْرِيْف উত্তম নয়।

قَالَ وَالْاَفْضَلُ فِى الْبُدْنِ النَّحْرُ وَفِى الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذَّبْحُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قِيْلَ فِىْ تَاوِيْلِهِ الْجَزُوْرُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ وَالذِّبْحُ مَا اُعِدَّ لِلذَّبْحِ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْاِبِلَ وَ ذَبَحَ الْبَقَرَةَ وَالْغَنَمَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ نَحَرَ الْاِبِلَ فِى الْهَدَايَا قِيَامًا اَوْ اَضْجَعَهَا وَاَىَّ ذٰلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنٌ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَنْحَرَهَا قِيَامًا لِمَا رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْهَدَايَا قِيَامًا وَاَصْحَابُهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَهَا قِيَامًا مَعْقُوْلَةَ الْيَدِ الْيُسْرٰى وَلَا يُذْبَحُ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قِيَامًا لِاَنَّ فِىْ حَالَةِ الْاِضْطِجَاعِ الْمَذْبَحَ اَبْيَنُ فَيَكُوْنُ الذَّبْحُ اَيْسَرُ وَالذَّبْحُ هُوَ السُّنَّةُ فِيْهِمَا وَالْاَوْلٰى اَنْ يَتَوَلّٰى ذَبْحَهَا بِنَفْسِهٖ اِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذٰلِكَ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَنَحَرَ نَيِّفًا وَّسِتِّيْنَ بِنَفْسِهٖ وَ وَلَّى الْبَاقِىَ عَلِيًّا (رضـ) وَلِاَنَّهُ قُرْبَةٌ وَالتَّوَلِّىْ فِى الْقُرُبَاتِ اَوْلٰى لِمَا فِيْهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُشُوْعِ اِلَّا اَنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ لَا يَهْتَدِىْ لِذٰلِكَ وَلَا يُحْسِنُهُ فَجَوَّزْنَاهُ تَوْلِيَةَ غَيْرِهٖ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উটের ক্ষেত্রে নহর এবং গরু ও বকরির ক্ষেত্রে জবাই উত্তম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করো এবং নহর করো।' [এখানে] নহর-এর ব্যাখ্যায় উট বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন– اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً 'তোমরা গরু জবাই করবে।' আর [বকরি সম্পর্কে] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ 'আর আমি তার পরিবর্তে ফিদ্ইয়ারূপে এক মহান 'যিব্হ' দান করেছি। 'যিব্হ' বলা হয় ঐ পশুকে যা জবাইয়ের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটকে নহর করেছেন এবং গরু ও বকরিকে জবাই করেছেন। হাদীসমূহের ক্ষেত্রে সে যদি ইচ্ছা করে তবে উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করতে পারে কিংবা তাকে বসিয়ে নহর করতে পারে। সে যা করবে, তা-ই ভালো। তবে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করা উত্তম। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে হাদীসমূহ নহর করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামও সামনের বাম পা বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করেছেন। গরু ও বকরি দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে জবাই করবে না। কেননা, পার্শ্বে শোয়ানো অবস্থায় জবাইয়ের স্থানটি অধিক স্পষ্ট থাকে, ফলে জবাই করা সহজ হয়। আর এ দুটির ক্ষেত্রে জবাই হলো সুন্নত। নিজেই জবাই করা উত্তম, যদি ভালোভাবে জবাই করতে পারে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজের সময় একশ উট হাঁকিয়ে নিয়েছিলেন এবং ষাটের কিছু উপরে নিজে নহর করেছেন আর অবশিষ্টগুলোর ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-কে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তা ছাড়া এটা হলো ইবাদত। আর ইবাদত নিজে করা উত্তম। কেননা, এতে অধিক বিনয় রয়েছে। তবে কখনো ব্যক্তি তা ভালোভাবে করতে পারে না। তাই আমরা অন্যকে দায়িত্ব প্রদানে অনুমোদন করেছি।

قَالَ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا يُعْطِي أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلِيٍّ (رض) تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَبِخُطُمِهَا وَلَا تُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً فَاضْطُرَّ إِلَى رُكُوبِهَا رَكِبَهَا وَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْ ذٰلِكَ لَمْ يَرْكَبْهَا لِأَنَّهُ جَعَلَهَا خَالِصًا لِلّٰهِ تَعَالَى فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهَا أَوْ مَنَافِعِهَا إِلَى نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى رُكُوبِهَا لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ عَاجِزًا مُحْتَاجًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উটের গায়ের চট ও রশি সদকা করে দেবে আর এগুলো দ্বারা কসাইয়ের মজুরি প্রদান করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে বলেছেন– تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَبِخُطُمِهَا وَلَا تُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا 'তার গায়ের চট এবং রশি সদকা করে দাও। আর এগুলো দ্বারা কসাইয়ের মজুরি দিও না।' যদি কেউ উট নিয়ে যাওয়ার সময় তাতে আরোহণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে সে আরোহণ করতে পারে। যদি আরোহণ না করার উপায় থাকে, তাহলে আরোহণ করবে না। কেননা, সে এটাকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেছে। সুতরাং জবাইয়ের স্থলে পৌঁছা পর্যন্ত তার সত্তা বা উপকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু তার নিজের জন্য ব্যবহার করবে না। তবে সওয়ার হতে বাধ্য হলে [ভিন্ন কথা]। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেছিলেন, তোমার সর্বনাশ ! এতে আরোহণ করো। এর ব্যাখ্যা হলো লোকটি অক্ষম ছিল, [উটে আরোহণের] প্রয়োজন ছিল [তার]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً الخ – মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি উট নিয়ে যাওয়ার সময় ক্লান্ত হওয়ার কারণে তাতে আরোহণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে তার জন্য আরোহণ করা জায়েজ। আর যদি আরোহণ না করে চলতে সক্ষম হয় তথা পায়ে হেঁটে যেতে পারে, তাহলে সে আরোহণ করবে না। কেননা, বাদানাহ্ একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার হক। এজন্য তার সত্তা বা উপকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু নিজের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন নয়– যতক্ষণ না জবাইয়ের স্থানে পৌঁছে যায়। তবে সে যদি আরোহণে বাধ্য হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে শরিয়ত তাকে আরোহণ করার অনুমতি দিয়েছে। কেননা, হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে উট নিয়ে যেতে দেখে বলেছিলেন– সর্বনাশ, এতে আরোহণ করো। এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, সে ব্যক্তি পায়ে হাঁটতে অক্ষম ছিল এবং সওয়ারিতে আরোহণ করতে বাধ্য ছিল বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আরোহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

وَلَوْ رَكِبَهَا فَانْتَقَصَ بِرُكُوْبِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلِبْهَا لِأَنَّ اللَّبَنَ مُتَوَلِّدٌ مِنْهَا فَلَا يَصْرِفُهُ إِلٰى حَاجَةِ نَفْسِهِ وَيَنْضَحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ وَلٰكِنْ هٰذَا إِذَا كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقْتِ الذَّبْحِ فَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا مِنْهُ يَحْلِبُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِلَبَنِهَا كَيْلَا يَضُرَّ ذٰلِكَ بِهَا وَإِنْ صَرَفَهُ إِلٰى حَاجَةِ نَفْسِهِ تَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِقِيْمَتِهِ لِأَنَّهُ مَضْمُوْنٌ عَلَيْهِ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ تَعَلَّقَتْ بِهٰذَا الْمَحَلِّ وَقَدْ فَاتَ وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيْمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بَاقٍ فِيْ ذِمَّتِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَثِيْرٌ يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ لِأَنَّ الْمَعِيْبَ بِمِثْلِهِ لَا يَتَأَدّٰى بِهِ الْوَاجِبُ فَلَابُدَّ مِنْ غَيْرِهِ وَصَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِرِ أَمْلَاكِهِ.

অনুবাদ : যদি সে তাতে আরোহণ করে আর সে কারণে ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে যতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তার জরিমানা ওয়াজিব হবে। আর তার দুধ থাকলে তা দোহন করবে না। কেননা, দুধ তার থেকেই সৃষ্ট। সুতরাং তা নিজের কাজে লাগাবে না; বরং তার ওলানে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে, যাতে দুধ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ হুকুম জবাইয়ের সময় নিকটবর্তী হলে। আর যদি জবাইয়ের সময় বিলম্বিত হয়, তাহলে দুধ দোহন করবে এবং তা সদকা করে দেবে, যাতে এর ফলে তার ক্ষতি না হয়। আর যদি সে তার নিজের প্রয়োজনে খরচ করে, তাহলে সে পরিমাণ দুধ কিংবা মূল্য সদকা করে দেবে। কেননা, তার জিম্মায় ক্ষতিপূরণ রয়ে গেছে। হাদী নিয়ে যাওয়ার সময় যদি তা [পথিমধ্যে] মারা যায়, আর তা নফল হাদী হয়, তাহলে তার উপর অন্য হাদী ওয়াজিব হবে না। কেননা, ইবাদত সম্পৃক্ত হয়েছিল এই প্রাণীবিশেষের সাথে, আর তা ফউত হয়ে গেছে। আর যদি তা ওয়াজিব হিসেবে হয়ে থাকে, তাহলে তদস্থলে অন্য একটি আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা, এখনো তার জিম্মায় ওয়াজিব রয়ে গেছে। আর যদি তাতে বড় ধরনের কোনো দোষ দেখা দেয়, তাহলে তদস্থলে আরেকটি আদায় করতে হবে। কেননা, বড় ধরনের দোষযুক্ত হলে তা দ্বারা ওয়াজিব আদায় হয় না। সুতরাং অন্য একটি দ্বারা আদায় করা জরুরি। আর দোষযুক্ত পশুকে যা ইচ্ছা তা-ই করবে। কেননা, এটা তার অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ رَكِبَهَا فَانْتَقَصَ الخ – মাসআলা : মুহরিম যদি হাদীর উপর আরোহণ করে আর সে কারণে হাদীর আর্থিক মূল্যে ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ অনুপাতে সে সদকা করে দেবে। হাদী যদি মাদি হয়, আর দুধ দেয়, তাহলে মুহরিম

দুধ দোহন করবে না। কেননা, দুধও তার থেকেই জন্মায়। তাই তা নিজের কাজে ব্যবহার করবে না; বরং তার ওলানে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে, যাতে দুধ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন জবাইয়ের সময় নিকটবর্তী হবে। পক্ষান্তরে যদি জবাইয়ের সময় বিলম্বিত হয়, তাহলে দুধ দোহন করে সদকা করে দেবে যাতে ওলানের দুধ হাদীর কোনো ক্ষতিসাধন না করে।

আর যদি সে দুধ নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেলে, তাহলে অনুরূপ পরিমাণ দুধ বা তার মূল্য সদকা করে দেবে। কেননা, দুধের مِثْل [সমতুল্য] পাওয়া যায়। আর তার মূল্যও مِثْل مَعْنَوِىْ [অর্থগত সমতুল্য]। এর দলিল হলো, তার উপর দুধের জরিমানা দেওয়া ওয়াজিব। আর যে বস্তুর জরিমানা ওয়াজিব হয়, তার বিধান এরূপই যে, তার সমতুল্য পাওয়া গেলে তা দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, আর সমতুল্য সহজসাধ্য না হলে তার মূল্য দিয়ে দেবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ الخ - মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি হাদী নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে বিনষ্ট হয়ে যায়, আর তা নফল হাদী হয়, তাহলে তার উপর অন্য একটি হাদী ওয়াজিব হবে না। কেননা, ইবাদত ও নৈকট্য এই হাদীর সাথেই সম্পৃক্ত হয়েছিল, আর তা ফউত হয়ে গেছে। আর যদি তা ওয়াজিব হাদী হয়, তাহলে তদস্থলে অন্য একটি হাদী আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা, ওয়াজিব তার জিম্মায় রয়ে গেছে, শুধু ক্রয় করার দ্বারা সে দায়িত্বমুক্ত হবে না– যতক্ষণ না হাদী জবাই স্থলে পৌঁছবে। আর যদি হাদীতে বড় ধরনের কোনো ত্রুটি যুক্ত হয়, তাহলে তদস্থলে আরেকটি আদায় করতে হবে। কেননা, বড় ধরনের ত্রুটি যুক্ত হলে, তা দ্বারা ওয়াজিব আদায় হয় না। এ কারণে আরেকটি হাদী দ্বারা আদায় করা জরুরি। আর কোনো হাদী দোষযুক্ত হয়ে গেলে, তা যা ইচ্ছা তা-ই করবে। কেননা, এটা তার মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে।

وَاِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ فِى الطَّرِيْقِ فَاِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَةَ سَنَامِهَا وَلَا يَاْكُلُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ بِذٰلِكَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَاجِيَةَ الْاَسْلَمِيَّ (رض) وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ قَلَادَتُهَا وَفَائِدَةُ ذٰلِكَ اَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ اَنَّهُ هَدْىٌ فَيَاْكُلُ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُوْنَ الْاَغْنِيَاءِ وَهٰذَا لِاَنَّ الْاِذْنَ بِتَنَاوُلِهِ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ بُلُوْغِهِ مَحَلَّهُ فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَا يَحِلَّ قَبْلَ ذٰلِكَ اَصْلًا اِلَّا اَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ اَفْضَلُ مِنْ اَنْ يَتْرُكَهُ جَزَرًا لِلسِّبَاعِ وَفِيْهِ نَوْعُ تَقَرُّبٍ وَالتَّقَرُّبُ هُوَ الْمَقْصُوْدُ فَاِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً اَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ صَالِحًا لِمَا عَيَّنَهُ وَهُوَ مِلْكُهُ كَسَائِرِ اَمْلَاكِهِ .

অনুবাদ : পথে যদি উট মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, তবে নফল হলে নহর করবে আর তার [কালাদার] জুতা তার রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করে দেবে আর তা দ্বারা তার কুঁজের পাশে ছাপ মেরে দেবে। সে কিংবা কোনো ধনী ব্যক্তি তার গোশত খাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজিয়া আল-আসলামী (রা.)-কে এরূপ করতে আদেশ করেছিলেন। বর্ণিত نَعْل [জুতা] দ্বারা গলায় ঝুলানো কালাদা উদ্দেশ্য। এর উপকারিতা হলো, মানুষ জানতে পারবে যে, এটা হাদী। তখন দরিদ্ররা তার গোশত খাবে; ধনীরা নয়। এর কারণ এই যে, এটা খাওয়ার অনুমতি জবাই করার স্থানে পৌঁছার শর্তের সাথে যুক্ত। সুতরাং এর পূর্বে হালাল না হওয়াই উচিত। তবে হিংস্র প্রাণীদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে দরিদ্রদের মাঝে সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর তাতে এক ধরনের ইবাদত রয়েছে আর ইবাদতই হলো উদ্দেশ্য। আর যদি উক্ত উট ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে তদস্থলে অন্য উট আদায় করবে। আর মুমূর্ষুটিকে যা ইচ্ছা তা করতে পারবে। কেননা, যে কাজের জন্য সেটাকে নির্ধারণ করেছিল, সেটা সে কাজের উপযুক্ত থাকেনি। অন্যান্য সম্পদের মতো এতে তার মালিকানা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : পথিমধ্যে হাদীর উট মুমূর্ষু হয়ে গেলে, তা হয়তো নফল হাদী হবে কিংবা ওয়াজিব হাদী হবে। যদি নফল হাদী হয়, তাহলে নহর করবে এবং তার রক্ত দিয়ে কালাদার জুতা ও কুঁজের পার্শ্বে ছাপ মেরে দেবে। কোনো মালদার ব্যক্তি তা থেকে খাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজিয়া আল-আসলামী (রা.) -কে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

نَعْل দ্বারা হাদীর গলায় ঝুলানো কালাদা উদ্দেশ্য। জুতা ও কুঁজকে রক্তে রঞ্জিত করার উপকারিতা হলো, এর ফলে মানুষ জানতে পারবে যে, এটা হাদী। তখন দরিদ্র লোকেরা তা থেকে খাবে, ধনীরা খাবে না। এর কারণ হলো, হাদীর গোশত খাওয়ার অনুমতি শর্তের সাথে যুক্ত। আর তা হচ্ছে হাদী জবাইয়ের স্থান তথা হারামে পৌঁছতে হবে। সুতরাং ধনী-দরিদ্র কারো জন্য তা হালাল না হওয়াই উচিত। কিন্তু হিংস্র প্রাণীদের জন্য ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে দরিদ্রদের মাঝে সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর দরিদ্রকে সদকা করার মাঝে এক ধরনের ইবাদত রয়েছে এবং ইবাদতই হলো মূল উদ্দেশ্য।

আর যদি উক্ত উট ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে তদস্থলে অন্য উট আদায় করবে। আর নহরকৃত উটটিকে যা ইচ্ছা করতে পারবে। কেননা, যে কাজের জন্য সেটাকে নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেটা সে কাজের উপযুক্ত থাকেনি। আর এতে তার মালিকানা রয়েছে অন্যান্য সম্পদের মতো। আর তার মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পদ খরচের ব্যাপারে যেমন সে পূর্ণ স্বাধীন– তদ্রূপ এক্ষেত্রেও সে স্বেচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা তা করতে পারবে।

وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَفِي التَّقْلِيدِ إِظْهَارُهُ وَتَشْهِيرُهُ فَيَلِيقُ بِهِ وَلَا يُقَلِّدُ دَمُ الْإِحْصَارِ وَلَا دَمُ الْجِنَايَاتِ لِأَنَّ سَبَبَهَا الْجِنَايَةُ وَالسَّتْرُ أَلْيَقُ بِهَا وَدَمُ الْإِحْصَارِ جَابِرٌ فَيَلْحَقُ بِجِنْسِهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهَدْيَ وَمُرَادُهُ الْبَدَنَةُ لِأَنَّهُ لَا يُقَلَّدُ الشَّاةُ عَادَةً وَلَا يُسَنُّ تَقْلِيدُهُ عِنْدَنَا لِعَدَمِ فَائِدَةِ التَّقْلِيدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : আর নফল, তামাত্তু' ও কিরানের হাদীকে কালাদা পরাবে। কেননা, এটা ইবাদতের দম। আর কালাদা ঝুলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচার ও ঘোষণা হয়, যা ইবাদতের দমের জন্য উপযোগী। إِحْصَار [অবরোধ] ও অপরাধ -ত্রুটিসমূহের দম-এর হাদীকে কালাদা পরাবে না। কেননা, অপরাধ হলো এর কারণ। আর অপরাধকে গোপন রাখাই যুক্তিযুক্ত। আর অবরোধের দম হলো ক্ষতিপূরণের জন্য। সুতরাং এটা ক্ষতিপূরণ জাতীয় কিছুর [অপরাধ] সাথে যুক্ত করা হবে। ইমাম কুদূরী (র.) 'হাদী' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। মূলত তার উদ্দেশ্য হলো বাদানাহ। কেননা, বকরিকে সাধারণত কালাদা পরানো হয় না। বকরির ক্ষেত্রে কালাদা পরানোর মধ্যে কোনো ফায়দা নেই বলে বকরিকে কালাদা পরানো সুন্নত নয়। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

أَهْلُ عَرَفَةَ إِذَا وَقَفُوا فِي يَوْمٍ وَشَهِدَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ النَّحْرِ أَجْزَاهُمْ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُجْزِيَهُمْ إِعْتِبَارًا بِمَا إِذَا وَقَفُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهٰذَا لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ فَلَا يَقَعُ عِبَادَةً دُوْنَهُمَا وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ هٰذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ وَعَلٰى أَمْرٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهَا نَفْيُ حَجِّهِمْ وَالْحَجُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ فَلَا تُقْبَلُ وَلِأَنَّ فِيْهِ بَلْوٰى عَامًّا لِتَعَذُّرِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ وَالتَّدَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَفِي الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ حَرَجٌ بَيِّنٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ عِنْدَ الْإِشْتِبَاهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ لِأَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَزُوْلَ الْإِشْتِبَاهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَلِأَنَّ جَوَازَ الْمُؤَخَّرِ لَهُ نَظِيْرٌ وَلَا كَذٰلِكَ جَوَازُ الْمُقَدَّمِ قَالُوْا وَيَنْبَغِيْ لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَسْمَعَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ وَيَقُوْلُ قَدْ تَمَّ حَجُّ النَّاسِ فَانْصَرِفُوْا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا إِلَّا إِيْقَاعُ الْفِتْنَةِ وَكَذَا إِذَا شَهِدُوْا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوْفُ فِيْ بَقِيَّةِ اللَّيْلِ مَعَ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ لَمْ يَعْمَلْ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ ـ

বিবিধ মাসআলা

অনুবাদ : আরাফার লোকেরা একদিন উকূফ করল। আর একদল লোক সাক্ষ্য দিল যে, তারা কুরবানির দিন উকূফ করেছে, তাহলে তাদের এ উকূফ যথেষ্ট হবে। কিয়াস অনুসারে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না– আট তারিখের উকূফের উপর বিবেচনা করে। কেননা, এটা এমন ইবাদত যা নির্ধারিত সময় ও স্থানের সাথে নির্দিষ্ট। সুতরাং এ দুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া তা ইবাদত হিসেবে সংঘটিত হবে না। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, এ সাক্ষ্য নেতিবাচক বিষয়ের উপর হয়েছে এবং এমন একটি বিষয়ের উপর হয়েছে, যা বিচারের আওতাভুক্ত নয়। কেননা, সাক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো তাদের হজ নাকচ করা। আর হজ বিচারের আওতাভুক্ত কোনো বিষয় নয়। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। তা ছাড়া এ কারণে যে, এটা একটি ব্যাপক সমস্যা যা পরিহার করা সহজসাধ্য নয় এবং ক্ষতিপূরণ করাও সম্ভব নয়। আর পুনরায় হজ আদায় করার আদেশ দানে স্পষ্ট জটিলতা রয়েছে। সুতরাং সন্দেহজনক অবস্থায় সেটাকে যথেষ্ট বলে সাব্যস্ত করা জরুরি। পক্ষান্তরে আট তারিখে উকূফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আরাফার দিন উকূফ করে সন্দেহ নিরসনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। তা ছাড়া বিলম্বিত আমল জায়েজ হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু অগ্রবর্তী আমল জায়েজ হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। আর মাশায়েখে কেরাম বলেন, শাসকের কর্তব্য এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করা এবং ঘোষণা দিয়ে দেওয়া যে, লোকদের হজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা সবাই ফিরে যাও। কেননা, সাক্ষ্য গ্রহণ করায় কেবল ফিতনা সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে যদি তারা আরাফা দিবসের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় আর ইমামের পক্ষে অবশিষ্ট রাত্রে লোকদের নিয়ে কিংবা তাদের অধিকাংশকে দিয়ে আরাফায় উকূফ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লেখকরা সাধারণত কিতাবের শেষে পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিবরণ ও অপ্রচলিত মাসআলা উল্লেখ করেন এবং সেগুলোকে আলাদা একটি পরিচ্ছেদে একত্র করে مَسَائِلُ مَنْثُوْرَةٌ কিংবা مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ কিংবা مَسَائِلُ شَتّٰى শিরোনাম দিয়ে থাকেন। সে আলোকে হিদায়া গ্রন্থকার-ও مَسَائِلُ مَنْثُوْرَةٌ শিরোনাম ধার্য করেছেন।

সূরতে মাসআলা হলো, আরাফার লোকেরা একদিন উকূফ করল আর একদল লোক সাক্ষ্য দিল যে, তারা আসলে দশই জিলহজ উকূফ করেছে। মর্মার্থ হলো, নয়ই জিলহজ আরাফায় উকূফ করা ফরজ, আর দশই জিলহজ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত এ সময় অব্যাহত থাকে। দশই জিলহজ ফজর উদিত হলেই উকূফের সময় শেষ হয়ে যায়। এজন্য ঐ সব লোকদের আরাফায় অবস্থান হয়নি, বিধায় হজও হয়নি। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের উকূফ হয়ে গেছে ও হজও সম্পন্ন হয়েছে।

কিয়াসের দাবি হলো, তাদের জন্য এই উকূফ যথেষ্ট হবে না। কেননা, যদি লোকজন সময়ের পূর্বে ৮ ই জিলহজে উকূফ করত আর একদল লোক সাক্ষ্য প্রদান করত যে, তারা সময়ের পূর্বে আরাফায় অবস্থান করেছে, তাহলে তাদের এই উকূফ গ্রহণযোগ্য হতো না; বরং যথাসময়ে পুনরায় উকূফ করতে হতো। তদ্রূপ সময়ের পরেও উকূফ করা জায়েজ নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বর্ণিত অবস্থায় উকূফ জায়েজ হবে না। কেননা, উকূফ হলো এমন একটি ইবাদত যা নির্ধারিত সময় [৯ ই জিলহজ সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে ১০ ই জিলহজ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত] এবং স্থান [আরাফার মাঠ] -এর সঙ্গে নির্দিষ্ট। এজন্য এ দুটি অবস্থায় ব্যতীত উকূফ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। সুতরাং সাক্ষ্যদাতারা যখন সাক্ষ্য প্রদান করল যে, তারা ১০ ই জিলহজ উকূফ করেছে– তখন উকূফের নির্ধারিত সময় না পাওয়ার কারণে তার উকূফ গ্রহণযোগ্য হবে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হচ্ছে– এ সাক্ষ্য নেতিবাচক বিষয়ের উপর হয়েছে। কেননা, কুরবানির দিবসে আরাফায় অবস্থানের সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো তাদের হজ হয়নি। আর এ সাক্ষ্যটি এমন একটি বিষয়ের উপর হয়েছে, যা বিচারের আওতাভুক্ত নয়। কেননা, হজ বিচারকের বিচারের আওতাভুক্ত কোনো বিষয় নয়। আর যে সাক্ষ্য নেতিবাচক বিষয়ের উপর হয় এবং যা বিচারের আওতাভুক্ত নয়– সেই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর সাক্ষ্যই যখন গ্রহণযোগ্য নয়, তখন কুরবানির দিনে উকূফ করা তাদের জন্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর আরাফার উকূফ গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে তাদের হজও সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, এ একটি ব্যাপক সমস্যা। কেননা, চাঁদ দেখা একটি বিতর্কিত বিষয়। এজন্য এ সমস্যাটি পরিহার করা সম্ভব নয়। আর আরাফায় অবস্থানের পরে যেহেতু সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে সেহেতু তার ক্ষতিপূরণও সম্ভব নয়। আর পরবর্তীতে পুনরায় হজ করার আদেশ দানে স্পষ্ট জটিলতা রয়েছে, যা বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় না। আর জটিলতাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং সন্দেহজনক অবস্থায় যে উকূফ হয়েছে, সেটাকেই যথেষ্ট বলে সাব্যস্ত করা জরুরি।

পক্ষান্তরে আটই জিলহজে উকূফ করার বিষয়টি ভিন্ন। এ দিনে উকূফ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বড় ধরনের কোনো জটিলতা ছাড়াই তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব আরাফার দিনে উকূফ করে সন্দেহ নিরসনের মাধ্যমে। কেননা, আটই জিলহজ থেকে শুরু করে দশই জিলহজ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে লাখ লাখ মানুষের সঠিক তারিখ মনে না থাকা অযৌক্তিক কথা। সুতরাং এ অবস্থায় ক্ষতিপূরণ সম্ভব। দ্বিতীয়ত উকূফকে যদি যথাসময় থেকে বিলম্বিত করা হয়, তাহলে তা জায়েজ হওয়ার নজির রয়েছে। যেমন– রমজানের রোজার কাজা ও নামাজের কাজা বিলম্বিত করা জায়েজ। তদ্রূপ কুরবানির দিনেও উকূফ করা জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে অগ্রবর্তী আমল জায়েজ হওয়ার নজির নেই। এজন্য যদি কেউ আট তারিখে উকূফ করে এবং পরে জানতে পারে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং আরাফার দিবসে পুনরায় উকূফ করতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, অগ্রবর্তী আমল জায়েজ হওয়ার নজির আছে। যেমন– সদকায়ে ফিতর ও জাকাত সময় আসার পূর্বে আদায় করলে আদায় হয়ে যায়। এর উত্তরে বলা হয় যে, এ দুটি বিষয় কিয়াস পরিপন্থি।

মাশায়েখে কেরাম বলেন, 'লোকেরা দশই জিলহজ উকূফ করেছে', কেউ এ ধরনের সাক্ষ্য দিলে শাসকের কর্তব্য হলো, এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করা এবং ঘোষণা দিয়ে দেওয়া যে, লোকদের হজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা সবাই ফিরে যাও। কেননা, সাক্ষ্য গ্রহণ করায় কেবল ফিতনাই সৃষ্টি হয়। অথচ হাদীসে এসেছে– اَلْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَيْقَظَهَا অর্থাৎ 'ফিতনা সুপ্তাবস্থায় থাকে। যে তা জাগায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে অভিশম্পাত দেন।'

মোটকথা হলো, এ ধরনের সাক্ষ্যদাতাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে– লোকদের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে আর সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে হজ হয়েছে কিনা? আর এর ফলে সাধারণ মুসলমানরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি সাক্ষ্যদাতারা আরাফার দিবসের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ইমাম উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। কেননা, এ সাক্ষ্যদানের অর্থ হলো আজ আরাফার দিন। অথচ উকূফের আর মাত্র সময় রয়েছে রাত কিংবা রাতের কিছু অংশ। এ অল্প সময়ের মধ্যে ইমামের পক্ষে সমস্ত লোকদের নিয়ে কিংবা তাদের অধিকাংশকে নিয়ে আরাফায় উকূফ করা সম্ভব নয়। কেননা, সমস্ত লোক কিংবা অধিকাংশই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করে। এ সময়ের মধ্যে তাদেরকে একত্র করত আরাফায় যেতে না যেতেই ফজর উদিত হয়ে যাবে। কাজেই এ সাক্ষ্যও যেন সময় চলে যাওয়ার পর প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি ইমামের পক্ষে অধিকাংশ লোকদেরকে আরাফায় উকূফ করা সম্ভব হয়, তাহলে ঐ সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যাক।

قَالَ وَمَنْ رَمٰى فِى الْيَوْمِ الثَّانِى الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى وَالثَّالِثَةَ وَلَمْ يَرْمِ الْاُوْلٰى فَاِنْ رَمٰى الْاُوْلٰى ثُمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحَسَنٌ لِاَنَّهُ رَاعَى التَّرْتِيْبَ الْمَسْنُوْنَ وَلَوْ رَمَى الْاُوْلٰى وَحْدَهَا اَجْزَاهُ لِاَنَّهُ تَدَارَكَ الْمَتْرُوْكَ فِىْ وَقْتِهٖ وَاِنَّمَا تَرَكَ التَّرْتِيْبَ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) لَا يُجْزِيْهِ مَا لَمْ يُعِدِ الْكُلَّ لِاَنَّهُ شُرِعَ مُرَتَّبًا فَصَارَ كَمَا اِذَا سَعٰى قَبْلَ الطَّوَافِ اَوْ بَدَاَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا وَلَنَا اَنَّ كُلَّ جَمْرَةٍ قُرْبَةٌ مَقْصُوْدَةٌ بِنَفْسِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ الْجَوَازُ بِتَقْدِيْمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ بِخِلَافِ السَّعْيِ لِاَنَّهُ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ لِاَنَّهُ دُوْنَهُ وَالْمَرْوَةُ عُرِفَ مُنْتَهَى السَّعْيِ بِالنَّصِّ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْبِدَايَةُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন মধ্যবর্তী ও তৃতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করল, কিন্তু প্রথমটি করল না, তাহলে প্রথমটি কাজা করার সময় পরবর্তী দুটিও করে নেয়, তাহলে উত্তম হবে। কেননা, এতে সুন্নতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হলো। আর যদি সে প্রথম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, সে যথাসময়ে ছেড়ে দেওয়া আমলটির ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে, শুধু ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সকল رَمْىٌ পুনরায় না করা পর্যন্ত যথেষ্ট হবে না। কেননা, ধারাবাহিকতার সাথেই তা প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এটা তওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করার মতো হলো কিংবা সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সা'ঈ শুরু করার মতো হলো। আমাদের দলিল– প্রতিটি জামরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবদত। সুতরাং একটাকে আরেকটার উপর অগ্রবর্তী করার সাথে তার বৈধতা সম্পৃক্ত হবে না। তবে সা'ঈ-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা তওয়াফের অনুগামী। কারণ, তা তওয়াফের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার। তদ্রূপ মারওয়া যে সা'ঈ-এর শেষ প্রান্ত, এটা 'নস' দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এর সাথে 'প্রারম্ভ' -এর সম্পর্ক হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো হাজী জিলহজের এগার তারিখে মধ্যবর্তী ও তৃতীয় জামরা করল; কিন্তু প্রথম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করল না অথচ ঐ দিনেই তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। অতঃপর সে ঐ দিনে শুধু প্রথম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করল অন্য দুটি জামরায় পুনরায় নিক্ষেপ করল না– তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, সে যথাসময়ে মূল رَمْىٌ আদায় করে ফেলেছে, তবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। কেননা, ধারাবাহিকতা ছিল এরূপ যে, প্রথম জামরায় رَمْىٌ শুরুতে আদায় করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শেষে আদায় করা হয়েছে। মোটকথা, সুন্নতের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। আর এ কারণে কোনো জরিমানা ওয়াজিব হয় না। আর যদি সে তিনটি জামরায় রমী পুনরায় আদায় করে নেয়, তাহলে উত্তম হয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে সুন্নতের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো হাজী যদি শুধু বায়তুল্লাহর তওয়াফ করে, হাতীমের তওয়াফ ছেড়ে দেয় অতঃপর শুধু হাতীমের তওয়াফ পুনর্বার করে, তাহলে তা জায়েজ। আর যদি সম্পূর্ণ তাওয়াফ পুনরায় আদায় করে, তাহলে উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু প্রথম জামরায় رَمِىْ -কে পুনর্বার আদায় করা যথেষ্ট হবে না; বরং তিনটি জামরায় رَمِىْ পুনরায় করতে হবে। কেননা, তিনটি জামরায় رَمِىْ ধারাবাহিকতার সঙ্গে শরিয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং ধারাবাহিকতা ছেড়ে দেওয়া হলো– শরিয়ত কর্তৃক যেভাবে প্রবর্তিত হয়েছে সেভাবে আদায় করা হয়নি। এটা এরূপ হলো, যেমন– কেউ তওয়াফ করার পূর্বে সাফা-মারওয়াতে সা'ঈ করে, তাহলে তরতিববিহীন হওয়ার কারণে জায়েজ হবে না। কিংবা কেউ সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করে, তাহলে সেটাও তরতিববিহীন হওয়ার কারণে সর্বসম্মতভাবে জায়েজ হবে না। তদ্রূপ প্রথম জামরায় رَمِىْ যখন মধ্যম ও তৃতীয় জামরার পরে আদায় করা হয়, তখন তরতিব ফউত হওয়ার কারণে তা জায়েজ হবে না।

আমাদের দলিল হলো, প্রতিটি জামরায় رَمِىْ করা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইবাদত। সুতরাং তা জায়েজ হওয়ার বিষয়টি একটার উপর অন্যটাকে অগ্রবর্তী করার সাথে সম্পৃক্ত হবে না; বরং যখন যেটা সম্পন্ন করা হবে, তখন সেটাই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে সা'ঈ-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেটা তওয়াফের অনুগামী। আসল উদ্দেশ্য তওয়াফ, আর সা'ঈ হলো তার অনুগামী। কেননা, তা তওয়াফের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার। এ কারণেই তওয়াফ সা'ঈ ছাড়া প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সা'ঈ তওয়াফ ছাড়া প্রবর্তিত হয়নি।

মোদ্দাকথা হলো, প্রতিটি জামরার রমীই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইবাদত– একটি অপরটির অনুগামী নয়। পক্ষান্তরে সা'ঈ তওয়াফের অনুগামী। এ কারণে রমীকে সা'ঈ-এর উপর কিয়াস করা জায়েজ নেই। আর মারওয়া সা'ঈ-এর শেষ প্রান্ত, এটা إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ الخ নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সাফা থেকে সা'ঈ শুরু করবে, সুতরাং এর সাথে 'প্রারম্ভ' -এর সম্পর্ক হতে পারে না।

قَالَ وَمَنْ جَعَلَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَاِنَّهٗ لَا يَرْكَبُ حَتّٰى يَطُوْفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَفِى الْاَصْلِ خَيَّرَهٗ بَيْنَ الرُّكُوْبِ وَالْمَشْىِ وَهٰذَا اِشَارَةٌ اِلَى الْوُجُوْبِ وَهُوَ الْاَصْلُ لِاَنَّهُ الْتَزَمَ الْقُرْبَةَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَيَلْزَمُهٗ بِتِلْكَ الصِّفَةِ كَمَا اِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ مُتَتَابِعًا وَاَفْعَالُ الْحَجِّ تَنْتَهِىْ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِىْ اِلٰى اَنْ يَطُوْفَهٗ ثُمَّ قِيْلَ يَبْتَدِئُ الْمَشْىَ مِنْ حِيْنَ يُحْرِمُ وَقِيْلَ مِنْ بَيْتِهٖ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّهٗ هُوَ الْمُرَادُ وَلَوْ رَكِبَ اَرَاقَ دَمًا لِاَنَّهٗ اَدْخَلَ نَقْصًا فِيْهِ قَالُوْا اِنَّمَا يَرْكَبُ اِذَا بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ وَشَقَّ الْمَشْىُ وَاِذَا قَرُبَتْ وَالرَّجُلُ مِمَّنْ يَعْتَادُ الْمَشْىَ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ يَنْبَغِىْ اَنْ لَا يَرْكَبَ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হেঁটে হজ করবে বলে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে, সে তওয়াফে জিয়ারত করা পর্যন্ত সওয়ারিতে আরোহণ করবে না। 'মাবসূত' গ্রন্থে তাকে সওয়ার কিংবা পায়ে হাঁটা যে কোনো একটির এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। এখানে মতনের ভাষ্যে ওয়াজিব হওয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এই হলো নীতিগত হুকুম। কেননা, সে পূর্ণ গুণসহ নিজের উপর ইবাদত লাযেম করে নিয়েছে। সুতরাং সেই গুণসহ তা তার উপর লাযেম হবে। যেমন– যদি কেউ লাগাতার রোজা রাখার মান্নত করে। আর হজের কর্মসমূহ যেহেতু তওয়াফে জিয়ারতের মাধ্যমে শেষ হয়, তাই উক্ত তওয়াফ করা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে চলা শুরু করবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার ঘর থেকে শুরু করবে। কেননা, বাহ্যত এটাই হলো উদ্দেশ্য। যদি সে সওয়ার হয়ে চলে, তাহলে দম দিতে হবে। কেননা, সে তাতে ত্রুটি স্পষ্ট করে ফেলেছে। মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, দূরত্ব যখন অধিক হয় এবং হাঁটা কষ্টকর হয়, তখন আরোহণ করবে। আর স্থল নিকটবর্তী হলে এবং সে হাঁটায় অভ্যস্ত হলে এবং তার জন্য কষ্টকর না হলে আরোহণ না করাই উচিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ পায়ে হেঁটে হজ করার মান্নত করে, তাহলে তওয়াফে জিয়ারত করা পর্যন্ত সওয়ারিতে আরোহণ না করা তার উপর ওয়াজিব। এটি হলো জামেউস সাগীরের বর্ণনা। এটি বিশুদ্ধতম অভিমত।

'মাবসূত' কিতাবে অবশ্য তাকে সওয়ার কিংবা পায়ে হাঁটা যে কোনো একটির এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, জামিউস সগীরের উদ্ধৃতি– وَلَا يَرْكَبُ حَتّٰى يَطُوْفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ থেকে পায়ে হেঁটে হজ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর এটিই নীতিগত হুকুম। কেননা, যে ব্যক্তি পূর্ণগুণসহ নিজের উপর ইবাদত লাযেম করে নিয়েছে, সে অসম্পূর্ণভাবে আদায় করলে তা আদায় হবে না। আর হজের ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে চলা হলো একটি পূর্ণ গুণ। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ حَجَّ مَاشِيًا فَلَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيْلَ وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ بِسَبْعِمِائَةٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে হজ করল, সে প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে হারামের ছওয়াব থেকে একটি ছওয়াব পাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! হারামের ছওয়াব কি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন : একটি ছওয়াব সাতশ ছওয়াবের সমান। যাই হোক, পায়ে হেঁটে হজ করা একটি পূর্ণ গুণ। কাজেই সে একটি পূর্ণ গুণসহ নিজের উপর হজ লাযেম করে নিয়েছে। আর মান্নত যেভাবে নিজের উপর নির্ধারণ করা হয়, ঠিক সেভাবে তার উপর তা আবশ্যক হয়ে যায়। সুতরাং হজ সেই গুণসহ তার উপর লাযেম হবে। অর্থাৎ তাকে পায়ে হেঁটে হজ করতে হবে। যেমন– কেউ যদি লাগাতার রোজা রাখার মান্নত করে, তাহলে লাগাতারভাবে রোজা রাখা তার উপর ওয়াজিব।

আর হজের কর্মসমূহ যেহেতু তওয়াফে জিয়ারতের মাধ্যমে শেষ হয়, তাই উক্ত তওয়াফ করা পর্যন্ত তাকে পায়ে হেঁটে চলতে হবে। তবে কথা হলো কোন স্থান থেকে পায়ে হেঁটে চলা শুরু করবে? কেউ কেউ বলেন, ইহ্রাম বাঁধার পর থেকে পায়ে হেঁটে চলা শুরু করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, নিজের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে চলা শুরু করবে। কেননা, বাহ্যত এটাই হলো উদ্দেশ্য।

পায়ে হেঁটে হজ করার মান্নত করার পর কেউ যদি সওয়ার হয়ে যায়, তাহলে দম দিতে হবে। কেননা, সে তাতে ত্রুটি স্পষ্ট করে ফেলেছে মান্নতের বিপরীত করার কারণে।

মাবসূত ও জামিউস সাগীর গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, দূরত্ব যদি অধিক হয় এবং পায়ে হাঁটা কষ্টকর হয়, তাহলে সওয়ারিতে আরোহণ করবে। যেমন– মাবসূতের বর্ণনায় রয়েছে। আর যদি দূরত্ব কাছাকাছি হয় এবং সে ব্যক্তি হাঁটায় অভ্যস্ত হয় এবং তা তার জন্য কষ্টকর না হয়, তাহলে সওয়ারিতে আরোহণ না করা উচিত। যেমন– জামিউস সগীরের বর্ণনায় রয়েছে।

وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً مُحْرِمَةً قَدْ اَذِنَ لَهَا فِيْ ذٰلِكَ فَلِلْمُشْتَرِيْ اَنْ يُحَلِّلَهَا وَيُجَامِعَهَا وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ لِاَنَّ هٰذَا عَقْدٌ سَبَقَ مِلْكَهُ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فَسْخِهِ كَمَا اِذَا اشْتَرٰى جَارِيَةً مَنْكُوْحَةً وَلَنَا اَنَّ الْمُشْتَرِيْ قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ وَقَدْ كَانَ لِلْبَائِعِ اَنْ يُحَلِّلَهَا فَكَذَا الْمُشْتَرِيْ اِلَّا اَنَّهُ يَكْرَهُ ذٰلِكَ لِلْبَائِعِ لِمَا فِيْهِ مِنْ خَلْفِ الْوَعْدِ وَهٰذَا الْمَعْنٰى لَمْ يُوْجَدْ فِيْ حَقِّ الْمُشْتَرِيْ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لِاَنَّهُ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ اَنْ يَفْسَخَهُ اِذَا بَاشَرَ بِاِذْنِهِ فَكَذَا لَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ لِلْمُشْتَرِيْ وَاِذَا كَانَ لَهُ اَنْ يُحَلِّلَهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ (رحـ) يَتَمَكَّنُ لِاَنَّهُ مَمْنُوْعٌ عَنْ غِشْيَانِهَا وَ ذُكِرَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ اَوْ يُجَامِعُهَا وَالْاَوَّلُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ يُحَلِّلُهَا بِغَيْرِ الْجِمَاعِ بِقَصِّ شَعْرٍ اَوْ بِقَلْمِ ظُفْرٍ ثُمَّ يُجَامِعُ وَالثَّانِيْ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ يُحَلِّلُهَا بِالْمُجَامَعَةِ لِاَنَّهُ لَا يَخْلُوْ عَنْ تَقْدِيْمِ مَسٍّ يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيْلُ وَالْاَوْلٰى اَنْ يُحَلِّلَهَا بِغَيْرِ الْمُجَامَعَةِ تَعْظِيْمًا لِاَمْرِ الْحَجِّ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ : আর কোনো ব্যক্তি যদি ইহ্রাম অবস্থায় দাসীকে বিক্রি করে যে তাকে ইহ্রামের অনুমতি দিয়েছিল, তাহলে বিক্রেতার জন্য জায়েজ হবে তাকে ইহ্রামমুক্ত করে তার সাথে সহবাস করা। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ক্রেতার জন্য তা জায়েজ হবে না। কেননা, এটা [ইহ্রাম] এমন একটি চুক্তি, যা তার মালিকানার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা সে বাতিল করতে পারবে না। যেমন– কেউ যদি বিবাহিতা দাসী ক্রয় করে। আমাদের দলিল হলো, এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার স্থলবর্তী হয়েছে। আর বিক্রেতার জন্য তাকে ইহ্রামমুক্ত করে নেওয়া জায়েজ ছিল। সুতরাং ক্রেতার জন্যও তা জায়েজ হবে। তবে বিক্রেতার জন্য তা মাকরূহ। কেননা, এতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়। আর এ কারণ ক্রেতার ক্ষেত্রে নেই। পক্ষান্তরে বিবাহের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিবাহ হয়ে থাকলে, তা বাতিল করার অধিকার তার ছিল না। সুতরাং ক্রেতারও সে অধিকার থাকবে না। ক্রেতার যখন ইহ্রামমুক্ত করে নেওয়ার অধিকার রয়েছে, তখন আমাদের মতে ইহ্রামের দোষের কারণে তাকে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সে দোষের কারণে ফেরত দিতে পারবে। কারণ, তার সাথে সহবাস থেকে তাকে বারণ করা হয়েছে। কোনো কোনো অনুলিপিতে এরূপ রয়েছে– 'অথবা তার সাথে সহবাস করতে পারবে।' প্রথম মতনের ভাবে বুঝা যায় যে, সহবাস ছাড়া চুল ছাঁটা কিংবা নখ কর্তন করার মাধ্যমে তাকে ইহ্রামমুক্ত করবে, অতঃপর সহবাস করবে। আর দ্বিতীয় ইবারত থেকে বুঝা যায় যে, সহবাস দ্বারা তার ইহ্রাম ভঙ্গ করাবে। কেননা, সহবাসের পূর্বে স্পর্শ সাধারণত হয়েই থাকে, যার দ্বারা ইহ্রাম ভেঙ্গে যাবে। আর উত্তম হলো হজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সহবাস ব্যতীত তাকে ইহ্রামমুক্ত করা। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি হজের ইহ্‌রামরত দাসীকে বিক্রি করে, যে তাকে ইহ্‌রামের অনুমতি দিয়েছিল, তাহলে এ বিক্রি জায়েজ হবে। ক্রেতা মুহ্‌রিম না হলে দাসীকে ইহ্‌রামমুক্ত করে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ক্রেতার জন্য এ অধিকার থাকবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ইহ্‌রাম এমন একটি 'আকদ' যা ক্রেতার মালিকানার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা বাতিল করার অধিকার ক্রেতার থাকবে না। যেমন- কেউ অন্যের বিবাহিতা দাসী খরিদ করলে তার বিবাহ বাতিল করে তার সাথে সহবাস করার অধিকার ক্রেতার থাকবে না। তবে ক্রেতা যদি বিবাহের বিষয়টি না জানে, তাহলে 'বিবাহের দোষের' কারণে তাকে ফেরত দিতে পারবে। তদ্রূপ ইহ্‌রামরত দাসীকে হালাল করে তার সাথে সহবাস করার অনুমতি নেই। তবে 'ইহ্‌রামের দোষের' কারণে ফেরত দিতে পারবে।

আমাদের দলিল হলো, এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার স্থলবর্তী হয়েছে। আর বিক্রেতার জন্য তাকে ইহ্‌রামমুক্ত করে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ ছিল। সুতরাং অনুরূপভাবে ক্রেতারও সে অধিকার অর্জিত হবে। অবশ্য বিক্রেতার জন্য ইহ্‌রামরত দাসীকে হালাল করা মাকরূহ। কেননা, বিক্রেতা যখন তাকে ইহ্‌রাম বাঁধার অনুমতি দিয়েছিল, তখন সে যেন তার সাথে সহবাস না করার অঙ্গীকার করেছিল। এখন সে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এ কারণে বিক্রেতার জন্য তা মাকরূহ। আর ক্রেতা যেহেতু তাকে ইহ্‌রাম বাঁধার অনুমতি দেয়নি, এজন্য তার ক্ষেত্রে অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয়টি পাওয়া যায় না। সুতরাং তার জন্য দাসীকে ইহ্‌রামমুক্ত করানো মাকরূহ হবে না।

বিবাহের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ বিবাহিতা দাসীকে ক্রেতা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা, বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিবাহ হয়ে থাকলে তা বাতিল করার অধিকার স্বয়ং তারও ছিল না। তদ্রূপ ক্রেতারও সে অধিকার থাকবে না। কারণ, ক্রেতা বিক্রেতার স্থলবর্তী। সুতরাং বিবাহিতা দাসীর উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ক্রেতার যখন ইহ্‌রামরত দাসীকে হালাল করে নেওয়ার অধিকার রয়েছে, তখন আমাদের মতে, ইহ্‌রামের দোষের কারণে তাকে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, ইহ্‌রামের দোষের কারণে ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে। কেননা, তাঁর মতে, ক্রেতা তাকে ইহ্‌রামমুক্ত করে তার সাথে সহবাস করতে পারে না। যেহেতু ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট ইহ্‌রাম সহবাসের জন্য বাধাস্বরূপ, তাই তাঁর মতে ইহ্‌রাম 'ত্রুটি' রূপে গণ্য হবে। আর ত্রুটির কারণে ক্রেতা বিক্রি বাতিল করে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারে। এজন্য এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইহ্‌রামরত দাসীকে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, জামিউস সগীরের কোনো কোনো অনুলিপিতে আছে- أَوْ يُجَامِعُهَا 'অথবা তার সাথে সহবাস করতে পারবে।' অর্থাৎ প্রথম অনুলিপিতে وَاوْ অব্যয় যোগে وَيُجَامِعُهَا রয়েছে, আর দ্বিতীয় অনুলিপিতে أَوْ অব্যয় যোগে يُجَامِعُهَا রয়েছে। প্রথম অনুলিপির ভাষ্যে বুঝা যায়, সহবাস ছাড়া চুল ছাঁটা কিংবা নখ কর্তন করার মাধ্যমে তাকে ইহ্‌রামমুক্ত করবে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করবে।

আর দ্বিতীয় অনুলিপির ইবারত থেকে বুঝা যায় যে, ইহ্‌রামরত দাসীকে সহবাস দ্বারা হালাল করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সে সহবাসের পূর্বে হালাল হয়ে যাবে। কেননা, সহবাসের পূর্বে কামভাবের স্পর্শ অবশ্যই হয়ে থাকে। আর কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে মুহ্‌রিম হালাল হয়ে যায়। এ কারণে এখানেও সে সহবাসের পূর্বে হালাল হয়ে গেছে, অতঃপর সহবাস হয়েছে। তবে আমরা বলে থাকি, কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা সহবাসের মতোই। আর তাই কামভাব নিয়ে স্পর্শ করার দ্বারা হালাল করার অর্থ সহবাসের মাধ্যমে হালাল করা। আর উত্তম হলো হজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সহবাস, স্পর্শ, চুম্বন প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় হালাল করে তার সাথে সহবাস করা। অন্যথায় হজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। আল্লাহ তা'আলাই সঠিক বিষয় সর্বাধিক জ্ঞাত।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ .

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত